অস্পষ্ট প্রস্তাবের আড়ালে হিন্দীভাষীর নূতন জোট

দর্পণ

সাপ্তাহিক সংবাদ সাময়িকী

সাধারণতন্ত্র দিবস বিশেষ সংখ্যা | কলিকাতা, রবিবার ২৬শে জানুয়ারী, ১৯৫৮ | মূল্য { ৪ আনা ২৫ নঃ পঃ

(নিজস্ব বিশেষ সংবাদদাতা প্রেরিত)

প্রাগজ্যোতিষপুর, ২২শে জানুয়ারী—শেষ পর্য্যন্ত বহু বিতর্কিত ভাষার প্রশ্নের কংগ্রেস যে সমাধান করেছেন, সেটা আর কিছু নয়—অস্পষ্ট একটা প্রস্তাবের দ্বারা উত্তর খণ্ডের হিন্দিভাষীদের আশ্রয় দেওয়ার ব্যবস্থা।

যতই সাংবাদিকেরা এই বিতর্কে গুরুত্ব আরোপ করুন দক্ষিণ-ভারতের সদস্যদের তরফ থেকেও এই বিতর্কে গুরুত্ব আনবার চেষ্টা কম হয়নি—তথাপি যে কোন বুদ্ধিমান পর্য্যবেক্ষকের কাছে একথা সুস্পষ্ট যে, দিল্লীর গভর্ণমেন্ট, বিশেষতঃ পণ্ডিত পন্থ যে ফর্মুলা পকেটে ক'রে এনেছিলেন, শেষ সিদ্ধান্ত তার থেকে এক চুলও সরানো যায়নি।

প্রকৃতপক্ষে, মাসাধিককাল পূর্বে দিল্লীতে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ে গিয়েছে এবং পণ্ডিত পন্থ সাংবাদিক সম্মেলনে যে কথা ঘোষণা করে দিয়েছিলেন, প্রাগজ্যোতিষপুরে প্রভূত ঢকা নিনাদের পরে সেই কয়টি কথাই প্রস্তাবের আকারে গৃহীত হয়েছে।

সংশোধন প্রস্তাবের পর অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে, তাতে কংগ্রেস বলছেন যে, হিন্দী প্রবর্ত্তনের ব্যাপারে ১৯৬৫ সালই চূড়ান্ত সীমা রূপে নির্দিষ্ট হবেনা এবং হিন্দী অফিসিয়াল ভাষারূপে চালু হওয়ার পরেও ইংরাজি কোন কোন জায়গায় বজায় রাখা যেতে পারে।

দক্ষিণ ভারতের সদস্যেরা একথা বুঝতে পারছিলেন যে, দুইটি আশ্বাসই কতকটা অবান্তর এবং অস্পষ্ট তো বটেই। কেননা ভাষা কমিসনও ১৯৬৫ সালকে চূড়ান্ত বলে নির্দ্দিষ্ট করেননি এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ইংরাজী বজায় রাখার সুপারিশ তাঁদের রিপোর্টেও ছিল কংগ্রেস অধিবেশনেও হিন্দি বিরোধী সদস্যেরা ১৯৬৫ সালের উপরে সামান্যই জোর দিয়েছিলেন, তাঁদের বিরোধিতা ছিল আরও মূলগত—সম্পূর্ণই হিন্দীর বিরোধী।

মাইহউক্ এই অস্পষ্ট প্রস্তাব কি ভাবে গৃহীত হল এবং উত্তর খণ্ডের নেতারা আসল প্রশ্ন কিরূপে পাশ কাটিয়ে এলেন, সেই বিবরণ আরও কৌতুহলোদ্দীপক।

মূল প্রস্তাবের উপরে প্রায় ২০টি সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছিল। অন্য বিষয়ের অবতারণার পূর্বে প্রস্তাবকদেরই সে সংবন্ধে বলতে দেওয়া বিধিসম্মত হলেও মহীশূরের শ্রীমনুমন্তিয়ার প্রখর সমালোচনামূলক বক্তৃতার পরেই (উল্লেখযোগ্য যে, শ্রীমনুমন্তিয়া একাই নয়টি সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন) শ্রীনেহরুকে কংগ্রেস সভাপতি বক্তৃতার জন্য আহ্বান করে বসলেন। ফলে অন্যান্য সংশোধন প্রস্তাবগুলি পরবর্তী অধিবেশন পর্যন্ত স্থগিত রইল।

অবশ্য শ্রীনেহরুর বক্তৃতা সংবন্ধে আমার আপত্তির কিছুই নেই। বস্তুত, আমার বিশ্বাস যে, ঐ সময়ে তিনি হস্তক্ষেপ না করলে হিন্দীভাষী এবং অহিন্দীভাষীদের মধ্যে বিতর্ক হয়তো বিদ্বেষে রূপান্তরিত হতে পারত। শ্রীনেহরুর আবেগপূর্ণ বক্তৃতা একাধারে উগ্র হিন্দীওয়ালাদের কার্যকরভাবে প্রশমিত করেছিল এবং অপর পক্ষকেও শান্ত করেছিল। কিন্তু একথা অস্বীকার করা যায়না যে, ঐ সময় শ্রীনেহরুকে

(২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

কংগ্রেস ও চিড়িয়াখানা

প্রাগজ্যোতিষপুর ২০শে জানুয়ারী

আর যাই বলা হোক্ আসাম কংগ্রেসকে কেউ আতিথ্যের দোষ দিতে পারবেনা। বর্ত্তমান কংগ্রেস অধিবেশনের "গৃহস্বামীরূপে" আসাম প্রদেশ কংগ্রেস যে জলজমাও ঘটিয়েছেন, পূর্বেকার কোনো কংগ্রেস অধিবেশনের চেয়ে তা খাটো হয়েছে একথা আমার অন্ততঃ মনে হয় নি। শুধু প্রদেশ কংগ্রেসের কথাই বা কেন বলি, আসামের গভর্ণমেন্টকেও ধন্যবাদ-ইতিপূর্বে পাঞ্জাব, সৌরাষ্ট্র, মাদ্রাজ, এবং পশ্চিমবঙ্গের গভর্ণমেন্ট কংগ্রেস অধিবেশনের সাফল্যের জন্য যে পরিমাণ সরকারী অর্থ ও লোকবল নিয়োগ করেছিলেন, আসামের গভর্ণমেন্ট তার তুলনায় কোনো কার্পণ্য দেখাননি। অবশ্য নেহরুজী যে নির্দেশ দিয়েছিলেন—ব্যয় সঙ্কোচ করতে হবে, জাক জমকের বাহুল্য বাদ দিতে হবে এবং কংগ্রেস অধিবেশনের সময় যে-কার্ণিভ্যালের আবহাওয়া তৈরী হয়, তা কোনোমতে করা চলবেনা—এই নির্দেশ কতটা পালন করা হয়েছে, নেহরুজী স্বয়ং তার উত্তর দিতে পারবেন। আসাম কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতি বলেছেন বটে যে, নেহরুজীর নির্দেশ কোথাও ক্ষুন্ন হয়নি : অন্যান্য বছরের তুলনায় এবারে সভামণ্ডপ কতো ছোট। মাত্র ১০ হাজার লোকের জন্য প্রকাশ্য অধিবেশনে জায়গা করা হয়েছে। অন্য বছর বিষয় নির্বাচনী কমিটির বৈঠকের জন্য পৃথক মণ্ডপ তৈরী হয়, এবার তাও বাদ দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু কার্ণিভ্যালের আবহাওয়া? তার বিষয়, যদি আপনারা চান, আমি কিছু বর্ণনা দিতে পারি। জাঁকজমকে অন্য বছরের চেয়ে কোনো অংশে ঘাটতি হয়েছে, আমার তো একথা অন্ততঃ মনে হলনা। বরং আসাম কংগ্রেস অন্যদের উপরে এক কিস্তি নিয়েছেন। এতাবৎ যা কোনো দিনই কেউ করতে পারেনি—কারুর মাথায়ও আসেনি—অধিবেশন ক্ষেত্রের মধ্যেই একটি ছোট্ট চিড়িয়াখানা বসানো হয়েছে। আসামের আরণ্যক প্রাণীরা সেখানে খাঁচার মধ্যে ভর্তি হয়ে অধিবেশনের প্রাণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করছে। এটা কোনো "আদিমতার" প্রতীক কিনা, সেকথা কেউ বলতে পারেনা। এবং কংগ্রেস নেতারা যখন বিষয় নির্বাচনী কমিটিতে বসে দেশের নানাবিধ সমস্যা আলোচনা করবেন, তখন এই গণ্ডার, হাতী ও বাঘ সমূহ সেই আলোচনায় কোনোভাবে সাহায্য করতে পারে কিনা, তাও বলতে পারব না।

(১১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সম্পাদকীয় ঃ

বাবু সংবাদপত্র ও দর্পণ

বিগত দশ বৎসরের মধ্যে বহু বাংলার শিক্ষিত বাঙ্গালী পাঠককে একথা জিজ্ঞাসা করতে হয়েছে যে, সংবাদ পত্রের কণ্ঠস্বর এত বিভ্রান্ত কেন? যখন পিছনের দিকে তাকিয়ে এক সঙ্গে গোটা দশ বৎসরের চিত্র আমরা দেখতে পেয়েছি, তখন সংবাদপত্রের ব্যর্থতা আরও তীব্রভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। কেননা এই দশ বৎসরে সমস্যা এক একবার উত্তাল হয়ে এসেছে, নৈরাশ্য এবং বৌরোক্তি বাঙ্গালার চিন্তা-জগতকে [illegible] করে দিয়েছে। [illegible] শক্তি বাঙ্গলা দেশকে [illegible] দিতে হয়েছে কি না সন্দেহ। [illegible] এর সামান্য সাক্ষ্যই [illegible] করেছে।

[illegible] সঙ্গে সংবাদপত্রের এই [illegible] নয় এবং এর কারণগুলি [illegible] প্রয়োজন আছে। যদিও [illegible] যুগে, সংবাদপত্রের চেহারা [illegible] পরিপাটি—প্রায় দিনে কথা [illegible] পোষাকে আচ্ছাদিত হয়েছে, তথাপি একথা সুস্পষ্ট যে, এই ভিকাড্যান্ট বাবুয়ানা ছাড়া তার আর সমস্ত সার্থকতা চুকে গেছে। ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে [illegible] সাংবাদিকতার যে ধারা তৈরী হয়েছিল, "বাবু সংবাদপত্র গুলির" হাতে সেটি বহুল সম্পূর্ণ পণ্ড হয়েছে। এখনও যে দুই এক জন সদিচ্ছাসম্পন্ন সম্পাদক অবশিষ্ট আছেন, তাঁরা একথা অস্বীকার করবেন না যে গত দশ বৎসরে সম্পাদকের সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে সংবাদপত্রের এই আর সম্পাদকদের একটা বৃহৎ দুর্ভাগ্য।

কিন্তু এই দুর্ভাগ্য এড়ানোর কোনো উপায় ছিলনা। এ যদি শুধু গভর্ণমেণ্টের চালেই ঘটত তাহলেও এর থেকে আত্মরক্ষা করা হয়ত কতক পরিমাণ সম্ভব ছিল। আসলে এক্ষেত্রে আত্মরক্ষার প্রশ্নই উঠেনা—এই অন্তঃসর্পণ স্বেচ্ছাকৃত। যুদ্ধোত্তর কালে এই একটা [illegible] পরিবর্তন ঘটেছে যে, পত্রিকা মালিকেরা মাঝারি শিল্পপতির শ্রেণী থেকে বৃহৎ শিল্পপতির গোষ্ঠিতে উত্তীর্ণ হয়েছেন। এবং এরই স্বাভাবিক পরিণতি এখন প্রতিদিনের বাস্তব সত্য। যে সময়ের সাংবাদিক তেজস্বিতার কথা আমরা স্মরণ করি, সে সময়ে সংবাদ পত্র ছিল ক্ষুদ্র ব্যবসায় এবং ক্যালকাটা ক্লাব অথবা রোটারি সমাজে তখনও সংবাদ কোম্পানী প্রবেশ করেনি। কাজেই এখন একথা আর আশা করাও বাতুলতা যে, এঁরা নিযুক্ত শ্রেণীর স্বার্থের মুখপত্র হবেন।

শিক্ষিত বাঙ্গালী পাঠকের কাছে একথা স্পষ্ট হওয়া দরকার যে, বৃহৎ সংবাদপত্রের আদর্শবাদের যুগ অস্তমিত হয়েছে। সৌভাগ্যক্রমে সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার পরলোকগত। নতুবা সার্কাসের ব্যাঘ্রের ন্যায় তাঁর পিঞ্জরাবদ্ধ দুর্দশাও দেখতে হত। এবং একালেও বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ট্র্যাজিডি অজ্ঞাত নয় যে, তাঁকে সংবাদপত্রের লেখনী ছেড়ে স্বমত প্রকাশের জন্য মাইক্রোফোনের আশ্রয় নিতে হয়েছে। যেকোনো সাংবাদিক ও লেখকের ক্ষেত্রেই এই কণ্ঠরোধ ঘটেছে।

কাজেই চিন্তাশীল বাঙ্গালীর আত্মপ্রকাশের জন্য একটি মুখপত্র দরকার। একথা আমরা বিশ্বাস করি বলেই দর্পণ

আসল খাদ্য সঙ্কট কত খানি?

(দর্পণের প্রতিনিধি)

সামগ্রিকভাবে দেখতে গেলে দেশে যে খাদ্যের ঘাটতি আছে একথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এ ব্যাপারে গুরুতর মতবৈষম্য যে নেই এমন নয়। প্রধানতঃ, এ মতবৈষম্য সুস্পষ্ট হ'য়ে দেখা দিয়েছে এক দিকে পরিকল্পনা কমিশনের বিশেষজ্ঞগণ এবং অপরদিকে বিহার, উড়িষ্যা ও অন্যান্য কয়েকটি রাজ্য সরকারের মধ্যে। চলতি বছরে ঠিক কত যে ঘাটতি হবে এই প্রসংগেই বিশেষ করে তীব্র মত'ভেদ ঘটেছে। পরিকল্পনা কমিশনের বিশেষজ্ঞগণের মতে এই সব রাজ্য যে ঘাটতির কথা বলেছে সে অঙ্ক অত্যন্ত বেশী করে ধরা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদ্য ও কৃষি বিভাগের মধ্যেও ১৯৫৭-৫৮ সালে চাউল উৎপাদনের পরিমাণ সংপর্কে মতের গরমিল রয়েছে। খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র সেন প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন যে এ বছর পশ্চিম বঙ্গের খাদ্যের ঘাটতি ১২ লক্ষ টনে দাঁড়াবে। অপর পক্ষে কৃষি বিভাগের পক্ষ থেকে ঐ ঘাটতির পরিমাণ দেখান হয়েছে ৮ লক্ষ টন। সুতরাং এই দুই বিভাগের হিসাবের পরিমাণে ৪ লক্ষ টন তফাৎ দেখা যাচ্ছে। গত কয়েক বৎসরের উৎপাদন পরিমাণের সংখ্যাতত্ত্ব বিশ্লেষণ করলে হিসাবের অঙ্ক ও উৎপাদনের পরিমাণের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। এই বছরের উৎপাদনের পরিমাণ সংপর্কেও কৃষি বিভাগের অভিমতানুযায়ী এই পার্থক্য ঘটার আশংকা আছে এবং কৃষি বিভাগের পক্ষ থেকে যে হিসাব দেওয়া হয়েছে তা থেকে ঘাটতি শেষ পর্য্যন্ত আরও কম হতে পারে।

কেন যে খাদ্য বিভাগ কৃষি বিভাগের এই হিসাব গ্রহণ করছেন না তা কিছুটা অস্পষ্ট থাকলেও এর একটা উত্তর অবশ্য পাওয়া খুব কঠিন নয়। সাধারণ ভাবে কৃষি বিভাগই খাদ্য উৎপাদনের সংগে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট। আসলে কেন্দ্রীয় শস্য ভাণ্ডার থেকে সাহায্য পাওয়ার আশায় ঘাটতি অঞ্চলের রাজ্য গুলি প্রত্যেকেই তাদের উৎপাদনের ঘাটতির পরিমাণ ফাঁপিয়ে দেখাচ্ছে এবং এই সংগে বাইরে থেকে সাহায্য যে পরিমাণ পাওয়া উচিত তার অংকও বাড়িয়ে দেখাচ্ছে। এমন কি খাদ্যের ব্যাপারে উদ্বৃত্ত রাজ্যগুলি পর্যন্ত অনেক ক্ষেত্রে তাদের উৎপাদনের পরিমাণ কম করে দেখিয়েছে পাছে ঘাটতি এলাকা বা কেন্দ্র তাদের উদ্বৃত্ত খাদ্যের উপর দাবি জানিয়ে বসে। অন্যদিকে বিদেশ থেকে আমদানির মারফৎ দেশের খাদ্যের ঘাটতি মেটাতে গিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারও ঘাটতি রাজ্যগুলোর মত পথ অবলম্বন

কিন্তু মন্ত্রী মহাশয় "অন্য প্রয়োজনের খাতিরে" সে কথায় কর্ণপাত করেন নি। এই মনোবৃত্তি রাজ্যের জেলা কর্তৃপক্ষের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছে। বিভিন্ন জেলার অফিসাররাও নিজের নিজের জেলার অনটনকে বাড়িয়ে দেখাবার প্রতিযোগিতায় মেতেছেন। কিন্তু এই অসামঞ্জস্যের ফলে আসলে কি ঘটছে? অতীতে প্রত্যেক বছর ফসল কাটার সময় চালের দর পড়ে যাওয়ার সংগে সংগে অন্যান্য খাদ্য শস্যের দরও কমে যায়। এই রাজ্যের প্রধান শস্য আমন ফসল কাটা অনেকটা এগিয়ে গেছে এবং আগামী তিন সপ্তাহের মধ্যেই সে কাজ সম্পন্ন হয়ে যাবে, আশা করা যায়। কিন্তু চালের দাম কমবার কোন লক্ষণ এখন পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। পুরানো চালের দাম কমা দূরের কথা, বরং বাড়তির দিকেই রয়েছে। চালের ব্যাপারীও অন্যান্য কারবারীরা বেশী মুনাফার আশায় মজুদ চাল ধরে রাখছে। এদের মধ্যে অনেকেই খোলাখুলিভাবেই একথা স্বীকার করছেন যে, সরকারী বিবৃতিতে যে ঘাটতির দেখানো হয়েছে তার ফলে যে আতঙ্কের আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছে, তার সুযোগ তারা গ্রহণ করবেন না কেন? সরকারও একথা ভালভাবেই জানেন যে তারা যে হিসেব তৈরী করেন সে হিসেবের ঘাটতিও নির্ভরযোগ্য বা সন্তোষজনক নয়। খালি মজুদ শস্য নিয়েই ব্যবসায়ীরা সন্তুষ্ট নয়, এই সব মুনাফাশিকারী কারবারীরা, দুর্নীতি ধরায় সরকারী যন্ত্রের নিষ্ক্রিয়তার এবং দুর্নীতিপরায়ণ কর্মচারীদের সুযোগ নিয়ে বিভিন্ন জেলার কর্ডন এলাকার ভিতর থেকে, লরী বোঝাই ধান-চাল কোলকাতায় নিয়ে আসে। খাদ্য বিভাগ এ সংবন্ধে বেশ ভাল ভাবেই অবহিত আছেন। কিছুদিন আগে তারা কর্ডন ব্যবস্থা মজবুৎ করার উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের সহায়তা প্রার্থনা করেন।

সরকারের ভিতরে ও বাইরে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ খাদ্যের ঘাটতি ও দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনার চিত্র বারংবার তাদের ঘোষণার মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন (যা অন্যান্য দলের অনেক নেতারাও প্রকারান্তরে স্বীকার করে নিয়েছেন) তার ফল যথেষ্ট ক্ষতিকর হয়েছে। কর্তৃপক্ষও এজন্য দায়িত্ব এড়াবার সুযোগ পেয়েছেন। অপর দিকে কলিকাতা ও জেলাগুলিতে যে ন্যায্য মূল্যের দোকান চালু আছে সেগুলোতেও সরবরাহ এবং প্রয়োজন মত খাদ্য শস্য সরবরাহ করা হচ্ছে না এবং যাও বা করা হচ্ছে তাও অতি নিকৃষ্ট ধরণের। সংপ্রতি খাদ্য বিভাগের পক্ষ থেকে জেলা কর্তৃপক্ষের নিকট এক সার্কুলার মারফৎ তাদের এলাকায় খাদ্য শস্য সরবরাহের পরিমাণ কমানোর নির্দেশ দিয়েছেন। এই অনিয়মিত সরবরাহ খাদ্য শস্যের দামের

অন্যান্য পৃষ্ঠায় ঃ

সমসাময়িক সংবাদ ঃ

দীর্ঘমেয়াদী অফিসার (৩)

শিলং-এর চিঠি (২)

মাধ্যমিক শিক্ষা সংকট (২)

ঢাকার খবর (৩)

ষ্টেডিয়াম তৈরীর অন্তরালে (৫)

উদ্বাস্তু সাহায্যের প্রতিশ্রুতি (৬)

মুস্রার চৌধুরী কথা (৮)

পঞ্চপল্লীর ডাইরী (১০)

সমসাময়িক চিন্তা ঃ

মানুষ ও মনীষা : বুদ্ধদেব বসু (৪)

হিং টিং ছট্ : কবি সৌভানন্দ (৩)

জীবিকার সংকট (৭)
সুবোধ ব্যানার্জী

উদ্বাস্তুদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা (৯)
বিমল কুমার ঘোষ এম,পি

পশ্চিমবঙ্গে আইনের গতি (১১)
চারুচন্দ্র চৌধুরী

আর্ট ও অভিজ্ঞতা (১৪
সত্যজিৎ রায়

এখন [illegible] প্রতি সপ্তাহেই শুক্রবার [illegible] প্রকাশিত হবে

মাধ্যমিক শিক্ষার ভবিষ্যৎ কোন্ পথে

ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বিশেষের রাজনীতি ও ব্যবসার ফলে একদিকে ছাত্রমেধ যজ্ঞ অন্যদিকে গভীর সঙ্কটের সৃষ্টি

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

সরকারের শিক্ষা ব্যয়ের, আর তার অনুপ্রভাজনেরা যতই চেষ্টা করুন না কেন, পশ্চিম বাঙ্গলায় মাধ্যমিক শিক্ষার সর্ব্বনেশে অবস্থাচাকে তাঁরা কোনকমেই ঢেকে রাখতে পারবেন না। এই বিরাট ছাত্রমেধ যজ্ঞের রক্তাক্ত ইতিহাস যেদিন যবনিকা নিয়ে এর জন্যে কৈফিয়ৎ দাবী করবে, সে দিন কে তার উত্তর দেবে? শিক্ষা মন্ত্রী রায় হরেন্দ্র নাথ চৌধুরী, তাঁর অনারারি এসিস্টেন্টরা ডাঃ ডি, এস, সেন, শিক্ষা নিয়ে যাঁরা রাজনীতি ও ব্যবসা খেঁদেছেন, সেই সব বিশিষ্ট ব্যক্তি বা গোষ্ঠীরা এবং সবশেষে এ,বি, টি,এ-এর সেলিল পাণ্ডারা থাকে কি?

মাধ্যমিক শিক্ষার বর্ত্তমান বিশৃঙ্খল অবস্থা হঠাৎ হয়নি। সরকারের হাতে এর ভার যাবার পর থেকেই এই দুরবস্থার সূত্রপাত হয়েছে, বলা যেতে পারে। অবশ্য শিক্ষক সমাজ এ একেবারে বেকসুর খালাস পেয়ে যাবেন, তা ঠিক নয়। তাঁদের দ্বারা গঠিত শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি নিয়েও ঐএকথা অস্বীকার করা যায় না যে, তাঁরাও তাদের পবিত্র দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য ঠিক মত পালন করেন নি। এছাড়া ম্যানেজিং কমিটির পলাদলি ও রাজনীতি এবং শেষ পর্য্যন্ত তা শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যেও সংক্রামিত হয়ে অনেক ভাঙ্গাগড়েই পড়াশোনার ক্ষতি করেছে এবং আজও করছে।

বহুসংখ্যক আনএইডেড স্কুল, আশোসানকারী শিক্ষক সমাজ, একাদশ বার্ষিক বিদ্যালয়ের জন্য পূর্ণাঙ্গ পাঠক্রম না থাকা, এবং উচ্চ শ্রেণীতে বিজ্ঞানের বিষয়গুলি পড়াবার জন্যে উপযুক্ত লোকের অভাব—এই সব বিলিতে মাধ্যমিক শিক্ষা আজ এক অনিশ্চয় এলোমেলো অবস্থার মধ্যে গিয়ে পড়েছে। তার উপর শিক্ষকদের নূতন বেতনের হার সম্প্রতি সরকারী নীতি ও ব্যবস্থিকা পর্ষৎ দিয়ে আটকাতেও আরও ভিজ করে তুলেছে।

পশ্চিম বাঙ্গলার মোট ১,৬৮৫টি মাধ্যমিক স্কুলের মধ্যে ৬০০টিই আনএইডেড। কলিকাতার মোট ২৫০টি স্কুলের মধ্যে ১২৪টি আনএইডেড। যাকী আনএইডেড স্কুলগুলি কলকাতার এবং তাদের একেবারে দেউনিয়া অবস্থা। কলিকাতার আনএইডেড স্কুলগুলির বর্ষ কয়েকটির আংকি অবস্থা বেশ স্বচ্ছল এবং তাদা সরকারী সাহায্য ছাড়াই চলতে পারে। এই সব স্কুলে শিক্ষকদেরও সরকারী হারের চাইতে উচ্চতর হারে বেতন দেওয়া হয়ে থাকে। এছাড়া, "বিনিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও গোষ্ঠী" দ্বারা পরিচালিত এবন বেশ কিছু সংখ্যক স্কুল আছে, যাদের শিক্ষকদের বেতন বাড়াতে হলে সরকারী সাহায্যের প্রয়োজন আছে। কিন্তু পরিচালকরা তাঁদের অবাধ কর্তৃত্ব হারাবার ভয়ে সরকারী সাহায্য চানেনা। অথচ, আশ্চর্য্যের বিষয় তাঁদের অনেকেই স্কুলগুলি জাতীকরনের স্বপক্ষে বড় গলায় সভা-সভায় কথা বলেন থাকেন কিন্তু তাঁদের অবিবাদীতে সরকার কিছু করতে গেলে তাঁরাই আবার ফেপে আগুন হয়ে যান। আর শিক্ষা ব্যবস্থার কথনও ভবে, কখনও ভালবাসার তাঁদের অবাধ কর্তৃত্ব ছাড়া কিছু দেখেনা। অবশ্য এ, বি, টি, এ-কেও ঐ সব ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বিশেষ কিছু বলতে শোনা যায় না।

এই সব ম্যানেজিং কমিটি দাবীদারী "ম্যানেজিং এজেন্সীদের" সরকার কিছু বেশ সহজেই শিক্ষকদের নূতন হারে বেতন দিতে বাধ্য করতে পারবেন। এই সহজ পন্থাটি হোল, শিক্ষকদের নূতন হারে বেতন না দিলে তাদের চিত্র। আবার অপর দিকের চিত্রে দেখা যাবে যে ভাল লোকের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত পরিচালিত অনেক ভাল স্কুল বন্ধ করেও সরকারী পাহায্য পাচ্ছেনা নানা কারণে, বা সরকারের অবাস্তব নিয়মাবলীর দরুণ তাদের আবেদন অগ্রাহ্য যোচ্ছে অথবা শিক্ষা দপ্তরের লাল ফিতায় তারা চাপা পড়ে আছে। এই যেখানে কলিকাতার স্কুলের অবস্থা সেখানে মফঃস্বলের স্কুলের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। মফঃস্বলের স্কুলগুলির অধিকাংশই আথিক বিষয় ও নানা কারণের সরকারী সাহায্য প্রাপ্য সর্ত্ত পুরণ করতে না পেরে ক্রমশঃ তলিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে সরকার স্কুলগুলির আর্থিক নিয়ন্ত্রণভার নিয়েছেন বলে শিক্ষা দপ্তরের তরফ থেকে যে সব সাহায্য দেওয়া হয়ে থাকে তার বধ্যে সত্তোর ভাগ অতি সামান্যই।

সরকার মাধ্যমিক শিক্ষার পূর্ণ দায়িত্ব নেবেন অর্থাৎ মাধ্যমিক শিক্ষক আন্তর্জাতিক হবে এবং শিক্ষা দপ্তর বা শিক্ষা মন্ত্রী যে সব ঘোষণা প্রতিশ্রুতি [illegible] আদায়ত উপরেই [illegible] আর আগে ঠাঁহর নয়। [illegible] দপ্তর কর্ত্তৃক পূর্ণদৃষ্টি [illegible] চালু করতে অক্ষীকার করেছেন।

নিম্নক্লাসের ফলতা পুরণ অর্থাৎ মাধ্যমিক শিক্ষার ভবন-পোষনের সম্পূর্ণ ভার সরকার নেবেন না—শুধু 'কিস বারার পোঁসাই' হবেই থাকবেন।

শিক্ষকদের জন্যে যে নূতন বেতনের হার সরকার ঘোষণা করেছেন, তা পাবার নিয়মাবলী নিয়ে শিক্ষক সমাজ বিক্ষুব্ধ হয়েছেন। শিক্ষা দপ্তর এই বেতনের ব্যাপারে যাই বলুন না কেন, বর্ত্তমানের শিক্ষকরা এই নূতন হারের বিশেষ সুবিধা পাবেন না। আর এই নূতন হার পাবার জন্যে অভিজ্ঞ শিক্ষকদের যা এখন বীরা শিক্ষকতা করছেন তাঁদের পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মারফৎ পরীক্ষা দিতে সরকার বাধ্য করছেন কেন? এই সুযোগ হারে বেতন দেবার জন্যে যে বাড়তি খরচা হবে, তার অর্দ্ধেক দেবেন কেন্দ্রীয় সরকার। তিনি সেই কেন্দ্রীয় সরকারও তো শিক্ষকদের ব্যাপারে এ ধরণ কোন সর্ত্ত দেননি। পশ্চিম বাঙ্গলার শিক্ষা দপ্তরের বাঁরা বাধা থেকে এই পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সর্ত্তটি বেরিয়েছে, নিশ্চয়ই তার তারিক করা যায়। আর যতদিন পশ্চিম বাঙ্গলা সরকারের আবশ্যাত্রিক কাঠামো বজায় থাকবে ততদিন (শিক্ষকরা বা ধনসাধারণ) তাই চীৎকার করুন না কেন) তাঁর আসন, বিশেষ করে বিধানবাবুর রাজত্বে কায়েম হয়ে থাকবেই।

একাদশ শ্রেণীর স্কুলের পাঠ্য পুস্তিকা তৈরী হয়নি। আর বিজ্ঞানের বিষয়গুলি পড়াবার জন্যে উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব একটা বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। একাদশ শ্রেণীর স্কুল চালু করার আগে শিক্ষা দপ্তরের এ সব বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়া উচিত ছিল। সাধা ভাবেই একাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয় চালু হচ্ছে। একথা ঠিক নয়। উচ্চ প্রাথমিক স্তরের একাদশ শ্রেণীর পরিকল্পনা চালু করতে অক্ষীকার করেছেন।

শিলংয়ের চিঠি

আসামে কংগ্রেসের দুর্দিনের লক্ষণ

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

শিলং ১৫ই জানুয়ারী—এখানে বসে এখন কিছু লিখতে গেলেই কংগ্রেস অধিবেশন সম্বন্ধে লিখতে হয়। আতি-থেয়তার ভার পড়েছে আসাম কংগ্রেসের উপর। তাঁরাও অনেক দিন থেকে তার জন্যে তৈরী হচ্ছিলেন। কারণ, সৌভাগ্যক্রমে বেশী হাঙ্গে যে তাঁদের পক্ষে বর্ষিত কংগ্রেস অধিবেশনের ভার নেওয়ার এর চেয়ে উপযুক্ত সময় আর কখনও হত না। মাত্র ছয় মাস আগে পর্য্যন্ত যে রকম গুরুতর রাজনৈতিক উত্তেজনার স্রোতে এই রাজ্যের উপর দিয়ে প্রবহমান ছিল তাতে সাধনোয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় কংগ্রেসের কোন অধিবেশন এই রাজ্যে করা সম্ভব ছিল না সে বিষয়ে অনেকেই গভীর সন্দিহান ছিলেন। বহুকাল যাবৎ আসাম অবহেলিতের মনোভাবেকে ভুগে আসছে জনৈক বৃটীশ সিভিলিয়ান ভারতের প্রদেশগুলির বধ্যে আসামকে সিংহাসনে বিশেষ বর্ণনা করেছিলেন। আমি ভ্রমণোপলক্ষে এই অবজ্ঞাপুষ্ট নাম্নাবরকাটীয়া ভেদের পোষনারার বগানো উপকথা থেকে পেয়েছিলাম। কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতাদের প্রতি বিরাগ তাঁর ধূঁয়ে যে অকংগ্রেসী দলগুলি উকক জলবিদ্যুৎ প্রোজেক্টের উদ্বোধনে পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ উপস্থিত থাকবে বলে ঘোষণা করে ব্যক্তিগত ভাবে এই সব নেতাদের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করতে পর্য্যন্ত দ্বিধা করেনি।

নাগা পাহাড়ের সম্বন্ধ বিক্ষোভ আসা যে সব পার্বত্য এলাকায় অধিবাসীদের আসাম ভেদি থেকে স্বতন্ত্র হওয়ার জন্য আন্দোলন ক'রে আসছে তাদের সঙ্গে চাল্লা এবং খোস কংগ্রেস দলের মধ্যেই মুখ্য মন্ত্রীর ঘনী বৈরীভাব মনোভাবকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে।

নাগা পাহাড়ের দ্বিখণ্ড মুখ্যমন্ত্রী ইউয়াসের অবতারণা করে আনি আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাতে চাইনে, কারণ তাতে করে আজ যে পুনর্গঠন আন্দোলনা আবার অভিপ্রেত তা থেকে আনি বিচ্যুত হব। অই দুই বেতন জেলাগরের অধীনে সেনা বাহিনীর কর্ত্তাকলাপের ফলে যেসোনকার পরিস্থিতি যে রকম রূপ পরিগ্রহ করেছে এবং তাতে করে যে অচল অবস্থার সৃষ্টি হ'তেছে, অবশ্যই তাদের তথ্যাদি বাহ্যবার সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। অবশেষে ১৯৫৭ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে কেন্দ্রীয় সরকার সেই চলম উপকত এলাকাটির ভাগুয়ন করায় এবং আসার হ'তে ঐ অঞ্চলটি বিচ্ছিন্ন হওয়ায় অনেকেই স্বস্তি লাভ করেছেন; কারণ এই সমস্যা রাজ্য সরকারের আয়ত্তাতীত হয়ে পড়েছিল। এই সমস্যার পরিণতির বধ্যে দিয়ে রাজ্য সরকারের যে সমস্ত আনাত্মিক অযোগ্যতা প্রকাশ পেয়েছিল, যাদগরী ভাবনার চাপে পূর্ণ সমাধানায় করে সরকারকে কম নাজেহাল করেননি।

আসাম, নাগাল কাটিয়ার তেল শোধন করার কারখানা আসামে স্থাপন করার সর্বসম্মত দাবীর প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের অবহেলাসম নীতিই যেমন এসে পৌছল তখন কংগ্রেস আসার উন্নতির তরার মুখোর সেল। বহু দিন ধরে কেন্দ্রীয় সরকারকে বাধ্য করার জন্য কংগ্রেস এবং অন্যান্য দলগুলি সরসর প্রতিবোশিতা করে আসছিল। একদিকে কংগ্রেস পরিষদ দল মন্ত্রিসভার পদত্যাগের হুমকি দিলেন, অন্যদিকে বাসপন্থী দলগুলি বহুতর কনভেনশানের অনুষ্ঠান এবং সত্যাগ্রহ করলেন। কেন্দ্রীয় সরকার বরাজনি এবং গৌহাটীর ওয়ুধের রিপোর্ট পরীক্ষা করে দেখবার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর পর্যন্ত এই সত্যাগ্রহ চালানো হয়েছে। বাবদগীরা এই বলে প্রচার চালানো, দেখে নিন, প্রাগ-জ্যোতিষপুর কংগ্রেস যেন হওয়া মাত্রই গৌহাটি থাকি প্রত্যাখ্যাত হবে। কিন্তু প্রাগজ্যোতিষপুর কংগ্রেসের প্রাক্কালেই যেন সিদ্ধান্ত এসে গেল যে আসাম সিলিচরে একটি রিফাইনারীর অধিকারী হবে। এই একক সিদ্ধান্তই কেন্দ্রীয় সরকার আসামের আশা-আকাঙ্খা এবং বাদি-প্রতিবাদের প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে এবং এই ধরণের প্রচারের বার ভোঁতা করে দিয়েছে।

নবনর্ধারণের নূতন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিমলা প্রসাদ চালিহা সাথেও বেতন প্রতিনিধিবর্গদের সাথেকে মন্ত্রীর বশদ শ্রবণ করিয়ে এবং তাঁর অনুগামী এবং অন্যান্য রাজ্য আন্দোলনের অগ্রণী পূর্ব ভারত উপজাতি সমবেশ বিধান সভার কংগ্রেসের সদস্যদী সমস্যাগুলো আলাভে স্বাধী করিবে চাল্লাসত্তার সাধনা এবং করেছেন। ফলতা শ্রবণের এক সপ্তাহের বধ্যেই শ্রীচালিলয়ের এই অনাধারন সাক্ষন্য তাঁর প্রভাব প্রভুত্ব বৃদ্ধি করেছে এবং কংগ্রেসের শক্তিও পুষ্টের বেড়েছে,—এ সংবাদে কেহ সন্দেহ করে; কিন্তু ব্যাবহা সাধারণভাবে উপজাতিকে প্রতিক্রিয়া বি ফল হবে তা এখনই বলা যায় না। তবে সবচ আয়োয়া যেন হয় তেমনি এখানেই অতঃ পার্বত্য রাজ্যের পুরোধাবর্গ ব্যক্তিতভাবে সুখোর-সুবিধার প্রতিপ্রুতি পাওয়াযায় আশোস করার জন্য বেন উদ্বীগ্র হ'য়ে থাকেন। নাগা পাহাড়ের উদ্বীনিরাকরন সাথে উপজাতি এলাকার বহী হয়েছেন, যাদি পাহাড়ের বি, এন, রায় শীঘ্রই উপসহী পদে বৃত হবেন এবং লুসাই পাহাড়ের লালবা-ভয়ারা পরিবর্ধীর সচিব রূপে ইতিবধ্যেই খ্যাতি লাভ করেছেন। অপর দিকে উপজাতি ইউনিবনের সভাপতি বে: বি, এল, সিই জেলা কাউন্সিল নির্বাচনে অব-লাভ করে তুরা কার্যকরী সদস্যের গদীনশীন হয়েছেন। মুর্দর পার্বত্য এলাকায় আসোজনের আওতায় রাওনা দিয়ে, উপজাতিদের দাবী-দাওয়া শুপুক্ষে প্রধানিক আনুকুল্যের পর বাক্তিগত স্বার্থের ঘাতিবে তাঁ প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতার ঘাবে এই সব নেতারা যদি তাদের অনুগামীদের ছাড়া অন্যিত হন, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু থাকবে না।

এই পত্রের সমাপ্তি টানার পর্বে বষ্টপতি কর্তৃক শ্রী রাও-এর রাজ্যের রাজ্যপাল নিযু ওয়ার কথাটি উল্লেখ না করে পারছি [illegible] অসাবিধানে বহুদিন হয়ে থাকবে। শ্রীযুক্ত রাও নিজেও বধ্যে নিজে রাজ্যপালের পদে প্রথম নিযুক্ত হয়ে এবং পুরোধার অসাবধানীর উদ্বি উত্তরোত্তর সাক্ষন্য জানা করবে।

আমাদের ছুটির দিন

(১৪ পৃষ্ঠার পর)

ব্যক্তিগত সংকর্ষে আবরা বহু আলোচনা করেছি। কংগ্রেসে এর প্রভাব কতদূর বিস্তৃত পাশ্চাত্যশিক্ষিতদের অধিবেশনই তার প্রমাণ। বিষয় নির্ব্বাচনী কমিটি এবং সাধারণ অধিবেশনের মোট ৩১ ঘণ্টা 'বক্তৃতার' বধ্যে শ্রীনেতার একাই ৯ ঘণ্টা সময় দখল করেছিলেন।

এবন ডাবে অধিবেশনের কার্য্য পরিচালিত হয়েছিল যে, এ, আই, সি, সি প্রতিনিধিদের যে প্রস্তাবগুলি তাদপর্য্য অনুধাবন করবার বা সম্যক সংকর্ষে অন্য সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করে তাঁদের মতামত বেবের বা বিবেচনের বস্তুতার সূত্র চলনা করবেন এরূপ সময় তাঁদের ছিল না। এই অবস্থায় ডাগাছিক নেতাদের সমালোচনা বা সমর্থন কোনটি ঠিই আশা করা বাতুলতা। নেতাদের পক্ষে আবেদনপূর্ণ বক্তৃতা এবং প্রতিনিধিদের পক্ষে হয় নীরবে শ্রবণ অথবা নিরাশক্তির বক্তব্য করা ছাড়া আর কোন কর্ত্তব্যীয় ছিল বলে বনে হয় না।

বিতর্কপূর্ণ ভাষায় প্রণে দক্ষিণ-ভারতীয় প্রতিনিধিদের কেই অগ্রণী ভূমিকা ভূমিকা নিতে দেখা গেছে। ডাঃ প্রণু তাঁদের দাবী সবন্ধে তাঁরা পূর্ব থেকেই প্রস্তুত হয়ে এসেছিলেন এবং নিজেদের বক্তব্য প্রতিগাদনের জন্য যে পর্যন্ত তাদের কেই বন্ধাই করতে দেখা গেছে। বিষয় নির্বাচনী কমিটি ভাষার প্রস্তাবটিকে নোখারের করে দেওয়ার পরেও অহিংসী ভারতীয়দের ভীতির কারণগুলি ঘোরালো ভাবে প্রকাশ করার জন্য তাঁরা যাবারের অনিবেশনের সুযোগ গ্রহণ করছেন। এবং হিংসাবাদীদের সবর্থন করে দিয়েছেন যে, তাঁদের অভ্যুদয়েই এই জনবর্ধমান হিংসী বিরোধিতার জন্য দায়ী।

পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিদের কার্য্-কলাপ বিশেষই সবন্ধন্য ছিল। এও নবন্ধন্য যে, তাঁদের পক্ষে ডাঃ বনিনাক্ষ সান্যালের ন্যায় লোক প্রধান মুখপাত্র হতে পে পেরেছিলেন। শ্রী কৃ ক ষ্ণ মু খা জী চট্টোপাধ্যায় এবন এক স্বকল্পিত মুক্তিদাতার ভাবে বসু ছিলেন যে তিনি অধিবেশনে প্রভুত্ব হাসির খোরাক জুগিয়েছেন। ডাগাছে প্রণু অন্য দুই জন নেতা—শ্রীবিমল সিংহ এবং শ্রী বিশ্বনাথ সিংহ সাহায্য, হিসিবেরে বসে হাত্তা আর কাজো বসে কোন বেখাপাত্ত করতে পারেনি। বসে কোন বেখাপাত্ত করতে পারেনি। বসে ডাগায় প্রণু ছোট কাশী মুখোপাধ্যায় এবং ডুমি সংস্কারের প্রণু শ্রীমতী মায়া মুখার্জি বক্তৃতা ডভু কতকটা সোনার বতো হয়েছিল।

পশ্চিমবঙ্গ প্রণধ কংগ্রেসের তিনটি স্তম্ভ ডাঃ রায়, শ্রীমতুল্য ঘোষ এবং শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র সেন এই অধিবেশন অনু-শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র সেন এই অধিবেশন অনুপস্থিত ছিলেন। বোকস সবয়ে তাঁরা পড়ে তিনজনই একযোগে অসুস্থ হ'য়ে পড়ে পড়লেন। মন্ত্রীদের বধ্যে শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীবনেন বসুই, শ্রী সান্যাল পর বর্ষণ, জনবান আদুল সত্তার এবং শ্রী অতুল মুখোপাধ্যায়কে অবু কংকেবরাও দেখা গিয়েছিল। অত্যকুমার অত্যন্ত হবে ডাগপাত্রে আত্মপ্রকাশ নিলেন। অন্য মন্ত্রী ডবাগডের নীরবতা অবলম্বনেই বুদ্ধিমানের পরিচয় দিয়ে কাজ করে ছিলেন এবং কেউই অপ্রোজনীয় অধিবেশনে উপস্থিত থাকেন নি।

প্রতিনিধিদের বধ্যে ডাঃ নলিনাক্ষ সান্যালকেই বোধ হয় সবচেয়ে উৎফুল্ল হতে প্রত্যাবর্ত্তন করেছেন। বিভিন্ন পুলক্ষ তাঁকেই সব চেয়ে বেশী বক্তৃতা করে দেখা গেছে এবং তাঁকে কোন কোন সবাবোচনা সভায় বিশেষভাবে ডোগা। কিন্তু অভিনব তাঁর প্রাদেশিকতার কথা, এ অধিবেশনে তার একটা সাক্ষাৎ পরিচয় পাওয়া গেল। অধিবেশনে প্রস্তাবের উপরে বক্তৃতা করার সবয়ে বারম্বারে গলা খুঁচে নিয়ে তিনি একেবারে ডেকে পড়লেন। তিনি অনুপলাত করেছিলেন কিনা, আমি ডাকো দেখতে পাইনি। শ্রীমতোকে সেলের পক্ষে দেখা সহজ ছিল। ডাঃ সান্যালের সমালোচনার উত্তর দিতে গিয়ে শ্রীসেন এক আশ্চার্য কথা বলেছিলেন কবেছিলেন": "দেশের সবস্যাসমূহ বিরাট সন্দেহ নাই। কিন্তু অধিবেশিত প্রস্তাবের কোন খুঁতই অনুপলাতের দ্বারা ধরা করা সম্ভব নয়।"

ডাঃ সান্যাল মুবোগ পাওয়া মাত্রই অবশ্য এর পালটা জবাবে শ্রীসেনের উপর এক হাত নওয়ার চেষ্টা করেছেন। পরের বক্তৃতায় ডাঃ সান্যাল প্রসঙ্গক্রমে বলে ফেলেছেন যে মুক্তা ব্যবসায়ীরা যে ভাবে প্রকাশ্য সবর্থন জানিয়েছে সেটা অনুচিত। মুক্তা ব্যবসায়ীদের কংগ্রেসের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। তাঁরা ডাকো দেবার জন্য ডাকা হয়েছিল। ডাঃ সান্যালের এই বন্তব্যের প্রতিবাদ করে শ্রীসেন বলেছেন যে মুক্তা ব্যবসায়ীরা কিনবার মত বিদেশী মুদ্রাই না পেলে কোথায়? আর, লাইফ ইন্সিং ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশনকে যা একদিন ডোকে দেখেনওনি দেখতে পেলেন কেন? একথা আনা সরকার এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি একথাও বললেন যে, তিনি কোন ব্যক্তি বিশেষের প্রতি কটা ক করছেন না। বলা বাহুল্য, কটাক্ষের মেইদুই যা অপেক্ষ ছিল এই শেষোক্ত বাক্যের পর কোনো নির্দেশের কাছেও অগ্রসর হওয়া আর গোপন থাকেনা।

মুক্তা ব্যবসায়ের সঙ্গে এককালে জড়িত শ্রীমতোকে সেন হয়তো এবিষয়ে কিছু আলোকপাত করতে পারতেন। কিন্তু তাঁকে দুর্ভাগ্যক্রমে অতঃপর আর বক্তৃতাদেরই দেখা যায়নি। বক্তাদের কোথাও তাঁকে পাবে আর খুঁজে পাই নি।

অধিবেশনের প্রারম্ভে যে অরুবিধা দেখা দিয়েছিল তা হচ্ছে প্রতিনিধিদের বধ্যে উৎসাহের একান্ত অভাব। এ,আই, সি, সি, সি, সদস্যরা সিবে প্রতিনিধিদের মোট সংখ্যা বলিগও সাড়ে পাঁচ হাজার তবু মাত্র এক হাজারের কিছু বেশী প্রতিনিধি অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলেন যে হাজারেরকেও প্রতিনিধি এবেছিলেন তাঁদের সবাই বিভিন্ন অধিবেশনে উপস্থিত থাকার উৎসাহটাও হারিয়ে ফেলেছিলেন বলে আশ্চর্য হতে হয়। তাদের জন্য বহতর আকর্ষণীয় বস্তু ছিল—বেবন করুণ প্রদর্শনী, টিড়িয়াখানা, চায়ের দোকান এবং সর্বোপরি অনভিপ্রেত আড়ম্বরাবান সার্কাস। প্রতিনিধিদের উপস্থিতি কোন সবয়েই লক্ষণীয় বস্তুর অন্তর্ভুক্ত ছিলনা এবং বিশ্বাস করুন আর না-ই করুন এর সবয় দেখা গেল সবয়েতে প্রতিনিধির সংখ্যা মাত্র দুই তা এই নিকৃষ্টতম ওজুহুত হয়েছিল যে, সাধারণ সভাপতির অধিবেশনে জনৈক সদস্য চেয়ারম্যান সাহেবে কিনা সে বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করেছিলেন, যার ফলে সবয় ও চিন্তাশক্তি হওয়ার পূর্বেই অধিবেশন স্থগিত ঘোষিত হয়েছিল।

কোন সবয়েই পোনর হাজারের বেশী সংখ্যক লোক উপস্থিত ছিল না, এক সবয়েই তো প্রতিনিধি ইস্যাপি নিয়ে সাকুলো মাত্র এক হাজার লোক উপস্থিত ছিলেন।

শাসনক্ষেত্রে মন্ত্রীদের কৃপাভাজন অফিসারদেরই এখন প্রতিপত্তি

অবসরপ্রাপ্ত অফিসারদের পুনর্নিয়োগের ফলে বিশৃঙ্খলা ও অযোগ্যতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি

(কলিকাতা দর্পণের নিজস্ব প্রতিনিধি)

পশ্চিমবঙ্গে অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারীদের পুনর্নিয়োগের সংখ্যা দেখলে একথা বিশ্বাস করতে হয় যে, গত ৬০ বছরের মধ্যে বাঙ্গালাদেশে বিদ্যান, বুদ্ধিমান কিংবা কর্মক্ষম কোনো লোক জন্মায়নি। অথচ দেশের নেতারা 'নূতন রক্ত' সঞ্চারের কথা অনবরত বলছেন। এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলিসহ প্রত্যেক সরাবর্তন উৎসবে পুরান মন্ত্রী থেকে আরম্ভ করে সব উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরাই যুবকদের শোনাচ্ছেন যে, রাষ্ট্র পরিচালনের দায়িত্ব দেওয়ার জন্য তাদের প্রস্তুত হতে হবে।

রাইটার্স বিল্ডিংসে একবার প্রবেশ করলে স্তম্ভাবতই মনে হবে যে, পশ্চিম বঙ্গে চকুষ্টীর ক্ষেত্রে এই উপদেশের মূল্য কতখানি? অবসর গ্রহণের পর পুনর্নিয়োগ অথবা ক্রমাগত চাকরীর এক্সটেনশান বাজায়সকারের দপ্তরে এটা আর এখন কোনো ব্যতিক্রম নয়; এটাই এখন নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সরকারী সেক্রেটেরিয়েট শাসনতন্ত্রিক কয়েকটি সংখ্যা দেখলে আরও অনেকগুলি অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীর পুনর্নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি খুঁজে পাওয়া যাবে। দুইটি ঘটনা তো রীতিমতই উল্লেখযোগ্য। অবসর গ্রহণান্তে একবার পুনর্নিয়োগের পর শ্রী এস, কে, গুপ্ত এখন পুনর্নিযুক্ত হয়েছেন সহায় ওঞ্জরের অরেণ্ট সেক্রেটারীরূপে। শ্রী পি আর কিংবা চাকরীর মেয়াদ শেষ হওয়ার পর এক্সটেনশান লাভ করেছিলেন। সেই এক্সটেনশানেরও শেষে এখন গভর্নরের সেক্রেটারিয়েটে তিনি পুনরায় স্পেশাল অফিসার রূপে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। শ্রীযুক্ত গুপ্তের ভাগ্যে যা জুটেছে, বাহুড়েরও এক্সটেনশান এবং তার পরেও আবার পুনর্নিয়োগ—অতটা বরাতের জোর অবশ্য সকলের থাকেনা। একজায় শ্রীযুক্ত গুপ্ত নিয়ে বোধহয় তাঁর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারেন, কেননা পেন্সনের কাছ থেকে তাঁকে বাঁচাবার জন্য, গভর্নমেন্টের সেক্রেটারিকে এতাবৎ যা ঘটেনি, তাও ঘটাতে হয়েছে—"স্পেশাল অফিসার" সম্রাজ একটি নূতন পদেরই সৃষ্টি করতে হয়েছে।

৫৫ বছরে অবসর গ্রহণের নীতি যে গ্রহণ করা হয়েছিল, এখন রাজ্য গভর্নমেন্টের তার দেখাদেখি হয়ত মনে হবে যে ঐরকম কোনো নীতি নিশ্চিই করাচারী বোধহয় ভুল হয়েছিল। অথচ ৫৫ বছরে অবসর গ্রহণের বয়ঃসীমা নির্দিষ্ট করার পিছনে যথেষ্ট জোরালো যুক্তি রয়েছে। নিম্নপদস্থ কর্মচারীদের উন্নতির উৎসাহ বজায় রাখা এবং সরকারী সেবাখাতে ব্যয় বাঁধন করা-দুই কারণেই এই নিয়ম প্রায় অলঙ্ঘনীয়। একথা সুবিদিত যে, অবসরপ্রাপ্ত অফিসারদের ব্যাপকভাবে এক্সটেনশান এবং পুনর্নিয়োগ দেওয়ার ফলে গভর্নমেন্টের প্রশাসনিক ব্যয় বছর-বছর বাজেটের মাত্রা ছাড়িয়ে যাবে যাবে ক'রে বাড়ছে। কিছুদিন আগে একটা হিসাব করে দেখা গিয়েছিল যে, ৯টেক চীফ ইঞ্জিনিয়ারকে এইভাবে স্পেশাল অফিসার হিসেবে (স্পেশাল অফিসার নানাকরণেও একটু রহস্য আছে যখন বাঁধারকা কোনো কাজ দেওয়া যায়না তখন অনেক ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অফিসারকেই স্পেশাল অফিসারক্ষে অভিহিত হন) পুনর্নিয়োগ করায় গভর্নমেন্টের বছরে প্রায় ২ লক্ষ টাকা বাড়তি খরচ হয়েছিল। আর, একথাও সুবিদিত যে, বার বার এবং পুনর্নিয়োগের ফলে অবশ্যম্ভাবে উন্নতি যখন বাধাপ্রাপ্ত হতে থাকে তখন নীচের দিকের লোকদের হতাশা ক্রমশঃ গভীরতর হয়। এবং এর ফলে শাসন বিভাগের যোগ্যতা যে নষ্ট হচ্ছে,সেবিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

বাত্র কিছুদিন আগের ঘটনা, এই রাইটার্স বিল্ডিংসে দেখা গেল যে, ডিপার্টমেণ্টাল সেক্রেটারী শ্রেণীর তিন-তিন জন অফিসার "ডেড্ উড" হয়ে গেছেন। প্যারা ডক্সিকেল মনে হতে পারে, কিন্তু ঘটনাটি অকাট্য সত্য। অথচ অবসরপ্রাপ্তদের পুনর্নিয়োগের সময় গভর্ণমেণ্টের বাঁধা যুক্তি হচ্ছেএকে, অভিজ্ঞ লোক নাকি পাওয়া যায় না।

প্রতি বৃহস্পতিবার পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রি সভার যে বৈঠক হয়, তার এজেণ্ডা বা কর্মসূচী যদি দেখেন আপনি হতবাক হবেন। সপ্তাহের পর সপ্তাহ এজেণ্ডার সব চেয়ে বড় তালিকা হচ্ছে অফিসারদের এক্সটেনশে অথবা পুনর্নিয়োগ।

অবশ্য একথা কেউ অস্বীকার করবেনা যে স্বাধীনতা এবং বঙ্গ বিভাগের অব্যবহিত পরে নিশ্চয়ই অভিজ্ঞ অফিসারের অভাব ঘটেছিল। কিন্তু দশ বছরের পরেও এই অভাব আছে কি এবং যদি থাকে, তবে সে বিষয়ে গুরুতর প্রশ্ন উত্থাপনের অবকাশ আছে। কি কারণে অভিজ্ঞ অফিসারের অভাব হয় তার কি কোনো কারণ অনুসন্ধান করা হয়েছে? একথা সন্দেহ করা কি অন্যায় হবে যে, অভিজ্ঞ অফিসারের ঘাটতি থাকলে যারা দায়ীবান হওয়ার কথা, তারাই এই ঘাটতি চিহ্নত করে থাকেন? যাঁরা পুনর্নিয়োগের অযোগ লাভ করেন, তাঁদের বৃহত্তম প্রায় সবঙ্ক অংশটাই হচ্ছে উর্দ্ধতন অফিসার। অবসর গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমতা এবং প্রভাব হারাতে হবে এবং তখন নিয়ে পেন্সনে দাঁড়াবে, এটা তাদের পক্ষে বড় আশ্বাতর কথা। কাজেই অবসর লাভের সেই "ডমকর দিন" তাঁরা যত পারেন পিছিয়ে দেবার চেষ্টা করেন। যদি তিনি চান তাহলে তাঁর পক্ষে নিজের পুনর্নিয়োগের রাস্তা তৈরী করে নেওয়া কিছুমাত্র অসম্ভব নয়। রাস্তা অনেক আছে, সহজতর এবং এখানে সেটা সবচেয়ে ব্যবহৃত তা হচ্ছে, ডিপার্টমেণ্টকে সবঙ্ক কর্মতা নিজের কুক্ষিগত করে রেখে দেওয়া। অবশ্য ভবিষ্যতে দেশের পরিকল্পনা কার্যকর হলে, তার শুরুতে পূর্ণ প্রস্তাবগুলির অভিসন্ধি গোপন ক'রে রাখা। মন্ত্রিসভা কিংবা উপরের তলা থেকে অফিসারদের এমন কোনো সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ দেওয়া হয়না যে, পরবর্তী উত্তরাধিকারীকে তৈরী ক'রে তোলা ওঁদের অবশ্যই কর্তব্য। কাজেই এইসব অফিসারেরা অতি নিরুপায়ভাবে নিজেকে "অপরিহার্য বস্তু" না "essential commodity" তে পরিণত করতে পারেন।

মন্ত্রীদের কাছেও এদের যারই অবারিত থাকে এবং নিজেকে অপরিহার্য অফিসাররূপে "প্রমাণ" করা তাঁর পক্ষে বড় সহজসাধ্য তাঁর নিযুক্ত অফিসারের পক্ষে তত্তটা নয়। সময় সময় কর্তাকে এঁরা ব্যক্তিগত সেবা ও সুবিধা দিয়ে কৃতার্থ ক'রে রাখেন। সাধারণতঃ অবসর গ্রহণের প্রস্তাব মন্ত্রীদের কাছেই যায় এবং শেষ সময়, এ ঘটনা প্রায়ই দেখা যায়, বছরে একটা-না-একটা করেও ছাঁটনো হঠাৎ পাকিয়ে ওঠে এবং তখন ৩ মাসের এক্সটেনশানটা অতি নগণ্য মনেই বিবেচিত হয়। বিশেষতঃ সেই অফিসারের ক্ষেত্রে, যিনি ইতিমধ্যেই মন্ত্রীর কাছে তাঁর অসামান্য যোগ্যতা যে নষ্ট হচ্ছে,সেবিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

বাত্র কিছুদিন আগের ঘটনা, এই রাইটার্স বিল্ডিংসে দেখা গেল যে, ডিপার্টমেণ্টাল সেক্রেটারী শ্রেণীর তিন-তিন জন অফিসার "ডেড্ উড" হয়ে গেছেন। প্যারা ডক্সিকেল মনে হতে পারে, কিন্তু ঘটনাটি অকাট্য সত্য। অথচ অবসরপ্রাপ্তদের পুনর্নিয়োগের সময় গভর্ণমেণ্টের বাঁধা যুক্তি হচ্ছেএকে, অভিজ্ঞ লোক নাকি পাওয়া যায় না।

প্রতি বৃহস্পতিবার পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রি সভার যে বৈঠক হয়, তার এজেণ্ডা বা কর্মসূচী যদি দেখেন আপনি হতবাক হবেন। সপ্তাহের পর সপ্তাহ এজেণ্ডার সব চেয়ে বড় তালিকা হচ্ছে অফিসারদের এক্সটেনশে অথবা পুনর্নিয়োগ।

অবশ্য একথা কেউ অস্বীকার করবেনা যে স্বাধীনতা এবং বঙ্গ বিভাগের অব্যবহিত পরে নিশ্চয়ই অভিজ্ঞ অফিসারের অভাব ঘটেছিল। কিন্তু দশ বছরের পরেও এই অভাব আছে কি এবং যদি থাকে, তবে সে বিষয়ে গুরুতর প্রশ্ন উত্থাপনের অবকাশ আছে। কি কারণে অভিজ্ঞ অফিসারের অভাব হয় তার কি কোনো কারণ অনুসন্ধান করা হয়েছে? একথা সন্দেহ করা কি অন্যায় হবে যে, অভিজ্ঞ অফিসারের ঘাটতি থাকলে যারা দায়ীবান হওয়ার কথা, তারাই এই ঘাটতি চিহ্নত করে থাকেন? যাঁরা পুনর্নিয়োগের অযোগ লাভ করেন, তাঁদের বৃহত্তম প্রায় সবঙ্ক অংশটাই হচ্ছে উর্দ্ধতন অফিসার। অবসর গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমতা এবং প্রভাব হারাতে হবে এবং তখন নিয়ে পেন্সনে দাঁড়াবে, এটা তাদের পক্ষে বড় আশ্বাতর কথা। কাজেই অবসর লাভের সেই "ডমকর দিন" তাঁরা যত পারেন পিছিয়ে দেবার চেষ্টা করেন। যদি তিনি চান তাহলে তাঁর পক্ষে নিজের পুনর্নিয়োগের রাস্তা তৈরী করে নেওয়া কিছুমাত্র অসম্ভব নয়। রাস্তা অনেক আছে, সহজতর এবং এখানে সেটা সবচেয়ে ব্যবহৃত তা হচ্ছে, ডিপার্টমেণ্টকে সবঙ্ক কর্মতা নিজের কুক্ষিগত করে

পূর্ব পাকিস্থানের আওয়ামী লীগ সরকারকে ঘায়েল করার ষড়যন্ত্র

মৌলানা ভাসানীকে হাত করার জন্য করাচী হইতে মুসলিম লীগ কর্তৃক বিশেষ দূত প্রেরিত

(ঢাকার দর্পণের নিজস্ব প্রতিনিধি)

ঢাকা, ২৩শে জানুয়ারী—

আওয়ামী লীগ পরিচালিত পূর্ব-পাকিস্থানের গভর্ণমেণ্টকে বানচাল করবার জন্যে মুসলীম লীগের যে পরিকল্পনা আছে তাতে সাহায্য করবার জন্য ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি নেতা মৌলানা ভাসানীর কাছে করাচী থেকে মুসলীম লীগ একজন দূত প্রেরণ করেছে। মুসলীম লীগের প্রস্তাব কি তা সঠিক জানা না গেলেও ঐদূতের সঙ্গে যে মৌলানার সাক্ষাৎ হয়েছে তা নিশ্চিত করেই বলা যেতে পারে। মুসলীম লীগ প্রেরিত ব্যক্তিটি তেমন সুপরিচিত নয় বলেই তার গতিবিধি তেমন সন্দেহের উদ্রেক করেনি। মৌলানা যখন সম্প্রতি ঢাকায় এসেছিলেন তা ব্যক্তিটি তখন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। মৌলানার অন্তরঙ্গ মহলের ধারণা এ প্রস্তাবের উপর মৌলানা কোনই গুরুত্ব দেন নি।

পূর্ব পাকিস্থানে প্রোদ্ভেসিভ বনো-ভারাণপূ ব্যক্তিরা এবং প্রবল ধারায় মুসলীম লীগের সঙ্গে মৌলানার বেলা-দেরা হয়তো তাঁরা অগ্রহণ করবেন এবং মৌলানার বাদেও রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ পূর্ব-পাকিস্থানে বরবাদ হতে পারে এই আশঙ্কার মৌলানা মুসলীম লীগের সঙ্গে কোন আঁতাতে আসবেন না বলেই সকলে ধারণা করছেন। সম্প্রতি শিয়াজ গজ ও রংপুর অনুষ্ঠিত উপনির্বাচন উপলক্ষে আওয়ামী লীগের সঙ্গে মৌলানার বনোবালিন্য যথেষ্ট বেড়েছে সন্দেহ নেই, তথাপি মৌলানা তার প্রতিনিধির নেতৃত্বের জন্য মুসলীম লীগের সঙ্গে যোগ দিয়ে রাজনৈতিক আয়হত্যা করবেন একথা কেউই বিশ্বাস করতে চাচ্ছেন না।

পাকিস্থানের রাজনীতি অনুধাবন করা যে কি অসম্ভব ব্যাপার তা সবিশেষ এই রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিবেই বোঝা যায়।

(দর্পণের করাচী সংবাদদাতা পাকিস্থানের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট সম্পর্কে যে সংবাদ পাঠিয়েছেন তাতে দেখা যায় যে বর্ত্তমানে উভয় গভর্ণমেণ্টেরই টিকে থাকার সম্ভাবনা উজ্জ্বল)। কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকারকে ঘায়েল করবার জন্য যে কানাঘুষা কিছু দিন ধরে চলছিল নীগ-ভাসানী বৈঠকের পর তাহা রাজনৈতিক মহলে এখন প্রকাশ হয়ে পড়েছে।

কুষক শ্রমিক পার্টির কয়েকজন নেতার শীঘ্রই করাচী যাওয়া সম্পর্কে মুসলীম লীগের সর্বধ্বক "বার্ণিং নিউজ"এ যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে তাতে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যে একটা ষড়যন্ত্র চলছে তা অস্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। করাচী যাত্রী নেতারা হচ্ছেন সৈয়দ আজিজুল হক, মিঃ নাসিক বিশ্বাস, মিঃ মেজবাউদ্দীন, মিঃ লুৎফর রহমান খাঁ এবং যোহন বিশ্বাস। আগামী মাসে পূর্ব পাকিস্থানের ব্যবস্থা পরিষদের বাজেট অধিবেশন আরম্ভ হবে এবং তখনই সরকারকে ঘায়েল করবার একটা চেষ্টা যে মুসলীম লীগ করবে তা একরূপ সুনিশ্চিত্ত। সৈয়দ আজিজুল হকের আগা এই যে অক্টোবরেই একটা কিছু ঘটবে। পাকিস্থানের জাপানী রাষ্ট্রদূতের সম্মানার্থে এক পার্টিতে আজিজুল হকের সঙ্গে সাংবাদিকদের কেন্দ্রীয় কোয়লিশন সরকার সম্পর্কে কিছু আলাপ আলোচনা হয়। বক্তব্যন সাংবাদিক যখন বক্তব্য করেন যে আগামী জুনাই মাসে যাহাতে কিছু পরিবর্তন ঘটতে পারে তখন মিঃ হক তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, "এত দেরীতে, এত দেরীতে। শীঘ্রই কিছু ঘটবে।"

মিঃ হুসেনশহীদের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য তাঁরা দিল্লী যাচ্ছেন এই মর্মে যে খবর বেরিয়েছে সেই সম্পর্কে মিঃ হকের সঙ্গে দেখা করলে তিনি এই সংবাদের সত্যতা স্বীকার করেন।

কম খরচে যন্ত্রের পূর্ণশক্তি কাজে লাগাইবার জন্য
বার্কমায়ারের তৈরী হেষ্টিংস মার্কা হেয়ার ও কটন বেল্টিং ব্যবহার করুন
হেষ্টিংস, রেডলেক্স, লেফ্‌লেক্স প্রভৃতি বার্কমায়ারের তৈরী রন বুনটের বেল্টিংগুলি ভারতের নানা শিল্প-কেন্দ্রগুলিকে ৭০ বৎসরেরও উপর সফল রাখিতে সাহায্য করিয়াছে।
বার্কমায়ার ব্রাদার্স লিমিটেড
প্রীকন হাউস,

ভারতের আলো

আশা ও নবীন জীবনধারার প্রতীক

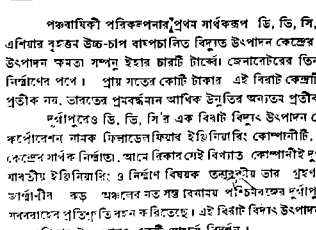

মহাকবি গ্যেটের শেষ উচ্চারিত অমর বাণী ছিল 'আলো, আরও আলো।' জীবন সায়াহ্নে যে অর্থেই তিনি আলো চাইয়া থাকুন, বর্তমানে ভারতবাসীর মনে কবির এই অমরবাণী যে অর্থ বহন করে তাহা বিদ্যুৎ। ভারতের অতীতের শিল্পীকবিগের সহিত ওতোপ্রোত ও প্রাণনিক-ভাবে যাহা জড়িত তাহা বৈদ্যুতিক সম্পাসরণ। কারণ দেশে কতটা বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হয় তারই উপর দেশের শিল্পোন্নতির পরিমাণ নির্ভর করে।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রথম সার্থকরূপ ডি, ভি, সি,র বোকারো বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র-এশিয়ার বৃহত্তম উচ্চ-চাপ বাষ্পচালিত বিদ্যুত উৎপাদন কেন্দ্রের অন্যতম। ঘাট হাজার কিলোওয়াট উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন ইহার চারটি টার্ব্বো। জেনারেটরের তিনটিই চালু হইয়াছে। অদুনা চতুর্থটিও নির্মাণের পথে। প্রায় সাতের কোটি টাকার এই বিরাট কেন্দ্রটি ভারতলক্ষ্মীর কাছে শুধ আশারই প্রতীক নয়, ভারতের প্রবর্দ্ধমান আর্থিক উন্নতির অন্যতম প্রতীক।

দুর্গাপুরেও ডি, ভি, সি,র এক বিরাট বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র নির্মাণের পথে। কুলজিয়ান কর্পোরেশন নামক ফিলাডেলফিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানীটি, যাঁরা বোকারো বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের সার্থক নির্ম্মাতা, আনে বিকার সেই বিখ্যাত কোম্পানীই দুর্গাপুর বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠান গাবতীয় ইঞ্জিনিয়ারিং ও নির্মাণ বিষয়ক তত্ত্বাবধায়ীর ভার গ্রহণ করেছেন। ভারত মার্কিণ কারিগরী ভার্ত্তাদীর বড় অঞ্চলের মত সস্ত বিষাময় পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুর ও সংশ্লিষ্ট সমগ্র অঞ্চলের বৈদ্যুতিক সরবরাহের প্রতিশ্রুতি প্রদান করিতেছে। এই বিরাট বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রটি ভারত মার্কিণ কারিগরী সহযোগিতার ইহা আরও একটি আশ্চর্য্য নিদর্শন।

দি কুলজিয়ান কর্পোরেশন
১২০০ নর্থ ব্রড ষ্ট্রীট, ফিলাডেলফিয়া, যুক্তরাষ্ট্র
কলিকাতা শাখা-৭, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ

মানুষ ও মনীষা

বুদ্ধদেব বসু

আমরা আজ এমন একটা জগতে বেঁচে আছি যেখানে ব্যক্তি আর নেই, আছে কেবল গিণ্ড; স্বকীয়তা নেই, আছে স্বীকৃতি; মানুষ আর নেই, আছে কেবল জনগণ। এবং এই অবস্থা থেকেই আজকের দিনের সব সমস্যার উদ্ভব হয়েছে।

একেবারে নেই তাও বলা যায় না। এমন কেউ কেউ এখনো জন্মাচ্ছেন, যাঁরা জনগণের একটি অণুমাত্র হ'য়ে (বা আইনসঙ্গত প্রতিনিধি হ'য়েও) তৃপ্ত থাকতে চান না, হ'তে চান—এবং হ'য়ে ওঠেন, একটি ব্যক্তি, একজন বিকশিত মানুষ একলা যে মানুষকে বিশ্বজগতের যাত্রা বলে ঘোষণা করা হয়েছিলো। এঁরা সেই মানুষ, যাঁরা জীবন ভ'রে নিজেকেই প্রকাশ করেন, এবং যাঁদের আমরা লেখক অথবা মনীষী নাম দিয়ে থাকি। ভাবনার প্রকৃতি কবির পক্ষে একরকম, জ্ঞানীর পক্ষে অন্য কিছু, সব বিশুদ্ধ ভাবনার একটি লক্ষণ এই যে তা নিরপেক্ষ। নিরপেক্ষ: অর্থাৎ, স্থান, কাল ও ঘটনাবলীর পুরোভাগ ও স্বার্থ থেকে তা মুক্ত হয়েছে।

বুদ্ধির চর্চা অনেকেই আজকাল ক'রে থাকেন, কিন্তু সেই চর্চা প্রায়ই নিরপেক্ষ হয় না। যেখানে তা হয় —না হ'তে গারে—এমন ক্ষেত্রে বিরল হ'য়ে, আসছে। বুদ্ধি বাঁধা পড়েছে পুরোভাগের কাছে, বৃহত্তর জনসংখ্যার বহুজন মুখাপেক্ষিনে পুরোজন। কেন্দ্রচ্যুত শিছনে স্পষ্ট কোনো উদ্দেশ্য নেই, যার দ্বারা শুধু মানুষের মনোল বেড়ে যায় কিন্তু জনগণের কোনো উপকার হয় না, এমন চর্চার অবসান ঘটাতে যাঁরা উৎসুক হবেন তাদের সংখ্যা দেশে-দেশে বিরবর্মান।

সব চেয়ে বড় প্রশ্ন আজ এই: এটা কোন কাজে লাগবে? এবং কাজে লাগার অর্থ হ'লো মানুষের বৈষ কীবনে কী ও কতটুকু দান করতে পারবো। সেটাই চরম পরীক্ষা: তার উপর আর— কোনো কথা মনে হওয়াটা বেআদবি। যে ছাত্র, যারবিদ্যা শিখতে আসে তাঁকে কিছুটা ইংরেজি পড়ানো দরকার কেন? এ-জন্যে নয়, যাতে কবিতার আভাতে মনের একটা বন্ধ জানলা খুলে যেতে পারে; এইজন্যে, যাতে, তার জীবিকার ক্ষেত্রে কাজ চালাবার ধাবা না হয়। ইংরেজি ভাষা ভারতবর্ষে রক্ষিত হওয়া ভালো, এ-কথা—কাকা কালেলকার ছাড়া-সকলেই কোনো-না-কোনো ভাবে স্বীকার করেন, কিন্তু এর সপক্ষে প্রায় সকলেরই যুক্তি হ'লো যে বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিদ্যার জন্য বা—আন্তর্জাতিক সংযোগের জন্য— ইংরেজি আমাদের প্রয়োজন। বিশ্বের সাহিত্য ও চিন্তাধারার বিরাট ভাণ্ডার ইংরেজি ভাষা, এবং সেইজন্যে তা রক্ষণীয়, এমন কথা কারুর মুখে শোনা গেলো তাঁদের সংখ্যা নগণ্য। কাকা কালেলকারের অন্তত এই গুণটি মানতে হয় যে তিনি মনের কথা স্পষ্ট ক'রে মুখে বলেছেন।

সংখ্যার ক্রমবৃদ্ধিপ্রাপ্তি এ যুগের একটি বড়ো ঘটনা। যে শব্দটিকে আমরা প্রায় অচেতনভাবেই মন্ত্রপূত বলে মেনেছি তা হ'লো 'গণতান্ত্রিক'। কিংবা, তাঁরা যাঁদের পছন্দ নয়, তাঁরা বলেন 'জনগণের সরকার', যা প্রায় ভগবানের ইচ্ছার মতোই দুর্জ্ঞেয়। আমরা ভুলে যাচ্ছি, ভোক্তান্দির অর্থ এক রাজার স্বেচ্ছাচার সরিয়ে অধিকাংশের স্বেচ্ছাচারকে প্রতিষ্ঠা করা নয়। ভুলে যাচ্ছি, ভারতের বৃহত্তম সুপ্রাংশে চিরদি আমা পুচলিত বলেই তার সর্বভারতীয় অধিকার যদি স্বীকার্য হয়,—তাহ'লে পরের দিন এ-কথা বলবারও বাধা থাকবে না যে ভারতের অধিকাংশ প্রজা যেহেতু, হিন্দু সেহেতু অন্যদেরও সেই ধর্ম গ্রহণ করা চাই। বিওকারা জনগণের ইচ্ছা যা অনিচ্ছা ব'লে কিছু নেই; ও-বালাই আছে শুধু আপনার, আমার ও অন্য একজনের, অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন মানুষের। কিন্তু এই ভিন্ন-ভিন্ন-মানুষেরা মানুষ হিসেবে আর কথা বলেন না আমরাও, যখন সুবিধে বুঝে, উদসর্গে অনুসারে, পার্টি'র খাতিরে কিংবা কোনো রাষ্ট্রিক সংকল্পকে এগিয়ে দেবার জন্য। তা যদি না হবে, তাহলে এ-মুহূর্তে ভারতের পার্টি নেতারা সকলেই চাচ্ছেন বিশি এ-দেশের রাষ্ট্র-ভাষা হোক, আর কি করেই বা পৌঁছাটি কংগ্রেসের ভাষা বিষয়ক প্রস্তাব—যাতে সাহস্র এক তিল পরিবর্তন করা হয়নি—এক্ষিণী ও বাঙালি প্রতিনিধির উপস্থিতি সত্ত্বেও সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হ'তে পারলো? প্রশ্নে যাঁরা প্রতিবাদ করেছিলেন তাঁদের বুকিকে খণ্ডন করার মতো একটি কথাও উচ্চারিত হ'লো না, অথচ কেন তাঁরা প্রতিবাদ প্রত্যাহার করলেন?

কেন, যাঁরা মনে মনে দ্বিশিকে মানতে পারেন না, তাঁরাও পুকাশ্যে বহু যুক্তি দিচ্ছেন তার সপক্ষে? একমাত্র সম্ভবপর উত্তর এই: পার্টি'র অথবা রাষ্ট্রিক স্বার্থের কাছে দেশের বহু বুদ্ধিমান মানুষ নিজ নিজ ব্যক্তিত্বকে বলি দিচ্ছেন। কোনো পার্টি'র দ্বিশিভাষী অঞ্চলে প্রতিপত্তি আছে, তা তাঁরা হারাতে চান না; কারো এখনো নেই, তাই প্রতিষ্ঠিত চান; আর কেউ বা পার্টি'র গৃহীত সংকল্পের বিরুদ্ধে বলতে ভরসা পান না—পাছে শাস্তি পেতে হয়। আর এঁদেরই হাতে আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ তুলে দিয়েছি।

'মানুষের জন্যই রাষ্ট্র'—গণতন্ত্রের এই নীতি উল্টে দিয়ে আজ দাঁড়াচ্ছে, 'রাষ্ট্রের জন্যই মানুষ'। স্বাধিকার ছেড়ে দিয়ে ভোটাধিকার কুড়িয়ে নিচ্ছি আমরা, যেদিকে যখন যাওয়া হইছে সেদিকে চলাকেই স্বাধীনতা ব'লে ভুল করছি। রাষ্ট্র আমাদের সংসারযাত্রার রক্ষণাবেক্ষণ করুক, এই মৌলিক নীতি থেকে ক্রমে— ক্রমে বহু দূরে সরে এসেছে পৃথিবীর মানুষ; রাষ্ট্রের হাতে তাঁকে দিচ্ছে—শুধু অনুবস্ত্রের ব্যবস্থা নয়, তাদের সমস্ত অস্তিত্ব, এমনকি তাদের আত্মা! কি আমরা ভালোবাসবো তা রাষ্ট্র ব'লে দেবে, কেমন ক'রে অবসর কাটাবো তা রাষ্ট্র জুগিয়ে দেবে, আমাদের সন্তানেরা কী ধরণের শিক্ষা পাবে তার ভার নিতে হবে রাষ্ট্রকে, নিরপরাধ বিজ্ঞানের চর্চার জন্যেও রাষ্ট্রের একটি ধরপ্রবাহি থাকা চাই। কোনো—কোনো ক্ষেত্রে, রাষ্ট্রের মহত্তর স্বার্থের জন্য, সন্তানের পক্ষে, পিতাকে বা স্ত্রীর পক্ষে স্বামীকে ধ্বংস করা শুধু সম্ভব নয়, সংকর্ম। এই পুকার ও পুচণ্ড রাষ্ট্রের কাছে মানুষ ক্রমশ: এমন ক্ষুদ্র ও নগণ্য হ'য়ে যাচ্ছে, যেমন ক্ষুদ্র ও নগণ্য কোনো ধর্মীপ্রিত ভগবানের দুষ্টান্তে সে কখনোই ছিলো না।

রাষ্ট্রের এই শক্তির পাশবিক ভিত্তি তার কাযান-বন্দুক—তার বিরুদ্ধে কোনো জনগণ আর দাঁড়াতে পারে না—আর নৈতিক ভিত্তি সংখ্যা, ব্যেজরিটি। পাশবিক দিকটা সাধারণত থাকে চোখের আড়ালে, সংখ্যাধিক্যের বিজ্ঞাপনের কাজ করে। এর কাছেই আমরা নিবেদিত যে-কোনো সময়ে যে-কোনো বিষয়ে অধিকাংশে যাতে 'হাঁ' বলবেন সেটাই ঠিক কথা। যদি ৫১ জনের একরকম মত হয়, ৪৯ জনের অন্য মত, তাহলে ৫১ জনের মতটিকে সিদ্ধান্ত ব'লে ধরে নিতে হবে। যদি কাজ লোকসভায় অধিকাংশ সভ্য বলে করেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কাজ হবে যন্ত্রবিদ্যার পরিবেশন তাহ'লে পরের দিন থেকেই আমরা বিদ্যাদুষ্টতে দেখতে শিখবো মানবিক বিদ্যা কত অর্থহীন। যদি কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসমিতির অধিকাংশ সভ্যের মত হয় যে পাঠ্যসূচিতে কবিতার স্থান অনুচিত, তাহ'লেই আমাদের উঠে—প'ড়ে লাগতে হবে বিদ্যালয় থেকে কবিতাকে তাড়াবার জন্য। এই রকম যুক্তির উপরেই সভ্যতার ভবিষ্যৎ আজ বেপথুমান।

কিন্তু সত্য জিনিষটা পরম, তা লক্ষ লোক বললেও যত সত্য, একা একজন বললেও ঠিক তেমনি। কলম্বাস যখন সমুদ্রযাত্রার সংকল্প করেছিলেন তখন সারা জগতে পু-চারজন ছাড়া কেউ বিশ্বাস করতেন না যে আমাদের পৃথিবীটা গোলাকার। রাজসভার ঘাদে—যারে ঘুরে একজন রাজা বা রাণীর আনুকূল্য পাওয়া সম্ভব হয়েছিলো কবাগদের পক্ষে, কিন্তু যদি তাঁর আপাত—অসম্ভব প্রস্তাবকে কোনো পুণ্যনি কবিদের কাছে পাপ করিয়ে নিতে হতো তাহ'লে আর আবেরিকা আবিষ্কার হতো না। ভোটের দ্বারা সত্যের যাচাই হ'তে পারে না, এই কথাটাকে তত্ত্ব হিসেবে আমরা এখনো মানতে পারি, কিন্তু কাজের বেলায় তা পুরোপু করার শক্তি আমরা অনেকেই হারিয়েছি। সে—শক্তি যাঁরা রাখেন তাঁদেরই বলা যেতে পারে সত্যিকার অর্থে বিশুদ্ধ অর্থে, মনীষী। আমরা যারা অবিকাংশ—আমরা জীবনযাত্রার পথে, পথে আপোশ করে চলি, আর সেইজন্যই এত রিক্ত এর বিজ্ঞান আমাদের জীবন। অতিসর স্বল্পসংখ্যক যাঁরা আছেন, যাঁরা কখনোই আপোশ করেন না, কোনো না— কোনো দিক থেকে সত্যোরনধানে যাঁরা একাগ্র, যাঁদের সাধনার দিয়েনে সেই সাধনা ভিন্ন অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই, তাঁদের প্রতি কী মনোভাব আমাদের পক্ষে যথোচিত, তা পর্যন্ত আমরা জানি না আজকাল। বিজ্ঞান বলতে আমরা— বুঝি ফ্রেকনদি, দর্শন বলতে বুঝি সমাজ বিজ্ঞান, আর্ট বলতে বুঝি আমোদ, গানকে ভালো বদি তা পরিসুর লাবণ্য করে ব'লে, উপন্যাস পড়তে চাই সবচ কাচাবার জন্য, আর আধুনিক কবিতা পরতে চাই না বেহেতু তা খুবকুঝির মতো আওতাত নেয় না। এই রকম অবস্থায় দেখাও যে জ্ঞানী ও গ্যানী মানুষ এ'কবারে নির্বাণ হ'য়ে যায়নি এতে অবশ্য একটু বোঝা যায় যে মানুষের বিচলপুবৃত্তা অন্তুসত্ত্ব হলেও তার মুক্তির আশাটি আছে।

সাফল্যের পথে শেষ কদম

বিশ লাখ টন ইস্পাত উৎপাদনের যে বিরাট পরিকল্পনা টাটা স্টীল গ্রহণ করেছে—আজ তার কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে পৌঁছালো ব'লে। এই পরিকল্পনা ১৯৬৮ সালের মার্চমাসের মধ্যে সম্পূর্ণ করতে হবে, তাই সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে প্রচণ্ড কাজ এগিয়ে চলেছে।

সারা আমদেশপুর জুড়ে আজ জোর কদমে এগিয়ে যাবার এক নতুন উদ্যম—সম্ভাসারণ পরিকল্পনাকে সময়-মতো সম্পূর্ণ করার জন্য রাতদিন কাজের আর বিরামহীনেই।

বিশ লাখ টন ইস্পাত উৎপাদনের এই পরিকল্পনা খনিজ লোহা আর কয়লা সংগ্রহ থেকে শুরু ক'রে ইস্পাত তৈরী করা পর্যন্ত কাজের প্রত্যেকটি স্তরেই পরিব্যাপ্ত। এই পরিকল্পনার কাজ সম্পূর্ণ হলে টাটা স্টীলের বাৎসরিক উৎপাদন দ্বিগুণ হয়ে বিশ লাখ টন অর্থাৎ ইস্পাত উৎপাদনের মোট জাতীয় লক্ষ্যের এক-তৃতীয়াংশ দাঁড়াবে।

এই নতুন ব্লাষ্ট ফার্নেসের নির্মাণকার্য প্রায় শেষ হয়ে আসছে—এতে রোজ ১২০০ টন লোহা তৈরী হবে।

দি টাটা আয়রন এণ্ড ষ্টীল কোম্পানী লিমিটেড

মানুষের অধিকার

ভারতবাসী যদি ভারতবর্ষের সকল প্রকার হিতকর দান কোনো একটি প্রবল শক্তিশালী যন্ত্রের হাত দিয়েই চির দিনই গ্রহণ করতে অভ্যস্ত হয়, তাহলে তার সুবিধা সুযোগ যতই থাক তার চেয়ে দুর্গতি আমাদের আর হতেই পারে না। সরকার বাহাদুর নামক একটা অস্বাভাবিক প্রভাব ছাড়া আর কোনো উপায় আমাদের হাতে নেই, এই কথা ধারণা মনে বদ্ধমূল হতে দেওয়াতেই আমরা নিজের দেশকে নিজে সর্বাঙ্গভাবে হারাই।

আমাদের নিজের দেশ যে আমাদের নিজের হয়নি তার প্রধান কারণ এ নয় যে, এদেশে বিদেশীর শাসনাধীনে। আসল কথাটা এই যে, যে দেশে সৈবক্রমে জন্মেছি মাত্র সে দেশকে সেবার দ্বারা, ত্যাগের দ্বারা তপস্যার দ্বারা জানার দ্বারা বোঝার দ্বারা সম্পূর্ণ আত্মীয় করে তুলিনি; একে অধিকার করতে পারিনি। নিজের বুদ্ধি দিয়ে, প্রাণ দিয়ে, প্রেম দিয়ে যাকে গড়ে তুলি তাকেই আমরা অধিকার করি। মানুষ আপন দেশকে আপনি সৃষ্টি করে। সেই সৃষ্টির কাজে ও রক্ষণের কাজে দেশের লোকের পরস্পরের মধ্যে সহজ যন্থিষ্ট হয়, আর সেই সৃষ্টি করা দেশকে তারা প্রাণের চেয়ে ভালোবাসতে পারে। আমাদের দেশের মানব দেশে জন্মাচ্ছে মাত্র, দেশকে সৃষ্টি করে তলছে না; এইজন্যে তাদের পরস্পরের বিলনের কোনো গভীর উপলব্ধা নেই, দেশের অনিষ্টে তাদের প্রত্যেকের অনিষ্ট বোধ জাগে না। দেশকে সৃষ্টি করার দ্বারাই দেশকে লাভ করবার সাধনা আমাদের ধরিয়ে দিতে হবে।

বিশ্বে বিধাতার যে অধিকার আছে সেই হচ্ছে তাঁর স্বরাজ, অর্থাৎ বিশ্বকে সৃষ্টি করার অধিকার। আমাদেরও স্বরাজ হচ্ছে সেই ঐশ্বর্য, অর্থাৎ আপন দেশকে আপনি সৃষ্টি করে তোলবার অধিকার।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ষ্টেডিয়াম তৈয়ারীর পশ্চাতে খেলার মাঠের ঘোরালো স্বার্থ

শেষ ভূমিকায় এখন গভর্নমেণ্টের খেলা

[আলোকসুন্দর]

কলকাতায় এখনও কেন ষ্টেডিয়াম তৈরী হচ্ছে না—এই প্রশ্নটি তলিয়ে দেখার প্রয়োজন আছে। এখনি শুধু জমি, টাকা কিংবা সংগঠনের অভাবের জন্য হাত গুটিয়ে ভাবনার কথা ছিল না। কেননা ষ্টেডিয়ামের পিছনে যে বিরাট দাবী এবং যে অসংখ্য মানুষের আকাংখা রয়েছে তাদের কাছে এই বৈধদিক বাধা গুলির সমাধান সাধ্যায় বিলম্বিত হতে পারে, কিন্তু অসম্ভব হতে পারে না।

তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে, আসল বাধা অন্যত্র। কিছুলোকের কোকের কায়েমী স্বার্থ, দীর্ঘকালের মাতব্বরী এবং কিছু আর্থিকের অবিবাহিতোদের লালনা ষ্টেডিয়াম নির্মাণের প্রধান বাধা হয়ে রয়েছে। খেলার মাঠে এবং বুয়র স্কুলে দুর্নীতি ও পলিটিক্স, কর্পোরেশন কিংবা রাইটার্স বিল্ডিংসের চেয়ে কম ঘোরালো নয়।

সর্বশেষ এই রাজনীতির মধ্যে পশ্চিম বঙ্গ গভর্ণমেণ্ট স্বয়ং প্রবেশ করেছেন। এতদিন পর্যন্ত খেলার মাঠের স্বার্থের স্বার্থভেদিরবে allignment দিয়ে গভর্ণমেণ্ট পুরবে করার পর বিশেষতঃ একজন বড়ী পৃষ্ঠপোষকের ক্রীড়াবোধী মতভার ফলে—স্বার্থের প্যাচাপেচি। কিন্তু ফিটাটি যোর হয়, মুর্তাগ্যক্রমে আরও ঘটিল এবং ষ্টেডিয়ামের সম্ভাবনা আরও দুরবর্তী হয়েছে।

কলকাতার ফুটবল মাঠে শুধু মুর্তাগ্য সাধারণ মানুষের ভীড়ই জমে না, টাকার পাহাড়ও সঞ্চিত হয়। টাকা আমি বিধি, আপনি বেন, অসংলগ্ন তর্কাবর্ষিত অসাধারণেরা যেন না। মাঠের পুরোধায় এবং ঔপবর্ণ্যপালীয়ের সাবনে থাকে। চ্যারিটি ম্যাচ উপলক্ষেও তাঁদের পকেটে হাত পড়ে না। টিকিট কিনে খেলা দেখে সাধারণ মানুষ চ্যারিটি করে আর অসাধারণ ও বিশেষ সুবিধেভোগীর নয় নিয়মণ লিপির জোরে মাঠে ঢুকে আরাম কেদারায় গোড়া বর্ষন করেন। অথচ আপনার আমার দুর্ভোগের অন্ত নেই। সাধারণের দেওয়া এই টাকার ঘোটা অংশ ফেনে মার বুনাকাশার টিকেটের পুষ্টিতারের পকেটে, কিছুটা ব্যবসাদার ক্রীড়াসংস্থার তহবিলে আর বাকীটা সরকারী তোষাখানায়। বাধার যার পারে কেলে বাক্স বেহনত করেন, বাঁদের ক্রীড়াশৈলী আকর্ষণ করে ঘাঙ্গারো মানুষকে এই টাকা পর্ণ করার অধিকার তাঁদের নেই। এক একটি ম্যাচকে সাধারণ দর্শকেরা যে পরিমাণ টাকা ঢালে অপরের মুনাকার অঙ্কটে কাঁপিয়ে তুলতে তার অর্ধে বিশেষত দিন সতর করে রাখার ব্যবস্থা হোতো তাহলে সেই টাকার কলকাতা শহরে একটা পাকা পূর্ণাঙ্গ ষ্টেডিয়াম গড়া হয়ে যেত কবে।

কলকাতার ষ্টেডিয়াম নির্মাণের দাবী উঠেছিল প্রথম আজ থেকে প্রায় বিশ বছর আগে, বিতীয় বহুমুত্ত কেঁধে ওঠবার পূর্বে। এই বিশ বছরে শহরের জনসংখ্যার মতো মাঠের দর্শক সংখ্যা সমস্ত হিসেবকে হাসিয়ে দিয়েছে, ষ্টেডিয়ামের প্রয়োজনীয়তাও বড় হয়ে উঠেছে। আজও কই আরও দুর্ধ সয়ে, আরও পয়সা ছড়িয়ে জনসাধারণ সেই দাবীকে ঘোরবার করছে, সভা সমিতি, পত্র পত্রিকা গঠনমূলক সমর্থনে মুখরও হয়েছে কিন্তু ভাতেও অবস্থার পরিবর্তন ঘটেনি।

কলকাতায় ফুটবল ষ্টেডিয়াম নির্মাণ প্রসঙ্গে রাজ্য সরকারের তুমিকা শূন্যগর্ভ আশ্বাস আর আছিলায় ভরে উঠেছে। পূর্ব কথা থাক, গত দুবছরের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি রাখলে এই তুমিকা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। গত দুবছরের মধ্যে কলকাতার ষ্টেডিয়াম নির্মাণ কল্পে পশ্চিম বাংলার আইন সভায় সর্বসম্মত প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে কিন্তু সে প্রস্তাব কার্য করী করা হয়নি। খেলাধুলা নিয়ন্ত্রণ ও অনিয়ন্ত্রে একটি ষ্টেডিয়াম নির্মাণের সংকল্পে ১৯৫৪ সালে আইন সভার একটি বিল সিপিবদ্ধ করা হয়েছে কিন্তু সেই আইন আজও চালু করা হয়নি। ইতিমধ্যে ষ্টেডিয়াম নির্মাণের বিলম্বের হেতু বর্ণনায় সরকার বলে আসছিলেন যে, বিদেশিরী কর্তৃপক্ষ মরদান অঞ্চলে পাকা ষ্টেডিয়াম গড়তে দিতে সম্মত নন। বর্ষা বাদ দে বাধা দূর হয়েছে, বিদেশিরী কর্তৃপক্ষ সম্মতি দিয়েছেন। কিন্তু নতুন সমস্যা সৃষ্টি করতে চাইছেন রাজ্য সরকার নিজে। সরকার বলছেন যে মরদানের অঞ্চল বিশেষে ষ্টেডিয়াম গড়া হলে সেই অঞ্চল যে দুটি ক্লাবের খেলার মাঠ হয়ে আছে তারা যাবে কোথায়? অর্থাৎ আরও টানাহানা এবং আরো অভুতাও দেখাতে কোনো ফেলেই সরকার পেছ পা নন। নিজের উদ্যোগ সিদ্ধ করতে রাজারাটি ক্রয় বয়সী বনে যেতেও তাঁদের আপত্তি নেই। অথচ কথিন আগে মরদানের এককুমে থেকে আর একটি কুমকে উৎখাত করতে এই সরকারই বিশ্বমায় কুণ্ঠাবোধ করেননি। ওইবে বাঁদের কথনো কোনো কালেই হুলের অভাব ঘটেনা, তাঁরাই আজ নতুন ডেক্ বয়ে বাংলা দেশের ওপর মরুভূতের মানিক সেজে বসেছেন। সুতরাং অভিযন্ত রীতিনীতির চাপ বাংলো দেশ যেন নাতো কে সইবে?

এই কাঁকে ইতিমান পুলিজ ক্রিকেট মাঠ ইডেন উদ্যানে একটি 'সর্বাধুনিক ষ্টেডিয়াম' নির্মাণের প্রস্তাব এসেছে সরকারের পক্ষ থেকে। বলা বাহুল্য যে, বিকল্প প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে আরও কিছু কালহরণের বরভন আসবে। 'সর্বাধুনিক ষ্টেডিয়াম' এক গরবতয়া পদ্য। ইডেন উদ্যানে 'সর্বাধুনিক ষ্টেডিয়াম' নির্মিত হলে ক্রিকেট মাঠ হিসাবে ইডেন উদ্যান তার বৈশিষ্ট হারাবে আর বাংলা দেশের ক্রিকেট কেন্দ্রার সর্বনাশও ঘটে যাবে। এসপর্কে ক্রিকেট খেলোয়াড় তথা ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের মতকরা নিরানব্বই জন একমত। তবুও ক্রিকেট অনুরাগীদের মতের বিরুদ্ধে সরকারী অভিমতকে জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার প্রয়াস ঘটছে। দরকার আমাদের ফুটবল ষ্টেডিয়াম। আর সরকার চাইছেন এক ঢিলে দুইপাখী মেরে 'সর্বাধুনিক ষ্টেডিয়াম' নামে একটি দিল্লীকা লাড্ডু পরবয়ণীকে উপহার দিতে।

এদিকে ইডেন উদ্যানের মালিকানা সত্ব নিয়ে জল ঘলাগই ঘোলা হয়ে উঠেছে, এই জল পরিষ্কার হতেও অনেক সময় কেটে যাবে, সরকারের টানাহানার রাজ্য অন্ততঃ কিছুদিনের জন্যে শান্তও হয়ে থাকবে এবং অন্তবর্তীকালে দর্শক সাধারণকেও ঘথারীতি ঘুভোগ সইতে হবে। কিন্তু ওদব সমস্যা খাঁটি নয়, আসলে এগুলো কৃত্রিম সৃষ্টি। বিলিটারী কর্তৃপক্ষের সম্মতি অনুযায়ী বরষাসে ফুটবল এবং ক্রিকেট ছাড়া অন্যান্য কলকাটি খেলার উপযোগী একটি ষ্টেডিয়াম গড়ে তোলা গেলে সমস্ত সমস্যারই সমাধান হয়ে যায়, তাতে কারুরই ক্ষতি সাধিত হয় না, অথচ মাগমুবাদের সৃষ্ট হয়না এবং অধির বাদিকাদার প্রভু তুলে ষ্টেডিয়াম নির্মাণ কাজকে পিছিয়ে দেবার সুযোগও পায় না কোনো পক্ষ।

ফুটবল মাঠকে কাঠের পাটাতনে ঘিরে প্যাভালি সাজিয়ে দর্শনী বাবদ ঘোটা টাকা উপার্জনের অধিকার পায় একটি মাত্র ক্রিকেলার প্রতিষ্ঠান। মাঠ পুলিশের হাতে, প্যাভালি আর পাটাতনে সাজিয়ে মাঠে ফলাও কারবার কাঁপার অধিকার পুলিশই এই প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে থাকে ভিভাবে, কোন্ চুক্তি অনুযায়ী পুলিশের সঙ্গে এই প্রতিষ্ঠানের বন্দোবস্ত হয় তা সকলের জানায় উপায় নেই।

ক্রিকেলার প্রতিষ্ঠানের মুনাকার ফুটবল নিয়ন্ত্রণ সংস্থারও কিছু ভার রয়েছে। তাহাড়া বড় বড় খেলা অর্থাৎ চ্যারিটি ফুটবল ম্যাচ উপলক্ষ্যে মাঝার মাঝার টাকার টিকিট নিয়ে খেলা করার এক চেটিয়া অধিকারও আছে এই ক্রীড়া সংস্থাটিরই। এই সংস্থার কর্তাব্যক্তিদের কেউ কেউ বেশ করিৎকর্মা পুরুষ। তাঁরা সমস্ত সময় বাংলাদেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের ভেট এতেরা দিয়ে আসেন, নির্বাচনের সময় পারে পারে কর্মীর ভোল এঁটে নেতাদের মনোরঞ্জন করেন। সরকারী উদ্যোগে ষ্টেডিয়াম গড়ে উঠলে এঁরা টিকিট নিয়ে খেলা করার সুযোগ হারাবেন।

ক্রিকেলার প্রতিষ্ঠান এবং ফুটবল নিয়ন্ত্রণ সংস্থার কর্ণধারদের কতিত আপত্তা কম নয় সত্যি কিন্তু তাদের প্রতি দরদ দেখাতে গিয়ে কলাপাবলী রাষ্ট্র আজ অগণিত জনসাধারণকে কেন ক্ষতিগ্রস্থ করে তুলেছেন? জনকার্য কি মুষ্টিমেয়ের স্বার্থের চেয়ে বড় নয়? জনবার্থ হলেও, অবশ্যেষা করা রাষ্ট্রের পক্ষে কতোদূর সমতওপোড়ন? ঘাতীকরণের যুগে বুহত্তর স্বার্থ ছিন্নায় বুহৎ বুহৎ বেলকরাটী প্রতিষ্ঠানগুলিকে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রনাধীনে রাখার নীতি স্বীকৃত হয়েছে, তবুও খেলাধুলা প্রতিনিয়ন্ত্রিত করে ষ্টেডিয়াম গড়তে জনসেবক সরকারের এই কুণ্ঠা কেন? তাহাড়া ষ্টেডিয়াম বাবাবে সরকারী আয়ের একটি পথ প্রশস্ত হতে পারে, সে পথ্য সরকার বর্জন করে চলছেন কেন?

সবসময় খাওয়ার পর এক গ্লাস জলের সঙ্গে 'প্যালুড্রিন' খাবেন।

ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল ম্যানুফ্যাকচারার (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড

P.C.M.

হিঃ টিঃ ছট

কবি গোঁড়ানন্দ

এই আহমা বস্তুটা যিনি অবিস্কার করেছিলেন তাঁর সঙ্গে আমার অন্ত শত্রুতা। কারণ কি জানেন?

কারণ, আমার মুলমটি যেমন আহমাতে অবিকল ডেমনটি দেখায়। তাইলেই বুঝে দেখুন কেমনধারী কতদুর পর্যন্ত গড়ায়।

আর আমনাটাও, আপনার নিজে ডাবতের সংবিধান তো নয়। তাই ওটাকে মেহারিচির ঘোরে খুসিমত যে খুসলে নেব, সে উপায়ও নেই। কাজেই আমার অবিকল রূপটি তার মধ্যে কোন ক্যাল ক্যাল করে চেয়ে দেখতে বাধ্য হই।

আমি এই সুবহান গৌড় দেশের জাতীয় কবি। প্রবল প্রতাপ মহারাজ মুকুচন্দ্র স্বয় আমাকে এই মহাসনে বসিয়ে গেছেন। কর্তার আমলে অবশ্য রাজকবিই ছিলাম। প্রজাতন্ত্রী ডারতে সাইনবোর্ডটি বদলে দিতে হয়েছে। আমাদের আমলের দিল্লীশ্বরেরা জনগীশ্বরো বা এমন কি রাষ্ট্রপতি হয়েছেন। বিশেওরে হয়েছে জনতা এক্সপ্রেস্। (অবশ্যি কংগ্রেস-রাজ, রাজভবন, রাজকুমারী অমৃত কাউর আর রাজপুরুষদের রাজত্ব এখনও যোচেনি। ওগুলো বোধকরি নয়া অবাবার আর্থ পুরোণো।) আমি আর কোন লজ্জার রাজপদ গায়ে দেখে দুরে বেড়াই। তাই আমি জাতীয় কবি।

আমাদের এই গৌড়দেশ কালচার ঘোঁষী। গৌড়বাসী সব ছাড়তে পারে। কিন্তু তার কালচারের গায়ে আঁচড়টি লাগুক দেখি, অমনি সেডেরিয়া বেরীয়া। এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি, গৌড়ের এক কবিই সে গান গেয়ে গেছেন্।

এই গৌড় দেশ অতীতে মুর্খ ছিল। তখন গৌড়বাসীরা কালচার কাকে বলে জানত না। তাই তারা বিদ্যাচর্চায় মন দিয়েছিল। এমনিস মহোৎসাহে ইসকুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় বানিয়েছিল। সে সবের ডগুমেণ্টের আজও দেখতে পাওয়া যায়।

অবশেষে এ জাতি কালচারের বর্ম বরণ। কিশকবি বেষিম বরলেন, বিদ্যেচা হ'ল কমলবীয়ে আর কালচারটা হ'ল তার খীবি—সেদিন গৌড়বাসীর বেন চোখ ফুটল। সেইদিন থেকেই তার দুর্ভিক্ষ দিবস। তাই সে ঝাটিতি বিদ্যেচা ছেড়ে কালচার ধরেছে। তারই নগদ ফল কালচারান কলকাবেরা।

পড়ছায় পাড়ায় আজ কত পাঠশেণ। এই দেশেতে জন্ম আমার কথাটা ধ্বত মনে পড়ে গেছে ততই যেন দুঃত পেশার বেড়ে যায়।

গৌড়বাসী সাধে কবিদের খাতির করে। কালচারের বান রাখতে সে বই পড়ে না কিন্তু সভায় শোনোচিতা করতে কবিদেরই ডাকে। গৌড়দেশের কালচার কবিদের তার খুঁটে বানিয়ে ছেড়েছে। এত সম্মান কে কবে কাকে কোথায় দিয়েছে।

এদের গৌড় দেশের জাতীয় কবি আমি। আমি এ দেশের যোগ্যতম প্রতিনিধি। আমাকে দিয়েই তো দেশকে চেনা যাবে। তাই আমি কত সাবধানে থাকি। কত যত্নে পোষাক পরি, প্রসাধন করি।

কিন্তু ঐ আয়নাটা আমার সব শ্রম বরবাদ করে দেয়।

আমার ধারণা, আমি সাক্ষাৎ চির-যৌবনা শ্রীমতী রাধা। কিন্তু আয়নার ছায়া পড়ে মুক্তার। দেখি আমার আননে প্রৌঢ়ত্বের ঘনি কনসেটিকসের প্রলেপ ঠেলে বেরিয়ে পড়েছে। দুর্বার ক্লান্তিতে নয়নের কোনের শ্যাম কলঙ্ক আরও গাঢ় হয়ে উঠেছে। ইমালসাইনের কত্তা বাধন সত্ত্বেও অঙ্গ আমার অভাব ধৈর্যিবেনা নিয়ন্ত্রণী হয়েছে।

আমার ধারণা আমি বনরাজ গোলাপ কিন্তু আয়নায় দেখি বেঁটে কুল।

কে না জানে আমি নিস্বার্থ দেশ সেবক। দেশ বই আর কিছু জানি না। পাছে দেশ সেবার খাবতি পড়ে তাই বাল্যে ইসকুলে ছেড়েছি, যৌবনে জেল খেটেছি বার্ধক্যে গঠনমূলক কারবার করেছি। এই নিস্বার্থ আদর্শ দেশবাসীর সামনে তুলে ধরতে গড়ের মাঠে রাখীর জন্য যোবিধানায় কাবিল কাপড় পরে আমার ঠুনি আঁটতে আমনা পানে বেই চাই অমনি দেখি মুকলচন্দ্রে বেবি চ্যান্সের পারনিট খচনচিয়ে উঁকি মারছে।

আমি পরম নিষ্ঠাবান সাংখানিক। আমার প্রাণটি পৌড়খেণ সতত কাঁদে। জাতির নৈতিক মানের অধোগতি কলমের খোঁচার বদ্ধ করে তাকে মুনবেশ্চেতন ভবায় তুলি। বন্যাপ্রাণ নিবারনী সভার আমি স্থায়ী সভাপতি। কিন্তু আমনায় দেখি আমার স্বাস্থিক শুক্ল কেন্দ্র কোম্পানীর তাবনিক গোলায় মধুর আবেশে গোদুল্ দোলে।

আমি বাবপন্থী পুরোবেতাত্ত্বিয়ত। দুনিয়ার বদমুদ্রকে দুবেলা এক করি। সব সর্বহারার বিশ্বস্ত নিস্কিলে লাল খাণ্ডার নিচে নিচে পেটেণ্ট দেশারের ভুতো পায়ে সনসনিয়ে চলি। আর বেয়ারা বাড়িতে আমার ষষ্ঠীর ভন্ত পাঠাই মুনিখাবাল বাজারোভের সিক্ক আর এম বি সরকারের পয়না। আয়নাতে বার পড়ি।

আমি গৌড় দেশের যুবক। দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ কুল তিলক। মিবিচারে প্রেম করি। কিন্তু বিয়ের সময় জীবনে একবার হাত পিতুমাজা পালন করি, পদের টাকা গুণে নিই।

আমি বৈজ্ঞানিক। গুড় পদার্থ অনুসন্ধানরত বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার উপর গবেষণা করে মর্ম পদক পাই। কিন্তু জানা বুলতেই আয়না দেখি বী। প্রাতের কনুইয়ের উপর অই বাহুর কবচ বাঁধা।

আমার ধারণা আমি বয়ঃজন. আমি বাবনারী, আমি মহের নবনারী। আমার ধারণা, আমি নেত্রী, আমি অন্যাশক, শিক্ষক, আমি ছাত্র। কিন্তু আয়নায় ভাসে এমন সব চেহারা যাদের আমরা হাবেশাই নাবনাবালায়ে দেখি।

বিক্রমে আমি ভীম কিন্তু সে যাত্রায় ভীম। পরাক্রমে আমি সিংহ কিন্তু সে সিংহ সার্কাসের।

আর আমার যা কিছু গৌরব, যা কিছু গরিমা, সে সব তো দেখি মুখুজ্জেদের কথা।

বাস্তবের ছবি আয়নায় যথাযথ ফোটে। তাই আয়না আমার পরম শত্রু।

অর্থ সাহায্যের ঠাণ্ডা লড়াইয়ে মার্কিন ও রুশ ভূমিকা

ভারতের ডলার সাহায্যের আসল ইতিবৃত্ত

(পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা বিষয়ক পর্যবেক্ষক)

আমেরিকার অর্থ সাহায্য যে ক্রমশ নিরপেক্ষ অর্থাৎ (Uncommitted) রাষ্ট্রগুলির দিকেও প্রসারিত করতে হবে বহুদিন যাবৎ অনিচ্ছাসত্ত্বে ঘোষ, এই যাদব সত্য কিছু কাল যাবৎ মার্কিন গভর্ণমেণ্টকেও স্বীকার করতে হয়েছে। কিন্তু ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে টেট ডিপার্টমেণ্ট যে রিপোর্ট প্রকাশ করেছেন তার পরে মার্কিন কংগ্রেস এবং মার্কিন জনসাধারণ প্রভৃতিকে সত্যিকারের চৈতন্য লাভ করেছে। এই গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্টটিতে পরিষ্কারভাবে পাশাপাশি দেখানো হ'য়েছে, কিভাবে অর্থ ও কারিগরি সাহায্যের ব্যাপারে রাশিয়ার চালাকি সমুদ্রিতের হয়ে উঠেছে। রাশিয়া যে প্রতিযোগিতার মনোভাব নিয়ে এগিয়ে চলেছে তাতে যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সমান তালে পাল্লা দিতে চায় তাহলে অবিলম্বে মার্কিন বৈদেশিক সাহায্য নীতির কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটাতে হবে। ভারতবর্ষ শেষ পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে ২২ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার সাহায্য পাবে বলে ১৯৫ জানুয়ারী ঘোষণা করা হয়েছে, সেই ঘোষণার পিছনে যতটা না টি, টি কৃষ্ণমাচারীর 'দাদাগিরি' আছে, তার চেয়ে বেশী স্টেট ডিপার্টমেণ্টের এই রিপোর্টের প্রতিক্রিয়া, লক্ষ্য করছে। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, ডিসেম্বর শেষ সপ্তাহে রিপোর্ট টি মুখ্যিল কয়েকদিন উপস্থাপিত না হলে সাহায্যের পরিমাণ ২২ কোটি ৫০ লক্ষ ডলারে পৌঁছে না। টি, টি, কের মার্কিন সফরের পর যে রকম কোন আশাতীত ফলাফল সম্ভাবনায় দেখা যায়নি।

এই রিপোর্টে স্পষ্ট দেখানো হয়েছে যে, রুশ নৈতিক প্রতিশ্রুতি না, শর্তহীনভাবে, সোভিয়েট ব্লক নিরপেক্ষ রাষ্ট্রকে সাহায্য দানের ব্যাপারে কতটা অগ্রসর হয়ে এসেছে: (১) গত ২। বছরের মধ্যে সোভিয়েট ব্লক ১০টি অনুন্নত রাষ্ট্রকে মোট ১,৫০০, ০০০,০০০ ডলার অর্থ সাহায্য দেওয়ার চুক্তি করেছে। এই ১০টি রাষ্ট্রের মধ্যে আফগানিস্থান, কাম্বোডিয়া, সিংহল, বিশর, ভারতবর্ষ, ইন্দোনেশিয়া, নেপাল, সিরিয়া, ইয়েমেন এবং যুগোস্লাভিয়া আছে। এই সাহায্যের টাকার মধ্যে শতকরা ১০ থেকে ১৫ ভাগ অর্থ ইতিমধ্যে দেওয়া হ'য়ে গেছে এবং বাকী অর্থ পরিকল্পনাগুলি যেমন যেমন তৈরী হচ্ছে ঠিক সেইভাবে সরবরাহ করে যাওয়ার জন্য সোভিয়েট রাশিয়া প্রস্তুত হ'য়ে রয়েছে। অপর পক্ষে গত ২। বছরে এই দশটি রাষ্ট্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে মোট ৯০০,০০০,০০০ ডলার সাহায্য পেয়েছে।

(২) ১৯৪৭ সালের প্রথম ছয় বছরের মধ্যে মোট ১৯টি অনুন্নত দেশে নিম্নোক্তানুসারের জন্য রাশিয়া মোট ১ হাজার টেকনিশিয়ান পাঠিয়েছে। এবং সোভিয়েট শিক্ষা ব্যবস্থার উতিবধ্যে ভাতেও প্রগতি সাধন করা হয়েছে যাতে করে কয়েক বছরের মধ্যেই সাহায্যকারী টেকনিশিয়ানের সংখ্যা আরও অনেক বাড়িয়ে দেওয়া যাবে।

(৩) সোভিয়েট ব্লকের ভিতরে আর্থিক অস্থিরতা যাহা থাক, এবং অনুন্নত দেশগুলিকে রাশিয়া যদি বিশুণ পণ্য সম্ভার সরবরাহ করতে আরম্ভ করে তাহলে ওই দেশে কোন উৎপাদনের শতকরা ৫ ভাগের বেশী খরচ করতে হবে না।

(৪) এই অনুন্নত অঞ্চলগুলির সঙ্গে রাশিয়া যে বাণিজ্য-চুক্তি করেছে তাতে স্থানীয় টাকা বা কারেন্সী নেওয়া হচ্ছে অথবা বিনিময় প্রথায় লেনদেন চলছে, যার ফলে, স্বভাবতই রাশিয়ার বাণিজ্যের সাহায্যের দিকে অনুন্নত দেশগুলি বেশী আকৃষ্ট হচ্ছে।

তিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই আমেরিকা মুক্তরাষ্ট্র অর্থনৈতিক ও সামরিক উভয় ক্ষেত্রেই বৈদেশিক সাহায্যকে তার পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হিসাবে গ্রহণ করেছিল। বর্তমানে দেখা যাচ্ছে, তার প্রতিদ্বন্দ্বী সোভিয়েট ইউনিয়নও এই ক্ষেত্রে তীব্র প্রতিযোগিতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। এবং নিঃসন্দেহে সোভিয়েট ভূমিকা যথেষ্ট কৌশলপূর্ণ।

যুদ্ধ যখন শেষ হল তখন যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউরোপের পুনর্গঠনে বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজন তীব্রভাবে দেখা দেয়। অন্য দিকে এশিয়ার বেশর অনুন্নত দেশ স্বাধিকার পেয়ে পুনর্গঠনে ব্রতী হ'ল এ প্রয়োজন তাদের কাছেও সমভাবে তীব্র হ'য়ে উঠল। পুরুষ পর্যায়ে এশিয়া ও ইউরোপের এই বিরাট আর্থিক প্রয়োজন মেটাবার চেষ্টা করা হয় রাষ্ট্রপুঞ্জের মারফৎ এবং বলাই বাহুল্য পৌরী সেনের ভূমিকার অবতীর্ণ হ'য়েছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। সোভিয়েট গোষ্ঠীর অসহযোগিতার ফলে রাষ্ট্রপুঞ্জের বন্ধ দিয়ে অন্য দেশগুলিতে স্যহায্য দানের নিরপেক্ষ ক্ষমতা বোপে টেকেনি। এমন কি মার্শাল পরিকল্পনার যে স্রবিপুল পরিমাণ ব্যবস্থা করা হয়েছিল তা গ্রহণ করতে কম্যুনিষ্ট গোষ্ঠীকেও আহ্বান জানানো হ'য়েছিল। ষ্টালিনের অনমতির ফলে শেষ পর্যন্ত কম্যুনিষ্ট গোষ্ঠীকে মার্শাল পরিকল্পনার আওতায় আনা সম্ভব হয়নি।

১৯৫০ সালে কোরিয়ার যুদ্ধের পর আমেরিকা নিরপেক্ষতার বানাই ফেলে 'কম্যুনিষ্ট আক্রমণ' প্রতিরোধ করার জন্য ঘোলাখুরিয়ের অপর পক্ষকে সামরিক সাহায্য দিতে এগিয়ে গেল। তারপর থেকে সে জোগাড় বিভিন্ন দেশকে যে আর্থিক এবং সামরিক সাহায্য দিয়ে এসেছে তা মুখ্যত রাজনীতির হিসেব করে। মার্কাণ এ'কে বহুল বৈদেশিক সাহায্য মার্কিনেরই প্রায় এক চেটে ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল।

সম্প্রতি সোভিয়েট ও কম্যুনিষ্ট জগৎ আমেরিকার বৈদেশিক সাহায্যের একচেটে অধিকারে হস্তক্ষেপ করেছে। ষ্টেট ডিপার্টমেণ্টের রিপোর্টে'বলা হয়েছে, সোভিয়েট নেতৃত্বে কম্যুনিষ্ট জগৎ এখন যে অবস্থায় এসে পৌঁছেছে, তাতে বিভিন্ন অনুন্নত দেশকে তারা কখনও ও জগতন উচ্চ হার থেকেই সাহায্য করতে সমর্থ। এমন কি, বহুতে এক শ' কোটি ডলারও যে যদি সাহায্য হিসেবে দেয় তা হলেও যে অঙ্কটা তার বাৎসরিক মোট নিংশেষ-পাদনের এক শতাংশের বেশী হবে না। বাইরের পুরোজন মেটাবার জন্য উপযুক্ত সংখ্যায় দক্ষ কারিগর তৈরী করার ব্যাপারেও সোভিয়েট এখন নজর দিয়েছে।

আমেরিকার মত লালকিতার কড়াকড়ি সোভিয়েট রাশিয়ার না থাকায় সোভিয়েট রাশিয়া অনেক সহজে বৈদেশিক সাহায্য দিতে পারে। প্রাথী দেশগুলোকে তাই যে তার আওতায় অপেক্ষাকৃত দ্রুত গতিতে এনে ফেলতে পারে। কোন দেশকে বৈদেশিক সাহায্য দেওয়া হবে কিনা, দিলে কি পরিমাণ দেওয়া হবে, কি চুক্তির ভিত্তিতে দেওয়া হবে, এই সব ব্যাপার নিয়ে ওয়া পিটেনে কংগ্রেস এবং সিনেটে দিবের পর দিন ধরে বিতর্কের ঝড় বইতে থাকে, ততক্ষণে বক্তা অনুন্নত দেশে তার সাহায্যের হস্ত প্রসারিত ক'রে দিয়েছে। মজার সাহায্য প্রসারে তিতীয় সুবিধা এই যে তারা নিঃসকোচ বলতে পারে যে, সাহায্যদানের নিছনে তাদের কোনো রাজনৈক সর্ত নেই। অন্যদিকে মার্কিন গভর্ণমেণ্টকে সর্ত, প্রত্যক্ষভাবে হোক, আর পরোক্ষভাবেই হোক একটা রাখতেই হচ্ছে। বস্তুত, কংগ্রেস এবং সিনেটে মার্কিন জনমতকে সন্তুষ্ট করা সম্ভব নয়। তৃতীয়তঃ, বক্তার সুবিধে এই যে, তারা বলতে পারছে, (ক) ষতদিনে খুশী ধ্রু পরিশোধ করতে পারেন; (খ) শতকরা ২।৩ টাকার বেশী সুদও দিতে হবে না, ((গ) সিকিত কারিগর যদি চান তাও দিতে পারি, কিংবা আপনার দেশের লোককে আমার গ্রেণে যদি ট্রেনিং এ পাঠাতে চান তো সচ্ছন্দে তাও পাঠাতে পারেন।

শীর্ষ সম্মেলন সম্পর্কে মতামৈক্য

সোভিয়েট প্রধান মন্ত্রী মার্শাল বুলগানিন শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠানের এবং বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী হ্যারল্ড ম্যাকমিলান প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শক্তিগোষ্ঠীর মধ্যে অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদনের যে প্রস্তাব করেছেন, প্রধানতঃ সে দুটো প্রস্তাবকে কেন্দ্র করেই বর্তমান বিশ্ব রাজনীতি-ক্ষেত্রে আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে।

বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রসৈতিক মহলে সোভিয়েট প্রস্তাবের মোটামুটি সমর্থন বিসেবে বলা চলে। তবে এই প্রসঙ্গে পদ্ধতির এবং প্রস্তাবিত পুরোজনীয়তা সম্পর্কে প্রশ্ন উঠেছে। বৃটিশ প্রস্তাবে পৃথিবীর বিরাট এক অংশের সমর্থন পাওয়া গেলেও মার্কিন রাজনীতি মহলে কিন্তু এ প্রস্তাব অকণ্ঠভাবে বিদ্রোহাত্মের সৃষ্টি করেছিল। ন্যাটো ও ওয়ারশ চুক্তিভুক্ত রাষ্ট্রগোষ্ঠি দুটোয় মধ্যে বর্তমান আন্তর্ণতিক পরিস্থিতিতে কোন চুক্তির ফায় ভাল অপেক্ষা বলই বেশী হবে বলে বাকিথী মহল থেকে বতাবত বারু করা হ'য়েছে।

মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব মিঃ ডালেস সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে আলাপ আলোচনায় যে কোন সুফল দেখা দিতে পারে সে সম্ভাবনাকে বড় একটা আমল দিতে চান নি। বৃটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ সেলুইন লয়েডের চিত্তার গতিও অনেকটা একরূপ। সোভিয়েট রাশিয়ার পক্ষ থেকে ২৭টি বাই নিয়ে আগামী ২।৩ মাসের মধ্যে শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠানের যে প্রস্তাব করা হ'য়েছে মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব মিঃ ডালেস তাঁদের অভ্যাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে যে মুখ্যিল বাঁকিয়েছেন। ফলিয়ার ফলে যে কি প্রতাব এবকম একটা ভাব দেখানো যেন তাঁদের অভ্যোসে পরিণত হ'য়ে গিয়েছে। কিন্তু একথা তাঁরা বুঝছেন কিনা, না, না তাঁরাও জান করছেন, জানি না—সে পৃথিবীর চাওয়া বদলাচ্ছে এবং তা অতি দ্রুতগতিতেই বদলাচ্ছে। এটা অবশ্য বোঝা খুব শক্ত নয় যে, অবিশ্বাস ও সন্দেহ থেকেই তাঁরা আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতে সবকিছুর দ্বিবিধ বিচার করবার অভ্যস্ত হ'য়েছে।

তবে আশার দিষয় এই যে, মিঃ নহেরু বা মিঃ ডালেস মত তাড়াহুড়ো ক'রে রুশ প্রস্তাব বাতিল করার পক্ষে যুক্তি দেখিয়েছেন বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাকমিলান অথবা মার্কিন প্রেসিডেণ্ট মিঃ আইসেনহাওয়ার কিন্তু তা করেন নি। বরং মনে হয় আন্তর্জাতিক অবস্থার পটভূমিকার বীর বাধায় সমস্ত বিষয় পর্য্যালোচনা করার জন্যে তাঁরা কিছু বেশী সময় নিয়েছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত রুশ প্রস্তাব সমর্থন না করার পক্ষে তেমন জোরালো কোন যুক্তি দিচ্ছেই তাঁদের মনে জাগেনি এবং জাগলে কখনই তাঁরা রুশ প্রস্তাব সমর্থন করতেন না। সম্মেলনের পদ্ধতি ও অন্যান্য খুঁটিনাটি ব্যাপারে সোভিয়েট প্রস্তাবের সঙ্গে তাঁদের মত পার্থক্য ঘটলেও শীর্ষ সম্মেলনের সম্ভাবনাকে তাঁরা বাতিল করে দেন নি।

ভারতের পক্ষ থেকেও রাষ্ট্রদূতিন ভাষায় রুশ প্রস্তাবকে অভিনন্দন জানানো হ'য়েছে। ন্যাটোর অন্তর্ভুক্ত দেশগুলও কতকগুলি খুঁটিনাটি ব্যাপার ছাড়া ঐ প্রস্তাবে মোটামুটি সমর্থন জানিয়েছে।

শীর্ষ সম্মেলনে প্রস্তাবিত আলোচ্য বিষয়গুলির মধ্যে আনবিক অস্ত্র পরীক্ষা বন্ধ, আনবিক অস্ত্রবিমুক্ত অঞ্চল গঠনের জন্য পোলিশ পরিকল্পনা সমর্থন, আনবিক অস্ত্র ব্যবহার বর্জন, সৈন্য সংখ্যা ও আতীয় অস্ত্রসম্ভার হ্রাস এবং ন্যায়তো ও ওয়ারশ চুক্তিভুক্ত রাষ্ট্রগুলির মধ্যে অনাক্রমণচুক্তি স্বাক্ষরের প্রস্তাব প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

অনুন্নত দেশগুলিতে জনসমর্থন সংগ্রহের এই যে প্রতিযোগিতা, ষ্টালিনের মৃত্যুর পর থেকেতত্ত্ব আসলে এই প্রতিযোগিতার উপর সব চেয়ে বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এরই পুরুষ দর্শকের হিসাবে বুলগানিন এবং ক্রুশ্চেভ প্রভৃতপক্ষে এশিয়ার এবং বর্ণাঢ্যচার প্রায় সবগুলি নিরপেক্ষ রাষ্ট্র একবার পরিক্রমণ ক'রে এসেছেন। বলিও দ্বিতীয় বহাযুদ্ধের পর প্রথমে এই সাহায্য দানের প্রতিযোগিতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আরম্ভ করেছিল, তথাপি ভাগ্যক্রমে পুরুষ হওয়ার সংগে সংগে ক্রমশ এই সাহায্যের ব্যাপারটা তথুমাত্র মার্কিন খোষ্টিভুক্ত রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে আনা হয়েছিল। ইতিমধ্যে ১০ বছর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে ২২ শত কোটি ডলার এশিয়া, আফ্রিকা এবং বহাপ্রাচ্যে খরচ করেছে, তার ও ভাগেরও কম Uncommitted রাষ্ট্রগুলি পেয়েছে। ফলে এখন সোভিয়েট রাশিয়ার ঘোরালো প্রতিযোগিতাকে 'প্রথম অতর্কিত আক্রমণ' রূপে গণ্য করতে হচ্ছে। বিশেষত রাশিয়ু নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলিকে সাহায্যের আওতায় আনবার জন্যে মুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েটের তুলনায় একটা পিছিয়ে পড়েছে। আফ্রোএশিয়ার প্রতি আমেরিকার বর্তমান কয় সাহায্যকে এই পাশ্চাত্যিকার এবং বিশেষ করে ষ্টেট ডিপার্টমেণ্টের এই মার্কে বিশোধের ভিত্তিতে দেখা চলছে।

মানসিক শান্তির জন্য
চাই স্নিগ্ধ মনোরম পরিবেশ

জনবহুল সহরের অধিবাসীর কোলাহল আবাসের প্রয়োজনগুলিকে পীড়িত করে তোলে। এখানে বাতাসে ধূলো, কলে আস্থাহানি ও আহ্বান অস্বাস্থ্যকর।

কলাণী এই অস্বাস্থ্যকর পারিপার্শ্বিক থেকে আপনাকে মুক্তি দেবে। কলাণীর উন্মুক্ত স্বাস্থ্যকর আবহাওয়ায় আপনি মানসিক শান্তি ফিরে পাবেন। এখানে রয়েছে অফুরন্ত আলো বাতাস। আর সেই সঙ্গে সহরের সর্বপ্রকার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থাও আছে পুর্ণমাত্রায়।

এখন ২৩টির উপর ট্রেণ প্রত্যহ কলিকাতা থেকে যাতায়াত করছে। কলিকাতা ও কলাণীর মধ্যে দুটি ভালো পাকা রাস্তাও আছে। ভবিষ্যতে ইলেকট্রিক ট্রেণ যাওয়া-আসা করবেন। কলিকাতা থেকে মাত্র ৩৫ মাইল দূরে।

বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা, পানীয় জল, পার্ক, হাই স্কুল, হাসপাতাল, বাজার, ডাকঘর, ফুলকপ্ত পয়প্রণালী প্রভৃতি কোন উপকরণেরই অভাব নেই এখানে।

বিশদ বিবরণদানের জন্য যোগাযোগ করুন: (১) নাগরিক রিসেপ্সন অফিসার, কল্যাণী, পোঃ কল্যাণী (নদীয়া) টেলিফোন: ৮ লাইন্যান্স-৮৮ (যদি অড়ারে ১২ টাকা পাঠানো কল্যাণীর স্থানে পাওয়া যাবে) (২) এক্সচেঞ্জার অফিস, হেডেক্সন মেঃ ডিপ:টেমেণ্ট, রাজভবন, কলিকাতা। টেলিফোন: ২৩-৪৪০১

আপনার বাড়ী তৈরীর উপযুক্ত স্থান কল্যাণী

১৮৮৫ সুরাশবিহারী এভিনিউতে একটি সেলস্ পুরোদমে অফিস খোলা হয়েছে। কল্যাণী সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় সম্পর্কে উক্ত অফিসে সন্ধান পাবেন।

পশ্চিম বঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত

জীবিকার সঙ্কট ঃ পশ্চিমবঙ্গে ১ কোটি ১০ লক্ষ বেকার

[শ্রীসুবোধ ব্যানার্জি]

সাড়ে দশ বছর হল কংগ্রেস দল শাসন ক্ষমতা অধিকার করেছে। এই সময়ের মধ্যে একটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাও বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনারও শেষ বছর কেটে গিয়েছে। ইচ্ছা থাকলে যে, এই সময়ের মধ্যে দেশের জনসাধারণের বাস্তব অবস্থার অনেকখানি উন্নতি সাধন করা তো দূর বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। যদিও কংগ্রেস দল এবং সরকারের পক্ষ হতে প্রচার করা হয়ে থাকে যে, প্রবিক কর্মচারীদের বাস্তব অবস্থার প্রভূত উন্নতি হয়েছে তবুও বাস্তব অবস্থার বিচার বিশ্লেষণ করলে কোন ক্রমেই এই প্রচারকে সত্য বলে স্বীকার করা সম্ভবপর হয় না—প্রকৃত অবস্থা ঠিক এর বিপরীত। বর্তমানে কয়েকটি গুরুতর সমস্যার চাপে পিষ্ট হচ্ছে। হাঁটাই ও বেকার সমস্যা হল তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা জটিল ও গুরুতর সমস্যা। এর সঙ্গে জনসাধারণের জীবনধারণের মান, শ্রমিক কর্মচারীর উপর কাজের চাপ (work load), উৎপাদিত সামগ্রীর আন্তর্জাতীক বাজার তথা দেশের অর্থনৈতিক জীবনের প্রতিটি প্রশ্ন প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত। পশ্চিম বাংলা সরকারের হিসাব অনুযায়ী এই রাজ্যে শহরে বেকারের (Urban unemployed) বর্তমান সংখ্যা হল প্রায় ১০'৫ লক্ষ এবং এই সংখ্যা প্রতি বছর ২০ হাজার হিসাবে বেড়ে চলেছে।

গ্রামীণ বেকারের কোন হিসাব সরকারের কাছে নেই সুতরাং পশ্চিম বাংলায় সঠিক কত গ্রামীণ বেকারের মোট সংখ্যা কত সে সম্পর্কে সরকারী তথ্যের অভাব আছে; তবে বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ কিন্সুন ও হিন্সেন রবিজনের মতে প্রায়োগ করলে পশ্চিম বাংলার মোট জনসংখ্যা ২ কোটী ৯০ লক্ষের মধ্যে এখন ১৯ হতে ৫৫ বছর বয়স্ক ১কোটী ১০ লক্ষ লোক ন্যূনপক্ষে পুরা বেকার ও আংশিক বেকার এবং প্রত্যেক বছরই এই সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে চলেছে।

উৎপাদন সঙ্কট কষ্ট করার পরিবর্তে অনাধারধনের বাস্তব অবস্থার উন্নত করে) দেখা দেবে—এই ভিন্নির ধারা তুলছেন তাঁদের সমর্থন করিয়ে দেওয়া দরকার যে, সাধারণি কঙ্কালের ঘন্টা কিছুটা করিবে দিলে অতি সহজেই পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে সঙ্কটের হাত থেকে আপাততঃ বেহাই পাওয়া যেতে পারে। তবে তাতে মালিক শ্রেণীর মুনাফা কমে যাবে বলে তারা প্রশ্ন থাকতে সে সুবিধা শ্রমিক শ্রেণীকে দিতে নারাজ। এই মুক্তিসঙ্গত পথ গ্রহণ না করে হাঁটাইএর যে নীতি পরিচালিত হচ্ছে তাতে পরিকল্পনায় অনিবার্য উৎপাদনের কথা ঘোষণা করলেও উৎপাদিত সামগ্রীর আন্তর্জাতীক চাহিদার বাজার উত্তরোত্তর সঙ্কুচিত হচ্ছে এবং এই সঙ্কুচিত বাজার নূতন নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠার ও অধিকতর উৎপাদনের অন্তরায় ঘটাচ্ছে।

প্রসঙ্গতঃ এই সম্পর্কে একটি কথা না বলে পারা যায় না। কংগ্রেসী পাসনে শ্রমিকদের কোনরূপ সুবিধা দেওয়া হয়েছে—ইত্যাকার অতিবাদ প্রায়ই শোনা যায় এবং সেই সুবিধার মধ্যে রাষ্ট্রবীমা (State insurance) একটি বলে উল্লিখিত হয়ে থাকে। ফ্যাক্টরী আইন অনুসারে কোম্পানীগুলি শ্রমিক কর্মচারীদের চিকিৎসার যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা দিয়াথাকে বর্তমানে তিতে আইনতঃ ধার্য্য রাষ্ট্রবীমাধারা তা অপেক্ষা খুব বেশী সুযোগ সুবিধা শ্রমিক কর্মচারীরা যে পাচ্ছে না সে বিষয়ে কণা মাত্র সন্দেহ নেই; তা সত্ত্বেও এখন তাদের বীমার টাকা বাবদ অর্থসংগ্রহ করতে হচ্ছে।

এখনকার সময়েতে বহু সময়ে হল হাঁটাই ও বেকার সমস্যা। আজ যদি কোন ব্যাপারে রাষ্ট্র-বীমার আবশ্যকতা থেকে, থাকে তাহলে সে বিষয়টি নিয়েসেখে হাঁটাই ও বেকারত্বের বিরুদ্ধে বীমা (Insurance against retrenchment and unemployed)। তাছাড়াও বেকার ভাতার ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়। এগুলি এমন কিছু নূতন দাবী নয়; পাশ্চাত্যের বহু দেশে এমন কি বনতান্ত্রিক দেশগুলিতেও সামাজিক নিরাপত্তা বিধার এই সব ব্যবস্থা আছে। আমাদের দেশে এই ব্যবস্থার আশু প্রচলন একান্ত প্রয়োজন।

হাঁটাই ও বেকারত্বের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ক্রমবর্ধমান কাজের চাপ। অর্থ নীতিতে র‍্যাশনালাইজেশন (rationlisation) কথাটির একটি বিশেষ অর্থ আছে। আমাদের দেশে সে অর্থ আজ অজানাই দেওয়া হয়েছে। এখন র‍্যাশনালাইজেশন বলতে শুধু বোঝায় শ্রমিক হাঁটাই ও কম সংখ্যক শ্রমিককে দিয়ে বেশী কাজ করিয়ে নেওয়া। সরকারের এই নীতির ফলাফল শ্রমিকদের উপর কাজের চাপ কি রকম বেড়েছে তার পরিচয় বিদেশে দিয়েছে তথ্যগুলি বিচার করলে। ১৯৪৯ সালের তুলনায় ১৯৫৬ সালে পাচশিদেশে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা শতকরা ১১ ভাগ দুল পেলেও এই সময়ের মধ্যে পাচমাত্তর মধ্যের উৎপাদন বেড়েছে শতকরা ২০ ভাগ। লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে এই কাজের চাপ আরও বেশী হারে শ্রমিকদের উপর চাপান হয়েছে—১৯৩০ সালের তুলনায় ১৯৩৬ সালে এই শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা শতকরা ২১ ভাগ বাড়লেও উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা ৩১'৬ ভাগ। ১৯৪৮ সালের তুলনায় ১৯৫৩ সালে সমগ্র উৎপাদন শতকরা ৫৮'২ ভাগ বৃদ্ধি পেলেও শ্রমিকের সংখ্যা কমেছে শতকরা ৬'৪ ভাগ। এইভাবে সারাবন শ্রমিকদের উপর কাজের চাপ প্রায় শতকরা ৭০ ভাগ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

এই বর্ধিত হারে কাজ করার জন্য শ্রমিকদের যদি বর্ধিত হারে মজুরি দেওয়া হত তাহলে অন্ততঃ আপত্তির বিশেষ কারণ থাকত না। কিন্তু তা তো দেওয়া হয়নি, পক্ষান্তরে মজুরী ক্রমশঃ নিম্নগামী হচ্ছে। কোন নিদের্শই ১৯৪৮—৫১ সালের মধ্যে শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধি পায় নাই, পরন্তু ভারত সরকার কর্তৃক প্রকাশিত ইন্ডিয়ান লেবার গেজেট থেকে জানা যায় যে, ফ্যাক্টরীগুলির মিট আয়ে মজুরের অংশ (share of wages and salaries in the net income from factories) প্রতি বছরে কমে যাচ্ছে।

১৯৫০ সালে মজুরীর অংশ ছিল এই মিট আয়ের শতকরা ৪২ ভাগ, ১৯৫১ সালে তা কমে দাঁড়ায় শতকরা ৩৬ ভাগ; ১৯৫৪ সালে আরও হ্রাস পেয়ে হয় শতকরা ৩১ ভাগ। এইভাবে মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যেই মজুরির অংশ শতকরা ৯ ভাগ কমে গিয়েছে।

অন্যদিকে মালিকের মুনাফার অংশ এই সময়ের মধ্যে সময়ায়ে বৃদ্ধি পেয়েছে —১৯৫০ সালে যেখানে মুনাফার অংশ (share of profit) ছিল শতকরা ৫৮ ভাগ সেখানে ১৯৫৪ সালে তা বেড়ে হয় শতকরা ৬৭ ভাগ। এই পরিসংখ্যান হতেই স্পষ্ট বোঝা যায় যে, শ্রমিক কর্মচারীর মজুরী ও বেতন কেটে শিল্পপতি মালিকদের পকেট ভর্তি করা হচ্ছে। ১৯৫৩ ও ১৯৫৪ সালের হিসাব প্রকাশিত হলে দেখা যাবে যে, অবস্থা অধিকতর শোচনীয় হয়েছে।

মজুরির লগ্ন কাঠামো

পশ্চিম বাংলার করেকটি প্রধান শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের মজুরির হার পরীক্ষা করলেই এই রাজ্যের মজুরি—কাঠামোর লগ্ন রূপ ধরা পড়বে। পশ্চিম বাংলার প্রধান প্রধান শিল্পগুলির মধ্যে পাট, বস্ত্র ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প অন্যতম। এই শিল্পগুলিতেই শ্রমিকের মজুরির উচ্চ, অন্যান্য শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের মজুরির তুলনায় অপেক্ষাকৃত বেশী। এই শিল্পগুলির মজুরি-হারও (below subsistance level)। বর্তমানে পাট শিল্পে নিযুক্ত একজন শ্রমিকের বোট আয় ৬৩'৩৮ টাকা, তন্মধ্যে মূল বেতন হল ৩৪॥৵০। বস্ত্র শিল্পে অবস্থা আরও খারাপ—এই শিল্পে নিযুক্ত বোট শ্রমিকের গড়বেতন ৪৪'৬৪ ভাগের মূল দৈনিক মজুরি ১৲ টাকারও কম, শতকরা ২২'৯৮ ভাগ ১৲ টাকা থেকে ১॥০ টাকা দৈনিক বেতন পায়। অর্থাৎ বোট শ্রমিকের শতকরা ৬৬'৮২ ভাগের বেতন দৈনিক ১॥০ টাকারও কম। ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে নিযুক্ত বোট শ্রমিকে শতকরা ৪৪'২ ভাগ দৈনিক ২৲ টাকার কম বেতন পায়। বর্তমানের আকাশচুম্বী মূল্যমানের দিনে এই মজুরিকে কোন ক্রমেই উপযুক্ত বলা চলে না ; উপরন্তু বর্ধিত ১৯৪৮ সালের তুলনায় মূল্যমান (price index) ১২৭ থেকে ১৮০ পয়েণ্টে উঠেছে তবুও এই সময়ের মধ্যে শ্রমিক কর্মচারীদের বোট আয় বৃদ্ধি পায় নাই, মূল বেতনকে বৃদ্ধি করা দূরে থাকুক।

শ্রমিক কর্মচারীর মজুরী ও বেতন বৃদ্ধির বিরুদ্ধে মালিকপক্ষ ও সরকার তিনটি যুক্তি উত্থাপন করে থাকেন। এই যুক্তিগুলির কোন সারবত্তা নাই। প্রথম যুক্তি হল—দেহের আমাদের দেশের শ্রমিকদের উৎপাদনশক্তি (productivity) অত্যন্ত কম, সেই হেতু বর্ধিতহারে তাদের মজুরি দিলে আন্তর্জাতিকবাণিজ্যিক প্রতিযোগিতায় ভারতীয় শিল্প টিকতে পারবে না। এই সম্পর্কে আমাদের জিজ্ঞাস্য-যদি তর্কের খাতিরে ধরেও নেওয়া হয় যে, ভারতীয় শ্রমিকদের উৎপাদন শক্তি কম তাহলেও প্রশ্ন থেকে যায়, তার জন্য দায়ী কে? এর জন্য ততটা দায়ী শ্রমিক নয় যতটা দায়ী পুরাতন কলকব্জাপাতনকল্প যন্ত্রপাতি। তাছাড়াও উৎপাদন শক্তি নির্ধারণের প্রশ্নটি বিজ্ঞান সম্মতভাবে বিচার করতে হলে একজনশ্রমিক আমাদের দেশে দৈনিক যত পরিমাণ সাবত্তী উৎপাদন করে তার সঙ্গে অন্য দেশের শ্রমিকের দৈনিক উৎপাদনের পরিমাণ তুলনা করলেই হবে না, একক (unit) সাবত্তী উৎপাদন করার জন্য উভয় দেশে ব্যয়িত মজুরির হিসাবও নিতে হবে। এই বিষ হতে বিচার করলে আমাদের দেশের শ্রমিককে অযোগ্য বলা যায় না। একটি উদাহরণ দিলেই আসল অবস্থাটি বোধগম্য হবে।

গ্রেটব্রুটেনে বস্ত্র শিল্পে নিযুক্ত একজন শ্রমিক সপ্তাহে পায় ২০৮ শিলিং ১০ পেন্স। এই হিসাবে তার দৈনিক আয় হয় ৩৪'৬ টাকা; আর সেক্ষেত্রে আমাদের দেশে একজন বস্ত্র শিল্পের শ্রমিকের মাসিক মজুরি হল ৩৩'১৫ টাকা অর্থাৎ উভয় দেশে শ্রমিক শিল্প ঘণ্টায় বস্ত্র উৎপাদনের পরিমাণে বিশেষ তারতম্য নেই।

ভারত সরকার কর্তৃক প্রকাশিত India 1957 নামক পুস্তকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের উৎপাদন শক্তির একটি তালিকা দেওয়া আছে। ঐ তালিকা ১৯৪৩ সালের উৎপাদনের ভিত্তিতে রচিত হয়েছে। বর্তমান বছরেরউৎপাদন ১৯৪৩ সালের তুলনায় প্রায় শতকরা ৪০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই বর্ধিত

(শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠার দ্রষ্টব্য)

দুর্দশাগ্রস্থ পঃ বঙ্গে শ্রমিকের জীবন কোনপথে?

কেবলমাত্র লোক সংখ্যা বৃদ্ধির জন্যই যে বেকার ও আংশিক বেকারের সংখ্যা বেড়ে চলেছে তা নয়; সরকারী পুনর্বাসিত কর্ম্মাদলে বেকার সমস্যা প্রতিদিন অধিকতর সঙ্কটজনক রূপ পরিগ্রহ করছে। যেখানে প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নূতন নূতন কর্ম সংস্থানের উদ্দেশ্য ঘোষিত হয়েছে সেখানে নূতন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা দূরে থাকুক কর্মে নিযুক্ত শ্রমিক কর্মচারীদের হাঁটাই করে বেকার সমস্যাকে ঘোরালো করে তোলা হচ্ছে। সরকার কর্তৃক পরিবেশিত পরিসংখ্যান এই কথার সত্যতা প্রমাণ করে। সম্প্রতি পশ্চিম বাংলা সরকারের শ্রম দপ্তর যে হিসাব দাখিল করেছেন তাতে দেখা যায় যে, ১৯৪৯ সালে পশ্চিম বাংলার ফ্যাক্টরী গুলিতে নিযুক্ত বোট শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৩,৬৬,০০৮; ১৯৫৫ সালে এই সংখ্যা কমে দাঁড়ায় ৩,৩৪,৫২৬জন।

অর্থাৎ এই কয় বছরে; যার মধ্যে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার চার বছর ছিল, ২৩,৪৮২ জন শ্রমিক তাদের কাজ হারিয়েছে। শিল্পসমৃদ্ধ এই সংখ্যাকে ভাগ করলে অবস্থার গুরুত্ব আরও পরিষ্কারভাবে পরিস্ফুট হবে। কেবলমাত্র পাট শিল্পেই এই কয় বছরে ৪৮,৩৮১ জন শ্রমিককে হাঁটাই করা হয়েছে।

আর এই দুরবস্থা শুধু পাট শিল্পের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, প্রধান প্রধান প্রায় প্রতিটি শিল্পেই এইভাবে বিভিন্নহারে শ্রমিক কর্মচারী বিতাড়ন পর্ব চলেছে। চায়ের ফ্যাক্টরীতে ১৭৪০, জাহাজ নির্মাণ কারখানায় ৪৩১৪, পাটগুলিতে ১৬৬৭, অন্যান্য শিল্প সাধারণী খাতে ২৩,৮৩১ জন শ্রমিককে এই ১৯৪৯—৫৪ সালের মধ্যে বরখাস্ত করা হয়েছে। এইরূপ বরখাস্ত শ্রমিক কর্মচারী সংখ্যা পূর্বোক্ত ৩০,৪৮২ জনের বহুগুণ বেশী হবে কিন্তু যেহেতু কতকগুলি শিল্পে এই সময়ের মধ্যে নিযুক্ত শ্রমিক কর্মচারীর সংখ্যা বেড়েছে সেইহেতু ১৯৪৯ সালে মোট নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা ও ১৯৫৫ সালের নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যার সমন্বয়ও অনেকখানি কম হয়েছে।

১৯৫৫ সালের পর অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নাই। নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির কথা ছেড়ে দিলে ১৯৫৫ সালের তুলনায় ১৯৫৬ সালে চায়ের ফ্যাক্টরীগুলিতে ২২৩২, তারাক শিল্পে ১৫১, কয়লা ফ্যাক্টরীতে ২৩০, মূল কারখানা শিল্পে ২৪১, চালাই শিল্পে (Rough casting) ৫৪৪জন শ্রমিককে বোট কম বেতনে হাঁটাই করা হয়েছে। এই সব শিল্পে হাঁটাই আরও বহু শিল্পে হাঁটাই সরকারে হয়েছে; বাহুল্য বোধে সেগুলির উল্লেখ করা হল না।

প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কার্যকালেই এইভাবে নিযুক্ত শ্রমিককে হাঁটাই করে বেকারত্বের পথে নিক্ষেপ করা হচ্ছে তাই অভাবতই প্রশ্ন জাগে—এ কোন জাতের পরিকল্পনা? কাদের স্বার্থ এর দ্বারা রক্ষা করার চেষ্টা হচ্ছে, জন-সাধারণের, না মালিক শ্রেণীর? অথবা একথা বলেই বসেন না যে, বেকার সমস্যার মত ভয়ঙ্কর সমস্যা একটি অথবা দুইটি পরিকল্পনার দ্বারা সমাধান করা সম্ভব। এই গুরুতর সমস্যাটির সমাধান করতে গিয়েসেদেশে যেন কিছু সময়ের প্রয়োজন। কিন্তু সমস্যার সমাধান করতে হলে বেকারের সংখ্যা যাতে প্রতি বছর বেড়ে না যায় তার কার্যকরী ব্যবস্থা অবশ্যই করতে হবে, কারণ প্রতি বছরই যদি করে নিযুক্তশ্রেণিক কর্মচারীকে হাঁটাই করা হতে থাকে এবং বেকারের সংখ্যা ক্রমশই বৃদ্ধি পেতে থাকে তা হলে কোন দিনই এ সমস্যার সমাধান হবে না। আমাদের দেশে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কল ঠিক এটাই ঘটছে—তাই তার বাধানে যে বেকার সমস্যার সমাধান করা যাবে না সে সত্যও অবধারিত। এতে অবাক হবার কিছু নেই, পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে পাকাপোক্ত করার জন্য যে পরিকল্পনা তার যৌক্তিক পরিণতিরূপে এছাড়া কিছুই বর্ধিত হতে থাকে।

এই হাঁটাই এর যুক্তি হিসাবে যে কথা মালিক ও সরকার পক্ষ থেকে বলা হয়ে থাকে তার বিশেষ কোন মূল্য নেই। তাঁদের বক্তব্য হল—যেহেতু আমাদের দেশের শিল্পগুলির উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতি বসান একান্ত দরকার এবং যেহেতু এই যন্ত্রগুলি হল শ্রম-সাশ্রয়কারী (Labour-Saving) সেইহেতু শ্রমিক হাঁটাই না করে উপায় নেই। এই যুক্তি অর্থনীতির নিয়ম ও কর্ম্যার রাষ্ট্রের নীতিবিরুদ্ধ। প্রথমতঃ, যেখানে উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যেই শ্রম-সাশ্রয়কারী যন্ত্র স্থাপন করা হচ্ছে সেখানে শ্রমিক হাঁটাই করে উৎপাদন হ্রাস করার পুচ্ছটা কেন? সেখানে তো উচিত এমন সংখ্যার শ্রম-সাশ্রয়কারী যন্ত্র বসান যাতে নিযুক্ত সকল শ্রমিককেই কাজে বহাল রাখা সম্ভবপর হয় এবং তার মাধ্যমে উৎপাদনকে স্তূপে বহুগুণ বর্ধিত করা যায়। এই একান্ত সহজ ও যুক্তিসঙ্গত পথ গ্রহণ না করার একমাত্র উদ্দেশ্য হল শ্রম-সাশ্রয়কারী যন্ত্র বসিয়ে শ্রমিক হাঁটাই করে মুনাফার পরিমাণ বহুগুণ বৃদ্ধি করা। ভারতীয় মালিক শ্রেণী এই উদ্দেশ্যেই শ্রমিক হাঁটাই করে চলেছেন। আর একটিকে শ্রমসাশ্রয়কারী যন্ত্র বসান অন্যায়কে নিযুক্ত শ্রমিককে কাজে বহাল রাখবে অতুৎপাদনের ক্ষেত্রে (বোনাস টাকা অতুৎপাদনের দক্ষিণ-স্তূ, এটা পুঁজিবাদী অর্থনীতির পীবনাত্মানী পদ্ধিতি। প্রকৃত কথাগ মার্ক্সীয় বর্ধিত

হিন্দ্—আপনার
সারাজীবনের বিশ্বস্ত সঙ্গী
হিন্দ্ সাইকেল বিশ্বস্ত সঙ্গী; আপনার সারা জীবন এটি আপনাকে কাজ দেবে—কখনও মুস্কিলে ফেলবেনা। হিন্দ্ তৈরী হয় সবচেয়ে ভাল উপাদান থেকে এবং এটির পেছনে থাকে কুশলী কর্মীদের নিষ্ঠা। সেইজন্যেই হিন্দ্ এত ভাল কাজ দিতে সক্ষম।

হিন্দ্ সাইকেল লিমিটেড, ২৫০ ওয়ারলী, বোম্বাই ১৮।
ASP/HC.119

মালিকের মুনাফা বৃদ্ধি—শ্রমিকের ছাঁটাই

পশ্চিমবঙ্গে চাকুরী জীবীর সঙ্কট

(৭ম পৃষ্ঠার পর)

উৎপাদনকে হিসাবে মধ্যে গ্রাহ্য করলে পর্ব্বত পিলে বিনুক্ত শ্রমিকের উৎপাদন শক্তি দাঁড়ায় প্রায় ২·১ টাকা, সিমেণ্ট শিলে ২·২ টাকা, বস্ত্র শিলে ১ টাকা, রেলয় শিলে ২·১ টাকা এবং লৌহ ও ইস্পাত শিলে ২·২ টাকা। পাশ্চাত্যের অনেক উন্নত দেশের সঙ্গেই এই উৎপাদন শক্তি তুলনীয়ে তুলনীয়। সুতরাং ভারতীয়, শ্রমিকের নয়নয় উৎপাদন শক্তির অযুহাত দেখিয়ে মজুরি বৃদ্ধির দাবীকে ঠেকান যুক্তিসঙ্গতভাবে চলে না। এই সম্পর্কে আর একটি কথা রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ কর্ণধারদের স্মরণ করিয়ে দেওয়ার দরকার আছে। মনে রাখা দরকার যে, কম মজুরি কম উৎপাদনশক্তির কারণ; উৎপাদন শক্তিকে বাড়াতে হলে শ্রমিকের মজুরিকেও বাড়াতে হবে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হবার পরে এই প্রশ্নটি নিয়ে ব্রেটেনটোনে বহু আলোচনা হয়েছিল। The economist এর মত পেঁচিয়া রক্ষণশীল ও মালিক ঘেঁষা পত্রিকাও স্বীকার করতে বাধ্য হয়—

'High wages are good for technical progress. Th's can perhaps be most easily seen by considering the case of a poor country such as, say, China. Firms which operate both in China and in Western countries find that it does not pay to mechanise in China because labour is so cheap. And labour is cheap because its productivity is low. The best way of breaking out this vicious circle is by insisting on high wages. * * * Thus there is justification for the belief that the high wages come first and the high productivity as a consequence" (Economist, September 16, 1944, Article on 'Labour and Wealth').

ব্রেটেনুইডে এর পর শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধি করে তাদের উৎপাদন শক্তির উন্নতি সাধন করা হয়। আমাদের দেশে শ্রমিকদের উৎপাদন শক্তি বাড়াতে হলে সেই পথই অবলম্বন করতে হবে।

বিষাক্ত চক্রের যুক্তি

মজুরি বৃদ্ধির বিরুদ্ধে দ্বিতীয় যুক্তি হল—বর্ত্তমানে যেহেতু ভোগ্যবস্তুর (Consumer goods) যথেষ্ট অভাব হয়েছে সেইহেতু মজুরি বৃদ্ধি করলে ভোগ্যবস্তুর আগে যোগান না বাড়লেও তা চাহিদা বেড়ে যাবে এবং তার ফলে ভোগ্য বস্তুর দাম বেড়ে যাবে। এই বর্ধিত দামের জন্য অধিকতর মজুরি বৃদ্ধি করতে হবে এবং তার জন্য আবার দাম বাড়বে। এইভাবে বর্ধিত মূল্য চেটাবার জন্য বর্ধিত বেতন তারপর আবার মূল্য বৃদ্ধি —মুদ্রাস্ফিতির এই বিষাক্ত চক্র সুরু হবে। পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় বহুবার বিধান সভায় তাঁর অভিবেশের কর্ণধারীদের মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধি করার প্রস্তাবের বিরোধিতা করে এই যুক্তি উপস্থাপিত করেছিলেন। মালিক পক্ষের "Vicious inflationary spiral of wages and prices to develop" এর এই যুক্তি আমাদের দেশে নয়া আমদানি হলেও পাশ্চাত্য দেশগুলিতে এই যুক্তি অনার বলে পরিগণিত হয়েছে। যুদ্ধোত্তর যুগে ব্রেটেনের শ্রমিক কর্মচারীরা যখন অত্যন্ত প্রয়োজনের জন্য বর্ধিত হারে মজুরি দাবী করে তখন সেখানকার মালিকপক্ষ এই কুযুক্তি উত্থাপন করে সে দাবীকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে। এই প্রশ্ন নিয়ে তখন অর্থনীতিবিদদের মধ্যে তুমুল আলোচনা চলে। সে আলোচনার সারাংসার অংশের সঙ্গান Margot Heinemann এর wages Front গ্রন্থক পুস্তকে বিধবে। এই প্রশ্নের বিভিন্ন দিক আলোচনা করার পর শ্রমিকের মজুরি বাড়ালে মুদ্রাস্ফিতি হবে কেবল মুক্তিকে পরিত্যাগ করা হয়; পক্ষান্তরে সমস্ত প্রগতিশীলী অর্থনীতি বিদরা এই মত প্রকাশ করেন যে, মজুরি বৃদ্ধির জন্যই মজুরি বাড়ানর পুরোজন পড়ে, "Prices rise first, and wages follow at a distance : as a result profits increase"

তাঁরা আরও বলেন যে, মূল্যমানের উর্ধগতিকে রুদ্ধ করার উপায় মজুরি বেঁধে দেওয়া (freeze) নয়, অধিকতর কঠোরভাবে দাম নিয়ন্ত্রণ করা। ভোগ্যবস্তুর অভাব যতই বাড়তে থাকবে শ্রমিক কর্মচারীরা যাতে তাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য কিনতে পারে তার জন্য তাদের মজুরিকে ততই বর্ধিত দামের নিকটবর্তী করে আনা দরকার। মুদ্রাস্ফিতির বিষাক্ত চক্রের যুক্তিটি এমনভাবে বলা হয় যাতে মনে হয় যে, শ্রমিক কর্মচারীদের মজুরি বাড়ানেই মুদ্রাস্ফিতি দেখা দেবে কিন্তু মালিক শ্রেণীর হাতে বাড়তি ক্রয় ক্ষমতা নিরাপদ।

এই কৌশলপূর্ণ ইঙ্গিত ও অবগুণ্ঠিত বক্তব্য দেশের অর্থনীতির পক্ষে দুর্বলনাথক। মালিক শ্রেণীর হাতে বাড়তি ক্রয় ক্ষমতা থাকলেও মুদ্রাস্ফিতি দেখা দিতে পারে কারণ তাবজন্য Capital goods এর দাম বাড়ে এবং Capital goods এর দাম বাড়লে ভোগ্যবস্তুর দাম বাড়তে বাধ্য। তাছাড়া মালিক শ্রেণীর হাতে সঞ্চিত বাড়তি ক্রয় ক্ষমতা অত্যাবশ্যক কাটকাবাজীর জন্য যেন যাতে ভিনিষ পত্রের নয় অগ্নিসূত্য ধারণ করে। "This helps to prepare the way for a crash later". আমাদের দেশে এখন যে কারণে ভোগ্যবস্তুর দাম আকাশচুম্বী হয়েছে তা হল মালিক শ্রেণীর হাতে সঞ্চিত বাড়তি ক্রয় ক্ষমতা দ্বারা অত্যাবশ্যক কাটকাবাজীর জন্য মজুত পণ্যের সরবরাহ আরও আগেই হ্রাসিত পড়ত। মুদ্রা যে সকল বিধায়ক বৃটিশ শিলপ প্রতিষ্ঠানগুলির উপর কর্তৃত্ব লাভ করেছেন তাদের আবাধীকৃত মুনাফার পরিমাণই সাড়কোটির বত। ফলেই যেসেশে দ্রুতের মোকাল মুনাফেও উদ্যোগের জন্য রাজ্যপালকে পাওয়া যায় এবং খবরের কাগজে কয়েক ফুট সচিত্র স্থান পাওয়া যায় সেখানে ইচ্ছে করলেই মুদ্রা "বিশ্ববিখ্যাত" হতে পারতেন। যেখানে তাঁর দেশবাসীন (মুদ্রা মাড়োয়ারী) প্রায় একই পদ্ধতি অবলম্বন করে তাঁর চেয়ে কম টাকার মালিক হয়েও লোকসভা, বিধান সভায় স্থান লাভ করেন সেখানে মুদ্রা কি আর "পাদুকি কিপার" হতে পারতেন না ? নিশেন পক্ষে কলিকাতা কর্পোরেশনের বেয়র তো অনায়াসেই হতে পারতেন। কিন্তু মুদ্রা আরও গভীর অনের মানুষ। নীরবকর্মী হওয়াই যে বুদ্ধিমানের কাজ সেটা তিনি খুব ভাল ভাবেই জানেন।

মুদ্রা "কীর্তিবান" পুরুষ। কাজেই তাঁর অভিনানবহল জীবনী আদুরের সঙ্গে লক্ষ্য করা যেতে পারে। কিন্তু আমি অনেক চেষ্টা করেও তাঁর সম্পর্কে খুব বেশী কিছু সংগ্রহ করতে পারিনি। আর ফেইুকুও বা পেয়েছি, মুদ্রা ঘটনাবলী' ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত বিচার বিভাগীয় তদন্তের অধীন থাকায় কলে প্রায় সবটুকু পরিশ্রমণ করতে পারাছিনে। তবে আজ কেউ না জানবেও একজন অন্তত আছেন যিনি মুদ্রার সব খবরই রাখেন। তিনি হচ্ছেন ভারত সরকারের আইন সচিব শ্রীঅশোক সেন।

একেবারে গোড়ার কথা কেউ কিছু বলতে পারেন না। তবেদেখা যাচ্ছে যে, গত যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইসেকষ্ট্রক্যাল ওভূপের ব্যবসায় মুদ্রা কলকাতার প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন এবং যুদ্ধের কয়েক বছরের মধ্যেই তিনি প্রভূত ধনসঞ্চয় করে ফেলেছেন। এর পরই আরম্ভ হয় নিশ্ন ভগতে তাঁর দুর্ধার অভিযান। যুদ্ধ পেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিধ্যাত বৃটিশ ইলেকষ্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং কার্ অনুসার কোম্পানীর কর্তৃত্ব তিনি লাভ করেছেন। এই কোম্পানীর মুনাফা এক কোটী টাকা। এরপর আসে ধবধবে অবধিত বিরাট ইঞ্জিনীয়ারিং কার্ জেনর এণ্ড কোম্পানী। এই কোম্পানীর আদায়ীকৃত মুলধনের পরিমাণই এক কোটি বাইশ লক্ষ টাকা এরপর আসে বিচার্ডসন এণ্ড ক্রডাল ইঞ্জিনীয়ারিং কোম্পনী। বোম্বাই ও মাদ্রাজে এই কোম্পানীর বিরাট কারখানা রয়েছে। কিন্তু মুদ্রা যখন কাপণ্ডকে সুবিশাল ইঞ্জিনীয়ারিং কার্ বৃটিশ ইণ্ডিয়া কর্পোরেশনকে তাঁর করতে আনেন তখন তার মোট মূলধন ছিল চার কোটি ছয় লক্ষ টাকা।

এখন থেকে মুদ্রার ভাগ্যাকাশে কিছু কিছু অশুভ নক্ষত্র দেখা দিতে লাগল। মুদ্রা নানা মামলা মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়তে লাগলেন। কিন্তু মুদ্রা আধকরণ করতে জানেন। তিনি কলিকাতার বিখ্যাত ব্যারিষ্টার অশোক সেনকে যোগ্য দক্ষিণায় তাঁর পরামর্শদাতা নিযুক্ত করলেন। কলকাতার আইনজীবী মহল জানেন যে, মুদ্রা-সেনের এই ব্যবসাগত সম্পর্ক ক্রমশ: গভীর সখ্যতায় পরিবত্ত হয়। যার জন্য শ্রীসেনকে বৈমুপকোম্পানীর অন্যতম ডিরেক্টর নিযুক্ত হতে হয়েছে,দেখা যায়। ভারত সরকারের সঙ্গী নিযুক্ত হওয়ার পূর্বে শ্রীঅশোক সেন এই ডিরেক্টরের পদ ত্যাগ করেন।

ধনপতি মুন্দ্রার বিচিত্র জীবন

[নিজস্ব বাণিজ্য সমালোচক]

ফিরোজ গান্ধীকে জানাম। তাঁরই কৃপায় নোকসভার মারফৎ শ্রীবিবাগন মুদ্রার নাম আজ সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে। মুদ্রা যে বিশাল বাণিজ্যিক সাম্রাজ্য গত বর বছর ধরে গড়ে তুলেছেন তাতে তিনি যদি আত্মগুপ্তাবে একেবারেই নিরুদ্যম হয়ে থাকতেন তবে তাঁর নাম সংবাদ পত্রের মারফৎ আরও আগেই ছড়িয়ে পড়ত। মুদ্রা যে সকল বিধায়ক বৃটিশ শিলপ প্রতিষ্ঠানগুলির উপর কর্তৃত্ব লাভ করেছেন তাদের আবাধীকৃত মুলধনের পরিমাণই সাড়কোটির বত। ফলেই যেসেশে দ্রুতের মোকাল মুনাফেও উদ্যোগের জন্য রাজ্যপালকে পাওয়া যায় এবং খবরের কাগজে কয়েক ফুট সচিত্র স্থান পাওয়া যায় সেখানে ইচ্ছে করলেই মুদ্রা "বিশ্ববিখ্যাত" হতে পারতেন। যেখানে তাঁর দেশবাসীন (মুদ্রা মাড়োয়ারী) প্রায় একই পদ্ধতি অবলম্বন করে তাঁর চেয়ে কম টাকার মালিক হয়েও লোকসভা, বিধান সভায় স্থান লাভ করেন সেখানে মুদ্রা কি আর "পাদুকি কিপার" হতে পারতেন না ? নিশেন পক্ষে কলিকাতা কর্পোরেশনের বেয়র তো অনায়াসেই হতে পারতেন। কিন্তু মুদ্রা আরও গভীর অনের মানুষ। নীরবকর্মী হওয়াই যে বুদ্ধিমানের কাজ সেটা তিনি খুব ভাল ভাবেই জানেন।

মুদ্রা "কীর্তিবান" পুরুষ। কাজেই তাঁর অভিনানবহল জীবনী আদুরের সঙ্গে লক্ষ্য করা যেতে পারে। কিন্তু আমি অনেক চেষ্টা করেও তাঁর সম্পর্কে খুব বেশী কিছু সংগ্রহ করতে পারিনি। আর যেটুকুও বা পেয়েছি, মুদ্রা ঘটনাবলী' ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত বিচার বিভাগীয় তদন্তের অধীন থাকায় কলে প্রায় সবটুকু পরিশ্রমণ করতে পারাছিনে। তবে আজ কেউ না জানবেও একজন অন্তত আছেন যিনি মুদ্রার সব খবরই রাখেন। তিনি হচ্ছেন ভারত সরকারের আইন সচিব শ্রীঅশোক সেন।

একেবারে গোড়ার কথা কেউ কিছু বলতে পারেন না। তবেদেখা যাচ্ছে যে, গত যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইসেকষ্ট্রক্যাল ওভূপের ব্যবসায় মুদ্রা কলকাতার প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন এবং যুদ্ধের কয়েক বছরের মধ্যেই তিনি প্রভূত ধনসঞ্চয় করে ফেলেছেন। এর পরই আরম্ভ হয় নিশ্ন ভগতে তাঁর দুর্ধার অভিযান। যুদ্ধ পেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিধ্যাত বৃটিশ ইলেকষ্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং কার্ অনুসার কোম্পানীর কর্তৃত্ব তিনি লাভ করেছেন। এই কোম্পানীর মুনাফা এক কোটী টাকা। এরপর আসে ধবধবে অবধিত বিরাট ইঞ্জিনীয়ারিং কার্ জেনর এণ্ড কোম্পানী। এই কোম্পানীর আদায়ীকৃত মুলধনের পরিমাণই এক কোটি বাইশ লক্ষ টাকা এরপর আসে বিচার্ডসন এণ্ড ক্রডাল ইঞ্জিনীয়ারিং কোম্পনী। বোম্বাই ও মাদ্রাজে এই কোম্পানীর বিরাট কারখানা রয়েছে। কিন্তু মুদ্রা যখন কাপণ্ডকে সুবিশাল ইঞ্জিনীয়ারিং কার্ বৃটিশ ইণ্ডিয়া কর্পোরেশনকে তাঁর করতে আনেন তখন তার মোট মূলধন ছিল চার কোটি ছয় লক্ষ টাকা।

এখন থেকে মুদ্রার ভাগ্যাকাশে কিছু কিছু অশুভ নক্ষত্র দেখা দিতে লাগল। মুদ্রা নানা মামলা মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়তে লাগলেন। কিন্তু মুদ্রা আধকরণ করতে জানেন। তিনি কলিকাতার বিখ্যাত ব্যারিষ্টার অশোক সেনকে যোগ্য দক্ষিণায় তাঁর পরামর্শদাতা নিযুক্ত করলেন। কলকাতার আইনজীবী মহল জানেন যে, মুদ্রা-সেনের এই ব্যবসাগত সম্পর্ক ক্রমশ: গভীর সখ্যতায় পরিবত্ত হয়। যার জন্য শ্রীসেনকে বৈমুপকোম্পানীর অন্যতম ডিরেক্টর নিযুক্ত হতে হয়েছে,দেখা যায়। ভারত সরকারের সঙ্গী নিযুক্ত হওয়ার পূর্বে শ্রীঅশোক সেন এই ডিরেক্টরের পদ ত্যাগ করেন।

বহুবার বিভিন্ন বৃটিশ শিলপ প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্ব লাভ করতে মুদ্রাকে প্রভূত অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে। মুদ্রা এই অর্থ পেলেন কোত্থেকে ? ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া মুদ্রাকে প্রভূত টাকা ওভার-ড্রাফ্ট দিয়েছেন। শোনা যায় কয়েকটি বৃটিশ এজেন্সির ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষের সঙ্গেও মুদ্রার গভীর বন্ধুত্ব রয়েছে।

নোকসভায় ফিরোজগান্ধীর অভিযোগে জানা যায় যে মুদ্রা লাইফ ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশন থেকে এক কোটী ছাপান্ন লক্ষ টাকা আদায় করেছেন। তিনি বলেন যে এই বাবদ লাইফ ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশনের প্রভূত লোকসান হবে। কিন্তু অর্থসচিব শ্রী টি, টি কৃষ্ণমাচারী বলেন যে পলিসি যোল্ডারদের স্বার্থের কথা বিবেচনা করেই মুদ্রার বিভিন্ন কোম্পানীর শেয়ার কেনা হয়েছে। কিন্তু পরে দেখা যায় যে, যে তারিখে লাইফ ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশন এই শেয়ারগুলো কিনেছিলেন ঠিক সেই তারিখেই এই শেয়ারগুলির

বোম্বাই হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রী সি চাগলাকে নিয়ে গঠিত কমিশনের সমুখে মুদ্রা বীমার সংস্থার ৬টি কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় সম্পর্কে জীবন বীমা কর্পোরেশনের সেনেদের ব্যাপারের অভিযোগ সম্পর্কে তদন্তকাজ সুরু হয়েছে। ২০শে জানুয়ারী প্রথম দিন শ্রীফিরোজ গান্ধী সাক্ষ্যগ্রহণকালে বলেন যে জীবন বীমা কর্পোরেশনের অর্থ অন্যায়ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। শ্রীমুক্ত গান্ধী দৃঢ়তার সঙ্গে এই অভি অভিযোগও করেছেন যে, অর্থব্যয়ের "আগা থেকে গোড়া" পর্যন্ত প্রত্যেকেই এই বিশেষ সংস্থার কার্যকলাপের বিষয় ভালভাবেই জানত। তৎসত্ত্বেও কর্পো-রেশনের অর্থ দিয়ে এইভাবে ছিনিমিনি খেলা হঁচ্ছে কি করে এটাই আশ্চর্য্য। জীবন বীমা কর্পোরেশনের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীএস এস বৈদ্যনাথনের সাক্ষ্যদানও সুরু হঁয়েছে। এই লেখা প্রেসে যাওয়া পর্যন্ত সংবাদ পাওয়া যায় শ্রীমুক্তার ক্রাশ পড়েছে। তাঁর সাথে সমন জারী করা হয়েছে কমিশনের সমুখে সাক্ষী দেওয়ার জন্য।

ব্যাঙ্গার রস লাইফ ইন্সিওরেন্স করপোরেশন কর্তৃক ক্রীত ধানের চেয়ে ৩১ লক্ষ ১০ হাজার ১২৫ টাকা কম ছিল। ফিরোজগান্ধীর অভিযোগের গুরুত্ব এত বেশী ছিল যে ভারত সরকার একটি তদন্ত কমিটি নিয়োগ করতে বাধ্য হয়েছেন। এই কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হলে বিস্তির অনসাধারণ যে চাকুলাকর তথ্য জানতে পারবে বলে আশা করা যায়।

কিন্তু এতদসত্ত্বেও মুদ্রা পরিচিত মহল বলেন যে মুদ্রা অধিচিনিত আছেন। অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি তাঁর 'মানিক জীবন' অনুসরণ করে থাকেন। বস্তুত: মুদ্রা 'ধার্মিক' লোক। নিত্যন্ত অসাধা না হলে তিনি পরস্ত্রীকে নিয়ে শোবন না করে কোন কিছু স্পর্শ করেন না। তিনি বিবাহবিরোধী এবং কোন প্রকার নেশার অধীন নয়েন। সিনেকের বৃত্তি পরে গঙ্গাজল হাত্য শৌত মেজেতে আসনে বসে তিনি সাত্ত্বিকভাবে আহারাদি করেন। তিনি অত্যন্ত মনাবাণী ও বিনয়ী ভদ্র-লোক। হিন্দী, ইংরাজী ও গুজরাটী তিনি অনর্গল বলতে পারেন। মাত্র ৩৭ বছর বয়সে তিনি যে 'কর্ণেসির' পদবির বিষেছেন ভারতীয় বহ্নাগরীদের মধ্যে তার তুলনা নেই।

পরিচ্ছন্ন ভ্রমণ

বড় বড় ষ্টেশনে বিনা খরচে কামরা পরিষ্কার করান যায়। পরিষ্কারকারীর সহায়তা নিলে যাত্রীরা নিজেরাই পরিচ্ছন্ন পরিবেশে যেতে পারেন। পরিচ্ছন্নতার কাজে সাহায্য করুন।

দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ

নির্মম বিশ্বাসঘাতকতা ঃ কার ষড়যন্ত্র

পূর্ববঙ্গ সরণার্থীদের পুনর্বাসন সম্পর্কে সরকারী নীতিতে একটা গুরুতর পরিবর্তন আসন্ন বলে মনে হয়। পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা এবং আসামকে নিয়ে গঠিত পূর্বাঞ্চলে পুনর্বাসনের জন্য উদ্বিগতে আর পরণার্থী পুরণ করা হবে না, শুধু যে এটাই ইতিমধ্যে স্থির হয়ে গেছে তাই নয়, তার চেয়েও গুরুতর ব্যাপার হচ্ছে এই যে উদ্বিগতে পূর্বঙ্গ থেকে আগত পরণার্থীদের সর্বপ্রকার পুনর্বসতির সুযোগ থেকে বঞ্চিত করার একটা চেষ্টা আরম্ভ হয়ে গেছে।

৪৭ সালের প্রতিশ্রুতি কোথায়?

(প্রবন্ধ)

পঃ বঙ্গের লোকসভা সদস্য

শ্রীবিমল কুমার ঘোষ

সরকার কেন যে তাদের নীতির গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্ত্তন সাধনের জন্য বর্তমান সময়টাকে বেছে নিয়েছেন তার সঠিক কারণ অনুধাবন করা কঠিন। তবে একথা সত্য যে কিছু দিন যাবৎ এধরনের নীতি পরিবর্তনের যৌক্তিকতা প্রতিপাদনের জন্য সমিশিতভাবে একটা পুচেষ্টা চলেছে। পঃ বঙ্গের কংগ্রেসী এবং পিসের এক সভায় এই প্রশ্ন প্রথম উত্থাপিত হয়। তার পর পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির এক সভায় এই প্রশ্ন আলোচিত হয় এবং নেইথানে ইউনিয়ন পুনর্বাসন মন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন; সর্বশেষে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত বিভিন্ন রাজ্যের পুনর্বাসন মন্ত্রীদের বাষ্টিমিঃ সম্মেলনেও এই প্রশ্ন আলোচিত হয়েছে। এই সম্মেলনের এই অভিমত প্রকাশ করা হয় যে এখন একটা নির্দিষ্ট তারিখ স্থির করা হোক যার পরে পূর্বঙ্গ থেকে আগত পরণার্থীরা আর কোন পুকার পুনর্বাসনমূলক সুযোগ সুবিধার অধিকারী হবে না।

এখন পর্যন্ত ভারত সরকারের মনোভাব পরিষ্কারভাবে জানা যায়নি। বিভিন্ন উপরিউক্ত সম্মেলনগুলিতে পুকাশিত ইউনিয়ন পুনর্বাসন মন্ত্রীর বক্তব্যও তাঁর ব্যক্তিগত বক্তব্যই বলে তিনি সংবাদপত্রে মত পুকাশ করেছেন, তথাপি একথা ধরে নেয়া যায় যে কেন্দ্রীয় সরকার সম্ভবতঃ কংগ্রেস হাই কমাণ্ডের সম্মতি ব্যতিরেকে তিনি অথবা পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস এম-পিরা এই ব্যাপারে উদ্যোগী হতেন না। এই সম্পর্কে আমরা লোকসভাতে যে মুলতুবী পুস্তাব আনার চেষ্টা করেছিলাম তার জবাবে পুধান মন্ত্রী যে উত্তর দেন তা থেকেই উদ্বাস্তদের সম্পর্কে এই নূতন নীতি পুরোপুরি কেন্দ্রীয় সরকার অথবা পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কে পুথম উদ্যোগী হয়েছিলেন তা সঠিক বোঝা যায়নি। কিছুটা অনাবশ্যক উত্তেজনার সংগে পুধান মন্ত্রী বলেছিলেন, "ভারত সরকার অথবা কোন জাতীয় নেতা পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তদের অনির্দিষ্ট কাল ধরে সাহায্য করবেন এমন পুতিশ্রুতি দিয়েছেন বলে আমার জানা নেই। এটা একটা অসত্য কথা। বস্তুত, ইহা করা মোটেই সম্ভব নয়।"

স্বভাবতই কয়টি পুশ্ন আসে। পূর্বঙ্গ পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে কখনও কি কোন পুতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল? দিয়েছিল; যদি দেয়া হ'য়ে থাকে তা হলে কি ভারতবর্ষের পক্ষে তা পালন করা সম্ভব? তৃতীয়তঃ, অধুনা এমন কি কারণ ঘটল যার জন্য পূর্ববঙ্গ থেকে আগত লোকদের সাহায্য বন্ধ করার পুস্তাব হচ্ছে?

১৯৪৭ সালের ২৬শে নভেম্বর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি নিম্নলিখিত পুস্তাবটি গ্রহণ করেন :—

"পাকিস্তান থেকে যে সকল অধুসলমান নাগরিক সম্মান ও জীবন বাঁচাবার জন্য ভারতবর্ষে আশ্রয়ের কংগ্রেস তাদের কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করতে বাধ্য"। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট তারিখে পুধানমন্ত্রী পাকিস্তানের পৃথ্যালঘুকে আশ্বাসের অংশ এবং চিরকাল তাই থাকবে। আশ্বাসের ভাগ্যে মাত্র দুটক না কেন, আমরা বধাবর্তই তাদের সুখ দুঃখের ভাগী হব।" ঐতিহাসিক সর্ভার প্যাটেল বলেন, "পাকিস্তান ওখানে আমাদের যে সব ভাইবোনরা রয়ে গেলেন, তাঁরা যেন মনে না করেন যে তাঁদের কথা আমরা ভুলে গেছি। তাঁদের মঙ্গলের পুতি আমাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকবে এবং এই আশাই আমরা করতে থাকব যে অচিরেই আমরা আবার মিলিত হব।" ১৯৪৭ সালের আগষ্ট মাসে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হলে যে সভা হয় তাতে সর্দার প্যাটেল এই বাণীটি পুেরণ করেন :—

সকলে সববেতভাবে যে স্বাধীনতা আমরা লাভ করেছি যদি উহার ও পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা তার অংশ না পান তবে সেই স্বাধীনতা আমরা পুরোপুরি ভোগ করতে পারবনা। পরাধীনতার গৃঙ্খল মোচনের জন্য তাঁরা সানন্দে যে দুঃখ বরণ করেছেন তা কেবল করে আমরা ভুলব? পূর্ববঙ্গে যা ঘটবে তার পরিপ্রেক্ষিতে সেখানকার সংখ্যালঘুদের মঙ্গলের কথা ভারতবাসীর এবং ভারত সরকারের গভীর মনোযোগ আকর্ষণ করবে।"

উপরে যে সকল বিবৃতি উদ্ধৃত হ'ল তাতে কি সরকার কোন সীমা নির্ধারণের ইঙ্গিত আছে? দেশ বিভাগের সময় পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে সর্বপ্রকার পুতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল। তাদের সংগে যে "পবিত্রচুক্তি" করা হ'য়েছিল তা তাবাদি হয়ে যাবে এমন কথা তো তখন বলা হয়নি। এই সকল পুতিশ্রুতির কথা বিবেচনা করলে সম্পত্তি লোকসভায় পুধানমন্ত্রী যে বিবৃতি দিয়েছেন তা শুধু বিসময়করই নয়, বেদনাদায়ক বলেও মনে হতে বাধ্য।

পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘুদের যে পুতিশ্রুতি দেয়া হ'য়েছিল তা পালন করতে কি অসুবিধা আছে দেখা যাক, যদিও এ প্রশ্ন এখন তোলা নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক। বলা হচ্ছে যে শুধু পশ্চিমবঙ্গেই নয়, পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতেও আর স্থান নেই। একথা যে সত্য নয় তা অনেকেই পুধানমন্ত্রী দেখিয়ে দিয়েছেন। যদি একে সত্য বলেও ধরে নেয়া যায় তা হ'লেও দেখা যাচ্ছে পরণার্থীদের পুর্বসতির জন্য গভর্ণমেণ্ট অন্যান্য অঞ্চলে স্থান সন্ধান করছেন। ধণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। উদ্বাস্তদের জন্য সারা ভারতে আর স্থান নেই, একথা তো আর বলা যায় না। এর পরে আসে টাকার কথা। হিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতে উদ্বাস্তদের জন্য গভর্ণমেণ্ট টাকা বরাদ্দ করেছেন। সেই টাকার অল্প ছাড়িয়ে বাড়বার সম্ভাবনা তো এখনও দেখা যায় নি, এদের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা সাহায্যের পুশ্নও তো আসেনা। আর বলা হচ্ছে যে পাকিস্তানে এঁরা যেভেতু শান্তিপূর্ণ আবহাওয়া ফিরে এলে সংখ্যালঘুদের ভারতে আসার আর দরকার কি? কি ক'রে পারে? সম্পত্তি পাকিস্তানে যুক্ত নির্বাচন উপলক্ষ্যে সংখ্যালঘুদের পুতি সংখ্যাগুরু সম্পুদায়ের মনোভাব স্পষ্ট বোঝা গেছে। যারা দশ বছর ধরে শত কষ্ট সহ্য করেও পাকিস্তানে আছে তারা যে নিতান্ত চাপে না পড়লে দেশ ছাড়বে না এটা তো সহজেই অনুমেয়। আবহা তো তখন বড় ধরণের পুতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে চিরকালই আমরা সংখ্যালঘুদের সুখদুঃখের পুতি নজর রাখব। এখন কথা ফিরিয়ে নেয়াটা কি চরম বিশ্বাসঘাতকতা নয়? আমরা কি সত্যই এত নীচে নেমে গেছি? আরও একটা যুক্তি তোলা হয়েছে; বলা হচ্ছে যে বুধ, শিখ অথবা খৃষ্টিয় আফ্রিকা থেকে ভারতীয়দের যেমন ভারতবর্ষে এসে বসতি করতে চাইলে গভর্ণমেণ্ট কোন সাহায্য করেন না কিম্ব বাধাও দেন না, পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘুদের বেলাতেও তাই কেন হবে না? এটা যে একটা অতি বাজে যুক্তি তা যে কেউ বুঝতে পারে। ঐ সকল দেশ থেকে যারা আসে তারা তাদের পুরণ বা অন্যান্য সম্পত্তির মূল্য নিয়ে আসতে পারে। কিন্তু পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘুরা তো কিছুই নিয়ে আসতে পারে না এবং ভারত সরকার তার কোন পুতিকারও করতে পারেন না। আরও বলা হয় পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যালঘুরা পূর্ব পাকিস্তানে এসে নিজেদের স্থান সংকুলান করে নিয়েছে; পূর্ববঙ্গের লোকেদের বেলায় তা হয়নি। কিন্তু পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘুরা পশ্চিমবঙ্গে এসে যে তা করেনি, ভারতবর্ষ কি তার জন্য তাদের কাছে ঋতজ্ঞ নয়? আরও একটা যুক্তি তোলা হচ্ছে, সেটা হচ্ছে এই যে অন্য দেশ থেকে সংখ্যালঘুরা এসে যদি বসাবসর ভারতের সরকারী সাহায্য পায় তবে ভারতের স্থায়ী বাসিন্দাদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা যাবে। এর মধ্যে যে কিছু সত্যতা আছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু কয়েকজন নেতাই তো এই অসন্তোষ জানিয়ে তুলছেন। দেশের লোককে যদি পাকিস্থানের সংখ্যালঘুদের পুতি ভারতের যে দায়িত্ব আছে তা ভাল করে বুঝিয়ে বলা যায় এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা গুলি তাড়াতাড়ি কার্যে পরিণত করে দেশবাসীর আর্থিক মান উন্নয়ন করা হয়, তা হলে এই অসন্তোষ কমে যেতে পারে।

তাহলে দেখা যাক কেন এখনই উদ্বাস্তদের সম্পর্কে নূতন নীতি নির্ধারণের কথা উঠছে। সরকার এখনই উদ্বাস্তদের মাইগ্রেশন সার্ভে রিপোর্ট দিতে খুব কড়াকড়ি করছেন। ফলে এখন মাসে চারশর বেশী উদ্বাস্ত আসছেন। ১৯৫৬—৫৭ সালে কেন্দ্রীয় পুর্বাঞ্চলীয় দপ্তর যে বার্ষিক রিপোর্ট পুকাশ করেছেন তাতে বলা হ'য়েছে যে হিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পুতি বছর ২০ হাজার পরিবার পূর্ববঙ্গ থেকে ভারতে আসবে এরূপ আশা করা যায়। পরিকল্পনার দুঃখ জন্য পরিষিত অর্থও বরাদ্দ করা হয়েছে। ঐ রিপোর্টে বলা হয়েছে যে পরিকল্পনার তিন বছর গেলে এই সময়াটিই পুনর্বিবেচনা করা হবে এবং দরকার হলে আরও অর্থ বরাদ্দ হবে। সেই সময় তো এখনও আসেনি। আর বর্তমানে যে হারে উদ্বাস্ত আসছে তাদের সংখ্যা তো পরিকল্পনায় ধার্য সংখ্যার চেয়ে অনেক কম। পরিকল্পনা মধ্যে করা হয় তখন তো ভবিষ্যতে উদ্বাস্তকে আসতে দেয়া হবেনা এমন কথা চিন্তা করা হয়নি।

তাহলে এমন কি কারণ ঘটল যার জন্য পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তদের বন্ধুত্বই দেখানো হচ্ছে? গত সাধারণ নির্বাচনের সময় উদ্বাস্তরা কমতার আসীন দলকে সমর্থন না করে যে অপরাধ করেছে তাদের কি তার জন্য এই ভাবে শাস্তিদেয়া হচ্ছে?

স্থানীয় এবং বৈদেশিক যাতায়াতে, সকল প্রকার ভ্রমণ ব্যাপারে এবং বৈদেশিক মুদ্রা ইত্যাদির জন্য

প্যামার্জ্জ কোং,
ভ্রমণ ব্যবস্থাপক,
৩০-বি চৌরঙ্গী রোড,
কলিকাতা-১৬
ফোন: ২৩ ১১৭০
Gram: EGRUNAP

গ্রাম: Megolim ফোন: ২২-৩১-৮১ (৭ লাইন)

কারখানা: শ্যামনগর, পূর্ব রেলপথ।

দি ন্যাশনাল ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল কেবল কোং অফ্ ইণ্ডিয়া লিঃ

"টিফেন হাউস", ৪, ডালহৌসি স্কোয়ার ইষ্ট, কলিকাতা-১

বেতার কনসার কণ্ডাক্টর, সলিড এবং ট্রাফেড্ এ-সি-এফ-আর এবং সবপ্রকার অ্যালুমিনিয়াম কণ্ডাক্টর, বাবার ইন্সুলেটেড কেবল, কটন কভার্ড এবং অ্যালুমিনিয়াম তার ইত্যাদির পুস্তুতকারক।

উপরুক্ত কি-এফ্ এবং আর আই স্পেসিফিকেশনের অনুরূপ সকল পুকার বৈদ্যুতিক ব্যাপার।

ম্যানেজিং এজেণ্টস্: অ্যাসোসিয়েটেড্ ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ডিভলপমেণ্ট কোং প্রাইভেট লিমিটেড্।

ভাঙ্গনের মুখে পঞ্চদলীয় আঁতাত

(নিজস্ব রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক)

গত সাধারণ নির্বাচনের পূর্ব বৎসরে মাত্র এক বছর আগে, পাঁচটি প্রধান বামপন্থী দলের নির্বাচনী আঁতাতে যে রাজনৈতিক আশার সঞ্চার করেছিল, এখন বিধান সভার বিরোধী আসনগুলি কার্যতঃ ঠিক তার বিপরীত একটি চিত্র উপস্থিত করছে।

নির্বাচনী আঁতাত আরও দৃঢ়ীভূত হওয়ার পরিবর্তে কার্যক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই এদের ঐক্য আরও শিথিল হয়ে এসে গেছেই বরং অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে তাদের পরস্পর বিরোধী নীতি এবং ভূমিকা প্রকাশ্যে ধরে পড়েছে।

সাধারণ নির্বাচনের অব্যবহিত পরেই কলিকাতা কর্পোরেশনের অন্তর্বাবর্তীকালীন নির্বাচনে যোগদান ব্যাপারে যে দ্বন্দ্ব প্রকাশ হয়েছিল, তার জের টেনে এখনও পর্যন্ত চলছে। ব্যাপক ভাবে শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল সেন এবং কমুনিষ্ট পার্টির নিশার অবতীর্ণ হয়। বিধান সভার বিরোধী বেঞ্চগুলি বেজন নির্বাচনের প্রশ্নে দ্বিধাবিভক্ত আছে। তীব্র হয়ে গেছে এবং [illegible] প্রতিফলিত হয়েছে।

[illegible] ভাবিকল্পের গতির মধ্যেকার কমুনিষ্ট পার্টি কে-কোন পর্যবেক্ষকের কাছে [illegible] স্পষ্ট যে, ফরোয়ার্ড এবং বিপ্লবী [illegible] শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল সেনের যার বন্দ্যোপাধ্যায় [illegible] পশ্চিমবঙ্গে একটা ঠুনকো ভূমিকা [illegible] নেহেরিনে—বিধান সভায় প্রধান [illegible] তিনি কমুনিষ্টপার্টি কে [illegible] সন্তান ও প্রিভিলেজের দ্বারা [illegible] আসনে বসিয়ে দিলেন। [illegible] পার্টির দল ঐক্যের উদ্দীপনা [illegible] বিধান সভার প্রধান প্রবেশ [illegible] এবং যখন বাইরে নির্বাচক [illegible] যুদ্ধ বাধবা ছিল, সে [illegible] একটা) ঐক্যবদ্ধ এসেম্ব্লী [illegible] হয়ে, ঠিক সেই সময় শ্যামা [illegible] শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় "বিরোধী পার্টি রূপে" সরকারী স্বীকৃতি দিলেন পূর্বকথিত কমুনিষ্ট দমনে। এবং তাঁর স্বতাবসিদ্ধ বাক্চাতুর্যের দ্বারা শ্রীমোহিত বন্ধুকে অভিন্ন ক'রে, তাঁকেই বিরোধী নেতার মর্যাদায় ভূষিত করলেন। এর পরে আজ পর্যন্ত বিধান সভায় দেখা গেছে যে এর পিছনে শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটা সুচিন্তিত নীতিই কাজ ক'রেছে এবং তিনি আগাগোড়া, যে কোন বক্তৃতায়, বিবৃতিতে, এবন কি সভার সাধারণ আলাপ আলোচনার সময়ও শ্রী বসুকে একটু নরম, একটু বেশী বিনয়ী, একটু অতিরিক্ত শ্রিভিলেজযুক্ত ব্যবহারে প্রীত দেখেছেন। যদিও আইনত বিরোধী নেতাজ্ঞানে শ্রী বসু অতিরিক্ত মর্যাদার অধিকারী, তথাপি একথা সুস্পষ্ট যে, এই ব্যবহার বৈষম্যই এক কথায় পঞ্চদলীয় আঁতাতের মধ্যেও একটা কৌলিন্যভেদ সৃষ্টি করেছিল।

স্বভাবতই, প্রধান বিরোধী দল কমুনিষ্ট পার্টি'কে এই সৌজন্যের প্রতিদান দেখাতে হয়েছে। এবং সেই সঙ্গে কেরালা ও কমুনিষ্ট পার্টির সর্বভারতীয় নীতি শ্রীযুক্ত বসুকে অন্যান্যের তুলনায় ক্রমশঃ চাইনে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছে। এর প্রথাব বিগত বিধান সভার অধিবেশনে কমুনিষ্ট পার্টি'র বক্তৃতাগুলি থেকে অল্পস্ব পাওয়া যাবে। আর, এরই প্রতিক্রিয়ার এটা সহজেই অনুমান করা যায়, ফরোয়ার্ড ব্লক এবং আর এস পি উপ্তত্ত বামপন্থী ভূমিকা নিয়েছেন। পি এস পি এই দুইয়ের মাঝখানে যদিও ডাঃ ঘোষ ও শ্রীযুক্ত সুবোধ ব্যানার্জির স্ট্রোঙ্গ নেতৃত্বের ফলে কতকটা ঢিলা গতিতে অগ্রসর হয়েছে, তথাপি অন্তাবধান নির্বাচনে কমুনিষ্ট পার্টি'র দ্বারা ডুবিকাহত শ্রীযুক্ত সুধীর রায় চৌধুরী এই যুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছেন। বিগতদী নেতার বেতন নির্ধারণের পূর্বে শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল সেন বাহাদুরীর কমুনিষ্ট পার্টিকে যাবাহকভাবে প্রতিবেধক দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন এবং তাঁর বক্তৃতায় এই সুস্পষ্ট অভিযোগ ছিল যে কমুনিষ্ট নেতা কংগ্রেসের "চোপ নিয়েছেন।" এবিষয়ে সন্দেহ নেই যে, সম্ভবতঃ ঘটনা পারম্পর্যের জন্যই শ্রীযুক্ত রায় চৌধুরীর বক্তৃতা অনলিতে যথেষ্ট বাগ কেটেছিল। কমুনিষ্ট পার্টি কে ইয়ানীং এডবড় মার কখনো খেতে হয়নি।

অন্যদিকে এসেম্ব্লীর বাইরে, বামপন্থী পত্রিকাগুলির পক্ষ থেকে সমস্যা-নীড়িত মানুষের দুঃখ দুর্দশা লাঘবের জন্যে কোন আন্তরিক চেষ্টা বা ঘোরালো আন্দোলনও দেখা যেনানি। এর কলেই একদিকে যেসনটী এবং অন্যদিকে কোনো কোনো বামপন্থী দলের মধ্যে নৈরাশ্য ও বিক্ষোভ ক্রমশঃ গভীর হ'য়ে উঠতে থাকে। প্রধানতঃ ধান্য ও উদ্বাস্তু সমস্যা সম্পর্কে রীতি নীতি ও আন্দোলনের পদ্ধতি কি রকম হবে তাই নিয়েই মতবৈষম্য দেখা যেন। কমুনিষ্ট পার্টি ও বি-এস-পি'কে বাদ দিয়েই সপ্তদি আর এক নতুন পঞ্চদলীয় আঁতাত গঠনের চেষ্টা অনেক অনুসর হয়েছে। ফরোয়ার্ড ব্লক, আর এস পি, এস, ইউ, সি, আর সি পি ও বলশেভিক পার্টি এই আঁতাতে যোগ দিয়েছেন বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে। অর্থাৎ পার্টি আঁতাত সম্পূর্ণভাবে নূতন প্যাটার্নে সাজানোর চেষ্টা চলেছে। ধান্য ও উদ্বাস্তু সঙ্কট প্রতিরোধকল্পে ন্যূনতম দাবীর ভিত্তিতে গণ-আন্দোলন সুরু করার উদ্দেশ্যে এই যুক্ত ফ্রন্ট গঠন করা হয়েছে। অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট বামপন্থী দল গুলোর এই আঁতাতের কলে কতখানি কি কাজ হবে সে বিষয়ে অবশ্য সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। কমুনিষ্ট পার্টি ও পি, এস, পি বিনাই কোনো গণ আন্দোলন সুরু হবে সর্বসাধে তা অন্তর্ভুক্ত হওয়া যে কতিন একথা বোঝা যোটেই শক্ত নয়।

বিছুদিন আগে যাওড়ার ফরোয়ার্ড ব্লকের বার্ষিক অধিবেশনে প্রগেশিক ফরোয়ার্ড ব্লকের সভাপতি শ্রীবিভূতি ঘোষ, এম এস সি, কমুনিষ্ট পার্টি সম্পর্কে যে মন্তব্য ক'রেছেন তা থেকেই কমুনিষ্ট দলের প্রতি তাঁদের মনোভাব রীতিমত খাঁজালো ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। ফরোয়ার্ড ব্লক মনে করেন যে কমুনিষ্ট পার্টি বার্ষসাধনে বিশ্বাসী হয়েও বিপ্লবে বিশ্বাসী নয়। কোনোরূপ বিক্ষোভ সৃষ্টি না ক'রে শান্তিপূর্ণ উপায়ে যতটা আন্দোলন চালান যায়—এই তাদের মনোভাব। এছাড়া, ফরোয়ার্ড ব্লকের ধারণা কমুনিষ্ট পার্টি কংগ্রেস সরকারের অনেক রীতি নীতি ও কর্মপ্রায়ও সমর্থন করে চলেছে। কমুনিষ্ট পার্টি সম্পর্কে ফরোয়ার্ড ব্লক দলের যেখানে এই প্রকাশ্য অভিমত, সেখানে বিরোধ যে কতদূর বেঁধে উঠবে এতে আর আশ্চর্য্য কি!

এ ছাড়া এই নূতন আঁতাত গঠনে এম ইউ সি নেতা শ্রীসুবোধ ব্যানার্জী এর এস এবং অনেকখানি হাত আছে। সংসৃষ্টি নানা মহলে এটা আজ স্ববিদিত। শ্রী ব্যানার্জী গত সাধারণ নির্বাচনকালে কমুনিষ্ট দলের সঙ্গে কোনরকম আঁতাতের তীব্র বিরোধী ছিলেন। নির্বাচন ও তার পরবর্তী কালে ঐ আঁতাতকে কাটস করবার জন্যে তাঁর চেষ্টার কোনো ত্রুটী ছিল না। এবারে তাঁর কৌশল অনেকটা সফলকাম হয়েছে বলা যেতে পারে। নির্বাচন কালে যারা ছিল বৈরী এমন দুটো দলকে কমুনিষ্ট পার্টি থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে তিনি নতুন বামপন্থী ফ্রন্ট গঠনে বিশিষ্ট অংশ নিয়েছেন।

পি-এস-পি'ও যাতে কমুনিষ্টদের সঙ্গ ত্যাগ করে পার্টি'র ভিতরে ও বাইরে তার চেষ্টা চলেছে। পি-এস-পি যদি কমুনিষ্ট পার্টি থেকে বিচ্ছিন্ন হয় তাহলে কমুনিষ্টদের সঙ্গে পঞ্চ আঁতাতের অবশিষ্ট থাকে মাত্র মার্কসবাদী ফরোয়ার্ড ব্লক। এ চেষ্টা যদি সফল হয় তাহলেও নতুন ফ্রন্টের কোন কোন দলনেতার কমুনিষ্ট পার্টিকে 'একঘরে' ক'রে রাখার অভিপ্রায় প্রায় সফল হবে।

বিধান সভার আসন সংখ্যার বিচারে দেখলে আর এস পি খুব একটা বড় দল নয়, তবে এস-ইউ-সি থেকে বড়। আর এস পি কমুনিষ্টদের সঙ্গে যাবতীয় কোনদিনই পছন্দ করেনি। তবে অবস্থাগতিকে কমুনিষ্টদের সঙ্গে তাঁদের কিছুকাল "ঘর" করতে হ'ল বাধ্য। পল্চিম বঙ্গ বিধান সভার বিরোধী দলনেতার বেতনের ব্যাপার নিয়ে একদিকে কমুনিষ্ট পার্টি এবং অন্যদিকে যুগান্তর পত্রিকা এস-ইউ-সি ও আর-এস-পি'র মধ্যে যে বিতর্কের সৃষ্টি করেছিল, তাতেই আর-এস-পি নেতা শ্রীযতীন চক্রবর্তী প্রকারান্তরে কমুনিষ্ট-বিরোধী বিতর্কের সূত্র শ্রীসুবোধ ব্যানার্জির সহায় হন। আর-এস-পি'র যে কমুনিষ্ট পার্টির সঙ্গে ঠিক খাপ খাচ্ছে না, এটা তখন থেকেই বেশ পরিস্কার হ'য়ে উঠতে থাকে এবং এর কয়েক সপ্তাহ পরই আর-এস-পি এর কমুনিষ্ট আঁতাত থেকে সরে দাঁড়ায়।

পি-এস-পি'র মধ্যে নানা উপদলের উপস্থিতি সত্ত্বেও এর একটা সামগ্রিক অভিন্ন যে কিভাবে বজায় আছে, সেটা একটা প্রথম শ্রেণীর রাজনৈতিক বিস্ময়। যোটামুটি দুইটি মতবাদের ভিত্তিতে এই পি-এস-পি'র যে দ্বন্দ্ব বর্ষবৈচিত্র্যকে ঘিরে সাজানো যায় তাহলে একটির নেতৃত্ব করছেন, ডাঃ ঘোষ। অন্যটির অর্থাৎ যারা অপেক্ষাকৃত উগ্রপন্থী এবং এ্যান্টি-কমুনিষ্ট, লেটার নেতৃত্বে এখনও শ্রীসুবোধ রায় চৌধুরী।

আমার উপলব্ধির ভিত্তিতে যদি লেখা যায় তাহলে একটি নেতৃত্ব করেন ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (পূর্বের কৃষক প্রজা বামপন্থ) এবং অপরটির নেতৃত্ব করেন শ্রীনিবারণ ব্যানার্জি ও নরেন সেন (সোসালিষ্ট পার্টি)। এছাড়া আরও দুটি উপদল আছে। এর একটার নেতৃত্ব করেন শ্রীসুশীল দাস এবং অপরটির নেতৃত্ব করেন শ্রীমনিবরণ রায় (পূর্বের চরম বামপন্থীনেতাদের অন্যতম)। কমুনিষ্ট—পি-এস-পি সম্পর্ক এখনও খটুট আছে বলে মনে হলেও সে সম্পর্কের গ্রন্থি যে ক্রমশঃ শিথিল হচ্ছে এটা বুঝতে কষ্ট হয় না। ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষের চেষ্টা সত্ত্বেও দলের অনেকেই ক্রমশঃ কমুনিষ্ট পার্টির বিরুদ্ধে ক্ষোভের হচ্ছেন। শ্রীসেবেন সেন যে কোনো দলে আছেন এটা সচরাচর মনে হয় না। তিনি পি-এস-পি'র নেবার জুৎই নিয়েই ব্যস্ত থাকেন বেশী। (শ্রীপিবনাথ ব্যানার্জিও একজন পুরিক নেতা বটে; কিন্তু হাওড়ার তাঁর নিজের এলাকাতেও পুরিকদের উপর তাঁর প্রভাব অব্যাহত আছে ব'লে আর মনে হয় না)। একথাত্র শ্রীসেবেন সেনের জুৎই ছাড়া অপর কোন জুৎপে যে এঁদের কার্যকলাপ বিধৃত তা বাইরে থেকে বড় একটা মালুম হয় না। পল্চিম বঙ্গে কয়েকটি বিশিষ্ট অঞ্চলের মধ্যেই এ দলের প্রভাব সীমাবদ্ধ ব'য়েছে। আশেনে এ সর্বভারতীয় পার্টির ধার করা আলো নিয়ে নিজের ঔষধা বজায় রেখে চলেছে।

আইন রচনায় কোন বিপ্লব আসে নাই

(১১ পৃষ্ঠার পর)

যে সমস্ত মতবাদের ধরিল প্রভৃতির ঐতিহাসিক মূল্য আছে সেগুলির রক্ষা করার জন্য রচিত হইয়াছে। ভারত রাষ্ট্রতন্ত্রে ঐতিহাসিক মর্ম প্রভৃতিকে দুইটি শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে। যেগুলিকে অধিন ভারতীয় সনদ বলিয়া ঘোষণা করা হইবে, সেগুলির রক্ষণা বেক্ষণের জন্য আইন করা কেন্দ্রীয় বিধানসভার এক্তিয়ার এর মধ্যে। রাজীভবন রাষ্ট্রীয় অধিকারের মধ্যে পড়ে। সেইজন্যি সম্পর্কেই এই আইন প্রণীত হইয়াছে।

আইনের ঘন ঘন সংশোধন

গত দশ বৎসরে যে সমস্ত মূল আইন প্রণীত হইয়াছে তাহাদের মুখবন্ধনির আলোচনা উপরে করা গেল। কিন্তু এই দশবৎসরের মধ্যে পরিবর্তন বা সংশোধন মূলক আইন প্রণীত হইয়াছে। দশবৎসরে ১২৩টি আইনের মধ্যে ২১০টি আইন সংস্কারমূলক বা amencing আইন। আইন পরিবর্তন করিতেই হয়। কাল এবং যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে আইনের বদল করিতে হইবে।

কিন্তু এই দশ বৎসরের আইন পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, নীতির পরিবর্তনের জন্যই সবসময়ে আইন সংস্কার করা হয় নাই। অনেক সময়, আইনের প্রয়োগে যে সমস্ত বাধা বিঘ্ন ঘটিতে পারে তাহার কথা চিন্তা করা হয় নাই—সেজন্য আইনের পরিবর্তন আবশ্যক হইয়াছে।

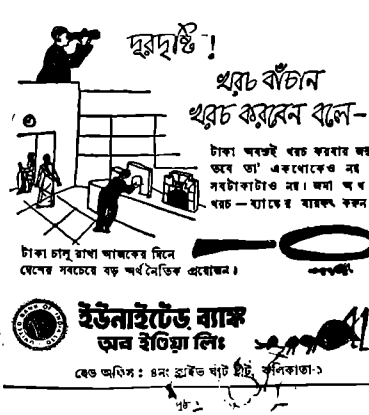

লেখকের বক্তব্য

আইনের কোন বিপ্লব আসে নাই

গত দশ বৎসরে পশ্চিমবাংলায়, শুধু পশ্চিমবাংলায় কেন সারা ভারতবর্ষেই যে সমস্ত আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে, সেগুলি পর্যালোচনা করিলে, স্বাধীনতার পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী যুগের সামাজিক বা অর্থনৈতিক চিন্তাধারার মধ্যে যে বিশেষ কোন পার্থক্য আছে তাহা মনে হয় না। অবশ্য একথা ঠিক, একটা জাতির জীবনে দশবৎসর মুহূর্তমাত্র; কিন্তু বিপ্লব মুহূর্তেই ঘটিয়া থাকে। আমাদের সামাজিক জীবনে বৈপ্লবিক কিছু ঘটে নাই সুতরাং আইনের মধ্যেও বৈপ্লবিক কিছু আশা করা যায় না।

যে সমস্ত সামাজিক সংস্কার বা অর্থনৈতিক পরিবর্তন আইনের মধ্য দিয়া এই দশ বৎসরে সাধিত হইয়াছে তাহার বীজ বহুপূর্বেই উপ্ত হইয়াছিল। সমস্যাগুলি পূর্বেই দেখা দিয়াছে, সমাধানের চিন্তাও আমরা পূর্বে করিয়াছি। সেই সকল চিন্তারই ফল এই দশ বৎসরের আইনে দেখা যায়। মূল ভাবধারার বা Concept এর কোন পরিবর্তন দেখিতে পাই না। এখানে সেখানে একটু আধটু সংস্কার হইয়াছে মাত্র।

দশ বৎসরে পশ্চিমবঙ্গের আইনের গতি

শ্রীচারুচন্দ্র চৌধুরী

পশ্চিম বাংলার আইনগুলি বিশ্লেষণ করার আগে একটা কথা মনে রাখা দরকার। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রতন্ত্রে আঞ্চলিক রাষ্ট্রের আইন প্রণয়নের অধিকার অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। ভারত রাষ্ট্র যুক্তের সংবিধানে আঞ্চলিক রাষ্ট্রের আইন প্রণয়নের যে সমস্ত অধিকার লিপিবদ্ধ আছে তাহার অধিকাংশই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নয়। ব্যক্তিগত অধিকার সম্পর্কিত বিষয় যেমন প্রভু ভৃত্য সম্বন্ধ, স্বামীস্ত্রী সম্বন্ধ, সম্পত্তিগত অধিকার যেমন সম্পত্তি হস্তান্তর দায়াধিকার বা ব্যবসা বাণিজ্য সম্পর্কিত, বিষয় যেমন চুক্তি একবার, কোম্পানী—সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েই আইন প্রণয়নের অধিকার কেন্দ্রীয় বা কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের। আঞ্চলিক রাষ্ট্রের যে সমস্ত বিষয়ে তুল্যাধিকার আছে সেই সব বিষয়েও বহুক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় আইন থাকায় আঞ্চলিক রাষ্ট্রের আইন প্রণয়নের বিশেষ অবকাশ নাই। একমাত্র ভূমিস্বত্ব সম্পর্কে এই আইন প্রণয়নের অবকাশ আঞ্চলিক রাষ্ট্রের আছে।

আর একটা কথা মনে রাখিতে হইবে যে, স্বাধীনতার পূর্বে প্রায় দশবৎসর আমরা একটা মহাযুদ্ধের মধ্যে কাটাইয়াছি। যুদ্ধের প্রয়োজনে আমাদের সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনের বহুক্ষেত্রে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ করিতে হইয়াছে এবং তদনুসারে আইনও প্রণয়ন করিতে হইয়াছে। যুদ্ধের সময় নানা রকম নিয়ন্ত্রণ বা Control, বাড়ী জমি প্রভৃতি দখল বা সরকারায়ত্ত করা প্রভৃতি নানা বিষয়ক আইনে আমরা অভ্যস্ত হইয়াছিলাম। যুদ্ধবিরতির সঙ্গে সঙ্গেই এই সমস্ত সঙ্কটকালীন আইনের প্রয়োজনীয়তা চলিয়া যায় নাই। গত দশ বৎসর ধরিয়াই এই সমস্ত আইনের জের চলিয়াছে।

সুতরাং গত দশবৎসরের আইনগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাইব যে, ভূমিস্বত্ব ও জমি বাড়ী দখলের ও অনেক সামাজিক ক্ষেত্রে কার্যের নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক আইনই বেশী প্রণীত হইয়াছে। প্রথমে ভূমিস্বত্ব বিষয়ক আইনগুলির কথা ধরা যাক।

গত দশকের আইনগুলির মধ্যে দুইটি আইন প্রধান স্থান পাইতে পারে—চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিলোপ আর স্বামিত্ব নিয়ন্ত্রণ আইন। প্রায় বৎসর পূর্বে লর্ড কর্ণওয়ালিসকৃত স্থায়ী বন্দোবস্ত ... ১৯৬২ ...

বৈশাখ তারিখে বিলুপ্ত হইয়াছে। জমিদারদের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা যে ভাল হয় নাই তাহা বহুপূর্বেই বুঝা গিয়াছিল। এক বাংলাদেশ (তখনকার বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা) ছাড়া ভারতবর্ষের আর কোনও প্রদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা হয় নাই। কিন্তু জমিদারী স্বত্ব এবং তার অধীনে যেসমস্ত মধ্যস্বত্ব কিকরিয়া তুলিয়া দেওয়া যায় ইহাই ছিল সমস্যা। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে ফ্লাউড কমিশন ক্ষতিপূরণ দিয়া ঐ সমস্ত স্বত্ব সরকারায়ত্ত করার প্রস্তাব করেন। ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিলোপ আইনে ঐ নীতিই গৃহীত হইয়াছে। ক্ষতিপূরণের পরিমাণ জমিদারী বা মধ্যস্বত্বের খাজনার দর অনুসারে ধার্য্য করা হয় নাই। জমিদারি বা মধ্য স্বত্বাধিকারীর ভূমি হইতে যে আয় হইত তাহার উপর ক্রম নিম্নমুখী শতকরা হারে ধার্য্য করা হইয়াছে। তাছাড়া জমিদার, মধ্যস্বত্বাধিকারী বা রায়ত কি পরিমাণ জমি খাসে রাখিতে পারিবে তাহারও পরিমাণ নির্দেশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

জমির মালিক কে, জমিদার না রায়ত এইবিষয় নিয়া বহু তর্ক বিতর্ক গত শতাব্দীতে হইয়াছিল। ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দের ভূমিস্বত্ব নিয়ন্ত্রণ আইনে রায়তকেই জমির পূর্ণ মালিক বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। রায়তীস্বত্ব উত্তরাধিকার এবং হস্তান্তর যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। তবে ইহাতে দুইটি প্রতিবন্ধক আছে; কোন রায়ত উত্তরাধিকার সূত্রে অথবা হস্তান্তরমূলে আইনে নির্দিষ্ট উর্দ্ধতনসীমার (২৫ একর বা ৭৫ বিঘা) বেশী জমি রাখিতে পারিবে না এবং হস্তান্তর করিয়া জমি নিম্নতনসীমার কম রাখিতে পারিবে না। জমির নিম্নতন সীমা, যাহাকে (Standard area) বলা হইয়াছে বা (Economic holding) বলাযাইতে পারে—কি হইবে তাহা সরকার বিবেচনা করিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন সীমা নির্দিষ্ট করিয়া দিতে পারিবেন।

রায়তের আরও দুইটি বাধ্যবাধকতা আছে। প্রথমতঃ তাহাকে জমি চাষ করিতে হইবে। জমি চাষ না করিয়া ফেলিয়া রাখিলে সরকার সে জমি নীলাম করিয়া দিতে পারিবেন। দ্বিতীয়তঃ রায়তকে জমির জন্য খাজনা দিতে হইবে। খাজনার নিরিখ জমির রকম এবং উৎপাদনের উপর নির্ভর করিবে। এই খাজনা যে জমির মালিক হিসাবে সরকারকে দেয় (Rent) নহে, সেটা পরিষ্কার করার জন্য আইনে ইহাকে রাজস্ব (Revenue) বলা হইয়াছে।

যদিও ভূমি স্বামিত্ব নিয়ন্ত্রণ আইনের মূলনীতি এই যে জমী যে চাষ করে সেই জমির মালিক হইবে—বর্গাদারের বেলায় এই নীতির ব্যতিক্রম হইয়াছে। যদিও এক সময় বর্গাদারী প্রথা বিলুপ্ত করার প্রচেষ্টা হইয়াছিল, পরে রায়ত এবং তার অধীনে বর্গাদার উভয়েরই অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে।

বিশদ আলোচনার মধ্যে না গিয়া ভূমি সম্পর্কিত আইনের মধ্যে আর দুইটি আইনের শুধু নামোল্লেখ করা যাইতে পারে স্ব-চাষী প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইন, ১৯৪৯, আর কলিকাতা ঠিকা প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইন, ১৯৪৯।

প্রতিষ্ঠানকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা সরকারকে দেওয়া হইয়াছে।

কুরুচিপূর্ণ বিজ্ঞাপন বন্ধ করিবার ক্ষমতা ১৯৪৮ সালের এক আইনে সরকার নিয়াছেন। ১৯৫০ ও ১৯৫৩ সালের দুইটি আইন দ্বারা সিনেমা, থিয়েটার প্রভৃতির প্রেক্ষাগৃহে ও সাধারণ ব্যবহৃত যান বাহনে ধূমপান নিষিদ্ধ হইয়াছে।

অপরাধীর মনোবৃত্তির সংস্কারের জন্য তিনটি আইন প্রণীত হইয়াছে। ১৯৫৪ সালের একটি আইনের বলে, খুব গুরুতর অপরাধ না করিলে, যে কোন অপরাধীকে ভর্ৎসনা করিয়া পরীক্ষামূলকভাবে আদালত ছাড়িয়া দিতে পারেন। ১৯৫৫ সালের আর একটি আইনে কয়েদীগণকে সাময়িকভাবে ছুটি দিয়া নিজেদের বাড়ী অথবা পরিবারের মধ্যে আসিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ১৯৫৭ সালের একটি আইনে জেলখানায় যে সমস্ত কঠোর শাস্তি—এখন বর্বরোচিত মনে হয় সেগুলিকে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

পশ্চিম বাংলার অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য যে কয়েকটি আইন প্রণীত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে ১৯৪৮ সালের ভূমি উন্নতি বিধায়ক আইন এবং ১৯৫২ সালের পতিত জমি দখল আইন উল্লেখযোগ্য। প্রথমোক্ত আইনবলে জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে ক্ষতিপূরণ দিয়া জমি অধিকার ও তাহার উন্নতি করা যাইতে পারে। দ্বিতীয় আইন বলে পতিত জমি দখল করিয়া তাহাও জনকল্যাণ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত করা যাইতে পারে। ১৯৫৫ সালের উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান আইন (Development Corporation Act) একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য আইন। সরকার এক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেশের নানাকর্ম উন্নতি বিধায়ক কাজের ভার ঐ প্রতিষ্ঠানের উপর দিতে পারেন। এই প্রতিষ্ঠানের মূলধন সরকার যোগাইবেন। প্রতিষ্ঠান শেয়ার বেচিয়াও মূলধন তুলিতে পারেন। তবে সেই শেয়ারের ৫১ শতাংশ সরকারের থাকিবে। কৃষির উন্নতির জন্য দুইটি আইন প্রণীত হইয়াছে। একটি ১৯৫০ সালের গোহত্যা নিবারণ আইন, আর একটি ১৯৫৪ সালের গো-সম্পদ উন্নতি আইন। প্রথম আইনে গো-হত্যা একেবারে নিবারণ করা হয় নাই—অল্পবয়স্ক ও দুগ্ধবতী গাভীর হত্যা নিবারণ করা হইয়াছে।

১৯২৩ সালে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ কর্তৃক কলিকাতা করপোরেশন সংক্রান্ত যে আইন প্রণীত হইয়াছিল, ১৯৫১ সালে সেই আইন বাতিল করিয়া নূতন আইন প্রণীত হয়। পূর্ব আইনের সঙ্গে এই আইনের প্রধান প্রভেদ প্রধান কর্মকর্তা সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন—করপোরেশন কর্তৃক নহে। ১৯০৬ সালে হাওড়া শহরের উন্নতি সাধনের জন্য হাওড়া উন্নতি সাধন আইন রচিত হইয়াছে। উহার বিধানগুলি কলিকাতা উন্নতি সাধন আইনের অনুরূপ।

শিক্ষাক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য আইন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আইনের আমূল পরিবর্তন ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। ১৯৫৩ সালে দুইটি আইন দ্বারা সদর দেওয়ানী আদালত ও সদর ফৌজদারী আদালত স্থাপন, এই সময়কার দুইটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

সমাজ সংস্কার ও আইন

সামাজিক সংস্কার মূলক আইন কয়েকটি এই দশ বৎসরে প্রণীত হইয়াছে। ম্যাসেজ ক্লিনিক বা শরীর মর্দনালয় নামে কলিকাতায় যে কতকগুলি অবাঞ্ছিত প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হইতেছিল, ১৯৫০ সালের চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান আইন সেইগুলি দমন ও নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য প্রণীত হয়। ঐ আইনে স্বাস্থ্যাগার ... প্রভৃতি ... প্রতিষ্ঠান ... চিকিৎসা সম্বন্ধীয় ...

১৯৫৭ সালের উল্লেখযোগ্য প্রধান আইন—পঞ্চায়েৎ আইন। গ্রাম পঞ্চায়েৎ প্রতিষ্ঠা করিবার নীতি গৃহীত হওয়ায় এই আইন রচিত হইয়াছে। তবে বাংলা দেশে গ্রাম পঞ্চায়েৎ নূতন নহে। ১৯১৯ সালের গ্রাম্য স্বায়ত্ত শাসন আইনবলে যে সমস্ত ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপিত হয় অনেকটা তাহারই অনুকরণে অঞ্চল পঞ্চায়েৎ স্থাপিত হইবে।

... সালের আর একটি আইন—

(শেষাংশ ১৩শ পৃষ্ঠা)

কংগ্রেস ও চিড়িয়াখানা

(প্রথম পৃষ্ঠার শেষাংশ)

সাধারণ লোকই বলুন, আর অভ্যর্থনা সমিতির "গুরুতর" লোকদের কথাই ধরুন, আমি এখানে অনেক লোকের সঙ্গেই তো কথা বলেছি, সকলের মনেই আসলে কিন্তু ঐ একটা কথাই আছে—কংগ্রেস অধিবেশনের সাফল্যের যেটা সবচেয়ে বড় মাপকাঠি : কংগ্রেসে লোকের ভীড় প্রচুর হয়।

একথা ঠিক যে, ভীড় প্রচুর হয়েছে, আসামে ইতিপূর্বে এত জনতা আর দেখা যায়নি। কংগ্রেসের আলোচনার কোনো রাজনৈতিক ছাপ এইসব দর্শকের মনে থাকবে কিনা কে জানে। কিন্তু একথা নিশ্চিত যে, তারা ভীড় এবং জাঁকজমক দেখে অভিভূত হয়ে গেছে এবং এই দৃশ্য সহজে মন থেকে মুছবার নয়।

কংগ্রেস অধিবেশন যেখানে চলছে তার বর্ণনায় আসা যাক। প্রকৃতি আর জাঁকজমকের খবর তাহ'লে নজরে কিছুটা পড়বে। গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকার মধ্যে অধিবেশনের স্থান নির্বাচন করা হয়েছে। কমপক্ষে দুই বর্গ মাইল জমি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকা। এর অধিকাংশই ছিল কর্দমাক্ত পতিত জমি। জায়গাটা আসাম ট্রাঙ্ক রোডের উত্তর ধারে এবং এর পূর্বে কামাখ্যা পাহাড়চূড়ার অপূর্ব শোভা দৃষ্টিকে মুগ্ধ করে। অগণিত বাঁশের বেড়া ও টিনের ছাউনী দেওয়া ব্যারাক আর ছোট ছোট কুটিরে জায়গাটি ছেয়ে গেছে। আর তার মধ্যে কৌলীন্য নিয়ে মাথা চাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ত্রিপল আচ্ছাদিত দুটি মণ্ডপ। ছোট বড় নানা রঙের বৈদ্যুতিক বাতির রৌশনী ছড়িয়ে প্রদর্শনীর টলগুলি যেন দর্শকদের হাতছানি দিচ্ছে। চারদিকে শতশত লাউডস্পীকার, মাইক্রোফোন সারি সংগীতের মূর্ছনা তুলে পরিবেশে এক জমজমাট কার্নিভালের আবহাওয়া সৃষ্টি করেছে। এই উপলক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় তার ... অট্টালিকা কংগ্রেস অধিবেশনের জন্য ছেড়ে দিয়েছে। এর মধ্যে ... বাড়ী এই অধিবেশনে ব্যবহারের জন্যই যে তৈরী ... শেষ করা হয়েছে তা বোঝা কঠিন নয়। কংগ্রেসের বড় কর্তাদের থাকার জন্য এগুলো ব্যবহার করা হচ্ছে।

কংগ্রেস অধিবেশনের জন্যই বিশ্ববিদ্যালয় এলাকাটিকে বিশেষ করে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর নাম দেওয়া হয়েছে। গৌহাটি শহর থেকে এর দূরত্ব ছ'মাইলের মত। এই শহরটিকে অল্প সময়ের মধ্যে শ্রীমণ্ডিত করে তুলবার জন্য সরকার এবং পৌরসভা পরস্পর শামিল হয়েছিলেন। নূতন রাস্তা ঘাট তৈরী করা হয়েছে এবং নূতন নূতন পার্কের পরিকল্পনাও এর মধ্যে স্থান পেয়েছে। গৌহাটি থেকে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের অর্দ্ধেক পথ হবে এরকম একটা চওড়া মোটরচালু রাস্তা কামাখ্যা মন্দির পর্য্যন্ত বানানো হয়েছে, তাড়াহুড়ো করে এর ওপর একটা ওভারব্রীজও করা হয়েছে এবং এই ব্যাপারে রেলওয়ে সরকারের সহায়তায় এগিয়ে এসেছে : একটা অস্থায়ী ষ্টেশন খোলা হয়েছে, বাইরে থেকে ডিজেল ইঞ্জিনও আমদানি করা হয়েছে। এই ষ্টেশন হয়ে গৌহাটি ও পাণ্ডুর মধ্যে ট্রেণ চালু হয়েছে। রাস্তা বরাবর বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা করতেও সরকার যথেষ্ট ব্যয় নিয়েছেন। বুলডোজার দিয়ে পতিত জমি পরিষ্কার করে অধিবেশনের উপযোগী করে তোলা হয়েছে; এই বুলডোজার গুলো সরকার যে কেবল ধার দিয়েছেন তা নয়, সরকারী কর্মচারীরাও একাজে হাত লাগিয়েছেন। এর বদলে সরকার কি পাবেন সেটা কি একটা বড় প্রশ্ন ?

আমাদের পুলিশ বিভাগ এখানে একটা বড় ঘাঁটি করেছেন; পুলিশের পদস্থ কর্মচারীরা অহরহ আনাগোনা করছেন; কয়েক হাজার ইউনিফর্মধারী এবং সাদা পোষাকের পুলিশ মোতায়েন হয়েছে; বিভিন্ন জেলা থেকে অসংখ্য মোটর গাড়ী এনে সমাবেশ করা হয়েছে।

সরকারের যে কত অর্থ এর জন্য লাগবে এবং তার অঙ্ক যে কতয় গিয়ে দাঁড়াবে, সেটা হয়তো কোন সময় জানা সম্ভব নাও হতে পারে। কিন্তু যতটুকু জানা গেছে তার হিসেবও বড় কম নয়। এরকম কাণাঘুষা শোনা গেছে যে, অভ্যর্থনা সমিতি সমস্ত খরচ-খর্চা বাবদ যে বাজেট তৈরী করেছেন তার অঙ্ক এ পর্য্যন্ত অন্ততঃ ২৫ লক্ষ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঢেবরকে গৌহাটি থেকে এক সুদীর্ঘ শোভাযাত্রা করে এখানে আনা হয়। সেই এক মাইল দীর্ঘ শোভাযাত্রার পুরোভাগে কংগ্রেস সভাপতি শোভা বর্দ্ধন করেন আর পিছনে সারিবদ্ধভাবে চলে সাতে ৬৩টি হস্তী (একটি বস্তি হিসেবেও এই শোভাযাত্রায় তার নামের সঙ্গে যোগ দিতে দেখা যায়)। কংগ্রেস সভাপতি একটি বিশেষভাবে সজ্জিত মোটরে বিরাজ করছিলেন। এই গাড়ীটা আসামের ... অনুকরণে সজ্জিত হয়েছিল। ... যে ... জাঁকজমক ... কিছু নষ্ট হয়নি। ... সেই শোভাযাত্রায় ... ছিলেন ... সাইকেল বাহিনী ... না আসলে সকলের দৃষ্টি ছিল ... প্রতি। কংগ্রেস অধিবেশনে এটাই স্বাভাবিক যে কংগ্রেস সভাপতির উপরই সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে। তিনি প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু যে সময় উপস্থিত হন, প্রায় সে সময়ই এসে পৌঁছেন। একমাত্র রাজ্যপাল, আসামের মুখ্য মন্ত্রী, কয়েক শত ইউনিফর্মধারী ও সাদা পোষাকের পুলিশ এবং একদল সাংবাদিক ছাড়া বোধ করি কংগ্রেস সভাপতিকে অভিনন্দন জানানোর কথা কারও স্মরণ ছিলনা। কারণ একমাত্র তাঁরা ছাড়া বিমান ঘাঁটি থেকে তাঁর বাসস্থান পর্য্যন্ত সাড় মাইল রাস্তা বরাবর আর বিশেষ কোন লোকের ভীড় বড় একটা দেখা যায়নি। প্রধান মন্ত্রীর আগমনের সময় যাঁদের বিমান ঘাঁটিতে ও পথিপার্শ্বে দেখা গিয়েছিল, তাদের মধ্যে সাদা পোষাকের সিকিউরিটি পুলিশরাই সংখ্যায় ছিল বেশী।

দি ন্যাশন্যাল রোলিং এণ্ড ষ্টীল রোপ্‌স্ লিঃ

খনি, জাহাজ এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের জন্য কালো এবং গ্যালভানাইজড, ইস্পাতের তারের দড়ির প্রস্তুত-কারক।

কারখানা :— শ্যামনগর, ২৪ পরগণা, পূর্ব রেলপথ।

হেড্ অফিস :— ৬৭ ষ্টিফেন হাউস,
৪, ডালহৌসি স্কোয়ার ইষ্ট, কলিকাতা-১

টেলি : ষ্টীলওয়ার্স ফোন : ২৩-৫১০২

বিমান ভ্রমণের নূতন যুগ

কলিকাতা — দিল্লী
ও কলিকাতা — রেঙ্গুন
যাতায়াতের জন্য আরামদায়ক
টার্বো-প্রপ্ আই-এ-সি

ভাইকাউন্ট

আই-এ-সি ভাইকাউন্ট, চলে অত্যন্ত দ্রুত, কোন রকম আওয়াজ এতে নেই; ঝাঁকুনিও লাগেনা। এক কথায়, বিমান-ভ্রমণের সব রকম আয়েস-আরাম আপনি এই নূতন ভাইকাউন্টে পাবেন। আই-এ-সি ভাইকাউন্টে কলিকাতা থেকে রেঙ্গুন যেতে ২ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট লাগে, আর কলিকাতা থেকে দিল্লী যেতে লাগে ৩ ঘণ্টা ৩০ মিনিট।

আই এ সি ভাইকাউন্ট এখন কলিকাতা-দিল্লী, কলিকাতা-রেঙ্গুন, দিল্লী-বোম্বাই, বোম্বাই-করাচী এবং বোম্বাই-মাদ্রাজ-কলম্বোর পথে যাতায়াত করছে। আই এ সি'র টাকে রুটগুলিতে শিগগীরই আরও ভাইকাউন্ট দেওয়া হচ্ছে।

আই-এ-সি ভাইকাউন্টএর বৈশিষ্ট্য :

কম্পমান — কারণ ভাইকাউন্ট চারটি রোলস্‌রয়েস টার্বো-প্রপ্ এঞ্জিনে চলে।

শব্দহীন — কারণ, ভাইকাউন্টের কামরায় বাইরের আওয়াজ পৌঁছায় না। তাছাড়া বাইরের হাওয়ার চাপে কোন রকম অস্বস্তিবোধ হয় না ব'লে এতে ভ্রমণ আরামদায়ক।

আবহাওয়ার উর্দ্ধে — ২০,০০০ ফুট উঁচুতে মেঘের ওপর দিয়ে চলে বলে ভাইকাউন্টে ঝড় কাকে বলে তার ভয় নেই।

দ্রুতগামী — ঘণ্টায় ৩২০ মাইল বেগে চলে ব'লে ভাইকাউন্ট আপনাকে খুব তাড়াতাড়ি গন্তব্যস্থানে পৌঁছে দিতে পারে।

আই-এ-সি ভাইকাউন্টএ ভ্রমণ সত্যিই উপভোগ্য

ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্স কর্পোরেশন

পাকিস্তানে নূন মন্ত্রিসভা আর কতদিন ?

মন্ত্রিত্বের ফাঁড়া কুর্তায় কোয়ালিসনের তালি

(করাচীতে দর্পণের নিজস্ব প্রতিনিধি)

করাচী, ১৭ই জানুয়ারী—মন্ত্রিত্ব নিতান্ত মুনাফাখী কিংবা নির্ভর না হলে পাকিস্থানী রাজনীতির ব্যাপারে কেউ ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেনা তথাপি এখন অন্ততঃ একথা নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে যে, পাকিস্থানের বর্তমান নূন গভর্ণমেণ্টের আয়ু এবছরের সভেরোতে নাগাদর নির্ণাচন পর্যন্ত টি'কে যাবে।

পাকিস্থানের বর্তমান বছরের আট প্রধান মন্ত্রী মিঃ নূন যে প্রধানের পাঁচ বিশালী পার্টি'র সমর্থন নিয়ে ক্ষমতায় এসেছেন, তাতে এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করাটা স্বপ্নেরও কাছে আপ্রর্ক মনে হতে পারে। কিন্তু, আসলে এই পাঁচ বিশালী "সাপোর্টে'র" অন্যেরই নূনের প্রতিটি বীর্তকে ছত্রাবাদ করছে।

কেননা, একথা তো কিছুদিন পূর্বেও আচিয়ারীর ছিল যে, আওয়ামীলীগ এবং ন্যাপন্যাল আওয়ামী পার্টি'র মধ্যে বিষয়মান মুইটি দল একই গভর্ণমেণ্টের সমর্থনে আসতে পারে। একথাও কেউ ভাবতে পারেনি যে, সোহরাবর্দীকে প্রধান মন্ত্রীর আসন না দেওয়া সত্ত্বেও আওয়ামী লীগ কিরে রিপাব্লিকান পার্টি'র সঙ্গে হাত মেলাবে। তথাপি না অতিরাবীর ছিল তাই ঘটেছে। এর একমাত্র কারণ বিধান যতই থাকুক, এই গভর্ণমেণ্ট মুইটি বিষয়ে একমত : সাধারণ নির্বাচন বর্ষা-সম্ভব কত তাড়াতে হবে এবং যুক্ত নির্বাচনের ভিত্তিতে এই নির্বাচন হওয়া চাই। গত একবাসরের মধ্যে পাকিস্থানের রাষ্ট্র নীতিতে এমন কোনো ঘটনা ঘটেনি যার ফলে এই শোচ্যাকার পরিস্থিতিটা পালটে যাওয়ার কোনো আশঙ্কা করা যায়।

বরং গত একবাসরের ঘটনাবলীতে ঐ কোয়ালিশনের জীবন আরও শক্ত হয়েছে বলেই তো মনে হয়। কোয়ালিশন ভৈরী হওয়ার ১১ দিনের মধ্যে চাকায় ন্যাশনাল এসেম্বলির যে বৈঠক আহ্বান হয়, তাতে যত বড় কড়কগুলি বাধা কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা উতীর্ণ হয়ে এসেছে। প্রথমতঃ পাকিস্থান নিরাপত্তা বিলটি পাশ হয়ে গেছে। অবশ্য কয়েকটা সংশোধনের দ্বারা এর কঠোরতা খানিকটা হ্রাস করাতে হয়েছে, কিন্তু বিনা বিচারে, আটক রাখার ক্ষমতাটা, বাস বিতে হয়নি। মিউীজর, ম্যানচেস্টেন্স অব এসেনশিয়েল লাজিসেস এ্যাক্ট এবং সি কাইন্স এ্যাক্টের সংশোধনী বিলগুলি পাশ করানো সম্ভব হয়েছে, যার ফলে এখন আমা সরকারী কর্মচারীদের বর্ষখাস্ত নির্দিষ্ট করা যাবে এবং সেনা বাহিনীকে কাইন্স অফিসারদের অধিকার অর্পণ করা যাবে। অথচ এই তিনটি আইনেই এমন সব বিধান রয়েছে, যৌলনা ভাসানী নীতিগত ভাবে সেগুলির ঘোরতর বিরোধী।

"নীন্থ নির্বাচন এবং যুক্ত নির্বাচনের তারিখ ছাড়াও আরও কতকগুলি বড় কারণ আছে, যার ফলে নূন মন্ত্রিসভাকে আয়ুষ্মীর্ণতর হওয়ারই সম্ভাবনা। এখন অন্ততঃ অবধা মেনে যা মনে হয়, নীন্থ যদি নির্বাচন সত্যই হয় তাহলে আওয়ামী লীগের, তাতে সবচেয়ে বেশী উপকৃত হওয়ার সম্ভাবনা। এবং এই নির্বাচনের ফলাও ও ধারার জন্য আওয়ামী লীগের পার্টি সংগঠন বেরাবর করার একটু সময় দরকার। তা যদি করতে হয়, আওয়ামী লীগের প্রধানতর এবং একমাত্র সংগঠনকর্ত্তা মিঃ সোহরাবর্দ্দিকে কিছু-দিন অবশ্যরূপে রাষ্ট্র পার্টি'র তরিবেই থাকতে হবে। তাছাড়া, করাচীতেও আওয়ামী লীগের ১৩ মাসের ক্ষীণ্ড যে পরিমাণ বিধান কুড়োতে হয়েছিল, সেগুলি তুলবার জন্য বিস্তৃতিপ্রিয় জনতাকে খানিকটা সময় দেওয়া দরকার। সোহরাবর্দ্দি মন্ত্রিত্বের সম্পর্কে আরীয় পোষণ এবং মুসলিম মন্ত্রিসভা বিস্তার উৎসাহিত। এবং এগুলিও তুলবার জন্য কিছু সময় দরকার একথা আওয়ামী লীগ নিজেরাই স্বীকার করেন।

তপশীলীদের মন্ত্রিত্বের লোভ

কোয়ালিশন বন্ধি সত্যকে নষ্ট করার জন্য বিশ্চয়ই সংখ্যালঘুদেরও কোনো বড়সর বাধার কথা নয়। তপশীলী সম্প্রদায়ের সদস্যদের মন্ত্রিত্বের লোভ তো প্রায় পাকিস্থানী প্রথার হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে কংগ্রেসের ভূমিকা এর বিরুদ্ধপক্ষেরা অনবরত এবনভাবে পূর্ব পাকিস্থানের আইন সভার চিত্রিত করে রেখেছেন যে, এদের পক্ষে কোনো স্থায়ীত্বের ডাঙা-পড়ার উদ্রেকযোগ্য কোনো স্থান পাওয়া প্রায় অসম্ভব। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি এবং মিঃ ফাযিলুর রুহ কৌবুরী ও সদস্য সমন্বিত কৃষক শ্রমিক পার্টি'র পক্ষেও প্রায় একই কথা প্রযোজ্য হতে পারে। তাছাড়া, এদের কারুরই কোয়ালিশন ডাঙবার মতো সদস্য সংখ্যাও নেই।

এর পর একবার বাকী থাকে রিপাব্লিকান দল। এখানে অবশ্যেই আসল। কয়েছেন কে, সম্ভবতঃ পশ্চিম পাকিস্থানের বাজেট পেশানের সময় রিপাব্লিকান দল থেকে একটা উপদল ছিন্নভিন্ন যাবে, আরো এখনও ভিতরে ভিতরে পৃথক নির্বাচন প্রথার সমর্থক। কেউ কেউ এবথাও বলছেন যে, প্রেসিডেণ্ট বীর্ধার সমর্থকতায় নূনসির নীগ এই দল ভাঙনের চেষ্টাটা চালিয়ে যাচ্ছে এবং যদিও কিছুদিন পূর্বে প্রেসিডেণ্ট বীর্ধা মিঃ চুন্ধীগড়কে এবং তার সহকর্মীদের চেয়ে রিপাব্লিকানদের প্রতিকর্মী অনেক ছিলেন। তবু এখন নাকি তাঁর মনোভাব কতকটা পরিবর্তন হয়ে গেছে। এই জলপনাগুলি সত্য হওয়া অসম্ভব নয়, কিন্তু পর পর প্রবীণ রিপাব্লিকান পার্টি' ছুকরো হবে কিনা, তাঁরা নির্ভর করছে অন্যান্য কতকগুলি ব্যাপারের উপরে।

প্রথম কথা প্রেসিডেণ্ট বীর্ধা পূর্বক ও যুক্ত নির্বাচনের প্রশ্নে যতই রিপাব্লিকানদের চাপের কাছে হয়ে থাকুন না কেন, একথা তো অস্বীকার করবার নয় যে, এই একটি পার্টি'ই তাঁর পক্ষি ও ক্ষমতার প্রধানতম অবলম্বন ? তিনি রিপাব্লিকান দল ভাঙবার জন্য তাহলে এত উৎসাহী হবেন কেন ? তাছাড়া, মুসলিম লীগ তাকে যতই প্রতিশ্রুতি দিক, কার্যকল্পে প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনের সময় মুসলিম লীগ সর্থার আবদুর হক নিজারকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার দাঁড় করাবেন, তার নিশ্চয়তা কি ? এবং আয়ুবুর হক নিজারের প্রেসিডেণ্টে নির্বাচনে অবতীর্ণ হওয়া, কিম্বুবাত অসম্ভব ব্যাপার নয়।

তাছাড়া দ্বিতীয় কথা, রিপাব্লিকানদের যে উপদলটি পৃথক নির্বাচন সবর্থক অর্থাৎ মাথেকে ভাঙিয়ে আনবার চেষ্টা এখন হচ্ছে তাবাই যা ঠিক এই মুহূর্ত্তে দল ত্যাগ করতে আসে কেন ? ১৭ই ডিসেম্বরের আগে যখন চুন্ধীগড় মন্ত্রিসভার ৪৪ দিনের আয়ু প্রায় নির্বা-পোন্মুখ হয়ে পড়েছিল এবং খবর প্রেসিডেণ্ট বীর্ধা ও চুন্ধীগড় এই মন্ত্রি সভাকে বাঁচু করিয়ে রাখার জন্য চারদিকে থেকে সবর্থন যোগাড়ের চেষ্টা করছিলেন, তখনই তো রিপাব্লিকান দলটি বিচ্ছিন্ন হতে পারত। বিচ্ছিন্ন হওয়ার এই চেয়ে উপযুক্ত সময় এবং "অবাবান" সময় আর কখনো হতে পারেনা। তখন তারা যদি বিচ্ছিন্ন না হয়ে থাকে, তবে মুহূর্ত্তে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সম্ভাবনা বোধহয় খানিকটা সুদূরপরাহতই। তাছাড়া যদিই এঁরা বেরিয়ে আসেন, তবু মুসলিম লীগ এবং এই কয়জন রিপাব্লিকান দলত্যাগীর দ্বারা নূনের মন্ত্রিপরিষদ তৈরী হতে পারেনা। সংখ্যাপরিষ্ঠতার জন্য এঁদেরকে আওয়ামী লীগের সাহায্য চাইতে হবে। এখন মুসলিম লীগের সঙ্গে আওয়ামী লীগ হাত বেলাবে কি ? মাত্র গত অক্টোবর মাসে মুসলিম লীগের চক্রান্তের জন্যই সোহরাবর্দি সাহেবকে পদিচ্যুত হতে হয়েছে এবং আওয়ামী লীগের পক্ষে সেকথা বিস্মৃত হওয়া সম্ভব পর বলে মনে হয় না।

এই সব পুশ্নের সঠিক উত্তর একমাত্র সময়ের গর্ভেই নিহিত আছে। কিন্তু ন্যাশনাল এসেম্বলির ঢাকা অধিবেশনের বিরবর্তী যাঁরা পাঠ করেছেন, তাঁরা স্পষ্ট একথা বলতে পারবেন না যে, রিপাব্লিকান মন্ত্রিসভার শিছনে দলের সাধারণ সদস্যদের সমর্থন তেমন ঘোরালো ছিলনা। বরং ইতিমধ্যে একথা অনুধাবন করা শক্ত নয় যে রিপাব্লিকানেরা যে কথতা পশ্চিম পাকিস্থানে এবং কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টে গ্রহণও করেছেন সেই ক্ষমতা তাঁরা আজও কিছুমাত্র ধরে রাখবার জন্যই আগ্রাণ চেষ্টা করবেন। এজন্য বল প্রয়োগ হবে যে, এই প্রথম তাঁদেরই হাতে একটা রাজনৈতিক পাটকবর্ধন করার সুযোগ এসেছে। যদি এঁরা শুধু নির্বাচনই অনুষ্ঠান করতে পারেন, তাহলে জন-সাধারণের কাছে যাঁচিয়ে একথা তাঁরা ঘোর পরাধ্য বলতে পারবেন : শুধু আবরাই প্রতিশ্রুতিটি রক্ষা করি।

কেউ কেউ অবশ্য এই যুক্তি দেখাচ্ছেন যে, নির্বাচন অনুষ্ঠান করানো এখন না মুসলিম লীগের স্বার্থ, না প্রেসিডেণ্ট বীর্ধার,না রিপাব্লিকান দলের। কাজেই বর্তমান কোয়ালিশন ভাঙবে এবং নির্বাচন স্থগিত হবে।

একথা যদি সত্যও হয় তাহলেও অপরপক্ষে আর একটি আরও সত্য যে, নির্বাচনী যেদিন হোক্, রিপাব্লিকানদের পক্ষে মুসলিম লীগের সঙ্গে আঁতাত ক'রে নির্বাচনী অবতীর্ণ হওয়া কিছুমাত্র লাভজনক নয় ; এবং নভেম্বরে নির্বাচন না হবেও নির্বাচন কোন-দিন-না-কোন দিন তো করতেই হবে। তাছাড়া, একথা এখন প্রায় সবলেই এখাবে স্বীকার করছেন যে, পাকিস্থানের পক্ষে এই মন্ত্রিসভা বেশবের কথানী বিলাসিতা ছোর হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং একারও যদি মন্ত্রিসভার পতনের পর ঘটে তাহলে গণতান্ত্রিক গভর্ণমেণ্টের স্বপ্ন আরও বহুবর্ষ হবে।

এই কোয়ালিশন ভাঙার জল্পনার অন্যতিকে অনেক ওয়াকিবহাল লোকেরা বলছেন যে, রিপাব্লিকান এবং আওয়ামী লীগের মধ্যে বহু সবয়োমিত্য বর্দ্ধিত হওয়ার সম্ভাবনা। এমন কি নির্বাচনের প্রাক্কালে মুইটি দল একত্র হয়ে যেতে পারে, একথা চিন্তা করাও খুব অবাস্তব নয়। প্রকৃতপক্ষে দুই দলের সম্মুখে আছেনে এই প্রশ্নটাই বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এদের কারুরই সারা পাকিস্থানব্যাপী প্রতিনিধিত্বের কথা নেই। বরং ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি' সেই অবস্থা দুর করার জন্য উঠে পড়ে লেগে গেছে।

এখন এই ভবিষ্যদ্বাণী ফলপ্রসূ হবে কিনা, তার কোনো নির্ভরযোগ্য লক্ষণ এখনও করাচী কিম্বা ঢাকায় খুঁজে পেতে চক্ষু হয়নি। বাদিকী পারস্পারিক পিঠ চুলকানি ইতিবধ্যে হয়েছে, একথা ঠিক। ঢাকায় যিঃ নূন বার বার তাঁর বক্তৃতায় যিঃ সোহরাবর্দিকে "A great intellect" বলে বর্ণনা করেছেন। বিনিময়ে যিঃ সুহ্রে উদ্দেশ্যে প্রভূত শুভেচ্ছা পুরাণ করেছেন। এই সভাই পূর্বোক্তদের বীর্ধার প্রতি পরোক্ষ কটাক্ষ ক'রে যিঃ সোহরাবর্দি বলেছিলেন "আবরা পুরোক্ত নাগরিকের কাছে এবনি করব যে বর্তমানে গভর্ণমেণ্টের স্থায়ীত্ব আছে।" তথাপি, আওয়ামী লীগ যে প্রত্যক্ষভাবে রিপাব্লিকানদের সঙ্গে মর্মান্তিক ভাবে ভাঙ এবন কোন লক্ষণ এখনও দেখায় নি। বরং কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা পুনর্গঠনের পরিষ্কার প্রশ্নে একই রিপাব্লিকানদের সমর্থন করতে হচ্ছে। চাকায় ন্যাশনাল এসেম্বলির বৈঠকের সময় বড় বড় বিষয়গুলির বিতর্কে আওয়ামী লীগ প্রায় নিরুপায় ছিল, যদিও ঐগুলির ফলাফল বিশেষভাবে পূর্ব পাকিস্থানকেই বহন করতে হবে। তাছাড়া এঁরা পুকাশ্য জনতায় পূর্ব পাকিস্থানের প্রতি বৈষম্য-মূলক আচরণের অভিযোগ পুনরায় উত্থাপন করতে আরম্ভ করেছেন। যদিও মাত্র কিছুদিন পূর্বে, যৌলনা ভাসানি প্রমুখ আঞ্চলিক স্বায়ত্ত শাসনের জন্য দাবী ঘোরালো করে তুলছিলেন এবং উপরোক্ত সমালোচনা করার তাঁর সভাগুলি ভেঙে দেওয়ার জন্য পুলিশ দিকে কেন্দ্রীয় পুশান মন্ত্রীর সংকরীদের মধ্যে একজন নাকায় পেছনেলিবিয়ে এসে তাঁর বক্তৃতা বন্ধ করতে উদ্যত হিলেন, তাতে খবর মিঃ নূনও ছিলেন। সেই হৈচৈকে আবোচনার সময় কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট এবং পাছ গভর্ণমেণ্টের মধ্যে পেশোয়ারী উচ্চাশ দেখা গিয়েছিল, তাতে ক'রে ঐ ভদ্রলোক পরে বলতে বাধ্য হয়েছিলেন "ঐসব কথাবার্তা শুনলে একথা মনে না করে উপায় নেইযে, এরা দুটো ভিন্ন ভিন্ন এবং বিরুদ্ধমান রাষ্ট্রের প্রতিনিধি।"

রাজধানীর চিঠি :

মুক্তিলাভের পর শেখ আবদুল্লার ভূমিকা

(দর্পণের নিজস্ব প্রতিনিধি)

শেখ আবদুল্লার বক্তৃতা এবং তাঁর অতিমত পুকাশ করার বিষয়েকোনও বড় আন্তর্জাতিক সংকট সমাধানের ক'এক দিন পুকাশিত হওয়ার মতো। এবং অনেক বিশিষ্ট ইতরাক সম্পাদক এই সব বক্তৃতার সবালোচনা করতে গিয়ে কতকটা দ্বিং-কর্ত্তব্যবিমূঢ় ভাব দেখিয়েছেন। অথচ, আসলে বিষয়বের কথা এ নয় যে, শেখ আবদুল্লা কি বলছেন। আসলে যেখানে রাজনৈতিক অনুসন্ধানের প্রয়োজন সেটা হচ্ছে, শেখ আবদুল্লাকে পুশ্ন ৪। বহু কারণেরই পর দীর্ঘ এই মুইটি বের হয়ে আসার পর শেখ আবদুল্লা কি ভাবছেন এবং কি করতে চাইছেন, তা জানবার জন্য দেশের সকলেরই আগ্রহ হওয়া স্বাভাবিক। এবং এই আগ্রহ মেটাবার জন্যই তিনি সাংবাদিক সম্মেলনের ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু, এই মুইটি প্রধান কথা তাঁর মনোভাব সম্পর্কে কোনও আলোকপাত করে নি। মুক্তিলাভের পরবর্তী বিশেষজ্ঞদের লক্ষ্য করবার মত এই জন্য যে, ঠিক এই মুইটি প্রধান ভারতবর্ষের এবং পাকিস্থানে সকল করছেন এবং মুইটি প্রধান বড় সংবাদপত্র ব্যাকবিদানও এই মুটি শেখ সকল করে সংপূর্ণ মুটিকে পুত্যাবর্ত্তন করেছেন। এক সময়ে মুইটি সত্যই কিংবা ভাইসরয়ের আবরণ উপলক্ষ্যে কথানীমুক্তির মোষণা পুকাশ করা হত। মুইটি পুধান বক্তার ভারতে সমর্থন এবং শেখ আবদুল্লার মুক্তিলাভ কতকটা হাস্যকরভাবে সেই পুরাতন পুথাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।

কিন্তু পুশ্নটা এই করাচী কথানার মধ্যে কোন যোগাযোগ আছে কিনা সেটা অনুধাবনযোগ্য। যদি নাও থাকে, তাহলেও একথা উপেক্ষা করা যায় না যে, সত্য হাবভাব এবং নিঃ পুাধান ভারতীয় সংবাদপত্রগুলিতে যে খবরের চাঞ্চল্য এবং দিল্লীর রাজধানীতে যে উত্তেজনা লক্ষ্য করে গিয়েছেন, সেটা পুত্যক্ষভাবে এঁদের সামনে উপস্থিত না করেই বোধহয় বুদ্ধিমানের কাজ হত। এ-কথা অবশ্য সত্য যে, ১৯৫৭ সালের দেশ্টেম্বর মাসেই পুধান বক্সী নেহরুর কাশ্মীর ববণের পর শেখ আবদুল্লার সঙ্গে যে সমঝে বন্ধুতা করেছিলেন তাতে তখন কাশ্মীরে এই অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছিল যে শেখ আবদুল্লার মুক্তি আসু। কেন বা, নেহরু মনেছিলেন যে, শেখ আবদুল্লা যদি শীঘ্র মুক্তিলাভ করেন তাহলে তিনি সুখী হবেন। এখন দিল্লীতে এবং কাশ্মীরে ক্ষতাবর্ত্তে এই জল্পনা চলছে, আবদুল্লাকে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট মুক্তি দিয়েছেন, অথবা কাশ্মীর গভর্ণমেণ্ট দিয়েছে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ?

যদিও, মুর্তাগ্যক্রমে, এই বরমের অনুমান অথবা রাজনৈতিক বিশ্লেষণ কাশ্মীর গভর্ণমেণ্টের পক্ষে এবং ভারতবর্ষের পুরাহিত আশপাশগুলির সম্পর্কেও খুব একটা সন্তোষকর বারণা সৃষ্টি করেনা, তা ছাড়া কোন মুক্তিদাতা লোকের পক্ষেই একথা বোঝা শক্ত নয় যে, কাশ্মীর গভর্ণমেণ্টের অনিচ্ছা সত্ত্বে শেখ আবদুল্লাকে মুক্তি দেওয়া কিছুতেই সম্ভব হতে পারে না। কাশ্মীরের মত একটা স্বীমান্তবর্ত্তী রাজ্য, যেখানে এখনও অনবত এবং গভর্ণমেণ্টের মধ্যে যথেষ্ট বিশ্বাসের অভাব রয়েছে, সেইজন্যে সমস্যাকে জটিলতর করা হবে—এরকম আশঙ্কা করাও ভারত গভর্ণমেণ্টের কোন স্বেচ্ছা-তারিক নির্দেশ দিতে পারেন বলে মনে হয় না। অথাৎ শেখ আবদুল্লার মুক্তি গোপাল বয়সম্বয়ের উপর শেখ আবদুল্লার ন্যায় আর একটা সমস্যা জোর করে চাপিয়ে দেওয়া ভারত গভর্ণমেণ্টের বিবেচনা শক্তির পরিচায়ক তো নয়-ই, সহানুভূতি-বোধের পুমাণ নয়। অন্য দিকে এ কথাও ঠিক যে, বক্সী গোলাম বয়সম্বয়কে বিশেষ-ভাবে বিপ্লত করার কোন চেষ্টা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীমণ্ডল কিম্বা দুরে কখনও করেন বলে মনে হয় না।

তা ছাড়া একথা ও ভাববার কোন কারণ নেই যে, মুক্তিলাভের পর শেখ আবদুল্লা কি বলবেন বক্তৃতা থেকে বা আলোলনের আরম্ভ করবেন তা দিল্লীর গভর্ণমেণ্টের কাছে অজানা ছিল। পুকৃত পক্ষে এই কয় বৎসর কারাগারের সময়ে শেখ আবদুল্লার মনোভাব এবং মতবাদ কিভাবে পরিবর্তিত হয়েছে এবং বর্তমানে তা কি অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে সেটার সঙ্গেও ভারত সরকার সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন, বক্সী গোলাম বয়সম্বয়ের গভর্ণমেণ্টের তো ছিলেনই। একটা দুই বছর পূর্বে শেখ আবদুল্লার সঙ্গে তাঁর আলাপ-বন্ধু এবং দেশীয় অনুচরদের কাছে এসেছে এবং বিগত কাশ্মীর নির্বাচনের সময়ে পুলিশাই শুদ্ধ নানক ধনষ্টি গ্রুপ পুকাশ্যেই কিছু কিছু গত এবং শেখ আবদুল্লার আন্দোলন-নীতি সম্বন্ধে বিশ্লিষ্ট কাশ্মীরে পুচার করেছে। এবন কি সরকারের ঘোষণা সবাদ সংপ্রত্রের সুত্রধরিণী ছাড়াও শ্রী বেলজ বক্স কতগুলি ব্যক্তিগত এবং বিশ্বস্তজন সূত্রের সঙ্গে পরিচিত। কাজেই, শেখ আবদুল্লার মনোভাব অজ্ঞাত ছিল এবন অনুমান বেলন নিরর্থক তেমনি এই বিশ্বয়ের নির্বাক ও, যে, শেখ আবদুল্লা মুক্তিলাভের পরেই ভারত-বিদ্বেষী পুচারে অবতীর্ণ হয়েছেন। এই মুটো কথা, আবার বলে দিতে পারি, ভারত সরকারের অজানা ছিল না।

রবীন্দ্রনাথের

কালান্তর

রাষ্ট্রনীতি-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মূল্যবিকারের চিন্তার প্রধান ও পরিণত অংশ এই গ্রন্থের বিভিন্ন প্রবন্ধে বিধৃত হইয়াছে। বাতায়নিকের পত্র, শিক্ষার মিলন, সভ্যতার আহ্বান, হিন্দু-মুসলমান, সভ্যতার সংকট প্রভৃতি ছাব্বিশটি প্রবন্ধ। মূল্য ৪৲ টাকা।

রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ রাষ্ট্রনীতি প্রসঙ্গে বাল্যাবধি তাঁর চিন্তার সম্পূর্ণ একটি পরিচয় দিয়াছেন।

সভ্যতার সংকট

বঙ্গের ও বিশ্ববাসীর প্রতি রবীন্দ্রনাথের শেষ বাণীর উপহারোপযোগী সংস্করণ। উৎকৃষ্ট ক্যাগজে মুদ্রিত, রবীন্দ্রনাথের স্বহস্তলিখনে মুদ্রিত প্রতিকৃতি সম্বলিত। মূল্য ০.৫০ টাকা।

স্বদেশ

এই গ্রন্থে নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি সংকলিত—নূতন ও পুরাতন; নববর্ষ; ভারতবর্ষের ইতিহাস; দেশীয় রাজ্য; প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা; ব্রাহ্মণ; সমাজভেদ; বর্ষবরোধের দুষ্টান্ত। মূল্য ১.০০ টাকা।

সংকল্প ও স্বদেশ

স্বদেশ-বন্দনা ও স্বদেশ-সেবার সংকল্প লইয়া রবীন্দ্রনাথ যে-সকল কবিতা রচনা করিয়াছেন তাহার অধিকাংশ এই গ্রন্থে সংকলিত। মূল্য ১.০০ টাকা

স্বরবিতান ৪৬ ও ৪৭ খণ্ড

১৯০৯ সালে এবং তাহার পূর্বে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক রচিত যাবতীয় স্বদেশী গানের স্বরলিপি এই দুই খণ্ডে মুদ্রিত। মূল্য যথাক্রমে ৩.০০, ৩.৫০ টাকা।

বিশ্বভারতী

৬/৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা-৭

"তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণের শক্তি-এইটেই হ'ল সিনেমা আর্টের একটা বড় কথা"

—শ্রীসত্যজিৎ রায়

অনেকে আমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করেন, —আপনি তো একজন আর্টিষ্ট ছিলেন, কোন্ প্রেরণায় সিনেমা তুলতে এলেন ? এই প্রশ্নের জবাব এক কথায় বলেও দেওয়া যায়। আবার আরেকটা বুদ্ধি ছিল ছবি আঁকা। তবে সে কথাশিল্পায় আর্ট আর কমার্শিয়াল আর্ট মানেই তো বিজ্ঞাপন। আমি স্বেতাঙ্গ, তাতে আমার মন ভরত না। ছবি আঁকার মতীরতর যে আর একটা দিক আছে, সেই পর্যন্ত পৌঁছাতে হবে। আমার আচার্য্য নন্দলালের কথা বলি। আধুনিক ইউরোপীয় চিত্রকলা সম্পর্কে তিনি একবার মন্তব্য করেছিলেন, —আধুনিক ইউরোপের চিত্রকলা ডিজিনিটাকে বড় বেশী সরল ক'রে ফেলেছেন। অথচ আমাদের অজন্তার ছবি দেখে, সেই ফালেমবরণ রাজ-কন্যাটির কথা মনে করো, —আগা থোড়া ছবিটিতে কোথাও আড়ষ্ট নেই। শিল্পী সহজ সরলভাবে রাজকন্যাকে রূপায়িত করেছেন। কিন্তু সেই তার সরলতা আঁকায় সহজ হল, শিল্পী তার সূক্ষ্মতাকে খুঁটিনাটি কোনটায় যান দিলেন না। তার ফলে এই হয়ে গে, ইউরোপের সকার ক'ন তাকে ছাড়া-কন্যার পুরো জলছা প্রকট হ'ল প্রত্যেক পেল। কিথা বলো, আমাদের সেই বিলুপ্তপ্রায় কুটুম্ব। তার কারুকার্য্যের কোথাও একটিমাত্র বাহুল্যকে শিল্পী করেন নি।

এই যে বৈশলীয়া কন্যাটি—এর সিলেশই এটা মূল কথা। সিনেমারও। আজিক এত বড়ন হ'লে খুঁটিনাটির কাজ তত কঠিনতীর হয়ে ওঠে—এবেই হবে বড় শিল্প।

এবার বিরাগিদনের কথার আসা যাক। সিনেমা নিলেন এ ছিনিমটি আগেও ছিল, এখনও আছে। এটা ছিল বহুল আদরণীয় নয়। পরিবেশ কিভাবে তৈরী হয়, কিভাবে তার সাজিগীর সঙ্গে চরিত্রগুলির ব্যবসীনতাকে সামাঞ্জস্য করে সেটা বোঝা দরকার। কোন্ পরিবেশে কি ধরণ সৃষ্টি করতে চাই সেটাও জানা দরকার। স্থান, কাল, পাত্রের মধ্যে সামাজস্য এনে বিবিধ পুরুষ রূপসৃষ্টি করা যায়। প্রেমের কথা বলব। একটা নোংরা বস্তির নরকেও প্রেমের উদ্মেষ হয়। সেটাকে পরিস্ফুটি ক'রে তুলতে হ'লে যদির বেলা পরিবেশকে ফুটিয়ে তুলতে হবে। এই বাস্তবতা কিন্তু আগো রসবীন নয়। এখানে এই যে ক-স্টাই বা বৈশলীয়া এতে এক বিশেষ ধরণের রস সৃষ্টি হ'য়েছে যে রস আমরা পাই আধুনিক কবিতায়, যেমন ধরুন জীবনানন্দ দাশের কবিতায়। এখানে সম্পাটা কিন্তু বাস্তবতা সৃষ্টি নয়, রসসৃষ্টি।

দুর্ভাগ্যবশত আমাদের দেশের সিনেমা মহলে এই রস উপলব্ধি করার মত লোকের অভাব আছে। কখনো যেবন মণীশদের সম্পর্কে খাটে তেমনি প্রযোজকদের সম্পর্কেও।

এখানে কিছু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলি। আগেই বলেছি, আমি "পথের পাঁচালী" চিত্রখানার ভার নিয়ে কোনপ্রকার সব পরিবেশক প্রযোজকদের দরজায় দরজায় ঘুরি। দেন প্রযোজক বা পরিবেশক নেই যিনি এই সাড়ে চার হাজার ফুট ছবি না দেখেছেন। কিন্তু কারও তা পছন্দ হয়নি। এইভাবে যখন ঘোরাঘুরি করছি তখন একজন পরামর্শ দিলেন সরকারের কাছে যেতে। তখন বিধান বাবুর কাছে গেলাম। তারপর সরকারী চাকায় ছবিটি শেষ হয়। তবে কাজ উদ্ধার হ'লে তাদের এগোতে থাকে। ছবিটা শেষ করতে সময় লেগেছিল পুরো আড়াই বছর। বিভিন্ন হওয়ার আগেও ন'টে ছিল তিন চার বার। "পথের পাঁচালী" প্রতি ইঞ্চি পথ পেরোতে পুরব বাধার সমুখীন হ'য়েছে।

যে অর্থে সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা, নাটক উচ্চ শ্রেণীর আর্ট, সিনেমাও সেই পর্যায়ভা কিনা এ প্রশ্ন কেউ কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা ক'রেছেন। সিনেমা যে ঐ সরণীর্ণারেরই আর্ট তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই। আর্টের মাধ্যম হিসাবে সিনেমা শুধু যে খুব ছোরালো তাই নয়, এই সত্তাগীতে এই অপরিহার্য। তবে নাতিদার্ঘের মধ্যে সঙ্গী কোন ক্ষেত্রেই তো রাখারে রাখাদের হয় না। চিত্রাঙ্কন যা ধারণাদানের ইলপ্যাসের মতো উপন্যাস রসধারা সৃষ্টি হয় ? আমার বহু ধারণা সিনেমার মাধ্যমে প্রথম শ্রেণীর শিল্প সৃষ্টি সম্ভব। তবে এই মাধ্যম ছবি তুলতে গেলে তার পিছনে শুধু কলশাস্ত্র মনেই নয়, নির্ভার দরকার।

এটা মনে রাখতে হবে, অন্য সব শিল্পের মতো সিনেমার চরিত্রও তার নিজস্ব। এর জন্যগ্রহণের পদ্ধতিও বিশিষ্ট। "অপরাজিত" নয়কে অনেকে ব'লেছেন যে তার মধ্যে নাকি নাটক নেই। এটা সত্য নয়। সিনেমার নাটকীয়তা অন্য নাটক থেকে স্বতাবতই স্বতন্ত্র। তাই এর প্রকাশভঙ্গীও স্বতন্ত্র। আর সেইটেই 'আর্থ মার্কেট' বলে সিনেমা সেটাকে টেপেরা করতে পারে না।

বাংলা ছবির বাজারকে প্রসারিত করার জন্য আমার মনে হয় বিদেশের দিকে নজর দেওয়া দরকার। ছবিতে সাব্-টাইটেল যোগ ক'রে বিদেশে দেখানো সম্ভব; তাতে তাঁরা ভাষা পাওয়া থাকে ব'লে মনে হয়। এদিক থেকে ফিল্মী ডামী প্রডিউসারিতে যে সম্ভাবনা তত উজ্জ্বল নয়। অবশ্য মূ'একটা জায়গায় "পথের পাঁচালী" এবং "অপরাজিত" ভালই চলেছে কিন্তু সেটা ঘটেছে সম্পূর্ণ অন্য কারণে। আর তা ভাষার ছবিই বে সে সুযোগ পাবে এবনও ভাবা যায় না। সাব্ টাইট্‌ল্ যোগ ক'রে বাংলা ছবি ভারতের অন্য প্রদেশে চালানোর একটি প্রধান অন্তরায় আছে। সেটি নিষেধতা। তবে অন্য ভাষায় ডাব্ ক'রে ছবি চালানোর একটা চেষ্টা করা যেতে পারে।

এ প্রকর বহুতর সমস্যার সমুখীন আধুনিক যুগের চিত্র পরিচালকের হতে হয়। এ সব কথা মনে রেখেও যিনি ছবি তুলতে বাসনে হবি তোলার চেষ্টা করবেন আমি তাঁদের আমর্গ পরিচালক বলব। তাঁদের ছবি তোলাই ভাল পরিচালকের সব চেয়ে বড় পরিচয়।

আর ভাল ছবি করতে গেলে যিনি পরিচালক তাকে করেকটি বিষয়ে কৃতী হ'তে হবে। তিনি চ'ক্ষু রূপের সাদিত্য রসিক হবেন। ভাল উপন্যাস পড়া থাকলে সংগীত সম্পর্কে তার ভাল ধারণা জন্মাবে। চিত্রকলা ও সঙ্গীত সম্পর্কে তার একটা আভাবিক শুনবণতা থাকার প্রয়োজন। বাস্তব দৈনিক বিষয়ে অবহান করে তা পরিচালক দেখবন করে অনুধান করবেন, যদি তাঁর বস্তুবস্তু সম্পর্কে ভাল জ্ঞান না থাকে ? এই সবই থাকা দরকার। আর সেই সঙ্গে সব থেকে বড় জিনিষ দেটা, সেই চোখটাও ভাল থাকা প্রয়োজন।

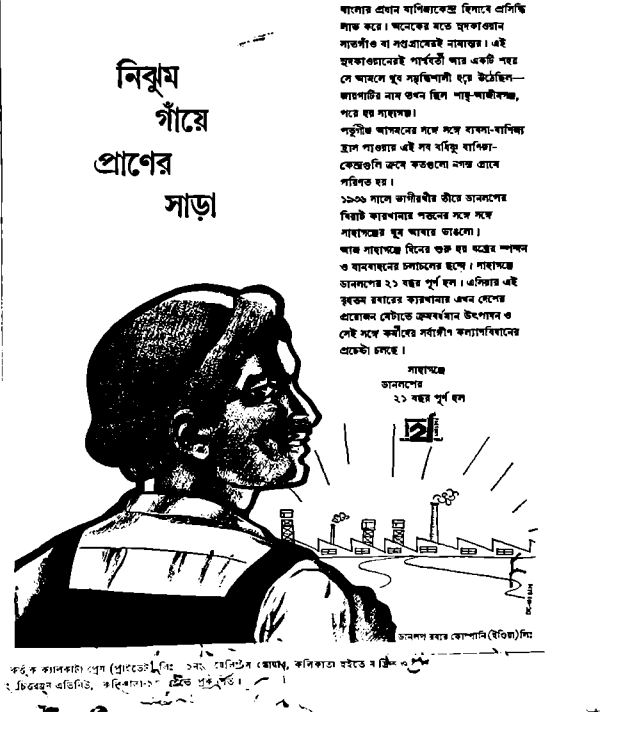

চলুর্নি পরাশ্চীর প্রতিষ্ঠিত পত্রিকাকে ইংরে বহুতা বাংলার মুখরাওয়ার নজর এনে সেখানকার সমৃদ্ধি দেখে বিস্মিত হন। তিনি উদ্ভাসিত ধরে বলেন, "এত সত্তায় জিনিষপত্র আমি দুনিয়ার আর কোথাও দেখিনি।" মুখরাওয়ান জবে বাংলার প্রধান খাদিজাতদ্রে হিসাবে প্রতিষ্ঠি লাভ করে। অনেকের মতে মুখরাওয়ান সাতগাঁও বা সপ্তগ্রামেরই নামান্তর। এই মুখরাওয়ানেরই পার্শ্ববর্তী আর একটি নগর যে আমলে খুব সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠেছিল— জায়গাটির নাম তখন ছিল শাহ্-আজীবন্দ্র, পরে হয় সাতগাঁও।

পর্তুগীজ আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য হ্রাস পাওয়ায় এই সব বনিয়ু খাদিজা-কেন্দ্রগুলি ক্রমে কতগুলো নগণ্য গ্রামে পরিণত হয়।

১৯০৯ সালে ভাগীরথীর তীরে ডানলপের বিরাট কারখানার পত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাম্প্রাসন্ন ও নব আয়ুর আরম্ভ তাহলো।

আজ সাম্প্রাসন্ন দিনের শুরু হয় অত্রের শব্দন ও যানবাহনের চলাচলের মধ্যে। সাম্প্রাসন্ন ডানলপের ২১ বছর পূর্ণ হল। এসিয়ার এই বৃহত্তম রবারের কারখানার এখন দেশের প্রয়োজন মেটাতে ক্রমবর্দ্ধমান উৎপাদন ও সেই সঙ্গে কর্মীদের সর্বাঙ্গীন কল্যাণবিধানের প্রচেষ্টা চলছে।

সাম্প্রাসন্ন
ডানলপের
২১ বছর পূর্ণ হল

ডানলপ রবার কোম্পানি (ইণ্ডিয়া) লিঃ

সম্পাদক, প্রকাশক ও মুদ্রাকর শ্রীবিজেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য কর্তৃক ক্যালকাটা প্রেস (প্রাইভেট) লিঃ ১৯৯, রবিন্দ্র রোড, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও ৫ বিপিন পাল রোড, দর্পণ কার্যালয় হইতে প্রকাশিত।

পৌরসভায় তিন কোটি টাকার ঋণপত্র লইয়া ফাটকাবাজী

সাপ্তাহিক সংবাদ সাময়িকী : কলিকাতা—৭ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার ১৯৫৮ :: মূল্য ২৫ নঃ পঃ

কিশোরীলালের কীর্তি

- ফিনান্স কমিটির ধুরন্ধরদের বিরুদ্ধে
- ত্রিগুণা সেন নীরব কেন ?

(দর্পণের নিজস্ব প্রতিনিধি)

নেয়র ডাঃ ত্রিগুণা সেন কাউন্সিলরদের করতালির মধ্যে এক বৃহৎ সংক্ষেপ ঘোষণা করেছেন—তাঁর বর্তমান নেয়রের বাকি ৮ মাসের মধ্যেই কর্পোরেশনকে দুর্নীতি-মুক্ত এবং বিভিন্ন বিভাগকে নিঃস্বার্থ জনসেবার উপযোগী করে পুনর্গঠিত করবেন।

কাউন্সিলরদের অনুমোদন পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি কাজে হাত দিয়েছেন।১৩টি কমিটি ইতিমধ্যেই গঠিত হয়েছে। কোনো কোনো কমিটির কয়েকটি মিটিংও হয়েছে। কমিটিগুলোর মধ্যে কয়েকজন বাইরের লোক আছেন বিশেষজ্ঞ হিসাবে।

ডাঃ সেনের কর্পোরেশনের সঙ্গে সম্পর্ক বেশী দিনের নয়। সব খুঁটিনাটি ব্যাপার হয়ত তিনি আজও বুঝে উঠতে পারেন নি। কিন্তু কর্পোরেশনের ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটিগুলোকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র ডিপার্টমেণ্ট ও অফিসারদের কার্যকলাপ অনুসন্ধান করে তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবেন —এ দুরাশা তিনি পোষণ করেন দেখে আশ্চর্য হতে হয়।

বলাবাহুল্য দেখা যায় উদ্বৃত্ত হয়েছে ৮০ লাখ টাকা বা তারও বেশী। একেবারে তেলকী। বাজেট অবশ্য প্রথম তৈরী করেন কমিশনর স্বয়ং। কিন্তু সকলেই জানেন—আইন যাই হোক না কেন—কমিশনারকে কিন্যান্স কমিটির কি চাপের মধ্যে কাজ করতে হয়। বাজেটের প্রকৃতি কেন এমন হয়, কোন স্বার্থ—এর পেছনে কাজ করে, অনুসন্ধান করলে অনেক তথ্য বেরিয়ে পড়বে।

পুনর্নিয়োগের নমুনা

উধ্বতন কর্মচারীদের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়ায় বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা না করে পশ্চিমবঙ্গে সরকার কর্তৃক অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীকে পুনর্নিয়োগের একটি জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত সদ্য সদ্য আমাদের হস্তগত হয়েছে।

কিছু দিন পূর্বে মেজর এস, দত্ত নামক কোন্নীর সরকারের জনৈক অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীকে ৪৫০, টাকার বিশেষ বেতনসহ ১৬ শত টাকা মাসিক বেতনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ডেটারিয়ারি সার্ভিসের ডাইরেক্টর পদে নিযুক্ত করা হয়। তিনি যাতে এই বিশেষ বেতন পেতে পারেন তার জন্য অ্যানিমেল হাজব্যাণ্ডি, বিভাগটিকে ডেটারিয়ারি সার্ভিসের সহিত যুক্ত করে তার ডাইরেক্টর উচ্চ ডয়রোলোকের উপরেই ন্যস্ত করা হয়।

এই বেতন এবং বিশেষ বেতনের বলে তিনি রাজ্য সরকারের কৃষি বিভাগে এক অস্থিতাঁর স্থানের অধিকারী হয়েছেন। তাঁর মোট বেতন কৃষি অধিকর্তা ডাঃ এস, কে নন্দীর চেয়েও বেশী। আর ডেটারিয়ারি সার্ভিসের সহিত অ্যানিমেল হাজব্যাণ্ডিকে যে যুক্ত করা হয়েছে তা তো শুধু নামে মাত্র। কারণ এখন পর্যন্ত বাদেও ডাঃ নন্দীই অ্যানিমাল হাজব্যাণ্ডির দেখা শোনা করেন, তথাপি এতদসত্ত্বেও যে বিশেষ বেতন তা ডাঃ দত্তই পেয়ে আসছেন।

সম্পাদকীয় ঃ

স্বজাতি হত্যা

কোনো একটি জাতি বিশেষের দ্বারা গোটা দুনিয়ার জাতির ভবিষ্যৎ কখনো বিপন্ন হতে পারে, একথা সহজে কল্পনা করা যায় না। কিন্তু এই আপাত-অবিশ্বাস্য সত্যই শ্রীযুক্ত বেগের চাঁদ বাগ্‌ড়া প্রমাণ করেছেন। সর্বনাশ সাধনের অসামান্য ক্ষমতা ঈশ্বরের কৃপায় তাঁহাতে-গুপ্ত রয়েছিল। এবং এই ক্ষুদ্র, খর্বকায় ব্যক্তিটির কৌশলপূর্ণ চক্রান্তের ফলে এক বৎসরের মধ্যে পূর্ব ভিয়েতে গোটা হিন্দু সমাজ একটা অন্ধকূপ হত্যার মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে।

এক বৎসরের মধ্যে তিনি ক্রমে ক্রমে তিনটি মারাত্মক সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন। প্রথমতঃ, পতন উদ্যতদের, অর্থাৎ যাঁরা ভবিষ্যতে পূর্বের থেকে ভারতবর্ষে পুনর্বার ফিরতে চাইবে তাদের সর্বপ্রকার পুনর্বাসনের সাহায্য প্রত্যাহার করা হবে। দ্বিতীয়তঃ, বাঙালী যেসব ক্যাম্পগুলিতে বে উদ্বাস্তরা রয়েছেন, তাদের খয়রাতি সাহায্য বন্ধ করে দিয়ে বাইরে বাওয়ার জন্য বাধ্য করা হচ্ছে। তৃতীয়তঃ, সব চেয়ে বেটা সাংঘাতিক কথা, ভারতীয় হাই কমিশনারের সঙ্গে পোলস আগরেডাটিভের দ্বারা এই ব্যবস্থা হয়েছে যে, পূর্বঙ্গ থেকে আর কোন হিন্দুকে সহজে ভারতবর্ষে আসতে দেওয়া হবে না। তিনটি সিদ্ধান্তই যদি যুগপৎ কার্যকর হয় তাহলে একথা নিশ্চিন্ত যে, জাতির এক দুর্ভাগাদের অস্তিত্ব লুপ্ত হবে। একথা আজ প্রত্যেকটি বাঙালীর অন্তরের কথা প্রকাশের যে, সমস্ত রাজনীতি এবং বৈষয়িক প্রশ্নের ঊর্ধ্বে একটা প্রশ্ন আছে। সেটা মানবতার প্রশ্ন। শ্রীযুক্ত বাগ্‌ড়া বাঙালাদেশে যেই মানবতার হত্যা কাণ্ড ঘটাতে চলেছেন।

১৯৪৭ সালে ভারত ব্যবচ্ছেদের যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল, কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন দপ্তরের বর্তমান কর্মকর্তাগণ সম্ভবতঃ তার চেয়েও 'অবাস্তবিক এবং অন্যায়। শুধু একজন দ্বারা এই কার্য সম্ভব হত না। পূর্ব ভিয়াপ্রকৃতে পশ্চিমবঙ্গের একশ্রেণীর অবুঝদার রাজনীতিকের সহায়তা তিনি লাভ করেছেন। বিগত নির্বাচনের সময় বাঙালাদেশের কংগ্রেস এবং শ্রীযুক্ত বাগ্‌ড়া একটি অদ্ভিবিত চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছেন। সেই চুক্তির সার কথা হচ্ছেএই যে, পশ্চিমবঙ্গকে উদ্বাস্তু সমস্যা মুক্ত করা হবে এবং বেসকল মুসলিম পুরুষোন্ন হয় পূর্ববঙ্গের নীরবে নোঃ-বর্বনিকা টেনে দিবে। অর্থাৎ বাঙালী সমাজের এক তৃতীয়াংশকে কশীবানার নিক্ষেপ করার জন্য এই দুইটি শক্তি এবন একত্র হয়েছেন। পৃথিবীতে যে জাতির কোনো রাষ্ট্রভূমি ছিল না—সেই ইহুদীদের প্রতিও এতখানি নিরয় ব্যবহার করা হয়নি। জাপান জাতির ইচ্ছার বা স্বমতে জাবাণী বিধিছিত হয়নি। তথাপি আজ পর্যন্ত পশ্চিম জার্মানীতে এ কথা কেউ উচ্চারণ করতে সাহস পাবেনা যে, পূর্ব জার্মানীর উদ্বাস্তদের আগমনের পথ বন্ধ করে দেওয়া হোক।

অথচ বাঙালাদেশে এই দুঃখাহ্নিক হত্যাকাণ্ড ঘটাতে শ্রীযুক্ত খাগুনকে বিশেষ কোনো বেগ পেতে হয়নি। যে সংবাদ পত্রগোষ্ঠি সাড়ে বৎসর পূর্বে পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের জন্য অনুকম্পার্থনের দ্বারা সংবাদ পত্রের পৃষ্ঠার সংখ্যা ভীড় করেছিলেন, অথবা যে সমস্ত ভূমিকেশীর ভ্রমান্টিয়ার শুধু এই ভারত সরকারদের ফলেই বহিষ্কৃতের পদী লাভে সক্ষম আজ তাদেই এই চক্রান্তের পৃষ্ঠাক সহযোগী। কিংবা নীরব দর্শক। এই স্বজাতি হত্যার বিরুদ্ধে বাঙালী জাতি যদি সংঘবদ্ধ না দাঁড়াতে পারে, তাহলে ইতিহাস আমাদের বুধ কলঙ্কিত করে যেবে।

উদ্বাস্তুদের বঞ্চনার সুপরিকল্পিত ফন্দী

(দর্পণের নিজস্ব প্রতিনিধি)

উদ্বাস্তু সমস্যা সম্পর্কে শুধু যে কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে সরকারী নীতির সূচনা দেখা যাচ্ছে তাই নয়, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি অভিসন্ধিও ফুটে উঠছে। এই কুখ্যাত নীতির নামে তাঁরা পূর্ববংগ থেকে ভবিষ্যতে যত উদ্বাস্তু আসবে তাদের সাহায্য এবং পুনর্বসতির সর্বপ্রকার সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করার সিদ্ধান্ত করেছেন।

● উপরন্তু যে সকল উদ্বাস্তু আগে থেকেই এসে সরকারী ক্যাম্পে এবং বাইরে নানা যায়গায় পোচনীয়ভাবে দিন যাপন করছেন—তাঁদের সম্বন্ধে সকল প্রকার দায়িত্ব প্রত্যাহার করার জন্যও সরকার ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। এতাবৎ অজ্ঞাত এবং অপ্রকাশিত কতকগুলি তথ্য আমাদের হস্তগত হয়েছে।

● সম্প্রতি কলিকাতায় অনুষ্ঠিত সরকারী নীতিনির্দ্ধারকদের এক সম্মেলনে ঘোষণা করা হয়েছে, এখন থেকে এই "হতভাগ্য" ব্যক্তিদের জন্য কিছু কিছু চাকুরী ব্যতীত সুযোগের ব্যবস্থা করা ছাড়া সরকারের আর বিশেষ কিছু করণীয় থাকবে না।

সরকারী-ক্যাম্প বহির্ভূত দশ লক্ষ উদ্বাস্তুদের জন্য এই ভবিতব্য স্থিরীকৃত হয়েছে। এবং ক্যাম্প নিবাসী তিন লক্ষ নরনারী আর নিজস্ব সম্পর্কে তাঁরা স্থির করেছেন যে, বাঙলার বাইরে তাদের পুনর্বাসন দেওয়ার সিদ্ধান্তে তারা অটল থাকবেন এবং যে সকল উদ্বাস্তু তাদের এই সঙ্কল্পের বিরুদ্ধাচরণ করবে, তাদের তাঁরা চোর এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করবেন।

প্রযোদের রবি কোন প্রয়োজন থাকে তবে চলতি আর্থিক বৎসরের মধ্য দানে পশ্চিমবঙ্গের সাহায্য এবং পুনর্বাসন দপ্তরের ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ নক্ষ করা যেতে পারে। ব্যয়ের পরিমাণ এই কথাই প্রমাণ করে যে, কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকার উদ্বাস্তু সমস্যার ব্যাপারে এক তরফা ব্যয় দিচ্ছেন, তেবনি তার একটা ব্যাঘাতাতি সমাধান করে কেলবার জন্যও ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমতিতেবই যে কেন্দ্রীয় সরকার উদ্বাস্তুদের একটা বিরাট অংশকে (যে সকল উদ্বাস্তু আগে থেকে এসে নানা জায়গায় ডাঙা বাড়ীতে বসবাস করছে) পুনর্বাসনের সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত করছেন, যা তো সহজেই বোঝা যায়।

এর ফলে অবশ্য এই রাজ্যে ১৯৫৭-৫৮ সালের বাজেটে তিন কোটি টাকা ব্যয় সংক্ষেপ হয়েছে। চলতি আর্থিক বৎসরের আর মাত্র দুটি মাস বাকি কিন্তু অবশিষ্ট এলোটেরও শতকরা ২৫ ভাগ টাকাও তাঁরা বন্টন করে উঠতে পারেন নি। এই নিষ্করুণ উদাসীনতা একটা সুচিন্তিত নীতির পরিণতিমাত্র এবং সেই নীতির উদ্ভাবক হলেন ভারত সরকারের পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীমেহের চাঁদ খান্না।

ঐনু কুটনীতির ঠিক উপযুক্ত সময়েই তাঁর অন্তত কল্পনায় জাল বুননার অনুকূল পরিবেশ পেয়েছিলেন। অরনিত উদ্বাস্তু আগমনের ফলে, যখন রাজ্য সরকারের আর্থিক সঙ্গতির উপর ভয়াবহ চাপ পড়তে থাকে এবং এই রাজ্যে পূর্ববঙ্গিত সংখ্যান সন্তুলান ক্রমাগত কীণ হতে থাকে, তখনই তিনি তার আকাঙ্ক্ষিত সুযোগটি লাভ করলেন, এবং রাজ্য সরকারের মন্ত্রীবর্গ ও অন্যান্য কংগ্রেস নেতাদের দ্বারাই এই সুযোগ রাষ্ট্রত হয়েছিল। শ্রীখান্নাও বুঝতে পারলেন যে এবন বক্তব্য তাঁর হাতে এসে গেছে যা দিয়ে তিনি নেহরুকে বোঝাতে পারবেন যে তিনি পূর্ব বঙ্গের উদ্বাস্তুদের বিরাট সমস্যাটির সমাধান করে ফেলেছেন এবং তাদেরই কেবিনেট মন্ত্রী হওয়ার দাবীটা তিন নেহরুর কাছে বেশ জোরের সঙ্গে পেশ করতে পারবেন।

(২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

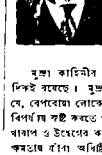

সততা বঞ্চিত ব্যক্তির মন্ত্রিত্বে অধিকার নাই

কৃষ্ণমাচারীকে অবিলম্বে গদীচ্যুত কর

দর্পণের বাণিজ্য সম্পাদক

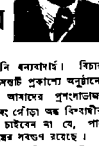

মুন্দ্রা কাহিনীর ভাল ও মন্দ দুটো দিকই রয়েছে। মুন্দ্রা দিকটা হচ্ছে এই যে, বেপরোয়া লোকেরা এবনও বাজারে বিদর্যস্থ সৃষ্টি করতে পারে। এবং আরও খারাপ ও উদ্বেগের কারণ এই যে, শাসন কতৃত্বে যাঁরা অধিষ্ঠিত আছেন তাঁরাও এখনও পুরোমাত্রিত হয়ে থাকেন। আর এই কাহিনীর ভাল দিকটা হচ্ছে এই যে, পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের কার্যকারিতার এটা একটা জলন্ত দৃষ্টান্ত।

সাধারণতঃ এক নায়ক শাসিত দেশে পরিষ্কিতে যেমন, সেখানে চোপ্পা করিলে গ্রহনের কথা কল্পনাতীত। প্রধান মন্ত্রীর প্রশংসা স্বরূপ একথাও বলতে হবে যে, আপাতঃ দৃষ্টে একটা অপ্রীতিকর ঘটনার দায়ত্বও যে তাঁরা নিজে এগিয়ে কৃষ্ণমাচারীকে পুরস্কারপুরস্কৃত করেও বরবার দাবিদ্যু এড়িয়ে জানবি। একথা একটা সেদেশ থাকতে পারে যে বিরোধী দলের কোন সদস্য যদি এই চাঞ্চল্যকর তথ্য উদ্ঘাটন করতেন তাঁহলে প্রধানমন্ত্রী এত তাড়াতাড়ি তদন্তের নির্দেশ দিতেন কিনা। যাই হোক, ফিরোজখাঁর যেরূপ সাহসিকতার বলে এই পোপন রেলদেবের কারবারটি ফাস করে দিয়েছিলেন এবং সরকারী কর্মচারী প্রশাসনিক নৈতিক মান উন্নয়নের জন্য সচেষ্ট হয়েছেন, তার জন্য তিনি ধন্যবার্হ। বিচার-পতি চাগলা তদন্তটি প্রকাশ্যে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করায় প্রশংসার পুরস্কারভাজন হয়েছেন। এবং যেঁটা অন্ধ বিশ্বাসীরা খুঁজে করতে চাইবেন না যে, পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের নবরূপ ধরেছে।

মুন্দ্রা কেলেঙ্কারী আমাদিগকে অনেক কিনিস সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তিত করে তুলেছে। পুথমতঃ সমস্ত রাজনৈতিক দলই সম্পদ ও শক্তি কেন্দ্রীকরণের বিরোধী। ওপরতেও এই কেন্দ্রীকরণ যে অব্যাহতভাবে চলেছে মুন্দ্রার ব্যাপারে সেই সত্যটি জলমেছে

(২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জিতরের পাতায় চাগলা কমিশনের পূর্ণ সারমর্ম ঃ

বাঙ্গালী বিতাড়নের গভীর চক্রান্ত
ইউনেস্কো কেন্দ্রে অরাজকতা
গবেষণা উপেক্ষিত ঃ ভারতের সুনামে ডিরেক্টরের কলঙ্ক লেপন

(দর্পণের নিজস্ব প্রতিনিধি)

ইউনেস্কো আর ভারতের মুক্ত বায়ে দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্রগুলির জন্যে এক বছর আগে কলিকাতায় যে গবেষণা কেন্দ্রটি স্থাপিত হয়েছে, তার গবেষণার রিপোর্ট যে নির্ভারিত সময়ে-এখন কি, তার অনেক পরেও তৈরী হবেনা, সে বিষয়ে সকলেই এখন নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। এই বছর মার্চ মাসে গবেষণার রিপোর্ট সবার হবার কথা; কিন্তু বলতে জানা যায়, কাজের ধুম যাদানায় এরিয়েছে- রিপোর্ট কবে তৈরী হবে—তা কেউই বলতে পারেন না।

অথচ, এই গবেষণার সকল পরিসংখ্যান সে ভারতের অর্থাৎ শুধু নয়-আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের সম্মান ও মর্যাদায় বিঘ্নিত হচ্ছে।

কিন্তু গবেষণার কাজ এযোবদি কেন্দ্র আরম্ভ হয়নি, তার কারণ কি? কারণ হচ্ছে ডিরেক্টর। ইউনেস্কো কেন্দ্রের ডিরেক্টর, যেটা যেটা আইনের বিশেষজ্ঞ—আর তার সাথে তার মিলিয়ে অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়ের তো অভাব ছিলনা। তবু কের্ব এই ব্যাবস্থা, কেনই বা বিদেশী বিশেষজ্ঞরা যতাদন এ বিরাজ করে বিদায় নিচ্ছেন? গবেষণা কেন্দ্রের গাত্র, বাহির আবাসে আজ বছরেরও বাকীদেরও কাছে এই কেন্দ্রের দ্বার রুদ্ধ হয়ে আছে কেন? এই সব প্রশ্ন আজ জনসাধারণের অন্তরে জাগছে।

এই সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে গবেষণা কেন্দ্রটির বিভিন্নকার অবস্থার দিকে তাকালেই বুঝে চিত্র দেখতে পাওয়া যাবে, তা আর কা-ই বোঝাবার নয়। গবেষণা কেন্দ্রের চির নবীন ডিরেক্টর ডিরেক্টরের রোগাক্রান্ত অবস্থাকে সি, এল, আইনে, মার্কেল ব্যাঙ্ক অন্যান্য বহুল নিন্দিত ব্যয় ৭০০০৲ টাকা ঘর ঢাই আসে। গবেষণার কাজে নজর দেবার সময় তাঁর কোথায়? কেন্দ্রে, সংগঠন, পরিচালনা ব্যাপারেই তাঁর উদ্যমে বেশী। কারণ করে নেবার মাইলের গভর্নমেন্টে কিরকমে নিজের লোকদের বসাওয়া যায়, কি করে ব্যাঙ্কোনদে বাঙালী বিতাড়নে সক্রিয় কাম হওয়া যায়—এই সবই এখন তাঁর গবেষণার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

১৯৫৭ সালের জানুয়ারী মাসে ইউনেস্কো কলকাতায় এই গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করেন। দক্ষিণ এশিয়ার কোথায় এই কেন্দ্রটি স্থাপিত হবে, তাই নিয়ে ভারত ও পাকিস্থান উভয়েই ছিল প্রবল দাবীদার। শেষে অনেক বিবাদ বিসম্বাদের পর ভারতেই কেন্দ্রটি খোলা হল। অনেক দেশ এই ব্যাপারে ভারতের হয়ে ওকালতি করেছে। আফিণানিস্থান থেকে ফিলিপাইন—১৩টা দেশের জন্য এই কেন্দ্র।

দক্ষিণ এশিয়ার শিলপ্রসাবের সে সাবাজিক প্রতিক্রিয়া তাহাদিগকে এই হল গবেষণার বিষয়। কথা ছিল একদল বিশেষজ্ঞকে নিশ্চিন্ত করেই এক বিশেষ পদ্ধতিতে বিভিন্ন দেশে গবেষণার কাজ চালানোর।

কিন্তু সময়মত অর্থাৎ ১৯৫৮ সাল মার্চে রিপোর্ট বেরোবে না কে? ভারত সরকার পুছুর অর্থ দিচ্ছেন, নানাবকম সুবিধা দিচ্ছেন আর এর সঙ্গে ডিরেক্টর বান ও সম্মান ও স্বস্তিও। উপযুক্ত কর্মীরও অভাব ছিলনা। তবু এই বিলম্ব কেন? এক কথায় বলতে গেলে বলতে হয়, বড়বান ডিরেক্টরের উৎসাহের আধিক্যই হল এই বিলম্বের কারণ। গবেষণার কাজ ছাড়া, আর সবই এই আধিকা পরিলক্ষিত। পারিরে ইউনেস্কোর প্রধান কার্যালয়ে তিনি নানা রকম আজগুবি রিপোর্ট পাঠিয়ে তাঁদের শান্ত রাখছেন।

জানুয়ারী মাসে কেন্দ্রস্থাপনা থেকে কাজ বন্ধ চলছিল না। আনুষ্ঠানিকভাবে কেন্দ্র স্থাপিত হওয়ার আগে থেকে এবং তার পরেও অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়েছিল। তাদের বিবেচনামের নির্দেশ তৈরী হ'ল। ১২৯টি প্রশ্নাবলীর এক তালিকা। কলকাতার শ্রমিক জীবনের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক তথ্য জানাই ছিল এই প্রশ্নাবলীর লক্ষ্য। তারপর এলেন অধ্যাপক সি, এন, ভকিল ডিরেক্টর হয়ে ১৯৫৭ সালের মার্চ মাসে। ওলন্দাজ বিশেষজ্ঞ ডাঃ ডাক্লুইজ, যিনি এতদিন প্রধান ছিলেন, তিনি হলেন ডেপুটি। উদ্দেশ্য এই যে, স্বাধীন অবস্থা ভালভাবে জানবেন এবং একজন ভারতীয়ের তত্ত্বাবধানে গবেষণা চালান হক। প্রঃ ভকিল হলেন এই ভারতীয় বিশেষজ্ঞ বোম্বাইয়ের খুল অব ইকনমিক্সের ডিরেক্টর। অধ্যাপক ভকিল এসেই যেন কাজ শুরু করলেন। অফিসে অফল-বলল হতে লাগল। তার উদ্দেশ্য যাই থাকুক আসলে তাতে কেন্দ্রের কর্মীদের কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি হতে থাকল।

শ্রী ডি, এন, পর্শা কেন্দ্রের এডাবিশ-মেণ্ট অফিসার। ভভলোক বাংগালির ছেলে ছিলেন। কিরে এসে তাঁকে আর কাজে যোগ দিতে হল না। তাঁর বিকল্পে তাঁর সহকর্মীদের বিরে ভ্রান্ত সৃষ্টি করা হল। তাঁরা রাষ্ট্রী য়নতিতিদের না করম তার দেখান হল। প্রশিক্ষিত লোকরা হল পূর্ব বেতন এবং ভাতাসহকে ছুঁ মাসের ছুটি। সে ছুটি যখন শেষ হল, তখন তাঁর কাজও ফুরিয়েছে। তিনি বিনায় নিতে বাধ্য হলেন। শ্রীপর্শার মা ঃ্রাণায় এসেদেখুন অফিসার—শ্রীরামভজন ও শ্রীপাণ্ডিয়ে। দুজনেই বোম্বাই থেকে এসেছে। একজন অধ্যাপক ভকিলের আত্মীয়। শ্রীরামভজন বোম্বাইতে তাঁর ষ্টেনোগ্রাফার ছিলেন। তিনি হলেন একাউন্টস অফিসার। এস্টাবিসমেণ্ট অফিসারের কাজ তিনিই করতে লাগলেন। শ্রীপাণ্ডি হলেন রেজিষ্ট্রেসন অফিসার। তাঁর প্রধান কাজ হল চিঠিপত্র পাঠানো। দুজনেই মাসে ৭৫০৲ টাকার ওপর পান।

কোকনিয়ার সম্পাকেও অধ্যাপক ভকিল নতুন ধারার প্রবর্ত্তন করলেন। ওঁকে দেখে মনে হয় তিনি বিশ্বাসই করেন না, বাঙ্গলা দেশ উপযুক্ত লোক পাওয়া যায়। তাঁর চারি বোম্বাইয়ের লোক। মেথারা, চাপরাসী দরকার? আনিয়ে নাও বোম্বাই থেকে। এ্যানিসিপাই দারিবেয়ারার দরকার? আনাও বোম্বাই থেকে। মাইনে একটু বেশী দিতে হবে বৈকি। দারিবেয়ারদের ফ্রীথি বেশী? তাতে কি? কলকাতা কিংবিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী কোর্স পাশ করে সেবে সময়মত। এই হচ্ছে ডিরেক্টর সাহেবের চিন্তাধারা। তা কলকাতায় বড়ই বেকার ডিগ্রীধারীরা থাকু না কেন।

ডিরেক্টর অধ্যাপক ভকিলের দৈনিক ভাতা ৭২৲ টাকা মাহিনে গেলে। অতএব তাঁর হল বন কাজ থাকে বোম্বাইয়ে, আর বোটা বোটা অঙ্কের বলি হয়। এদিকে কিছু মাত্রাধিকা হয়েছে বেহারের। না হলে একটা বিল সম্বন্ধে ডাঃ ডাব-লুইস, প্যারিসে ডভারবে লিখলেন কেন ?" "আবার মনে হয় অধ্যাপক ভকিলকে পুনেয় ফিরে কিছু ভুল আছে। ওটা দৈনিক ৭২৲ টাকা হিসাবে হবে আর। কিন্তু আমার ধারণা নিজের বাবা পরবে কোন কাজে গিয়ে নিজের বাড়ীতে থাকলে ওই হিসাবটা কি ব্যাপ হতে পারে"

তারপর এল শুরু হয়েছে ব্যয়-সংকোচ। দিনের বেলায় হুকার হলেও আলো জ্বালবে না, টেয়াবের উপর দুটো বাল্ব হবে, আর বালিশ থেকে সেই মাপে আনার জন্য অফিসের গাড়ীও ব্যবহার করা হয়।

পৌরসভার ঋণপত্রে ফাটাকাবাজী

(প্রথম পৃষ্ঠার শেষাংশ)

পর পরই নির্বাচনে কাউন্সিলরেরা তাঁর বক্তব্য শুনতেছেন ও বিশেষের মতামত ব্যক্ত করেছেন। শুধু দুটিতে উপস্থিত থেকে আমার মনে হয়েছে, কাউন্সিলরদের আকাঙ্ক্ষা প্রধানতঃ ১৯৫১ সালের আইনের উপর কাঁচা এতে তাদের ক্ষমতা কিছুটা সংকুচিত করা হয়েছে। এখন তাঁরা অফিসারদের দৈনন্দিন কাজে হস্তক্ষেপ করবার অধিকার থেকে আইনত বঞ্চিত।

কিন্তু শুধু এখানে উদ্রেখ করা যেতে পারে। আজ তিন বছরের বেশি হল ফিন্যান্স কমিটির অনুমোদনের কলে কর্পোরেশন "বাজার" থেকে প্রায় তিন কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ করে। তার কর্পকর্তব্য ব্যয় হয়নি।

ঋণ তোলা হয় তখনই যখন কোনো বড় নতুন কাজ হাতে নেওয়া হয়। সাধারণত ঋণ গ্রহণ করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে এবং পুরানো পাকাপাকি তৈরী হয়ে যায়। কিশোরীলাল বাবুর আদেশে উল্টো ব্যবস্থা। কলে, ঋণ তোলা হল। কিন্তু তিন চার বছরেও কাজ আরম্ভ হোল না কিন্তু এই কাজ বছরে ১০।১২ লক্ষ টাকা খরচ কর্পোরেশনকে গুণে দিতে হচ্ছে।

ফিন্যান্স কমিটির পূর্বে কিশোরীলাল বাবুর নেতৃত্বে কর্পোরেশনের একদল মাতব্বর ডাঃ রায়ের সঙ্গে দেখা করেছিলেন—আজও চার কোটি টাকার ঋণ তুলবার প্রস্তাব বুধ্যক্ষীন "ফেডেছার" জন্য। এখনওঠা টাকা বাজার থেকে তোলা হয়নি। হয়েও থাকতে পারে। কারণ, এর তুলবার ব্যাপারে ফিন্যান্স কমিটি এবং ফিন্যান্স ডিপার্টমেণ্টে অত্যন্ত গোপনীয়তা অবলম্বন করে চলেন। বছর তিনেক আগে যে ধার তোলা হল, কে জানে কেন কবে একটি মাত্র দালাল ও একটিমাত্র বীমা কোম্পানীই পূর্বে থেকে খবরটা জানতে পেরে একে-বারে টাকা সঙ্গেত হাজির। এবং বলা বাহুল্য তাদের সুপারিশ দিয়ে ঋণ তৎপরতার সঙ্গে পূরীত হয়ে গেল।

ঋণের টাকাগুলো কবলাতাদের কোনো উপকারে কিংবা কাজে আসে নি যে কারণ তাদেরই আগে নি তা নয়। টাকাগুলো অবনি অবনি বসে থাকে না। এ নিয়ে এক প্রকার কাটাকাবাজী চলে। কত্ত ব্যাপক এর আসর। বুকোটি পঁচাত্তর লক্ষ টাকা।

কর্পোরেশনের হাতে কিছু আয় হয় এ জন্যে এ টাকা লগ্নী করা হয়—প্রধানত কর্মচারী, ইন্সুরেন্সকে ট্রাষ্ট ও পোষ্ট ট্রাষ্টকে পত্রে। এ সব পত্র কিনবার জন্য দালাল আছে—কিশোরীলাল বাবু তাদের সবচে বিশ্বাসির খবর রাখেন বিশ্বাসী। কারকেই নতুন দালালও না—কি কর্পোরেশনের ঋণের টাকার চারপাশে ঘোরাফেরা করেন।

বহুদিন যাবত কর্পোরেশনের করেকটি ব্যাঙ্কের সঙ্গে লেনদেন ছিল। সে সব ব্যাঙ্কের সঙ্গে সাফলিতি বা ডুল হয়েছে, একথা কেউ বলেননি। তথাপি কোনো রহস্যজনক পুরোজনে গত চার বছরে নতুন দুইটি ব্যাঙ্কের সঙ্গে কর্পোরেশন সংঘোগ স্থাপন করেছেন। এখন কোন্ কোন্ ব্যাঙ্ক মারফৎ সিকিউরিটি ক্রয়-বিক্রয়ের চাকা লেন—যেন রহ ?

কিশোরীলাল বাবু কাপড়ের ব্যবসা এবং আবগারী প্রণালীর বাবসায়ে কবিয় কর্মা পুরুষ। কর্পোরেশনে প্রবেশ করার পর তিনি ফিন্যান্স এক্সপার্ট—প্রায় কর্মকুশল হয়ে উঠেছেন। অন্যান্য হ্যাবিং কেশিকে ছেড়ে দিলাম, ফিন্যান্স কমিটির কার্যকলাপ থেকে আমরা অনুমানের প্রত্যবে তিনি নাম দেবেন আশা করা যায় না কি? কারা এতগুলো ঋণের টাকা দিচ্ছে সেদের দেখা দিয়েছে। চতুর্থত: পাবলিক-কর্পোরেশন ও কোম্পানীগুলিতে রহিদের ক্ষমতাকে বহু করার জন্য যতদিন পর্যন্ত সক্রিয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা না যাবে ততদিন জনস্বার্থের বাতিরে রাষ্ট্রীকরণ এবং সরকারী মালিকানায় রাখী নীতিগুলি ভাবে বহু করে আনতে হবে। আমরা সকলেই সমাজের যে লক্ষ্যে উপনীত হতে চাই, তার জন্যে এর চেয়ে উন্নতরের কোন পছতি বের কর যায় কিনা সেদিকেও আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে।

এই প্রশ্নগুলির যৌক্তিক সমাধান এবং জন সাধারণ উভয়কেই লোকায়ত্তিক

সত্তরা বর্জিত ব্যক্তির মন্ত্রিত্বে অধিকার নাই

(১ম পৃষ্ঠার শেষাংশ)

উপযাক্ত করেছে। দ্বিতীয়তঃ এই কেন্দ্রীকরণ রোধ করার জন্য আনেক আইন পুণীত হলেও কোম্পানীর পরিচালনার আনেক ত্রুটি ও দুর্নীতি সমানভাবে চলেছে। এই আইনগুলির চরম ব্যর্থতাই মুত্রা জনসাধারণের কাছে প্রমাণ করে দিচ্ছে। পুনু হয় কেন এমন হয় এবং এর প্রতীকার কি? তৃতীয়তঃ পাবলিক কর্পোরেশন কিংবা কোম্পানী গঠন সম্পর্কে আমাদিগকে খুব গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে; বিশেষতঃ সরকারী প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য যে সময় কর্ম-কর্তাদি নিয়োগ করা হয় মন্ত্রিদের হস্ত-কেপের ফলে তাদের কর্তব্য কর্মের কিছুদিন পরেই তাদের বদলি করা হয়। ফিরুপ বিচ্ছিন্ন ইতি এবং তার কল ঘাতীনভাবে ব্যবসা পরিচালনার সম্ভব কিনা সেবিষয়ে তাঁহারা গভীর সন্দেহ দেখা দিয়েছে। চতুর্থতঃ পাবলিক-কর্পোরেশন ও কোম্পানীগুলিতে রহিদের ক্ষমতাকে বহু করার জন্য যতদিন পর্যন্ত সক্রিয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা না যাবে ততদিন জনস্বার্থকে ঘাতিকে ঘাতীকরণ এবং সরকারী মালিকানায় রাখী নীতিগুলি ভাবে বহু করে আনতে হবে। আমরা সকলেই সমাজের যে লক্ষ্যে উপনীত হতে চাই, তার জন্যে এর চেয়ে উন্নতরের কোন পছতি বের কর যায় কিনা সেদিকেও আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে।

উদ্ভ্রান্ত বরুনার ফন্দী

(১ম পৃষ্ঠার শেষাংশ)

পশ্চিমবঙ্গের সাহায্য এবং পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীপুরুষ চন্দ্র সেন যে, এই পরিকল্পনার কোন বিরোধিতা করেননি শুধু তাই নয়, বরং তাঁর পক্ষ থেকে এ প্রস্তাবে পূর্ণ সম্মতি এবং সমর্থন জানানো হয়েছে। বিগত সাধারণ নির্বাচনে উদ্যাগুসের কংগ্রেসের বিপক্ষে ভোট দেওয়ার 'গাণাহ' শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সেন আজও ভুলতে পারেননি, (কংগ্রেসের কোন নায়কনা নেতাই বা সে কথা ভুলতে পেরেছেন?) এবং এই কারণেই বোধ হয় উদ্যাগুসের সম্পর্কে কোনো প্রস্তাব আগুয় দেখানো শ্রীসেনের পক্ষে অসম্ভব হয়নি। সেই জন্যই বোধ হয় তিনি তাঁর রাষ্ট্র মন্ত্রী এবং উপমন্ত্রীদের মধ্যে এবনভাবে দায়িত্ব বণ্টন করে দিয়েছেন যে, অধিকাংশ দায়িত্ব গিয়ে পড়েছে এবন সব লোকের উপর যাঁরা ডিপার্ট-মেণ্টে সেয়াডই মুক্ত আমলাদি। এখন কি তিনি তাঁর রাষ্ট্র মন্ত্রী এবং উপমন্ত্রীদের কাজের মধ্যে কোনো সমন্বয় সাধনের চেষ্টা পর্যন্ত করেননি, যার ফলে ডিপার্ট-মেণ্টের প্রতিটি বিভাগে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি চলেছে।

উদ্যাগু সমস্যার তড়িঘড়ি সমাধানের ব্যাপারে শ্রীমান্যুই এর সঙ্গেপ্রথক্য তা অবশ্য নয়। তার পূর্ববর্তী শ্রীমজিত প্রসাদ জৈনও এই ব্যাপারে হাত পাকিয়েছেন। তিনিও পূর্ববর্তরে উদ্যাগুদের কিছু ঋণ মঞ্জুর করে তিন মাসের মধ্যেই এই সব সমস্যাটাকে খারিজ করে ফেলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অত্যধিক কলপনাবিলাসী প্রতিপন্ন হয়ে তাঁকে বিদায় নিতে হয়। শ্রীখানদুায় কপালেও যে সৌভাগ্যই লেখা আছে তা তো এখ স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। কারণ নিয়মনয় প্রেসে এবং বাঁকুড়া জেলার কিছুদ প্রভৃতি জায়গায় অফিসারদের উপর হামলার ব্যবস্থা দিয়ে উদ্যাগুদের পুতিরোধের কিছুটা আঁচ পাওয়া যাচ্ছে।

বস্তুত, সমস্যাটাকে এই রকম এক-তরফা সমাধান করে ফেলার পুরণতাটা এসেছে সরকারী মহলের একটা বিশেষ দিকটায়ের থেকে; সেই চিন্তাধারাটি হচ্ছে এই যে, তাঁরা উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে, তাদের উপর যে "পবিত্র দায়িত্ব" ন্যস্ত হয়েছিল সে সম্বন্ধে কার্যকর কোন কিছু করতে তাঁরা নোচনীয় ব্যর্থ হয়েছেন কিন্তু সূত্রে জানা গেল যে তারা কিছুদিন আগে সিদ্ধান্তে ছাড়া যে, উদ্বাস্তু সমস্যা কার্যকর কোন রকম স্বীকার করেছেন যে, উদ্বাস্তু সমস্যার শতকরা পঞ্চাশ ভাগের পুনর্বাসন সরকার সম্পূর্ণ করেছেন হলে দাবি করেছিলেন। সেই দাবী সম্পূর্ণ ভুরো ডেকেও তাঁরা সেকেন্ড পুনর্বাসিত হবনি। তেকেও, তাদের সত্যিকারের পুনর্বাসিত করা ও তা দায়িত্ব সরকার কাছে আরাম ঘাট কোটি টাকা প্রার্থনা করেছেন।

এর সমুখীন হতে হবে। কিন্তু চাকলা ওপর কর্মিদলের আঘাত করতেগিয়ে তিনি আছে, যা জনসাধারণের অধিক দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কেরীর অধিকারী ও কতিপয় সরকারী কর্মচারী যেভাবে লক্ষ করেছেন তা কেলেঙ্কারী ছাড়া আর কিছু নয়। সাম্প্রতিক কাঠমোগাড় দাঁড়িয়েও তাঁরা সত্য গোপনের জন্য যেরূপ ব্যবহার করেছেন, তা অত্যন্ত গহিত। অর্থ মন্ত্রণালয়ের মুখ্য সেক্রেটারী, বীমা কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর প্রভৃতি গাহিত্যনীল ঝর্করচারীগণ যেভাবে কাজ করেছেন, তা অবহেলা পূর্ণ। তাঁরা তাদের পদের সম্পূর্ণ অযোগ্য। অর্থমন্ত্রী ভৌকসাহার একবন্য বলেছেন এবং করিশনের সামনে বলেছেন আর এক কথা। স্বভাবতঃই তিনির সত্যের অপলাপ করেছেন ।। এবং কোন অর্থমন্ত্রী যাঁর চারিত্রিক সততা সম্পর্কে জনসাধারণ আস্থা রাখিবেছে, যাঁহার গণি আটকে থাকা তাঁর পক্ষে উচিত নয়। সবচেয়ে খারা তাঁর পক্ষে রহস্যজনক হলো মুত্রায় এক সঙ্গে এতগুলি শেয়ার ক্রয়ের পিছনের উদ্দেশ্য, অথচ অর্থমন্ত্রণালয়ের মুখ্য সেক্রেটারী, রিজার্ভব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান ও ষ্টেট ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান, কারও মুত্রা এবং ঔঁর কার্য-কলাপ সম্পর্কে উচ্চ ধারণা ছিলনা, কিন্তু তাঁহারা চুপচাপ, জীবনবীমা কর্পোরেশন, জনসাধারণের গচ্ছিত অর্থনিয়ে মুত্রায় এই খেয়াওলি কিরলেন কেন? এই উদ্দেশ্য কি? চাকলা কমিশন এই রহস্যের রহস্যের আবোক সম্পাত করতে পারবেন কিনা তা জনসাধারণ সাগ্রহে লক্ষ্য করবে।

হিং টিং ছট্

—কবি গৌড়ানন্দ

গত ২৬শে জানুয়ারীর পুণ্য প্রভাতে শুনিলাম তাহিং বরিষ কন নভোচরদের স্বাধীন আখুর ডাগ করে যখন গগনাঙ্গনে গৌড়ভূবিন গণপ্রাঙ্গণে নেতি নরনাথদের খুবরো চুলে বিনিতি কুকুরের মত গড়াগড়ি যাচ্ছিল, যখন বাতবিদ্যা উৎসাহে মাতোয়ারা গৌড়ীয় তকগঞ্চল চুলে উত্তমকুমার হাঁটি, পবনে বাফতাপুরি, ইত্তের, গায়ে মাকিনী হাওয়াই কুর্তি চাপিয়ে বুকে কিটিস ড্রাম বেঁধে মূর্তির প্রাণ গড়ের মাঠের উদ্দেশ্যে কদম কদম বাড়িয়ে যাচ্ছিল, তখন আমি, গৌড়ের জাতীয় কবি, সমস্যার বোঝা কাধে নিয়ে ভাবভাবান্তর বনে আমার চিরে কোঠার আশুরে আবদ্ধ হয়েছিলাম।

* * *

আজ প্রজাতন্ত্রী দিবস। জাতীয় পুণ্যাহ। সমগ্র জাতির পুলক আজ তো নটখা খাওয়া পায়রার মত দিগ্বিদিকে ছিটকে পড়বে। বাড়িতে বাড়িতে ঝাণ্ডা উড়বে, ঘরে ঘরে পঞ্চম বাজছে। আর আমি হঠকারিতার জন্য নিজেকে ঘারাবন্ধ সেই চিরে কোঠায় বসে ধিক্কার দিচ্ছি।

হ্যাঁ, হঠকারিতা ছাড়া আর কি? নোটবুক খুলে দেখছি আজ বারো দিনে প্রজাতন্ত্র দিবসের ছয়টি উৎসবে আমার নিমন্ত্রণ। তিনটে বেনামে কংগ্রেসের সভা। একটি সরকারী চা পার্টি। একটি কম্যুনিষ্টদের সাংস্কৃতিক উৎসব। আর একটি —হ্যাঁ সেটিই বড় বেয়াড়া—ন্যাশ খসা রাজপথীদের সম্বেলিত কমনওয়েলথ বিরোধী দিবস সভা। সভাতে একটি বিস্ফোরণ হবে। সেইসময় চুপ করে একটা যোববাটি ঝেলে তার উদ্বোধন করতে হবে আর মিশ্রভাষী তা বুঝ বুঝে নয়)—ঐ চুঁকুই আমার কাজ। কিন্তু করি কখন? সময় একবার চলে গেলে কংগ্রেসি নদীর মত ব্যাকডোর দিয়ে তো তাকে আর কেহুৎ আনা যায় না।

তাই ভাবিত হচ্ছিলাম।

* * *

এখন স্বাধীন হলে সত্যি বলতে কি ভবিষ্যৎ ভেবে কিকিৎ ভয় পেয়েছিলাম হুবুচাঁদ রাজার রাজত্ব, তো গেল, প্রজাতন্ত্রী দেশটা কেমন হয় কে জানে? কিন্তু দুদিন যেতে না যেতেই ভয় আমার দেশ ছেড়ে পালাল। দেবনাগর ডিমোক্রেসি অর্থাৎ ডিমোক্রেসির ডিমারহা) বড় বন্যা-দার বন্যনা। আগে প্রভু ছিল এক হবুচন্দ্র এখন শত হবুচন্দ্রের রাজত্ব। আগেও মুবুচাঁদ নামেই রাজা ছিলেন আসলে রাজ্যপাট চালাতেন মন্ত্রী গবুচাঁদ। এখনও দেখি সেই গবুচন্দ্র মন্ত্রীরাই স্বরাজ চালাচ্ছেন।

মাঝখানে আমার কিছু সুবিধা হয়ে গেছে। জাতীয় কবির পদ পেয়েছি। রাজার আমলে যাও বা ন বাসেহ মাসে দু এক পদ ছড়া বাঁধতে হ'ত, এখন আর তাও হয় না। এখন শুধু অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করি।

আর সেজন্যই তো এই কয়াপাদ।

* * *

বলতে পারেন বাড়ী ছাড়ার কেন? দেশের ডাক অমান্য করা যায় কি না কি বুকলিদের নেমন্তন্ন উপেক্ষা করা যায়? আখের গোপাই হয়ে যাবে না? জাতীয় কবির দাদিত্ব কি সামান্য স্বাধীনতা দিবসের উদ্বোধনসভায় দুটো গোড়ের মালা, একটা চন্দনের ফোঁটা আর একজোড়া যুঁতি ছাদর দিলেই যুতি কবির যুতি দেশের কর্তারা ভুকে যা। রবীন্দ্র পুরস্কার, আকাদেমিপ্রাইজ, সরকারী খেতাব, এসব আসবে কি করে, যদি ভক্তিপেরী বুকদিরা বুকফিরা চোখ হবে হবে। একটাও বাগ

মুকপিপর
পোয়া
গৌড়

ভারতীয় সংবাদ পর্য্যালোচনা

৭০৫

। নিয়ে ৯১৫৫
পরিকল্পনার একমাত্র সম্বল বাঁচা
অভিনব বাচ চলেছে।

তাদের সুপারিশে আরও বলা হয় পরিকল্পনার প্রাথমিক স্তরেও মুদ্রাং বাড়ানোতে কিছু নেই এবং পরিকল্পনা কমানোর অসুবিধা দেখা দিলে পুরোটার অভাবকেই দেরুয়া লাগী করতে হবে। খালা ও পণ্য দ্রব্য সরবরাহের নিয়ন্ত্রণের একটা সর্বনিম্ন কাঠামো খাকা উচিত ব'লেও তাঁরা মন্তব্য করেন।

তাঁদের সুপারিশে আরও বলা হয় যে, জনসাধারণের ভোগ্য পণ্যাদ্রব্যের বিক্রয় এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে যার ফলে তাদের ভোগের মাত্রা বৃদ্ধি না পায়। দেশে খাদ্য শস্যের উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির উপর নতুনর নজর ওকত্ব প্রদান এবং বিদেশী মুদ্রার সাশ্রয়ের জন্যে রপ্তানী বৃদ্ধি ও ষ্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশনের কার্যক্ষেত্র প্রসারের পুরোজনীয়তার প্রতিও তাঁরা পরিকল্পনা কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

* * *

নব দিল্লীর এক খবরে প্রকাশ যে, অধিকাংশ রাজ্য আসন্ন বাজেট অধিবেশনে ১৯৫৮-৫৯ সালের বাজেটে অতিরিক্ত কর ধার্য করা হবে। কারণ, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার তৃতীয় বছরের নির্দিষ্ট কাজ যদি শেষ ক'রতে হয় তাহ'লে ঋণগ্রহণ অথবা কর ধার্যের দ্বারা ২০০ কোটি টাকা সংগ্রহের প্রয়োজন।

রাষ্ট্রদ্রোহমূলক প্রচার

শেখ আবদুল্লার কার্যকলাপ ও উক্তি সমূহ রাষ্ট্রদ্রোহমূলক ব'লে ভারতের সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন মহল থেকে এর তীব্র প্রতিবাদ জানানো হচ্ছে।

কাশ্মীরের
নিয়ে এখন যার তাঁরা
ক'রতে পারেন।

ব'লছেন তা রাষ্ট্রদ্রোহমূলক।

ভারতের প্রতি বিদ্বেষ প্রচারের আবারে শেখ আব্দুল্লা কখনো কাশ্মীর এবিচ্ছে মানুষকে ব'লে সবিবেচক মহল মনে করেন। ১৯৫৫ সালের জানুয়ারী হতের বন নমতিতে ভুল। নাম্যকের সময় বন্ধু হ'কারে শেষ আবদুল্লা বলেন যে, দেশের দেশ আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবী স্বীকার করে না, "তারা আমাদের প্রতিবেশী হ'লেও শত্রু" এবং তারা তাঁদের ঐ দাবী সমর্থন ক'রে তাঁরা "পুরো না পশ্চিমে অবস্থিত হ'লেও আমাদের মিত্র।"

* * *

আবদুল্লা সাহেব আরও বলেন,—"কাল পর্যন্ত ভারত বিদেশের সরবরে আক্রমণাত্মকিকারকে সর্বলোকের নৈতিক অধিকার বলে ভাহির ক'রে এসেছে। কিন্তু কাশ্মীর বেলায় ভারতের তিন মত পোষণের কারণ কি?

উল্লেখ্য সম্প্রতি বিনিময় সম্পর্কে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সম্প্রতি এক চুক্তি সম্পন্ন হ'য়েছে। ঐ চুক্তি সম্পর্কে ভারত সরকার এক প্রেসনোটে প্রচার ক'রে জানান যে, অপ্রার্থব সম্পত্তি বিনিময় সম্পর্কে ঐ চুক্তির ফলে উভয় দেশের বহু ক্ষতিগ্রস্ত লোক নীরুই সাহায্য লাভ ক'রবে। সম্পত্তি বিনিময় সম্পর্কে উভয় দেশের মধ্যে এক তালিকা বিনিময় হ'য়েছে। বিনিময় তালিকার অন্তর্ভুক্ত সম্পত্তি সম্বন্ধে সমস্তরকমের অভিযোগ সম্পর্কে ভারত বা পাকিস্তান সরকারের

পক্ষে
পাওয়ার
সম্পত্তির
ব্যাহতের
ব্যাহতের

সংসদের এই অধিবেশনে ইস্পাত ও কয়লা, কলিকাতার ইণ্ডিয়ান ষ্টাটিস্টিক্যাল ইনষ্টিটিউটকে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান ব'লে ঘোষণা প্রভৃতি।

সংসদের এই অধিবেশনে ইস্পাত ও কয়লা শিল্পের উন্নয়ন সম্পর্কে দুটি বিশেষ রিপোর্ট পেশ করা হবে।

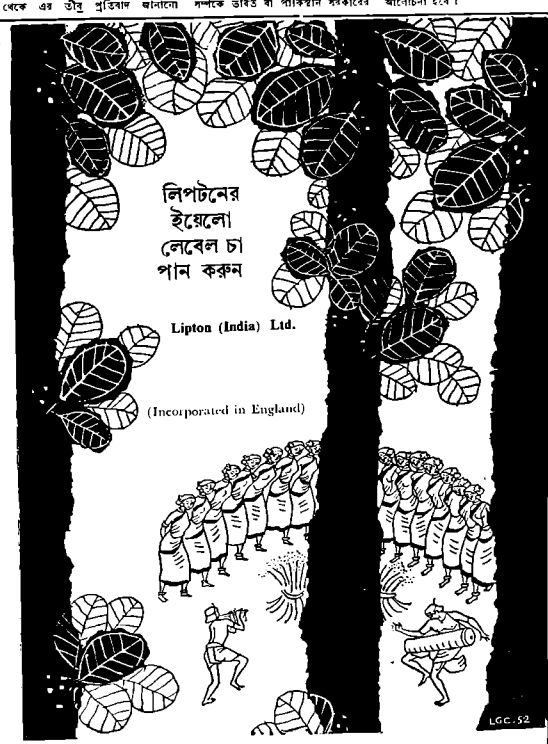

শিলংয়ের চিঠিঃ

বদরপুরে শ্রীচানিহার আশ্রয় গ্রহণ

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরকে আবার অতীতের কোচার ঠেলে দিয়ে আধুনিক আসানে ফিরে আনা গেছিল। অকাথ কর্মব্যস্ততা নেই। পুথাগো নয়র-পতিতে জীবন চলেছে রাজনীতির ক্ষেত্রেও। এখানে ঘটনা প্রবাহ বলতে কিছু নেই, অসমীয়া ভাষা থেকে একটা কথা নিয়ে সবাই বলতে শিখেছে যে এখানে সবই "নাম্বে নাহে" অর্থাৎ আছে আছে হয়। অনেক কাঠ খড় পুড়িয়ে কংগ্রেসের ত্রিমাতিক পুর্ণাল অধিবেশন সুসম্পন্ন করা গেছে, এখন কিছু দিন বেশ সব কিছুই বিরিয়ে গেছে। গৌহাটি থেকে খবর আসছে সেখানকার উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনা কংগ্রেস ভবনে নীলাম ডাকার আগর বসেছে—প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের উত্তপ্ত ঘটি বাটি এবন কি কুলের বাগুলোও কিনী হচ্ছে।

নীলামদার শেষ হলে বোধ হয় ঘরদুয়ারে কিস্কি উত্তেজনা বৃদ্ধির কথা শোনা যাবে। সেখানে নতুন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীনবীনচন্দ্র বরদলৈ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। বিনা সভায় সভাপতি নির্বাচন নিয়ে কংগ্রেসী মহলে বহু আলোচনা হয়েছে। বিনায় সভায় সভাপতি নির্বাচন করার পূর্বে কংগ্রেসের সংবিধান অনুযায়ী প্রত্যেক প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভ্যদের মতামত গ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু তাঁদের মধ্যে অধিকাংশ সভ্যের মতামত উপেক্ষা করে কয়েকজন প্রাদেশিক নেতার নাম হাইকমাণ্ডের নিকট পাঠানো হয়েছিল। হাইকমাণ্ড থেকে তাঁদের মধ্যে একজনকে নির্বাচিত করে পাঠানো হয়েছে। এই ব্যাপারে কংগ্রেসের অনেক সভ্য অসন্তুষ্ট হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আবার উপসভাপতি লাভের আশায় পুলুহ উৎসাহীও হয়েছেন।

বাইরে আশার কংগ্রেসী নেতারা কথাটা স্বীকার করবেন কি করে? আমরা আশাও করি না। তাই নানারকম রাজনৈতিক সমাধিতত্ত্ব নোটাই দিয়ে শ্রীচানিহার, কাছারে নির্বাচন প্রার্থী হওয়ার যুক্তি দেখানো হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীর গ্রহণের এক সপ্তাহের মধ্যেই তিনি পার্বত্য উপজাতীয় নেতাদের দলে ভিড়িয়ে নিতে পেরেছেন। এটা কম কথা নয়। প্রায় চার বছর ধরে আসামের তাঁদেরও ত উপায় ছিল না। শ্রীমেথীর পরে গোটা সহর লোক থাকতেও কাউকেই পাইনি ভিন্ন বিশ্বাস করা যায় না এই পরিস্থিতিতে গণতান্ত্রিক অগণতান্ত্রিকের চুলচেরা বিচার বিশ্লেষণ করতেই হয়। একথা অবশ্য স্বীকার করতেও হবে যে শ্রীচানিহা আসানে সতীই জনপ্রিয় এবং সাধারণের আগ্রহান্বিত। সাধারণ নির্বাচন তাঁকে আবণ্ডি কেন্দ্রে রেভলিউশনারী কনিডেনিই দেতা শ্রীখন্দেন বরদলয়ের বিরুদ্ধে দাঁড় করানোই হয়েছে আসান কংগ্রেসের প্রথাও ভুল। শিবসাগর জেলার জন্য যে কোন কেন্দ্র থেকে শ্রীচানিহা জনলাভ করতে পারতেন।

একটা কথা শোনা গিয়াছিল যে পূর্ব আসামের অনেক কংগ্রেসী সভ্যাই শ্রীচানিহার ভাগ্যবিপর্যয়ের পর নিজ নিজ আসন তাঁর জন্য ছেড়ে দিতে রাজী আছেন জানিয়েছেন। আম দেখা যাচ্ছে তিনি নির্বাচনপ্রার্থী হয়েছেন তাঁর বিরুদ্ধে কেহ দাঁড়াচ্ছে না। আম দেখা যাচ্ছে তিনি নির্বাচনপ্রার্থী হয়েছেন তাঁর বিরুদ্ধে কেহ দাঁড়াচ্ছে না। আম দেখা যাচ্ছে তিনি নির্বাচনপ্রার্থী হয়েছেন তাঁর বিরুদ্ধে কেহ দাঁড়াচ্ছে না। আম দেখা যাচ্ছে তিনি নির্বাচনপ্রার্থী হয়েছেন তাঁর বিরুদ্ধে কেহ দাঁড়াচ্ছে না।

বিদেশী সাহায্যে ইস্পাত কারখানা

অর্থনৈতিক প্রবন্ধ

মধ্যভারতের ভিলাইন ধূলিলিপ্ত মাঠের উপরে যেখানে এখন গগনচুম্বী বৃষ্টি ফারনেস্‌ এবং সারি সারি অট্টিকায় চুল্লী এবং বৃহৎ ইস্পাতের জটিল যন্ত্রজাল মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে সেখানে প্রতিদিন ১০০ বাশিয়ান ইন্‌জিনিয়র ও ভারতীয় তরুণ ইনজিনিয়ারদের তত্ত্বাবধান করছেন।

আরও ১৫০ মাইল পূর্বে প্রায় একই রকম দৃশ্য রাউরে কেল্লায় প্রতিদিন দেখা যাবে হাজার হাজার ভারতীয় মজুর মাথায় কঙ্কৌট, ইট কিংবা মাসির বস্তা নিয়ে দীর্ঘ সারিতে চলেছে। এবং অনেকটা ট্র্যাফিক পুলিশের মত জর্মাণ ইন্‌জিনিয়ারেরা দিনের পর দিন এই মজুর শ্রেণীর পাশে দাঁড়িয়ে যাচ্ছেন।

পশ্চিম বঙ্গের দুর্গাপুরে ৬টা বুটিশ কণ্ট্রাক্টরের কোম্পানী বিরাট বুলডোজার এবং ডাম্পার দিয়ে ছোট ছোট পাহাড় কেটে সমান করছে, রেল লাইন পাতা হচ্ছে, বৃহৎ কারখানা কক্রেটের গড়ে উঠছে এবং পথঘাট ও জনপদের আভাস ইতিবধ্যেই চিহ্নিত হচ্ছে।

এই তিনটি বিশাল ইস্পাত কারখানার কাজ এখন পর্যন্ত যতটুকু অগ্রসরহয়ে এসেছে, তাতে করে সম্পূর্ণ কারখানা গুলি নির্দ্বিধে হলে তার চেহারা কী দাঁড়াবে, সেটা অবশ্য এখনই অনুমান করা যায় না। কিন্তু এ-কথা ঠিক যে, ষষ্ঠদ্বৈ কাজ ইতিবধ্যে সমাপ্ত হয়েছে তা থেকে নিশ্চয়ই আশা করা যায়, ১৯৬১ সালের মধ্যে ভারত গভর্ণমেণ্ট ইস্পাতের উৎপাদন বর্তমানি বাড়াবেন বলে সঙ্কল্প করেছেন, তা অসম্ভব হবে না। ১৯৬১ সালের মধ্যে ভারত গভর্ণমেণ্টের পরিকল্পনা—ইস্পাতের উৎপাদন তিন গুন বৃদ্ধি করা হবে। ভিলাই এবং রাউরু কেল্লার কারখানা নির্মাণের কাজ ১৯৫৪ সালে প্রায় একই সময়ে আরম্ভ করা হয়েছে এবং আশা করা যাচ্ছে যে, এই দুইটী কারখানারই দোহা ভৌগী হতে আরম্ভকরবে বর্তমান বছরের শেষের দিকে এবং দুর্গাপুর কারখানা ১৯৬১ সালের শেষের দিকে।

পার্বত্য অঞ্চলের আন্দোলন চলেছিল আসাম এক পুলেশ চাই শুধু পার্বত্য উপজাতীয়দের জন্য।... অসমীয়াদের সঙ্গে আর বর কথা বায় না। শ্রীচানিহা সে আন্দোলনের নেতাদেরও, বিশ্বাস-ভাজন প্রমাণিত হয়েছেন। সুতরাং এবার তাঁর ওচেজন্মুলক অনবদ্য বক্তের মোড়া বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলের দিকে চলেছে। বরদলুরে প্রথাগত ধরণে অসমীয়া বাঙ্গালী রেষারেষির অবসান ঘটানো যায় কি না শ্রীচানিহাকে নির্ধারণে অগ্রসরকরিতে হয়ত শ্রীচানিহা অসমাপ্ত করবেন। বাঙ্গালীদেরও তাঁর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ এখনো শোনে শোনা যায় নি। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে আসানের দেশে নির্বাচন উপলক্ষে যে পরিমাণ কাদা খাঁচাখাঁচি ও হোঁচাহুঁচি হয় তাতেই না অসমীয়া বাঙ্গালী হব আবারকেও ওঠে শ্রীচানিহার বিরুদ্ধে তিনজন প্রার্থী এখনো আছেন এবং তাঁরা শেষ অবধি থাকলে কোন না কোন তরফ থেকে এই প্রশ্ন উঠতে পারে। যে দিক দিয়ে দেখা অবশ্যই বর্তমানে শ্রীচানিহার উপনির্বাচন সাহায্য করতে পারে আশা আছে।

শ্রীবিষ্ণুরাম মেধী শুধু মুখ্যমন্ত্রী পদে ইস্তাফা দেন নি বিধান সভার আসনও পরিত্যাগ করেছেন কারণ কেন্দ্রীয় সরকারের দৌলতো তিনি মাত্রাদের রাজ্যপাল পদে অভিষিক্ত হয়েছেন। কারক্তণ তেলায় হালো কেন্দ্রে তাঁর আসন এখন শূন্য। সেখান থেকে কেন শ্রীচানিহা নির্বাচনপ্রার্থী হলেন না? প্রশ্নটি সঙ্গত। ১৯পুরুষ তাদিবই আসন, উদ্যাগত লাম্পুলধিক প্রশ্ন অবতঃ উঠতে পারতো না সেখানে। তবে পূর্ব আসার কথার পরিচয় আসানে (না আসার আসার নোয়াস আসার) বেশাবেরির কথা ছিল। এবং গত সাধারণ নির্বাচন যখন দেখা গেছে আসানের কংগ্রেস নেতাদের কেউ কেউ নিজেদের দলের প্রার্থীদের পরাজয় কামনা করে তবু তাঁদেরকে কাছে প্রার্থনা করেই ক্ষান্ত হন নি বরেই এর বাবড় করেছেন এক্ষেত্রেও হয়ত তা ঘিরে যে হাসে। কেন্দ্রে অবতীর্ণ হলে অবতারোগী দু একজন প্রদুল্ল শ্রীচানিহার বিরুদ্ধে দলবাঁধি নাড়তে মুরিরে পেতো। কাছাবে তাদের তুলোনা হয় হবে।

হয়ত উৎপন্ন হবে। দুর্গাপুর যেন হওয়ার কথা এরও এক বছর পরে। এই তিনটি কারখানা সম্পূর্ণ হয়ে গেলে দুটোকাটিতে বলক থেকে ৮ লক্ষ পাকা ইস্পাত প্রতি বছর উৎপন্ন হয়ে আসবে। তাছাড়া, ক্রমে ভবিষ্যতে প্রত্যেকটি কারখানাকে দ্বিগুন উৎপাদনের উপযুক্ত ক'রে তোলা যাবে। প্রত্যেকটি কারখানা অঞ্চলে আর্থিক ভিলাই মাইন্স এবং দুর্গাপুরের এই সবের সঙ্গে তিনটী বৃহৎ জনপদও তৈরী হোচ্ছে, যেখানে ১০ হাজার শ্রমিক এবং ষোট পুরু ৬০ হাজার লোক বসবাস করবে। এই তিনটী কারখানার নির্মাণের ইতিহাস পরবর্তীরা সঙ্গে পুথানুপুথ তুলনার দ্বারা হয়ত দেখানো এখনই সম্ভব নয়। তথাপি যদি বাস্তাত তিনটী আরম্ভার কাজের তুলনা করা যায় তাহলে তিনটী ভিন্ন ভিন্ন আর্থিক চরিত্র এবং কর্মধারার একটা আভাস অন্তত পাওয়া যাবে। প্রকৃতপক্ষে বাস্তিক প্রগতির দিকটা বাদ দিলেও ভারতবর্ষের মানুষ এবং মাটির সঙ্গে রুশ ও জর্মাণী জাতীয় চরিত্রের এই যে অদ্ভুত সামঞ্জস্য দেখা যাচ্ছে, সামগ্রিক দিক থেকে এইটি একটা লক্ষণীয় বিষয়। রাউরকেল্লার ইতিবৃত্তটি, দুইশতাব্দি গড়ের্ণ সবারত্তার সারির, বাঙ্গবাদের চওড়া পীচের রাস্তা হয়ে গেছে, নানা শ্রেণীর কর্মচারীর অজস্র ওয়ারিন্যসহোটোরা কয়বাংলো তৈরী হয়েছে এবং বাজার, হাসপাতাল, স্কুল নাগরীক জনসংসের সবরু স্বাচ্ছন্দ্যই ইতিবধ্যে তৈরী করা হয়েছে। পাহাড়ের এক দিকে প্রচণ্ড শব্দ এবং প্রচুর ধুলো উড়িয়ে কারখানার পত্তন সবে হয়েছে মাত্র, অন্য দিকে পাহাড়ের বিশালীত পাদ্যে মন অবসরের আরামে সুসজ্জিত, আধুনিক জনপদের স্বাচ্ছন্দ্য বিদ্যুৎ হয়ে গেছে। যদিও এই আরামদায়ক আবাস সুখ আর্থান ইনজিনিয়ারদেরভোগ হচ্ছে, তবু উড়িয়াদের এই অবশ্য, এই শ্রীধ এবং বন্যাতরের কাছে একেবারেই অপরিচিত। এবং এ-কথা একবার দেখলেই বোঝা যায় যে এই অপরিচিত পরিবেশ এদের কাছে কতকটা রোমাণ্টিক উৎপাদের সঞ্চার করেছে। অবশ্য বলাই বাহুল্য, যে সব ভারতীয় ইনজিনিয়ারেরা এঁদের সঙ্গে কাজ করছেন, তাঁদের পক্ষে এই পরিবেশই অনেক সময় নিতান্ত বিরক্তিকর বলে মনে হয়ে।

বিদেশী ইনজিনিয়রেরা মজুরের মাথায় করে মাটী, ইঁট এবং কঙ্কৌট পরিবহনের ধরণ্যবীয় এই ব্যবস্থার সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত। এবং সাধারণ শিপীজিবের সারির সত এই-ব কুলির শ্রেণ্ড মাত্তাহত করতে থাকে, একটা কঙ্কৌটকেও কেউ নাম দিয়েছেন, Indian Overhead Conveyor আর্থাৎ ইনজিনিয়রদের মতে অনেকেরই এই বিশ্বয় কাটেনি যে, এই অপ্রশস্ত মন্ত্র দুর্গাপুর মজুর শ্রেণীর দ্বারা একটা আধুনিক জটিল কারখানা আগো নির্মিত হতে পারে ভারতীয়েরা যাঁরা এই ধরণের অনাধুনিক পদ্ধতিতে অভ্যস্ত, তাঁরা অবশ্য মনে করেন যে, আরও একটু স্বল্পব্যয় পরিকল্পনা এবং আরও একটু তাগিদ দিলে কাজ আরও তাড়াতাড়ি পাওয়া যেতে পারতো এবং ঘাবার কতকটা শুধুতর কাজ আশার করা সম্ভব হবে।

বাইরে কেরাম এবং পর্যবেক্ষ ভারী শিল্পগতি যে পরিমাণে এসে পৌঁচেছে তাতে এই কারখানার ভারবাহকের ভারতীয়েরা স্বভাবই কতকটা উদ্বিগ্ন বোধ করছেন।

যে কোনো পর্যবেক্ষকের একথা স্বীকার করবেন যে, রাশিয়ানরা যে পরিশ্রমে যান এবং যেটাকে ফেলেছে এবং যে-গতিতে যন্ত্রপাতী আসছে, সেটা একটা মস্ত সাফল্যের কথা। এবং দুইটি কারখানার জন্য কলকাতার তারাক্রান্ত বলব ব্যবস্থার কতকটা ভেঙ্গে। কিন্তু রুশ ইনজিনিয়রেরা ভিলাই এর জন্য অপেক্ষাকৃত কমুহতর ভিজ্ঞাধারণের বলবরী নির্দ্ধারণ করেছিলেন। এবং এঁদেরই সহায়তায় বলব্রাকে এই কাজের জন্য কতকটা উপযুক্ত করে তোলা হয়েছে। এখন যদি ভিলাই এ কোন বর্ণক যান, সেখেতে পারেন, একটা বিস্তৃত অঞ্চল ভরে গেছে অসংখ্য লালমাটির ঐবরে দুর্গোধ্য নাম-পরিচয় লেখা আছে। ষোটকথা কারখানার এক-একটি ইউনিটের ভিত্তি নির্ম্মান শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কারখানার শটাকুচার তৈরী সুরু হয়ে যেতে পারবে। রাউরকেল্লা, দুর্গাপুর এবং ভিলাই এই তিনটির মধ্যে একমাত্র ভিলাই যেখানেই কতকটা চাঁচা এবং বার্ণপুরের পরিচিত ন্যাশভেন্সের ন্যায় ব্রাড কারনেগু এবং অতিকায় চুল্লীর দৃশ্য দেখা যাবে। কতকগুলি বিষয়ে রাশিয়ানদের কাজ বরিত অনেকখানি অগ্রসর হয়ে গেছে, তবু আর্ত্তাদের ধারায়ন এবং মনিষবিত অগ্রগতির তুলনায় রাশিয়ানরা আসলে কতটা বেশী অগ্রসর, সে কথা এখনই বলা যায় না। কিন্তু বাইরে থেকে দেখলে ভিলাই এর দুটা নিঃসন্দেহে অনেক বেশী চমকপ্রদ।

ধূলিধূসর, নাগাবাঠা, রুক্ষ প্রান্তরে ভিলাই আজ এক Stakhanovite আবেগেরও সঞ্চার করেছে। ইস্টার্ণ ও সাউথেরিয়ার কর্মাচারী এবং ইনজিনিয়ারদের বসবাসের প্রান্তরে কাজ করা ফ্রেন্স কিছু নতুন অভিজ্ঞতা নয়। ভারতের কার্যক্রমের পূর্বাপেক্ষা সচিক পালিত হচ্ছে। ভিলাই নগরে এখন পঞ্চাশ ভাগু ছোট ছোট বাংলোগুলোই তৈরী হয়েছে। আর ছোট বড় ওজবিন্যাসের সবাতন ভারতীয় ধারা উল্‌টে দিয়ে এখানে সকল ধরণের কর্মই স্থান পাচ্ছে।... পীচ-ঢালা নতুন রাস্তা আর রাস্তার ধারে ন্যায় দেওয়া আছে—এই সব বিশালতার সবাবেরে বহুদূরের কথা। পরিকল্পনায় খোল কাজের অনেক পরের ব্যাপার।

রুশের কাজের পর নিজেদের অবাড়ের কুাঁথড়িতে আড্ডা বসানো দেখলে পড়ুন করে। সেখানে রাঁধা হয় পাশ্চাত্য ভাবে দু'একবার বিলিয়ার্ড বলে ছড়ি ঠোকে, নয়তো Moscow-Radio'র কাঁপ সঙ্গীত শুনন কাণ পেতে শোনে। আর তাঁরা একথাও লুকোন না যে কাজ ফুরোলে যে যার ঘরে ফিরতে পারলেই খুশি হবে। বোটকথা ভিলাইয়ের রুশ প্রযোক্তকে দেশী বিদেশী কারিগরি সমবোঝিতার ব্যাপারে আদর্শ স্থানীয় বলে গণ্য করা যেতে পারে। রুশ ব্যবস্থাপনার আরও পাঁচটি শিল্প সংগঠন শুরু হচ্ছে। পশ্চিমীদের সাবনে শক্ত প্রতিযোগিতা ভারতের শিল্প ক্ষেত্রে কুতকাল সহাবস্থিতি Challenge.

বৈদেনিক যুদ্ধ সম্ভাবের বাজারে অনেকটা হালকা করা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এই তিনটি ইস্পাত কারখানা এবং VISCO, IISCO কেন্দ্রবর্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাঁচ বছরের বধ্যে ভারতে ইস্পাতের পরিমাণ দাঁড়াবে বর্তমান উৎপাদন ১,১০০,০০০ থেকে ৬,০০০,০০০ টনে। এই পরিমাণ উৎপাদন বৃদ্ধি সংগঠিত হতেথোর ব্রিটেনই রেলেছিল রেলোছিল দিন বছরে ১৮৪০ থেকে ১৮৭০ পর্য্যন্ত বর্তিত এই পরিকল্পনা গুলিতে ব্যয়বারে অভাবিত বৃদ্ধি দেখা দিয়েছে (প্রথম প্রস্তাবিত ব্যয়ের তুলনায় ৬০ নিদিয়ন পাউণ্ড বেশী) তবুও পরিকল্পনাগুলি সফল হবে যে বৃদ্ধিই শেষ আশা করতে পারে তার তুলনায় এই ব্যয় অকিঞ্চিৎকর।

দি ওরিয়েণ্ট পেপার মিলস্ লিঃ

প্রকল্প তৈয়ারী করছে

প্যাকিংয়ের জন্য ঃ

(ক) এম. জি রিবড্ ক্র্যাফট (গ) ওয়াটার প্রুফ ক্র্যাফট
(খ) এম এফ আনব্লিচড্ ক্র্যাফট (ঘ) ক্রেপ ক্র্যাফট

লেখা ও মুদ্রনের জন্য ঃ

(ক) সাদা প্রিণ্টিং (গ) সেমি ব্লিচড্
(খ) ক্রীম লেইড (ঘ) আন্‌ব্লিচড্
বাদামী বর্ণের আচ্ছাদন

বাক্স, কার্টন ইত্যাদি তৈয়ারীর জন্য ঃ

(ক) কার্টন বোর্ড (ঙ) ডু প্লেক্স
(খ) এম জি গ্রে বোর্ড (চ) কার্ডিজ বোর্ড
(গ) এম এফ গ্রে বোর্ড (ছ) টিকেট বোর্ড
(ঘ) ট্রি প্লেকস্ (ঙ) কভার বোর্ড

পেলিথিন আচ্ছাদিত পেলিক্যাফট ও পেলিবোর্ড

দি
ওরিয়েণ্ট পেপার মিলস্ লিঃ
ম্যানেজিং এজেন্টস ঃ
বিড়লা ব্রাদার্স প্রাইভেট লিঃ
৮, ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা-১

টি, এস, এলিয়টের সঙ্গে শিবনারায়ণ রায়ের বিতর্ক

[অধ্যাপক শিবনারায়ণ রায় তাঁর সাম্প্রতিক ইয়োরোপ ও আমেরিকা পরিভ্রমণের সময়ে গত বৎসর আগষ্টমাসে লণ্ডনে কবি শ্রী টি,এস এলিয়টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। উভয়ের বিতর্ককালে জীবন, শিল্প, সাহিত্য, দর্শন ইত্যাদি নানা বিষয়ের অবতারণা ঘটে।

[এই প্রবন্ধটি দর্পণের জন্য অধ্যাপক রায় বিশেষভাবে লিখে পাঠিয়েছেন।]

এক বেষন্ত দিবেকের চলিশ নম্বর রাসেল জোয়ারে কেয়ার কোম্পানীর বাড়ীর ওপরতলার দুখানি ঘরে টি, এস, এলিয়টের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ। চাকরের নিমন্ত্রণ করেছিলেন। ঘরের আসবাবপত্র, চৌবিলে রাখা, দেয়ালে-টাঙানো কয়েক-খানার বৈশিষ্ট্য বিবেশাগ্য বলেই মনে হয়। সিঁড়ি-কাটা চুল, গোল চশমা আঁটা মুখ, কালো সোয়াক ঝোড়া ঈষৎ সাদরে বোঁকা দীর্ঘ ঘুগুই দেহ, সব মিলিয়ে মানুষটিকে মাঝারি ঘরের কোনো কোম্পানীর বেডবাবু বলে ভ্রম হতে পারে। স্যাহিত্যে এলিয়ট আধুনিক সাধনা করেও দৈর্ঘ্যক্রিয়া অর্জন করতে পারেন নি, চেহারায়ও সে অভাব পুরিয়ে নিয়েছেন।

না ভুল বলেছি। আরাধ্য করতে কবে এলিয়ট চলনা খুলে চৌবিলের ওপরে রাখলেন। সেই আগের চোখের দিকে চেয়ে স্মরি কিছুক্ষণ এলিয়টের কথা শুনতে সেলাম না। আরও দুই চোখে সেকি নিবিড় দৃষ্টি! একই খুতে অঙ্গন পরিক্রমণ। সেই চোখের গভীরে কেয়ার কোম্পানীর ডাইরেক্টরের আড়ালে 'ভেরাইটি এণ্ড' থেকে 'কোরা-স্টেজের' কবির দেখা মিলল।

প্রথম দিনের আলাপে এলিয়ট কিন্তু কাব্যের 'বার' মেঁড়েও গেলেন না। কয়েকদিন পূর্বে 'টাইমস লিটেরারি সাপ্লিমেণ্টে' ডারউীন সেখকের সম্পাদনায় সদ্যে আমার একটি প্রবন্ধ ছাপা হয়েছিল। স্যাপ্লিমেণ্টের সম্পাদক প্রবীন, ছোনদ্ বোধবৈর সেই এলিয়টকে পাঠান এবং সেই সূত্রেই কবি আমাকে আলাপের জন্য ডেকে পাঠিয়েছিলেন। তিনি ওই প্রবন্ধ দিয়ে আলোচনার সুরু করলেন।

"সেখকের এবং পাঠকদের মধ্যে ব্যবধানের সমস্যা যে ডারডারবেণ্ড এত প্রবল হয়ে উঠেছে, আপনার প্রবন্ধ পড়ার আগে আমার ধারণা ছিলনা। আমি ভেবেছিলাম এটা বুধাত্ত পাশ্চাত্য সভ্যতার সমস্যা। যন্ত্র-বিপ্লবের পর থেকে পশ্চিমে যে গণশিক্ষের সভ্যতা (mass civilization) গড়ে উঠেছে তাতে সব শিল্পী সাহিত্যিক মাত্রই ঐতিহ্যচ্যুত এবং সমাজ-বিচ্যুত হতে বাধ্য। এটা বুঝতে আমাদের সমস্যা লেখেছে—বোমলেয়ার অবশ্য অনেক আগেই বুঝতে পেরেছিলেন—কিন্তু কবি যে আমার বিশেষ কিছু করতে পারছি, বা পারব, এমন মনে হচ্ছেনা। কিন্তু ডারডবর্ণ্ডে এত চট্ট করে প্রগতিশীলতার ছাড়া সন্তেমিত হবে, আশা করিনি। আপনাদের ঐতিহ্যপ্রীতিতা, বর্ণবিন্যাস এবং বর্ণ বোধ প্রগতির হাত থেকে আত্ম-রক্ষায় সাহায্য করবে, এইরকম একটা বিশ্বাস ছিল।"

এলিয়টের কবি এলিয়টের সঙ্গে আলাপ করতে, তাত্ত্বিক এলিয়টের সঙ্গে তর্ক করার অনেক তৈরী করে আসিনি। আমি বললাম, "খুবতে পারছি, আমার প্রবন্ধে আমি আমার বক্তব্য স্পষ্ট করে উপস্থিত করতে পারিনি। তা ছাড়ের, সত্তবত আপনি আমাকে চাহতের নিমন্ত্রণ করতেন না। আমি যাকে ডারডীয় সভ্যতার প্রাণশক্তি মনে করছেন, আমার চোখে তা স্যাদি হিসেবেই দেখা দিয়েছে। এবং যদি ও আপনার কবিতার আমিবিশেষ অনুস্বীর্ণ, তবু স্বীকার না করে উপায় নেই, আপনার দানটুকু আমাকে আকর্ষ করেনা। অথচ আপনি যাকে প্রগতিশীলতা বলে সংজ্ঞা করছেন, আমি সে স্যাবির দ্বারা নির্ণয় ডারডে মারাত্মক।"

চেহারায় বয়া পড়েনা, কিন্তু হালের পোষা নাম এলিয়টের বয়স সত্তর ছুঁইছুঁই বোঝা যায় এলিয়টের বয়স সত্তর ছুঁইছুঁই করছে। ঠিক জানিনা, তবে বোধ হয় ভুল আন্দাজ করিনি, বেশির ভাগ বাঁচাই বাঁধানো। পাকা ফলের মত মসৃণ বুধে হাসিটি বেরানান, সমস্তে নুকোনো বার্ধক্যের আড়ালে সকলন। এলিয়ট বুধ হেসে বললেন, "একেবারে না ভেনেই আপনাকে আলাপের জন্য ডাকিনি। আপনার অন্য নেখার কিছু পড়েছি। কিন্তু সংস্কৃতি আর গণসভ্যতা, এ দুটোকে কিভাবে মেলাবার আশা করেন, তা বুঝতে পারিনি। সেটা যদি বুঝতে পারি, তাহলে সাহায্য করেন, তবে খুশী হই।"

মুখরনান, জোর কণ্ঠসরে পড়েছি, তবু সেই চেষ্টা করে বললাম, "আমার বক্তব্য এমন কিছু দুরূহ্যনান নয় যে তা ব্যাখ্যা করে আপনার সময় নষ্ট করি। তাছাড়া সিদ্ধান্তের চাইতে সন্ধানে আমার আগ্রহ বেশি। আপনার কাছে শুনতে এসেছি, বলতে আসিনি।"

"না, না, এক্তিয়ে থেকে চলবেনা।" চাপা ঠোঁটে আবার হাসি খেলে গেল। "সন্ধান কি অতই সহজ? তা ছাড়া আপনারের এই প্রবন্ধটিকে গণসভ্যতার সমস্যার অবসর কই? সন্ধানের জন্য অসম্পূর্ণতা বোধ থেকে। মানুষ অবস্যাত্রাবী ভাবেই বর্তিত অসম্পূর্ণ। ক্রিশ্চিয়ানিটির আদির পাপ এই পূর্ণ তত্ত্বেরই নির্দেশ দেয়। কিন্তু পাপ বোধ ব্যক্তির পক্ষে সত্য, গণ-পিণ্ডের পক্ষে সত্তর নয়। গণপিণ্ডের গতি আছে, প্রগতিও থাকতে পারে, বোধ নেই।"

"আপনি যে ভাবে আপনার বক্তব্য উপস্থিত করছেন, তাতে আলোচনা চলেনা। সন্ধানের অন্য অর্থও সত্তর, এটা আপনি লক্ষ্য করছেন কই। পরিপূর্ণতা অবারত্ত বলে, বিশ্বাস অসাধ্য নয়, এবং বিশ্বাস আপেক্ষিক—তা কি জ্ঞানের ক্ষেত্রে কি জীবনের ক্ষেত্রে। ক্রিশ্চিয়ানিটি প্যাগেস কল্পনা করেছে, তার কারণ প্রথমেই তা ঈশ্বরের স্বতঃসিদ্ধ পূর্ণতা থাকে সৃষ্টি করেছে। এই ঈশ্বরিক পূর্ণতা যাদের কাছে স্বতঃসিদ্ধ নয়, পাপ কল্পনাও তাদের কাছে অর্থহীন। তাদের সন্ধান আপেক্ষিক উৎকর্ষের, অপরত্ত পরিপূর্ণতার নিমিত্ত হবার নয়।

"কিন্তু আপনারের এই তথাকথিত আপেক্ষিক উৎকর্ষের ধারণাটি কি?

"নিত্য ধারণাটি যদি ক্রমনে বর্ষের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক চিন্তার ফারাক থাকতো। ধারণাটিও পরিবর্ত্তনশীল, আপেক্ষিক। এরপর আপনি যে প্রশ্ন তুলবেন, তা বোধহয় আমি আন্দাজ করতে পারি, এবং আমি যে জবাব দেব, তাও আপনার অজানা নয়। সুতরাং যদি অনুবত্তি করেন, দে তবে তা হয় প্রথমদিনের পরিচয়ে মুহূর্ত্তেই থাক।"

লোক্রাতেসের কথোপকথন একে-বারে বুধাই পড়েনি।

"আচ্ছা, তা না হয় থাকল। কিন্তু এই গণ সভ্যতায় সংস্কৃতির কি সম্ভাবনা দেখলেন সেটাতো বলুন।"

"আপনি যদি এডাবে আমাকে প্রশ্নর দেন, তাহলে আমাকে খানি হাতে ফিরতে হবে। গণসভ্যতার সম্ভাবনা অনেক, গলদ পুচ্ছ—কিছু দেখেছি, কিছু পড়েছি। আপনার কাছে আমরা ডালো করে বুঝতে চাই। বরাবা আপনার যদি বলার উপযুক্ত ঠেকে—আমি শুনতে এসেছি।"

"আপনি দেখছি একই সঙ্গে চতুর এবং বিনয়ী। বহু পঁচিশ ত্রিশ আগে এসেলে বেশির ভাগ লেখক পণ্ডিত বুদ্ধিমান লোকেদের মুখে শুনতাম, জনত্রাস সঙ্গে এক না হতে পারলে আর কোনো আশা নেই। এক হবার জন্য তাঁরা আপ্রাণ চেষ্টা করলেন—তাঁদের সততা এবং সাধনা দেখে দূর থেকে মুগ্ধ হয়েছি। ইতিবধ্যে জনতার সমাজ, জনতার সংস্কৃতি একরকম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বন্দরে কাথজ খুললে ঘরে ঘরে টেলিভিশন প্রেক্ষাগৃহ দেখতে আমার একথার পচুর প্রমাণ পাবেন। জনত্রাস সংস্কৃতি বানে সব মানুষের মধ্যে যা সোচেই কমন্ ডিনো-মিনেটর (Lowest common Denominator) তারই প্রতিষ্ঠা। আমার বন্ধু আর্চাল্ড গ্যাটেল্ড-এর এই নিন্দাই পড়েছেন বিন্তু মানুষের মাংশেষার করতা প্রায় অপরিমাণ। মানুষের মানসিক পাপে সিস্যাস করার জন্যে বোধহয় ক্রিশ্চান না হলেও চলে।"

"একটা প্রশ্ন করব?"

"শুধু প্রশ্ন করলেন কেন, উত্তরও দেবেন।"

"দেখুন, এসেপে গত ত্রিশ বছরের মধ্যে সাধারণ মানুষের ক্রমতা অনেক বেড়েছে। সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, এমন কি সাংস্কৃতিক জীবনে তাদের প্রভাব আগের তুলনায় আজ অনেক বেশি। কিন্তু এই ক্রমতাকে কাজে লাগাবার কতটুকু সময় এবং সুযোগ তারা পেয়েছে? প্রাচীন যত সংস্কৃতি তাদের মধ্যে পুরোপোক্ত ছিল, তারা পুরুষের পর পুরুষ ধরে কত-সুযোগ, অবসর, স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করেছে, সেটা বলে করুন। অথচ তা সত্ত্বেও মাত্র কয়া রাজা, জমিদার, বিশপ-কিংবা বিত্তবান ব্যক্তি, ৩তাদের অধিকাংশের নীতিবোধ, রুচি, বা অনুভূতি কি খুব উঁচু স্তরের ছিল? আজ আপনি জনতা বলে যাদের বাঙ্গ করছেন, তাদের বহুর ক'জন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পেয়েছে, ক'জন সুযোগ পেয়েছে ভাল সঙ্গীত শোনার, ভাল ছবি দেখার, ক'জনের সময় মিলেছে টি'কে থাকার চিন্তা ছাড়িয়ে সুস্থতর বৃহত্তর কোনো কিছু নিয়ে ভাবার, সেই ভাবার আবেগকে প্রকাশ করার? একটা সংস্কৃতি গড়ে তোলার জন্যে কয়েক পুরুষের সুযোগ-অবসর কি দান নেন, তবে কি অধিকার করা হবে না?

"এ প্রশ্ন আমি আশা করেছিলাম। আমি বেটুকু বুঝি বলার চেষ্টা করতে পারি। পাপের দিক থেকে অবশ্যত্রাবী অসম্পূর্ণতার দিক থেকে, ঈশ্বরের অনুগ্রহের উপরে নির্ভরশীলতার দিক থেকে, সব মানুষই সমান। তবু কোনো কোনো দিকে সামর্থ্যের হিসেবে মানুষের মধ্যে ভেদ আছে। মানুষের নিয়তির পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে এই ভেদ নিতু-নিয়মের অধ্য, কিন্তু সাধারণ আমি কোনদিন সংস্কৃতি, শিল্প, সাহিত্যকে অর্থের মূল্য-মূল্য ডাবতে পারিনি। কিন্তু সংস্কৃতির বেটুকু বীরাবদ্ধ অংশ, এই ভেদ তার অন্যতম ভিত্তি। সব মানুষ কবি হয়না" সব কবি ধার্মে—বিশেষ মানুষ হয়না। কেন যে একজন বিশেষ মানুষ শেক্সপীয়র হয়, সে রহস্যের আমি উদ্ধার জানিনা। কিন্তু এটুকু অনুমান করতে পারি যে সমাজে ঐতিহ্যবোধ প্রবল এবং যে ঐতিহ্যে আবেগের সংযম, চিন্তার পরিচ্ছন্নতা, এবং এসবের পেছনে মানুষের অবগাঢ়ীর অসম্পূর্ণ ডাব চেতনা জাগ্রত, সেখানে সাংস্কৃতিক বিকাশের সম্ভাবনা বেশি। সর্বসাধারণের মধ্যে এই সংযম, পরিচ্ছন্নতা, চেতনা দুর্লভ। অনেক চেষ্টা করে এদের অর্জন করতে হয়। সমাজ বিপ্লবকরে সংস্কৃতি বাঁচেনা; কিন্তু সংস্কৃতির প্রাণ যে বৈদগ্ধ্য, অল্প লোকেই তা অর্জন করে। এ শুধু সুযোগ, অবসর, শিক্ষার কথা নয়—সামর্থ্য এবং অনুশীলনের কথা। যেখানে অনন্যসাধারণ বিশুদ্ধ মনের প্রভু সেখানে সংস্কৃতির বৃত্তি অবশ্যম্ভাবী। সংস্কৃতির জন্যে দরকার যে বিশুদ্ধ মন সমাজ থেকে বিযুক্ত না হয়, আবার সমাজও যেন তাকে গড়পড়তায় নাবিয়ে না আনে। ফলে, চান বা না চান, সংস্কৃতি একরকমের না একরকমের বর্ণভেদ বোধহয় প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। গণ-সমাজ একথা মানে না বটে কিন্তু গণ-সমাজেও অসাধারণ অভাব নেই। তবে সে সমাজের যারা পরিচালক তারা বিজ্ঞ নয়, তারা এই নিয়ামকার অনিবার্যতাকে বিশেষ মর্যাদার প্রতিফলন।"

মিষ্টার এলিয়ট নাকি 'যদি' 'হয়ত' 'কিন্তু' বোধ না দিয়ে কথা বলেন না। ভাল, ভাল।

"দেখুন, মানুষে মানুষে যে সামর্থ্যের ভেদ আছে, এটা বোধহয় প্রগতি বাদি-গুরুদের মধ্যেও অনেকে মানেন। সংস্কৃতির জন্যে যে অনুশীলন দরকার, এ নিয়েও বুধ মতভেদ নেই। কিন্তু সামর্থ্যের ফারাক সত্ত্বেও প্রতি মানুষই নিশিষ্ট এবং অদ্বিতীয়; এবং কোনো মানুষকেই অন্য ব্যক্তির বিকাশের উপায়মাত্র হিসাবে দেখা যে অসত্তত একথা তত্ত্ব আপনিও অস্বীকার করবেন না। ফলে-সংস্কৃতির একটা বুধ চল, সব মানুষের মধ্যেই সাম্যহ্য অনুযায়ী বিকাশের যে সম্ভাবনা নিহিত আছে, তা কি করে সার্থক করে তোলা যায়? আমেকার দিনের দাস কিন্তু মানুষের বিকাশ নিয়ে তত্ত্ব ছিল; অধিকাংশ মানুষ সেখানে ছিল অন্য মানুষের বিকাশ সম্ভবপর করার উপায় মাত্র। আজ তাই হচ্ছে অধিকাংশ মানুষেরও যাতে বিকাশ ঘটে, এবং সমাজ গড়ে তোলার। আধোকার দিনে সংস্কৃতিতে যাদের এক চেটিয়া ধরল ছিল, এ ডাবের অবস্থাই আপত্তি হতে পারে—কিন্তু বাকী মানুষদের পক্ষে সে আপত্তি মানাত্ত গুরু।

"তা যে শুরু, তাতো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু সংখ্যার প্রাধান্যের জোরে বোধহয় গুণ সৃষ্টি করা যায়না। অভিজাতের দিক থেকেই না হয় সমস্যাটা দেখুন। আপনার বিচারে যারা নাকি সংখ্যা-নির্ষিষ্ট হয়েও সংস্কৃতির এক চেটিয়া অধিকারী ছিল, তারা বেশর নিরপ, সাহিত্য, স্থাপত্য রচনা করেছিল, তার সঙ্গে তুলনা করার মত কিছু কি আপনার এই গণসভ্যতায় ইতিমধ্যে দেখতে পান? এমন কিছু, যাকে শ্রীক সাহিত্যের সঙ্গে তুলনা করা যায়, অথবা রবিবর্মীর ছবি নয়, অথবা আপনারের দেশের উপনিষদ কিম্বা গীতার সঙ্গে? অথচ সেটা আপনারা একেবারেই দেখতে পান না সেটা বোধ এইসব লক্ষণ শুনু মুহূর্ত্তেরের ডোগে নাগালে, এবং সর্বসাধারণ আপন আপন ডাবে খাদ্য সংগ্রহ করছে। পলিটী সাধনার চরম পুরুষার বে গীয়ার স্থানত্য, যেখানে সংস্কৃতি এসে বর্ষের কাছে আত্মনিবেদন করেছে—তার সঙ্গে নিযুঢ় যোগ কি শুধু রাজা-পুরোহিত-পরিতন্ত্রের? মার্কি সাধারণের সঙ্গে তার যোগ অনেক বেশি ঘনিষ্ঠতর?"

"কিন্তু সে যোগ কোন স্তরে, সে বাদ্য কি ধরণের? আপনারের দেশেও বীর্ঘ্য যেখানে, আমেরিকায় সেখেও মলিন, মসজিদ দেখেছি। সাধারণ লোকের সঙ্গেই তাদের যোগ বেশি, তাও নাকি। কিন্তু সেইসব বিরাট অন্ধ শাখর মূর্তির মধ্যে তারা কিসের সন্ধান পেয়েছে? নিজেদের অক্ষম, নিরাশ্রয়, ক্ষুদ্র, আর্ত, জীবনের বাকী মৌয়ার বাইরে এদের বিরাট অক্ষম রূপ দেখে বিচুত হয়, আত্মসমর্পণ করে। এ ধরনের বোধের বহুয় বিকাশের সম্ভাবনা কোথায়? মনির বীর্ঘ্যের ছায়াতে যারা বাস করে। তাদের বেশির ভাগই তো পশু বিবনাশ বুদ্ধুস্থ। আরো অতীত সভ্যতার সাংস্কৃতিক কীর্তিকে অশ্রাদ্ধা করতে চাইছিনা। আমরা চাইছি যে সংস্কৃতির ঐশ্বর্য সকলের উপভোগের মধ্যে আসুক। সাধারণ লোক তার দ্বারা আচ্ছন্নমুগ্ধ হবে না তা থেকে বঞ্চিতও হবেনা, তার মধ্যে মানুষের যে, স্বাই-সীনতা আকার পেয়েছে তার সূক্ষ্ম অটিল ঐক্য তাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যে অনুবাদিত হোক। অর্থাৎ যারা শুধু সিদ্ধি এ ধরে শেক্সপীয়রের মধ্যে আবেগের বাধন দিয়ে এসেছে, তারা শেক্সপীয়রের নিপুণ অভিব্যক্তির মধ্যেই তাদের পিপুক। আর সাধারণ মানুষের মধ্যে যে সামর্থ্য বিশেষ বিকশিত হয়ে তখন তা থেকে যে সংস্কৃতি জন্ম নেবে প্রাচীন কোন সংস্কৃতিতেই তার তুলনা মিলবে না, এই আমাদের আশা।"

"চমৎকার। আপনে মুক্তির কি জানেন বিস্তর্ত্তনের কথা শুনে শুনে আপনাদের ধারণা হয়েছে পুরোপোক্তই বুঝি অসীম সম্ভাবনার আকাশ আর সুযোগ পেলে সকলেই প্রায় এক একজন ঈশ্বর হয়ে উঠতে পারে। আধুনিক সভ্যতার ওপোরে যদি হোল মানুষ সমাজ এই ধোনাটিকের ধারণা। এ ধরণের সাক্ষাৎ একেবারে থেকে সাংস্কৃতিকের মানুষদের দিকে একবার চাইলেই বুঝতে পারবেন আপনারের এ ঋণ কত নির্মম, হাস্যকর। মানুষ যে কত নীমাবদ্ধ জীব, কোত্ত নির্বুদ্ধিতা আর অক্ষমতা যে তার কত পুরল, নিজের চারা থেকেই নিজেকে নিয়ন্ত্রণ আবশ্যক এটা বুঝতে পারলে এই ধরণের অবাস্তব ইউটোপিয়ার পেছনে কেউ ছুটত না। অন্ধ আত্মাভিমানে মানুষ ব্যবধান এই ধরণের ইউটোপিয়া বাড়া করেছে, আর ব্যবধান আকাশে নাক দিতে দিয়ে খুব খুনছে পড়েছে।"

কিছুক্ষণ এলিয়ট চুপ করে রইলেন। আমার 'নির্বুদ্ধিতার ডারে তাঁর প্রাজ্ঞ মুখখা খুবের চাকড়া, বেন এ্যা পালের চাড় বেয়ে ঠোঁটের দিকে একটু ঝুলে পড়েছে। আমি কিছু বলার আগেই তিনি আবার বলতে সুরু করলেন :

"তত্ত্বের কথা ছেড়ে দিয়ে সাধারণ অভিজ্ঞতার দিক দিয়ে সমস্যাটা দেখুন। অনুশীলনের জন্য অবসর দরকার। নিজের সব প্রত্যেকের যদি নিজেকে কোটে হয় তাহলে যে কোনো খুবসর ছাড়া হয়ে পড়ে। আপনারের গণসভ্যতার সমাজ-ব্যবস্থা কি করে বেঁচে থেকার ব্যবস্থা করেছে। কলে যে সময়টুকু যারা সুখ্যবসায় করলেও করতে পারত, তাদের অবসর সাধ্যন। বাকী যারা সবনর্ণিত অবসরের অংশীদার তারা যে সময় পায় কাজে তাকে যে ব্যবহার করতে পারেনা। নতুন নতুন নন্ধ্য দিয়ে যে অবসর ডরাবার জন্যে তাদের যারীর শেষ নেই সংস্কৃতির কে ধারে ধারে অথবা নিলেম্ন, কি কোনো খুক্ত কর্মে। সেই জন্য বিত্তহীন ভেঙে ফেলতে হবে, বার্ড-শ্যেড্রাস হাউজ ভেঙেছে, কোনো সাম্রিত্য পত্রের গ্রাহক ভোটেনা, ব্যালে সংক্রান্ত বক্তা ওটেনা। শেষ এবন কুল এবুসুরুত সর্বসাধারণ এবন সংস্কৃতির পুষ্টিপোষক, যারা অতি বোধার তাদের কবলাম না খেয়ে উপায় কি? যারা তা বাটতে নারাজ, তাদের জিন শেষ হয়ে এল।

চেষ্টা করে নিজেকে সমরণ করতে যাচ্ছিল, এবুসের একজন বয়স শিল্পীর নামনে বসে আছি, এঁর কাছে আমার ধর্মের শেষ নেই, কবির কাছে পাঠকের ধ্বণ। তবু শেষ কথার মত চেষ্টা করে বললাম, "তবু নয়, অভিজাত্য কি থেকেই বলছি, আমা বিকাশ কি একেবারেই আপনার চোখে পড়ে না? শেক্সপীয়রের যুগে তাঁর কাব্যরূপ ক'জন উপভোগ করেছে? আপনার কাব্যের সমকালীন ভোক্তা এদেশের ঘরে ঘরে। ডাল সাহিত্যপত্র না থাকতে পারে, কিন্তু যেসব কাগজিকের সঙ্গে পরিচয় এডদিন তবু মুষ্টিমের বিশ্বজনের মধ্যে বাঁধা ছিল, আজ কি সত্য সত্যেরে লক্ষ লক্ষ সাধারণ পাঠকের ঘর ডারা লক্ষ করেনা? চরকথার সম্ভাবিতাবীর বাণী শুনল ঘ্রীষ্ট ছাড়া এই লক্ষিক কথাগুলোর মধ্যে কোন বিরোধ দেখতে এসেছি টেলিভিশনে কাথানাইকের অন বারীদের কোন ভয়ও নাইকি। এক প্রগতি বলতে আপনার বাধবে, কিন্তু এক্কে অবোধগতি বলে বাঁচির করতে হবে বা কি করে বাকী রই?"

এলিয়ট কিছু না বলে আস্তে একটু শ্বাস্ নিলেন। (ক্রমশঃ)

বাংলাদেশের বিকার

ক্যান্থারাইডিন

হেয়ার অয়েল

বিশুদ্ধ অলিভ অয়েলে ও অন্যান্য উদ্ভিজ্জ তৈল সংমিশ্রণে এবং ক্যান্থারাইডিন্ প্রয়োগের আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রযোগীতে প্রস্তুত। স্নিগ্ধ সুগন্ধুর গন্ধে মনোহর।

কেশবর্দ্ধনে সহায়ক ও মস্তিষ্কের নিয়ামক।

• আউন্স মূল্য আনার পাকা হার।

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ

জনসাধারণের গচ্ছিত অর্থ নিয়ে ছিনিমিনি

লোকসভায় ফিরোজ গান্ধীর অভিযোগঃ কমিশনে সাক্ষ্য

জীবনবীমা কর্পোরেশনের মুন্দ্রা কোম্পানীর শেয়ার কিনতে "অতিরিক্ত আগ্রহ ও তৎপরতা" দেখিয়েছে, মুন্দ্রার কারবার সম্পর্কে ভাল রকম খোঁজ খবর করা তাঁর। আবশ্যক বোধ করেননি, কয়েক ক্ষেত্রে শেয়ারের দাম মুল্য যা চেয়ে ছিলেন তার চেয়েও বেশী দামে সেই শেয়ার কেনা হয়েছে, এই শেয়ার কেনার ব্যাপারে বীমা কর্পোরেশনের লগ্নি বোর্ডকে সন্তুষ্ট উৎপন্ন করা হয়েছে এবং ভারত সরকারের অর্থ মন্ত্রী টি, টি, কৃষ্ণমাচারী এবং অর্থসচিবের প্রধান সচিব শ্রইচ, এম, প্যাটেল সন্তবত এই শেয়ার মেনার ব্যাপারে "এক মুখ্য অংশে অবতীর্ণ" হয়েছিলেন, বীমা কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টরও এই ব্যাপারে অবিবেচনা ও দায়িত্বহীন পরিচয় দিয়েছেন। চাগলা কমিশনের সামনে বিভিন্ন ব্যক্তির বক্তব্যে এই সব তথ্য উদ্ঘাটিত হয়েছে।

জীবনবীমা কর্পোরেশনের টাকায় মুন্দ্রাগোষ্ঠি ভুক্ত কোম্পানীর শেয়ার বেশী দামে কেনার গোপন তথ্যটি নেহরু-জামাতা ফিরোজ গান্ধী লোকসভায় ফাঁস করে দেবার পর ভারত জুড়ে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। সর্বত্রই এমন চাঞ্চল্য এর আগে কখনই দেখা গেছে। এই ব্যাপারকে কেন্দ্র করে জনগনের চাপে সরকার এক কমিশন বসিয়ে তদন্ত সুরু করিয়েছেন। বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারপতি চাগলাকে নিয়ে এই কমিশন গঠিত হয়েছে।

এই নাটকের রবনিকা ওঠে গত ১৬ই ডিসেম্বর লোকসভায়। কংগ্রেস সদস্য ফিরোজ গান্ধী সরাসরি অভিযোগ করেন, জনসাধারণের গচ্ছিত অর্থ নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হয়েছে। তিনি বলেন কর্পোরেশন যখন গোপনে মুন্দ্রার শেয়ার কেনেন, সেই সময় মুন্দ্রা তাঁর শেয়ারের দাম-কৃত্রিমভাবে বাড়িয়ে দিয়ে ছিলেন, এবং এঁদের কর্মকর্তা প্রতিষ্ঠানের শেয়ার কেনা হয়েছে যাদের আর্থিক অবস্থা মোটেই ভাল নয়।

ফিরোজ গান্ধী এইটুকু বলে ক্ষান্ত হননি। তিনি আরও বলেন যে তথ্য তাঁর কাছে আছে তা দিয়ে চৌদ্দখানা বড় বড় বই লেখা যায়। তিনি বলেন, ডি, এস, সি, সমুদ্রিই, খন্ডা ব্রাদার্স, সমুদ্রার মতো কোম্পানীর শেয়ার কিনে পড়ে ১। লেখিন অর্থমন্ত্রী টি,টি,কৃষ্ণমাচারীকে এই অভিযোগের জবাব দিতেও বলেছেন। তিনি বলেন যে, "এই ব্যাপারে বেশ কিছু গোলমাল আছে।"

কেলেঙ্কারীর কথা

অর্থমন্ত্রী তাঁর আসনে উঠে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক থেকে তীব্র গুঞ্জন ধ্বনি হতে থাকে বক্তব্য সম্বন্ধে কোনওরকম বুঝবার বাকি রাখতে তাঁদের। কংগ্রেস পক্ষের সাংসদের আসন থেকে মহাবীর ত্যাগী চেঁচিয়ে ওঠেন, "কেলেঙ্কারী, ঘোরতর কেলেঙ্কারী।" কংগ্রেস পক্ষ চাচ এবিষয়ে 'তদন্ত চাই,' তাঁরা রায় সুদ্ধও নিজের উদ্যেছিলেন কণ্ঠ খোলা যায়, "এই নিয়ে তিনবার," রায় বলে তিনবার কেলেঙ্কারী হল। ত্রিপক্ষে কেলেঙ্কারী, তিনিয় কেলেঙ্কারী তাদের আবার এই নতুন কেলেঙ্কারী।

তাদে বলেন, "সরকার তার পরিকল্পনা বাঁচাতে যে সময় টাকার জন্যে হন্যে হয়ে বেড়াচ্ছেন, সেই সময় জনসাধারণের গচ্ছিত টাকায় 'পুঁজিপতির বিপদ উদ্ধার' করা হচ্ছে। পরিকল্পনার পরিকল্পনার এটাও কি একটা অঙ্গ ?" অপোক্ষে তাঁরা কোথায় করেন, "শেষটে বোঝা যাচ্ছে উপরওয়ালার হুকুমে বীমা কর্পোরেশন শেয়ার কেনার ব্যাপারে লগ্নি উপদেষ্টা বোর্ডের পরামর্শ গ্রহণ করেন নি।"

কৃষ্ণমাচারী জবাব দিতে উঠে বলেন যে, বীমা কর্পোরেশন ২৪ এবং ২৫শে জুনএ এক থোকে কিছু বেশি শেয়ার কিনেছেন, এইটিই হল প্রকৃত তথ্য। তিনি একথাও জানান যে, মুন্দ্রার দেনবড় প্রতিষ্ঠানের শেয়ার কেনা হয়েছে সেই প্রতিষ্ঠানগুলো অনেকদিন ধরেই ভালভাবে চলে আসছে। "বেমন, বরুন জেনপ।"

ফিরোজ গান্ধী : ৬টা একটা ভাল প্রতিষ্ঠান।

অনেক সদস্য : অন্যগুলোর খবর কি ?

কৃষ্ণমাচারী : বতদূর আমার স্মরন হয়, কর্পোরেশনের চেয়ারম্যানকে মুন্দ্রার কারবারগুলোর অবস্থা কি সে সম্পর্কে খোঁজ নিতে বলেছি।

ফিরোজ গান্ধী তাঁর বক্তব্য শুরু করতে বলেন, "আমি শতচেষ্টা করেও বুঝতে পারিনি জীবন বীমা কর্পোরেশন কি করে এরকম একটা সন্দেহজনক ব্যাপারে টাকা ঢালতে পারেন।"

শেয়ার কেনার আগে কর্পোরেশনের উচিত ছিল, এ বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করা, সংশ্লিষ্ট ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যালান্স সীট ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখা।

এই কথা বলে ফিরোজ গান্ধী একটু থামেন। তারপর বলেন, "আর করবেন, আমার একটু ভুল হচ্ছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলোর বেশী কোন কোনটা ১৯৫৩ সালের পর কোন হিসাবই দাখিল করেনি। (বিভিন্ন সদস্যের হাস্য)

তারপর ফিরোজ গান্ধী নানা তথ্য বিবৃত করে দেখান, বীমা কর্পোরেশন কিভাবে ঠকেছেন। তিনি কলকাতার শেয়ার বাজারের সরকারী দর উদ্ধৃত করে বলেন, ২৫শে জুনের বদলে যদি ২৩শে জুন এ শেয়ারগুলো (যেগুলো কর্পোরেশন ১ কোটি ২৯ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকায় কিনেছেন) কেনা হত, তাহলে কর্পোরেশনের ১৩ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকা বাঁচত। ২৩শে জুন ওগুলো কিনলে ১ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা বাঁচত। ১৯শে জুন বাঁচত ১১লক্ষ ৫২ হাজার টাকা, ১৮ই জুন বাঁচত ১১ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা, ১৭ই জুন বাঁচত ১১ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা, আর ১৩ই জুন ঐ শেয়ারগুলোই কিনলে ২০ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকা কম দিতে হত। "আমি ১৩ই জুনের ওদিকে আর যাইনে করিনি। এই হিসেব দেখেই আমার বাধা বন্ধ বন্ধ করে ঘুরে গেছে।"

মুন্দ্রার খবর সরকারের জানা ছিল

মুন্দ্রা গোষ্ঠির বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যে ভাল চলছেনা সে কথা ভারত সরকারের অগোচর ছিলনা বলেই ফিরোজ গান্ধী জানান। তিনি বলেন, বৃটীশ ইন্ডিয়া কর্পোরেশনের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে চেম্বারলেন কমিশনার যে রিপোর্ট দিয়েছেন, তা আমার কাছে আছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তিনজন সিনিয়র অফিসারও ঐ প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে "উদ্বেগ" প্রকাশ করেছেন। চেম্বারলেন কমিশনারের সাথে ১৩ই জুন শেষ হয়, আর তার ঠিক ১৫ দিন পরেই কাওজানের বাধা খেয়ে ঐ প্রতিষ্ঠানেই টাকা লগ্নী করা হয়।

* * *

ষ্টেটস্ম্যান, বিজার্ভ্যাঙ্ক, জাতীয় দিনপ উনুয়ন কর্পোরেশন এই মুন্দ্রা গোষ্ঠীকে গত বাজেটে সাহায্য দিতে অস্বীকার করেন। তথাপি জীবনবীমা কর্পোরেশন বম্বেই আগুরেয় সবেই সে সব প্রতিষ্ঠানকে অর্থ সাহায্য দিয়েছেন। আর তাও কখন ? না, যখন ওদের অবস্থা কথা: "ধারাপের দিকে" যাচ্ছে।

* * * "শীকার মহেশ্বর", জীবোজ গান্ধী বলেন, "ভারতীয় জীবন বীমা কর্পোরেশন আর শ্রীমুন্দার মধ্যে যে বোঝা পাড়ার আছে আমা করি তা আমি ভুলে বরতে পেরেছি। আশা করি এই বোঝাতে পেরেছি যে, জনসাধারণের গচ্ছিত অর্থ ব্যক্তিবিশেষের স্বার্থ রক্ষার প্রয়োজনে অন্যায়ভাবে ব্যবহারের ষড়যন্ত্র হয়েছে।"

২৩শে জানুয়ারী বোম্বাইতে চাগলা কমিশনের সামনে সাক্ষী জবানবেলা সবয় ফিরোজ গান্ধী বলেন, "এ বিষয়ে যে দোতরফা অন্যায় কাজ করা হয়েছে তা আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি।" তিনি বলেন যে উদ্দেশ্যে জীবনবীমা কর্পোরেশন গঠিত হয়েছিল, এই ঘটনায় সে উদ্দেশ্যের মূলেই কুঠারাঘাত করা হয়েছে বলে আমি মনে করি।

জীবনবীমা কোম্পানীগুলি বীমা-কারকদের সঞ্চিত টাকা যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করত। সেটি বন্ধ করা জীবন-বীমা আইনের কারণের অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্যে অর্থের প্রয়োজন। সরকার সেই কারণেই জনসাধারণের সঞ্চয় বৃদ্ধিতে উৎসাহ দিয়ে এসেছেন। ১৯৫৬ সালের ১লা সেপ্টেম্বর বীমা কর্পোরেশনের জন্ম হয়। আর তার জন্মের কয়বাসের মধ্যেই ১৯৫৭ সালের মার্চ মাসেই অন্যায়ভাবে লেনদেন সুরু হয়ে যায় বলে শ্রীমাঝা মন্তব্য করেন।

ফিরোজ গান্ধী, ১৯৫৭ সালের ২৯শে ডিসেম্বর কৃষ্ণমাচারী লোকসভায় যে উক্তি করেছিলেন, তা এই পুনরে উদ্ধৃত করেন। তিনি বলেন, সেইসময় কৃষ্ণমাচারি বলেছিলেন, লগ্নি উপদেষ্টা বোর্ডের নির্দেশেই বীমা কর্পোরেশন পরিচালিত হয়। মাঝে মাঝে যেসব শেয়ার কেনা হয় তার ওপর সরকারের কোন হাত নেই। শ্রীমাঝা অভিযোগ করেন, তা সত্ত্বেও একেত্রে সেই উপদেষ্টা বোর্ডকে অগ্রাহ্য করা হয়েছে।

ফিরোজ গান্ধী জানান যে, কোম্পানী আইন সংক্রান্ত বিভাগটি অর্থমন্ত্রণালয়ের অন্তর্ভুক্ত। সেই কোম্পানী আইন সংক্রান্ত বিভাগের অফিসার থেকেই জানা যায় যে মুন্দ্রার বিরুদ্ধে অন্তত ১৪টি অভিযোগ পাওয়া গেছে। ১৯৫৬ সালের ২৯শে ফেব্রুয়ারী মুন্দ্রার বিরুদ্ধে এক মামলা হয়। ১৯৫৭ সালের ১৮ই জুন তার সাজাও হয়। আর ঠিক তার এক সপ্তাহ পরেই বীমা কর্পোরেশন সেই ব্যক্তির কারবারেই লগ্নি করবার জন্য চাকা চালান।

কোম্পানী আইন অনুসারে শ্রীমুন্দার উপর শমনজারী

পশ্চিমবঙ্গের কোম্পানী রেজিষ্ট্রারের অভিযোগক্রমে কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীহরিদাস মুন্দ্রা এবং অন্যান্য ইনেকচিক ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্কাকাচারিং কোম্পানী লিমিটেডের অন্য ছয় জন ডিরেক্টরের উপর সমন জারী করেছেন। তাঁদের বিরুদ্ধে কোম্পানী আইনের কয়েকটি ধারা ভঙ্গের অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। আগামী ১৩ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত এই সমনের তামিল করবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

কলকাতার ডায়রেক্টরি লিমিটেডের পক্ষ থেকে শ্রী ঠাকুরদাস দুগারী, শ্রীযুক্ত দাস মুন্দ্রা এবং অন্যান্য কোম্পানীর আর পাটনের ডিরেক্টরের বিরুদ্ধে কলকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে বিপুলচন্দ্র ও ২৫ হাজার টাকা বিনিময়মূল্যের ১৫০০ টি শেয়ার তুচ্ছকরে অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয়।

ম্যাজিষ্ট্রেট এই অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত এবং ১৪ই ফেব্রুয়ারী তারিখের মধ্যে রিপোর্ট দেবার জন্য কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের ডেপুটি কমিশনারকে নির্দেশ দেন।"

শ্রীনেহরুই মুন্দ্রার আদর্শ

২২শে জানুয়ারী বোম্বাইতে শ্রী হরিদাস মুন্দ্রা এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুই তাঁর আদর্শ ব্যক্তি। তিনি বলেন, 'আমি আমার জীবনের সরকম শ্রী বৈভবের কাছ থেকেই তাঁর কাছে তাঁরই আদর্শ সামনে রেখে আমি খুব সতর্কতার সঙ্গে অগ্রসর হচ্ছি। দেশের উন্নতি সাধনে ইন্ডিনিয়ারিং ফার্মগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে, তা আমি জানি। এবং সেই কারনেই আমি অনেকগুলি কোম্পানীর দায়িত্ব-ভার গ্রহণ করেছি।

এক প্রশ্নের উত্তরে শ্রী মুন্দ্রা বলেন 'বর্তমানে লাভজনক কিছু বাঁচে সমাজ-গঠনের চেষ্টা চলেছে' আমারও তাই আদর্শ। তবুবাজার অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে নিয়ে আমি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কিনিনি। আমার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য জাতীয় শিল্প সংস্থা গড়ে তোলা।'

ফিরোজ গান্ধী বলেন, "মুন্দ্রার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে অধমরী ৬জানিবয়াল ছিলেন কিনা সে সম্পর্কে পুন জানতে চাই।

তারপর তিনি জানান যে, "১৯৫৫ সালের ২৩শে আগষ্ট, কৃষ্ণমাচার যখন দিল্লী ও বাণিজ্য দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন, সেইসময় তিনি স্বয়ং তদানীন্তন অর্থসচী শ্রীমেনুবুরকে মুন্দ্রা সম্পর্কে এক চিঠি লেখেন। সেই চিঠিতে তিনি মেনবুরকে মুন্দ্রা সম্পর্কে সতর্কও করে দেন। তবু তাই নয়, মুন্দ্রা মেন্ডারে প্রধান ইন্ডিয়া কর্পোরেশনের শ্রীরাও কেমারেজা করেছেন তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করার জন্যও কৃষ্ণমাচারি মেনবুরকে পরামর্শ দিয়েছিলেন। কৃষ্ণমাচারী তখন এও বলেছিলেন যে, এব্যাপারে যদি কোম্পানী আইনকে সংশোধন করতে হয় তবে সেও করা উচিত।

চাগলা কমিশনে বিভিন্ন ব্যক্তির সাক্ষ্য

অর্থ মন্ত্রণালয় মুখ্য সচিব শ্রী এইচ এস প্যাটেল ২৩শে জানুয়ারী কমিশনের কাছে সাক্ষ্য দেন। তিন ঘণ্টার ভাত বক্তব্য সমাপ্ত হয়। শ্রীপ্যাটেল সব্য নিউনোবিয়ায় ভুগে চেঠেছেন। তাই তিনি বসে বসে তাঁর বক্তব্য বলে যান।

শ্রী প্যাটেল জানান যে, ২২শে জুন রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা হলে সঙ্গে সঙ্গে মুন্দ্রার ব্যাপার তিনি অর্থ মন্ত্রীকে জানান।

শ্রীপ্যাটেল সাক্ষ্যদানকালে বলেন যে, ১৯৫৬ সালের শেষ দিকে তিনি অর্থ-মন্ত্রণালয়ের মুখ্য সচিব নিযুক্ত হন। তার আগে, ১৯৫৪ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে তিনি অর্থমন্ত্রণালয় অথবৈতিক বিভাগে সেক্রেটারীর কাজ করেছেন। জীবন বীমা কর্পোরেশন গঠিত হবার পর থেকে তিনি ১৯৫৭ সালের ৫ই জুন পর্যন্ত ঐ কর্পোরেশনের চেয়ারম্যানও ছিলেন।

*

এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন যে, তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্যের সঙ্গে এক কথায় বিরুদ্ধপথ করাটা একটু মুস্কিলের ব্যাপার। তবে, মুখ্য সচিব হিসাবে, অর্থনৈতিক ব্যাপারে যেখানে যে সরাবনের প্রয়োজন তা তিনি দিতে থাকেন।

বিচারপতি চাগলা : কর্পোরেশনের বৈদেশিক কাজের সঙ্গে আপনার কোন সম্পর্ক নেই বলে আমি মনে করি।

শ্রীপ্যাটেল : না, তা নেই।

শ্রীচাগলা কিন্তু, সাধারণ যে সব লগ্নী নিশ্চিই তার সঙ্গেও আপনার কোন সম্পর্ক নেই।

শ্রীপ্যাটেল : সাধারণত থাকে না।

শ্রীচাগলা ২২শে জুনের আগে মুন্দ্রা সম্পর্কে আপনার ধারণা কেমন ছিল ?

শ্রীপ্যাটেল জানান যে, সরকারীভাবে ২।৩ বার মুন্দ্রার নাম শুনে তাঁর দেখা হয়েছে। তবে ব্যক্তিগতভাবে তিনি তাকে জানেন না। শ্রীপ্যাটেল আরেকটি প্রশ্নের উত্তরে একথাও জানান যে, বিভিন্ন সরকারী সূত্র থেকে তিনি মুন্দ্রা সম্পর্কে যে সব রিপোর্ট পেয়েছেন তাতে শ্রীপ্যাটেলের ধারণা হয়েছে যে ধরণের লোকের উপর সম্পূর্ণ ভাবে আস্থা রাখা যায় মুন্দ্রা ঠিক সেই ধরণের ব্যক্তি নন।

শ্রীচাগলা প্রশ্ন করেন, সে ক্ষেত্রে তার সঙ্গে লেনদেন করা সরকারের পক্ষে কি উচিত কাজ হয়েছে ?

শ্রীপ্যাটেল : কোন লোকের সঙ্গে কারবার চলছে তাতে তার চরিত্র বিচার করার চাইতে, আমার মনে হয়, সেই লেনদেনের চরিত্রটি কি, সেটা বিচার করাই কর্তব্য।

শ্রীচাগলা : আমি মনে করি, সরকার বা সরকার কর্তৃক গঠিত কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সেই লেনদেন (মুন্দ্রার) খুশীটি যোচন করতে এসিয়ে যাওয়া উচিত কাজ হয়নি।

শ্রীপ্যাটলকে মুন্দ্রার সন্দেহজনক কার্যকলাপের বিষয় জানিয়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যে সব চিঠিপত্র লিখেছিলেন শ্রীচাগলা অত্যপর সেগুলোর উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, "রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্ণর শ্রীরাও ১৯৫৬ সালের ১৭ই অক্টোবর এক চিঠিতে আপনাকে জানিয়েছিলেন যে, তিনি মুন্দ্রার কার্য-কলাপে উদ্বেগ বোধ করছেন। সেই চিঠিতে তিনি গভিবিধি সম্পর্কে নানা তথ্যও তিনি দেখিয়েছিলেন। এবর কি তিনি একথাও জানিয়েছিলেন যে, মুন্দ্রা অর্থ ও বাণিজ্য দপ্তরের মন্ত্রীদের কাছে নিজের কার্য কলাপ সম্পর্কে কৈফিয়ৎও দিয়েছেন। আপনি কি এ সম্পর্কে কিছু জানেন ?"

শ্রীপ্যাটেল বলেন যে চিঠির কথা তাঁর স্মরণে আছে। তবে মুন্দ্রার কৈফিয়ৎ সম্পর্কে তিনি কোন খবর জানেন না।

শ্রীচাগলা আরও কিছু তথ্যের উল্লেখ করে বলেন যে, শেয়ার নিয়ে নানা কারচুপি, জাল শেয়ার বিক্রীর ব্যাপারে মুন্দ্রাকে সন্দেহ করা হচ্ছে সে খবর পাটলে ১৯৫৭ সালের ভুন মাসের আগেই জানতেন।

শ্রীপ্যাটেল জানান যে, একথা সত্য।

অতঃপর শ্রীপ্যাটেল জীবন বীমা কর্পোরেশনের চাকরি বৃত্তির শেয়ার কেনার পদ্ধতি বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেন। তিনি বলেন : ১৯৫৭ সালের যে মাসের মাঝেই ব্যবসাটি বহলে অগত্তোষের সৃষ্টি হয়। সেখানের দাম অল্প অল্প করে পড়তে থাকে। সরকার ব্যবসাটি বহলে আবার ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট হন। এই সময় অর্থ মন্ত্রী বোম্বাইতে এবং কলকাতায় বিরে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বৈঠক করার সিদ্ধান্ত নেন। এই সময়ে শ্রীপ্যাটেল, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্ণর এবং পেটে ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যানও অর্থ মন্ত্রীর সঙ্গে থাকেন।

১৮ই জুন কলকাতায় শ্রীকৃষ্ণমাচারীর সঙ্গে ব্যবসায়ীদের এক বৈঠক হয়। এইখানে কলকাতা শেয়ার মার্কেটের চেয়ারম্যান শ্রীচন্দুর্জী আবারের জানান যে, মুন্দ্রার বিক্রয় শেয়ার বাজারে এসে আর ধরাতাকে এলে সঙ্কট বন্ধ হয়েছে। ওগুলো যখন যা তা ধরে বিক্রী হতে আরম্ভ হবে তখন এ সঙ্কট আরও বেড়ে যাবে।

শ্রীপ্যাটেল বলেন যে, তারপর তারা বোম্বাই যাত্রা করেন। ২২শে জুন ওখানকার ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বৈঠক হবার কথা।

শ্রীপ্যাটেল জানান যে, তিনি ২৩শে জুন বোম্বাই যান। সেখানে মুন্দ্রা তাঁর সঙ্গে দেখা করে তাঁর পেরাগুলো বিক্রী অথবা বন্ধক দেওয়া সম্পর্কে নানা প্রস্তাব দেন। সঙ্গে সঙ্গে জানান যে, কলকাতার বাজারে চালাও ভাবে তাঁর শেয়ার আমদানির কুঁকি তাঁকে যাতা হয়েই নিতে হবে। শ্রীপ্যাটেল নির্দিষ্ট-ভাবে মুন্দ্রাকে তাঁর কাছে প্রস্তাব করতে বলেন।

*

শ্রীপ্যাটেল বলেন, "একথা পরে অর্থ মন্ত্রীকে জানাব এবং তাই সাধারণ-ভাবে তাঁ র অনুমোদন পাওয়া যায়।"

শ্রীচাগলা জিজ্ঞাসা করেন, জীবনবীমা কর্পোরেশনের সঙ্গে শ্রীপ্যাটেলের কোন যোগ না থাকা সত্ত্বেও মুন্দ্রা তাঁর সঙ্গে কেন দেখা করলেন ?

শ্রীপ্যাটেল সত্যিই তা আমি জানিনে।

শ্রীচাগলা জিজ্ঞাসা করেন' যে, শ্রীপ্যাটেল মুন্দ্রাকে তার প্রস্তাব সম্পর্কে জীবন বীমা কর্পোরেশনের কাছে লিখতে না বলে নিজের (প্যাটেলের) কাছেই বা চিঠি লিখতে বললেন কেন ?

(বিষয় পৃষ্ঠায়, কলিশনের সামনে প্যাটেল ও বৈদ্যনাথন সিরোনাবার নীচে দুইবার)

শ্রীমুন্দ্রার জন্য অর্থ সংস্থানই ছিল অন্যতম উদ্দেশ্য

চাগলা কমিশনে ভারতের এটর্ণী জেনারেল শ্রী শীতলবাদের সওয়াল

বীমা কর্পোরেশন যে মুদ্রা প্রতিষ্ঠানগুলির শেয়ার কিনেছেন তার জন্য দায়ী কে? প্রাথমিক দায়িত্ব অবশ্যই শ্রী বৈদ্যনাথন এবং শ্রী কামাতের। কিন্তু আসল অর্থমন্ত্রণালয়ের মুখ্যসচিব। তাঁরা গত দু তিন বছর ধরে শ্রী মুন্দ্রার স্বরূপ জানতেন। তাঁর কার্যকলাপের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন। তাই তাঁদের দায়িত্ব যথেষ্ট বেশী।

চাগলা তদন্ত কমিশনের সামনে গৃহীত সাক্ষ্যসমূহের সারমর্ম বিশ্লেষণ করবার সময় এই সওয়াল করেন শ্রী শীতলবাদ, ভারতের এটর্ণী-জেনারেল।

'বিচারপতি চাগলা বলেন অর্থমন্ত্রী ও মুখ্যসচিবের সাক্ষ্যের মধ্যে অনেক পরস্পর বিরুদ্ধ উক্তি আছে। মন্ত্রী কী তাঁর সচিবের দোহাই দিয়ে বাঁচতে পারেন? যদি ধরে নেওয়া যায় যে তিনি কিছুই জানতেন না তিনি কোন সম্মতিও দেননি তবুও আইনতঃ তিনি কি দায়ী নন?

শ্রীশীতলবাদ : অবশ্যই সাংবিধানিক ভাবে।

বিচারপতি চাগলা : তিনি ত বলতে পারেন, 'এ সিদ্ধান্ত আমার নয়, আমার সচিবের।'

শ্রীশীতলবাদ : সংবিধান অনুযায়ী তাঁর নিযুক্ত কর্মচারীদের সব কাজের জন্যই তিনি দায়ী। তা তিনি জানুন বা না জানুন।

বিচারপতি চাগলা বলেন যে কার্যতঃ তিনি হয়ত দায়ী নন। কিন্তু আইনতঃ তাঁর কোন দায়িত্ব আছে কি?

শ্রীশীতলবাদ আইনতঃ দায়িত্বের একথাও পরীক্ষা হচ্ছে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা রায়ের করা যাবে কি না।

বিচারপতি চাগলা : সিদ্ধান্ত যদি সরকারের হয় ত সরকারের বিরুদ্ধে মামলা করা যাবে না কেন আমি বুঝিনে।

সরকারের সঙ্গে বীমা কর্পোরেশনের সম্বন্ধটা কি ধরণের। শ্রীশীতলবাদ এই প্রশ্নে আইনের নানা খুঁটিনাটি প্রশ্ন তোলেন। তাঁর মতে সরকার শুধু জনস্বার্থ সম্পর্কিত ব্যাপারে নির্দেশ দিতে পারেন। তাও লিখিতভাবে। সাধারণ নীতি সম্পর্কে নির্দেশ। কোন বিশেষ লগ্নীর ব্যাপারে নয়। কেন না তা হলে তা আর সাধারণ নীতি হইল না। বিশেষ হল। বর্তমান লেনদেনে এই জিনিষটা সারা আফয়াজও দুষিত করেছে।

লগ্নী সমিতিকে অগ্রাহ্য

এর পরও কথা আছে। শ্রীশীতলবাদ বিচারপতির সঙ্গে একটি বিশেষ প্রকরণ নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন লগ্নী পরিকল্পনার এই প্রকরণ অনুযায়ী কর্পোরেশন কোন কোম্পানীর শতকরা ৩০ ভাগের বেশী শেয়ার কিনবে না। অতিরাষ্ট্র আর প্রকারান্তরে এখন বিদিয়ে শতকরা ৩০ ভাগ। লগ্নী সমিতির আরও কিছু আইনও মানা হয় নি। তবোর অভাবে তিনি বলতে পারছেন না সেগুলি ঠিক কি ধরণের।

শ্রীশীতলবাদ বলেন এই লেনদেনে "ঔচিত্যের" অভাব স্পষ্ট। কেনার ব্যাপারে সরকার হস্তক্ষেপ করেছেন। তাদের নির্দেশ অনুযায়ী কেনা হয়েছে এটা ঠিক নয়। কেন না আইনতঃ কর্পোরেশন নিজের বিবেচনা মত কাজ করতে পারেন নিজের অবস্থার বুঝে। অবশ্য সরকারের নির্দেশযোগ্য বিষয়গুলি ছাড়া। এ হচ্ছে নীতিগত কথা। অথচ এই বহুতাঃ পার্লামেণ্টের বিতর্কে একথা বারবার শোনা গেছে।

শ্রীবৈদ্যনাথন ও শ্রীকামাতের সাথে খেলেই এই ব্যাপারটা শ্রীশীতলবাদের কাছে স্পষ্ট হয়েছে। কারণ সাধারণতঃ ছোরব্যাপার ও ব্যাঙ্কিং ডিরেক্টর এই সব পুস্তাব বিবেচনা করেন। তারপর লগ্নী সমিতি পরামর্শ দেন। সমিতি তখন প্রস্তাবগুলি পরীক্ষা করেন। এ ক্ষেত্রে তেমন কিছুই হয় না। সরকারী নির্দেশ কর্পোরেশনকে "পক্ষাঘাত গ্রস্ত" করল।

বিচারপতি চাগলা : কর্পোরেশনের পক্ষাঘাত হল আর অফিসরা শ্রীশাটকে কর্তৃক সম্মোহিত বলেন।

আইনকে অবজ্ঞা

এটর্ণী জেনারেল বলেন এতে কর্পোরেশনকে আর একটা সরকারী বিভাগে পরিণত করা হল। আইনের উদ্দেশ্য কিন্তু তা ছিল না। অতএব পার্লামেণ্টে গৃহীত আইনকে "অবজ্ঞা" করা হল। ওদিকে পার্লামেণ্টে অর্থ মন্ত্রী বলছেন কর্পোরেশন স্বশাসিত সংস্থা। বীমাকারীদের স্বার্থে কর্পোরেশন নিজেই লগ্নী করে।

এই "কাহিনী" শ্রীশাটের চেনে নিয়ে যেতে চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন নির্দেশ না। আসলে তিনি "পরামর্শে"র কথা বলছিলেন। এদিকে শ্রীবৈদ্যনাথন ঘোনাথুলি বলেছেন যে "সরকারই প্রভু" কর্পোরেশন কিছুই নয়। "পরামর্শের কথাটাই বলা যাক।

শ্রীশাটকে কিছুদিন আগে কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান ছিলেন। বর্তমানে তিনি অর্থব্যবস্থাবের মুখ্য সচিব। তাঁর নিযুক্ত অফিসরদের পদোন্নতি তাঁর হাতে। তাই তিনি বলব তাঁর নিযুক্ত অফিসকের পরামর্শ যেন তখন তা আর "পরামর্শ" থাকে না। আগলে তা নির্দেশ হয়ে দাঁড়ায়।

এবার লগ্নী সমিতির ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করা যাক। চারজন সরকারী আর তিনজন বেসরকারী সভ্য নিয়ে এই সমিতি। বেসরকারী সভ্য শ্রীপারিখ বলেছেন তিনি ব্যাপারটা সরকারী নির্দেশ বলেই জানতেন। বেসরকারী সভ্যের এই ধারণা। সরকারী সভ্যেরদের কাছে কি আশা করা যায়?

তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াল এই। একটা সমিতি গঠন করা হল, "গণতন্ত্র" তার নাম লগ্নী সমিতি। সে সমিতির এই ধরণের নির্দেশ পেশ করা হল। মোট ফল হল কি না কর্পোরেশনের কাজকর্ম থেমে গেল। আসলে সরকারই বীমা কর্পোরেশনের অর্থ নিজেরা লগ্নী করল। বীমা কর্পোরেশন নয়।

◆ ◆ শ্রীকৃষ্ণমাচারের সাক্ষ্য শ্রীনীহরবাবুর কাছে শুনে চমকি। শ্রীকৃষ্ণমাচারী বলেছেন শেয়ার কেনা সম্বন্ধে তিনি কোন আদেশ দেননি। বলেছেন শ্রীপাটকে তাঁর কাছে নিয়মটা তুলেছিলেন। তখন শ্রীমুন্দ্রা সম্বন্ধে বাজারে নানা গুজব রটে। তাই তিনি শেয়ার সম্বন্ধে খোঁজখবর নিতে সতর্কভাবে নির্দেশদানের কথা বলেছিলেন।

◆ ◆ শ্রীপাটকে তার সাক্ষ্যে বলেছেন মুদ্রা শেয়ার ক্রয় ব্যাপারে তিনি অর্থমন্ত্রীর সাধারণ সম্মতি পেয়েছিলেন। শ্রীশীতলবাদ বলেন এই উক্তি পরস্পর বিরোধী। কবিনদই প্রকৃতভাবে বিবেচনা করতে পারেন এঁদের দুজনের কথা সত্যই কি হয়েছিল।

২১শে জুন শেয়ার কেনা সম্বন্ধে কথা-বার্তা শুরু হয়। ২৫শে জুন ব্যাপারটা চুকে যায়। কলকাতার বাজার নাকি সংকটজনক। তাই তাড়াতাড়ি কাজ করা দরকার। বোঝাযে অথচ, শ্রীপাটকে ও বড় বড় অফিসরা নিজেদের ঘরনী কাজের তাঁকে ব্যাপারটা করলাল করে ফেললেন।

শ্রীশীতলবাদ : কারণটা কি? এই লেনদেন এত জরুরী হয়ে উঠল কেন? কেউ তা ব্যাখ্যা করলেন না।

বিচারপতি চাগলা : নিঃসন্দেহে তাড়াতাড়ি লেনদেন চুকে গেছে। আমি শ্রীপাটকেকে বলেছিলাম ব্যাপারটা "অভদ্র" রকম তাড়াতাড়ি হয়েছে। শ্রীপাটকে বিশেষভাবে গহণ করেননি।

সাক্ষ্য থেকে উদ্ভূত করে এই বী লেনদেনে বলেন শ্রীপাটকে বলেছেন শেয়ারগুলি সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত নিতে তিনি ইতস্তত করছিলেন। তিনি নিজে থেকে কোন সিদ্ধান্ত নিতে চাইছিলেন না। বম্বীর সঙ্গে পরামর্শ করতে চাইছিলেন। "তাড়াহুড়ো"র কারণটা কি? শ্রীপাটকে বলছেন একবার কারণ যাতে দর না চড়ে যায়।

(৯ম পৃষ্ঠায় ১ম কলম দ্রষ্টব্য)

মুন্দ্রার বিরুদ্ধে বিদেশী মুদ্রা আইন ভঙ্গের অভিযোগ

মেসার্স ডারকান ষ্টাটর্স এণ্ড কোম্পানী লিমিটেড এবং এস, বি, ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল কর্পোরেশনের ডিরেক্টার শ্রীহরিদাস মুন্দ্রার এবং শ্রীতুলসীদাস মুন্দ্রার বিরুদ্ধে বিদেশী মুদ্রা বিষয়ক আইন ভঙ্গের যে মামলা বোম্বাইয়ের চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে চলিতেছে তাহার শুনানী আগামী ১০ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত মুলতুবী রাখা হয়।

২৯শে জানুয়ারী এই মামলার শুনানীর সময় শ্রীহরিদাস মুন্দ্রা আদালতে উপস্থিত হন।

শ্রীমুন্দ্রার কৌঁসুলী ম্যাজিষ্ট্রেটকে জানান যে, শ্রীমুন্দ্রা অতিশয় বাত রোগে। কাজেই বাহাতে তাঁকে ক্ষণিকাতা, কালপুর, দিল্লী যেতে হয়। তাই তাঁর পক্ষে এর মধ্যে আদালতে উপস্থিত হওয়া সম্ভব হবেনা। তাছাড়া শ্রীমুন্দ্রা এই মামলায় রথিপক্ষ পড়ে দেখারও সময় পাননি। সেইজন্যই তিনি কিছুদিন সময় চাইছেন। কৌঁসুলীর প্রার্থনা মঞ্জুর করা হয়।

'বিক্রীত শেয়ার আবার কিনতে চাই'—শ্রীমুন্দ্রার সাক্ষ্য

২৮শে জানুয়ারী, বুধবার। কবিনদ কক্ষের ভিতরে ভিড় বরফার জায়গা নেই। বাইরে অপরিচিত লোক। অধীর আগ্রহে 'তদানীয় জন্য' 'বারি' অপেক্ষা করে আছে। মহীন বাইরে উৎকণ্ঠিতা ছবিতে পড়ল। কক্ষকোর্ট উৎকণ্ঠায় উদ্ধারিত হল—বিক, বিক।

কবিনদকক্ষের যবনিকা শ্রীহরিদাস মুন্দ্রার চেহারা ভেসে উঠল। বয়স ৩৭ বছর বয়সের কোটিপতি মুন্দ্রা বীর পক্ষেপে প্রবেশ করলেন। মুন্দ্রা অকপিত, উদ্ধত।

সমবেত দর্শককে তুচ্ছিত করে দিয়ে সাক্ষ্যদান-কালে মুন্দ্রা অকপটে স্বীকার করলেন, জীবনবীমা কর্পোরেশন গত বৎসর জুন মাসে ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা দিয়ে তাঁর যে-সেয়ার কিনেছিলেন সেগুলি তিনি আবার কিনে নেবার প্রস্তাব করে জীবনবীমা কর্পোরেশনের কাছে চিঠি লিখেছিলেন। আর তার জন্য ১০ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত মূল্যও দিতে চেয়েছিলেন।

মুন্দ্রা জানিয়েছিলেন, দু মাসের মধ্যেই ঐ সব শেয়ার তিনি কিনে নেবেন, তার জন্য ৫০ লক্ষ টাকার জামিন রাখতেও প্রস্তুত আছেন।

শ্রীমুন্দ্রা জানান যে, যে ধানে জীবন বীমা কর্পোরেশনের কাছে তিনি শেয়ার গুলো বিক্রী করেছেন, অন্য যে কোন লোকের কাছে বিক্রী করলে তার থেকে অনেক বেশী দাম পেতেন। তিনি কোন ব্যক্তি বিশেষকে শেয়ারগুলো বিক্রী করতে চাননি তার কারণ, তাঁর ভয় ছিল পাছে তাঁর নিজের পুষ্টিটানের কর্তৃত্ব হাতছাড়া হয়ে যায়। বীমা কর্পোরেশনের কাছে যে তত বেই কারণ কারবারে অর্থ লগ্নী করাই কর্পোরেশনের পরিনি, কর্তৃত্ব করা নয়।

শ্রীচাগলা শ্রীমুন্দ্রাকে প্রশ্নেতে জানান যে, সাক্ষ্যদানকালে তিনি এমনে যে সকল তথ্য প্রকাশ করবেন তার ভিত্তিতে তাঁর বিরুদ্ধে কোন মামলা করা হবে না। তবে শ্রীমুন্দ্রা যদি সত্য গোপন করেন, তার ফলাফল তাঁকে পেতে হবে।

শ্রীমুন্দ্রা : যথাণ, বুঝতে পেরেছি।

শ্রীচাগলা : আপনি কি বলে নিজের পরিচয় দিয়ে থাকেন? লগ্নীকার, শিল্পপতি, ব্যবসায়ের সাক্ষি সব?

শ্রীমুন্দ্রা বলেন—১৯৩৪ সালে আমি ব্যবসা ক্ষেত্রে প্রবেশ করি। ৪৬ সালে, এই প্রথম, আমি শিল্পপতিদলে উন্নীত হই। ১৯৪৬ সাল থেকে আমি কয়েকটি শিল্প সংস্থার পরিচালনভার গ্রহণ করি।

শ্রীচাগলা : শ্রীমুন্দ্রা, আপনি কি আবারকে বলবেন, ভুল মানে জীবনবীমা কর্পোরেশনের সঙ্গে আপনার যে লেন দেন হয়, তার প্রথম পর্যায়টা সুরু হয় কিভাবে?

শ্রীমুন্দ্রা : প্রথমে আমি কিছু শেয়ার —হাজার পঞ্চাশেক হবে, জীবনবীমা কর্পোরেশনের কাছে বিক্রী করি। ১৯৫৭ সালের শেষ মার্চ মাস।

শ্রীচাগলা : আপনি কি করে জানলেন, জীবনবীমা কর্পোরেশন আপনার শেয়ার কেনার ব্যাপারে আগ্রহ দেখাবে?

শ্রীমুন্দ্রা : কলকাতা শেয়ার বাজারের সভাপতি শ্রীচতুর্বেদী আমাকে বলেন, জীবনবীমা কর্পোরেশন আমার শেয়ার কেনার ব্যাপারে হয়তো আগ্রহ দেখাতে পারেন।

শ্রীচাগলা : এই কথা তো কলকাতার হয়েছিল?

শ্রীমুন্দ্রা : হাঁ।

আরও প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমুন্দ্রা শ্রীচাগলাকে জানান, প্রথম কেপের ৫০ হাজার টাকার শেয়ার বিক্রী করার পর তিনি ৫০ হাজারের আর একটা লট কর্পোরেশনকে বিক্রী করেন। কলকাতার শেয়ারের বাজারে তখন মন্দা চলেছে, তাই তাঁকে এই শেয়ার বিক্রী করতে হয়।

শ্রীচাগলা : এই সব শেয়ার আপনি কি সবাসরি জীবনবীমা কর্পোরেশনকে বিক্রী করেছেন? এর বধ্যে কোন দালাল ছিল না?

শ্রীমুন্দ্রা : না যথাণ। প্রথম লেন-দেনটা কলকাতাতেই হয়েছিল, দ্বিতীয়টা হয় বোম্বাইতে। তখন আমি এখানে ছিলাম।

শ্রীচাগলা কলকাতায় আপনার লেন দেনটা কার মারফৎ চোকে?

শ্রীমুন্দ্রা : সঠিক মনে করতে পারছি না। তবে আমার মনে হয় প্রথম ৫০ হাজার আমার এক প্রতিনিধির মারফৎ বিক্রী করি।

শ্রীচাগলা আপনার প্রতিনিধিটি কে?

শ্রীমুন্দ্রা : শ্রীমোধানি।

শ্রীচাগলা তাঁর সঙ্গে কিন্তুই জীবনবীমা কর্পোরেশনের পক্ষে কর্পোরেশনের কথাবার্তা হয়েছিল?

শ্রীমুন্দ্রা : ব্যাপারটা কে কি করে সবাই হল তা আমি বলতে পারব না, তবে এই শেয়ারগুলো আমি জীবনবীমা কর্পোরেশনকে পেঁছে দিই।

শ্রীচাগলা : আচ্ছা এখন আপনি আপনার দ্বিতীয় ধকার কারবারের বিবরণটা একটু দিন তো।

শ্রীমুন্দ্রা : দ্বিতীয় লেন-দেনের সময়ে আমি বোম্বাইতেই ছিলাম। আমি এ বিষয়ে ব্যালেক্সি ডিরেক্টর বৈদ্যনাথনকে আনাই। শ্রীবৈদ্যনাথন আমার কেনার কেনা ব্যাপারে আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন চেয়ারম্যানের সঙ্গে কথা বলে তিনি আমাকে পরে জানাবেন।

শ্রীচাগলা : শ্রীবৈদ্যনাথন আবারের বলেছেন, দিল্লী থেকে একটা ট্রাঙ্ক কল পাবার পর এই কেনা বেচা সম্পন্ন হয়। আপনি কি বলিবের কিছু জানেন?

শ্রীমুন্দ্রা : না যথাণ।

শ্রীচাগলা : আচ্ছা, ধরুণাম্রা কিভাবে ঠিক হয়?

শ্রীমুন্দ্রা : আমি প্রতি শেয়ারের জন্য ২৪ আনা ২৩ টাকা চেয়েছিলাম। কিন্তু তাঁরা ২৩৷৷৩ আনায় ঠিক করেন। আমি চেয়েছিলাম, বাজার দর অনুসারে দামটা ঠিক ঘোক।

শ্রীমুন্দ্রা অভঃপর জানান, তাঁর হাতে তখন অনেক শেয়ার জমে গেছে।

শ্রীমুন্দ্রা তারপর জানান, সেই সময়ে তাঁর হাতে বিস্তর শেয়ার জমে গিয়েছিল। ব্যাঙ্কের কাছে দেনা করে এই শেয়ারগুলো তাঁকে কিনতে হয়েছিল। বুজার শেয়ার তখন বহুদারদের হাতেও জমে গিয়েছিল। অতি অল্প সময়ের বধ্যে শ্রীমুন্দ্রা অনেক গুলো বিপুল পুষ্টিটানকে তাঁর কবায় এনে ফেলেন। ১৯৫৭ সালের বে মাসে থেকে তাঁর শেয়ারের দাম পড়তে আরম্ভ শুরু করে। সেপ্টেম্বর মাসে একটা বন মাসে। এতগুলো কারবার এক সঙ্গে চালাতে গেওয়ায় শ্রীমুন্দ্রার উপর অবনীতির চাপ ভীষণভাবে পড়ে।

শ্রীচাগলা : জীবনবীমা কর্পোরেশনের কাছে আপনার যেগুলো বিশু অংশ বিক্রী করে আপনি সেই পরিবার দেবার হাত থেকে অব্যাহতি পেতে চেয়েছিলেন, এ-কথা আমি ঠিক বলছিনে?

তাঁর উত্তরে শ্রীমুন্দ্রা জানান, বাড়ি নির্মেদের কাছে দেনার বিক্রী করার চেয়ে জীবনবীমা কর্পোরেশনের কাছে বিক্রী করাই তিনি অধিকতর বাঞ্ছনীয় মনে করেছিলেন; কারণ ব্যক্তি বিশেষের কাছে বিক্রী করলে তাঁর কর্তৃত্ব চলে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল।

(নবম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সিনেমা সমালোচনা

* তিনটি সাম্প্রতিক ছবি *

[জীবন তৃষ্ণা, লৌহ কপাট, পরশ পাথর]

অসিত সেনের প্রথম ছবি 'চলাচল' দেখে অনেকেরই উৎসাহিত হয়েছিলেন। দ্বিতীয়বার কিছু একটা তৈরী ক'রে এবার বাহবা অবশ্যই কারুর হয়নি, কিন্তু যা সমালোচকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলো তা-ও ছবির চিত্রায়ণে। অথচ চলচ্চিত্রে যে ক্ষেপ থাকবারে, পাত্র-পাত্রীর ব্যবহারই কথোপকথনে জীবন হয় না, বরং তার বহু শক্তি শব্দ-সংগীত-মূক-অভিনয়ের সম্মিলিত. বাদ্যতে, মনে রয়েছিলো যে কথা সম্পর্কে অসিত সেন অবহিত। এবং তাঁর সাধ্যমত তিনি নিজেদের সবকটি গুরোজনীয় অংগ, যেমন অভিনয়, সংগীত, আবহসংগীত, চুঙ্গরা, পরিবেশ পরিবেশ কারিগরীর প্রয়োগ-তাদেরকে প্রাণবন্ত করার প্রচেষ্টায় দৃষ্টি ও শ্রুতির মাধ্যমে দর্শকের সামনে ধরেন। কোথা চলচ্চিত্রের পক্ষে এ প্রয়াস অবশ্য ধারণা; অভিনন্দন যোগ্য।

শ্রীসুব্রত সেনের দ্বিতীয় ছবিও এদিক থেকে সম্পূর্ণ নিরাশ করেনি, বরঞ্চ কাহিনী চিত্রায়ণে আশা জাগিয়েছে, তবে হয়েছিলো যোগ্য কাহিনী নির্বাচনে ও তাকে যথা চিত্রনাট্য নির্ভর করলে [illegible] তাঁর সহজ লেখা কলমানুষের আরো [illegible] ধরেছে। তাঁর সহজ স্ট্যাটাস [illegible] অগভীর কাহিনীর প্রতি ঝোঁক [illegible] হারে, তিনি বক্তব্য এবং [illegible] চিত্রায়ণের গভীরতার দিকে [illegible] শিল্প ব্যাবসের বিকাশের [illegible]

[illegible] কুয়াশা

[illegible] কে প্রজাপতি প্রায় [illegible] কাহিনী নির্বাচনে [illegible] প্রথম থেকেই [illegible] থেকেই তাঁর ঝোঁক [illegible] পানে, কিন্তু ভুল [illegible] ব্যাপ্ত অংশগঠনীন, [illegible] চিত্রায়ণের গভীরতার তাঁর [illegible] ধারণি ।

[illegible] ছেলে দখির [illegible] ডাক্তার। না নিয়েই [illegible] বাস করার [illegible] কেন বিধবা [illegible] নিজের কাঁধে টেনে [illegible] আপন উজ্জ্বল [illegible] নেওয়ার, কেন [illegible] কোর্টশিপের পুর্ব হওয়া সত্ত্বেও ডাক্তারের ডাক্তার বাড়িতে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ রাখবে, কেনই বা পরিচিত হবে তাদের সঙ্গে, এসব খুলে উত্তর চাইলে এবং ইচ্ছাপূরণমূলক কাহিনীর বিশ্লিষ্টই বিনষ্ট হয়, তাই পরিচালক সে চেষ্টা করেননি।

তিনি সোজাসুজি ডাক্তারে উপকারী কোর্ট-পত্তির পুত্রকে পলাতক তরুণী ডাক্তারের অন্যায়ী আস্তানায় এনে তুলেছেন।

অতঃপর কাহিনী নির্ভরিনায় এগিয়ে গেছে। তরুণীর সঙ্গে মুখে নিজেকে ও'দের হাতুরার কাঁপানো ভাবাব অনন্যন নায়ক কথার কানুন উড়িয়েছেন, নায়িকা ভাল খেয়েছেন, খাঁচে বাঁচে ভালডেকে এসিয়েডে গেছেন। এবং অনেক অযৌক্তিক মুহূর্ত মুহে অবশেষে আলিঙ্গনে তাদের বিলন ঘটছে।

বাস্তবধর্ম সংগোপন সাম্প্রতিকিক প্রভাব, আধ্যান ভাষাবার চৈতন্যগ্রাসীন মোর্সার্চাচ ও অগতীর বিশ্যান 'জীবনতৃষ্ণা'র চিত্রনবতা নষ্ট করেছে। প্রত্যেকটি দৃশ্যই প্রায় বহু বুথর সংগোপন প্রয়োজন, পাত্রপাত্রীর বাহু বুদ্ধের আতিশয্যে অন্ত হয়ে পড়েছে। আবহাতরা সৃষ্টি, তার বহুক পরিস্থিতি নির্মাণ, বনজঙ্গলের সুক্ষ্ম ও বাহ্যবাহিক উপোক্ষন, কিংবা চরিত্র-গুলির পারস্পারিক সম্পর্কের জীবন ভাব-সাধ্য প্রতিষ্ঠা—কোনো ক্ষেত্রেই অসিত সেন আশোচ্য ছবিতে গোপন করতে পারেননি। পারেননি তার কারণ কাহিনীর আন্তর্ভাবি বিন্যাস ও অত্যাবক বাক্যবায়। এই বিন্যাস ও বাক্যবাহুল্যের চাপে চরিত্রগুলি এক একটি বিশিষ্ট রূপ পায়নি। তারা নিজেরাও প্রকাশ করছে কেবল কাঁপা কথার। কিন্তু চরিত্রের প্রকাশ, অন্তত বিশেষার, কেবল বাক্যে নয়, তার আঙ্গিকাভি ওঠা-বসায়, চলাফেরায়, তাকাবোয় এবং না তাকানোয়, অন্তভার ও স্বরে, চাহনা আর ঘৈর্যে—এক কথায় চোখো বড় মাঝারি সব রকম অভিব্যক্তির যোগ সূত্রে। সুতরাং দু'পাঁচটি অভিনেতা-অভিনেত্রীকে চোখের সামনে রেখে কেবল কথা বলালে চলচ্চিত্র অর্জুত হ'তে বাধ্য; আর এই কৃত্রিম আড়ষ্টতার 'জীবনতৃষ্ণার' সর্বনাশ।

আশীষ বর্মণ

ফলে অভিনয়ও কাজে উল্লেখযোগ্য নয়, উত্তম কুমারের মুখের চিত্তাগীনতার ছাপ ও গ্রাম্য সৌন্দর্যের পরে সমিপ্রতিকেন্দ্রে চরিত্রের পক্ষে সম্পূর্ণ বেমানান। তাঁর চেহারায় না আছে সহজ সংবেদনশীলতা না বৈশাখমঞ্চের চাপা অগ্নি। কাজেই সিগারেট মুখে দিয়ে নায়কের কেতাদুরস্ত হওয়ার পুরান হাস্যকর মনে হয়। স্মৃচিত্রা সেনকে অপরী দেখায় নিঃসন্দেহে, কিন্তু অভিনয়ে মনে হয় তুলের অপষ্ট হাজীরের মত অনভ্যস্ত, আড়ষ্টতেন। তাঁর কথা বলার ভঙ্গী ও বাক্য উচ্চারণ এবনো অবার্জিত পোনায়। উপরন্তু কাঁপা আড়ষ্ট সংগোপের ভারে তিনি আপাগোছা বিপর্যস্ত।

লৌহ কপাট

অন্যপক্ষে, তপন মিহিরে 'লৌহ কপাট'এর অনপ্রিয় হওয়ার সম্ভাবনা যথেষ্ট। তপনবাবুর কাজ দেখলে মনে হয় গল্প নিয়ে পাঁচ কথায় তিনি বিপক্ষে এবং নিজের শিল্প সাধ্যমত সবচে তীব্র বর্ণনায়। এই বিন্যস থেকেই সম্ভবত তিনি প্রথমে অভাবিধীকে এক ঘোরালত্বহীনে ফেলতে চান, আর এটাই তাঁর সব থেকে বড় সমায়। তাই 'লৌহ-কপাট' বাহ্যিক অন্তর্দু টুকরো কথকতা থেকেও চিত্রনাট্য সংগঠ একটি চিত্রনাট্য তিনি খাঁড় করতে পারেন। এ চিত্র কাহিনী অভিনাদুকে ও সাম্যবিকতায় অভিনয় মনেও অনপ্রিয় হবার সাদাস সম্ভাব্য সাপেট থাকে।

এবং পথা দেখানেই। অর্থাৎ বুনত অভিনয় কাহিনীও তপনবাবুর কথকেই সহজ গুণের কথা নেতিচিত্র হরণ করবে।

গল্পের প্রধান দুটি চরিত্রকে সমি বিচার করা হয় তাহলে দেখা যাবে দু-জনের একজন পাকা খুনে এবং অন্যজন খুনের ও ডাকাত। মধ্য চিত্রে কাহিনীর সূচনা হলো তাদের ব্যক্তিগত চিত্তবিক্ষেপের মধ্যে দিয়ে। দেখানো হলো একজন বুনি, তার বুত কিশোরী কন্যার অধিকন সুখাবয়ব অধিকারিনী একটি তরুণীর উপর আগন নজরেই আকৃষ্ট হয়ে অন্যায়িক অত্যাচার দর্শনে মানসিকভাবে সম্পূর্ণ বিমনস্ক, এবং ছেলে ও'দের কি-ভাবে প্রতিশ্চিন্ত করা যায় সে চিন্তায় মগ্ন; আর অন্যজন, কবির, স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক ক'রে একটি যুবাকে মেরে স্ত্রীর দ্বারাই জেলে নিশ্চিন্ত, তবু তারই মুখোস্থি ডেকে-ডেকে বাঁচার জন্যে ব্যাকুল।

কবেলীদের ভিতর প্রধান দুটি চরিত্রের কাহিনী তাদের ব্যক্তিগত জীবনের এই ভাবাগু আখ্যানের মধ্যে দিয়ে আরম্ভ হওয়ায়, স্বভাবতই, দর্শক চরিত্র দুটির আসল স্বরূপ ভুলে যান, তাদের প্রতি নমু হয়ে যান। আর সেটাই সাধারণভাবে ক্ষতিকর। কেননা মুলিন ও কবির খুনলের ইতিপূর্বে আরো বহু-বুন ডাকাতি করেছে, তখন তাদের প্রাপে প্রেম-বন্ধতা প্রশ্ন ওঠেনি, চিত্তে অনুশোচনা বা দুখে জাগেনি। কারণ এর আগে ঘৈকবন একজন অধিকন নিজের মেয়ের বয়ী থেকেনি এবং অন্যজন স্ত্রী সত্ত্বে ঈর্ষা বিনাই নিধারীন ভাবেলোক মেরে মাটিতে পুঁতে ফেলেছে।

বিশদের কথা এই যে ছবির মাধ্যমে তাদের আলোচা সাবিক স্বরূপটাই চাকা হয়েছে, তুলে ধরা হয়েছে অভিব্রিতি, ভাবাগু বৈনবচারাগত ধৈর্যেরও দিক। তাতে দর্শকের (এবন কি বিচারপতিরও!) মন অপাত্রে আর্দ্র হয়। কবির ও মুলিন চরিত্রের সম্পূর্ণ ছবি দর্শকের চোখের সামনে থেকে লুপ্ত রেখে একপেশে যে স্বরূপ চোখেনো হয়েছে তা সত্যের অপলাপ, আর তাই মানবিক নয়, বরঞ্চ বিপজ্জনক।

কলা নৈপুণ্যের দিক থেকেও লৌহ কপাট চরকসুখ নয়; সাধারণ গড়পড়তা দেশি ছবির তুলনায় প্রশংসনীয় বলাই যথেষ্ট। কামুনিওয়ালা থেকে এ ছবিতে চিত্রগুণের প্রতি তপনবাবু বেশি নজর দেওয়ার চেষ্টা করেছেন স্পষ্টই, এবং সে চেষ্টা শুধুমাত্র নজতে উচ্চ চলার মূল্যে বহু জায়গা নি – প্রশ্নাল পেরেছেন চরিত্রগুলিকে তাদের পরিবেশের চিত্রন করতে। কিন্তু সাধের পরিধাণে সাধ্য তাঁর স্বপ্ন, কাজেই কৃতিত্ব তবস বরে না; বরং জায়গায় জায়গায় অত্যন্ত তরল প্রতীকী ঝোঁক, প্রতীকী চিত্রের অবোধ ব্যবহার, ভয়ানক কাঁচা লাগে। বেমন মুলিন পলায় বন্দি দেওয়া ও পাখীর বাসায় পাখীর ছটকটিয়ে মরা, কবিরের বাসায় পাখীর ছটকটিয়ে মরা, কবিরের ছেলের পরাণ ঘরে বৌয়ের চিন্তা এবং অন্যপক্ষে কলোতকপোতীর নীড় বাঁধা, মতীনবাবুর গুণ্ডাদলে নাম লেখানো, ভিজে কাপাসে মাটি ঠেলে এক মুড়ন বেরে অঙ্কুরোদগম দেখে যাওয়া ইত্যাদি।

মোটামুটি সবু লৌকপাট ছবিটাই ভাবাগু অতি-নাটোর সুরে বাঁধা, মুল সমাজ বিরোধীও।

পরশ পাথর

অথচ নরসা সিনেমাজিরেই মনে যে সামাজিক চৈতন্য বহুমুল, ভণ্ডাওতের চিন্তা পুরব দে-কথা বিদেশী পুত্তিকান না ঘাঁড় করিয়েও যোমান যায় সত্যজিৎ রায়ের পুষ্টাহে। সত্যজিৎ রায়ের ছবি দেখতে বসলে মনে হয় না যে ছবির অন্তর্গত ঘটনাবলী শুধ তথাকথিত দিনেমাহেই সম্ভব, সব জগতে নয়; মনে হয় না যে তাঁর পাত্র-পাত্রীরা স্বনি কাল পাত্রের সমস্ত নিয়ন্ত্রনের উর্দ্ধে। বরং অন্যপক্ষে, সত্যজিৎবাবুর ছবি জীবনের পটভূমির উপাদর্শি জাগায়, স্থানকালের বিধৃত মানুষের সমাজ সংগাত সমন্বে এবং পারস্পরিক সম্পর্ক সমন্বে অন্তর্দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করে।

তাঁর হাতের ছবি 'পরশ পাথর' পুনশ্চায় প্রধান সমস্যা যে সত্যজিৎ বাবু বাজারে চালু 'ট্রাজেডি' হোমেনা না, মাথা খোঁড়েনা না এবন কোনো অসাধারণ বক্তব্য সমাজে না তুলে স্বাভাবিক সুন্দরো করাবার্গায় কুশলী। তিনি তাঁহার সমাজ—সংসারে জড়ানো মানুষের পুত্তিই, তাদের আশাপ্ত, দুষ্টিগ্রাহ্য সাধারণ জীবন যাত্রার নেপথ্যেরা যে নাটক, যে ধ্বনিরো আবেগ, যে হাসি ও বেদনা তার কেন্দ্রে।

বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার মনুষ্যত্বের বুলা পুরে পুনা, তাই 'পরশ পাথরের' পরেশবাবুর স্ট্রোক বহনেও সহ বন্দরের চাকরীর পর অফিস থেকে অবসরোত্তরে গ্রাচিটি চন্দ্র গ্রাচিটি-এর বরে পরেশবাবুর কি ক'রে চলবে, আদৌ চলবে কি না সে আগাবরে সমাজ সম্পূর্ণ উদাসীন। কেবল বাড়ি—মানুষের নিবাস্ত বর্তমান সামাজিক ব্যাবস্থা কোনো রাহিত্যই স্বীকার করে না তার কাছে নিছক মনুষ্যত্বের মাবীতে বাড়ির কোনো মুল্য নেই।

মুল্য সোনার, সম্পদের। তাই ঘটনাচক্রে পরেশবাবু যেই পরশপাথর পেলেন এবং সেই পাথর দু'টিয়ে অনায়াসে লোহাকে সোনায় রূপান্তরিত করতে থাকলেন অবনি সমাজ তাকে সিংহাসন করলো, সম্মানিত করলো।

ছবিটির মুল বক্তব্য এটুকুই। আর এই তাৎপর্যের আধ্যানকে সত্যজিৎ রায় অনবদ্য শিল্প নৈপুণ্যে, হাসির ছবির সুরে, সবার সামনে ধরেছেন।

পরেশবাবুর চ্যাক্ষিতে চ'ড়ে চিত্র; গার্ড অফ অনার পুরব কথা; কুতকাযাজক পরিবর্গ; শ্টাচ্যু, আশন মনে হাতবুর নাড়তে নাড়তে পথ চলা; পরশ পাথর হাতে মা-কালীর ছবির সামনে বিষ্ণু আর্তনাদ; জৈত্রা বাঁচিয়ে রাখা সম্বন্ধে বক্তৃতা, দুষ্টিনীকে সমায় উপসায় দিতে যাওয়ার বৃথা, অতীত ভুলে যেতে বলার পরামর্শ, কবুলের পাটি; পরেশ দিন দুয়ে বিপর্যস্ত অবস্থা ও অবশেষে বিলন ঘরে এসে চোকা—এক কথায় সমগ্র ছবিটির দৃশ্যের পর দৃশ্যে সত্যজিৎবাবু তাঁর অসাধারণ পর্যবেক্ষণ শক্তি ও নিপুণ বোধের সাক্ষ্য রেখেছেন। তাঁর গভীর পর্যবেক্ষণ শক্তি ও তাকে চলচ্চিত্রে জীবন্ত করার ক্ষমতা সর্বত্র বিরল।

তাঁর ছবিতে আচরণ-সংলাপ অভিনয় ও পরিবেশ সৃষ্টিতে ই'রে সুচাগ্র তাৎপর্যে প্রণাত্রিত হয়, ছবিতে আনে বক্তীর ইতিত এবং প্রাণবন্ত অর্থ-ব্যঞ্জনা। আচরণ অভিনয় সংলাপ ও পরিবেশের পুথক সত্তা থাকে না, তারা সংযুক্ত সত্তা পায়।

বেবন পরেশবাবু কবুলের দুর্ঘটনার পরের দিন অফিসে আসেন; বিচ্ছুটা অনুভূতির, বিবনা। ছোকরা গ্রিয়তোষ তাঁকে দেখে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ায় চেয়ার ছেড়ে, সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করে তাঁর কি শরীর খারাপ ? পরেশবাবু সোজাসুজি উত্তর দেন না; কেবল এক সেকেন্ডের মধ্যে ভেবিয়ে আসেন নিজের চৈরিসের দিকে, স্বগতোক্তে বলেন—"বেমরী— (Pause)—া"

বলেন নিজের চেয়ারে, আপন মনেই বলেন—বেমরী বি ফিকিব... (Pause) গ্রিয়তোষ বেমরী। ইত্যাদি।

অর্থাৎ তখনো তাঁর মন আচ্ছুন, আপ্লুত পূর্ববাত্রের দুর্ঘটনায়। কিন্তু বেহেতু গ্রিয়তোষ সত্বুখে, গ্রিয়তোষ সমুখস্থ বাস্তব, বেহেতু গ্রিয়তোষ সত্বুখ, তাই তাঁর আচ্ছুন চৈতন্যের মধ্যে, ধীরে ধীরে সচেতন হ'তে-থাকাবেক, ক্রবেই গ্রিয়তোষ আকার পাচ্ছে, পরিষ্কার হচ্ছে তথকোনীন অবয়ব। আর এই বে মানুষের চরিত্রাবয়ব ও মনোবের সঙ্গে আচরণ এবং কথার অন্যোন্য যোগ, এইযোগকেই, নাড়ীর বন্ধনকেই, নিবেদার নির্ভুল ইতিতে সত্যজিৎ উপস্থিত করেন। সেখানেই তাঁর জোর।

তাঁর চিত্রনাট্য অনবুকরণীয়, বিস্ময়কর, পরশ পাথরও সেকথার সাক্ষী।

দুরত বিত্রের কথাবার্তার কাজ সম্বন্ধেও উদ্ভুসিত হওয়া সত্যজিৎ নেই; তাঁর হাতে, সত্যজিৎ-এর সর্বশেষ ছবিতেও, কাগজের কাগ্য হয়ে ওঠেনি। বরনী চক্র ওপরে সেই তো সেই বলেই মনে হয় না এবং নিরপেক্ষের পক্ষে এর থেকে বড় ওণ অনুপস্থিত।

উপসংহারে অভিনয়ের কথা। আগলে সত্যজিৎবাবু ছেড়াবে ছবি তোলেন, মানুষের বনস্তরের সঙ্গে দে-তাবে তার বহি: প্রকাশের সঙ্গতি খোঁজেন, তার কথা-চলা-বলা-চাওয়া এবং নীরবতা সব ছেড়াবে স্থানকাল ও পরিস্থিতির ঐকি বুড়ায় বাঁধেন, তাতে গুণী মাত্রেই চমকুপ্ত অভিনয় করার সুযোগ পান। তাঁর প্রত্যেকটি ছবিই একখাত উজ্জ্বল প্রমাণ, পরশ পাথরও তার ব্যতিক্রম নয়। এতকালের চেনা দুলসী চক্রবর্তী ও অন্যান্য যে সব পাঁর অভিনয় দেখিয়েছেন পরশপাথরে, যে গভীর অর্থ পেয়েছে তাঁদের কৃতিত্বের সঙ্গে পুণ্যশ্লোক সত্যজিৎ রায়ের প্রতিভা।

এ ছবি আবার বাবণা, প্রত্যেকটি বাঙালীর দেখা উচিত।

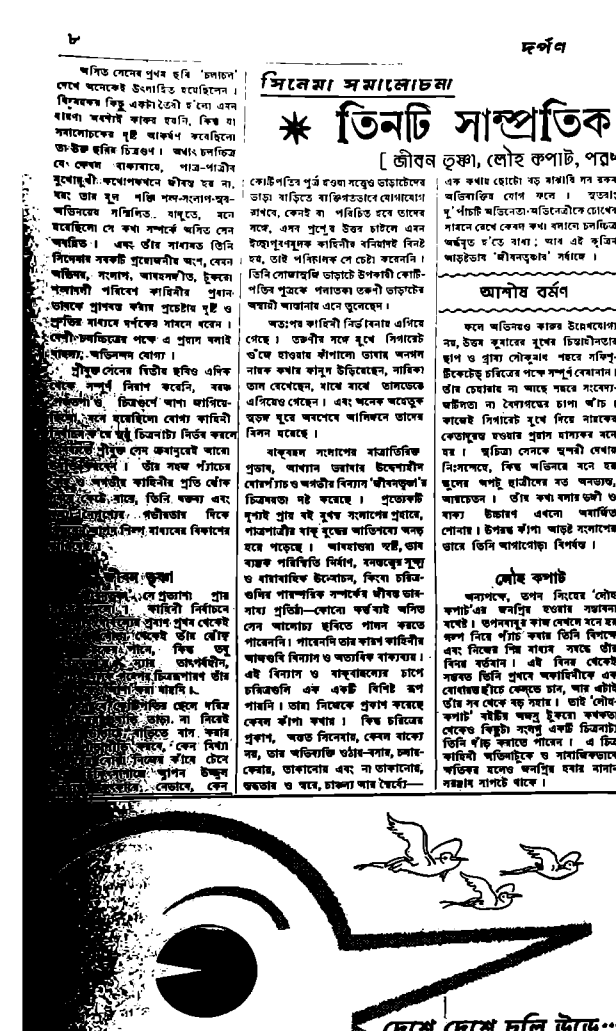

কমিশনের সামনে প্যাটেল ও বৈদ্যনাথন

(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

শ্রীপ্যাটেল : কেন তা আমি জানিনে তবে আমি মুন্দ্রাকে আবার কাছেই চিঠি লিখতে বলি।

অতঃপর শ্রীচাগলা মুন্দ্রার প্রস্তাব সম্পর্কিত চিঠিখানার উল্লেখ করে বলেন, "আমার ধারণা এই চিঠিতে তিনি পরিষ্কারভাবেই চেয়েছিলেন যে আপনি তাঁর আর্থিক সংকট মোচন করুন।" দেশের ভবিষ্যৎ বা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সম্পর্কে তাঁর (মুন্দ্রার) কোন আগ্রহ নেই।

শ্রীপ্যাটেল : কখনো না।

শ্রীচাগলা অর্থমন্ত্রীকে আপনি কি চিঠিখানা দেখিয়েছিলেন ?

●

শ্রীপ্যাটেল : বলতে পারছি নে। হয়ত দেখিয়ে থাকব।

শ্রীচাগলা : টাকার অঙ্কটা যে কত, তা কি আপনি তাঁকে বলেছিলেন ?

শ্রীপ্যাটেল (মাথা নেড়ে ঐ চিঠির ভিত্তিতে) তাঁকে বোধ হয় ৮০ লক্ষ টাকার কথা বলেছিলেন।

এক প্রশ্নের উত্তরে শ্রীপ্যাটেল জানান যে এইসব আলোচনা ২২শে জুন আরেকবার ঘরে হয়েছিল। সেই সময় শ্রীভট্টাচার্য (স্টেট ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান) উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীচাগলা স্বেচ্ছা প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করেন, এই ব্যাপারে লণ্ডী উদ্যোক্তা বোর্ডের বহু প্রমুখ কথা হয়নি কেন ?

শ্রীপ্যাটেল বলেন যে, কোন কোন ক্ষেত্রে চেয়ারম্যানও নিমন্ত্রণ নিতে পারেন। তবে তাঁকে পরে অবশ্য বোর্ডের অনুমোদন নিতেই হবে। শ্রীপ্যাটেল বলে করেন যে, এই পেয়ার কেনার আগে বোর্ডের বহু নিতে পেলে অনর্থক বিলম্ব হত। কারণ সংসারা বিভিন্ন জায়গায় থাকেন। তাঁদের কাছে নোটিশ পাঠানো, তাঁদের অনু করতে নবহ তো লাগতই।

শ্রীচাগলা : বোধাই আর কলকাতার মধ্যে তো খুব ভতাযাত বিমান সার্ভিস আছে। (হাস্য)

শ্রীচাগলা : আমি আপনাকে সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করতে চাই, জীবনবীমা কর্পোরেশনকে এই বিষয়ে বিবেচনা করবার বা সিদ্ধান্ত নেবার মত সময় কি আপনি দিয়েছিলেন ?

শ্রীপ্যাটেল : নিশ্চয়ই। এটা তো কর্পোরেশনেরই বিবেচনা করার বিষয়।

●

যে তাড়াহুড়োর মধ্যে এই পেয়ার কেনার ব্যাপারটা ঘুরেছে সে সম্পর্কে শ্রীচাগলা জিজ্ঞাসা করেন, আমাদের সামনে যে সব সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থিত হয়েছে তাতে দেখছি, ব্যাপারটা খবই জরুরী হয়ে পড়েছিল আর সেই জন্যেই তাড়াহুড়ো করতে অতঃ সকলের তাড়াহুড়ো করতে হয়েছিল। এত তাড়ার কি ছিল ?

শ্রীপ্যাটেল : এব্যাপারে একটু তাড়া ছিল।

জীবনবীমা কর্পোরেশনের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর শ্রীএন, এম, বৈদ্যনাথন তাঁর সাক্ষ্যে বলেন যে, তাঁর বিদা পরামর্শে ১৯৫৭ সালের ২৩শে জুন তারিখে মুন্দ্রাযোগাঁর কমেপনী কোম্পানীর পেয়ার কেনা সাব্যস্ত হয়ে যায়।

তিনি বলেন, এক রবিবার শ্রীপ্যাটেল তাঁকে বোম্বাইয়ের রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ডেকে পাঠান। সেখানে কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান শ্রীজি, আর কামাত, অন্য একজন ডিরেক্টর শ্রীরাআগোপালন কর্পোরেশনের লণ্ডী সচিব শ্রীএস, ডি সোধনি এবং ওরিয়েণ্টাল কাম্পানীর ম্যানেজার শ্রীএস, এম, মৈথাও ছিলেন। সেখানে কর্পোরেশনের সম্পর্কে সাধারণ ভাবে কিছু কথা আলোচনা হয়। বৈঠক শেষ হওয়ার মুখে শ্রীপ্যাটেল, শ্রীকামাত, শ্রীবৈদ্য ও তাঁকে নিয়ে তিন সকালে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে যেতে বলেন। সেদিন সেখানে তিনি চেট ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান শ্রী টি, সি, ভট্টাচার্যকেও দেখেন। শ্রীপ্যাটেল শ্রীবৈদ্যনাথনকে জানান যে ঠিক হয়েছে যে মুন্দ্রা কোম্পানীর কিছু পেয়ার কেনা হবে।

ইতিমধ্যে সেখানে শ্রীমুন্দ্রাও এসে হাজির হন। কি পরিমাণ পেয়ার কেনা হবে এবং কি রাবে কেনা হবে তাই নিয়েই কিছু সাধারণ কথাবার্তা হয়। শ্রীপ্যাটেল মুন্দ্রাকে বলেন বাজার দরের চেয়ে বেশী দাম তাঁকে দেওয়া হবে না। সেই কথাবত যত পেয়ার কেনার কথা ছিল, পরে সেটা বাড়ানো হয়, শ্রীবৈদ্যনাথন বক্তব্য করেন।

শ্রীচাগলা : কেন-বেচ পেশ হয়-করে ?

রবিবার, না সোমবার ?

শ্রীবৈদ্যনাথন : আমি জানিনে কারণ আমি উপস্থিত ছিলাম না।

শ্রীচাগলা : আপনি তো কর্পোরেশনে ম্যানেজিং ডিরেক্টর। এ ব্যাপারে আপনার কোন পরামর্শ নেওয়া হল না ; এতে কি আপনি বিস্মিত হননি ?

শ্রীবৈদ্যনাথন : না, কারণ, কারণ আমাকে আগেই জানানো হয়েছিল যে মুন্দ্রা-কোম্পানীর পেয়ার কেনা হবে। তবে বিস্মিত হলাম, যখন দেখলাম যে মাত্র একজন লোকের কাছ থেকেই এত বেশী টাকার পেয়ার কেনা হচ্ছে।

শ্রীচাগলা : বুঝতে পারছি, আপনি আগেভাগেই (ঐ সব পেয়ার কেনার ব্যাপারে) বোধ দেননি। আপনি ছিলেন শুধু বিরাট দর্শক।

শ্রীবৈদ্যনাথন : কারণ সেখানে আমার উপস্থিতিতা নিষ্প্রয়োজন।

শ্রীচাগলা জানতে চান যে, শ্রীপ্যাটেল নির্ভিধাবে কোন নির্দেশ দিয়েছিলেন কি না।

শ্রীবৈদ্যনাথন : যখন বুধা সচিবের মত গণ্য ব্যক্তি বলেন যে, 'এটা করতে হবে' তখন সেটাকে আমরা নির্দেশ নির্দেশ বলেই ধরে নিতে পারি।

শ্রীচাগলা : শ্রীপ্যাটেল পরামর্শ দিয়াছিলেন ? না নির্দেশ ?

শ্রীবৈদ্যনাথন : নির্দেশই দিয়েছিলেন।

শ্রীচাগলা শ্রীপ্যাটেলকে লেখা শ্রীমুন্দ্রার ২৩শে জুনের চিঠিতে যেখানে লেখা আছে "বর্তমান অবস্থা থেকে আমরা পরিত্রাণের জন্য" তা উল্লেখ করেন ও শ্রীবৈদ্যনাথনকে জিজ্ঞাসা করেন, এটা কেন আপনি কি বোঝেন ?

আপনি কি জানতেন, শ্রীমুন্দ্রার আর্থিক দুর্গতি মোচনের জন্যই এই লেন-দেনের ব্যবস্থা হয়েছিল ?"

শ্রীবৈদ্যনাথন হাঁ।

অতঃপর নানাপ্রশ্নের পর শ্রীচাগলা বলেন যে এই লেন-দেনে খুব তাড়াহুড়ো করা হয়েছে বলে থাকে।" এই তাড়াহুড়োর কারণ বোধ হয়, শ্রীমুন্দ্রা তখন আর্থিক দুর্গতিতে লিপ্ত হচ্ছেন ?"

অন্য এক প্রশ্নের উত্তরে শ্রীবৈদ্যনাথন বলেন, শ্রীমুন্দ্রা সম্পর্কে এখন যা জেনেছি তখন তা জানতাম না।

শ্রীচাগলা মুন্দ্রা সম্পর্কে এখন যা জানেন আগে যদি তা জানতেন তাহলে কি পেয়ারগুলো কিনতেন ?

শ্রীবৈদ্যনাথন : না, কখনও।

শ্রীচাগলা আপনি যার ম্যানেজার ছিলেন সেই ওরিয়েণ্টাল ইন্সিওরেন্স কোম্পানী, কি এ ধরণের লণ্ডী করত ?

শ্রীবৈদ্যনাথন কখনই না।

দিল্লীর চিঠি

কৃষ্ণমাচারীর পদত্যাগ নিশ্চিত

(দর্পণের নিজস্ব প্রতিনিধি)

অর্থমন্ত্রী শ্রীটি, টি,কে, কে আর কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় বসে রাখা যেন না। শুনলাম তিনি পদত্যাগ পত্র দাখিল করেছেন, এখন বাকি সেটি গৃহীত হওয়া এবং তার সরকারী ঘোষণা।

শ্রীটি, টি, কে অবশ্য ইতিমধ্যেই দপ্তরে আসা বন্ধ করেছেন এবং আমার মনে হয় ১০ই ফেব্রুয়ারী লোকসভার বাজেট অধিবেশনের উদ্বোধন দিনে ট্রেজারী বেঞ্চে তাঁর আসনটি শূন্য দেখবো।

বেচারী কৃষ্ণমাচারী। দুর্নীতির সঙ্গে সংগ্রামে জড়িয়ে পড়ার অপরাধে গত কয়েক বছরে কম করেও আধ ডজন মন্ত্রীকে পদত্যাগ দ'তে হয়েছে কিন্তু তাঁদের কারো জন্যে মনেনি কমিশন, যদনি এতো বৈচে। সেই গদীচ্যুত মন্ত্রীদের নামও আজ অনেকের মনে নাই। কংগ্রেস দলের মধ্যে খুঁটির জোর থাকলে গদীকুক্ষাচারীও সশরীরে বিদায় দিতে পারতেন পূর্বগামীদের মত। খুঁটির জোর নেই, এখন তিনি সব ঘোর।

একটা কথা। কাঁচা পরনা খেকলে মন্ত্রিদের নয় হাত নিল্ দিয়ে করে। গদীসুদিন বইতো নয়। সাবনে অন্ধকার ও অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। কিন্তু তাঁদের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত এবং গদী

বেশ পাকা ডিতের ওপর প্রতিষ্ঠিত সেই আই, সি, এসরা এখন হলেন কেন ? স্বাধীনতার হাওয়া লেগে ইস্পাতের ত্তেরে ভং ধরলো নাকি ?

●

রাজধানী দিল্লীতে প্রজাতন্ত্র দিবসের তাবাসার শিছনে কত টাকা খরচ হয়—একবার তার খোঁজ নেবার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু বেশী দূর এগুতে পারিনি। কারণ এই তামাসার উদ্যোক্তা হলেন সৈন্য বিভাগ এবং খরচটা সামরিক খাতে বিভিন্ন খরাদের কোন একটির বা কয়েকটির অন্তর্গত, কাজেই গোপনীয়।

তিনি যে বা মোক, এই বাৎসরিক তামাসার প্রধান পরিকল্পনা যিনি করেছিলেন তিনি সরবরীয় ব্যক্তি। কেন্দ্র তুলতে যে বেশনার দরকার সচিকভাবেই তিনি তা অঁচ করেছিলেন।

এখন মুক্তি হয়েছে ছেলের বয়স বাড়ছে, তবু বেশনায় সে আর ভুলতে চাইছে না। এবং বেশনার বদলে অন্য কিছু তার হাতে ধরিয়ে দেবার কথাও কেউ ভাবছে না।

সৈন্য সাবন্ধের কুচ কাওয়াজ মন্দ নয়। কিন্তু কি প্রয়োজন মারণাস্ত্রের প্রদর্শনীর ? বিশেষ করে যার সবগুলিই বিদেশ থেকে আমদানী এবং অবশ্যসিদ্ধ।

তামাসার মং খোগাতে কুচকাওয়াজের মধ্যে হাজির করা হয়েছিল সৈন্য বিভাগের দীর্ঘতম ব্যক্তিটিকে। আগামী বারের জন্যে কোন মং এবং কি বিষয়ে আপোষ করছে কে জানে।

●

কয়েক বছর ধরে দেখছি প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজের নেতৃত্ব হিসেবে গাকে এক সাজুক্তিক শোভাযাত্রা—যার সঠিক বর্ণনা দিতে গেলে সং কথাটা প্রথমেই মনে আসে। এই সংএর ব্যবস্থা খুব সম্ভব ধর্মঘটের বিরুদ্ধে দেবার জন্যে।

শুনেছি এই সাজুক্তিক সংএর পরিকল্পনাটি কেন্দ্রীয় শিল্প দপ্তরের সম্পূর্ণ নিজস্ব। পর পর কয়েক বছর এই সাজুক্তিক সং দেখার পরও জেনে বিস্মিত হতে হয় যে 'সংস্কৃতি' আজও শিল্প দপ্তরের পোটকোনিও ভুক্ত হবার সুযোগ পায়নি।

শ্রীমুন্দ্রার সাক্ষ্য

(৭ম পৃষ্ঠার শেষাংশ)

শ্রীচাগলা : শ্রীচতুর্বেদী কি আপনাকে শ্রীপ্যাটেলের সঙ্গে দেখা করতে বলে ছিলেন ?

শ্রীমুন্দ্রা : হাঁ। আমার সঙ্গে তিনি ঘোষাইতেও আসেন। তাঁর চিকিৎ আমি কাছে তিনিই আমাকে শ্রীপ্যাটেলের সঙ্গে দেখা করতে বলেন।

শ্রীচাগলা : আপনারের সাক্ষাৎকারটা হল কিভাবে ?

শ্রীমুন্দ্রা : ২শে জুন সকালে আমি তাঁকে টেলিফোন করি; তিনি আমাকে দেখা করতে বলেন।

শ্রীচাগলা : আপনি কি শ্রীপ্যাটেলকে আগে থাকতে জানতেন ?

শ্রীমুন্দ্রা : দিল্লীতে দু'এক বার তাঁর সঙ্গে আমার স্বাভাবিক কাজকর্মের ব্যাপারে দেখা হয়েছে।

শ্রীচাগলা এই স্বাভাবিক কাজ কর্মটা কি ?

উত্তরে শ্রীমুন্দ্রা জানান, নানা বৈ বৈষয়িক কাজ কারবারের জন্য তাঁকে প্রায়ই দিল্লীতে যেতে হয়। এবং দিল্লীতে অর্থ ও বাণিজ্য দপ্তরের বিভিন্ন উচ্চ পদস্থ কর্চারীর সঙ্গে তিনি দেখা সাক্ষাৎ করে থাকেন।

শ্রীচাগলা তারপরে শ্রীপ্যাটেলের সঙ্গে দিল্লীতে আপনার ক'একবার সা সাক্ষাৎ হয়েছে। বোম্বাইতে আপনি তাঁকে টেলিফোন করেন, তারপর তিনি আপনাকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেন।

শ্রীমুন্দ্রা হাঁ।

শ্রীচাগলা ২১শে জুন বোম্বাইতে আপনারা যে আলোচনা করেন সেখানে আর কেউ উপস্থিত ছিল ?

শ্রীমুন্দ্রা না, মহাশয়।

শেষাবের ঘর সম্পর্কে নানা প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমুন্দ্রা জানা, জীবনবীমা ক কপে রেপনের কাছে

তিনি অনে কম ধরেই শেয়ার বিক্রী করেছেন।

শ্রীমুন্দ্রা আমাকে অনেক স্বার্থ ত্যাগ করতে হয়েছে।

শ্রীচাগলা আপনার স্বার্থত্যাগের জন্য আপনাকে আপশোষ করতে হবেনা (হ,স্য)

অতি সস্তায় ও সব রকম ধারে
মোটর, অগ্নি ও প্রমিক
বীমার জন্য
বা
গাড়ী, ট্রাক প্রভৃতি সুবিধামত
কিস্তিবন্দীতে কেনার জন্য
যোগাদান করুন :
মেসার্স এস এন বসু
এণ্ড
কোম্পানী
প্রাইভেট লিমিটেড
১০১-সি, বালিগঞ্জ প্লেস, কলিঃ-১৯
(টেলিঃ ৪৬-১৮৮৪)
ন্যাশনাল এমপ্লয়ার্স
মিউচুয়াল
জেনারেল ইনসিওরেন্স
এ্যাসোসিয়েশন লিমিটেডের
(ইংলেণ্ড সমিতিস্থ)
এজেণ্ট

চাগলা কমিশনে শ্রীশীতলাবাদের সাওয়াল

(৭ম পৃষ্ঠার শেষাংশ)

২৩শে জুন শ্রীমুন্দ্রার চিঠির উল্লেখ করেন শ্রীশীতলবাদ। তিনি বলেন ঐ চিঠিতে ৮০ লক্ষ টাকা (বীমা কর্পোরেশনকে বিক্রীত পেয়ার) ৯৪ লক্ষ টাকা হয়েছে। তারপর কী করে ঐ অঙ্কটা এক কোটি ২৬ লক্ষ দাঁড়াল তা পরিষ্কার হয় না।

শ্রীমুন্দ্রা বেশী টাকার জন্য চাপ দিয়েছিলেন। এ ব্যাপারও করা যেতে পারে। জুন মাসের ২৪শে ও ২৫শে প্রায় এক কোটি ২৩লক্ষ টাকার পেয়ার নরাসরি কেনা হয়। মার্চ মাসে জেপল কোম্পানীর পেয়ার কেনার পর ঐ একরাত্র নরাসরি পেয়ার কেনা। কর্পোরেশনের ইতিহাসে এই প্রথম।

●

কি রাবে পেয়ার কেনা হবে সে সম্বন্ধে গুরুত্ব পরস্পর-বিরোধী সাক্ষ্য রয়েছে, শ্রীশীতলবাব বলেন।

বিচারপতি চাগলা এটা অত্যন্ত রহস্যময়। দায়িত্বশীল অফিসারবাও জানেন না কী বর ঠিক হয়।

শেয়ারের দামে কারচুপি

শ্রীশীতলবাব বলেন সাক্ষ্য থেকে দেখা যাচ্ছে এর মধ্যে "কারচুপি" ছিল। অন্ততঃ তিনটি ক্ষেত্রে শ্রীমুন্দ্রা যাচ্ছেতাইভাবে তার চেয়ে বেশী দাম দেওয়া হয়েছে। তিনি বলে করেন এই লণ্ডী যোটেই "ফ্রাইডেন" নয়।

এই জেনদেনে কর্পোরেশন যে শেয়ার কিনেছে তার মধ্যে সাড়ে পঞ্চাশ লক্ষ টাকার শেয়ার খারাপ, ৩৭ লক্ষ টাকার মত শেয়ার ভাল, ও ৩৯২৫০০০৲ টাকার শেয়ার মাঝামাঝি। এই অনুপাত ব্যবসায়ীর দিক থেকে সুবিধার নয়। শ্রী মুন্দ্রার দিক থেকে ভাল। শ্রী শীতলাবাদ এর থেকে মনে করেন যে শ্রী মুন্দ্রার জন্য "কিছু অর্থের সংস্থান করাই ছিল অন্যতম উদ্দেশ্য।"

শ্রীশীতলবাদ গৃহীত সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করে বলেন যে একনরাত্র চলতি দরের কথাই হয়েছিল। তা নিয়েও মতভেদ আছে। তিনি বলেন : "অথচ সরাসরি কথা হচ্ছে শ্রীপ্যাটেলকে ২১শে জুন লিখিত মুন্দ্রার চিঠিতে মনে হয় চিঠিতে যে দর আছে তাই ঠিক ধরে। সেই দরেই ঐ চিঠির উপরই শ্রীপ্যাটেলের হস্তাক্ষরে নানা অঙ্ক আছে।" কতকগুলো দরের নীচে দাঁড়ি টানা। কতকগুলো দর বৃত্তের মধ্যে। কতকগুলোর অন্য দরপের নানা চিহ্ন। "কাজেই মনে হচ্ছে পাবে চিঠিতে যেসব দরগুলিই বিবেচ্য।" এরপর শ্রীপ্যাটেলের সাক্ষ্য উদ্ধার করে তিনি বলেন যে চলতি বাজার দরই গৃহীত হবে।

●

এরপরী জেনারেল তারপর কার্যকরী সমিতির ও লণ্ডী সমিতির সভার বিবরণ দেন। তিনি বলেন লণ্ডী সমিতি ১০ই জুলাই তারিখের সভায় পেয়ার কেনার ব্যাপার তোলা হয়। সমিতি কতকগুলি বিষয় জানতে চান। ৩য়া আগষ্ট শ্রীমুন্দ্রা চিঠিতে তা জানান।

বিচারপতি চাগলা জুন মাসের নেপনের ১০ই জুলাইয়ের সভায় প্রথম পেশ করা হয়।

শ্রীশীতলবাব বলেন আগে কোন অনুসন্ধান না হওয়ায় এই তথ্যের কাছে অত্যন্ত অসুবিধা হচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেট আলোচনাকালে সিনেটে শালীনতা বর্জিত বাক্‌বিতণ্ডা

(সিনেট সভায় দর্পণের নিজস্ব পর্যবেক্ষক)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের গত ২৫শে জানুয়ারীর সভায় একটা নাটকীয় অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। এই নাটকের তিনটি অঙ্কে বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনটি ভিন্ন ভিন্ন চিত্র উদ্ঘাটিত হয়েছে তাছাড়া কয়েকটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র এই নাটকের তিন অঙ্কে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে বিখ্যাত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ডাঃ সুবোধ মিত্র, শ্রীযুক্ত সতীশ ঘোষ এবং স্বয়ং উপাচার্যও ছিলেন। সভার বাইরের দর্শক ছিলেন না, নতুবা তাঁদের পক্ষে যথেষ্ট চিত্তাকর্ষক হত: এই মহৎ ব্যক্তিরা এক সময় প্রায় হাতাহাতির উপক্রম ঘটিয়েছিলেন।

কিন্তু সবচেয়ে যে চমকপ্রদ বিষয় সেদিনের সভায় উদ্ঘাটিত হয়েছে তা হ'ল এই যে, গত পাঁচ ছয় বৎসর যাবৎ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে প্রাথমিক বাজেট যতবারে পেশ করা হয়েছে, তার কোনটাই আইনসম্মত হয়নি। প্রকৃতপক্ষে সিনেট সদস্য শ্রী এস এস ব্যানার্জি এই দিনের সভায় দেখান যে, প্রিলিমিনারী এ্যাম্বুয়েল একাউন্টস তৈরী করা সম্পর্কে যে নিয়মাবলী আছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে তা প্রতিপালিত হয় না।

১৯৫৭-৫৮ সালের বাজেট এই সভায় দ্বিতীয়বারপেশ করে, দ্বিতীয়-বার মঞ্জুর করা হয়েছে। এও একটা অত্যন্তগুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কিন্তু তা নিয়ে এই বাজেটের বিষয়ে কেন্দ্র কোন সোরগোল ওঠেনি। শ্রীযুক্ত সতীশ ঘোষ তাঁর অভ্যাসসিদ্ধ কায়দায় এই ব্যাপারটির 'গোপনীয় এড়িয়ে' দিয়েছিলেন। প্রথমেই তিনি মুক্তকণ্ঠে বক্তৃতা দোষ স্বীকার করে অনুপোলা করেন, তারপর তিনি স্বীকার করেন যে একটা যে আইনী' কাজকে আইনসিদ্ধকরার জন্যই তাঁদের এই বাজেট দুইবার পেশ করতে হয়েছে!

কিন্তু প্রতিবেদনের ২৫ পৃষ্ঠা ১৯৫৬-৫৭ সালের বার্ষিক হিসাব (Preliminary Annual Accounts for the year 1956-57) বিশ্লেষণ সভার পেশ করা হয়েছে। এ হিসাব প্রাথমিক হিসাব, চূড়ান্ত করা হিসাব নয়। এভাবে প্রাথমিক হিসাব পেশের প্রতিবাদ জানিয়ে অনেকে বক্তৃতা দেখান যে, অর্থের ব্যয়-বরাদ্দের বাঁধা নিয়মকানুন রয়েছে, অর্থ-বরাদ্দের সর্বশেষ সীমা রয়েছে, কি, না হচ্ছে তা অডিটর মহাশয়ের তাঁদের আছে। বিশ্ববিদ্যালয় আইনে সে অধিকারের পুর্ণ স্বীকৃতি আছে। কিন্তু হিসাবের যদি প্রয়োজনীয় অডিট না হয় তাহ'লে অর্থের সত্যব্যয় হ'চ্ছে, কি অপব্যবহার হ'চ্ছে সেটা জানা সম্ভব কি?

আলোচ্য বার্ষিক হিসাবের বেলাতেই শুধু নয়। গত ৫।৬ বছর ধ'রে প্রতি বছর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ক্রমাগত এইরূপ ভাবে প্রাথমিক হিসাব পেশ ও পাশ করে আসছেন। বিশ্ববিদ্যালয় আইনের সঙ্গে এর সঙ্গতি কোথায়? আসলে অডিট না করে বার্ষিক হিসাব অনুমোদনের কোন বিধান আইনে নেই। ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বেআইনী কাজ ব না করে এমন নয়; কিন্তু সেজন্যে এতগুলো বিচক্ষণ শিক্ষাব্রতীর চোখে ধুলো দিয়ে কিভাবে বহু বছরের পর বছর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এভাবে বেআইনী কাজ ক'রে চলেছেন তা ভেবে কিনারে কিনারে পাওয়া যায় না।

একজন হিসাব বিশেষজ্ঞ সেদিন চোখে আঙুল দিয়ে এ 'বেনামা' ধরিয়ে না দিলে হয়তো এরাবেও যথারীতি প্রাথমিক হিসাবই অনুমোদিত হ'ত। অবশ্য এবারেও যে প্রাথমিক হিসাব অনুমোদিত হয়নি এমন নয়, তবে তা হ'য়েছে অডিট সাপেক্ষে।

বর্তমানে ডি-ডি-সি'র অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ও ভূতপূর্ব একাউন্ট-জেনারেল শ্রীসুধাংশু মোহন ব্যানার্জী এই অসঙ্গতির কথা সিনেটের সভায় উত্থাপন করেন। তিনি আইনের বই থেকে উদ্ধৃতির দ্বারা এটা প্রমাণ ক'রে দেখান যে, আইনে এককভাবে প্রাথমিক বার্ষিক হিসাব পেশ করার কোন বিধান নেই।

কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক শ্রীঘোষ একটা অযথা দেওয়ার চেষ্টা করেন বটে। কিন্তু তাঁর অযাবে কিছুই পরিষ্কার হয় না; আর এখানে অযাবহীনই আছেই বা কি? শুধু তাঁর বারম্বার্টাকে তিনি আসল উত্তর এড়িয়ে যান। অধ্যাপক ঘোষ আত্মগত সমর্থনে বা বলেন তার মর্মার্থ এই দাঁড়ায়—বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে একটি অডিট পাশ-শাখা আছে। সেখানে সাত-আট জন কর্মচারী আছেন, চল্লিশ পঞ্চাশ প্রতিবেদনের সেখানে অডিটের কাজ হয়। তাঁর এই অযাব থেকে আসল প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় কি?

* * * *

দ্বিতীয় বিতর্কের পর্ব হয়, 'ইউ-নিভার্সিটি কলেজ অব বেডিসিন'-এর ব্যাপার নিয়ে। এবারে ডাক্তারে ডাক্তারে কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি, অন্যান্য কয়েকজনও (অডিকিপক্ষ) যে বাতে যোগ না দেন এমন নয়, এবং আমোদকর বেশ জমাজমা হ'য়ে ওঠে। কিন্তু যেহেতু পর্যায়ক্রমে আলোচনার ধারা যে ভাবে নেবে যায় তা সাধারণ পাঠিনজাবোধকে কতখানি খুন করেছে তার বিচারের ভার পেশকারীর উপর।

এখানে ব'লে রাখা দরকার যে, কর্মন সিন্ডিকেট সভায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ হ'লেও আসলে ছিলেন ডাঃ সুবোধ মিত্র। কারণ ইউনিভার্সিটি কলেজ অব বেডিসিন-এর জন্য ও এর প্রাথমিক কার্যনির্বাহনের দায়িত্ব ছিল তাঁর উপর।

ক্যাপ্টেন সি বি মুখার্জি, ইউনি-ভার্সিটি কলেজ অব বেডিসিন-এর জন্ম বর্ণাশ্রিতের হয় নি, এই অডিযোগ তোলেন এবং এই কলেজের জন্যে অর্থবরাদ্দের প্রতিবাদ জানিয়ে এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। কলেজ কাউন্সিলের পক্ষাতে শেরাম্বুশিলতা শিক্ষক নিয়োগ এবং আরও অনেককিছু অবডিপ্রেড ব্যাপার ব'লে চ'লেছে ব'লেও তিনি অভিযোগ করেন।

অনেক সদস্য—তা'হলে তো দেখছি ইউনিভার্সিটি কলেজ অব বেডিসিন একটা illegitimate child.

অপর একজন সদস্য—এর জন্ম স্বাভাবিকভাবে হয়নি,—সিজারিয়ান অপারেশনের ধারাই এ সন্তান ভূমিষ্ঠ হ'য়েছে।

এখানেই শেষ নয়, অপর একজন সদস্যের কণ্ঠে শেষে ওঠে ইংরেজি ছন্দে—Dr. Subodh Mitra is probably the fittest doctor to attend the birth of such a child. সভাকক্ষে একটা হাসি ছড়িয়ে পড়ে।

অবশ্য এরপর উপাচার্য শ্রীনির্মল কুমার সিদ্ধান্ত এবং ডাঃ সুবোধ মিত্র দুজনাই ওঠের অবাবদিহি করবার জন্যে। আত্মপক্ষ সমর্থনে তাঁরা যা বলেন, তার মধ্যে,—এ কলেজের জন্মকে নিয়মানুগ-পথে হয় নি, তার স্বীকৃতি পাওয়া যায়। একথাও অবশ্য তাঁরা ঘোষণা করেন যে, এবার কলেজ কাউন্সিল গঠিত হ'য়েছে এবং কাউন্সিলের উপরই এর কার্য পরিচালনের পূর্ণ দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া হবে। এবিষয়ে আলোচনার এইখানেই পরিসমাপ্তি ঘটে।

* * *

এর পর পৃথক বিষয়ে আলোচনা এসিয়ে চলে। শেষ পর্যায়ে বিচারপতি শ্রীবামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে পুরুষকার বেশ কিছুটা উত্তপ্ত বলায় কথা ব'লতে শোনা যায়। কারণটা হ'চ্ছে—সিরিয়াস বিষয়ের উপর তিনি যখন ভাষণ দিচ্ছেন তখন কেন উপাচার্য মহাশয় অনবোযোগী থাকবেন? কেন তিনি তাঁর সারগর্ভ প্রতিটি কথা মনের পাতায় নোট করে রাখবেন না?—অভিযোগ করেন রমা-প্রসাদবাবু। রমাপ্রসাদ বাবু দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করছিলেন, ব'লে পড়েন আবহাওয়ায় কিছুটা উত্তাপ সঞ্চার করে। অবশ্য উপাচার্য শ্রীনির্মলকুমার সিদ্ধান্তকে কিছুটা সাবধানবাণী ক'রতে হয়, ব'লতে হয়, 'আপনি বলুন, আপনি বলুন না, আমি সব শুনছি। একটা কথাও কেলিনি, আপনি যা বলছেন, প্রতিটি ওয়ার্ড আমি রিপোর্টেডিস্ব ক'রতে পারি।'

এরপর অবশ্য রমাপ্রসাদবাবু উঠে আসার বক্তৃতা দিতে শুরু করেন। তাঁর বক্তৃতার সারবর্ত ছিল এই যে, বার্ষিক হিসাব ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য প্রয়োজনে যে সব অনিয়ম ও ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে সেগুলো দূর করবার জন্যে তাঁদের একটা সেপাল কমিটি তৈরী করতে হবে। এবন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের তিনি অবতারণা ক'রেছেন, আর সেই সময়ে 'ডিল্টারব্যান্স'! রমাপ্রসাদবাবুর বক্তৃতার সময় উপাচার্য শ্রীনির্মলবাবু এবং রেজিষ্ট্রার ডাঃ চক্রবর্তী নীচু গলায় বোধ করি দুচারটে পুরোজনীয় কথা শেষে নিচ্ছিলেন।—কিন্তু তা মনায় নো সেই। রমাপ্রসাদবাবু চেপে ধরেন, উপাচার্য মহাশয়কে তাঁর দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন থাকতে বলেন। অবশ্যা উপাচার্য মহাশয়কে তাঁর দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন আছেন এবং রমাপ্রসাদবাবুর বক্তৃতা বিশেষ মনোযোগ দিয়েই শুনছেন।—রমাপ্রসাদবাবু এরপর উঠে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

রমাপ্রসাদবাবুর বক্তৃতার মাঝখানেই সভার একটা চাপা গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল। তিনি ব'সতেই সে গুঞ্জনের সুত্র ধ'রে উঠে দাঁড়ান শ্রীবেচারীলাল বাসু, অডিযোগের সুত্রপাত বলেন—রমাপ্রসাদ বাবু এতদিন পরে আর মঠার সিনেটের সভায় এসব একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা ক'রে সদনের কেন, বুঝছি না। তিনি তো একাডেমিক কাউন্সিলও সিন্ডিকেটেরও সভ্য। এর বহু আগেই কি তাঁর এই গুনবাণী সিন্ডিকেট এবং একাডেমিক কাউন্সিলে তোলা উচিত ছিল না?

এতটা রমাপ্রসাদবাবু হয়তো আশা করেননি। তাই বোধ করি আত্মসমর্থন করা তাঁর পক্ষে কঠিন হ'য়ে পড়ে। বেশ ঝাঁঝালো সুরে তাঁর কাছ থেকে উত্তর আসে,—আবার কি কর্তব্য, না-কর্তব্য সে সম্বন্ধে আমি কাউকে অবরিত আছি। সে আর আপনার কাছ থেকে শিখতে হবে না।

* * *

এরপর সাবান আলোচনাসেষে সভার পরিসমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। * * *

কিন্তু হঠাৎ এ কি ব্যাপার!। * * *

দুঃখ হয়ত বাবু ও রমাপ্রসাদবাবুর মধ্যে উত্তেজিতভাবে কথাকাটাকাটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দুই থেকে তাদের কথা কিছুবোঝা যায় না ঠিক, তবে এটা বোঝা যায় যে দুজনাই একটা Climax-এর দিকে চলেছেন। ও-কি, দুজনাই পরস্পরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন না? হাইতো...একজন যেন আরিল গোলাচ্ছেন; (নিজের কোনরকম বিপদ আশঙ্কা ক'রতে পারছিনাম না সেই মুহূর্তে, দুহাত দিয়ে বেশ ক'রে চোখ ব'ণ্ডিয়ে নিলাম)। না, ধাঁধা নয়, যা দেখছি ঠিকই দেখছি। দুজন আরও মনিষ্ট হবার আগেই তৃতীয় এক ব্যক্তি (জনৈক সিনেটর সদস্য) তাঁদের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েন। সেলেকারীটা এ যাত্রায় রক্ষা পায়।

তরুণ শিল্পীর প্রতিভা বিকাশে বেতার কেন্দ্রের দ্বার রুদ্ধপ্রায়

একদিকে ব্যয় সঙ্কোচ অভিযান অপরদিকে অর্থহীন প্রোগ্রামের দরুণ যথেচ্ছ ব্যয়

(দর্পণের বিশেষ প্রতিনিধি)

রেডিও কর্তৃপক্ষের একটি সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তের দরুণ প্রায় ৬০০ 'সি ক্লাস' শিল্পী বেতারের জীবিকা থেকে বঞ্চিত হতে চলেছেন।

একথা অনুমান করা হচ্ছে যে, ব্যয় সঙ্কোচের প্রচেষ্টা হিসাবে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কেননা প্রায় ৪ হাজার অডিশনার্থী, যাঁরা বেতার শিল্পীজগতে দাঁড়াবার জন্য তৈরী হচ্ছিলেন- তাঁদের ক্ষেত্রেও এই সঙ্কোচের সিদ্ধান্ত প্রযুক্ত হয়েছে। অর্থাৎ সঙ্গীত শিল্পীদের উৎসাহ দানে এবং তরুণ শিল্পী আবিষ্কার করার যে সত্তর কেন্দ্রকারের আমলে জল ইত্যিয়া রেডিও ঘোষণা করেছিলেন, ইতিমধ্যেই কলকাতা কেন্দ্রে তার পরিসমাপ্তি লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

যদি ব্যয় সঙ্কোচের প্রচেষ্টা হিসাবেই এই শিল্পী-ছাঁটাইকে সিদ্ধান্তকে দেখানো হয় তাহলেও এই সিদ্ধান্তকে যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত বলে গ্রহণ করা কঠিন। কারণ, একদিকে এই কুচ্ছতা যখন তরুণ শিল্প প্রতিভার টুঁটি টিপে ধরছে, অন্যদিকে ঠিক সে সময়েই অনাবীন শ্রোতাবর্গের ব্যবসা ক'রে রেডিও মহলে অভিবাদ্যের দৃষ্টান্ত দিচ্ছে। রেডিও শ্রোতাবর্গলি পুরুষানুপুরুষভাবে নজর করলে একথা মনে হওয়া অস্বাভাবিক যে, এই ব্যয় সঙ্কোচের জন্য কোনো সৃষ্টিকিও এই সর্বাঙ্গীন পরিবর্তনা করা হয়নি।

'বিদ্যার্থী মহল' দীর্ঘক শ্রোতাগ্রাহী বেতার কোথাই পুরুষ বেলা—সময় ২।৩টি থেকে ৩টে। এটা পরিচারিত হয় স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের জন্য, এবং তাঁদের একটা বিশেষভাবে নতুন পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়ার জন্যই শ্রোতাগ্রাহীর উদ্দেশ্য। কিন্তু বেতার কর্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই জানেন যে আমাদের দেশের বেশীর ভাগ বিদ্যালয়েই 'রেডিও সেট' নেই। যদিও বা কোন কোন স্কুলে থেকে থাকে, সেখানেও ঐ নির্ধারিত সময়ে 'বিদ্যার্থী বহুমহল' পরিবেদন পোনবার জন্য ছুলকর্তৃপক্ষ ছাত্রছাত্রীদের স্কুল ছুটি বহুক্ষ করে থাকেন না। আর যদি বাড়ীর কথা বলা যায়, তবে সেখানেও দেখা যায় অন্তর পরিচারের সময় থেকে আরম্ভ করে স্কুল ফাইনাল স্কুল পর্যন্ত কোন বয়সের ছাত্রছাত্রীরাই সে সময় বাড়ীতে থাকেনা এই শিক্ষামূলক পরিবেদন শোনবার জন্য।

শুধু যেখা যাচ্ছে যে দিনের পর দিন এই ধরণের পুরোজনহীন প্রোগ্রাম চালিয়ে যাওয়া হয় বিনা দ্বিধায়ে। কিন্তু কেন?

এবার আসা যাক 'কথিকাগুচ্ছ' আসরে। এটার সময় নির্ধারিত বিকেল ৫।। টায়। ছোটদের নানাজাতীয় বক্তার ও শিক্ষা-মূলক গল্প শোনাবই এ আসরের উদ্দেশ্য। কিন্তু ভুল প্রত্যাশও ছোটদের কাছে বিকেল বেলায় যবে যবে পেশার থেকে বাইরের মাঠের ঘোনা অনেক বেশী লোভনীয় আর আকর্ষণীয়। সময় দিনের কুাজ, ঘরটাসা বন্ধ ছুটি পেতে চায় বাইরের ফাঁকে। তারা তাদের শিশু প্রাণের গতি আবার ফিরে পায় পার্কে, মাঠে, নানা জাতীয় ক্রীড়া কৌতুকের মধ্যে। বিকেল ৫।।টায় এ আসরের সার্থকতা কোথায়?

এবার আসা যাক বিচিত্র শ্রোতাগ্রহের পাতায়। রোজই খানিকটা করে সময় দেওয়া হয় উড়িয়া ভাষায় প্রোগ্রামে। কোলকাতার উড়িষ্যাবাসী ডাইরেক্টরদের অভাব এ ব্যবস্থা। এছাড়া সপ্তাহে কয়েক দিন প্রোগ্রাম থাকে তামিল তাপ্তাডাউী ডাইরেক্টরদের জন্য। দিল্লী থেকে বীনে মাঝেও কলকাতা রেডিও বোল বেশ কিছুটা সময় নেন নিজী প্রোগ্রামের জন্য। বাংলা খুবই ভাল, কিন্তু কোলকাতার বাইরে, মাদ্রাজ, বোম্বে, কটক কোণাওকিং রেডিওতে এরূপ বিদেশ শ্রোতাবর্গের ব্যবস্থা আছে আমাদের বাঙালী ডাইরেক্টরদের জন্য? রেডিও কর্তৃপক্ষ হয়তো বলবেন-'তাহারা অবশ্য বলিয়া আমরা চেষ্টাকে কষ্টাক ক'রেবন। কিন্তু বক্তব্য এই যে যদি ব্যয় সঙ্কোচই তাঁদের বক্তব্যের মূল উদ্দেশ্যের উদ্দেশ্য হ'য়ে থাকে তবে বেতার কেন্দ্র এ শ্রেণীর অহেতুক শ্রোতাগুলির পরিবেদন বন্ধ করে না কেন?

এ জাতীয় প্রোগ্রাম বন্ধ হলে এই বিশেষ শ্রেণীর শ্রোতারা কিছুই বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হ'বেন। কারণ বিশেষ স্থানের শ্রোতারা তাঁদের নিজেদের দেশে ইচ্ছানুরূপ বিচার বরেই তাঁদের আকাঙ্ক্ষা ও পুরোধন মেটাতে পারেন।

তবে কর্তৃপক্ষ যদি এতে নারাজ থাকেন তা হ'লে নজর রাখবার আরও বিষয় আছে।

আমাদের কোলকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে পাশ্চাত্য সঙ্গীত ও অর্কেষ্ট্রা রোজই পরিবেশিত হয়। এ প্রোগ্রাম বন্ধ করবার কথা বলা হচ্ছে, তবে বক্তব্য আমাদের পারিপ্রমিকের অঙ্কটার বলো। ভারতীয় সঙ্গীত শিল্পীদের তুলনায় এ শ্রেণীর শিল্পীরা অনেক বেশী টাকা পেয়ে থাকেন রেডিও থেকে, তাঁদের পারিশ্রমিক হিসেবে। কিন্তু এ বৈষম্য কেন? এ প্রশ্ন বেতার কর্তৃপক্ষের মনে কি কখনও অনেক টাকা বাঁচাতে পারেন তাদের হিসেবের পেষে।»

কেবলমাত্র সঙ্গীতেই নয়; এ ধরণের বৈষম্য দেখা যায় বহুস্তাতেও। ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা অবশ্যে বেশী টাকা পেয়ে থাকেন বাঙ্গলা ভাষায় বক্তাদের তুলনায়।

কোন কোন শিল্পীর অভিযোগ যে, কোন বিশেষ সঙ্গীত বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের বিভুবায়েই কষ্ট পেতে হয় না বেতিওতে শ্রোতারূপে পেতে। আর শ্রোতার পেতে অভ্যস্থিরা হয়না তাঁদেরই যাঁরা শ্রোতার এক্সিকিউটিভদের সাথে বিশেষ ঘনিষ্ট বা একই শ্রেণীর।

'অডিযন্ত্র বোর্ড' বলে একটি বস্তু আছে। কিন্তু এটা একটা প্রহসন। সত্যিকারের শিল্পী নির্ধারনের জন্যেই কি নেওয়া হয়ে থাকে এখানে? কর্তৃপক্ষের মতে অবশ্য- মুর্তীতি নিবারনের যা কিছুবায়না, তা পুরো-পুরী ভাবেই নেওয়া হয়ে থাকে এখানে। বর্ষা—অডিযন্ত্র পার্থীদের পর্যায় আছালেই থাকেন তাঁদের দূর যা কণ্ঠ পরীক্ষার সময়ে; আড়াল থেকেই তাঁদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয় পৌর্ভ বেষ্ণবদের মতো। তাঁদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয় স্বীকারনের ফলে রেডিও কর্তৃপক্ষের নেওয়া এক একটি বিশেষ সংখ্যা মাত্র। তবে এটাও জানিয়ে দেওয়ার তাঁর কিছু একজন প্রোগ্রাম এসিসেটেন্টের উপরে।

সমালোচকেরা বলেন যে এ পরিচয় কিছু গোপন থাকেনা। এর আংশিক সত্যতার প্রমাণ পাই আমরা যখন দেখি যে কলকাতার বাইরে থেকে অনেক উচুদরের শিল্পীরাও কিরে তাদের বার্ষিক ছুটিতে কলকাতায় এসে বেতারে যখন অডিশানে অকৃতকার্য হয়ে।

রেডিও কর্তৃপক্ষ ওদের যেখান যে স্টুডিও ক্যাপাসিটি দিন যখন পুরোপুরি যা দিল এখনও তাই আছে। কিন্তু বর্ধমান কলকাতা শিল্পীদের সংখ্যা দিনের পর দিন বেড়েই চ'লেছে। তাই শিল্পীদের যে অভাব নির্ধারিতের সুযোগ দেওয়া হয়না পুরোপুরীভাবে।

তবু স্টুডিওর ব্যাপার কিছু সুরাহা করা যেতে পারে অতি সহজেই। বছরের বেশীর ভাগটাই শান্তিনিকেতনের স্টুডিওটি পরে থাকে অবেলো। সময়ায় নিবাদীদের কথা ভেবে একটু দরদী মন নিয়ে কর্তৃপক্ষ কি পারেন না শান্তি-নিকেতনের স্টুডিওটির পুরোপুরী ব্যবহার করতে?

সম্পাদক—শ্রীরবেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য

সম্পাদক—কর্তৃক কালিকা প্রেস (প্রাইভেট) লিমিটেড, ১নং ওয়েলিংটন স্কোয়ার কলিকাতা—১৩ হইতে মুদ্রিত এবং ৭নং চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা—১৩, দর্পণ কার্যালয় হইতে প্রকাশিত।

পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিসভায় অন্তর্বিরোধের সুস্পষ্ট লক্ষণ

সাপ্তাহিক সংবাদ সাময়িকী :: কলিকাতা—১৪ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার ১৯৫৮ :: মূল্য ২৫ নঃ পঃ

পারস্পরিক অবিশ্বাস ও সন্দেহের ফলে মন্ত্রিমণ্ডলী দ্বিধাবিভক্ত

(দর্পণের রাজনৈতিক সংবাদদাতা)

পশ্চিম বঙ্গের মন্ত্রি সভার কার্যকাল যদিও মাত্র এক বৎসর পূর্ণ হয়েছে, তথাপি ওয়াকেবহাল মহল একথা জানেন যে, ইতিমধ্যেই এর ভিতরে অন্তর্দ্বন্দ্ব গভীর এবং তীব্র হয়ে উঠেছে।

● গত নভেম্বর মাস থেকে এই অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রথম লক্ষণগুলি পরিস্ফুট হতে থাকে। ডিসেম্বর মাসে ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের "সুখী পরিবার রূপে কথিত" মন্ত্রিসভার বৈঠকেই যন্ন কয়েকবার বাদানুবাদ ও তর্কবিতর্ক দেখা যায়। এবং নভেম্বরের মধ্যভাগে অনেক মন্ত্রী পদত্যাগের জন্য প্রায় প্রস্তুত হন—এই ঘটনাগুলি জনচক্ষুর অন্তরালে থাকলেও উর্দ্ধতন অফিসার এবং সেক্রেটারীদের মহলে অজ্ঞাত নয়।

● মন্ত্রিসভার ভিতরে নভেম্বর মাসে যে সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছিল, গত তিনমাসে তার অনেকখানি প্রশমিত হয়েছে বটে এবং এখন পর্যন্ত কোনো ভাঙ্গন দেখা দেয়নি, একথাও সত্য। কিন্তু রাইটার্স বিল্ডিংসের তথ্যাভিজ্ঞ মহল একথা জানেন যে, মন্ত্রিসভার ভিতরে অন্তর্দ্বন্দ্বের রেষাই এই কয় মাসে গতীরতর হয়েছে—পারস্পরিক সন্দেহ, মানসিক দূরত্ব এবং অবিশ্বাস মন্ত্রিমণ্ডলীকে দুইটি সুস্পষ্ট গোষ্ঠীতে ভাগ করে দিয়েছে।

ওয়াকেবহাল মহল একথা জানেন যে, অন্ততঃ এখন মন্ত্রী এবং দুই একজন রাষ্ট্রমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী স্বাধীনতার মূল কেন্দ্র থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছেন। গোপন এবং গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায়, বিশেষতঃ যে সমস্ত আলোচনার কংগ্রেসের দক্ষীয় স্বার্থের কারক পরিপন্থী প্রতিত, সেগুলিতে এই "অন্যায় ভাবন স্কীমের" স্থান দেওয়া হয়না।

প্রকৃতপক্ষে খুবর মন্ত্রিসভার ভিতরে এখন আর একটি নেপথ্য মন্ত্রণা সভা গড়ে উঠেছে এবং সেই মন্ত্রণাসভার আলোচনা ও গোপন সলা পরামর্শের সংবাদ যার মাঝি ৯ জন মন্ত্রীর কর্ণকুহরে প্রবেশ।

নভেম্বর মাসে এই গোলযোগের প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল একটি বখড়া আইন।

বিচার বিভাগীয় মন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় এই আইনটির খসড়া রচনা ক'রে মন্ত্রিসভার নিকট পেশ করতে চাইছিলেন এবং আইনটির প্রয়োজনীয়তা ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা ক'রে তিনি মুখ্যমন্ত্রী এবং অন্যান্য মন্ত্রীদের কাছে একটি স্মারকলিপি পেশ করেছিলেন।

স্মারকলিপি পেশ করেছেন।

ডাঃ রায় এই স্মারক লিপিটি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজিত হয়ে ওঠেন এবং রাইটার্স বিল্ডিংসে কয়েক দিন অত্যন্ত সংঘর্ষমুখর একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়। আইনটির উদ্দেশ্য ছিল—দুর্নীতি দমন করা। প্রাশাসনিক দুর্নীতি, খাদ্য, ও ঔষধে ভেজাল এবং নীচের তলার কর্মচারীদের বেআইনী অর্থোপার্জন, কিভাবে কমানো যায় সিদ্ধার্থ রায়ের স্মারকলিপিতে তার কতকগুলি উপায় নির্দ্দেশ করা হয়েছিল। তাছাড়া, আইনের খসড়াটির মধ্যে ছিল এই দুর্নীতিগুলির শাস্তি বিধানের জন্য সঠোর কতকগুলি ধারা, যে ধারাগুলির বিরুদ্ধে আপীল করা যাবে তাঁরা জানান যে, নেপথ্য মন্ত্রণার আলোচনায় একথা প্রায় সুস্পষ্ট হয়েছিল যে, এঁরা অভিযানের বিরোধিতা ও সমর্থনের পক্ষে এই আইনটি গুরুত্ব করতে নারাজ হন।

নেপথ্য মন্ত্রণাসভার গুরু পরামর্শ

খসড়াটি পেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই যন যন দুই তিন দিন ডাঃ রায়ের গৃহে নেপথ্য মন্ত্রণার বৈঠক বসে এবং ঐ বৈঠকের পূর্ব কংগ্রেস উচ্চপদস্থ অফিসারের সঙ্গে নেপথ্য মন্ত্রণাসভার সদস্যের যে সলা পরামর্শ রাইটার্স বিল্ডিংসে হয়েছিল, ওয়াকেবহাল মহল সেকথাও জানেন। তাঁরা মন্ত্রীদের গুরু

(২য় পৃষ্ঠার তৃতীয় কলামে)

সম্পাদকীয় :

মর্যাদার যুদ্ধ ?

এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন আছে যে, পাবলিক সার্ভিস কমিশন সম্পর্কে পশ্চিম বঙ্গ গভর্ণমেণ্টের এত উৎসাহের কারণ কোথায় ? সাত ৪ বৎসর সার্ভিস কমিশনের যে সমস্ত রিপোর্ট বিধান সভায় পেশ করা হয়েছে তার মধ্যে তো এই উৎসাহের কোনো সাক্ষ্য নাই। সেখানে গণতন্ত্রের সকল প্রকার ন্যায়নীতি বিসর্জন দিয়ে, কমিশনের সভ্য মর্যাদা ধূলায় মিশিয়ে করে, পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তাঁর উদ্দেশ্য সফল দিয় করেছেন। যখন ও আজীয়দের সরকারী চাকরীতে ভর্তি করার সময় পাবলিক সার্ভিস কমিশনের ওপাদিকে কেউ পাত্তাও করেনি। এবং তাঁ ডি এর সেন ফার প্রেসিডেন্সী কলেজ ও সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক নিয়োগের সময় কমিশনের নির্দেশ ভেতাবে সকলকে করেছিলেন, সেই কেলেঙ্কারী করার অবকাশ নাই।

১৯৫৩ সালে সার্ভিস কমিশনের রিপোর্টে অস্ট্রীতিকর বক্তব্য ছিল বলে ডাঃ রায় তৎকালীন সার্ভিস কমিশনটি ভেঙ্গে দিয়ে নূতন কমিশন গঠন করেছিলেন এবং পূর্ববর্তীদের অস্ট্রীতিকর রিপোর্টটি "গুপ্ত" করেদেনা হয়েছিল—এই তথ্য কিন্তুবই তাঁ রাখকে সরকার করিয়ে দেওয়ার দেই। তখনকার সার্ভিস কমিশন সদস্যই কমিশন এখন গভর্ণমেণ্টের প্রধান সচিব। তাঁদের কাছে একথাও কেউ জানতে চাইবেন না যে, আবগারীও রাষ্ট্রমন্ত্রী বিভিন্নতে ডাঃ রায়ের প্রিয়ভাজন "শ্যেশান অফিসারদের" মধ্যে কতজন সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা না দিয়ে এসেছেন ? এবং মুখ্য সচি "ব্রিলিয়ান্ট" পোর্ট তাঁ ডি এসকের কোন্ কমিশনের দ্বারা নির্বাচিত হয়ে।

আসলে সার্ভিস কমিশনের মর্যাদাও নয়, শিক্ষার মান উন্নয়নও নয়—ওয়াকেবহাল মহল জানেন যে, গভর্ণমেণ্টের একটা রাস্তা এবং বুদ্ধিনীর সিদ্ধান্তকে বহাল রাখার জন্য এখন শিক্ষকদের সঙ্গে মর্যাদার লড়াই চালানো হচ্ছে। বহিরাগত যখন এই প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল, তখন সমস্ত যুক্তি তর্কের পর অধিকাংশ সভ্য এই রায় দিয়েছেন : "এখন সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা হলে গভর্ণমেণ্টের মর্যাদা নষ্ট হবে।" প্রকৃতই যদি গভর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্ত যুক্তি সঙ্গত হত এবং গভর্ণমেণ্টে নিজেও যদি নিরিহদে বিশ্বিচ্ছ হতেন, তাহলে এই লড়াইর একটা অর্থ ছিল। কিন্তু একজন মন্ত্রীর পদত্যাগের হুমকি এবং তাঁর সেক্রেটারীর নির্মর্ম অত্যাচার বীভৎসতা দেখে সাধারণ লোকের মনে এই সাংঘাতিক লড়াইয়ের অবতীর্ণ হবে !

নির্দ্দিষ্ট বয় শিক্ষক সমিতি কংগ্রেসী শিক্ষকদের দ্বারা পরিচালিত হল এবং তাঁদের দাবী স্বীকার করা হলে কংগ্রেস বিরোধীদের একটি সংগঠনকে শক্তিশালী করা হবে। তাদের এই দাবীর যাচাইয়ের চিন্তা গভর্ণমেণ্টের মর্যাদার প্রশ্নটাকে নাড়িয়েছে। কিন্তু এই দুই "ছেড়ে ইন্ডিনেন্স" চিন্তিয়ে শিক্ষকদের মধ্যেই দুই দলের মধ্যে হচ্ছা ঢাঁচির ছিল। প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেসীপন্থী শিক্ষকেরা বাঙ্গালাদেশের অধিকাংশ শিক্ষকের নিকটেদের দলে টানতে পারেননি। হওয়ার জন্য এরা মনে মনে বাসনা যাঁর আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল। অতীত ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে একথা বলা যায় যে জেনারেল বীর্ডী, গভুর্ণর এবং সেনাবাহিনীর অধিনায়কের মধ্যে পারস্পরিক স্বার্থের খাতিরে যদি একটা চুক্তি হয় তবে খুব আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। অবশ্য, এই বয়সের একটা অনুমান বে পুরোপাকিস্থানে বহনাবে চালু আছে এ কথা অস্বীকার করা যায় না।

জঙ্গীশাসন কি আসন্ন ?

এই প্রসঙ্গে অনেকেরই মনে হয় যে, সম্প্রতি সেনাবাহিনী পূর্বপাকিস্থানে যে "অপারেশন ফ্লাড চেক" "যুদ্ধ" করেছে তার অন্যতম উদ্দেশ্য হল সেনাবাহিনীকে পূর্ব পাকিস্থানীদের কাছে প্রথম বারের মত পরিচিত করে দেওয়া।

সেনাবাহিনী বীরাবে যে সমস্ত ঘোরাকারবারের খবর পাওয়া যাচ্ছে, তাতে দেখা যায় যে, আবহাওয়া বেশ গুরুত বীর্ডার অনুকূল হয়ে উঠছে। জনসাধারণ জরুণ: রাজনৈতিক নেতৃত্বের কার্যকলাপে বিরক্ত হয়ে পড়ছেন, আর অপর দিকে প্রধান সেনাপতি আইয়ুব খাঁও বীরে বীর উপদ্রবিত করতে করতে পারছেন রাজনৈতিক নেতৃত্বের দলাদলির ফলে হয়ে-বাইরে পাকিস্থানের অবস্থা কি পরিমান তিত্তিপ্ত হচ্ছে।

যথাবীতি, অন্তত নির্ব্বাচনের পূর্বে, পশ্চিম পাকিস্থানের এক ইউনিট প্রথা ভেঙ্গে দেবার জন্য আন্দুল গফুর খাঁর নেতৃত্বে নীমায় প্রদেশবাসীরা যে গুপ্ত আন্দোলন সুরু করেছে, তার জন্যও সেনাবাহিনীর নাসেবের মত একটা এক-নায়কত্ব প্রতিষ্ঠার দিকে যেন বেশী ঝোঁক দেখা যাচ্ছে। কারণ হিসেবে বলা হয় যে, পাকিস্থানের সেনাবাহিনীর উর্দ্ধতন অফিসার বৃন্দের অধিকাংশই সীমান্তবিবাসী যে লড়াই কংগ্রেসের নড়বার কথা ছিল এবং যে লড়াইয়ে কংগ্রেসী শিক্ষকদের সংগঠন পরাজিত হবেছে, এখন গভর্ণমেণ্ট নিজে সেই লড়াইয়ে বিচ্ছিন্নভাবে অবতীর্ণ হলেছেন। অথাৎ কংগ্রেসের দুর্বলতা সরকারী শক্তির দ্বারা চাকরার চেষ্টা একটা নির্লজ্জ চেষ্টা হবেছে। এবং বায় হবেছে সাধ এই অপ্রয়োগে তাঁর প্রাক্তবর্ণাল চরিত্রটি প্রকটিত। পরাজিতের এই অন্যায় দুঃখের সঙ্গে বাংছের শক্তি ও মর্যাদাকে যুক্ত করা হবেছে। বাঙ্গালা দেশের ছাত্র ও অভিভাবকদের কি কোনো স্বার্থ বা সম্মানবোধ নেই ? তাঁদের সর্বনাশের ব্যবাই কি কংগ্রেসের প্রতিনিধি সরকার তাঁর জন্য চ্যাম্প ভোগাতে হবে ?

এবারের সংখ্যায় পাবেন

● হিং টিং ছট (পৃষ্ঠা ৩)
● মধ্যপ্রাচ্যে লক্ষ্য (,, ৪)
● কৃষ্ণমাচারীর ভাগ্য বিপর্যয় (,, ৪)
ভিতরে নামের
● স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস (,, ৭)
● ভারতে জন সংখ্যানীতি ভ্রান্তজনীয়তা (,, ৬)
● উর্দ্ধ জেলাগুলিতে যোগাক নাই (,, ৭)
● গগনেন্দ্রনাথের চিত্র প্রদর্শনী (পৃষ্ঠা ৮)
● মিউজিয়ামে রবীন্দ্রনাথ (,, ৮)
● ভাষা সম্মেলন (,, ৯)

দিল্লীর দরবারে বঙ্গ সরকারের শুষ্ক মুখ
শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্র-মেধ যজ্ঞ ?
● নিদারুণ খাদ্যসঙ্কটের মুখে বায়ুলার গ্রাম ●

পাকিস্থানের জঙ্গী শাসন কি আসন্ন ?

(১ম পৃষ্ঠার শেষাংশ)

হেচড়াহাতাহতি যদি পরস্পরের কণ্ঠরোধ না করে, তবে নূন সাহেবের কেন্দ্রীয় সরকার এবং যে কোনো একটি বা উভয় প্রাদেশিক সরকারের মধ্যেই অল্প-বিস্তর সম্ভাব্য বিচ্ছিন্নতা বিচিত্র নয়। গত দুই সপ্তাহের পশ্চিম পাকিস্থানের সংবাদে রিপাবলিকান পার্টির অর্ন্তদ্বন্দ্ব এবং ঐ পার্টি এবং জাতীয় পরিষদে তাদের সবর্ণ করে বিশেষ করে জাতীয় আওয়ামি পার্টির মধ্যে যে দ্বন্দ্ব ঘনীভূত আকার ধারণ করেছে। রিপাবলিকান পার্টির প্রাদেশিক সভাতেও হয়েছিল নির্লজ্জ কলহীয় প্রদর্শন। পার্টির একটা দুবহ অংশই সবদ্বন্দ্ব দেশে না হলেও অন্তত পশ্চিম পাকিস্থানে পৃথক নির্বাচনের পক্ষপাতী হয়ে পড়েছে।

পাঞ্জাবী বনাম অপাঞ্জাবী

পশ্চিম পাকিস্থানে নির্বাচনের পূর্বেই এক ইউনিট রদ করার দাবী আলোচনের পরেই স্থান পেয়েছে নির্বাচন ইস্তাহার এই নিয়ে। এই প্রশ্নে রিপাবলিকান পার্টির পাঞ্জাবী সভ্য এবং অন্য প্রদেশী সভ্যদের মধ্যে তীব্র মতভেদ বিদ্যমান। আশ্চর্য যাহোক অধিকাংশ পশ্চিম পাকিস্থানের মুখ্যমন্ত্রী সর্বার জনীদের প্রাধান্যের সম্ভাবনার কথা এর মধ্যেই শোনা যাচ্ছে। এই প্রসঙ্গেই উল্লেখ করা যেতে পারে যে, প্রায় তিন জনের পূর্বে জরুরী ইউনিট ব্যবস্থার ব্যাপক পাকিস্থানের উপর অর্তভুক্ত করার যে অর্ডিনেন্স "পাঞ্জাবী" পরিকল্পনা রচিত হয়েছিল। নাই, সর্বাধ্যক্ষ তাঁকে অভিনন্দনের কথা লেখে যেন। অবশ্যই বাস্তবিক ঐক্যের সন্ধান করিতে লেজুড় যেতে বাধা নেই তো, সংখ্যা-সাম্য ভুলিয়ে পূর্বপাকিস্থানের তীব্র অসন্তুষ্টি এবং বাহ্যতার প্রত্যাক্ষণের বিপ্লব হয়ে ওঠা অসম্ভব, চৌধুরী মহম্মদ আলী এবং মওলানা ভাসানী 'প্রমুখ পশ্চিম পাকিস্থানী নীগ রাজনীতিকগণ দুই ইউনিট গঠনের দ্বারা পূর্বপাকিস্থানকে সংখ্যা-সাম্যের নীতি গ্রহণে রাজী করাবার যেরূপ উদ্যোগী এক ইউনিট বিলোপের তেমনি করেন। এই ইউনিটের দ্বারা পাঁচ প্রদেশ অধিকার অক্ষুণ্ণ থাকে, প্রত্যেকটি প্রদেশের জন্য আলাদা আলাদা পরিষদ-গঠিত হয় এবং তার বর্ণনা দিয়ে তাদের কাছে তিন দিনু সময় পাঠানো হয়। এইভাবে ফেডারেশন, এবং সীমান্ত প্রদেশের কাছে এক রকমের পরিকল্পনা, এবং পাঞ্জাবকে পরিশেষে দেয়া হয় "মাঝারি পাঞ্জাব"। পাঞ্জাবের নিজস্ব প্রস্তাবিত পরিকল্পনা ছিল খুবই অগ্রগতিপূর্ণ। কারণ এতে ব্যাহত পাঞ্জাবকে যে সমস্ত স্বার্থ ত্যাগ করতে, আরাম জানানো হয়েছিল, পাঞ্জাবের পক্ষ থেকে তার তীব্র বিরোধিতা হবে এ-ই ছিল সকলের আশা। এতে খোলাখুলি এ-কথাই বলা হয়েছিল যে, পূর্ব পাকিস্থানের সংখ্যাবিভিত্তিকে নিয়মকর্ম করার এই পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য। পাকিস্থান থেকে পূর্বপাকিস্থানের সরে যাওয়া অবস্থাটিও এই ধারণা থেকেই পরিকল্পনার সূত্রপাত। অতএব দেশের নেতৃত্ব গ্রহণের উপযুক্ত হওয়ার জন্য পাঞ্জাবকে অবশ্য অর্ধনীতিকভাবে অগ্রগতির হতে হবে। কাজেই প্রস্তাবিত এক ইউনিটে সমস্ত ভোজনীয় পদগুলি সংখ্যামন্ত্র প্রদেশগুলোকে অন্তত কুড়ি বছরের জন্য ছেড়ে দিতে হবে। আর এই প্রস্তাবে বাঁদের বিরোধিতা নিশ্চিত যেমন সিন্ধুর পীর আলুল সত্তার এবং সীমান্তের কেউ কেউ—তাদের জন্য ছেলে পান সন্তুলনের কথা এই পরিকল্পনায় ছিল। প্রীন ভাষার কথা হয়েছিল। পরিকল্পনায় এই পর্যায়টির নাম দেওয়া হয়েছিল "ছেক পরিকল্পনা"।

গোপন দলিল

কায়ুম খাঁকে সরিয়ে নীরবেরে মুখ্য সর্বার জনীদ মন্ত্রী এবং ঐ এলাকার এক ইউনিট পরিকল্পনার লোকনায়ক হিসেবে বেনোনীত হয়েছিলেন। কিন্তু এই পরিকল্পনার দুর্ভাগ্যবশতঃ গোপন পরিকল্পনাটি ভুল করে গিয়ে পড়ল তাঁর হাতে। তাঁর চোখ খুলতে দেরী হল না। কিন্তু পরিকল্পনার উপযোগে তিনি এতদূর এগিয়ে গিয়েছিলেন যে তা থেকে পিছিয়ে আসা তার পক্ষে তখন আর সম্ভবপর ছিল না। (ব্যক্তিগত স্বার্থ যে বিবেকের কণ্ঠরোধ করেনি, তাই বা কে বলবে?)। কিন্তু গণপরিষদে একটা চাঞ্চল্যকর উদ্ঘাটন করা ছাড়া তার যাদু আর বিশেষ কিছু সম্ভব হল না। তবে এই উদ্ঘাটনেই দেশে ঠৈ ঠৈ পড়ে গেল। শেষ পর্যন্ত চেয়ারম্যান ওয়াহাব খাঁ বিরোধী দলের নেতা সুরাবর্দী এবং চৌধুরী মহম্মদ আলীকে নিয়ে গঠিত একটি তদন্ত কমিটি নও প্রকাশ করলেন যে, উক্ত দলিলের অংশে গণ-পরিষদে পাঠ করা চলবেও বাইরে তা ছাপানো যাবে না।

●

সর্বার আলুল রশীদের ব্যাপারেই আবার ফিরে আসা যাক। শোনা যাচ্ছে যে আলুল গফুর খাঁর অনুরোধের এক ইউনিট বিরোধী আন্দোলনে তাঁর সাহায্যের পরিপ্রেক্ষিতে সর্বার রশীদকে সরিয়ে নাকি নবাব মুজফর আলী কিজিলবাশকে তাঁর পদীতে বসানো হবে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে এসম্বন্ধে কিজিলবাশের মতামত জানতে চাওয়ার তিনি যে তাঁর কোন প্রতিবাদ করেন নি তাই নয়, ইসানাং মুসীর নীগের ওয়ার্কিং কমীটার মনোজ সৌলতানার সঙ্গে তাঁকে খুব বেশী সময়ের সময়ের করতেও দেখা যাচ্ছে।

গফুর খাঁর আহ্বান

গফুর খাঁর নেতৃত্বে নীবাবের জাতীয় আওয়ামি পার্টি প্রত্যক্ষ সংগ্রামের প্রস্তুতি নিয়েছে বলে খবর শোনা যাচ্ছে। এই সংগ্রাম কি রূপ নেবে তা জানা না গেলেও এ-কথা সত্য যে পশ্চিম পাকিস্থান বিধান সভাতেও প্রায় সকলখ্যের রিপাবলিকান এবং নীগ দলের বাহে জাতীয় আওয়ামী দল শক্তিসাম্য রক্ষা করছে। অবশ্য অবিচিত্র থাকার জন্য রিপাবলিকানরা হয়ত গফুর খাঁর দাবী মেনে নিতে বাধ্য হতে পারে কিন্তু তার বাহে তাদের নিজেদের দলেও ভাঙন দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা বিদ্যমান। এই রকম ঘটনা যদি সত্যই ঘটে তাহলে তার প্রতিক্রিয়া যে শুধু প্রাদেশিক সরকার গুলোর উপর পড়বে তাই নয়, কেন্দ্রীয় সরকারও তা থেকে রেহাই পাবেন। পাঠক বর্তমান যদি এই সেখার প্রশ্ন অনুচ্ছেদে বর্ণিত উপসেপ্ত গ্রাহ্য করে থাকেন, তাহলে তিনি সাহজানে হবেন বলেই আমার বিশ্বাস।

তালালীর ভূমিকা

খুব স্পষ্ট না হলেও, প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যে অপুর্ণা আবর্ত পূর্ব পাকিস্থানের রাজনীতিতেও বর্তমান, সে কথা অস্বীকার করা যায় না। মৌলানা তালালীর কাছে নুরীম মৌতোরা পরবর্তী কোন বিবর পাওয়া না গেলেও একথা নিশ্চিতভাবে জানা গেছে যে মৌতো-কারিবীতে কোন ভুল নেই। এবং আরও জানা গেছে যে নামুদ আলীর নেতৃত্বাধীন জাতীয় আওয়ামী দলের অপোট নুরীম লীগের সঙ্গে হাত মিলানোতেও কোন অস্থবিধা দেখেন না। অবশ্য লীগের সঙ্গে কাজ-কারবার করার এই আপাত আগ্রহের পশ্চাতে এই সহযোগিতাকে সম্পূর্ণ সাময়িক বিপর্যয়ে রাখার একটা ইচ্ছাও দ্যমান। আওয়ামী লীগের আশা হারিয়ে যেলি আওয়ামু খাঁরের সরকারের পতন হয়ে সেদিনই হবতো লীগের সঙ্গে জাতীয় আওয়ামী দলের সহযোগিতার অবসান ঘটবে কারণ এ-ই হচ্ছে এ-কারের রাজনৈতিক পরম্পর। এই সহযোগিতার সংবাদ জাতীয় আওয়ামী দলের কোনো কোনো অংশে রূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে কারণ তারা নুরীম লীগ বা অন্য কোনো সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তাদের পার্টির স্বনাম কলঙ্কিত করার যোরতর বিরোধী।

●

একপ সহযোগিতার সম্ভাবতা সম্পর্কে কবাচীতে থেকে মৌলানা ভাসানীর সতর্কবাণীর পর তার কোনো কোনো অনুগামী তাঁকে "অত্যাকৈ উদ্ধাশা সম্পন্ন ব্যক্তি" বলে অভিহিত করছেন।

মন্ত্রিসভায় অন্তর্দ্বন্দ্ব ও মতবিরোধের ফলে সুস্পষ্ট ফাটলের চিহ্ন

(১ম পৃষ্ঠার শেষ অংশ)

এই ব্যবহারে প্রসূট্ট বিজ্ঞাসা করেছিলেন : এই আইনের দ্বারা আপনারা কোথায় যাচ্ছেন, সেটা একবার ভেবেছে দেখেছেন?

●

প্রসূট্ট সাধারণ পাঠকের কাছে তেমন ব্যবহার হয়ত মনে হবেনা। কিন্তু যে মন্ত্রীদের কাছে এই প্রশ্ন পেশ করা হয়েছিল, তাঁদের পক্ষে প্রসূট্টর গুরুত্ব সাংঘাতিক এর মধ্যে পরস্পরার নিয়ে যদি অতিরিক্ত-খাঁটাখাটি করা হয় তাহলে স্বভাবতই অফিসারেরা মন্ত্রীদের নির্দেশে যে সকল পত্রিত কার্য" করে এসেছেন, সেটাও প্রকাশিত হবে। তাছাড়া, দলীয় এবং অন্যান্য স্বার্থের খাতিরে প্রায় সব সময়ই "গর্হিত ব্যাপারে" অফিসারেরা মন্ত্রীর আজ্ঞাবহ হন এবং সেই আজ্ঞাবহতা রক্ষা করা যাবে না। এই ইঙ্গিত বা হুবকি দেশথা যন্ত্রণীর শিকট; উপেক্ষনীয় নয়।

●

(১) কেমনা, জিলা সবরের শাসন ব্যাপারে, জিলা স্কুল বোর্ডের পরিচালনায় জিলায় স্থানীয় আক-টি-এ'র সংগঠনে এবং পারমিট বিতরণে এবং এরমকি শেষ পর্যন্ত স বার নির্বাচন ইত্যাদিতে পার্টির স্বার্থ এঁদের দ্বারা সুরক্ষিত হয়।

(২) এছাড়া রাইটার্স বিল্ডিংসে টেবার বিতরণ, চাকরী, বদলী এবং পুরস্কারদানের বিষয়গুলিতেও মন্ত্রীরা নিজেদের ইচ্ছা পুরণ করেন আজ্ঞাবহ অফিসারদের দ্বারা এবং এখানে একটি নিউ বুঝোয়া 'সেন্টেনেন্ট' ব্যবস্থা আছে।

দুর্নীতির সহাবস্থিতি

প্রজাবিত 'আইন' এই পারস্পরিক নির্ভরতা এবং সহাবস্থিতির উপরে একটা মারাত্মক আঘাত হানবার উদ্যোগ করেছিল। ডাঃ রায় তাঁর নূতন উদ্যমটি মন্ত্রীদের ডেকে প্রায় ঘণ্টা দেড়েক পর্যন্ত প্রস্তুত পাশাপাশনল করেন। তাঁর উক্তেশ্যের প্রাথমিক কারণ এই ছিল যে, স্বাধরনলিপিট প্রত্যেক মন্ত্রীর কাছে বিতরণ করার কলে সংযোগসে সেটি ফাঁস হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। অতঃপর শ্রীমুক্ত রায়কে সাবধান ক'রে দেওয়া হয় যে তিনি এইসব বিষয়ে যেন লিখিত আর কোনো নোট বা স্বারকলিপি পেশ না করেন।

●

যাক, পূর্ব পাকিস্থানের রেলের পরিচালনার দায়িত্ব শ্রীনুরুলকাদের হাতে অর্পণ। এঁদের মতে মৌলানার কথা হচ্ছে এই-বর্তমান যখন পিছিয়ে যাবে তখন পেছু হাঁকীর সঙ্গে সহযোগিতার বিষয়টিতে যদি তিনি দেশে তাঁর জনপ্রিয়তা পুনর্বার প্রতিত করে জাতীয় আওয়ামিদলকে সংগঠিত হবার সুযোগ এবং অবকাশ দেওয়া হয় তাহলে তাতে ক্ষতি কি? তার পর নির্বাচন যখন আসবে তখন লড়া যাবে।

●

এই সমস্ত গবেষণা কতদূর সত্য হবে তা সবই কালগর্ভে নিহিত আছে। যেটুকু বলা যায় তা হচ্ছে এই যে অন্তত কাল স্থায়ী কবাচী বাসের মধ্যেই মৌলানা পূর্ব পাকিস্থানের এক ধরণের বেরকবীর কিছু কিছু প্রাথমিক প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রীয় সরকারের সম্মতি সংগ্রহে সক্ষম হয়েছেন। দু দিনেরও কম ধরাবাবের পরেই সৈনপুরের ধন প্রজাতি বেরকবীকে ১৯৫৩ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ১৫ মাসের পরিপূরক ভাতা এবং যেসবত্ত তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী হিসাবপুর থাকে মৌকার বাস করে তাদের ধরাকরে সাত টাকা ও পাঁচ টাকা করে দিতে কেন্দ্রীয় সরকারকে তিনি রাজী করিয়েছেন এত দিনের পুরণো দাবী কথা তেকে মৌলানার কৃতিত্ব স্বীকার না করে পারা যায় না।

দিল্লীর দরবারে পশ্চিমবঙ্গ

(১ম পৃষ্ঠার শেষ অংশ)

যার ৪ লক্ষ বাদে বাকি সমস্তটাই যাবে এই বছরের নানা উনুবনের কাজে। ১৯৫৮-৫৯ সালের নূতন পরিকল্পনার জন্য থাকবে মাত্র ৪ লক্ষ টাকা।

শোনা যায়, পশ্চিম বঙ্গের প্রতি এইরকম অবহেলামূলক অবজ্ঞা না কি পরিকল্পনা কমিশনের মন্ত্রঃ পুত নয়। তার চেয়েও মর্মান্তিকটা হচ্ছে এই যে, এতে রাজ্যের স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকারকে পর্যন্ত বে-পরোয়া লঙ্ঘণ করা হয়। রাজ্যের উন্নয়ন কমিনারদের এড়িয়ে তাঁর অধস্তন কর্মচারীদের কাছে চিঠিপত্র লিখে পরিকল্পনা কমিশন ছোড়া ডিক্রির মত ঝাড়ছেন।

রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে একাধিকবার প্রতিবাদ সত্ত্বেও এই প্রথাতা অব্যাহতভাবে চলেছে। এমন কি কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের স্বায়ত্তশাসন অধিকার লঙ্ঘন ক'রে ডাঃ রায়ের কাজকর্মে পর্যন্ত হস্তক্ষেপ করছেন। ডাঃ রায়ের মত অবরদস্ত শাসন-কর্তাকে বিধানসভেই যদি এইরূপ অবস্থা হয় তবে ডাঃ রায়ের অবরুদ্ধায়ের পরিস্থিতি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে?

সিদ্ধান্তে নয়চক করাচাকে "অর্থাভাবে হানিকর" বলে বলে করেন। দ্বিতীয় প্রোট্ট একটা আপোষের জন্য ডাঃ রায়ের উপরে চাপ দেন।

●

তবাপি, আসলে বিরোধের যেখানে উৎপত্তি হয়েছিল, অর্থাৎ দুর্নীতি দমন বিলটি সম্পর্কে এখনও চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়নি। এ ব্যাপারে ডিসেম্বর মাসে ডাঃ রায় একটা সাময়িক শান্তি, ব্যবস্থা করেছিলেন। বিধানচন্দ্রকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের বিবেচনারজন্য দিল্লীতে পাঠানো হয়েছে।

●

ফলে এখানে যে দলাদলি ঘুনায়িত হয়ে উঠেছিল, সেটা কতকটা চাপা পড়েছে। দ্বিতীয়তঃ, স্বরাষ্ট্র দপ্তর যদি বিলটি সাবক করে দেন, তাহলে ডাঃ রায় সহজেই নবীন উদ্যমীদের শায় করতে পারবেন, অথচ পুরাতন মন্ত্রীদের অভিমান্ত চরিতার্থ হবে।

●

ইতিমধ্যে দুর্নীতি দমনের জন্য তিনি একটি সাব কমিটি গঠন করেছেন, যার মধ্যে সিদ্ধার্থ রায়কে নেওয়া হবেন। কিন্তু প্রফুল্ল বাবু এবং কালীপদ বাবু রয়েছেন। এই সাব কমিটির কার্যকারিতা সম্বন্ধে তিনটি গোষ্ঠির নেতারা হতাশা ছাড়া আর কিছু পোষণ করেন না। তাঁদের একজনের উক্তি হচ্ছে: ব্যাপারটা মন্ত্রিসভার ফাটল বন্ধ করার জন্য একটা লোক দেখানো white wash। এই কমিটি কোনো নির্দিষ্ট সুপারিশ করতে পারবে বলে তাঁরা আশা করেন না, এবন কি অনিশ্চয়ারাও না।

ধর্মঘট প্রসঙ্গে গুরুতর মতভেদ

কিন্তু দুর্নীতির প্রশ্নে মন্ত্রিসভার মধ্যে যে অন্তর্বিরোধ তুঙ্গ হয়েছে, সেটা শুধু দুর্নীতির প্রশ্নেই আবদ্ধ আছে একথা বলে করার কোনো কারণ নেই। কংগ্রেস পার্টির ভিতরেও এর প্রতিক্রিয়া পৌঁছেছে। কলিকাতার কংগ্রেসের নবগঠিত কমিটির নির্বাচনের সময় যে প্রকাশ্য আন্দোলন এবং সভাগুলি অনুষ্ঠিত হয়েছিল, (যার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল শ্রীঅতুল্য ঘোষের বিরুদ্ধে একটা দলবাঁধা কুৎসা অতুল্য বাবু নিয়ে নিয়েছেনকে সেটার পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে কয়েকজন মন্ত্রীও আছেন।

ঈর্ষ্যা ও অবিশ্বাস

আরও একদিকে এই মতভেদ পুষ্পর হয়েছে। এই নবীনের দল বিভিন্ন সভ্যতার সমাধানের ব্যাপারে, যেমন শিক্ষক বা উদ্বাস্তুদের সমস্যা ইত্যাদিতে যে চিন্তাধারায় চলেন, সেটা স্বভাবতই কলকাতার জনবতের কাছাকাছি। এঁদের সঙ্গে পাটি বহির্ভূত অনসাধারণের সংযোগ এবনও ঘনিষ্টতর। ফলে যে কোনো সমস্যায় এঁরা যে মতবায় বা দৃষ্টিভঙ্গী প্রতিফলিত পেশ করেন, সেটা দেশথা বহুলীয় দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে প্রায় প্রকাশ্য বিরুদ্ধতায় দাঁড়ায়। এই বিরুদ্ধতা পর পর তিন চারটি সমস্যায় পুষ্পর হয়েছে, সর্বশেষ দৃষ্টায় শিক্ষক ধর্মঘট। একথা মনে করার কোনো কারণ নেই যে, এই বিরুদ্ধতা এইখানেই শেষ হবে অথবা অবর্বিরোধ পুনশিত্ত হবে আসবে। কেননা, এই বিরোধের আসল কারণ মতবায় ও মনোভঙ্গীর পার্থক্য। এবং এর সঙ্গে ইন্ধন রূপে যুক্ত হচ্ছে, পুরোন কংগ্রেসের পার্টি স্বার্থ, পরস্পারিক অবিশ্বাস ও সন্দেহ।

হিং টিং ছট

সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

দেশের দুঃসাহসিক কীর্তি

সংবাদপত্রের ক্ষমতা

তিনজন চীনা মন্ত্রী বরখাস্ত

নির্ভীক সাংবাদিকতার ছাপ

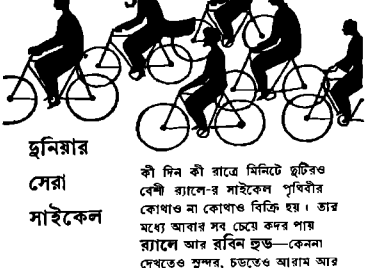

অর্থ মন্ত্রী কৃষ্ণমাচারীর ভাগ্যবিপর্য্যয়

জনসাধারণের ধিক্কার ঃ প্রীনেহরুর গুণ-গান ও প্রশংসায় পঞ্চমুখ

(দর্পণের নিজস্ব ভাষ্যকার)

রাষ্ট্রপতি পার্লামেন্টের বাজেট অধিবেশন উদ্বোধন করেছেন। তাঁর ভাষণে নতুন তথ্য বা নীতি বিশেষ কিছু নেই। দেশে নতুন আশা বা নতুন ভীতির সঞ্চারও এতে হয় নি। প্রীনেহরু ও অন্যান্য মন্ত্রীদের বলা কথা আর একবার শুছিয়ে বলা হল, এই মাত্র।

রাষ্ট্রপতির ভাষণ তাই দেখে আলোচনার বিষয়বস্তু হ'তে পারে নি। তিন সপ্তাহ সারা দেশকে যা উদ্বেলিত করেছে, দেশের সামনে আজও তা আলোচনার বিষয়—চাপ্না কমিশনের পরিপ্রেক্ষিতে অর্থমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণমাচারীর ভবিষ্যৎ।

তথ্য যা প্রকাশ পেয়েছে তাতে দেশজুড়ে লোকের ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে, শ্রীকৃষ্ণমাচারীকে মন্ত্রী-সভা ত্যাগ করতে হবে। 'ধারণা' না বলে 'আশা' বলাই বোধহয় সঙ্গত। দিল্লী থেকে রোজই শ্রীকৃষ্ণমাচারী সম্বন্ধে নতুন নতুন কলঙ্কের সংবাদ আসছে। রাজধানীর অভিজ্ঞ সাংবাদিক মহলের বিশ্বাস অর্থমন্ত্রী সদ-ত্যাগ পত্র দাখিল করেছেন। চাপলা কমিশনের রিপোর্ট না পাওয়া অবধি সিদ্ধান্ত স্থগিত আছে।

শ্রীকৃষ্ণমাচারীকে মন্ত্রীসভা ত্যাগ করতেই হবে, দু'দিন আগে কি পরে। রাজনৈতিক অর্থমন্ত্রী করবার কথা বলছে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণমাচারী নিজেকে বড়ো একটা রাজনীতিক বলেছেন, আর তেমন কোনদিন দিল্লী আসবেন না, এক বিরাট কলঙ্ক নিয়ে তাঁকে দিল্লী ত্যাগ করতে হবে।

শ্রীকৃষ্ণমাচারীর গুণগান

আশ্চর্য্য, দেশজুড়ে লোক যখন শ্রীকৃষ্ণমাচারীকে ধিক্কার দিচ্ছেন, শ্রীনেহরু ঠিক তখন তাঁর গুণগানে ব্যস্ত। এখন কি, চাপলা কমিশন রায় পেশ করা অবধি অপেক্ষা তিনি করতে পারেন নি। কেন, কেউ বলতে চাইছেন, শ্রীনেহরুর ঔদার্য্য দেশকে ঘোরান যে ভারত সরকারের আধিক + নীতি সবচেয়ে উপযুক্ত নীতি এবং জীবনবীমা কর্পো-রেশনের ব্যাপারে যাই ঘটুক না কেন, এ নীতির পরিবর্তন হবে না।

যদি শ্রীনেহরুর উদ্দেশ্য তাই হয়, তবুও তিনি কি আশ-পাশ দিক আঁচ করতে পারছেন না ? চাপলা কমিশনের বৈঠক শেষ হয় ৯ই ফেব্রুয়ারী, ঘোষাইতে। এই ঘোষাইতেই, শ্রীনেহরু দু-দুটো সভায় শ্রীকৃষ্ণমাচারীর গুণগান পঞ্চমুখ হয়ে ওঠেন। দেশের শাসনের বহর উঁচুতলা বাঁধা হয়েছে : জনসাধারণের আর্থিক উন্নতি এবং ধনবৈষম্যের অসাধারণ অবসান। এ উদ্দেশ্যের দিকে এগিয়ে যেতে শ্রীকৃষ্ণমাচারীর অবদান শ্রীনেহরুর প্রশংসার যুপ কাষ্ঠ।

কংগ্রেসী সভায় নেহরু

পার্লামেন্টের সাম্প্রতিক অধিবেশন আরম্ভ হবার পূর্বের সপ্তাহ শ্রীনেহরুকে দেশের বিভিন্ন সভ্যদা দিকে কংগ্রেসী সভাদের সভায় ভাষণ দেন। এখানেও শ্রীকৃষ্ণমাচারীর আরেক পুর্ব গুণগান তিনি করেছেন। সভায় সাধারণের পুরেব ছিল না। কিন্তু সভায়ে উপস্থিতরা শ্রীনেহরুর ভাষণের বিপোর্ট বিপোর্টে প্রকাশ করে দেন। তিনি বলেছেন, ভারতের আর্থিক সংকট কেটে গেছে। এর জন্য শ্রীকৃষ্ণমাচারীর কৃতিত্ব অনেক।

পুরান বিশ্বাসঘাতি চাপলার বিপোর্ট তখনও ইস্তাহী হয়নি। অধিনেতৃর বৈঠক চলা কালে এবং বিপোর্ট বিরবার সময় থাকে ওাঁহাতেও সাঙ্কাতে হয়েছে তাঁকে বারবার পুরবাদের এত প্রশংসা কথা শ্রীনেহরু কি করে যুক্তি সংগত বলে করবেন ?

যে বিদ্যা ভাষণ করেছিলেন তাই কি হবে ? শ্রীনেহরু উত্তর দেন, সময়মত তা বোঝা যাবে। সদস্যদের জানা উচিত, পার্লামেন্টে মন্ত্রীদের উত্তর অফিসারদা লিখে দেন।

কৃষ্ণমাচারীর মিথ্যাভাষণ

অর্থাৎ মিথ্যাভাষণের দায়িত্ব শ্রীকৃষ্ণমাচারীর নয়, কোনো অফিসারের ? বলে রাখা পুরোজন, মুরার শেগার ক্রয়ের অনেক পরে লোক সভায় পুশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণমাচারী বলেছিলেন, জীবন-বীমা কর্পোরেশন টাকা লগ্নী করে থাকের উদ্দেশ্যে। শেয়ারের বাজার কম রক্ষা করা বা শেয়ার বাজারে লগ্নী দ্বারা কম করা বীমা কর্পোরেশনের কাজ নয়।

এর কিছুদিন পূর্বে মুরার শেয়ার ক্রয় করা হয়েছে। আর এই করেকমাস পর চাপলা কমিশনে শ্রীকৃষ্ণমাচারী পুরাণ করবার চেষ্টা করেছেন, মুরার শেয়ার-গুলো বাজারে বশার ডায় সষ্টি করেছিল। এগুলো কেনা হয় মুলাকে উদ্ধারের জন্য নয়, শেয়ার বাজারকে চাঙ্গা করার জন্য।

শ্রীবিরোজ গান্ধী কলঙ্কময় ব্যাপারটি অনেক তথ্য দিয়ে লোকসভায় পেশ করেছিলেন। চাপলা কমিশন বসার তার পর। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণমাচারী শ্রীমাধীর অভিযোগের উত্তরে লোকসভায় নির্বিকার চিত্তে বলেছিলেন, মুরার শেয়ার ক্রয়ের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই।

এর থেকে বেশী মিথ্যাভাষণ কি হতে পারে বলা কঠিন। অর্থমন্ত্রী পার্লামেন্টকেই ভুল বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু করেকদিন যেতেই ধরা পড়েছেন। আজ অফিসারদের উপর মোগরোগ করে তাঁকে বাঁচানোর চেষ্টা বৃথা।

আসরে প্রেম ভাটিয়া

নতুন নতুন চেনে। শ্রীকৃষ্ণমাচারী সাংবাদিক মহলে বহু একজন সমর্থক পেয়েছেন। ইইদানীন্যালের শ্রী প্রেম ভাটিয়া। গত দু'বাস যাবত তিনি আদাজল খেয়ে আসরে নেমেছেন, শ্রীকৃষ্ণমাচারীর ওকালতিতে আর শ্রীকৃষ্ণজননের গায়ে কালা ছুঁড়তে। শ্রীভাটিয়া অত্যন্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন এই কথা পুমাণ করতে যে শ্রীকৃষ্ণমাচারীর মত এত ওণী লোক এপর্যন্ত নিবন। ডাগ্যি এই, শ্রীকৃষ্ণমাচারীর নিকট দেশের কতজ্ঞ থাকা উচিত। উকৈাদেকে ডাকা হচ্ছে, শ্রীকৃষ্ণজেনন দেশটাকে উৎসন্ন দিচ্ছেন।

শ্রীপ্রেম ভাটিয়া, হৈইন্যান, বা শ্রীনেহরু স্বয়ং যাই করুন, শ্রীকৃষ্ণমাচারী আর অর্থমন্ত্রী থাকবেন না। সবচেয়ে দুঃখের বিষয় বলে কহে এত বড় দায়িত্ব-পূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থাকতে পারে না।

কে নতুন অর্থমন্ত্রী হবেন তাই নিয়ে এখন জল্পনা চলছে পরপুরীর নিশ্চয়ই অনেক আছেন, কিন্তু কোনো নামের ঘষিণা করা যাচ্ছে না। অনেকে বলে করেন, আগাতত শ্রীনেহরুই এ দায়িত্ব গ্রহণ করবেন এবং লোকসভায় এবারকার বাজেট পেশ করবেন।

বিরাট পরিবর্ত্তন

দিল্লীতে শুরুর চলছে, স্ত্রীসভার যত্ন রকমের পরিবর্তন আসছে। গত নির্বাচনের পর নতুন নতুন মেসর বহী করা হয়েছিল, শ্রীনেহরু এতদিনে তাদেরকে চিনে নিয়েছেন। কেউ হত আধা মন্ত্রী (কেন্দ্রীয়) থেকে তিন-চতুর্থাংশ মন্ত্রী (মিনিয়ার মিনিস্টার) কেউবেবা পুরো মন্ত্রী হবেন, কিন্তু তিন-চতুর্থাংশ মন্ত্রী হবেন পুরো মন্ত্রী।

শ্রীঅশোক কুমার সেনের ভাগ্যে কি আছে কে জানে! তিনি মুখ্যত বন্ধু, ব্যবসায়ের অংশীদার এবং কিছুদিন তাঁর ল্যাইনের পরামর্শদাতা ছিলেন। একসময় মন্ত্রীমহলে তাঁর নাম খুব ছড়িয়েছিল। অর্থমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রকের প্রধান সেক্রেটারী ও শ্রীমুন্দ্রার অনেক কীর্তি আজ ফাঁস হ'য়ে গেছে। শ্রীসেনের ওরুত্ব কি বাড়ল না কমল ?

ইতিমধ্যে পার্লামেন্টে দক্ষিণ ভারতের দলী সক্রিয় হয়েছে। তাদের পুরাণ ওরু হয়েছে, শ্রীকৃষ্ণমাচারী দিল্লী ত্যাগ করলে, দক্ষিণ ভারতের কোনো পুতিনিধিকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করতে হবে মাদ্রাজ বা অন্ধ্র থেকে।

আজ মধ্য প্রাচ্যের লক্ষ্য কি—

বাগদাদ জোট, না সংযুক্ত আরব রাষ্ট্র

(পরবাষ্ট্রীয় পর্যবেক্ষক)

মি: ডালেস যখন তাঁর ঐতিহাসিক সফরটিনেদের নিয়ে বাগদাদ চুক্তি পরিষদের বৈঠকে বিসিত ছিলেন এবং মধ্যপ্রাচ্যে বেশ একটা জোরালো পশ্চিমী হাওয়া পুবাহিত করার চেষ্টা চালছি, ঠিক সেই মুহূর্তে কায়রোয় জনতার বিরাট বিক্ষোভোদেন" মধ্যে সংযুক্ত আরব রাষ্ট্র গঠনের বিবৃতি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

সংযুক্ত আরব রাষ্ট্র গঠনের ঘোষণা যে, ঠিক এই মুহূর্তেই বাগ্দাদ চুক্তি পরিষদের উপরে আঘাত করতে পারে—একথা অন্তত: মি: ডালেসের কাছে অজানা ছিল না। পুকৃতপক্ষে, অনেকেই এই অনুমান করবেন যে সংযুক্ত আরব রাষ্ট্রের ঘোষণাটি পুকাশিত হওয়ার সময়টাকে আছে জেনেই, এবারের বাগদাদ চুক্তি পরিষদের বৈঠকে পুস্তুত পুচারাভিযান তৈরী করা হয়েছিল এবং মি: ডালেস স্বয়ং এই বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন।

কেননা, এই ঘোষণা সমস্ত আরব রাষ্ট্রগুলির জাতীয়তাবাদের মূলে যে বিষ পুয়োগ করবে, বাগদাদ চুক্তির পক্ষে সেটা নি:সন্দেহে মারাত্মক। "আইজেন-হাওয়ার তত্ত্বটুকুনেও" ভরসার যায়া নি: ডালেস গত ২ বৎসরের মধ্যে কিছু সংযুক্তের যে অভিধান আরব্ধ ক'রেছিলেন, বিশর এবং সিরিয়ার সংযুক্তি তার একটা পুকাণ্ড পাল্টা অঘাত হানিছে।

১৯ ফেব্রুয়ারী এই সংযুক্তির সিদ্ধান্ত স্বাক্ষরিত হয়েছে। কিন্তু এর উদ্ভব-দিবস আরম্ভ হয় ৩ বৎসর পূর্বে-ঐ সময় সিরিয়া এবং মিশর সংযুক্ত পুতিজ্ঞা ব্যবস্থায় স্বক্ষর করেছিল। ২ বৎসর পূর্বে সিরিয়ার পার্লামেন্টে ঐক্যমত সিদ্ধান্তের দ্বারা পুস্তাব গৃহণ করা হয়েছিল যে, মিশরের সঙ্গে ফেডারেশন গঠনের বিষয়ে আলোচনার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হবে। তারপর থেকে এপর্যন্ত ঐ কমিটির কাজ অগ্রসর হয়েছে এবং অন্যদিকে ক্রমশ:ই রাজনৈতিক আব-হাওয়ার এই মৈত্রীর অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করেছে।

বর্তমান ঘোষণার মধ্যে অবশ্য এই ফেডারেশনের কোনো পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা দেওয়া হয়নি এবং ফেডারেশন কার্যকর হতে সময়ও আরও ২ বৎসর সময়সাপেক্ষ। ইতিমধ্যে শুধু এইটুকু পুকাশিত হয়েছে যে, ২টি রাষ্ট্রের একই পুতিরক্ষা, এক পার্লামেন্ট, এক মন্ত্রিসভা এবং একজন পুেসিডেন্ট থাকবে। পুেসিডেন্টের পদ, যদিও সিরিয়ার এল-কুয়াৎলির মনোনয়নে তথাপি তিনি সাময়িক ভাবান আদমেদ নাসেরের হাতে অর্পণ করেছেন।

* * * বৈধয়িক দিক থেকে লক্ষ্য করবার বিষয় : সংযুক্ত আরব রাষ্ট্রে মোট লোক সংখ্যা হবে ২ কোটি ৭৪ লক্ষ; অন্যান্য আরব রাষ্ট্রে ১ কোটি ৯৪ লক্ষ; বাগদাদ চুক্তি গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত অন্যপাকা গেণ্ডলির লোকসংখ্যা হবে এই সংযুক্ত রাষ্ট্রের পুায় ৩ গুণ।

● ● ● কিন্তু পুতিশিদ্ধ বধ্য পুচ্যে থেকে যে পেট্রল রপ্তানী হয় তার বেশীর ২৩ লক্ষ ব্যারেল পাঠাতে হবে এই সংযুক্ত রাষ্ট্রের তিনের দিকে—সুয়েজ খাল, অথবা সিরিয়ার ২ টি মুখর পাইপলাইনের মারফৎ। অর্থাৎ বধ্যপ্রাচ্যের মোট ৩১ লক্ষ ব্যারেল রপ্তানীর মধ্যে ২৩ লক্ষ ব্যারেলের গতিপথ নিয়ন্ত্রিত করবে এবং তার ওরুত্ব আপনা করবে এই নুতন রাষ্ট্র।

● ● ● অবশ্য অন্যান্য পণ্য রপ্তানীর তুলনা করলে দেখা যাবে যে, আরব রাষ্ট্রগুলির বাণিজ্যিক লেনদেনের পুায় অর্দ্ধেক অর্থাৎ পুায় ১৩০ কোটি ডলার মূল্যের পণ্য এই নুতন রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীন হবে।

● ● ● ভৌগোলিক দিক থেকে দেখলে নুতন রাষ্ট্রটি অনেকটা পারিস্থানের মত উত্তরে সিরিয়া এবং দক্ষিণে মিশর, এই ২ ইউনিটকে বাঙ্ক-বানে ইস্রাইল একটি পরবাষ্ট্র থাকছে। অবশ্য উপিয়াতে যদি ডর্ডান এই সংযুক্তির দিকে আকৃষ্ট হয় তাহলে সিরিয়ার এবং মিশরের অস্ত্রাগারী সংখ্যা পুতিষ্ঠিত হতে পারবে; তবলিন না হচ্ছে ততদিন এই দুইএর যোগাযোগের হবে সমুদ্র অথবা বিমান পথে।

এরকম সংযোগ আসবার পর, সুয়েজ অবরোধের পর মাকিন পরবাষ্ট্র দপ্তর মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কে নুতন উদ্যমতা দেখা তে শুরু করেছিলেন। এর যুক্তিসঙ্গত পরিণতি জনিরীতিতে ক্রমশ: মাকিনের আধিপত্য পুতিষ্ঠিত হয়েছিল। মি: ডালেস গত ২ বৎসরের চেষ্টার আরব রাষ্ট্রগুলিকে তিনটি শিবিরে ভাগ করে এনেছিলেন : (১) একদিকে বাদ পুাচ্যে নিশর, সিরিয়া, ইয়েমেন; (২) মাঝখানে জর্ডান, সৌদি আরব এবং (৩) দক্ষিণপুাচ্যে ইরাক, ইরান, পাকিস্থান এবং তুরস্ক। একটু শিছনেরে দিকে তাকালেই পাঠকের একথা মনে পড়বে যে, ২ বৎসর পূর্বেও মধ্যপ্রাচ্যে এই তিনটি গোষ্ঠীর বিভাগ ছিলনা—(১) এবং (২) নং গোষ্ঠীর রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বিশির, সিরিয়া, ইয়েমেন, জর্ডান এবং সৌদি আরব একটা আরব সংহতির আভাষ তৈরী ক'রে রেখেছিল। এবং এই সংহতির পশ্চাতে আরব জাতীয়তা-বাদ ও ইংরেজ বিদ্বেষ ছিল পুধান ঐক্যসূত্র। কিন্তু মাকিন যুক্ত রাষ্ট্র সৌদি আরব, জর্ডান ও সৌদি আরব বিরিই ছিলনা। কাজেই ইংরেজের পশ্চাদপসরণের সঙ্গে সঙ্গেই মাকিন কূটনীতি সুয়েজ সোরগ ও সঙ্কর্ষনার দ্বারা জর্ডান এবং সৌদি আরবকে নিশরের নেতৃত্বের আওতা-থেকে সরিয়ে আনবার জন্য সচেষ্ট হয়েছিল। এবং যি: ডালেস এই পুচেষ্টায় কৃতকার্য হয়েছিলেন। জর্ডানের পুায় পাশার গনিযুক্তির অব্যবহিত পরেই (এবং নাসের বধন বক্স ও বনিবার তীর্থ সবর ক'রে এখেন ঠিক তার পর-পরই) পাঁচটি আরব রাষ্ট্রের মধ্যে সংযুক্ত পুতিজ্ঞা জেটি গঠন এবং সংযুক্ত সৈন্যপত্যের ব্যবস্থা পুতিষ্ঠা করা হয় নিশ্চিন্ত মনে হয়েছিলেন। কিন্তু একবাত্র মাকিন কূটনীতির সাফল্যের দরুণ শেষ মুহূর্তে এই উদ্যম ভণ্ডুল হয়। পুধানতঃ ইরাক এবং সৌদি আরবে অবস্থিত মাকিন তেলের কোম্পানীগুলির এবং নেতাদের পুভাবিত করেছিলেন : শেষ পর্যন্ত যুক্ত পুতিজ্ঞা এবং যুক্ত সৈন্যপত্যের ব্যবস্থা শুধু নিশর, সিরিয়ার ও ইয়েমেনের মধ্যেই স্বাক্ষরিত হয়। অপর দিকে নিশরের সঙ্গে জর্ডান ও সৌদি আরবের যুক্ত ক্রমশ: বৃদ্ধি পেতে থাকে, যার ফলে একসময় একথা বলে হয়েছিল যে, এই ২টি রাষ্ট্র যুক্তভা অবশেষে বাগদাদ চুক্তি আওতাভুক্ত হবে।

এই পুতিক্রিয়া আবহাওয়ায় গতিবেগ করার জন্য নিশরের গায়ান আশেল নাসেরের হাতে একটি মাত্র বুহৎ আস্ত্র আছে—আরব জাতীয়তাবাদকে নুতন কোনো পেরণী দেওয়া। জর্ডান ও সৌদি আরবের জনসাধারণের মধ্যে সেই পেরণাকে এমন ডাবে সঞ্চারিত করা, যাতে ক'রে জনতার চাপ এই ২টি রাষ্ট্রের রাজন্যযন্ত্রকে পুতাবিত করতে পারে। নিশর এবং সিরিয়ার বিদেনের দ্বারা এই চাপটি সৃষ্ট করা হয়েছে। পুস্তুতপক্ষে এর পুতিক্রিয়া আরব জাতীয়তাবাদের আবারে ইরাক এবং জর্ডান ও সৌদি আরবে ভালোমন্দ পুবেশ সৈন্যকে এখন বাহুনৈতিক পর্যবেক্ষকের পুধান লক্ষণীয় বিষয়।

কেননা, এইরূপ নিশর বে আশেই সমর আধুনিক দুনিয়ার দুইটি সর্দ্দান রাষ্ট্রের গভর্ণরকে নিজেকে কায়েমী স্বার্থ এবং অন্যান্য স্বার্থের বন্ধন পরিত্যাগ করে, একটা ফেডারেশনে যে নিশির হতে পারে এই উদ্দামবের কথা এতকাল কল্পনাবিলাস অথবা বিদ্রূপের বিষয় ছিল। কিন্তু বাস্তবে "পুোগ্রা-গ্যাতা ইন্" বলে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। গায়ান আবেদনের নামের এবং সিরিয়ার পুেসিডেন্ট এল-কুয়াতলির এই জাতীয়তা বাদের ঝণ্ডাকে সর্ব্বত্র করেছেন। বস্তু-পুচোর পক্ষে এই দুইয়ের যোগাযোগ আরও গভীর এইরূপ যে, যত দিন দপক যায় পুতোকটি আরব রাষ্ট্রের রাজনৈতিক নেতা এবং রাজনীতি সচেতন মানুষ একথা বিশ্বাস করে এসেছে যে, প্যান আরাবিজমের মধ্যেই অর্থাৎ আরব সংহতির মধ্যেই উদ্দামের শক্তি নিহিত আছে।

লোকসভায় প্রথম দিন

(দর্পণের নিজস্ব পুতিনিধি পুেরিত)

দিল্লী ১১ই ফেব্রুয়ারী—লোকসভার পুথম দিনের অধিবেশন বেশ জমজমা না। কেবল বেন বিরোনো ভাব। রাষ্ট্রপতির ভাষণের সাড়ে ধাধন না। সকলের মুখেই এক কথা। চাপলাকমিশনের রিপোর্ট'ও অর্থমন্ত্রীর ভবিষ্যৎ। নানা জল্পনা কল্পনা। নানা গুজব পোনা যাচ্ছে। অর্থমন্ত্রী পদত্যাগ করছেন না কি। কে হচ্ছেনে ছাড়খাড়। কে চাড়ে পাচ্ছে? কিন্তু এর চেয়েও বেশী কৌতূহল শ্রীকৃষ্ণমাচারীর ভবিষ্যতে।

শ্রীনেহরু কথাবার্ত্তায় ব্যাপারটা অনেকের কাছে রহস্যময় ঠেকছে। তাঁর মনে কি আছে ঠিক বোঝা যাচ্ছেনা। তবে চাপলা কমিশনের রিপোর্ট পাওয়ার আগে কিছুই হচ্ছেনা। এটা ঠিক।

গত রবিবার কংগ্রেস পার্লামেন্টারী পার্টির সভায় শ্রীনেহরু অর্থমন্ত্রীর অতন্ত্র পুশংসা করেছেন। তার আগে ৩দু একবার করেছেন। এই থেকে কেউ কেউ মনে করছেন শ্রীনেহরু অর্থমন্ত্রীকে প্রাণপণ জনা বাচ্ছ চলে পড়েছেন। আবার কেউ বলছেন এ সব বিদানী পুশংসা।

মন্ত্রীর আজ পাকলা বলছেন বিপোর্ট যদি তাঁর বিরুদ্ধে হয় তিনি পদত্যাগ করবেন। তাঁর আশা শ্রীকৃষ্ণমাচারীর বিরুদ্ধে বিশু থাকবে না। শ্রীপ্যাটনের থাড়েই সব দোষ চাপানো হবে। শ্রীকৃষ্ণমাচারী সোমবার লোকসভায় উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু ঠিক কখন আসবেন তা কেউ বলতে পারেন না। তাঁর শ্রীপ্যাটনের নাকি অপিসে আসছেন না। জোর গুজব তাঁকে সাময়িকভাবে কর্য বিছুত করা হয়েছে। কিন্তু এ খবর বোধ হয় ঠিক নয়। অন্তত সরকারী মহলে সমর্থন মেলে না।

অর্থমন্ত্রীর ভবিষ্যত নিয়ে কথার অন্ত নেই। তাঁর সমর্থকরা ভাবছেন যে শ্রীকৃষ্ণমাচারী বহীদ থাকবেন যাই হোক না কেন। কংগ্রেস পার্টিতে অর্থমন্ত্রী হড়যার মত লোক কই ? আর এক দল লোক বলছেন যে শ্রীকৃষ্ণমাচারী দিনে দিনে না কেন কোন পার্টিরই অনেকটে উপেক্ষা করা উচিত নয়।

আশ্চর্য্যের কথা ডবিষ্যত এখ বহী কে হতে পারে আলোচনা একদম হচ্ছে না বলা যায়। ৩দু লোকসভার মহীতে শ্রীমোরারজী দেশাই'ও শ্রীমান মেহতার নাম শোনা যাচ্ছে। যেমন কি কেউ কেউ শ্রীরাজাজি নেহরুরও নাম করছেন।

চাপলা কমিশনের রিপোর্ট হাতে-নাতে দিল্লীতে পৌঁছুতে। লোকসভা পৌঁছাতে কিছু সময় লাগবে বলে মনে হয়।

ভিয়েৎনামের রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস

প্রেসিডেন্ট ডাঃ হো চি মিনের বিপ্লবী জীবন কাহিনী

(দর্পণের দ্বাঙর্জাতিক ডায়েরী)

আটাশ বছর পূর্বে ডাঃ হো চিমিনের উপর ফাঁসীর হুকুম দেয়া হয়েছিল। কিন্তু ফাঁসী সরকার তাঁকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি। কারণ সে জন্তুম তামিল করা যায়নি। ইন্দোচীনের কমিউনিষ্ট পার্টি তখন ছিল ক্ষুদ্র একটি সংঘা। এক বছর বয়সও তার হয়নি। সেই পার্টির প্রতিষ্ঠাতা ও নেতা আজ ভিয়েৎনাম গণতান্ত্রিক রিপাবলিকের অবিসম্বাদিত নেতা ও রাষ্ট্রপতি। দশ দিনের জন্য রাষ্ট্রীয় অতিথি হয়ে তিনি ভারত সফরে এসেছেন। এ লিখে তুষার তিনি ভারতে পদার্পণ করলেন। প্রথমে এসেছিলেন বার ছয় পূর্বে।

বিপ্লবী হো চি মিন

বিপ্লবী ইন্দোচীনের নায়ক তখন বাচ্ছিলেন ফ্রান্সে। স্বেচ্ছায় ফ্রান্স ইন্দোচীন ত্যাগ করতে রাজী কি-না দেখতে। অত্যাচারিত ও শোষিত ইন্দো-চীন আপোষে স্বাধীনতা পায় নি। ডাঃ হোর উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছিল। ফ্রান্সের দক্ষিণ প্রান্তীয় বেঁকে বসেছিলেন—ইন্দো-চীনের সুচ্যগ্র ভূমিও তারা ছাড়বেন না।

সেটা ১৯৪৬ সন। ফ্রান্স যুদ্ধে বিধ্বস্ত ও আমেরিকান-পদ-দলিত হয়েছিল বটে, কিন্তু সাম্রাজ্যলিপ্সা তার কমে নি। ডাঃ হোর আপোষে স্বাধীনতা-লাভের চেষ্টা ব্যর্থ হলেও ফ্রান্স ইন্দোচীনে তার সাম্রাজ্যকে জবরে রাখতে পারে নি। ক্রমেই ও অবাধ্য হয়ের স্বাধীনতাকামী জনসাধারণের হাতে মার খেতে খেতে—নিজে ইন্দো-চীন যুদ্ধ করেছে বটে, আট লক্ষের। সাম্রাজ্য রক্ষাকারী নৈন্যবাহিনীকে পরাস্ত মেনে নিতে হয়েছে। বিভিন্ন-বিভিন্ন ভুলে ক্রমাগী শক্তি যে মার খেয়েছিল তা থেকে সে আর উঠতে পারে নি। ইন্দোচীন থেকে তাকে সরে আসতে হয়েছে। রক্তক্ষয় করে ইন্দো-চীন তার স্বাধীনতা অর্জন করেছে।

১৯৪৬ সালে ব্যাপার যখন ডাঃ হো-চে কলকাতায় একদিন অবস্থান করতে হয়েছিল। ছিলেন তিনি গ্রেট ইষ্টার্ন হোটেলে। সাংবাদিক হিসেবে তাঁর সঙ্গে দেখা করবার—আমার সৌভাগ্য হয়েছিল।

শীর্ণকায়, গাম্ভীর্য চেহারা। পরণে সাদাসিধে ট্রাউজার ও টিউনিক। কিন্তু দৃষ্টি তীক্ষ্ণ ও সহানুভূতিশীল। ইংরেজি বলেন আস্তে আস্তে, অনেকটা ফরাসীরা যে উচ্চারণে বলে সেই ধরন। আবহা ইংরেজি মিশ্রিত বৃটিশ রাজত্বের গালচে; ইন্দোচীনবাসীরা ফরাসী ভাষা শিখতে তেমনি ফরাসী রাজত্বের গালচে। তা ছাড়া, ডাঃ হোকে মহানিল খেল ফ্রান্সেই কাটাতে হয়েছে। কমিউনিষ্ট মন্ত্রদীক্ষা তাঁর সেখানেই।

ডাঃ হো রক্তাভরী নেতা সেদিন আমার প্রশ্নের জবাব তিনি দিয়েছিলেন বোলাচুলি ভাবেই। তবে নিজে থেকে গরজ করে বিশেষ কিছু বলেন নি। যে টুকু কথোপ-কথন হয়েছিল সেইটি, তা থেকে ডাঃ হোর একাত্মতা, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সুদৃঢ় ধারণা এবং সর্বোপরি নিজের দেশের জনসাধারণের উপর অগাধ বিশ্বাস আমার মনে গভীর ছাপ রেখেছিল।

আর ডাঃ হো-চে দেখলাম আবার সেদিন রাত্রে বখন বিমান ঘাঁটিতে। গত ১২ বছরে তাঁর চেহারায় পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু সেই মৃদু হাসি, তীক্ষ্ণ ও সহানুভূতিশীল দৃষ্টি আর অনাড়ম্বর বেশের যখন যখন এক তিলও। ১২ বছরে তাঁর দেশে অনেক পরিবর্তন হয়েছে তবু পরিবর্তন হয়নি সে দেশের নেতার জীবনে। কঠিন পরিশ্রম করে তিনি আজ জীবনের প্রান্তদেশে এসে দাঁড়িয়েছেন। বয়স তাঁর ৬৬; শ্রীঅরবিন্দ নেবার থেকে তিন বছর কম। প্রৌঢ়ত্বের ছাপ —কিন্তু কর্তব্য থেকে অবসর নেবার ইচ্ছা তাঁর নেই।

এশিয়ার অন্যতম জননেতা

এশিয়া মহাদেশের তিনজন প্রধান জননেতার নাম করতে হলে, অগুরবদান নেহরু ও মাওসে-তুঙ-এর পরই ডাঃ হো-চে উল্লেখ করতে হয়। চীন ও ভারত বিহাট দেশ। ইন্দোচীন, বা এখন ভিয়েৎনাম নামে আখ্যাত, আয়তনে ক্ষুদ্র; লোকসংখ্যায় অনেক কম, মাত্র আড়াই কোটি।

সেদেশ এখন দু'ভাগে বিভক্ত—উত্তর ভিয়েৎনাম এবং দক্ষিণ ভিয়েৎনাম। দুটি স্বতন্ত্র সরকারের অধীনে। উত্তর ভিয়েৎনাম বা ভিয়েৎনামের গণতান্ত্রিক রিপাবলিক—ডাঃ হো এই অংশের প্রধান বা প্রেসিডেন্ট। দক্ষিণ ভিয়েৎনাম বা ভিয়েৎনাম রিপাবলিক—বাঁর প্রেসিডেন্ট বুগো ডিন ডিয়েম—আমেরিকান স্বাধীন—স্বাধী প্রভুত্বের দেশানে অধনাম রয়েছে, কিন্তু জনগণই সে আবেরিকার আওতার এখিরে যাচ্ছে।

দেশটি ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু যে সংগ্রামের মধ্যে সে স্বাধীনতা অর্জন করেছে, তা ছোট নয়। আজ ডাঃ হো-র সংগ্রাম নতুন আকার নিয়েছে। আন্তর্জাতিক রাজনীতির খেলায় দু অংশের মিলন ডাঃ হো-র সামনে এক নতুন সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

১৯৪৪র প্রথম দিক। ফরাসী সৈন্যবাহিনী ডাঃ হোর শিপুরদ আবির সামনে ক্রবেই পিছু হটছে। একটা বিপর্যয় তাদের সামনে। বাধ্য হয়ে ফ্রান্সকে সন্ধিতে রাজি হতে হয়। দুমাই মাসে জেনিভায় যুদ্ধ বিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

আন্তর্জাতিক কমিশন

দেশের উত্তরাংশে ডাঃ হোর ক্ষমতা অপ্রতিহত। দক্ষিণ অংশে ফ্রান্সের তাঁবেদারদের ঠাঁই। চুক্তি হ'ল, সাময়িক ভাবে দু'টি অংশ পৃথক পৃথক সরকারের অধীনে থাকবে এবং গণভোটের দ্বারা দেশের ঐক্য সাধন করতে হবে। যুদ্ধ বিরতির সর্ত যথাযথ পালিত হচ্ছে কিনা, তদারক করবার জন্য একটি আন্তর্জাতিক কমিশন গঠিত হয়। তার সভ্য হল ভারত, কানাডা ও পোল্যাণ্ড। যুদ্ধবিরতির জন্য ভারতের পুরোহিত ওকত্ব সর্বজনস্বীকৃত, যেমন স্বীকৃত আন্তর্জাতিক কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে তার স্থান।

বুগো ডিন ডিয়েমের নেতৃত্বে দক্ষিণ ভিয়েৎনাম অস্বীকৃতি জানিয়েছে। যুদ্ধ বিরতি মু'অংশে সমান প্রযোজ্য। কিন্তু চুক্তিতে দক্ষিণ অংশের তরফে দস্তখত দিতে সমীকার করা হয়েছিল। দস্তখত দিয়েছিল শুধু ফ্রান্স ও ভিয়েৎনামের পিপ্‌লস্ আর্মি অর্থাৎ ডাঃ হোর ফৌজ।

ডাঃ হোর ডাকত পরিচয়া শুধু শ্রীনেহরুর ১৯৫৪ সনের অক্টোবর মাসের হ্যানয় পরিদর্শনের পরিবর্তে শৌজন্যমূলক ঘটনা নয়। এর গুরুত্ব রাজনৈতিক তাৎপর্য আছে। কি করে যুদ্ধবিরতির চুক্তি সম্পূর্ণ পালিত হতে পারে তা নিয়ে ডাঃ হো শ্রীনেহরুর সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করবেন, কোন সন্দেহ নেই। সেটিই তাঁর সফরের মুখ্য উদ্দেশ্য।

ষোড়শ শতাব্দীতে ফ্রান্স ইন্দোচীনে তার স্বার্থ বিস্তারে প্রবৃত্ত হয়। এ এলাকায় অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী দেশের যে কোপদৃষ্টি ছিল, ফ্রান্সেরও তাই। প্রথম আসে এক্সেন বিশনারী। রাজনৈতিক ক্ষমতা বিস্তারে প্রায় দু'শ বছর লেগে যায়। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে শতাব্দীর শেষ চতুর্থাংশেও ইন্দোচীন পুরোপুরি ফ্রান্সের অধিকারে আসে বলে ওঠেনি; কেবল এক পুতুল রাজা বসান হয়েছে কোচিন চীনে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এলাকাটি ইন্দোচীন নামে ফ্রান্সের সম্পূর্ণ করায়ত্তে আসে।

● ডাঃ হো চি মিন ঃ ঝড়ো জীবনের পথিক

১৮৯২ সনে ডাঃ হো চি মিনের জন্ম হয়। মধ্যবিত্ত সরকারী কর্মচারীর সন্তান তিনি। অতি অল্প বয়সেই রাজনীতির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে। শতাব্দী শেষ হবার সময় ইন্দোচীনে নতুন জাতীয়তাবোধের অভ্যুদয়ের সূচনা হয়। তখনকার অতি ঘোলাটের জাতীয় আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল বলে তাঁর পিতার পদচ্যুতি ঘটে।

বছর আটেক বয়সে তখন ডাঃ হোর ছোট ছেলে, পিতা তাঁর নাম রেখে ছিলেন, নগুয়েন আই কুয়ক। পিতার পদচ্যুতি তাঁর উপর গভীর ছাপ রেখে গেছে নিশ্চয়। এ বয়সে থেকেই ডাঃ হো জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে ক্রমে জড়িত হয়ে পড়েন।

১৮ বছরে তিনি দেশ ছেড়ে সমুদ্র পাড়ি দেন। গন্তব্যস্থল ফ্রান্স। স্বাধীন যুদ্ধে গেল যখন একটি ফরাসী জাহাজে তিনি রসুইখানার বয়ের চাকরী পেলেন। জাহাজে কাজ তিনি বেশীদিন করেন নি। তখনও প্রথম যুদ্ধ শুরু হয় নি। প্যারিসে তিনি একটি ফটোগ্রাফারের দোকানে কাজ নেন। এ কাজ করবার সময়ে তিনি সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে ঘোগাযোগ স্থাপন করেন।

অবশ্য তখন এবং তারও অনেক বছর পর পর্যন্ত ফ্রান্স এবং দেখার পুরোজেবীরতা অনুভব করেন নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও সাম্রাজ্যবিরোধী আন্দোলন যে দানিবে রাখতে পারে নি। প্রথম যুদ্ধোত্তর যুগে এশিয়ার যেসে দেশে গণ আন্দোলনের যে ঢেউ প্রসারিত হয়েছিল ইন্দোচীন তা থেকে বাদ পড়েনি।

হো-র কমিউনিষ্ট মতবাদ গ্রহণ

ফ্রান্সের সোশ্যালিষ্ট আন্দোলনের সঙ্গে ডাঃ হোর সংযোগ বখন গভীর হয়েছে, তখন এই আন্দোলনেরই এক নতুন পরিণতির উদ্ভব হয়। তৃতীয় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; ফ্রান্সের সোশ্যালিষ্ট পার্টি ভিতর হতে ভেঙ্গে এক খণ্ড কমিউনিষ্ট পার্টি হয়ে বের হয়ে দিল। ডাঃ হো এই অংশের সঙ্গে যুক্ত হলেন। সেদিন থেকে কমিউনিষ্ট মতবাদ বা কার্যপদ্ধতি সম্বন্ধে তাঁর বিশ্বাস কখনো টলে নি। ১৯২৩সনে তিনি মু'বছরের জন্য মস্কো যান, কমিউনিষ্ট আন্দোলনের কলা-কৌশল শিখতে।

ইতিমধ্যে তাঁর নাম ফ্রান্সের এবং ইন্দোচীনের সরকারী মহলে হড়িয়ে পড়েছে। তাদের কাছে তিনি বিপজ্জনক ব্যক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর পক্ষে ইন্দোচীনেরিয় প্রবেশ করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। মস্কো থেকে তিনি আসেন ডেনমিনুস চীনের বিপ্লবের অন্যতম কেন্দ্র ক্যাণ্টনে।

ভিয়েৎনাম কমিউনিষ্ট আন্দোলনের প্রাথমিক সাংগঠনিক কাজ ক্যাণ্টনেই সুরু হয়—নির্বাসিত রাজনৈতিক কর্মীদের মধ্যে। ডাঃ হো-চে পরের কয়েক বছর কাটান হাংকং শ্যাম, দক্ষিণ চীন প্রভৃতি, গুপ্ত সংগঠন গড়বার এবং ভিয়েৎনামের অভ্যন্তরে বিপ্লবীদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের কাজে। ইন্দোচীনের কমিউনিষ্ট পার্টি বা সাডেং (ওয়ার্কার পার্টি) তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠা করেন ১৯৩০ সনে।

কৃষক অভ্যুত্থান

কিছুদিনের মধ্যেই উত্তর আনামে (তাঁর জন্মস্থান) এক কৃষক অভ্যুত্থান ঘটে। ডাঃ হোকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। কিন্তু ফরাসী সরকার তাঁর অবর্তমানেই তাঁর বিচার করে। ফাঁসীর হুকুম জারী হয়। সে হুকুম তামিল করবার সুযোগ ফ্রান্স আর পায়নি। বৃটীশ সরকার তাঁর উপর কিছু ঝাল ঝিটিয়েছিল ১৮ বার হংকংএর এক জেলে বন্দী করে রেখে। তিনি নাকি হংকংএ বৃটীশ আইন ভঙ্গ করেছিলেন।

দশ এগার বছর সংগঠন গড়ে তোলার কাজ চলবার পর দ্বিতীয় যুদ্ধ সুরু হয়। ১৯৪১এ জাপান ঘটিকা যুদ্ধে আমেরিকান, বৃটীশ ও ফরাসীদের দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার ঘাঁটিগুলো দখল করে নেয়। ঐ সময়েই ডাঃ হোর নেতৃত্বে ভিয়েৎমিন্ হ সংগঠন গড়ে ওঠে। এশিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলনই সুরু হয়ে গেল।

ফরাসী কাইসেরের নেতৃত্বে কুয়োমিণ্টাং চীন ডাঃ হো-র কার্যকলাপ কোনদিন ভুলবারে দেখে নি। ইন্দোচীনেরই উপর তারও নজর ছিল। ১৯৪১এ কুয়োমিণ্টাং সরকার ডাঃ হোকে গ্রেপ্তার করেন। তাঁর আপাত বিরোধী সংগ্রাম তাঁকে কুয়োমিণ্টাংএর আক্রোশ থেকে রক্ষা করতে পারে নি।

কিছুদিনের মধ্যেই তিনি মুক্তি পান। ১৯৪৫এ যুদ্ধের অবস্থা সম্পূর্ণ বদলে গেল। পশ্চিমে জার্মানী পরাজিত হয়েছে এবং পূর্বে জাপানের পরাজয় হয় হয়। হিরোশিমা ও নাগাসাকী আনবিক বোমার বিধ্বস্ত। জাপান দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন অংশ থেকে পশ্চাদ-পসরণে বাধ্য। সবত্র অঞ্চলের ভাগ্যনিয় বদলে গেছে—পরিবর্তন ক্ষেত্রে ইন্দোচীনে দেখা দিয়েছে পুণ্যতা।

বিচক্ষণ রাজনীতিক ডাঃ হো-এ সুযোগ গ্রহণ করলেন। ফ্রান্স, বৃটেন ও আমেরিকা আসবার আগেই তিনি ইন্দোচীনের জাতীয় মুক্তি ফৌজ গঠন করলেন। ঘোষণা করলেন পূর্ণ স্বাধীনতার।

একমাত্র তাঁর হাতেই তখন সংগঠিত স্বেচ্ছাসেবকের ফৌজ। জাপানীদের হাত থেকে বিছু সরকার-পরবর দখল করা হয়েছে। তিনি উত্তর ভিয়েৎনামে সাম্রাজ্যবাদ উৎখাত করে এবং কমিউনিষ্ট নেতৃত্বে জাতীয় সরকার গঠন করলেন। শত চেষ্টা করেও ফ্রেঞ্চ ফৌজ চীনা ভাগে বুটেন ও আমেরিকার শুভেচ্ছা ও সাহায্য পেয়েও ফরাসীরা আর সেখানে ফিরতে পারবে নি। ১৯৪৫এর ২রা সেপ্টেম্বর ভিয়েৎনামে গণতান্ত্রিক রিপাবলিকের ঘোষণা করা হয়। ডাঃ হো তখন থেকে এ রিপাবলিকের প্রেসিডেণ্ট পদ অধিকার করে আছেন। কিছুদিন তিনি প্রেসিডেণ্ট ও প্রধানমন্ত্রী দুই ছিলেন।

কিন্তু দীর্ঘ বরুকরী সংগ্রাম তাঁকে করতে হয়েছে। ১৯৪৫এর শেষে ফ্রান্স কতিপয় ধেসেজারীর সহায়তায় দক্ষিণ ভিয়েৎনামে প্রবেশ করে। কিছুদিন হোচে ঘাঁটি সুরু চলবার পর ১৯৪৬এর মার্চে সুদ্ধ বিরতি চুক্তি হয়। ফ্রান্স, ইন্দো-চীনা ফেডারেশনের মধ্যে ভিয়েৎনামের ফেডারেটিক রিপাবলিককেও একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে মেনে নিতে বাধ্য হয়। কিন্তু চুক্তি পাকা করবার কথা ছিল ফ্রান্সে। এই সময়েই ডাঃ হো কথকতা হয়ে ফ্রান্সে যান।

ব্যাপক যুদ্ধ সুরু

চুক্তির কথাবার্তা ব্যর্থ হলে ডাঃ হো স্বদেশে ফিরে আসেন। এর পর যুদ্ধ পুরোপুরি সুরু হয়। আট বছর পর বহু রক্তক্ষয়ের মধ্যে ফ্রান্সের সম্পূর্ণ পরাজয় ঘটে। ভিয়েৎনাম চিরতরে ফ্রান্সের করবমুক্ত হল।

দ্বিতীয় বিমান ঘাঁটিতে অভ্যর্থনা করবার সময় শ্রীনেহরু বলেন ডাঃ হো সম্বন্ধে অনেক কিংবদন্তি ছড়িয়ে পড়েছে। তিনি স্বাধীনতার নায়ক, জনপ্রিয় নেতা এবং একটি বহু রাষ্ট্রের প্রধান। উত্তরে ডাঃ হো বলেন শ্রীনেহরুর আগমনে প্রীত বন্ধু।

গত গত বছর আগে আমাদের মু'দেশের মধ্যে যোগাযোগ ছিল ঘনিষ্ঠ। সাম্রাজ্যবাদী কুটনীতি তা ছিন্ন করে দিয়েছিল। কিন্তু এক অপরের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি সহানুভূতির ধারা আবার সরল যোগাযোগ স্থাপন করেছে। ইন্দোচীনে যুদ্ধবিরতির জন্য শ্রীনেহরুর নেতৃত্বে ভারত যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়, তাতে দুদেশের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। ১৯৫৪র অক্টোবর মাসে শ্রীনেহরু হ্যানয় বিয়েছিলেন মাত্র এক দিনের জন্য। কিন্তু তার কলে সে বন্ধুত্ব দৃঢ় হয়। ডাঃ হো-র ভারত ভ্রমণের ফলে দুটি দেশ আরও নিকটতর হবে।

শ্রীনেহরু ও ডাঃ হো মু'জনেই শান্তি চান।

মু'জনেই পঞ্চশীলের প্রতি বিশ্বাসরোধণা করেছেন। হ্যানয় ভ্রমণের পর শ্রীনেহরু লিখিত-এ বলেছিলেন শান্তিপ্রিয় মানুষ বলে ডা। হো আমার মনে স্থান রেখেছেন। ডাঃ হো শ্রীনেহরুকে কত্তা দিয়েছিলেন, ভিয়েৎনামের মু'অংশের ঐক্যসাধন করতে চান শান্তিমূলক পথে। সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত ব্যর্থ করে তা সম্ভব কিনা সে কথা একমাত্র ভবিষ্যৎ বলতে।

ডাঃ হো-র কমিউনিষ্ট পার্টি ব্রত তত্ত্বগতভাবে শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি। কিন্তু তাঁর সাফল্যের প্রধানতম কারণ তিনি কৃষক সমাজকে আয়া অর্জন করতে পেরেছিলেন, অন্যান্য ঔপনিবেশিক দেশের মত ইন্দোচীনেও ভূমি সমস্যা ছিল প্রধান ও সুরুর বস্তুা। উত্তর ভিয়েৎনামে তা সমাধান হয়েছে বা হবার পথে। যুদ্ধ চলা কালেই এ সমস্যা সমাধানের পুরোদমে চালছে। কৃষক সমাজ যখন শিক্ষিত হয়েছে ভিয়েৎ-বিনের সংগ্রামে তাদের ভূমিবাড়েজ সংগ্রামের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, কোন পথ বেছে নিতে হবে তখন তাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে।

ডাঃ হো কমিউনিষ্ট। কিন্তু অতি বিচক্ষণতার সঙ্গে তিনি কমিউনিষ্ট আন্দোলনকে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের পুরোভাগে রাখতে সক্ষম হয়েছেন। এ এক জন্য অবস্থা ফ্রান্সের বুর্জোয়া-বাদী দেশ ও রীতি অনেকদিন নাকী। এক সময় তাদের এসে বাঁড়িয়ে ছিলেন। ডাঃ হোর নেতৃত্বে উত্তর ভিয়েৎনাম আজ নিশ্চিতভাবেই কমিউনিষ্ট আগর্পে পরিচিত হয়েছে।

কমিউনিষ্ট উত্তর ভিয়েৎনামের সঙ্গে বন্ধুত্ব আছে বলে ভারতের কমিউনিষ্ট বিরোধী দক্ষিণ ভিয়েৎনাম সরকারের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রেই তা নয়। গত নভেম্বর মাসে শ্রীনেহরুর আমন্ত্রণে দক্ষিণ ভিয়েৎনামের রাষ্ট্রপতি নু'য়ো ডিন ডিয়েম পাঁচ দিন ভারত সফর করে গেছেন। সফরশেষে তিনি ও শ্রীনেহরু এক যুক্ত বিবৃতি প্রচার করে বলেছেন দুনিয়ার সামনে আজ শান্তি রক্ষাই প্রধান কর্তব্য। ভিয়েৎনামে শান্তিবজায় জন্য ভারতের ভূমিকারও উল্লেখ করা হয়।

ডিয়েম অবশ্য গণভোটের দ্বারা দেশের ঐক্য সাধনের বিরোধিতা ত্যাগ করেন নি। তাঁর আস্থা পশ্চিমীদের উপর। ভারত ত্যাগের প্রাক্কালে তিনি বলেন, তাঁর দেশ আজ জাতিক রাজনীতিতে নিরপেক্ষ। কথিত ভিয়েৎনাম সিয়াটো চুক্তির মধ্যে নেই, কিন্তু তাঁর দেশকে কমিউনিষ্টদের থেকে রক্ষার জন্য সিয়াটোকে তিনি স্বাগত জানান।

উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েৎনামের বিষম সুদূরপ্রসারত দল বাড়ছে, বেশ পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানী বা উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার বিষম সুদূরপ্রসারত।

ভারতে জনসংখ্যা নীতির প্রয়োজনীয়তা

[অধ্যাপক বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়]

আমাদের দেশের দারিদ্র্যের কথা সর্বজনবিদিত। তার নানারকমের কারণ আছে—সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক। কিন্তু একথা অস্বীকার করা খুবই শক্ত যে, নানা কারণের মধ্যে প্রধান ভূমিকা অধিকার করে আছে আমাদের শ্রমের স্বল্প উৎপাদনশীলতা।

শ্রমের স্বল্প উৎপাদনশীলতার জন্য দায়ী আমাদের জনসংখ্যার অনুপাতে জমি ও মূলধনের স্বল্পতা। অবশ্য নানারকমের ব্যবস্থা দ্বারা জমির যোগান কিছুটা বাড়ান যায়, কিন্তু খুব বেশী নয়। আমাদের গরীব দেশের পক্ষে তাড়াতাড়ি বেশ কিছু মূলধন যোগাড় করা কতখানি শক্ত, সেটা সাধারণ বুদ্ধিতেই বোঝা যায়, তারজন্য অর্থনীতির জটিল তত্ত্বের অবতারনা করতে হয় না।

সুতরাং ব্যাপারটা এসে দাঁড়াচ্ছে এই যে, আমাদের এই অভাব্য সম্পত্তিতে বর্তমানে যেটুকু শিল্পোন্নতি করা সম্ভব, সেটুকু বজায় রাখতে গেলে, আমাদের দেশের জনসাধারণের জীবন মানের সামান্য একটু উন্নতি করতে হলে, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা বোঝা যায় আরও একটা দিক দিয়ে। ইউরোপীয় দেশসমূহের ইতিহাসে দেখতে পাই যে, শিল্প বিপ্লবের পরেই বেশ কিছুদিন ধরে জন্মহার খুব বেশী হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তার কারণ হল যে, শিল্প বিপ্লবের ফলে শিল্পোন্নতি, তার ফলে আর্থিক উন্নতি, জীবন যাত্রার পরিবেশে অনুকূল পরিবর্তন, ফলে মৃত্যুহার কমে যায় এবং মোট জনসংখ্যা বাড়তে থাকে। এই আমরা দেখি অন্যান্য বর্তমানে উন্নত দেশগুলির ইতিহাসে।

সুতরাং ভারতেও শিল্পোন্নতি হবার সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুহার কমবে বলাটা নিশ্চয়ই অযৌক্তিক নয়। একটা খুব ছোট উদাহরণ দেওয়া যাক। আমাদের বর্তমান জন্মহার যদি যা আছে তাই থাকে আর মৃত্যুহার যদি কমিয়ে ফেলা যায়, যেটা করা মোটেই শক্ত নয়, তাহলেই মোট জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারটা এখন যা আছে তার চেয়ে বেশী হয়ে গেল। যেমন আমাদের দেশের প্রচুর সংখ্যক লোক ম্যালেরিয়ায় মারা যায়, অথচ আজকের দিনে চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নতির ফলে একজনেরও ম্যালেরিয়ায় মরার প্রয়োজন নেই। এই ম্যালেরিয়ার মরণ রোধ করতে পারলেই আমাদের মৃত্যুহার কমে গেল অনেকখানি। এবং মৃত্যুহার যথাসম্ভব কম করাটাই সর্বজন কাম্য। কিন্তু অবস্থাটা তাহলে কি হবে, মৃত্যুহার কমে গেল, জন্মহার বেড়ে গেল, এই ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জীবন যাত্রার, মানুষের মত বেঁচে থাকার কি ব্যবস্থা কি রকম হবে?

এখানেও আমরা আর একবার পাশ্চাত্যের দিকে তাকাতে পারি। সেখানেও ঠিক এই অবস্থার উদ্ভব হয়েছিল। সেখানেও মৃত্যুহার কমার পর প্রায় সত্তর পঁচাত্তর বছর ধরে জন্মহার বেড়েই চলেছিল। এবং শিল্প বিপ্লবের পরেই সারা জগতে যে পাশ্চাত্যের অভিযান তার কারণ অনেকখানি খুঁজে পাওয়া যাবে এই বিবর্ধমান জনসংখ্যার ভিতর। এবং সেখানে আরও একটা জিনিষ ছিল যার জন্য দ্রুত বর্ধমান জনসংখ্যার সঙ্গে সঙ্গে জনসংখ্যার তাল রেখেও জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নত হতে পেরেছিল, সেটা হল তাদের অভূতপূর্ব শিল্পোন্নতি। এই জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঘটেছিল শিল্পবিপ্লবের পরে, সুতরাং এই সময়ে যে সমস্ত নতুন নতুন শিল্পের চাকা ঘুরতে আরম্ভ করল, সেই সব চাকা ঘোরানর জন্য এই জনসংখ্যারই প্রয়োজন ছিল।

আজকের দিনে পিছনের দিকে তাকিয়ে দেখি যে তখন এই বর্ধিত জনসংখ্যা আধুনিক উৎপাদন পদ্ধতি, শিল্প ও বাণিজ্য নীতির উদ্ভবের কার্য্য ও কারণ দুইই। আর সবচেয়ে বড় কথা যে, তখন জনসংখ্যা সমস্যা হয়ে দাঁড়ালে কিছু লোক এক দেশ থেকে আর দেশে যেয়ে বাস আরম্ভ করতে পারত। কিন্তু এই পটভূমিকায় আমাদের দেশের প্রতি তাকিয়ে কি দেখি? প্রথমতঃ ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপীয় দেশসমূহের জনসংখ্যার ঘনত্বের অপেক্ষা আমাদের দেশের আজকের জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশী। দ্বিতীয়তঃ, আমাদের আজ এ সুযোগ নেই যে আমরা কোন বিদেশে ঔপনিবেশিক হিসাবে বাস করতে আরম্ভ করব। সুতরাং এ-অবস্থায় একমাত্র আশা নিজেদের শক্তিসামর্থ্য। তাও খুব বেশী বলে মনে হয় না।

১৯৫১র আদমসুমারী

১৯৫১ সালের আদমসুমারী রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, জন্মনিয়ন্ত্রণ না করা হলে, ভারতীয় জনসংখ্যা ১৯৫১র ৩৬ কোটি থেকে ১৯৬১তে ৪১ কোটি, ১৯৭১রে ৪৬ কোটি এবং ১৯৮১তে হবে ৫২ কোটি। প্রশ্ন হচ্ছে যে, এই জনসংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে খাদ্যোৎপাদন সম্ভব কিনা। আজকের মাথাপিছু খাদ্যের হিসাবে দেখা যায় যে, ২৪ জনের ১ বছরে ৫টন খাদ্যের প্রয়োজন। এই হিসাবে ১৯৮১ সালে আমাদের ১০·৮০ কোটি টনের প্রয়োজন।

ঐ রিপোর্টেই আছে যে, ১৯৫১ সালে আমরা উৎপন্ন করেছি ৭.৫০কোটি টন। শতকরা হিসাবে বললে বলতে হয় যে ১৯৮১ সালে ১০.৮০ কোটি টন খাদ্যোৎপাদন করতে হলে আমাদের ১৯৬১তে ২১%, ১৯৭১রে ৩৭% ও ১৯৮১তে ৫৪% হারে উৎপাদন বাড়াতে হবে। এই রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, সমস্ত রকম যান্ত্রিক উন্নতির কথা ধরেও বলা যায় যে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির এই প্রতিযোগিতায় ১৯৭১র মধ্যেই জনসংখ্যার জয়ের সম্ভাবনা। পরিশেষে এই রিপোর্ট লেখকের মতে আমাদের একমাত্র কর্তব্য জন্মনিয়ন্ত্রণের দ্বারা জনসংখ্যাকে এমন ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যাতে জন্মহার মৃত্যুহার অপেক্ষা বেশী না হয়ে যায় এবং মোট জনসংখ্যা ৪৫ কোটিতে পৌঁছবার আগেই যাতে দাঁড়িয়ে যায়।

এতক্ষণের আলোচনার ফলে আমরা কয়েকটা কথা জোর করে বলার মত জায়গায় এসে পৌঁছেছি। সেটা আর কিছুই নয়। সেটা হল এই যে, মৃত্যুহার কমা আর জন্মহার কমার মধ্যে একটা সময়ের ব্যবধান থাকে, সেটাকে যথাসম্ভব কমিয়ে আনতে হবে। অর্থাৎ জনসংখ্যা সম্বন্ধে চাই সুনিশ্চিত নীতি এবং সেই হিসাবে কাজ।

অবশ্য জনসংখ্যানীতির প্রয়োজন একথা বোঝা, বলা আর সেই হিসাবে কাজ করা, আমাদের দেশে খুবই শক্ত। তার কারণ প্রধানতঃ সামাজিক পরিবেশ ও আমাদের জীবন ধর্মের প্রাধান্য। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ইত্যাদি সম্বন্ধে আমাদের গতানুগতিক ধারণাগুলি এখনও এত প্রবল, এখনও আমরা সেগুলিকে এমনভাবে সত্যাসত্য ন্যায়ের একমাত্র রূপ বলে আঁকড়ে পড়ে আছি যে আমাদের মানসিক জগতের পরিবর্তন প্রচুর সময় ও শিক্ষাসাপেক্ষ। আর সেই পরিবর্তন ছাড়া কোন বড় রকমের পরিবর্তন, কি সামাজিক কি অর্থনৈতিক, সম্ভব নয়।

তাছাড়া দারিদ্র্য, অশিক্ষা প্রভৃতির জগদ্দল পাথরও রয়েছেই। অথচ আজও আমরা বসে রয়েছি, 'পথপ্রান্তে নত করি মাথা ক্লান্ত ধৈর্য্য প্রত্যাশার পূরণের লাগি দৈবাগত দিনে,' যখন জগতের আর সব জাতি 'জীবন গ্রন্থে নব নব পৃষ্ঠা উলটিয়ে' চলেছে। এবিষয়ে আমাদের সরকারের কথাও মোটেই আশাপ্রদ নয়। সরকার থেকে কিছু চেষ্টা যে না হচ্ছে তা নয়, কিন্তু তা সমস্যার তুলনায় এত স্বল্প যে, সিন্ধুর সাথে বিন্দুর সম্পর্কের কথা মনে আসে।

আজ আমাদের দেশে বড় বড় পরিকল্পনা হয় নানা রকম অর্থনৈতিক কাজের জন্য। কিন্তু কই দেশবাসীকে একথাটা বোঝানর চেষ্টা কোথায় যে অর্থনৈতিক উন্নতি এমন একটা জিনিষ নয় যেটা সমাজ জীবনের আর সব দিককে যেমন তেমনি রেখে করে ফেলা যায়। এবং একথা বললে বোধহয় অন্যায় হবে না যে, সেই অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য মূলধন যতখানি প্রয়োজন, একটা বিশেষ মানসিকতার প্রয়োজন তার চেয়ে কোন অংশে কম নয়।

তাই, আজ আমাদের বোঝার দিন এসেছে যে, আমরা যদি সত্যই একটা আধুনিক উন্নতিশীল জাতি হিসাবে পরিগণিত হতে চাই, তাহলে শুধু সরকারী প্রচেষ্টা ও বিশেষ ক্ষেত্রে সীমিত প্রচেষ্টা, যথেষ্ট নয়। গোটা ভবিষ্যতটা আমাদের পড়ে রয়েছে সামনে, কাজ রয়েছে প্রচুর, সাধারণের মধ্যে যদি এ বিষয়ে কোন উদ্দীপনা না জাগে, তাহলে আশা খুবই কম।

আর এটাই সরকার, বুদ্ধিজীবীদের কাজ, সেই উদ্দীপনা, সেই আশা, একটা বিরাট কিছু করছি এই মনোভাব জাগিয়ে তোলা, আক্ষরিক অর্থে আমরা ইতিহাসে গড়তে পারি, গড়ছি এই মনোভাব জাগান প্রয়োজন। এটাই আজ জাতির কাছে ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ, আমরা তা গ্রহণ করব কিনা, তার উপরই সব নির্ভর করছে।

দর্পণ

(একমাত্র বাঙলা সংবাদ সাময়িকী)

চাঁদার হার

ত্রৈমাসিক——তিন টাকা

ষাণ্মাসিক——ছয় টাকা

বার্ষিক——বারো টাকা

দর্পণ প্রতি শুক্রবার নিয়মিত প্রকাশিত হয়,

যে কোন সংখ্যা থেকে গ্রাহক হওয়া যায়।

টাকা কড়ি পাঠাবার ঠিকানা—

ম্যানেজার, দর্পণ
৭নং চিত্তরঞ্জন এভেনিউ
কলিকাতা—১৩

সঙ্কটের মুখে পশ্চিমবঙ্গ—

উদ্‌বৃত্ত জেলাগুলিতেও আজ খোরাক নাই

গ্রাম বাঙলায় সাইন বোর্ড ঝোলে 'এখানে আমেরিকান চাউল বিক্রয় হয়'

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

বালুরঘাটে ভুষলার মাঠে আদিবাসীদের পচাই উৎসব চলেছে। ধানবোনা, ধান কাটা আর ধানঝাড়াই হলে এরা তিনবার এমনি পচাইয়ের হাঁড়ি নিয়ে পুকুরপাড়ে বসে। পাশের গাঁয়ের এক অফিসার গরুর গাড়ীতে ক'রে কয়েক বস্তা ধান নিয়ে যাচ্ছিল। বললো, ন'বিঘে জমি চাষ করে বার মণ ধান পেয়েছে। "এতে খরার মাসও যাবেনা।"

মুর্শিদাবাদ, মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর গ্রামে গ্রামে দিন পনের ঘুরে এসেছি। সব জায়গাতেই প্রায় একই অবস্থা। বৃষ্টি হয়নি, তাই ধান ভাল হয়নি। মুর্শিদাবাদে এর আগের বছর বাণের জলে অনেক ধান নষ্ট হয়েছিল। এবার জলের অভাবে হতে পারেনি, তবে বাণের বছর থেকে কিছুটা ভাল হয়েছে বলে মনে হল।

মালদহে যে ধান হয়েছে তাতে সারা জেলার মাস চারেকের খোরাক হতে পারে। 'ধানের জেলা' পশ্চিম দিনাজপুরের কোন জায়গায় হয়েছে বিঘে পিছু দশ সের, কোথাও চারমণ। কার্ত্তিক মাসে জল হয়নি। চাষীর অঙ্কুর শুকিয়ে হয়েছে চিটে। বালুরঘাট সহরে একটা চালের দোকানে সাইন-বোর্ড ঝুলছে, "এখানে আমেরিকান চাউল বিক্রয় হয়।"

আকাশে জল নেই, তাই চাষীর চোখে জল। ক্ষেতমজুরদের কাজ নেই, অনাহারি। কে দেবে কাজ? সরকার রিলিফের কাজ দিয়ে তাঁদের কোনওমতে বাঁচিয়ে রেখেছেন। গম আর বেগুণ সেদ্ধ খেয়ে তারা দিন কাটাচ্ছে। এক সরকারী কর্মচারীকে একথা বলাতে তিনি বললেন, "কেন—বেগুণতো বেশ পুষ্টিকর খাদ্য, মশাই।"

এই আবার বাংলার ছবি। চারিদিকে "ঘাটতি ঘাটতি" করে চেচামেচি শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু কতটা আমাদের ঘাটতি হবে তা কি কেউ জানেন? সরকারী পরিসংখ্যান বিভাগের যে হিসেব, কৃষিবিভাগের হিসেবের সাথে তার কোন মিল নেই। কেউ বলছেন, বারো লাখ মণ ঘাটতি, কেউ বলছেন, আট লাখ মণ।

এমন আশার কথাও শোনা যাচ্ছে যে ঘাটতি আরো কমে গিয়ে ছ লাখ মণেও দাঁড়াতে পারে। ঘাটতি কমুক তাতে সবাই খুশী হবে, কিন্তু সরকারী তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতির কোন উন্নতি না হ'লে সরকারী হিসেবের উপর লোকের আস্থাতেও ঘাটতি পড়ে যেতে পারে।

বার বার কেন খাদ্যে ঘাটতি হচ্ছে সেটাই ভাববার কথা। বন্যাও অনাবৃষ্টি ছাড়া কি আরও কোন কারণ আছে? মুর্শিদাবাদে অনেকে বলেছেন, চাষের জমির পরিমাণ এ বেলায় আগের থেকে অনেক বেড়ে গেছে, কিন্তু সব ধান তেমন বেশী হচ্ছেনা। পাট, আখ, কাপাসের চাষ বেড়েছে। ধানের দাম কম, তাই মজুরী পোষাবেনা এই ভয়ে অনেক চাষী ধানের চাষ কমিয়ে দিয়েছে।

পশ্চিম দিনাজপুরে শুনেছি, যে সমস্ত শিক্ষিত ভদ্রলোক আগে মাঠে দাঁড়িয়ে চাষের তদারক করতেন তারা আজকাল আধিয়ারদের হাতে সব ছেড়ে দিয়ে চাকরি বাকরি বা ছোটখাটো ব্যবসায় মন দিয়েছেন। জমির উর্বরতা কমে যাচ্ছে বলে অনেকের ধারণা। মাঠে আজকাল আর গোবর পড়ে থাকতে পারেনা। গ্রামের দুঃস্থ লোকেরা তা কুড়িয়ে নিয়ে দু চার পয়সায় বাজারে বিক্রি করে।

নিরক্ষর আদিবাসীর কঙ্কালসার বলদ দিয়ে জমি চাষ করে। লাঙলের ফাল ইঞ্চি চারেকের বেশী মাটিতে ঢোকেনা তারপর পিতৃপুরুষের আশীর্ব্বাদ যদি সময়মত একটু জল হয়, খাব করা দুটো বীজ ধান সে ছড়িয়ে দেয় মাঠে। সবুজ ধান গাছ যখন জলের অভাবে হলদে হয়ে আসে, আদিবাসী তাকিয়ে থাকে আকাশের দিকে। জল দাও।

মালদহের গাজোল থানা। এক পশলা বৃষ্টি হয়েছে। রাস্তার পাশে ঢাকি খানেক বৃষ্টির জল হয়েছে। এক চাষী তার নিজের জমির কাছে নালার ওপর কাদামাটির বাঁধ দিচ্ছে। ঐ বৃষ্টির জলটুকু আটকে রেখে, হাড়িতে করে তুলে সে কাছের জমিটার যাবন ধানের চারাগুলিকে কোনমতে বাঁচিয়ে রেখেছে।

সে বললো, ঐ দেখুন, আমার আর ছ বিঘে ধানের জমি। জলের অভাবে কিছুই করতে পারিনি। এ সব কয়েক বছর আগের কথা। এবার গিয়ে দেখলাম গাজোলের মাঠে ধান হয়নি। শহরে এসে শুনলাম, আগেকার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট হিসেবে করে দেখেছিলেন যে সারা জেলায় গভীর নলকূপ আর খালের ব্যবস্থা করতে খরচ পড়বে প্রায় ১৪ কোটি টাকা।

পশ্চিম দিনাজপুরের মাঠে আগে অনেক পুকুর ছিল। জমিদারীর আমলে চাষীরা দিনে পয়সায় তা থেকে জল পেত। সে সবপুকুরের অনেকগুলি মজে গেছে। সরকার তার কতকগুলি সংস্কার করেছেন। এতে চাষীদের কিছু উপকারও হয়েছে, কিন্তু ঐ পুকুরগুলি সরকার মাছের চাষের জন্য ইজারা দেওয়ায়, অনাবৃষ্টির বছরে চাষীরা প্রয়োজনমত জল পাচ্ছেনা। ইজারার সর্ত হচ্ছে এই যে ইজারাদার মাছের জন্য কয়েকফুট করে জল রাখতে পারবে। অনাবৃষ্টির ফলে পুকুরের জল যখনকমে যায়ই, ইজারাদার চাষীদের জল দেয়না, বলে—মাছ মরে যাবে। চাষী জলের জন্য সরকারকে ট্যাক্স দিয়েও জল পায়না।

তিনটি জেলায় ঘুরে যা দেখে এসেছি আমার মনে হয়, চাষের উন্নতি করতে হলে সেচের জল চাই। যতই টাকাই লাগুক পুকুর কেটে, নলকূপ ও পাম্প বসিয়ে সরকারকে এ কাজ করতেই হবে। দরকার হ'লে নয়াদিল্লী থেকে এ টাকা আনতে হবে।

তারপর চাই ঢেকির পুনর্ব্বসতি। পশ্চিম দিনাজপুরে আজ ৩০ টি চালকল চলছে। এর ফলে, হাজার হাজার ক্ষেত মজুর ও দুঃস্থলোক উপোস করছে। মাঠে যখন কাজ থাকতনা, তখন এরা ঢেকিতে ধান ভেনে কিছু চাল, কুড়ো পেত। তুষ দিয়ে আর শুকনো পাতা দিয়ে রান্না করত। এখন তারা চার পাঁচ মাইল দূরে গিয়ে রিলিফের কাজ খোঁজে, কখনও পায়, কখনও পায়না। সরকার ধান কিনে যদি ওদের দিয়ে ধান ভানান, টেষ্ট রিলিফের খরচা কিছুটা কমতে পারে।

"মশাই, যতই যা করুন, চাষীদের যদি মানুষ না করতে পারেন তো কিছুই হবেনা।" একথা বলেছিলেন পশ্চিম দিনাজপুরের এক ভদ্রলোক। এই মাঠের মধ্যে যে আদিবাসী পচাই খেয়ে পড়ে আছে তাকে জাগান। আপনাদের কোন বক্তৃতাই তাদের কাছে পৌঁছায় না। নীচের দিকের সরকারী কর্মচারীরা চাকরি করে স্রেফ চাকরি।" দেখেছেন কি কেউ কোনদিন যে সরকারী খাদ্য, কৃষি বা প্রচার বিভাগের কোন অধিকর্তা রাইটার্স বিল্ডিং ছেড়ে এসে এই মাঠের মাঝে তাবু ফেলে চাষীদের সাথে দুদিন থেকেছেন, তারা কি ভাবে চাষ করে দেখেছেন, তাদের সুখদুঃখের কথা শুনেছেন?

সমালোচক ও দার্শনিক কি এক ব্যক্তি ?

—টি এস এলিয়ট

[গত বছর আগষ্ট মাসে কবি টি, এস, এলিয়টের সঙ্গে অধ্যাপক শিবনারায়ন রায়ের লণ্ডনে দু'দিন সাক্ষাৎকার ঘটে। প্রথম দিনের বিবরণ গত সংখ্যা দর্শনে প্রকাশিত হয়েছে। দ্বিতীয় দিনের কবিকর্ম ও ভাবাদর্শ, সমালোচক ও দার্শনিকের রূপ প্রভৃতি প্রসঙ্গে আলোচনা হয়। দুদিনের বিবরণটি দর্পণের জন্য বিশেষ ভাবে লিখিত।]

প্রথম পরিচয়ের ভাবগতিক থেকে আমি আগা করেছিলাম যে এলিয়টের সঙ্গে আবার দেখা হবার কোনো সম্ভাবনা আছে। কিন্তু বর্তাও দেখাটি আগাখোড়াই ভাল। শ্রীযুক্ত ভাদোরি এলিয়টের চিঠি পেয়ে কবির সঙ্গে দ্বিতীয়বার দেখা করতে বাওয়া গেল।

—"ওনলাম আপনিকা যাচ্ছেন। কতদিনের জন্য ? কোথায় কোথায় ঘুরবেন ?"

—"হাস হুকের হবে। পুরানো শিকাগোতে থাকব। কোথায় কোথায় ঘুরব ওখানে বিয়ে ঠিক করব ?"

—"বাস হুকের ...তার বাদে ওয়াশেই ত' শীত কাটবে। শিকাগোতে কিন্তু বেজায় শীত। বরফ তাওাদে নামের মধ্যে থাকে, সাইডে সাঁওা। বেশ লোটা দেখে ওভার-কোট নিতে ভুলবেন না; আর মাতি-বাইয়ে মোজাকে কলি-চাকা পর্যন্তের অর্থে রোলুবের দেশের মানুষ বলে, তাদের ব্যাপারে অবিশ্যি কুছবেশী ভাবনা নেই।"

—"তবে বৈষম আলাচিত্ত একটানিবাস ? এ বিষয়টির খোঁজ তো তাঁর কোন দিনই নেই। সাদি ফ্রাঙ্কে, আমাদের পাড়ার বাচ্চা ছেলেরা পর্যন্ত জানে—ছুটির দিনে বাবা-মা'র সঙ্গে বেড়াতে যাবার জন্য কোন্ জায়গা সবচেয়ে ভাল। কিন্তু এলিয়ট সাহেবের ওসব খবর রাখার কোনো দরকার আছে বলে মনে হয় না। তিনি যে কোথায় কি ভাবে থাকেন তা তিনিই জানেন। তাঁর কাছে ওসব প্রশ্ন করা বৃথা।

—"বিশেষ গরু নয়। আপনি বহু আগে একটা চিঠি লিখে সাক্ষাতের অনুমতি চেয়ে নেবেন। ও'র সময় দেবা আপনার পুরুষগুলোও সঙ্গে পাঠিয়ে দিতে পারেন। দেখা করলে খুশী হবেন বলেই অনুমান করি।"

—"আচ্ছা আপনি পাউণ্ডকে এ মুখের মুখের কবি বলেন। আমিও ও'র কবিতার অনুরাগী, যদিও খাঁটির না করে উপায় নেই 'ক্যান্টোস'এর অনেকখানিই আমার বোঝার সাধ্যে। কাব্যের, শুধু কাব্যের কেন, যে কোনো কিছুরই উৎকর্ষ-নিকর্ষ জানা কর-ভালো বেশি-ভালো কি করে বাচাই হয় একটু বলবেন।"

—"তবেই তো মুস্কিলে ফেললেন। বাকিবে যাচ্ছেন, এসব প্রশ্ন বিচার্তর সাহেবের জন্যে আলোচনা করেছেন।"

—"বুঝলাম, আমি বোকার মত প্রশ্ন করেছি।"

—"না না ভুল বুঝবেন না। আপনি যে প্রশ্ন করেছেন সেটা দার্শনিকের প্রশ্ন, তোতার নয়। আমি লেখক এবং পাঠক, কিন্তু দার্শনিক নই।"

—"একটু ধৈর্য ধরে বলেন।"

ধর্ম্মম ও কাব্য

—"দেখুন, মূল্যায়ন নির্ণয় দর্শনের একটা কেন্দ্রীয় প্রশ্ন। প্রথম জীবনে আমি নিজেও দর্শনের ছাত্র ছিলাম—হার্ভার্ডে, সরবোনে, কিংবুরিজ ভার্সাটিতে। কিন্তু দর্শন আর কাব্যের পথ আলাদা। যার দার্শনিকের সিদ্ধান্ত কাব্যকে হতে আপ্তর দিতে পারে, পুষ্ট যোগাতে পারে—বাস্তুর ক্ষেত্রে তাই ঘটেছিল—কিন্তু কবি যদি দার্শনিক হতে চান, তবে কাব্যের সাধনা তাঁকে চাড়তে হবে। তত্ত্বচিন্তা বড় কঠিন। একনিষ্ঠ সাধনা। তাছাড়া, এলিয়ট একটু থেমে বললেন, "তাছাড়া, কবি যত সচেতনই হোন না কেন, তাঁর কবিকর্মের স্থান অবচেতনায়। এমন কি হয়ত একথাও বলা চলে, রূপতত্ত্বের চর্চা রূপস্রষ্টার পরিপন্থী।"

—"মতলব ?"

—"মতলব মূল্যায়নের সম্বন্ধে আলোচনা করতে হল দার্শনিকের কাছে যেতে হবে। ভালো হই বা মন্দ হই, আমি কবি বাত্র। বিনয় করে বলছিনা, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে জানি, কর্মের ক্ষেত্রে আমি অনধিকারী। জীবতত্ত্বের ভাষায় বলতে পারেন, আত্মরক্ষার প্রয়োজনেই আমাকে দর্শনের পথ ছাড়তে হয়েছে।"

—"কিন্তু আপনি তো শুধু কবি নন, সমালোচনও বটেন।"

সমালোচক ও দার্শনিক

—"সমালোচক আর দার্শনিক কি এক ব্যক্তি ? সমালোচকের গোড় আর কজুরে ? সমালোচকের সার্থক হোল বা ভাল তার আবেদনে নাড়া দিতে পারা এবং তার প্রধান দায়িত্ব হোল সেই ভালোর কিসে অনেক বড়ই আবর্ষণ করা। যা ভালো, তা বে কেন ভাল, এ প্রশ্নের জবাব সমালোচকের সাধ্যের বাইরে। তা ভালো তা অনেক সময় সাধারণ পাঠকের নজরে পড়ে না —(আমি সাহিত্যের কথা বলছি) সজরে পড়লেও অনেক সময় তা মনে নাড়া তোলে না। সমালোচক সেই অবজ্ঞাত, অস্বীকৃত ভালোকে আলোচনার দ্বারা, উদ্ধৃতির দ্বারা পাঠকের সামনে পেঁছে দেন। তা-যে তিনি পারেন তার কারণ বোধহয় এই যে তাঁর অনুভূতি সহজে অনুশীলিত, স্বীকৃত সংসাহিত্যের অর্থাৎ ক্লাসিক্যুসের সঙ্গে অনেকদিনের অন্তরঙ্গতা থাকার ফলে অথাত সংসাহিত্যের আবেদনের প্রতিও তিনি সজাগ। কিন্তু ভালো বলের বুল প্রশ্ন সহজে জবাব দেবার সাধ্য তাঁর নেই ;সহজত যে দায়িত্বও তাঁর নয়।"

—"কিন্তু বিচার বিশ্লেষণও যে সমালোচনার অংশ এ কি আপনি স্বীকার করেন ? আপনার নিজের সাহিত্য-সমালোচনাতে কি ব্যবাবিচার একটা বড় স্থান জোড়েনি ?"

—"বিচার বাদ দেবার কথা তো আমি বলছিনা, বিচারের ভিত্তি নিয়ে বিচারের কথা বলছি। তাছাড়া সমালোচনার ক্ষেত্রে বিচার যত কম অংশ জোড়ে ততই বোধহয় ভাল। বিশ্লেষণের কথা স্বতন্ত্র। সমালোচকের কাজ understanding-কে জাগ্রত করা, judgement-কে নিয়ন্ত্রিত করা নয়। আমি নিজে এ ভুল অনেকবার করেছি। এবং তার কুফলও বোধহয় দেখাৰ কম হয়নি।"

—"যেমন বিলটন ?"

আমরা দুজনেই হেসে ফেললাম। ●

*এলিয়ট একজনে তাঁর নানা লেখার মধ্যে মিলটন যে উৎকর্ষ দিন নত তার ইঙ্গিত করেছিলেন। অবশ্য পাউণ্ডের মত মিলটনকে তিনি কখনো তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেন নি। কারণ তাঁর ধাত আলাদা। যাই হোক, দেখা যাচ্ছে আধুনিক কবি এবং সমালোচক তাঁদের মধ্যে থাকে, তাঁরা, এমনকি ড্রাই-ডেনের তুলনায় মিলটনে যে কবি হিসেবে নগণ্য এবিষয়ে একটা ধারণা বদ্ধমূল হয়ে যায়। ১৯৪৭ সালে এলিয়ট ব্রটাৰ ব্রিটিশ অ্যাকাডেমির এক বক্তৃতায় মিলটনের হয়ে ওকালতি করে বলেন। তাঁর যুক্তি ছিল যে, যদিও দু'দশক আগে ইংরেজ কবিদের পক্ষে মিল্‌টনের প্রভাব কল্যাণকর ছিল না, বর্তমানে মিল্‌টনকে নতুন করে আবিষ্কার করার বিশেষ প্রয়োজন আছে। তখন বক্তৃতার ছিল কাব্যের ভাষার সঙ্গে মানুষের কথা ভাষাকে থাকে। আপনি বলছিলেন, কবিকর্মের স্থান অবচেতনে। আমেন চেকনিক নিয়ে এত যে গবেষণা নিরীক্ষা, অভিজাত জীবনবাণী সচেতন অনুশীলন—এদের স্থান কোথায় ?"

ক্যাটালিটিক এজেন্ট

—"হয়ত আপনার আমার নয়, বহুকাল আগে আমি একটা উপমা ব্যবহার করেছিলাম—ক্যাটালিটিক এজেণ্টের (Catalytic agent)। সব উপমার মত এটাও উপমা মাত্র, তার বেশি নয়। অনুশীলনের দ্বারা কবি তাঁর সাবর্ণের সীমা বাড়ান, কিন্তু যে সংশেষের ফলে রূপ জনম নের তার ওপরে তাঁর কোন প্রত্যক্ষ হাত নেই। ঠিক পদার্থ খুঁজেছি, উপাদান সংগ্রহ করছি, অনুভূতিকে সুসম্বদ্ধ করার চেষ্টা করছি, কিন্তু নিজ উপাদান নিজে বা আহরণের, তা আমার ইচ্ছের কবলাগ নেবে চলেনা। কবিতার যে কবির ব্যক্তিত্বের প্রকাশ বলে তাকতে পারিনা এই বোধ তার একটা কারণ, এবং এই জন্যেই আমার কাছে কবির চরিত্র বিশ্লেষণ কবিতা-সমালোচনার অবান্তর ঠেকে। একই কবিতার নানা অর্থ করা সম্ভব আর কোনো কবিতা রূপ নেবার পর তাতে কবির অধিকার পাঠকের চাইতে বেশি নয়। তার বাদে অবশ্য এ নয়, পুরোপুরি ওপরে নির্ভর করে থাকলে কবির কবিতা বিশ্বতে পারেনা। যন্ত্র শূন্য না হলে তাতে কি শূন্য ঘর বাজে সেই শূন্যতা অর্জন কবির জীবনবাণী সাধনা।"

আমার এতিথি সিটওয়েলের কথা মনে পড়ল।

শুনেছিলাম এলিয়ট সাধারণত খুব বিভভাষী, সেখা পড়েও তাই ধারণা হিল। হয়ত এই মুহূর্তেই আপত্তকের সঙ্গে নিকট ভবিষ্যতে আবার সাক্ষাৎ হবার আশকা নেই বে বিষয়ে নিশ্চিত থাকার ফলে কিম্বা হয়ত আজই শেষের প্রথম হৈরভী বাজার নয়েরী অনেকগুও নয়ের বাঁধন সামরিকভাবে ঢিলে করে দেছ, তাই এলিয়ট সাধারণ থেকে আমার বলতে লাগলেন :

"সবচ ব্যাপারটাই যেন আপাত-বিরোধী। কবি যখন তাঁর কাব্যকর্মে যেতে আসার চেষ্টা করেন, তখন সে চেষ্টা যেন সচেতন, চেতনি দৃশ্যের। অথচ সেই চেষ্টার একটা স্তরে যখন কোনো অভিজ্ঞতা অথবা শেল, তখন তিনি নিজে আর কর্তা নন, তিনিও বাধ্যের পর্যবসিত। অর্থাৎ ব্যক্তি হিসেবে কবির যে সচেতন সাধনা তার পরিণতি তাঁর ব্যক্তিত্বের সাবত্রিক নির্বাণে। নানা অভিজ্ঞতার উপাদান গ্রহণ করে যখন একটা সম্পূর্ণরূপের মধ্যে স্থিতি পায়, সে মুহূর্তে কবির যে অবস্থা তার কোনো বর্ণন সম্ভব নয়—তাকে শূন্যতাও বলা যায়, আবার পরিপূর্ণতাও বলা যায়। অবশ্য সে অবস্থা সাময়িক। তারপর বীর্ধনি রয়ে আবার অনুশীলনের পালা—শব্দের অনুশীলন, অভিজ্ঞতার অনুশীলন, বাক্তনার অনুশীলন—যতদিন না আবার সেই রহস্যময় বিলিসনের (fusion) বন্যা দিয়ে রূপের জন্ম ঘটে। এবং তা যে ঘটবেই এবনকোন নিশ্চিততা নেই।"

চুপ করে শুনছি। এরপ কথা যে একেবারে অপরিচিত তা নয়; এলিয়টের লেখায় সেকে আমার ছাত্রাবস্থা থেকে পরিচয়। একসময়ে বহু ক্রিটিস্‌প্রাণ্টের উৎসাহে তাঁর কবিতা নাটক এবং গদ্য আলোচনা করে ধারাবাহিক দীর্ঘ নিবন্ধও লিখেছি। কিন্তু একই কথা ছাপার হরফে যে অর্থ বহন করে, কাণে শোনার সময় তাতে যেন পুচ্ছন্ন আসে কিছু ইঙ্গিতের আভাস পাওয়া যায়। আচোনা; এখন ধরকার পড়েছে গুপ্ত পরিবর্তনের হাত থেকে আমার বহু সাধনালব্ধ পুঁজি রক্ষা করা। একটা ধারণা এলিয়ট নিশ্চয়ই অনেকেই খুব ধারাল হন এবং সমালোচক নিজি সাহেব তাঁর গুরুকে যেন একতাট নেন। শোনা যায় আকাডেমির বৃদ্ধ শ্রোতারা এ ভাষণ শুনে এত উৎসুক হয়ে ওঠেন যে, তাঁদের একজন নাকি ভাষণ শুনতে শুনতে চেঁচিয়ে উঠে-ছিলেন ; a little louder please.

হয়ত বা এ শুধু আমার কল্পনা। বেকর্ডে এলিয়টের কাব্যগাঠ শুনেছি। আবাদী গলার স্বর অনাবরণের মতে শুনু একেবারে অন্যরকমের নয়।

—"চেকনিকের আবো একটা আপাত-বিরোধী দিক আছে। একদিকে তার কাজ যেমন কবি অভিজ্ঞতা যাতে তার পাঠক সবচু রূপটিতে পেঁছিতে পারে, সে বিষয়ে সাহায্য করা। অন্যদিকে সেইরূপটি পাঠক বা শ্রোতার মনে সঞ্চারিত করার ব্যাপারেও তার অংশ কম নয়। সেদিন আপনার সঙ্গে সাধারণ মানুষ ও শিল্পীর মধ্যে ব্যবধানের কথা আলোচনা করছিলাম। পরে বলে, বলা, আবার বক্তব্য আপনাকে হয়ত ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারিনি। রূপের তত্ত্ব করণ বক্তব্যটা আমার কাছেই এখনো যথেষ্ট স্পষ্ট নয়। কিন্তু যেটা স্পষ্ট সেটা হোল, কাব্য যদি পাঠকদের নিজেকে সঞ্চারিত না করতে পারে, তাহলে সেই রূপের মধ্যেই কোথা কত্ত ত্রুটি রয়ে গেছে। জানেন তো, একসময়ে "ওয়েইস্যাণ্ডের" পেছনে বিস্তর টাকা ভুড়েছিলাম। পরে বুঝেছি কবিতার অর্থ যদি কবিতার দেহেই না রূপ পেয়ে থাকে, তাহলে সে কবিতা বিফলাজ, অনার্থক। অভিজ্ঞতাকে পরের মাধ্যমে অপরিচিত বাদুদের মধ্যে সঞ্চারিত করতে পারার সার্থক অর্জন কবির জীবনবাণী চেকনিকের একটা প্রধান হেতু।" অর্থাৎ ব্যবাবকে স্বীকার করেও, ব্যবাবকে আমি স্বীকার করছি না।"

—"আমাদের ভাষার সাহিত্যের একটা মুখপত্রিতর অভাব ছোল: এর দ্বারা একের সঙ্গে অন্যের সাবনিক যোগাযোগ ঘটে। কিন্তু যোগাযোগ যত মূল্যবান হোক, রূপ-সৃষ্টির সঙ্গে সেবক কি সে উদ্দেশ্য সহজে সচেতন থাকেন ? প্রাবছিক নয়, কবির কথা বলছি। আমি কবি নই, পাঠক বাত্র। তবু অনুমান করি, কবি যখন কবিতা লেখেন তখন তিনি নিজের অজানেই নিজে নিজেকে, পাঠকের কথা নিশ্চয়ই তাঁর তখন বলে আসেনা।"

—"এরপটা একটা আদীল প্রসেস্ (Process) বলতে পারেন। অভিজ্ঞতা থেকে কাব্যের রূপ নিতে থাকে তখন কবির যে নিজস্ব অভিজ্ঞতা যাবতুলে, তাও ধারে ধীরে হারিয়ে যায়। কিন্তু রূপ পরিষ্কৃত করে তা পাঠকের সামনে উপস্থিত হয় তখনই এই প্রসেস্‌-এর আরেক পর্য্যায় সুরু। তখন পাঠকের অভিজ্ঞতার সঙ্গে নিজে এই রূপের আবার নতুন জন্ম ঘটে। কিন্তু এই প্রথম সৃষ্টনা থেকে পরের কোনো সেতুর কোন যোগ নেই তাই, কিন্তু সৃষ্টির আগে অনুশীলনের অধ্যায়ে এবং সৃষ্টির শেষে পাঠকের বহনে নতুন রূপে পরিপূর্ণতার হবার সময়ে কবি এবং পাঠক পরস্পরের সঙ্গে দর্শিত সম্বন্ধে যুক্ত।

সংস্কৃতির সাজসজ্জ

" এ গুরুজ কেন তুলনায় বলি। আপনার হয়ত ধারণা হয়ে থাকতে পারে যে গণসভ্যতার আবার আজা নেই বলে আমি সাহিত্যে—সংস্কৃতিকে দুষ্টি-স্তর হয়ে আবদ্ধ রাখতে চাই। আপনি যে ধারণা হয়ে থাক না না থাক আমার কাছে সমালোচকের এসবি ধারণা। অথচ এ ধারণার সবর্থন নে আমার লেখায় কোথাও আছে, তাতো আমার মনে হয়নি। আমার চিন্তা বহু বিলবীতর। ঐতিহ্যকে আমি যে বহুবার এত মূল্যবান মনে করে এসেছি, তার কারণ ঐতিহ্যমান সমাজে সংস্কৃতি সবসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত, তা সবসাধারণের অভিজ্ঞতা, ভাবনা-চিন্তা, বিশ্বাস পুচ্ছেই থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে, তার ক্রিয়াকর্ম সর্বসাধারণের জীবন স্পর্শ করতে সক্ষম। তথাকথিত ধর্ম-নিরপেক্ষ জীবনধারা অনেকেই খুব বাস্তার হন এবং সবালোচক নিজি সাহেব তাঁর গুরুকে যেন একতাট নেন। শোনা যায় আকাডেমির বৃদ্ধ শ্রোতারা এ ভাষণ শুনে এত উৎসুক হয়ে ওঠেন যে, তাঁদের একজন নাকি ভাষণ শুনতে শুনতে চেঁচিয়ে উঠে-ছিলেন ; a little louder please.

আপনি যখন অন্য পরিপ্রেক্ষিতে সে কথা বলছেন, তখন আবার সন্দেহ হচ্ছে এর ফলে ধাঁয়া সৃষ্টিনীল উঁদের ব্যক্তিত্বটা ব্যাহত হতে পারে। ঐতিহ্যের মূল্য মানলেও ব্যক্তিত্বটা আবার কাছে তার চাইতে বেশি ছাড়া কম মূল্যবান নয়।"

—" এ সবস্যার বিচার করতে হলে এসব শব্দ আমরা কি অর্থে ব্যবহার করছি, তা বিশেলষন করতে হয়, কিন্তু সে চেষ্টা হয় আজ আর সম্ভব হবে না। কার্ল মানহাইমের সঙ্গে "সংস্কৃতি" অর্থাবচার সুরু করে শেষ পর্যন্ত আমকে একটা পুরো বই খাড়া করতে হয়েছিল। এবং তারপরেও আবার বলে গভীর সন্দেহ রয়ে গেছে ও শব্দের অর্থ আমার নিজের কাছেই স্পষ্ট হয়েছে কিনা।"

এ ভালই যোন। আপনার কাছে আমার আসবার একটা সূত্র রইল।"

"সূত্রের ধরকার আছে নাকি? আবার যখন এদেশে আসবেন, খবর দিলে খুব খুশী হব। বাকিন যেন আপনার কেমন লাগে আনবার কৌতুহল রইল।"

* * * *

এটা সৌজন্য। কিন্তু তাতে খুশী হতে যাবা কি ? খুশী হবেই বই কিবনায়।

লিউ এক্স-এর বই বলতে বোঝায় :: সেরা লেখক :: সার্থক রচনা :: সুলভ মূল্য

মরুপ্রান্তর বহুপ্রচারের মরুপ্রান্তরে যে ইতিহাস আবষমান-কাল প্রসারিত হয়ে আছে তারই কাহিনী

ভঙ্গরকুমার ভাদুড়ী

এসে পৌঁছেছে 'ভা' ভ্রমকথার বহোই অনুরূপ। লেখক এই বিচিত্র ভূখণ্ডের ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক পটভূমিকায় বর্ণনা করতে বেরিয়েছিলেন। তাঁর সেই সন্ধান বে যায় হয়নি তার প্রমাণ এই "মরুপ্রান্তর"। ৩·৫০

নাবিকা বোডি আয় নায়ক পুণ্যরঞ্জ। কিন্তু দু'জনের মধ্যে যে দুর্বোধ্য ব্যবধান রচিত হয়েছিল তা বেদিন অপসারিত হলো সেদিন তাহতবর্ষের ইতিহাসে এক মহা-দুর্যোগের অধ্যায়। 'রাঁচীর রাণীর' প্রখ্যাত লেখিকার সুখর উপন্যাস। একটি সর্বকর উপভোগ্য সকল ও সুন্দর সৃষ্টি। ৩·৫০

নটী সমাকোচক ভট্টাচার্য

রাজধানীর পাঠকদের সুবিধাকে লয়া শিল্পীর গোল মার্কেটে আমাদের প্রতিষ্ঠানের একটি শাখা স্থাপিত হয়েছে। সেখানে আমাদের নিজস্ব পুস্তক ছাড়াও অন্যান্য প্রকাশকের পুস্তক এবং মূল কলেজের বইও বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে। আপনাদের শুভপদার্পণে আমাদের প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হোক।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা

সুভাষ মুখোপাধ্যায় সেই বিরল প্রতিভার কবি যিনি একাধারে আপন বৈশিষ্ট্যের অনন্যতায় সমৃদ্ধ আবার গণচেতনার উদ্বুদ্ধ পথাতিক। এই গ্রন্থ ১৯৬৮ থেকে ১৯৫৭ পর্যন্ত লিখিত তাঁর সমৃদ্ধ কবিতার সংকলন। ৪·০০

তারতবর্ষের অবহমান্য বিশেষ সভ্যতা ও সংস্কৃতির নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেছেন নীরা ও তাঁর আজীবনসাধনা ভিতর দিয়ে, সাহিত্যে তাঁর আন্তরিক অভিজ্ঞতা, অকৃত্রিম ভাষা ও উপন্যাস ছিটি হয়ে, ধন্য তাঁর জীবন বিশ্বকর্মা দিয়ে, নয়নজুড়ে অবৃতের তীর্থ ছিবেন। ত্রিবাণী ও সবযোগী বরন করে একদিন বুর্ব রেলওয়ে সব নাগরিক

বরনারী জাবালি

নিউ এজ

২২, কর্ণান্স ষ্ট্রীট, ক:

পথিকৃৎ শিল্পী গগনেন্দ্রনাথের চিত্র প্রদর্শনীতে দর্শকের অভাব

(দর্পণের চিত্র সমালোচক)

সত্যই আশ্চর্য হলাম দেখে যে, গগনেন্দ্রনাথের ব্রত পথিকৃৎ শিল্পীর প্রদর্শনী দেখবার লোক নেই শহরে। জনসাধারণের কথা ছেড়েই দিলাম, শিল্প শিক্ষার্থীরাই বা সব গেল কোথায়। রবীন্দ্রভারতীর বিরাট হল ঘরে লক্ষ্য করলাম খুব জোর হয়তো জন দশ বারো মোট দর্শক। এটা সত্যিই পরিতাপের বিষয়। রবীন্দ্রভারতী অকৃত্য পরিশ্রম করে গগনেন্দ্রনাথের এই চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছেন। ব্যবস্থায় কোনও ত্রুটি নেই।

আগামী ১৯শে ফেব্রুয়ারী অবধি প্রদর্শনীটি খোলা থাকবে। শিল্পোৎসাহী দর্শকবৃন্দকে এবং ছাত্রদের একটু গ্রহিষ্ণু করে ছোড়াগাঁকরার জিনে প্রদর্শনীটি দেখে আসতে অনুরোধ করি। এ সুযোগ হারালে আর মিলবে না।

এমন ব্যাপকভাবে গগনেন্দ্রনাথের চিত্রপ্রদর্শনীর ব্যবস্থা এই প্রথম। সব শুদ্ধ ২৭৫টি ছবি প্রদর্শন করা হয়েছে। এই ২৭৫টি ছবিই শিল্পীর প্রতিভার যথেষ্ট পরিচায়ক।

গগনেন্দ্রনাথের মন ছিল অনুসন্ধানী, আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার নানা প্রকার নতুন উন্মেষ তাঁরই রেখা ও বর্ণে প্রথম দেখা যায়। এ প্রদর্শনীতে কিছু ছবি আছে এমন, যা আপাত বা চীনের প্রাচীন চিত্রকে স্মরণ করিয়ে দেয়, তা হলেও ছবিগুলি নিজস্ব গৌরবে বিশিষ্ট। পাশ্চাত্যশৈলী 'পাস্তেল' দিয়ে আঁকাবাঁকা ও চীনা ধরণের চিত্র রচনা, গগনেন্দ্র-নাথই কাছেই এ শিল্প-রীতি করেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ।

ছবিগুলি কিন্তু জাপানী বা চীনা আর্টের পুনরাবৃত্তি ভালো নয়। ব্যক্তিত্বের সুরে পূর্ণ হয়েওই তাঁর এ চেষ্টা নিজের অবশ্যই পরিণত হয়েছে। গগনেন্দ্র-নাথ এক থেকে আর এক নতুনের সন্ধানে ঘুরেছেন, রেখাচিত্র চোখে দেখেছেন পৃথিবীকে। এঁর ছবি মানুষের মনের রহস্যে ভরা। অবচেতন অবস্থার মানুষ যেমন মনের অস্পষ্ট ছায়া নিয়ে খেলা করে; শুধু দিয়ে গড়ে তার আশে-পাশের জগৎকে গগনেন্দ্রনাথের ছবি সেই অজানা প্রকৃতির রহস্যে পূর্ণ। নিসর্গ চিত্র, মানুষের গড়া শহরের চিত্র, ব্যক্তিচিত্র এ সবের মধ্যে দিয়ে মানুষের এই বিচিত্র জগৎপূর্ণ জীবনকে তুলিতে তুলেছেন তিনি।

শেষ জীবনের রচনায় পাশ্চাত্য প্রকরণের লক্ষণ অতি স্পষ্ট—বিশেষ করে কিউবিজম-এর কিছু পাশ্চাত্য কিউবিস্ট শিল্পীদের মত সামান্য সত্যকে সম্পূর্ণ বর্জনায় করে কেবল কতগুলি জ্যামিতিক রেখার সাহায্যে প্যাটার্ন সৃষ্টি করেন নি, গগনেন্দ্রনাথ সরলরেখা, চতুষ্কোণা, ত্রিকোণ প্রভৃতি কিউবিক বাস্তবতা দিয়ে চমৎকার রচনা করেছেন কিন্তু ইঙ্গিত তাঁর সুর বিয়ালিস্টিক বিষয়ের দিকে। কতগুলি ছবিতে টেকনিকও পাশ্চাত্য সুর-রিয়ালিস্টিক আর্ট ঘেঁষা। শিল্পীর অনুসন্ধিৎসা শুধু দুইএ বাহিরটাতেই ঠেকে ফিরে আসেনি তাদের অন্তরের গোপন রহস্য ভেদ করে চলে গেছে।

অপোচরের অবাস্তবের অন্তরের অন্ধকার সঙ্গে দুই বগল করবার দুর্নিবার ইচ্ছা ছিল শিল্পীর সাধন-পথের সাথী। তাই এমন একটি জগতের খবর শিল্পী তাঁর ছবিতে রেখে গেছেন, যার অনুসন্ধান তাঁর নিজেরও শেষ হয় নি।

তিনি কেবলই খুঁজে বেড়িয়েছিলেন পরমসত্যকে, কি জানতেও পারেন নি কখন সেই পরমপাথরের স্পর্শ লেগে তাঁর মনে আলো আলোকিত হয়ে গিয়েছিল। বাহ্যবিচার নেই, চটপট দেখ বিদেশের প্রকরণ আয়ত্ত করে রূপসৃষ্টির সাধনা করে গেছেন শিল্পী কিন্তু প্রত্যেকটি রচনায় শিল্পীর ব্যক্তিত্বের রসে পরিপূর্ণ হয়ে নিজস্ব গৌরবে স্বতন্ত্র রূপ ধরেছে।

পরিশেষে রবীন্দ্র-ভারতীর কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি। তাঁরা উদ্যোগী না হলে পুণ্য ঠাকুরের চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়ত কোন দিনই হত না কলকাতায়।

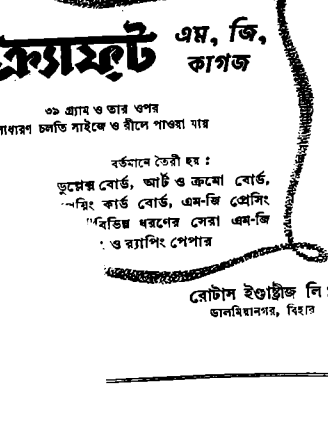

ডি ডি সি কর্তৃপক্ষ ও অর্থ উপদেষ্টার মধ্যে মতভেদ

(দর্পণের নিজস্ব প্রতিনিধি)

ডি ডি সি'র কর্তৃপক্ষের প্রিয়ডাজনদের পদোন্নতি ও বেতনবৃদ্ধির ব্যাপার নিয়ে কিছু-কাল যাবৎ ডি ডি সি'র অর্থ-নৈতিক উপদেষ্টার সঙ্গে কর্পো-রেশনের শুকতর মতভেদ সৃষ্টি হওয়ার সংবাদ পাওয়া গেছে।

ডি ডি সি'র শাসন ও পরিচালনে কেন্দ্রে দুইজন কনস্ট্রাকশন সুপারিণ্টে-ণ্ডেণ্টকে প্রেষণের মাধ্যমে আনবারের পদে উন্নীত করে যোগ্য স্থানে তাঁদের বেতন বৃদ্ধি করা হয়েছে। কনস্ট্রাকশন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হিসাবে তাঁদের বেতনের হার ছিল ১৩০০-৬০-১৬০০, টাকা। নূতন সৃষ্ট পদে উন্নীত হবার পর তাঁদের বেতনের হার বৃদ্ধি ক'রে করা হয় ১৮০০-১০০-২০০০, টাকা।

প্রিয়ডাজনদের প্রতি ডি ডি সি'র চেয়ারম্যান শ্রীপি এন রাওয়ের এরূপ কৃপাবর্ষণের দৃষ্টান্ত বিরল নয়; কিন্তু সম্প্রতাইতে আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, ডি ডি সি'র অর্থনৈতিক উপদেষ্টা শ্রী সুধাংশুকান্ত ব্যানার্জী ভারতের পাবি-পার্শ্বিকতা ও নীতির দিক দিয়ে কতগুলো যুক্তি অবতারণা ক'রে এরূপ পদোন্নতির বিরুদ্ধে কঠোর মন্তব্য ক'রে পাঠানোও, চেয়ারম্যান সে ব্যাপারে দীর্ঘকাল নীরব থেকে, কেন্দ্রীয় সরকার প্রবর্তিত বিধি ভেঙ্গে ভঙ্গ করেছেন, তার দৃষ্টান্ত বিরল।

শ্রীব্যানার্জী তাঁর অর্ধবার্ষিক রিপোর্টে ঐ বিষয়ে তাঁর আপত্তি লিপিবদ্ধ করেন। কিন্তু ঐ রিপোর্ট সম্পর্কে ডি-ডি-সি কর্তৃপক্ষের চূড়ান্ত মতামত নিহিত রয়েছে বহু পর সংসৃষ্টি মন্ত্রী দপ্তরে পাঠানো হয়।

কেন্দ্রীয় সেচ ও বিদ্যুৎ দপ্তর প্রবর্তিত নিয়মানুসারে কর্পোরেশনের সঙ্গে মতভেদ সংক্রান্ত অর্থনৈতিক উপদেষ্টার রিপোর্ট কর্পোরেশনের কাছে পেশ করবার ১৫দিনের মধ্যে সে সম্পর্কে ডি ডি সি কর্তৃপক্ষের বক্তব্যসহ অর্থনৈতিক উপদেষ্টাকে ফিরে জানানোর কথা। এর পর কর্পোরেশনের বক্তব্যসহ সম্পর্কে অর্থনৈতিক উপদেষ্টা তাঁর চূড়ান্ত রিপোর্ট আবার কর্পোরেশনের কাছে পাঠাবেন এবং কর্পোরেশন সে বিষয়ে পুনরায় তাঁদের চূড়ান্ত বক্তব্য একবার পেশ না হ'তে সংসৃষ্টি কেন্দ্রীয় দপ্তরে পাঠাবেন।

রিপোর্ট পরীক্ষায় দেরী

কিন্তু মন্ত্রী দপ্তরে নিহিত সবরের মধ্যে চূড়ান্ত বক্তব্যসহ পেশের রীতি ডি ডি সি কর্তৃপক্ষ উপেক্ষা করার ফলে বহুক্ষেত্রে অনেক গুরুতর বিষয়ে মতানৈক্য সম্পর্কে অর্থনৈতিক উপদেষ্টার রিপোর্ট পরীক্ষার অযথা অস্বাভাবিক বিলম্ব ঘটছে।

মাইথনে কনস্ট্রাকশন সুপারি-ণ্টেণ্ডেণ্টের পদোন্নতি সম্পর্কে শ্রী ব্যানার্জী তাঁর চূড়ান্ত রিপোর্টে বলেন, 'ভারতের অবস্থার সঙ্গে যা খাপ খায় না সেরকম 'ডেভিগনেশন' আবদানীর আমি বিরোধী। আমি বেতনের হার সম্পর্কেও আপত্তি জানিয়েছি। কিন্তু আমার সে আপত্তির বিষয়ে কোন কথাবার্তা হয় নি। এই দুই ক্ষেত্রে আমার আপত্তির কারণ নীতিগত এবং কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে যথার্থ মূল্য নির্ধারণের প্রশ্ন সংক্রান্ত।

পাকেৎ হিসেব পদটি সম্পর্কে তিনি যে পরামর্শ দেন তার সারমর্ম এই— কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ এটা ভাল ক'রেই জানেন যে, আমি মাইথনের কনস্ট্রাকশন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের বেতন বৃদ্ধির ব্যাপারে কর্পোরেশনের সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত হ'তে পারিনি। 'ডেভিগনেশন' পরিবর্তনেও আমার আপত্তি ছিল। সুতরাং পাকেৎ হিসেব ঐ রকমের কোন পদমর্যাদা বৃদ্ধির প্রস্তাবের সঙ্গে আমি একমত হ'তে পারি না।

মিউজিয়ামে রবীন্দ্রনাথ

(দর্শকের নিজস্ব প্রতিনিধি)

পণ্ডিতশ্রেষ্ঠকে মনোযোগ। রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকীর পূরক হাতে কবির বাস-ভবন 'উত্তরায়ণকে' রবীন্দ্র মিউজিয়ামে পরিণত করার আবেদন জানিয়ে তিনি দেশবাসীর শুভাভিনন্দন হয়েছেন। এই উদ্দেশ্যে একটি অর্থভাণ্ডার গড়ে তুলে দুঃস্থ অর্থ সাহায্যের অনুরোধও আবেদনে আছে। একটি পূর্ণাঙ্গ অঙ্গহিত তত্ত্বাবধানে থাকবে ঐ রবীন্দ্র স্মৃতি মিউজিয়াম।

অতি উত্তম প্রস্তাব। এবং পণ্ডিতজীর সদিচ্ছা সম্পর্কে কারও বিন্দুমাত্র সংশয় নেই। আবাদের আশংকা অন্য কারণে। ইদানীংকার নানা অছিলায় বিশ্বভারতীকে রবীন্দ্রপ্রভাবমুক্ত করার অন্য কোনও বেঁধে নেলেছেন, তাঁদের কেউ কেউ পণ্ডিতজীর এই প্রস্তাবে এখন থেকেই নূতন কলী আঁটাছেন বলে শোনা যাচ্ছে। মিউজিয়ামের নাম করে উত্তরায়নের সমস্ত কিছুর রবীন্দ্রনাথকে নির্বাসন দিয়ে শান্তিনিকেতনে 'রবীন্দ্র বেষ যজ্ঞ সুলভন্ত্র করার জন্যেই নাকি ইতিমধ্যেই আরম্ভ হয়ে গেছে।

এইরূপ আশংকার যথেষ্ট কারণ আছে। কিছুকাল থেকেই দেখা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথকে শিবগীতলে খাড়া করে কর্তাব্যক্তিদের কেউ কেউ শান্তিনিকেতনের অচলপ-জীবনে কুকুরের কাও লাগিয়ে দিয়েছেন। যেহেতু শিক্ষা কেতে নূতন পরীক্ষার অবতীর্ণ হয়েই রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীপ্রতিষ্ঠা সেহেতু অন্যান্য কয়েক-জনও বিশ্বভারতীকে নিজ নিজ খেয়ালখুশী চরিতার্থের 'প্যারকেরী' বানাতে কসুর করছেন না। বিশ্বভারতী অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মত হয়ে যাক, এবং ভাতার ভবন আওড়ানো হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু কাজের বেলায় দেখা যাচ্ছে, অন্যান্য বিশ্ববিদ্যা-লয়ের অঙ্গ অনুকরণ বেশ ঘুরুতরভাবেই চলছে। ফলে বিশ্বভারতী দিন দিন নিজের বৈশিষ্ট্য হতে হারাচ্ছেই, অন্য ভাতার ভাল দিকটাও যখন করতে পারছে না এখন না যরকা 'না ঘাটকা' হয়ে ত্রিশঙ্কুর মত অনিশ্চয়তার শূন্যে সে দোল খাচ্ছে। তার জন্যে অবিশ্যি কোন ব্যক্তিবিশেষ দায়ী নন। পরিচালন ব্যবস্থার বন্ধ্যা নানা প্রকার গলদের ছাপ সুস্পষ্টই।

বিশ্বভারতী অন্য বিশ্ববিদ্যালয় গুলে পুরুষ হলেই রবীন্দ্রনাথের হাতে-গড়া ছিলিন বলেই অর্থসঙ্কটে কবিগন হয়ত পঞ্চপাণ্ডবের দুইটে একে দেখে থাকছেন। অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় টাকা বরাদ্দের পরিমাণও কম নয়। সম্প্রতি অর্থবন্ধুরা কবিগনের প্রতিনিধি ও বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের এক বৈঠক হয়েছে। শোনা গেল তাতে নাকি অবন্ধুরা কবিগন মনোভেদ, বিশ্বভারতী যদি রবীন্দ্র আদর্শ থেকে সরে যায়, তাহলে তাঁরা টাকার পরিমাণও কমিয়ে দেবেন।

বিশ্বভারতী অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের গুঁতে চলা হোক এটা তাঁরা চান না। কিন্তু আক্ষেপের কথা, তাতে কর্তা-ব্যক্তিদের চৈতন্যোদয়ের লক্ষণ নেই। তাঁরা অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মত হতে চাইছেন।

বিশ্বভারতী থেকে রবীন্দ্রনাথকে বিদায় ও দেওয়ার মনোভাব কোন কর্তাব্যক্তির মনে আছে বলেই পণ্ডিতজীর প্রস্তাবে পরিষ্কার ভাবে কারও দেখা দিয়েছে। এখন রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কিত সেতাই পেছে উত্তরায়নের ভেতর রবীন্দ্রনাথকে যদি কুলুপ এঁটে রাখা যায়, তাহলে এক ঢিলে দুই পাখি বধবে। মরলব সহজেই বাঁসিল হবে।

পণ্ডিতজীর আবেদনে বেশ কয়েক লাখ টাকা উঠবে সন্দেহ নেই। সেই টাকা দিয়ে 'উত্তরায়ণ' এলাকা কেনা হবে। ঐ এলাকার নানা বিশ্বভারতী সব ইমারতগুলির সুযোগ সুবিধা পুরো মাত্রায় মালিক হবেন। 'উদয়ন' বাড়ীটা বিশ্বভারতীর আপিস বাড়ী হিসাবে কাজে লাগছে বলে উনি মাসিক অর্থ হাজার টাকা ভাড়া বাবদ পাচ্ছেন। নূতন প্রস্তাবেও বিশ্বভারতীর সঙ্গে নবগঠিত অছিরা কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকবেন।

গত ডিসেম্বর মাসে পণ্ডিতজীর সঙ্গে কবি-পুত্রের এ সম্পর্কে কি সলা পরামর্শ হয়েছে জানিনা; তবে এটা নিশ্চিত জন-সাধারণের ধনের চাকার এক বিরাট অংশ উত্তরায়নের জন্যেনুসা ব্যবস্থা চলে বাবে এক ব্যক্তি বিশেষের সুরে কবির পুত্র নাতীরা বিশ্বভারতীর আপিস বাড়ী হিসাবে কাজে লাগছে বলে উনি মাসিক অর্থ হাজার টাকা ভাড়া বাবদ পাচ্ছেন। নূতন প্রস্তাবেও বিশ্বভারতীর সঙ্গে নবগঠিত অছির কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকবেন।

গত ডিসেম্বর মাসে পণ্ডিতজীর সঙ্গে কবি-পুত্রের এ সম্পর্কে কি সলা পরামর্শ হয়েছে জানিনা; তবে এটা নিশ্চিত জন-সাধারণের ধনের চাকার এক বিরাট অংশ উত্তরায়নের জন্যেনুসা ব্যবস্থা চলে বাবে এক ব্যক্তি বিশেষের সুরে কবির পুত্র নাতীরা বিশ্বভারতীর আপিস বাড়ী হিসাবে কাজে লাগছে বলে উনি মাসিক অর্থ হাজার টাকা ভাড়া বাবদ পাচ্ছেন। নূতন প্রস্তাবেও বিশ্বভারতীর সঙ্গে নবগঠিত অছির কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকবেন।

গত ডিসেম্বর মাসে পণ্ডিতজীর সঙ্গে কবি-পুত্রের এ সম্পর্কে কি সলা পরামর্শ হয়েছে জানিনা; তবে এটা নিশ্চিত জন-সাধারণের ধনের চাকার এক বিরাট অংশ উত্তরায়নের জন্যেনুসা ব্যবস্থা চলে বাবে এক ব্যক্তি বিশেষের সুরে কবির পুত্র নাতীরা বিশ্বভারতীর আপিস বাড়ী হিসাবে কাজে লাগছে বলে উনি মাসিক অর্থ হাজার টাকা ভাড়া বাবদ পাচ্ছেন। নূতন প্রস্তাবেও বিশ্বভারতীর সঙ্গে নবগঠিত অছির কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকবেন।

গত ডিসেম্বর মাসে পণ্ডিতজীর সঙ্গে কবি-পুত্রের এ সম্পর্কে কি সলা পরামর্শ হয়েছে জানিনা; তবে এটা নিশ্চিত জন-সাধারণের ধনের চাকার এক বিরাট অংশ উত্তরায়নের জন্যেনুসা ব্যবস্থা চলে বাবে এক ব্যক্তি বিশেষের সুরে কবির পুত্র নাতীরা বিশ্বভারতীর আপিস বাড়ী হিসাবে কাজে লাগছে বলে উনি মাসিক অর্থ হাজার টাকা ভাড়া বাবদ পাচ্ছেন। নূতন প্রস্তাবেও বিশ্বভারতীর সঙ্গে নবগঠিত অছির কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকবেন।

EXPLORATIONS

ESSAYS IN LITERARY & PHILOSOPHICAL CRITICISM

By

Sibnarayan Ray

Commenting on these essays

BERTRAND RUSSELL writes-

"Mr. Sibnarayan Ray stands for a point of view which I consider important in every part of the world, including India. Every part of the world is too much prone to rival fanaticisms which generate heat without light. Mr. Ray's writings ably represent a more reasonable point of view than that of most writers of our time....."(London, 24.5.57)

DAME EDITH SITWELL writes

"It is my convinced opinion that Mr. Sibnarayan Ray is one of the very few really important critics of our time. 'All absolute sensation,' said Novalis, 'is religious', and in almost every sentence in this remarkable book we are given absolute sensation. Doors are opened upon long vistas of beauty and of meaning. There is nourishment for mind and for the powers of living upon every page."

Mr. H. J. Blackham writes:".....The value of Mr. Ray's contribution is that he himself is sensitive enough to feel the despair of the western intellectual and perceptive enough to see its point and the immense danger into which it precipitates us, and at the same time he is sane enough to believe still in the values of the Renaissance and to maintain that they are sound and permanent and necessary and must be rehabili tated....."

(The Plain view, London)

Rupees Four: Six Shillings: One Dollar

RENAISSANCE PUBLISHERS PRIVATE LTD.

15, BANKIM CHATTERJEE STREET, CAL.-12

নিখিলবঙ্গ ভাষা সম্মেলন

[নরেশ গুহ]

ভাষাতত্ত্ব ভাষা সমস্যা নিয়ে আলোচনা করার জন্য বিভিন্ন কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য স্থানে গত চার বছরের মধ্যে যে-সব ডেলিগেটি অনুষ্ঠিত হয়েছে, তাদের পরিধানে নিখিল বঙ্গ ভাষা সম্মেলনের। গত ২৩শে ও ২৪শে ডিসেম্বর এই উপলক্ষে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি রবীন্দ্রভারতী সদনে মিলিত হয়েছিলেন। বাঙলাভাষা সংক্রান্ত সমস্যার দুই আলোচনার সঙ্গে যাঁরা একরত প্রবীনত্ব তাঁরাই এই সম্মেলনের উদ্যোক্তা হলেও এই দুই দিনের অধিবেশনে একথা নিশ্চিন্ত ভাবে প্রকাশ হয়েছে যে ভাষা সমস্যার সমাধান-কল্পে নব এবং পোক্ত নিবিবেশে বাংলাদেশের অধিকাংশ চিন্তাশীল লোক যোগদৃষ্টি ঐক্যবদ্ধ। আটশ বছরের ঐক্যে কথকতা সহরে এমন আর কোনো সম্মেলনের কথা মনে করা যায় না যাতে বিভিন্ন বয়সবর্গী এত অধিকসংখ্যক বিশিষ্ট ব্যক্তি একই উদ্দেশ্যে একত্র হয়েছিলেন। উদ্যোক্তারা প্রথমেই একথা ঘোষণা করেছিলেন যে বিশেষ কোনো রাজনৈতিক দল কিংবা গোষ্ঠীর মত প্রচারের জন্য এই সম্মেলন আহ্বান করা হয়নি। কেন্দ্রে হিন্দিভাষা প্রতিষ্ঠার এক-আয়োজন চলছে তার ফলে ভারতের অন্যান্য ভাষা এবং সংস্কৃতি যে ডাকে বিপন্ন হবে বাঙা সে-বিষয়ে সর্বপ্রথীর সবিবেদন অভিনত পেশ্যাদীর সমুখে উপস্থিত করাই ছিল এ সম্মেলনের প্রধান লক্ষ্য।

সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন প্রবীণ রাজনৈতিক নেতানেতা চন্দ্র সেনগুপ্ত; অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিত্ব করেন আচার্য লোকসংস্কৃতির সভাপতি শ্রীসুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়। সম্মেলনের দু'দিনব্যাপী বিভিন্ন অধিবেশনে যাঁরা আলোচনায় যোগ দেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন : শ্রীহেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ডাক্তার [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅশোক সেন, শ্রীবিনয়কৃষ্ণ বসু, শ্রীসুধীরঞ্জন দাশ, ডাঃ নি, নি, ঘোষ, শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার, [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসুশীল রায়, [illegible] হালদার, কাজী আবদুল [illegible], শ্রীসুধীরঞ্জন বসু, শ্রীপ্রবোধ কুমার [illegible], শ্রীসতী রাধারাণী দেবী, শ্রীসতী [illegible] দেবী, শ্রীনলিনী ভট্টাচার্য, [illegible] মাখ সেন, ডাঃ রমেন্দ্র রঞ্জন [illegible], শ্রীঅনন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় [illegible] অনেকে। 'বর্ণাবিজ্ঞান আধুনিক [illegible] ঐতিহ্য ও বিশ্লেষণ' বিষয়ক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। এই প্রবন্ধটি বিশেষ ঔৎসুক্য সহকারে শ্রোতৃমণ্ডলী শ্রবণ করেন। বিষয়টি জটিল, অনেকের পক্ষে দুর্বোধ্য। তবুও সকলেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে মাতৃভাষার পরিপূর্ণ বিকাশের সুযোগ রাখাটাও যেমন নিতান্ত আবশ্যক এবং সরকারি রাষ্ট্রভাষা কিংবা জাতীয় ভাষার নামে কোনো ভাষাকেই, জোর ক'রে চাপিয়ে দেওয়া অন্যায়, অসংগত এবং দেশের মুক্তির স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর।

দ্বিতীয় দিনে শ্রীসুকুমার রায়ের, তাঁর বক্তৃতার যা বলেছেন, এবং পরে সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের সঙ্গে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর বিষয় মোল পুড়ে আছে। কিন্তু বক্তব্যগুলো বিলও যে আছে সেটাই চলনিতে শ্রোতাদের কাছে উজ্জ্বলভাবে বলে মনে হয়েছিল। মাতৃভাষা কিভাবে পূর্ব-বিকাশ লাভ করবেন এবং উপযুক্ত বর্ধনা পাবে-এটা তাঁরও চিন্তার প্রধান আছে। এবং এ বিষয়ে তাঁরা মাতৃভাষা সংরক্ষণ সংঘই নয়, অধিবেশনে আলুত কোনো বক্তাই ভিন্ন কথা বলেন নি। পুজেন এইখানে যে অধিকাংশ যে মনে নিয়েশনের যোগণা করেছেন যে হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষা, এবং কি সরকারী ভাষা করা হলে বিভিন্ন রাজ্যের মাতৃভাষা পদ্ধিপাতে বিপন্নহ'য়ে পড়বে, শ্রীযুক্ত চালদার তখন একমত হতে পারেন নি। হিন্দির বিকল্প হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকারের পরীক্ষাগুলি যুগপৎ চোদ্দটি ভারতীয় ভাষাতেই নেওয়া উচিত বলে শ্রীযুক্ত চালদার যে প্রস্তাব করেন অধিকাংশ বক্তা সে প্রস্তাবকেও গুরুপ-যোগ্য বলে করেননি। কেননা সে ক্ষেত্রে পরীক্ষার মান ভাষাভেদে ভিন্ন হবেই। বিভিন্ন ভাষার প্রকাশ ক্ষমতা যদি সমত্বের না হয় তাহলে যুগপৎ সেই সব ভাষাকে যাচন ক'রে, আর যাই হোক পুতিযোগিতা করা যায় না। তাছাড়া কেন্দ্রের ভাষা যদি হিন্দি হয় তাহলে সে-ভাষা বাঁধনে মাতৃভাষা তাঁরাই যাদের প্রধান প্রধান পরীক্ষায় অধিকার করবেন, আর বলেরা প্রাণপণে উদ্যম হিন্দি শেখার জন্য এবং চেষ্টা করতে থাকবেন যে তাঁর ফলে মাতৃভাষা অবশ্য হীনবল অথবা অন্য কোনো ভারতীয় ভাষা শেখবার জন্যে তেমন আগ্রহ কিংবা অবসরও কারোরই বিশেষ থাকবে না। কেন্দ্রের ক্ষমতা ক্রমশই সর্বপ্রাণী হয়ে উঠছে। এবং যাঁরই শক্তি আছে, উচ্চাকাঙ্ক্ষা আছে, তিনিই কোনো না কোনো ভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যুক্ত থাকতে বাধ্য হবেন, যদি না তিনি 'গঙ্গবন্ধুনিরাবরণী' সাহিত্যিক অথবা আত্মতাগী সন্ন্যাসী হন। হিন্দিভাষী শিক্ষিতেই যদি ভাষো ভালো সরকারি চাকরি পাওয়া যায় তাহলে মাতৃভাষার প্রতিও মনোযোগ কমে আসবে। কেউ রোধ করতে পারবে না।

হিন্দিভাষীবিকাশের ইতিহাসও খুব বিস্ময়কর নয়। প্রথম দিকের অধিবেশনে জনৈক বৈদেশী কবির বক্তৃতা সভাতে বিশেষ উত্তেজনার সঞ্চার করেছিল। তিনি বলেছিলেন যে, হিন্দি পত্তিবোলি ভাষার (যাকে রাষ্ট্রভাষা করার আয়োজন চলছে) জন্ম হয়েছে কৃত্রিম উপায়ে এবং বৃদ্ধি ঘ'টেছে বৈদেশীর মতো নানা ভাষাকে গ্রাস করে। হিন্দিভাষী অঞ্চলে বৈদেশী ভাষার বাড়াও আজ সরকারীভাবে স্বীকার করা হয় না। অথচ বৈদেশী ভাষার অত্যন্ত লিপি আছে, এবং তার সাহিত্যও তুচ্ছ করবার মতো নয়। তাছাড়া এককোটির বেশি লোক এই ভাষার আজ পর্যন্ত কথা বলেন।. তৎসত্ত্বেও বৈদেশী ভাষার মর্ম প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে এবং, শিক্ষার বাহন হিসেবে তাকে গ্রাহ্য করা হয় না তার ফলে বৈদেশীভাষেরকরা এখন হিন্দিতে বই প্রকাশ করতে বাধ্য হন এবং উচ্চশিক্ষার বাহনও এঁদের কাছে আবশ্যক হিন্দি। অতিমাত্র বলিষ্ঠ-ভাবে বৈদেশী কবি পরভাষার প্রতি হিন্দিভাষীদের এই অনাদিষ্ণুতার কথা ব্যক্ত করেন এবং বলেন যে এখনো যদি হিন্দিতে রোধ করা না যায় তাহলে ভাষা কমিশনের ব্যক্ত অভিলাষই একদিন পূর্ণ হবে, ক্রমে সমস্ত উত্তর ভারতে প্রচলিত হবে একটি মাত্র ভাষা —হিন্দি এবং একটি মাত্র লিপিই নাগরি।

অন্যত্র পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ থেকে দেখা যাচ্ছে যে কেউ কেউ এই আশঙ্কাকে সত্য বলে মেনে নিয়েও হিন্দিকেই রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষপাতী। একজন লিখেছেন : "···কিন্তু কোনো ভারতীয় ভাষাকে ইউনিয়নের ভাষা করলে তার ধ্বংসকে পথরাত ডক্ক কি থাকে না ? নিশ্চয়ই থাকে। কিন্তু যে বিপদের হাত থেকে রক্ষা পাবার রাস্তা এ নয় যে, বাঁধকে আরো পিঠে ভাগ করতে ডাকব। পুতোকটি রাজ্যের আকাঙ্ক্ষি ডাকাকেই ইংরেজির সঙ্গে যুঝতে হচ্ছে। এই সমস্যার ওপর দাঁড়িয়েই ভাষার ভাষার একদিকে যেমন ঐক্য গ'ড়ে উঠবে, তেমনি এক ভাষার ওপর অন্য ভাষার প্রভাবপ্রতিকেও ঠেকানো সম্ভব হবে।"

এর অতিপর এই লড়াই শুরু হলে "হিন্দি ভাষাকে···সাধারণ মানুষের মুখের ভাষার ছাঁচে গড়ে তুলতে হবে। তা না হলে সে ভাষা কিছুতেই প্রাণ পাবেনা।" কিন্তু হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষা করতে হবে এক্ষুণি, এই মুহূর্তে।

অর্থাৎ বর্তমানে প্রাণহীন ভাষাকে ব্যবহারযোগ্য ক'রে তুলতে হলে ক্রমে তাকে মানুষের মুখের ভাষার ছাঁচে গড়ে তুলতে হবে—সেই ভাষী ভাষাকেই নাকি আমাদের রাষ্ট্রভাষা করা নিতান্ত প্রয়োজন। ইংরেজি বিদেশী ভাষা। এবং "ইংরেজের মুঠো থেকে দেশের ভাষে আমাদের নিজের দেশ কেড়ে নিতে হয়েছে, দেশের নিজেদের ভাবনা চিন্তা গুলোকেও ইংরেজির কবল থেকে ছিনিয়ে নিতে হবে।"

ভারতবর্ষের মতো বহুভাষী বিরাট দেশে কেন্দ্রের ভাষা কোন কোন উদ্দেশ্য সাধন করতে পারে সে বিষয়ে বিস্তারিত চিন্তা ক'রে দেখবার উপরেও আবেগপূর্ণ কথাগুলোকে অত্যন্তসাদন্য ব'লে মানতে হবে। নিজেদের ভাবনা চিন্তাগুলোকে আধুনিক ভাষাতেই ভাবতে হবে এবং প্রকাশ করতে হবে এ বিষয়ে কেউ দ্বিমত নন। বহুবছর আগেকারকে এই উদ্দেশ্যেই কবীন্দ্রনাথ মাতৃভাষাকে বিশ্বের বাহন করার পরামর্শ দিয়েছিলেন "কোনো শিক্ষাকে স্থায়ী করিতে হইলে, গভীর করিতে হইলে, ব্যাপক করিতে হইলে, তাহাকে চির-পরিচিত মাতৃভাষার বিস্তারিত করিয়া দিতে হয়। যে ভাষা দেশের দর্শত সর্বাহিত, অন্তঃপুরে অন্তর্মুখশালা কক্ষেও যাহার নিষেধ নাই, যাহাতে সমস্ত জাতির মানসিক নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নিরুদ্ধ হইতেছে, শিক্ষাকে সেই ভাষার মধ্যে বিস্তৃত করিলে তবে সে সমস্ত জাতির রক্তকে বিশুদ্ধ করিতে পারে। সমস্ত জাতির জীবন-ক্রিয়ার সহিত তাহার যোগ সাধন হয়···"। বিদেন রবি ভাষা সম্মেলনের প্রস্তাবে তাই মাতৃভাষাকে শিক্ষার সর্বস্তরের বাহন করার কথা বলা হয়েছে। বাঙালীর পক্ষে তাই চিন্তাভাবনার ভাষা কি হিন্দী ? গুজরাটি, 'মারাঠা, শুদ্ধ, তামিলনাড়, উড়িষ্যা, আসামের লোক কি তাঁদের ভাবনা চিন্তাগুলোকে "ইংরেজির কবল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে" হিন্দিতে প্রকাশ করবেন, নাকি বাঁর ধার মাতৃভাষা ? এখানে ইংরেজির পরিবর্তে মাতৃভাষা না এনে হিন্দির কথা আসে কি করে ? কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যবহার্য ভাষাতো আমাদের কবিতা লেখবার, গ্রন্থ লেখবার কিংবা ভাষা প্রকাশের ভাষা নয়, তা হচ্ছে কাজ চালাবার ভাষা। সে ভাষায় আইন রচনা চলবে, বিচারের রায় লেখা চলবে, সব ভাষার প্রতিনিধিদের মধ্যে প্রতিবোধিতার পরীক্ষা দেওয়া চলবে, আর লেখা চলবে সরকারী দপ্তরের কোথা চিঠিপত্র ইত্যাদি। এবং আতির জ্ঞান বিজ্ঞান সাহিত্য সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়ার জন্য কেউই সেই সব আইন, রায়, পরীক্ষার খাতা এবং সরকারী পত্রাবলী পাঠ করার কথা ভাববেন না। জাতির জীবন প্রতিফলিত হবে ভারতের বিভিন্ন মাতৃভাষায়, যার প্রত্যেকটি আতীয় ভাষা। সেই আঞ্চলিক ভাষা থেকেই জাতির পরিচয় পেতে হবে। হিন্দীর সপক্ষে পূর্বোক্ত লেখকের যুক্তি তাই একবারে অচল। এঁরা যে কারণে কেন্দ্রে হিন্দি স্থাপন করতে চান, আমাদের তার জন্য বিভিন্ন রাজ্যে মাতৃভাষার পূর্ণবিকাশ আবশ্যক। বাধাটা বুঝবে, মাধ্যম হেন বানিন করলে আবোগাের সম্ভাবনা কম।

মাতৃভাষা সংরক্ষণ সংঘ এবং পরে নিখিল বঙ্গ ভাষা সম্মেলন কেন্দ্রে হিন্দি প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করলেন এবং লেখাকারে অধিকাংশ বর্ণে ইংরেজি ব্যবহারের প্রস্তাব ক'রেছেন। হিন্দি উন্নত ভাষা বিনা, কিংবা অহিন্দিভাষীর পক্ষে হিন্দি শেখা কঠিন কিনা—সে প্রশ্ন এ প্রসঙ্গে অবান্তর। হিন্দি যদি ভারতের শ্রেষ্ঠভাষা হোতো এবং তা শিক্ষা করা মাতৃভাষার তুলনায় সহজসাধ্য, তবু এ প্রস্তাবের কোনো পরিবর্তন করা হোতো না। সংক্ষেপে তার কারণ হচ্ছে এই : ইংরেজি ভাষা এবং সেই ভাষার মধ্য দিয়ে ইউরোপের জ্ঞানবিজ্ঞান—চিরাথ-কর্মের সঙ্গে বিচ্ছেদকে কেউ কাম্য মনে করছেন না। ভাষা কবিদন যে পরাবর্ণ দেন নি, কয়েদ্রে সে প্রস্তাব করেননি (বরং প্রাণজ্যোতিষপুরের কংগ্রেস অধিবেশনে নেহরু বলেছেন, ভারতবর্ষে ভবিষ্যতে ইংরেজির ব্যবহার আরও ব্যাপক হবে এবং হওয়াই বাঞ্ছনীয়) ; এবংকি হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষা করার আবশ্যকতা দেখিয়ে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করলেও "স্বাধীনতা" পত্রিকার সভার মুখোপাধ্যায় স্বীকার ক'রেছেন : "তাহলে কি ইংরেজির সঙ্গে সমস্ত সম্পর্কই আমরা চুকিয়ে দিতে চাই ? সে প্রশ্নই ওঠে না।···" অতএব সবাই স্বীকার করছেন যে, ইংরেজি আমাদের চাই, হয়তো আরো ব্যাপকভাবেই চাই। কিন্তু প্রথমে চাই দেশের সর্বস্তরের শিক্ষার জাতীয়করণের চিন্তা প্রকাশের রাষ্ট্রের সর্ববিধ কর্মকাণ্ডনের স্বাভাবিক যাহন হিসাবে মাতৃভাষার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা। অথচে,

সামান্য একটু সৌজন্য

শীতের রাতে ট্রেনের
কামরায় জোয়ান মানুষ
সারা বেঞ্চি জুড়ে কম্বল মুড়ি
দিয়ে শুয়ে আছে···
পাশেই হুমত বাচ্চা এক ছেলে
মালপত্রের ওপর ঠায়
বসে' শীতে
কাঁপছে···এক কোণে ভীড়ের
চাপে কোন মহিলা
হয়ত কষ্ট পাচ্ছেন···বুড়ো
অথর্বদের ফিরে
দেখছেই না কেউ···ট্রেনের
কামরায় এই ধরনের
অপ্রীতিকর দৃশ্য
হামেশাই চোখে পড়ে।
অথচ সহযাত্রীদের
সামান্য একটু
সৌজন্যে সকলের
পক্ষেই ট্রেন-ভ্রমণ প্রীতিকর
হ'য়ে উঠতে পারে।
মিষ্টি কথা আর আন্তরিক
ব্যবহারে পথের অনেক
কষ্ট অনেক অসুবিধাই
হাসি মুখে সহ্য করা যায়।

পূর্ব রেলওয়ে

ERIPAIE

সরকারী নির্দ্দেশের প্রতিবাদে শিক্ষকদের অনশন

মর্য্যাদা রক্ষার অজুহাতে পূর্ব সিদ্ধান্ত পরিবর্ত্তণে শিক্ষামন্ত্রীর একগুঁয়ে ও অনমনীয় মনোভাব

(দর্পণের সংবাদদাতা)

পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সম্মুখে ইণ্টারভিউদের 'অপরাজনক' সরকারী নির্দেশের প্রতিবাদে মাধ্যমিক শিক্ষকগণ আগুয়ারী সেবসহ সন্ধ্যার অনশন ধর্ম্মঘট সুরু করেছেন।

কলিকাতার ডিগ্রীধর শিক্ষিকা সহ ২৮ জন এবং পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন জেলার আরও ১৮জন মোট ৪৬ জন শিক্ষক শিক্ষিকা ঐ দিন অনশন ধর্ম্মঘটে যোগ দেন। কলিকাতার যাঁরা অনশন করেন তাঁদের মধ্যে নিঃ ঘঃ শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক শ্রীসত্যপ্রিয় রায় এম-এল, সি সহ ৩ জন কলিকাতা স্কুলের শিক্ষক ব্যতি আর সকলে অন্যান্য জেলা থেকে অনশন ধর্ম্মঘট যোগ দেবার জন্যে কলিকাতায় এসেছেন।

[illegible] অনশন ধর্ম্মঘট সম্বন্ধে [illegible] ঘোষণা করেন। নিম্নে তাহার সারমর্ম্ম প্রদত্ত হইল।

"পশ্চাদভূমি এবং শিক্ষকদের মধ্যে শ্রেণীগত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া শিক্ষক-কর্ম্মচারীদের ভাতার ধরিয়ে দেবার চেষ্টা" করে অভিহিত করা হয় এবং শিক্ষক সমাজ এর প্রতিবাদে মুখর হ'য়ে ওঠে। অভিজ্ঞ শিক্ষকদের এইভাবে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মনোনীত করার সরকারী অভিপ্রায়কে তাঁদেরকে পদমর্য্যাদাজনক অনেক অভিযত পদ বাদ করা হয়।

নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়ে তা প্রত্যাহারের দাবী করা হয়। তাঁরা এই যুক্তি দেখান যে, এই কমিশন অধ্যাপনা কলিংদের মুখ্যাধিকার প্রোগ্রাম প্রবন করা দেখে যে, শিক্ষকদের তাঁদের যোগ্যতা প্রমাণের জন্যে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সম্মুখে হাজির হ'তে হবে। তা ছাড়া নূতন পদ্ধতি হয়ে ওঠু সাধারণভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ না থেকে সে কলিংদের মুখাধিন অনুযায়ী সমস্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধির মূল্যের দেওয়া হ'ক এ দাবীও সমিতি পত্রে থেকে জানা হয়।

শিক্ষকদের দাবী

বেতন বৃদ্ধি সম্পর্কিত সরকারী বিজ্ঞপ্তি ঘোষিত হবার বিভূমিন পরে নিঃ ঘঃ শিক্ষক সমিতি পক্ষ থেকে এক প্রতিনিধি দল শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ রায়ের সমুখে উপস্থিত হবার দরবার। চানুরীর নিরাপত্তার দিক থেকেও ঐ ব্যবস্থা উচ্চর বলে তিনি মনে করেন। তিনীয় দাবীর উত্তরে শিক্ষামন্ত্রী অর্থাভাবের অজ হাত দেখান।

অতঃপর সমিতির প্রতিনিধিবর্গকে অনুগ্রহতে নিরাশ হ'য়ে ফিরতে হয়। পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে সভা সমিতির মাধ্যমে প্রতিবাদ ধ্বনিত হ'তে থাকে। মুমাহিত অসন্তোষে ক্রমশঃ বিক্ষোভে পরিণত হয়। এই বিক্ষোভ আমার ইরন ঘোগার মাধ্যমিক শিক্ষা সংশোধন বিল। এ বিলে বহা শিক্ষা পর্ষদ বলেও গঠনের প্রস্তাব হ'য়েছে তাতে শিক্ষার স্বাধিন্য (নৈতিক ও আর্থিক) না নিয়ে ধরনারীর অধিকারচ্যুত নিজের হাতে রাখার যে মনোবৃত্তি সরকার দেখিয়েছেন তার বিরুদ্ধে শুধু শিক্ষকমূলে নয়, ছাত্র সমাজেও প্রতিবাদের ঝড় ওঠে।

কিন্তু সরকার নীরব। তাঁরা ইণ্টারভিউ পদ্ধতি বাতিল ক'রতে রাজী হন না। উপরন্তু কলিকাতার ও অন্যান্য জেলার পাবলিক সার্ভিস কমিশনের ৭টি বেঞ্চ খুলে শিক্ষকদের নির্দ্দিষ্ট সময়ে ইণ্টারভিউদের জন্যে হাজির হবার নির্দ্দেশ দেওয়া হয়। যাঁদের হাজির হ'তে হবে তাঁদের তালিকাও স্কুলে স্কুলে পাঠানো হয়। এ'র ফলে বাধ্যতামূলক শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে এর তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে এই ব্যবস্থা প্রত্যাহার না ক'রলে অনশন ধর্ম্মঘট করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়।

কার্য্যনির্বাহক কমিটিরও বহুদূরে ইণ্টারভিউর এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষা বিলের বিরোধী পরিষদ বাধ্যতামূলক শিক্ষক ও হাজরাদারদের এক বিশাল সভাতে এবারী ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ডাক দেয়।

অবশেষে গত ১লা ফেব্রুয়ারী নিঃ ঘঃ শিক্ষক সমিতি ও পশ্চিম বঙ্গ শিক্ষক সমিতি (সংশোধিত রূপ) এই অনশন প্রত্যাহার প্রতিজ্ঞা জানান। অবশ্য একবাক্যে আন্দোলনের বিরুদ্ধ তাঁরা ছাড়া এই দুটি সংস্থার অস্তিত্ব বা কার্য্যকলাপ বড় একটা দৃষ্টিগোচর হয় না। এবং তাঁদের প্রতিজ্ঞা সত্ত্বেও পঃ বঃ মাধ্যমিক শিক্ষকদের আন্দোলন এখিরে চলে।

অন্যত্র অনশন ধর্ম্মঘটের ন্যায় একটা অবভিত্তিপূর্ণ ব্যাপার এড়ানোর জন্যে শেষবারের মত একটা চেষ্টাও যে না

মুদাদিয়ার ও পেরুমিমলের জলাঞ্জলি

হ'য়েছে এমন নয়। কিন্তু সরকার তাঁদের পূর্ব সিদ্ধান্ত থেকে একচুলও নড়বার আনিচ্ছা জানানে সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

বঙ্গ ৩০শে জানুয়ারী সমিতির পক্ষ থেকে রাজ্য সরকারের নিকট প্রেরিত এক পত্রে বলা হয় যে তাঁদের দাবীগুলোকালো সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচিত না হওয়ায় তাঁরা অনশন ধর্ম্মঘটের সিদ্ধান্তের অপরিবর্ত্তিত হ'রে রিয়েছে। এর আগে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে মাধ্যমিক শিক্ষকদের অনশন ধর্ম্মঘটের সিদ্ধান্ত পরিবর্ত্তনের অনুরোধ জানিয়ে সমিতির নিকট এক পত্র পাঠানো হয়েছিল। তারই উত্তরে সমিতির পক্ষ থেকে ৩০শে জানুয়ারী তারিখের সিদ্ধান্তের পুনরুল্লেখ ক'রে সেই পত্রের এই চিঠি লেখা হয়।

সমিতির ঐ পত্রে আরও বলা হয় যে, গৈ কমিশন ও মুদালিয়ার কমিশন সম্বন্ধে শিক্ষকদের মনে বদ্ধিত বেতন হার পুনর্বিবেচনা সুপারিশ করেন। পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সম্মুখে হাজির হবার প্রশ্ন নিশ্চয়ই এসব সুপারিশের ভিরোধী।

শিক্ষা বিভাগের পক্ষ থেকে পরশা ফেব্রুয়ারী নিঃ ঘঃ শিক্ষক সমিতির নিকট প্রেরিত এক পত্রে এই অভিমত ব্যক্ত করা হয় যে, নির্দ্দিষ্ট সব শিক্ষক সমিতি কেন যে অনশন ধর্ম্মঘটের সিদ্ধান্ত ক'রেছে তা তাঁদের বোঝানো হয়নি বা বুঝতে পারা যায় না। বস্তুতঃ যে সব শিক্ষককে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের ইণ্টারভিউতে হাজির হ'তে বলা হ'চ্ছে তাঁদের অনেককেই হাজির হ'তেনা। অতএব শিক্ষা বিভাগের ধারণা এই যে, ঐ সমিতির মতে যে সব শিক্ষক একদম না আসলে সে সব শিক্ষকেরা বিরুদ্ধেই তাঁদের এই অনশন ধর্ম্মঘট।

এই যেখানে সরকারী মনোভাব, সেখানে ধর্ম্মঘট এড়ানোর চেষ্টা বার্থ হবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

দিল্লীর দরবারে বাংলার কোন ঠাঁই নাই

পরিকল্পনার তৃতীয়বর্ষের অর্থ বরাদ্দ বেপোয়াভাবে হ্রাস

রাজ্য প্রতিনিধি দলের সকমুখে প্রত্যাবর্ত্তন

(দর্পণের রাজনৈতিক সংবাদদাতা)

ব্যয়বাহুল্য বিভিন্ন মহলে এই প্রশ্ন উঠেছে—দেহলের পর ভারতের আর কোন রাজ্য রইবে কে? পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রেও বোধ করি গভীরতর আশঙ্কা নিয়ে ঐ প্রশ্ন মনে জাগে—ডাক্তার রায়ের পর কে? বর্ত্তমানে অবস্থা যেমন দাঁড়িয়েছে তাতে কেন্দ্রীয় সরকার এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিভাগগুলো একমাত্র ডাক্তার রায় ছাড়া পশ্চিম বঙ্গের আর কাউকে পাত্তা দেন খুব কমই।

পশ্চিম বঙ্গের একদল অফিসার সম্প্রতি দিল্লী গিয়ে এ অভিজ্ঞতার স্বাদ গ্রহণ ক'রে এসেছেন। পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন বিভাগের প্রতিনিধিত্বে এই দলে প্রায় ৪০জন অফিসার ছিলেন। দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার তৃতীয় বৎসরে এ রাজ্যের বিভিন্ন উন্নয়ন কাজে কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হ'তে পারে সে সম্বন্ধে আলোচনা ক'রবার জন্যে পরিকল্পনা কমিশনের আহ্বানেই তাঁরা দিল্লী গিয়েছিলেন।

গেড়ায় বাঁধের কথা হবে স্থির, তাঁদের সংখ্যা ছিল ৭৪ জনেরও বেশী। কিন্তু শেষ মুহূর্ত্তে ডাঃ রায়ের হুকুমেপত্রের ফলে সংখ্যা কমাতে হয়। তবে দিল্লী ফেরে তাঁদেরকে যে অভিজ্ঞতা হ'য়েছে তা থেকে তাঁরা স্থিরচিত্ত এ ধারণা নিয়েই ফিরে এসেছেন যে আগেই কোথায় না খেয়েই ঘোর কলি হ'ত ভাল।

বস্তুতঃ দিল্লীতে যাঁরা গিয়েছিলেন পশ্চিম বঙ্গের হ'য়ে দরবার ক'রতে, তাঁদেরে মুখিকে আমল দেওয়া হ'য়েছে খুব কমই—প্যাসেজ দেওয়া হয়নি বলাবাহুল্য সভ্যের অপলাপ হবে না। পরিকল্পনা কমিশনের অনেক উচ্চ কর্ত্তাদের এই কথাই শুনিয়েছেন তাঁদের বারবার —শুধু হাতে তো আর আপনাদের বিদায় করছি না, আপাততঃ আপনাদের দাবীদাওয়ার উপরোক্ষ পরিকল্পনা বাবদ ৫ কোটি ২০ লক্ষ টাকা ধ'রে মোট ২৭ কোটি টাকা রিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

যেসব আর্থিক অনটনের পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিম বঙ্গ সরকার নিজে থেকেই রাজ্যের পরিকল্পনার অনেক কাটছাঁট ক'রেছেন। তাঁরা চেয়েছিলেন মাত্র ৪১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা আর এটাই বোধ করি তাঁদের ন্যূনতম দাবীর সর্ব্বনিম্ন পরিধান। এর থেকেও কেন্দ্রীয় সরকার এবং পরিকল্পনা কমিশন মিলে একটা বড় অংশ বাদ দিতে বিশুমাত্র দ্বিধা করেন নি।

যেভাবে এটা করা হ'য়েছে তা যেন কেন্দ্রীয়দোষীপক্ষ; পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে পঞ্চাদকরও বলা যেতে পারে। কেন্দ্রের ছোট কর্ত্তারা অনায়ত্ত পশ্চিমবঙ্গের ছোটকর্ত্তাদের সঙ্গে সামান্যসামান্য কোন ব্যাপারই কথনাকে ক'রতে প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁরা ডাঃ রায়ের অপেক্ষায় ছিলেন। কিন্তু বাংলার পক্ষে আলোচনাকালে উপস্থিত থাকা সম্ভব হয়নি।

পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধি কে ?

পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান শ্রীডি, ঈ, কুষ্ণমাচারী ই'লে ওঠেন "ও, ডাঃ রায়ই আসেন নি। পশ্চিমবঙ্গের আর পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিত্ব করার কে আছেন ?" পশ্চিমবঙ্গের অর্থ বিভাগের সচিব এবং প্রতিনিধিদলের নেতা শ্রীবিনয় লাপগুপ্ত সাহস ক'রে বলে ওঠেন "কেন, আমরাই তো আছি।" "কিন্তু আপনি কে ?" পরিকল্পনা কমিশনের অইনক সদস্য প্রশ্ন করেন। "আমি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থ-সচিব।"

মিনিটখানেক চেয়ারম্যান শ্রীকৃষ্ণমাচারী নরবতা করেন, "আপনাদের সঙ্গে আলোচনা ক'রে কোন লাভ নেই। আমরা ডাঃ রায়ের সঙ্গে কথা বলতে চাই।" শ্রী গগুপ্ত সম্প্রতি হার্ট ব্লক-এসের ধাক্কে সেরে উঠেছেন; ঈশ্বরের কৃপায় তিনি ভিরবি থান নি। কিন্তু এত যাত্রকে যাত্র ঐ, মুখে তাঁর উত্তর দেবার দি। অইনক সারকী তাঁর কাছে কারণে কিছু বলায় পরে তিনি আরও বাঁড়িয়ে আগান-ঐ, ডাঃ রায়ের নির্দ্দেশ বরাই ঘিরি এসেছেন এবং এ সম্বন্ধে কথা বলবার পূর্ণ যোগ্যতা তাঁর আছে।

এর পরে পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যগণ বিভিন্ন দাবার করেন। অইনক সদস্য প্রশ্ন করেন, "বেশ বেশ আপনাদের গাবীর কথা" শ্রী গগুপ্ত কাঁচুমাচু ভাবে বলেন, "৪১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা।" পরিকল্পনা কমিশনের অইনক যোগ্য তেড়ে কথে বাহিরে ওঠেন, "আ ম কমাই এত বি করে দেওয়া যাবে আপনাদের ? কাঁদের না, শেষে কি হবন আখিরি কাজ ? ওরা বাঁচিয়ে পরিকল্পনার মুল-নিরূপণ করাই এখন পাঞ্জাদের উদ্দেশ্য।"

বরাদ্দ অর্থের বেপরোয়া হ্রাস

পরিকল্পনা কমিশনের কার্য্যবলী পাঠা, কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের নির্দিষ্ট ক্ষতার এই নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধিত হয়েছিল যে, পশ্চিমবঙ্গের চাহিদাকে ৩৩ কোটি টাকার নীচে কিছুতেই নামানো হবে না। কিন্তু পরিকল্পনা কমিশন তাতেও তুষ্ট নন। তাঁরা আরও অনেক প্রস্তাব কাটছাঁট করে, অনেক ব্যয় কমিয়ে নিয়ে শেষ পর্যন্ত অঙ্কটাকে ২৭কোটি টাকার এসে দাঁড় করানেন।

সরকারী ব্যয়ের রাজনীতিতে একটা নীতিকালীন পুরোধ বরাদ্দ আনন্দ তাঁরা ভোগ করলেন বটে, কিন্তু আশার আলোচনার ব্যর্থতা তাঁদের যে আনন্দকে নিঃপ্রভ করে দিয়ে। তবে তাঁরা একেবারে ঠকেছেন এমনও বলা যায় না, কারণ এ থেকে তাঁরা যে অতিরিক্ত লাভ করলেন তার মূল্যও কম নয়। এটা তাঁরা হাড়ে হাড়েই টের পেয়েছেন বলে মনে হয় যে, ডাঃ রায় ছাড়া দিল্লীর দেবতাকী কর্ত্তাদের খোকাবেলা করতে গেলে অবজ্ঞা ছাড়া আর কিছুই মেলে না।

কাজেই, আর যাই হোক বা না হোক, পশ্চিমবঙ্গের প্রতি পরিকল্পনা কমিশন এবং কেন্দ্রীয় সরকার বিরুপতার বিরুদ্ধতার কিছুতে সংগ্রাম করে ডাঃ রায় দুর্গাপ্রয়ের ইস্পাত কারখানা, কোক ভট্টী এবং আরও অনেক জিনিষ যে আদায় ক'রেছিলেন তা অস্বীকার করা যায় না। দ্বিতীয় পাঁচসালার বৈঠকে দ্বিতীয় পরিকল্পনার তৃতীয় বর্ষের জন্য যে সিদ্ধান্ত পুরীত হ'য়েছে, পশ্চিম বঙ্গের জন্যেও উন্নয়নের পক্ষে তার কম সুদূর প্রসারী হবে না বোধ হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, এর ফলে রাজ্যের স্বাস্থ্য বিভাগের জন্য এবারকে বিশেষে মাত্র ২ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা

(২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

সম্পাদক—শ্রীব্রজেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য

সম্পাদক—কর্তৃক ক্যালকাটা প্রেস (প্রাইভেট) লিমিটেড, ১নং ওয়েলিংটন স্কোয়ার কলিকাতা—১৩ হইতে মুদ্রিত এবং ৭নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা—১৩, দর্পণ কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

কংগ্রেস দলের বৈঠকে ডাঃ রায়কে চ্যালেঞ্জ

সাপ্তাহিক সংবাদ সাময়িকী

১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা :: কলিকাতা—২১শে ফেব্রুয়ারী শুক্রবার ১৯৫৮ :: মূল্য ২৫ নঃ পঃ

পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ দলাদলির নগ্নরূপ

নেপথ্যে পাকানো বহুদিনের ঘোটের বহিঃপ্রকাশ

(দর্পনের রাজনৈতিক সংবাদদাতা)

বিধান সভাভবনের কমিটি রুমে মঙ্গলবার বিপ্রহরে যে ঘটনা ঘটেছে, সেটা ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি কিনা কে জানে। ১৯৫০ সালে পশ্চিম ভারতের একদল কংগ্রেস নেতা ঠিক একইভাবে কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় পরিষদ দলের সভায় নেহরুর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন এবং তাঁদের ধারণা ছিল যে তাঁরা সর্দার প্যাটেলের পক্ষপুটাশ্রয়ে আছেন। নেহরুর নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সেই বিদ্রোহ অবশ্য মাসিক কংগ্রেসের অধিবেশনে চূর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

আকারে ক্ষুদ্র হতে পারে কিন্তু একইভাবে মঙ্গলবারে পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস পরিষদ দলের বৈঠকে আর একটি বিদ্রোহের ভূমিকা তৈরী হয়েছে। শ্রীযুক্ত অতুল্য ঘোষ এবং তাঁর পার্শ্বচরেরা কিছুকাল যাবৎ কংগ্রেস পরিষদ দলের ভিতরে ডাঃ রায় সম্পর্কে যে সূক্ষ্ম চক্রান্ত আরম্ভ করেছেন তার একটা প্রাথমিক আভাষ এই দিনের বৈঠকে উদ্ঘাটিত হয়েছে।

গত দশ বৎসরের মধ্যে বার একবার ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষের বিরুদ্ধে এইরূপ সংঘবদ্ধ বিদ্রোহ দেখানো হয়েছিল। কিন্তু তারপরে ডাঃ রায়ের আমলে কোনোদিন মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে এতবড় চ্যালেঞ্জ উত্থাপন করা হয়নি। যদিও শিক্ষকদের সঙ্গে আপোষ করার প্রশ্ন নিয়েই এই বিদ্রোহের ভূমিকা রচনা করা হয়েছিল, তথাপি "বিদ্রোহী বক্তাদের" নানাবিধ প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করলে সামান্যও সন্দেহ থাকেনা যে, কে এই বিদ্রোহের পশ্চাতে এবং তাদের অভিসন্ধি কি।

মুখ্যমন্ত্রীর মুখের উপর দাঁড়িয়ে তাঁকে রুক্ষকণ্ঠ দেখানো হচ্ছে এবং কংগ্রেস দলের কয়েকজন "স্যাক রেজ" মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়ের কাছে জবাবদিহি চাইছেন—এই ঘটনা ডাঃ রায়ের জীবনে এই প্রথম বার ঘটেছে। এর আগে পুরাণো "সংসাহসের" পিছনে কার অদৃশ্য নির্দেশ থাকে, সেকথা বিশ্লেষণ করতে ডাঃ রায়ের কাছে অজানা নয়। কারণ, পার্টি'র বৈঠকে যাঁরা এই দিন ডাঃ রায়ের কাছে জবাবদিহি চাইছিলেন তাঁদের বহু শ্রীহাসেমআলি খাঁড়া, শ্রীআনন্দ গোপাল মুখার্জী, শ্রীমতী মায়া ব্যানার্জী, শ্রীনেরাকদের মন্ত্রণসার প্রভৃতি কয়েকজন শ্রীযুক্ত অতুল্য ঘোষের মুখপাত্র—একথা রাজনীতিক মহলের কাছে সুবিদিত।

যে ডাক্তার এই জবাবদিহি চাওয়া হয়েছিল ডাঃ রায়কীর্তি। এঁরা পুস্তাকেই প্রশ্ন সরবরে করেছেন বর্তমান বঙ্গিমন্ত্রী কংগ্রেসের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ রক্ষা করেন। এবং বঙ্গিমন্ত্রী যদি এইভাবে চলে তাহলে কংগ্রেসকে টিকিয়ে রাখা যাবেনা। বক্তারা একথা গোপন করেনি যে, তাঁরা প্রদেশ কংগ্রেসের মুখপাত্র এবং তাঁরা বঙ্গিমন্ত্রীর বিপক্ষে।

প্রকৃতপক্ষে রাজনীতিক মহলের কাছে একথা সুস্পষ্ট যে, এই প্রকাশ্য বিদ্রোহের দ্বারা ডাঃ রায় যদি তাঁর প্রদেশ কংগ্রেসের মুখপাত্রের মুখে একটি প্রাথমিক শক্তি পরীক্ষা করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী শিক্ষকদের সঙ্গে যে আপোষ করেছেন, সেই

(দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সম্পাদকীয় ঃ

দায়িত্ব কার ?

শিক্ষকদের জনসভাস্থলের পর সৌজন্যক্রমে মুখবন্ধ সংবাদপত্রে একটিই কার্টুন প্রকাশিত হয়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, শ্রীযুক্ত সত্যপ্রিয় রায় প্রায় মূর্ছা যেতেই সখ্যত্যাগ করতে সমর্থ হয়েছেন। পাশাপাশি আর একটি চিত্র প্রকাশিত হয়নি। আটদিনের সংগ্রামের পর শিক্ষকগণ যেন রোমীর ন্যায় যে চেহারা নিয়ে কংগ্রেস পার্লামেন্টারী পার্টি' বেরিয়ে এসেছে, তার কোনো কার্টুনের সংবাদপত্রে ছাপা হয়নি। তার প্রতিবাদ নিষ্ফল হয়েছে নয়। (দর্পণের এই সংখ্যায় সেই রিপোর্ট পাশের করলে ছাপা হচ্ছে।)

যে ভাবে এবং যে সর্তে সোমবার শিক্ষকদের সঙ্গে আপোষের ব্যবস্থা হয়েছিল, একদল কংগ্রেসী এম-এল-এ তাই নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে (এবং পরোক্ষে কয়েকজন সদিচ্ছাসম্পন্ন মন্ত্রীর বিরুদ্ধেও) একটা বিদ্রোহের ভূমিকা আরম্ভ করেছেন এবং বোধহয় এটা তাদের প্রথম পরিষদ, যেসব লোক শিক্ষার কোন সদর দেউড়ী দেখেতে পাবেননি, সেইসব সেবার সীতার এবং দিল্লী কংগ্রেসের করেকটি পাও। এই ঘটনার অন্তরবর্তী নেতা। প্রকৃতপক্ষে, অতুল্য বাবুর দল এই ঘটনাটিকে একটি ভাক্তার হিসাবে ব্যবহার করতে যাচ্ছেন। এবং পরে দুটাই উদ্দেশ্য প্রথমত, বিধানচন্দ্র রায় সম্পর্কে পার্টিতে প্রকাশ্য সমালোচনার সূত্রপাত ঘটানো, যাতে ভবিষ্যতে মুখ্যমন্ত্রীত্বের গদি পরিবর্তনের বাধাগুলি অপসৃত হয়। দ্বিতীয়তঃ বঙ্গিমণ্ডলীর মধ্যে অতুল্যবাবুর গোষ্ঠি বর্ধিষ্ণুত যাঁরা আছেন, তাঁদের ক্ষমতা হ্রণ করা। একটি শিক্ষক ধর্মঘটের ফলে এই মারাত্মক চক্রান্তের মধ্যে কংগ্রেস পার্লামেন্টারী পার্টিকে জড়াতে হয়েছে। কিন্তু বিবুদ্ধি সম্পন্ন কংগ্রেসের লোকদের জন্য চিন্তান্বিত হওয়ার আরও কয়েকটি বিষয় আছে।

প্রথমতঃ, এই প্রস্তাবির সদুত্তর সন্ধান করতে হবে যে, আটদিনের এই সংগ্রাম করি অপরিণামদর্শিতার ফল? বুদ্ধিবহী? শিক্ষানবী? অথবা শিক্ষাপ্রবরের সেরেটারী?

সোমবার যে সর্ত শিক্ষকদের দেওয়া হয়েছে, গত ডিসেম্বর মাসেই সেই সর্তে

রায় সম্মত হয়েছিলেন। কার প্রবোচনায় সেই আপোষ বানচাল করতে হয়েছিল, এই প্রশ্নটির উত্তর সন্দেহজনক ভিত্তিহীন করলেও না কেন তৃতীয়-বি-টি-এ'র প্রতিনিধি আশুর কথাবও প্রাথমিক দায়িত্ব ছিল ডাঃ ডি এন সেনের উপরে। তিনিই মধ্যস্থে পরামর্শ দিয়েছেন এবং প্রথম আপোষ তাঁরই প্ররোচনায় বানচাল হয়েছে। তাঁর জন্য গত ৪ বৎসরের মধ্যে গভর্নমেন্টকে দুইবার দুটি মারাত্মক আন্দোলনের সাধারণের। এই বাড়ি জনসাধারণের কোন কাজে লাগানো যাবেনা।

"আমি যে রাজ্যকে কথা দিয়ে কেনেছি। ওখানে একটা হাসপাতাল করা যায় না?"—জিজ্ঞেস করলেন ডাঃ রায়। বিভাগীয় সেক্রেটারী উত্তরে বললেন, মেরামত করে হাসপাতালের উপযোগী করে নিতে প্রায় আরও পাঁচ লক্ষ লাগবে। এর কুল্য, সাত লক্ষ টাকা অনেক বেশী ধরা হয়েছে। "একটা মোট লিখে পাঠাও", বলে বিরক্ত ডাঃ রায় সেক্রেটারীকে বিদায় করলেন।

ডাঃ রায়ের দরদ !

রাইটার্স বিল্ডিংএ জনিষ্ঠার প্রবেশ কর্মচারীর অভাব নেই। তাঁদেরই একজনের তরিবে ব্যাপারটা আবার শীঘ্রই চাড়া দিয়ে উঠল। ডাঃ রায় স্বাস্থ্য বিভাগের ডাইরেক্টরকে ডেকে বললেন, ওহে, নারকোলার রাজার বাড়িটা কেনা হচ্ছে, ওখানে বিকাশগুপ্ত রোগীর হাসপাতাল হবে। রাঁচীর হাসপাতালে আমরা টাকা দিচ্ছি, অথচ আমাদের কোন কটা-চুলে নেই, ভেবেনাগুলিতে তাদের বাবার বর্ত্তমানে যে ব্যবস্থা আছে, তা বিজ্ঞানসম্মত নয়।

ডাইরেক্টর বললেন, ওটা বিকাশগুপ্ত রোগীর হাসপাতালের উপযোগী নয়। প্রথমতঃ গঠনের দিক দিয়ে হাসপাতালের চাহিদা ভিন্ন রকমের, কাজেরাটা সে চাহিদা মিটিয়ে পারে না। ভেতে

(২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জমিদারী উচ্ছেদের পর সরকারী তহবিল দিয়া জমিদার পোষণ

(দর্পনের বিজস্ব প্রতিনিধি)

মুর্শিদাবাদে লালগোলার রাজার প্রাক্-নিকেতন। এবন একেবারে ডগুপগুর পৌঁছেছে। একন বছরের আগে প্রাসাদটি তৈরী হয়েছিল। এর অতীত ছিল বটে, কিন্তু বর্তমান ডগুপুপের মধ্যে। ভবিষ্যতের তো প্রশ্নই উঠেনা, কিন্তু এই ভবিষ্যৎ নিয়েই বাংলা সরকার খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। এই বাস্তুহার ইতিহাসটি চমৎকার।

প্রাসাদের বর্তমান মালিক যুবরাজী ডাঃ বিশ্বনাথ রায়ের কাছে বিয়ে বলেন, আবাদের জমিদারী নিয়ে নিলেন, এখন আমাদের উপায়? এই বাস্তুহারাদের প্রতি কি আপনাদের কোনো কর্তব্য নাই? ধনীর আবেদন ডাঃ রায়ের হৃদয়ে পৌঁছতে দেরী হয় না। তিনি তাঁর প্রস্তাবে রাজী হলেন। ভূমি ও রাজস্ব বিভাগের মন্ত্রীকে ডেকে বললেন, লালগোলার রাজার প্রাসাদটি দেখে কিনে ফেলবার ব্যবস্থা কর।

ভূমি ও রাজস্ব মন্ত্রী সেক্রেটারীকে সঙ্গে নিয়ে লালগোলায় গেলেন। রাজা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তাঁদের সব দেখালেন। তাঁরাও দেখলেন, বলবেন না কিছু, কারণ বলবার যা আছে, কলকাতা গিয়ে ডাঃ রায়কেই বলবেন। বাড়ী দেখে আর রাজার আতিথ্য গ্রহণ করতে তারা পেরেন না। ডাক বাংলোয় ফিরে এলেন। কলকাতায় ফিরে আসবার পর তাঁরা ডাঃ রায়কে বললেন, এ প্রাসাদ ৭ লক্ষ (৯) টাকা দিয়ে কেনার কোন অর্থ হয়না। বিশেষতঃ টাকাটা যখন জনসম্পদ হতে হয়েছে, যিনি মুখ্যমন্ত্রীর এবং অধিদপ্তরকারিতার দ্বারা শিক্ষক নিগ্রহের নজীরের পথে বার বার নামিয়ে আনছেন, সেই কংগ্রেস-শাসিত-পোষিত সেক্টোরীয়ট প্রভৃতি পার্লামেন্টারী পার্টির দৃষ্টি পড়ে না কেন?

একথা সুস্পষ্ট যে, শিক্ষকদের বর্ষে কংগ্রেস কোনো ফুল্ট বরা করতে পারেনি। কিন্তু তার ক্ষেত্রেও সাংঘাতিক কথা, গভর্নমেন্ট শিক্ষকদের বর্ষে যে সহযোগিতার ফুল্ট সৃষ্ট করতে পারতেন, এই সেক্রেটারীয়ট দ্বারা তাও সম্ভব হয়নি। অবাধিকা পথেরে অবাচারে, শিক্ষকদের উপরে অবমাননা এবং ব্যুরোক্রাটিক মেজাজের দ্বারা ডাঃ ডি এন সেন গভর্নমেন্টের ফুল্ট সৃষ্ট করেছেন। শেষ পর্যন্ত এই একটি ব্যক্তির জন্য পার্লামেন্টারী পার্টিতে ডাঃ রায়কে চক্রান্তের সম্মুখীন হতে হয়েছে। ১৯৫৪ এবং ১৯৫৮'র আন্দোলনের মধ্যবর্তী সময়ে বুদ্ধার গভর্নমেন্টের মর্যাদা নামিয়েছে। গ্রাণ্ডমেন্ট নিবাচক মণ্ডলীতে ২টি পরাজয় লোচনীয় হয়েছে এবং শিক্ষক নিবাচক মণ্ডলীতে এ-বি-টি-এ'কে কংগ্রেস দুইটি আসন উপহার দিতে থাবা হয়েছে।

অঘঃ কর্কটের কথা

(দর্পনের প্রতিনিধি)

সম্প্রতি কলিকাতার একটি কফটের পার্টি'তে হাজির থাকার সৌভাগ্য হয়েছিল। সেখানে দেবি, বেয়ার ত্রিগুণা সেনকে ঘিরে রয়েছেন কয়েকজন বিশিষ্ট অতিথি। অতিথিদের মধ্যে ছিলেন কতিপয় বিদেশী। আলোচনা চলছিল কলোরেশনের দুর্নীতি বিষয় সম্পর্কে বেয়ারের পুচ্ছটা নিয়ে।

ডাঃ সেন দুঃখ করে বলছিলেন : "দুর্নীতি খুবই ব্যাপক এবং খুব নেওয়ার এতটুকু সুযোগ সুবিধা কেউ ছাড়ছে না। এই যেমুন না দেখিন একজন রুপ প্রতিনিধি দুঃখ করছিলেন যে তাঁর কাছে পর্যন্ত খুঁষ চাওয়া হয়েছিল।"

"কি রকম!" আশ্চর্য্য হয়ে একজন জিজ্ঞেস করলেন।

"এর রকম সকম নেই" বেয়ার দুঃখ করে বলেন। "ডিলাইয়ের ইম্পাত কারখানার জন্য কিছু সরঞ্জাম এসেছিল কলিকাতা পোর্টে। রুপ প্রতিনিধি সেগুলি ছাড়াতে চেয়েছিলেন। তাকের ওপরে কর্মচারী বলেন, কিছু টাকা না দিলে সে তাঁর কাজ করে দিতে পারবে না। রুপ ভদ্রলোক বলেন, আমদানী লিসিন্সগুলির মাশুল তিনি দিয়েছেন এবং এগুলির বাবদ আর কিছু দেয় নাই। পোর্টের কর্মচারী বলেন, তিনি যে টাকার কথা বলছেন, এ টাকা পেয়ে থাকেন এবং এটা তাঁদের প্রাপ্য। রুপ ভদ্রলোক অবশ্য খুঁষ দিতে রাজী হননি এবং উপরে দরবার করে বার ছাড়িয়ে নিয়েছিলেন।"

মেয়রের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পশ্চিম বাংলার একজন পদস্থ কর্মচারী কলিকাতা মেটের ডেইলর ডিপার্টমেন্টের দুর্নীতির কথা বলতে গিয়ে বলেন, কিছুদিন আগে, বিশেষ অনুসন্ধান করে দেখা গেছে যে, ওখানকার একজন কর্মচারীর মুখে বাৎসরিক আয় এক লক্ষ টাকা। এই নিয়ে খুব একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীও তিনের মধ্যে আভাষ পাওয়া যায়। তাঁকে এবং আরও কয়েকজনকে ঐ ডিপার্টমেন্ট থেকে বদলি করা হয়। তার ফলে অবস্থার অনেকটা পরিবর্তন হয়েছে।

এখানে উল্লেখ করি, মেয়র এবং সরকারী কর্মচারী, দুজনের হাতেই ছিল "শাফ ডিউস"।

অন্যান্য পৃষ্ঠায় পাবেন

- চিঃ চিঃ (পৃষ্ঠা ৩)
- দিনেমা সমালোচনা (.. ৩)
- চিত্র বিচার বিশ্লেষণ (.. ৪)
- কবরার অভাব (.. ৪)
- চিত্রালী ও কুকুরের প্রতিযোগিতা (.. ৬)
- গ্রুপ বিভাগ (পৃষ্ঠা ৬)
- পাছ চর্চার সর্ববনে (.. ৭)
- বিজ্ঞান আলোচনা (.. ৮)
- নিঃ বঙ্গ ভাষা সম্মেলন (.. ৮)
- মুলার খেলার (.. ১৩)

চাগলা রিপোর্ট সম্পর্কে সংবাদপত্রের মতামত কম্যুনিষ্ট পার্টির গঠনতন্ত্রে পরিবর্তন

ডাঃ রায়ের দাপটে চক্রীদের পশ্চাদপসরণ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে এই শক্তি পরীক্ষার আয়োজন করা হয়েছিল এবং "বিদ্রোহীরা" পার্টি কেন্দ্রগুলির মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলেন। বৃদ্ধ কেশরী অবশ্য তাঁর স্বভাবসিদ্ধ হুঙ্কারের দ্বারা দেখিয়ে দিয়েছেন যে, এখনও সবল আছেন। বিধান চন্দ্র রায়কে যদি অতুল্য ঘোষ সত্যই পদিচ্যুত করতে চান তাহলে তার সময় এখনও আসেনি।

বঙ্গলবার পার্টির বৈঠক আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অত্যাশক শ্যামাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য প্রমুখ নিষ্কলঙ্কের অনশন ও সাময়িক পুলটি প্রত্যাশন করেন। অবশ্য একথা বলা বুদ্ধিল যে বেদিনীপুরের এই বীরত্বাবী সর্বশক্তি অন্তরাত্মাবন্ধী প্রচারকের কোনো খবর রাখতেন। সঙ্গতও তিনি নিম্নকে একটি আলোচনার অবতারণা করতে দিয়েছিলেন। কিন্তু কংগ্রেসের পলিক, ডাক্তার অনশন নেতা শ্রীযোগেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে যে কথা বলা হয়েছিল, তা সত্য প্রমাণিত হওয়ার পরেই যোগেশ মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্য কংগ্রেস নেতারা অনশন ভঙ্গ করেন। ডাঃ রায় বলেন : আমাদের বিরোধিতা করে যাঁরা অনশন করেছিলেন তাঁরা আমাদের সহকর্মী। তাঁদের সঙ্গে আমাদের কোনো বিরোধ নেই। তাঁরা অনশন ভঙ্গ করেছেন, এতে আমরা খুশী হয়েছি। তাঁরা যে দাবি করেছিলেন তা আমরা মেনে নিয়েছি। আমাদের বিরোধিতা করে তাঁরা যে ভুল করেছিলেন তা তাঁরা বুঝতে পেরেছেন। তাঁরা আমাদের সহকর্মী হিসাবে কাজ করবেন।

সিংহের গর্জ্জন

বিজয় সিং নাহার এককালে কুখ্যাত নরীর দলের লোক ছিলেন, কিন্তু একবৎসর হল তাঁর রতি পরিবর্ত্তন হয়েছে। কেননা, প্রভূত পুচার ও ওজর সত্ত্বেও গত বৎসর বহিসভার পদ পর্য্যন্ত তাঁর নাম অন্তর্ভুক্ত হয়নি। সেই বিজয় সিং নাহার বোধহয় ভাবলেন যে, একটা পরম সুযোগ হস্তচ্যুত হতে চলেছে। তিনি হঠাৎ উত্তেজিত ভাষায় আরম্ভ করলেন কংগ্রেসকে দাঁড় করিয়ে রাখতে হয় আমাদের। আজ আপনি বুঝবেন আছেন, আমরা আছি।

ডাঃ রায় বাধা দিয়ে জোড় হাত করে বিজয়ের স্কন্ধে বললেন : "ডাহলে এঁর তোমরাই এখানে এসে বল।"

শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল সেন এবং কালি মুখার্জী বিজয় সিংহবাবুকে একেবারে পাশেই ছিলেন। এতক্ষণ তারা চুপ করেছিলেন। এইবার তাঁদের উত্তেজনার মাত্রা দেখে তাঁদের মনে হল যে, প্রথম কিস্তিতেই একদুত্ত জানবা। তাঁহারা দু'জনের পক্ষেই এতটা উত্তেজনা সহ্য করা কঠিন। (শ্রীযুক্ত সেনের সে মুড (প্রশোন আছে, কালীবাবুর হাই মুড (প্রশোন) তারা নারায়ণে পাত্রীটিই ধরে টেনে বসিয়ে দিলেন। কিন্তু তবুও তিনি হাত পাঁ ছুঁড়ে বলছিলেন : এ জিনিষ কতদিন সহ্য করা হবে। পার্লিমেন্টারি সেক্রেটারীশিপ ছেড়ে দিচ্ছি। আমি রিজাইন করব।

ডাঃ রায় যে মুহূর্ত্তে বসলেন, তাহলে কোনমুহূর্ত্তে এসে এখানে সব; বিজয়বাবু মুখ থেকে বেরোতে বেরোতে তার পাশেই অন্যান্য মিনের : আমাদের বিরোধিতা করা হল। না হলে আমি একা বলছিলাম আপনারা ছাড়াও তোমরা (I is hightime that you resign.

ডাঃ রায় আওনের মতো জলে উঠলেন। তাঁর স্বরে বলতে আরম্ভ করলেন : ভেবেছ কি তোমরা। আমাকে চোখ রাঙাবে ? তোমরা যে কি পদার্থ আমার জানা আছে। আমি যা ভাল বুঝব করি, দেশের স্বার্থে, সাধারণ মানুষের স্বার্থে এবং কংগ্রেসের স্বার্থে আমি যা ভাল মনে করি আমি তাই করে থাকি। অপোজিশনের দুই একটা লোকের মতোও যদি সাধারণ এসে তোমাদের থাকত তাহলেও কথা বলার মুখ ছিল—আমাকে তোমরা শেখাবে, কি করব না করব ?

ডাঃ রায়ের প্রশ্নবাণ

নাটকীয়তার ডাঃ রায় বৈঠক থেকে বেরিয়ে এসেন। বিধানসভার শিক্ষকদের পুনরায় বলতে আরম্ভ করেন পার্টির বিদ্রোহের উপরে তিনি তাঁর রাগ একবার ঝাড়লেন। জ্যোতিষ বাবু এবং মতীন চক্রবর্তীর নাম উল্লেখ করে তাঁদের বন্যবাদ দিয়ে বললেন যে, বীরাংগার এঁরা বাড়িয়ে এসে সাহায্য করেছেন।

বঙ্গলবার এই ঝড়ের পরে বুধবার বিধান সভায় আসন গোপালের আসন খালি; বিজয় সিং নাহার কোথায় গেছেন-শ্রীযুক্ত অতুল্য ঘোষের সঙ্গে পরামর্শের জন্য কিম্বা তা কেহ জানেনা। যারা বাসনাই অনুপস্থিত, হংসেশ্বর ঝাড়ও সে সময়ে বেপাত্তা।

একথা ওয়াকেফহাল রাজনীতিক মহলকে অনুমান করতে হয় না যে, ঐ প্রকাশ্য বিদ্রোহের পিছনে দীর্ঘকালের সঞ্চিত ঈর্ষা এবং চক্রান্তের ইঙ্গিত রয়েছে। গত সংখ্যার দর্পণে বরিসভার যে অন্তর্দ্বন্দ্বের কথা বলা হয়েছিল, বঙ্গলবার ঘটনা তার একটা বৃহৎ বহিঃপ্রকাশ। পার্টির অতুল্য-ঘোষ-অনুচরের দীর্ঘকাল ধরে সিদ্ধান্ত নয় এবং মন্ত্রিসভার নবীন অংশকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার। সিদ্ধান্ত রায়ের প্রতি ডাঃ রায়ের স্নেহ এবং সিদ্ধান্তের কতকগুলি ব্যাপারে ঔদাসীন্য, এদের মধ্যে যে তীব্র ঈর্ষার সঞ্চার করেছে, সেটা পার্টির কাণাঘুষা থেকে আরও আগেই সুস্পষ্ট হয়েছিল। এঁরা যে সিদ্ধান্ত নয় এবং ২।৪ প্রধান কাবণ : (১) এই নবীন বহিরওনী অতুল্যবাবুর দলের লোক নন, (২) এবং এঁরা বহিসভার স্থান পাওয়ায় অতুল্যবাবুর কয়েকজন উপযোগী অনুচর বহিরওনীর মধ্যে ঢুকতে পারেন নি। গত জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী মাসে আসন গোপাল, বিজয় সিং নাহার, ব্যোমকেশ মজুমদার—এঁরা প্রত্যেকেই নরীত্বের জন্য প্রভূত উমেদারী করেছেন।

সব চেয়ে লক্ষণীয় যে, এই পার্টির বৈঠকে প্রফুল্ল সেন এবং কালী মুখার্জী নীরব ছিলেন। এমনকি একথা যে কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তির কাছে সুস্পষ্ট যে এদের নীরব সমর্থন বিদ্রোহীর পিছনে ছিল। বৈঠক থেকে বেরিয়ে এসে এদেরই একজন পরিষ্কার বলেছেন আমরা কি করব ডাঃ রায় তো আমাদের পরামর্শ নেন না।

ডাঃ রায় কার পরামর্শ নেন ?

ডাঃ রায় কার পরামর্শ নেন ? এই প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ। নিম্নে অনশনের বীরাংগার পিছনে অন্তরালবর্ত্তী ঘটনা যাঁরা জানেন, তাঁদের কাছে একথা অজ্ঞাত নয় যে, গোধবার রাত্রে বিধান সভার বৈঠক শেষ হওয়ার পর বিধান রায় ভবনেই ডাঃ রায়ের ঘরে একটি জরুরী সভা হয়েছিল। সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন ডাঃ রায়, শিক্ষামন্ত্রী হরেন্দ্রনাথ রায়, কালীবাবু, প্রফুল্ল সেন, সিদ্ধার্থ রায় এবং পাঁচজন পদস্থ দাস ব্যাবাসী। এই বৈঠকে সিদ্ধার্থ রায়, ডাঃ রায়ের সঙ্গে প্রায় দুই ঘন্টা যুক্তি তর্ক করেন এবং পদস্থ দাস ব্যাবাসী ছিলেন তাঁর সমর্থক। শেষ পর্যন্ত ওইখানেই বীরাংগার সর্ত্ত স্থির হয় এবং ঐ ঘর থেকে বলেই প্রেস নোট রচনা করা হয়। ডাঃ রায় শেষ পর্য্যন্ত শিক্ষামন্ত্রী এবং কতকটা কালীবাবু ও প্রফুল্ল সেনকেও উপেক্ষা করে বীরাংগার সর্ত্ত সম্বন্ধে সিদ্ধার্থ রায়ের সঙ্গে একমত হন। এই ঘটনাটি পার্টির ভিতরকার ইতা আরও পুঞ্জীভূত করেছে।

—দিল্লীর চিঠি—

(প্রথম বিশ্বের প্রতিনিধি)

শ্রীটি, টি, কৃষ্ণমাচারী অর্থ মন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন একবছর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রধান মন্ত্রীর কাছে যেসের প্রায় প্রত্যেকে কোথ থেকে তার আসতে শুরু করে যার ভাব ও ভাষা নাকি কতকটা এই ধরণের আমরা বুঝতে পারছি শ্রীটি, টি, কৃষ্ণমাচারী নির্দোষ। আমাদের অনুরোধ তাঁকে পদত্যাগ করতে নিষেধ করুন।

একটা আঙ্কা নয়, শত শত নয়, হাজার হাজার চেলিগ্রাম।

কে বা কারা এই সব চেলিগ্রাম পাঠাবার ব্যবস্থা করেছেন তা অনুমান-করতে কষ্ট হয় না। কেননা, কৌশলটি পুরনো এবং নিতান্ত অপরিচিত নয়। বলম্পটি দিয়ের সমর্থকরা কি ভাবে পাত্রিদের বলে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন অনেকেই হয়তো তা এখনও ভুলে যাননি।

শ্রী টি, টি, কৃষ্ণমাচারীর সমর্থকদের চেলিগ্রামগুলি যে একেবারে নিষ্ফলে যায় নি তার প্রমাণ শ্রীটি, টি, কৃষ্ণমাচারীকে লেখা প্রধান মন্ত্রীর চিঠি।

* * *

শ্রী টি, টি, কৃষ্ণমাচারী বিদেশ সফরে গত অর্থ বছরের মধ্যে নিয়েছেন প্রায় প্রধান মন্ত্রী, অবশ্য সাময়িকভাবে। এ সময়ের এ বছরের জন্যে যেসমস্ত সেবকের একাত্ত আভাব। পরশী রাত্রি ন'ন। বোম্বাইয়ী ভাইও অনিচ্ছা জানিয়েছেন। আজাদ সাহেবের কথা ওঠে না। এঁদের বাদ দিলে কেবিনেটে ও পদের যোগ্য লোক নেই। কেবিনেটের বাইরে খোঁজ-খবর নেওয়া হ'চ্ছে। আবেরিকায় ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রীবসনবিহারী লাল মেহতার নাম অনেকের মুখেই উচ্চারিত হ'চ্ছে।

এখানে অবশ্য একটা কথা বলা দরকার। মন্ত্রী হতে গেলে দপ্তর সম্পর্কিত বিশেষ জ্ঞান সকল ক্ষেত্রে আবশ্যিক নয়। আস্থা ক্রীকে আস্থা বিজ্ঞান না জানলেও চলে। আমাদের বেন, পূর্ত বা যোগাযোগ মন্ত্রীরা কেউই ইনজিনীয়ার ন'ন। কৃষি মন্ত্রী কৃষিকর্মে কোন দিন শিক্ষা নিয়েন বলে শুনি নি। পুরিত্রাণ ক্রীর সময় নষ্ট করিয়ে পায়সপিয়ে ঘুরে থাক কুচ-সাওয়াজও করেন নি কোন দিন। ব্যতিক্রম বোধহয় একটি ক্ষেত্রেই —তিনি আইনমন্ত্রী।

রাষ্ট্রপতিদের সম্বন্ধেও বড় গুণ ধরনের সন্ধান। কিন্তু অর্থমন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছেন বরাবরই দলের বাইরে থেকে। সম্পূর্ণ চেষ্টা, জন যাবাই, সেদুর্ঘ কি কৃষ্ণমাচারী কেউই দলের লোক ছিলেন না। কেবলমাত্র জন যতিও দলে ভিড়ে পড়ার প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন।

অতীতে অর্থমন্ত্রীর গদী পেয়েছিলেন দলের সুপরিচিত ব্যক্তিরাই। কেননা তাঁদের সুপারিশ ছিল অনেক বড়। বিড়লা গোষ্ঠি বা এসোসিয়েটেড প্রেসের মত কোনো সংস্থা কখনও মুন্সী ব্যাপারে কেঁদে না গেলে যেন কিছুদিন মন্ত্রিত্ব করতেন।

যাঁরা পরবর্তী অর্থ মন্ত্রীর পদের জন্য শ্রীপরমবিহারী লাল মেহতার নাম উল্লেখ করছেন তাঁদের বিশ্বাস শ্রীযুক্ত মেহতার পিছনে ওয়াল ষ্ট্রীটের সমর্থন আছে।

* *

এর পিছনে অন্যো নিয়বিত যোগাহারা, অধিবেশন কালে দৈনিক ভাতা, রেলের পাশ উত্যাদি নানা সুবিধার ব্যবস্থা হয়েছে এখন বাকি রয়েছে ওয়েনসনের। পাঁচবছর পরে এর পি বয়েদের যদি পুনর্নির্বাচিত না হতে পারেন বা নির্বাচিত হবার পর এর পি জীবনের মেয়াদ ফুরোবার আগেই যদি তিনি ইহলীলা সংবরণ করেন তাহলে তাঁকে বা তাঁর পোষ্য পরিবারবর্গকে কে দেখবে।

সংবিধান রচনাকালে "কাফী কাজা মনে হয়নি। হ'লে অবসরপ্রাপ্ত এর পিদের জন্য পেনসন এবং তাঁদের মৃত্যু ঘটলে তাঁদের পরিবারবর্গের ভরণপোষণের নিশ্চয়ই একটা ব্যবস্থা হোত। এখান 'সে ভুল শোধরানোর কথা রাষ্ট্রপুরীল যখনে কেউ কেউ আবছেন। এবং আমর বিশ্বাস তাঁদের সে চেষ্টা শীঘ্রই হয়তো একটা বিলের আকার নেবে।

এই ভাবে ভবিষ্যতের ভাবনা থেকে মুক্ত হ'তে পারলে এর পিরা তাঁদের কাজে আরও বেশী মন দিতে পারবেন।

(৩য় পৃষ্ঠার ৩য় কলমের পর)

সুতরাং অনেক পরিশ্রম ও প্রভূত অর্থ ব্যয়েও 'বাঙ্গার ইস্তিজা' সরকারীর হয়ে উঠতে পারেনি। একথাত্র বাঙ্গিলের অভিনয় কৃতিত্বই সত্যি তারিফের যোগ্য ; যদিও তাঁর বাক্তাবও অত্তরীন ধৈর্য্য ও আত্মগুরি ব্যাপারের চাপে সবকে চেনে রাখতে পারে না।

আয়গার আয়গার হবির বা ভাস্কর্য্য নেই। কিন্তু সব সময় নয়; আবসরসীতও উল্লেখ বৈশিষ্ট্য অর্জন করেনি।

তুমি সা নাহি লেখা

শেষ ছবিটি হ'লো কিশিবভাবের 'তুমসা নাহি দেখা' অর্থাৎ তোমার মত দেখিনি আর। কথাটা পুরা সত্যি, অন্য অর্থে।

কাহিনী, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা নাজীর হোসেন-এর। অভিনয়ে আছেন পাশী কানুর, অবিতা ও অন্যান্য। এ-ছবি তোদার আগে উদ্যোক্তারা ঘ'রেই নিয়েছিলেন যে দর্শক শুধু বিরক্ত ও বোধহীন নয়, উপরন্তু সবাই ছিনুনুল জীবন যাপন ক'রে ক'রে, ছটি ও কলপনার অপমৃত্যু ঘটিয়ে, বর্ত্তমানে যেসবও হ'য়ে গেছেন। তাদেই ছবির আরম্ভ থেকেই দেখা যায় নায়ক বাগানে বাগানে ঘুরে অপরিচিত তরুণীদের অঙ্গুলি নির্দেশে দেখিনি আন। আবার বাগানে ঘুরে অপরিচিত তরুণীদের অঙ্গুলি নির্দেশে মনস্কাম জানায়, নানান রকম মুখভঙ্গী করে, অঙ্গ দোলায়, চোখ নাচায় ইত্যাদি। এবং সবে শেষে তরুণীরাও কোনর দুলিয়ে তালে তালে তথাকথিত নাচ নাচে, হোকরাকে আঁখি ঠারে, হাসির নাচে,বাঁকে দেখায়।

এদের নায়ক যে প্রথম থেকেই নায়িকাকে চোখ মারবেন, খুব বিরক্তেন, অন্তজলী যেকেনো এবং অভিনেষ্ট এবংবিধ ওথকৌটিতে রাজকন্যার বনোহরণ করবেন সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই, থাকলে 'তুমসা নাহি দেখা' পুস্তক কর্ত্তা এগাত্ত কর্ত্তব্য। নইলে এ ছবির বন্ধো আর কিছু দর্শনীয় নেই।

(৩য় পৃষ্ঠার ৪র্থ কলমের পর)

ঘটনাটি ঘটেছে ১৯৫৬ সালে। তখন ডাঃ রায় মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন না। তিনি ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের সভাপতি। তখন তাঁর বাড়ীতে একটি বৈঠক বসে। সেই বৈঠকে ছিলেন ডাঃ রায়, প্রফুল্ল সেন, কালী মুখার্জী, অতুল্য ঘোষ, সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, সুধীরচন্দ্র রায়চৌধুরী, সুবোধ ব্যানার্জী, কানাই ভৌমিক, সুশীলা ধাড়া, রেণু চক্রবর্তী, হরিপদ ভারতী, রাধা গোস্বামী, ভূপতি মজুমদার, নিরঞ্জন সেনগুপ্ত, রমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, সুধীর দাশগুপ্ত, ভূপেন দত্ত, সুধীর গুহ, ভূপেন নাগ, সুধাংশু দাশগুপ্ত, সুধীর বসু, সুধাংশু মুখার্জি, সুধীর মুখার্জি, বসুধা মুখার্জি, সুধীর মিত্র, ইন্দ্রসেন।

বৈঠকে উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে কয়েকজন ছাড়া সকলেই ছিলেন কংগ্রেস কর্মী। বৈঠকে কংগ্রেসের সাংগঠনিক অবস্থা নিয়ে আলোচনা হয়। কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ কি-ভি-এ'র জন্য ডাঃ রায় একবার পরোয়া করলেন না।'?

●

এই দুইটি বক্তৃতার পর বৈঠকের আবহাওয়া মুহূর্তেরমধ্যে বদলে গেল। নিম্নে থেকে, পাশ থেকে অতুল্যবাবুর পার্শ্বচরেরা উচ্চকণ্ঠেই (অবশ্য বলে বলে) বক্তব্য ছুঁড়ে মারতে লাগলেন। শ্রীসেনবন্ধব ধাড়া—অতুল্যবাবুর দক্ষিণ হস্ত বিনি—তিনিও দাঁড়ালেন। বিজয় সিং নাহারকে দেখা গেল গজরাতে। শ্রীসেনী ধাড়া ব্যানার্জীর কাংসা কণ্ঠ কি বলছিল, স্পষ্ট বোঝা গেল না।

ডাঃ রায় উত্তেজিতভাবে দাঁড়িয়ে উঠলেন, পাশ থেকে অতুল্যবাবুর সমর্থন করা তাঁর পক্ষে কঠিন হয়ে পড়েছে। প্রথমে তিনি যোগকেশকে বরবেন—লজ্জা করেনা বলতে স্টিলার্স কুংগ্রেস কথা বল ? তোমরা দেবার কুংগ্রেস কি করছে ? তোমাদের আর্দ্ধি কর টাকা দিয়েছি ? গভর্নমেন্ট-টের সাপোর্ট কম পেয়েছ ? কতটা সিট তোমরা ইলেকশনে পেয়েছ ? অন্নই-কি-ভি-এ একটা Shadow organisation, কাজের সময় তার চিহ্ন পাওয়া গেলনা।

পড়ো বাড়ী, সরকারের কাছে চেয়ে পেয়ে গছিয়ে দেবার চেষ্টা শুধু প্রকাশ অধিবেশনে মর্ণেই নীরবতা নয়। রাজস্ব বোর্ডের সভা শ্রীঅন্নদাশিষ তাঁর গ্রামের বসতবাটী সরকারের নিকট বিক্রী করবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিলেন, ঘাটি হাজার টাকায়। চীপ সেক্রেটারী বরদেন, শ্রীঅন্নদাশিষ নিজের বাড়ী নিজের ডিসাটিবেশকে দিয়ে কিনিয়ে নেবার চেষ্টা করছেন, কাজটা ভাল দেখাচ্ছেনা। রাজস্ব বোর্ডের সেক্রেটারী বাড়ীটি দেখে এসে বরদেন জনগণারদের টাকায় এটা কিনবে, তার অপব্যবহার হবে। শ্রীঅন্নদাশিষ দুঃখ করে বরদেন, আমার পুত্রবধূর স্যাবোজিক করদেন।

বাংলা সরকারের প্রক্তন স্বরাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারী এবং বর্ত্তমানে কলিকাতা পোষ্ট কমিশনের চেয়ারম্যান শ্রীনায় কে নিয়ে অন্য পথে দেখেন। তার কৃষ্ণনগরের ভগ্নপ্রায় বাড়ী সরকারের কাছে পর বরদের বন্দোবস্ত দিলেন। জানেন বাড়ী ব্যবহার করতে হবে, সরকারকে মেরামত করে দিতে হবে। ফলও ভাই। পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে নিজা বিভাগ বাড়ীটা সারিয়ে নিয়েছে। শ্রীবির মতো নামে ডাড়া পাচ্ছেন এবং অবসর গ্রহণের সময় সঙ্গে সরকারের কাছ থেকে একটি নতুন বাড়ী উপহার পাবেন।

কোন কোন নরীর অধিবেশক বনোবৃত্তির সুযোগ নিয়ে, অফলো জনি সরকারের কতক চাপিয়ে দেওয়ার অনেক নজীর আছে। পূর্ববঙ্গের বাস্তহারাদের পুনর্বসতির জন্য সরকার চার শতের বেশী জমি করেছেন। এ সকল জমির বরো ১১শটির জন্য যে জমি কেনা হয়েছে, তা জমি নয় জলাভূমি এবং তা কখনও উদ্ধার করা যাবে না।

রহিমপুরে সমবেত বড় গুণ ধরনের সবর্থন। কিন্তু অধিবেশী নিমুক্ত হয়েছেন বরাবরই দলের বাইরে থেকে। সম্পূর্ণ চেষ্টা, জন যাবাই, সেদুর্ঘ কি কৃষ্ণমাচারী কেউই দলের লোক ছিলেন না। কেবলমাত্র জন যতিও দলে ভিড়ে পড়ার প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন।

অতীতে অর্থমন্ত্রীর গদী পেয়েছিলেন দলের সুপরিচিত ব্যক্তিরাই। কেননা তাঁদের সুপারিশ ছিল অনেক বড়। বিড়লা গোষ্ঠি বা এসোসিয়েটেড প্রেসের মত কোনো সংস্থা কখনও মুন্সী ব্যাপারে কেঁদে না গেলে যেন কিছুদিন মন্ত্রিত্ব করতেন।

যাঁরা পরবর্তী অর্থ মন্ত্রীর পদের জন্য শ্রীপরমবিহারী লাল মেহতার নাম উল্লেখ করছেন তাঁদের বিশ্বাস শ্রীযুক্ত মেহতার পিছনে ওয়াল ষ্ট্রীটের সমর্থন আছে।

* *

এর পিসের জন্যো নিয়বিত যাতোহারা, অধিবেশন কালে দৈনিক ভাতা, রেলের পাশ উত্যাদি নানা সুবিধার ব্যবস্থা হয়েছে এখন বাকি রয়েছে ওয়েনসনের। পাঁচবছর পরে এর পি বয়েদের যদি পুনর্নির্বাচিত না হতে পারেন বা নির্বাচিত হবার পর এর পি জীবনের মেয়াদ ফুরোবার আগেই যদি তিনি ইহলীলা সংবরণ করেন তাহলে তাঁকে বা তাঁর পোষ্য পরিবারবর্গকে কে দেখবে।

সংবিধান রচনাকালে "কাফী কাজা মনে হয়নি। হ'লে অবসরপ্রাপ্ত এর পিদের জন্য পেনসন এবং তাঁদের মৃত্যু ঘটলে তাঁদের পরিবারবর্গের ভরণপোষণের নিশ্চয়ই একটা ব্যবস্থা হোত। এখান 'সে ভুল শোধরানোর কথা রাষ্ট্রপুরীল যখনে কেউ কেউ আবছেন। এবং আমর বিশ্বাস তাঁদের সে চেষ্টা শীঘ্রই হয়তো একটা বিলের আকার নেবে।

এই ভাবে ভবিষ্যতের ভাবনা থেকে মুক্ত হ'তে পারলে এর পিরা তাঁদের কাজে আরও বেশী মন দিতে পারবেন।

সিনেমা সমালোচনা —

হালের তিনটি হিন্দী ছবি

[আশীষ বর্মণ]

* * * "লালবত্তী" এই কথাই প্রমাণ করে: শিল্প সৃষ্টির ক্ষেত্রে কেবলমাত্র সাধু সাধই সার্থক শিল্পের জন্মদাতা নয়।

* * * অনাবশ্যক বিপুল দৈর্ঘ্য, অহেতুক নাচ গান, অসংলগ্ন আখ্যানবস্তু "মাদার ইণ্ডিয়া"'র সাধু উদ্দেশ্য ব্যর্থ করেছে। নার্গিসের অভিনয় কৃতিত্ব তারিফের যোগ্য।

* * * "তুমসা নাহি দেখা" অর্থাৎ তোমার মত দেখিনি আর। কথাটা সত্য, তবে বিপরীত অর্থে।

লালবত্তী

বলরাজ সাহনী ছবি ক'রছেন জানা অবধি মনে মনে উৎসুক হয়েছিলুম। তাঁর অভিনয় দক্ষতা ইতিপূর্বেই সুধী জনের নজর কেড়েছিলো, সবাই তাঁকে আর পাঁচজন সমসাময়িক অভিনেতা থেকে ভিন্নভাবে বিবেচনা করতেন। উপরন্ত আমার জানা ছিলো মানুষটির চারিত্রিক পটভূমির খবরও; জানতুম তিনি শিক্ষিত, ভাবুক এবং লেখকও। তিনি সমাজ-সংস্কারের ভালমন্দ নিয়েও চিন্তিত; সংস্কৃতি বুদ্ধির অর্থ শুধু যে গ্রামারে নিঃশেষিত নয় এ কথাও তাঁকে বোঝাতে হয় না, তিনি স্বতই জানেন।

সুতরাং যখন কানে এলো বলরাজ ছবি করছেন, অর্থাৎ শুধু অভিনয় নয়— অভিনয়ে তো তিনি পাকাই—পরিচালনাও, তখন স্বভাবতই ঔৎসুক্য বেশ, দানা বেঁধে উঠেছিলো। তারপর জানলুম ছবির কাহিনী এবং চিত্রনাট্যও তাঁরই, ফলে আশা আরো বেড়ে গেলো, ভিতরে-ভিতরে কেমন জানি ধ'রেই নিলুম যে "লালবত্তী" সিনেমা হিসাবে গড়পড়তা ছবি থেকে স্বতন্ত্র হবে। তাঁর টিকুরী কোন্টি সমালো বেরিয়ে অন্য পাঁচটা হিন্দি ছবির কথা স্মরণ করলেই চলবে না, বিশিষ্ট মানদণ্ডের প্রয়োগ হবে অবশ্যম্ভাবী।

হলো সে জন্যেই, ছবি দেখে, আমার নৈরাশ্য আমাকেই অবাক ক'রেছে। কেননা 'লালবত্তী'র কাহিনীর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ব্যতীত অন্য কোনো দিক থেকেই ছবিটিকে আর দশটা ছবি থেকে পৃথক করা সম্ভব নয়।

কাহিনীর গোড়া ১৯৪৭ সালে, স্বাধীনতালাভের ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ঠিক সীমান্তবর্তী সময়ে। স্থান, ভারত-পাকিস্তান সীমান্তের নিকটবর্তী কোনো ছোট্ট। রেল স্টেশান। এই রেল স্টেশানের আশেপাশে একটি বিরাট চক্রান্তকারী দলের আড্ডা। এই দলটি সেই অনিশ্চিতির কালে, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও হননের মাঝে, দাঙ্গাকারী উভয় পক্ষকেই এবং সমাজবিরোধী সব রকম শক্তিকেই, চড়া মূল্যে অস্ত্র সরবরাহ করতো আর এই সরবরাহ পাচার করা হ'তো দুই দেশের সীমান্তবর্তী আলোচ্য ক্ষুদ্র রেলওয়ে ষ্টেশানের কর্মচারীদের সহায়তায়।

এক ফেরীওলার ছদ্মবেশধারী গোয়েন্দা (বলরাজ) কি ভাবে নানা ঘটনাপুঞ্জের মধ্যে দিয়ে, কয়েক ঘণ্টার সতর্কতায়, শেষ পর্যন্ত এইসমাজ-শত্রু দলটিকে ধরতে সাহায্য করলো "লাল-বত্তী"-তে মোটামুটি তাই-ই দেখাবার প্রয়াস হয়েছে। আর আখ্যানভাগের মূল ভাববস্তু অবশ্যই একটি সামাজিক দায়িত্বসম্পন্ন মনের পরিচয় দেয়; বোঝা যায় পরিচালক-কাহিনীকার শুভ সংকল্পের অধিকারী।

* * * কিন্তু গোল বাঁধে কাহিনীর মৌল ভাববস্তু নিয়ে নয়; বরঞ্চ সমস্ত সাধু সংকল্পই বানচাল হ'য়ে যায় আখ্যান-ভাগের গোড়ার ভাবকে বাস্তবতার ছোঁয়াচে জীবন্ত করে না তুলতে পারায়। অর্থাৎ, আখ্যানের এই-যে সংক্ষিপ্তসার, কেন্দ্রের এই বক্তব্যটুকু, একে একটি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবিতে রূপায়িত করার জন্যে কাহিনীকার পরিচালক যে-সব অজস্র ছোটখাটো ঘটনার সাহায্য নিয়েছেন সেগুলো প্রায়শই দাঁড়িয়েছে অসার, কষ্টকল্পিত, অবাস্তব। ছোটখাটো ঘটনাগুলি, বিভিন্ন পরিস্থিতি-গুলি মিলেমিশে, ক্রমান্বয়ে, একটা সংলগ্ন ধারাবাহিকতায় গল্পাংশের মৌল ভাবকে তার অনিবার্য পরিণতিতে আনেনি; মধ্যপথের অর্থহীন নাচগান, পাত্রপাত্রী-গুলির অস্বাভাবিক আচরণ, কাহিনীর বিক্ষিপ্ত ও অসংলগ্ন অগ্রগমন ছবির গোড়ার কথাকে প্রায় বিলুপ্ত ক'রে ফেলেছে।

পরিণামে, তথা ছবির শেষে, যখন দর্শক কাহিনীর কেন্দ্রে গিয়ে পৌঁছায়, বোঝে যে কাহিনীকারের বক্তব্য কি, তখন তার মন থেকে বক্তব্যের গুরুত্বের রেশ সম্পূর্ণ মুছে গেছে। তার মন তখন শূণ্য, ভাবাবেশহীন। কেমনা ইতিমধ্যে দীর্ঘ পথশ্রম—অলীক সব ঘটনা, চরিত্রগুলির অভাবনীয় লীলা, আশ্চর্য্য ব্যবহার ও অসংলগ্ন উত্থান-পতন—ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে, তার অনুভূতিকে একটা তীক্ষ্ণ গভীর আবেগে রূপান্তরিত না করে বরং ম্রিয়মান, ক্লান্ত এবং শতধাবিক্ষিপ্ত করে ফেলেছে। তাই তার ছিন্নভিন্ন অনুভবের অন্তে, চোখের সামনে যেটুকু শুকনো ঘটনা ঘটে, কাহিনীকার—পরিচালকের শুভ উদ্দেশ্যের যেটুকু বাণী মর্মে পশে, বোধ হয়, তাতে শুধু ঠোঁটের কোনে ব্যঙ্গের হাসিই জমে, কোনো, অতল ভাবাবেগ মনকে মথিত করে না।

শেষ পর্যন্ত, ফলে, বলরাজ সাহনীর সমস্ত শুভ সংকল্পই শিল্পবোধের দৈন্যের প্রভাবে লুপ্ত হ'য়ে যায়। এবং এ কথা প্রমাণ হয় যে শিল্প সৃষ্টির ক্ষেত্রে কেবল মাত্র সাধু সাধই সার্থক শিল্পের জন্মদাতা নয়, তার জন্যে প্রয়োজন শুভবুদ্ধি ও শিল্পবোধের একত্র সমাবেশ। আর এই শুভবুদ্ধি ও শিল্পবোধের সমমাত্রায় সমাবেশ সম্ভবত বলরাজ সাহনীর নেই বলেই তাঁর প্রথম ছবি গড়পড়তার ঊর্দ্ধে উঠতে পারেনি। 'লালবত্তীর' আষ্টেপৃষ্ঠেই এই গড়পড়তামানের স্বাক্ষর; অভিনয়ে, আলোকচিত্রে, আবহসঙ্গীতে কোনটাই মনে দাগ রাখে না।

মাদার ইণ্ডিয়া

সৎ সংকল্পের আর একটি হালের নিদর্শন হলো মেহেবুব প্রোডাকসন্সের ছবি 'মাদার ইণ্ডিয়া'। ছবিটির প্রযোজনা-পরিচালনাও মেহেবুব-এরই। এবং 'মাদার ইণ্ডিয়া' দেখলে এ-কথা বুঝতে বিলম্ব হয় না যে মেহেবুব ছবিটিকে আদর্শ-স্থানীয় করতে চেয়েছিলেন কেবল পয়সা উপার্জনের ফিকিরেই আলোচ্য ছবি নির্মাণে হাত দেননি।

'মাদার ইণ্ডিয়া' সংক্ষেপে চাষীর সঙ্গে মাটির যে ঘনিষ্ঠ যোগ তারই আলেখ্য। একটি চাষী পরিবারের জীবনের কাহিনীর মাধ্যমেই মূল বক্তব্য ছবিতে আনা হ'য়েছে। চাষীর ঘরের মেয়ে রাধা (নার্গিস) বিয়ে হ'য়ে হ'লো চাষী গৃহিণী। নতুন বৌ এসেই বুঝলো পরিবারের অবস্থা, বুঝলো গৃহস্থের জমির বেশিরভাগই বাঁধা পড়ে আছে গ্রামের মহাজনের কাছে। সে খুঁলে দিলো তার গয়না-পত্র, বলল জমি হ'লে তার সবই হবে। অতঃপর স্বামী- স্ত্রী পরিশ্রম করে, সাধারণ খাওয়া পরায় দিন চলে সংসারে অমানুষিক পরিশ্রমের ফসলের তিনভাগ নিয়মিত দিয়ে যেতে হয় মহাজনকে। কিন্তু তাতেও আসল ঋণ কখনো কমে না, সবই নাকি সুদেই যেয়ে যায়। বেনিয়া তার হিসেবের খাতায় কি সব আঁকিবুঁকি কাটে এবং নিরক্ষর চাষী টিপ সই তাতে দিয়ে দেয়। আসল ঋণ অক্ষত থাকে।

তবু রাধাদের জীবনে সুখ ছিলো, কেননা ছিলো পারস্পরিক প্রেম ও সহযোগিতা। সময়ে এলো তিনটি সন্তানও। তারা যেন আরো পূর্ণ করলো জীবন।

তখন স্বামী-স্ত্রীতে আরো বদ্ধপরিকর হ'লো ঋণ শুধবে ব'লে, পাথর ও জঙ্গলে ভরা নিজেদের সামান্য জমিটারা স্ব-হস্তে সাফ ক'রতে লাগলো। দুর্ঘটনা ঘটলো সেখানেই, একটি বৃহৎ র'য়লো প্রচণ্ড পুনে এবং তারপরেই ঘটনাচক্রে গেলো স্বামীর দুই হাতও। যে হাত দুটিই ছিলো তার পুঁজি, তার একমাত্র সম্বল। শেষ পর্যন্ত অকর্মণ্য অবস্থায় ব'সে ব'সে সংসারের দুরবস্থা দেখতে না পেরে রাধার স্বামী একদিন অলক্ষ্যে গৃহত্যাগ করলো।

অতঃপর তিনটি শিশু সন্তান নিয়ে রাধার একাকী সংগ্রাম। একটি মারা গেলো শিশু অবস্থাতেই। আর দুটিকে রাধা বাঁচিয়ে রাখলো; বড়টির বিয়ে দিয়ে বৌ আনলো, আর ছোটোটিকে গ্রামের একটি মেয়ের মর্যাদা রক্ষা করার জন্যে নিজের হাতে গুলি ক'রে মেরে ফেললো। তারপর সে, দুঃকম্প, বৃদ্ধা কানে শোনে না, চোখে দেখে না, স্থানু হ'য়ে ব'সে থাকে দাওয়ায়।

খুব সংক্ষেপে প্রায় যোলো হাজার ফুট ছবির গল্পাংশটুকু এই রকম।

এবং প্রথমাংশে অর্থাৎ রাধার স্বামীর গৃহত্যাগের পূর্বে পর্যন্ত, গল্পাংশের খুঁটিনাটিও বিশেষ আলগা হয়নি, খণ্ড-খণ্ড পরিস্থিতি গুলিও মোটামুটি ধারাবাহিকভাবে এগিয়ে এসেছে। এই ধারাবাহিকতা বজায় থেকেছে কেবল বাক্যে নয়, চিত্র-গুলির পারস্পরিক ভাবগত সংযোজনায়ও। আসলে এই অংশ পর্যন্ত মনে হয় মেহেবুব বিষয় ও আঙ্গিকের উপর আপন কর্তৃত্ব সাধারণভাবে অটুট রাখতে পেরেছেন, অর্থাৎ তিনি কেন ঘটনা বিশেষকে চিত্রে আনছেন এবং ঘটনা বিশেষ কি উদ্দেশ্য সফল ক'রছে, সমগ্র ছবিটিকে কোন দিকে বইয়ে নিয়ে যাচ্ছে, সে বিষয় মনস্থির রাখতে পেরেছেন প্রথমাংশেই। প্রথমাংশেই তিনি, মনে হয় ছবি দেখতে দেখতে, সজ্ঞানে নির্বাচন ও বর্জন ক'রেছেন; ছোটো-ছোটো ঘটনাগুলিকে একটি সামাজিক পরিণতিকে তাৎপর্যময় করার জন্যেই সংস্থাপন করতে সমর্থ হ'য়েছেন। ফলে সমগ্রভাবে এই অংশে বিক্ষিপ্তভাব যেমন কম তেমনি চিত্রময়তা বেশি। টুকিটাকি চিত্রগত বর্ণনায়, পরিবেশগত মেজাজের ব্যবহারে মেহেবুব অতিরিক্ত আশা জাগান; ভরসা হয় সারা ছবির মধ্যে একটা চিত্রময়, সামগ্রিক বিন্যাস বা প্যাটার্নও বুঝি বা দেখা যাবে। প্রত্যাশা কিন্তু পূর্ণ হয় না।

অতঃপর অসংখ্য ক্ষুদ্র, বৃহৎ ঘটনা ঘটতে থাকে প্রায়শই অসংলগ্নভাবে, আখ্যানের গতিকে রুদ্ধ ক'রে। ছবিও তার চিত্রময়তা ক্রমান্বয়ে হারায়। অনেক বিক্ষিপ্তএবং প্রক্ষিপ্ত ঘটনাবলীর পর হঠাৎ থেকে থেকে পরিচালক মূল কাহিনীর মেজাজে প্রত্যাবর্তন করেন, তখন আবার ক্ষণিকের জন্যে কিছুটা মানবীয় সুর বাজে, ক্ষণিকের জন্যেই মাত্র, কেননা চকিতে তা আবার অগোছালো, বিচ্ছিন্ন ঘটনাপুঞ্জেগুলিয়ে যায়। এই ভাবে ছবি যখন শেষ হয়, তখন সাধু নির্জীব, অবসন্ন।

মেহেবুবের মত সৎ প্রচেষ্টার উদ্যোগীও ও প্রবীণ পরিচালকও যে কি পরিমাণ অস্বাভাবিক ও হাস্যকর পরিস্থিতির অবতারণা করেন, দেখলে বিস্ময় জাগে।

পলাতক স্বামীকে প্রাণান্তক খোঁজ ক'রে রাধা যখন সাশ্রু নয়নে দুই শিশু পুত্রের হাত ধ'রে অপ্রকৃতিস্থ অন্তরে গৃহে ফিরছে তখন অকস্মাৎ তাকে দিয়ে করুণ রাগিণী ধরানো হলো।

দুই শিশুপুত্র সহ যখন বলদের অভাবে রাধা অমানুষিকভাবে নিজেই ক্ষেতে লাঙল টানছে তখনো তার কণ্ঠে গান, সে গানে গরীবের প্রাণের বাণী। অথচ তাদের নিঃসম্বল, নিঃসহায় অবস্থায় প্রতিবেশীদের ক্ষুদ্র-বৃহৎ সাহায্য, একমাত্র যে সাহায্যে তারা বাঁচতে পারে, তা দেখানো হ'লো না। তার জায়গায় রয়েছে অজস্র, অহেতুক নাচ-গান, যা কেবল ছবির কৃত্রিমতাই বাড়ায়।

(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠার ৫ম কলমে)

হিং টিং ছট

—কবি গৌড়ানন্দ

সম্প্রতি একখানি দৈনিক সংবাদ পত্রে পড়লাম, কলিকাতার চিড়িয়াখানার এক কর্তা বলেছেন পশু-পাখীরা বনের থেকে খাঁচাতেই থাকে ভাল। কারণ খাঁচাতে নিরাপত্তা বেশি।

পড়েই মনে হল এই কর্তাবাবুটি নিশ্চয়ই গৌড়ানন্দের সাক্ষাৎ ভায়রা ভাই হবেন। নতুবা এহেন মৌলিক এবং বিজ্ঞ উক্তি যে সে লোকে সরবে না। গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করতেই বললেন, হতে পারে, চিড়িয়াখানার তোমাদের আত্মীয় স্বজন তো বড় কম নেই।

ভাগ্যি সংবাদটি একখানি ইংরাজী কাগজে বেরিয়েছে এবং তখন ভাগ্যি এই যে দেশ থেকে বর্তমানে ইংরাজী তাড়াবার জন্য বাঘা বাঘা নেতৃবৃন্দ কোমর বেঁধে উঠে পড়ে লেগেছেন, তাই খবরটা বিশেষ কারও নজরে পড়েনি। বিশেষ করে পশু পক্ষীদের। আমাদের রাষ্ট্র ভাষা যদ্দিন এটি প্রচারিত হলে বনজ পশুপক্ষীদিগের অভিযান বন্ধ করতে চিড়িয়াখানার চতুর্দিকে ১৪৪ ধারা জারি করতে হত।

ঐ কর্তাবাবুর উক্তি যে বর্ণে বর্ণে সত্য তা আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকেই বলতে পারি। আপনারা বোধ হয় জানেন না, পিতামহ ব্রহ্মার অভিশাপে আমাকে এক জন্ম পক্ষীরূপে কাটাতে হয়েছে। তোতাপাখী। এই যে এক্ষণে আপনারা আমার বিজ্ঞতা, আমার বাগ্মীতা, আমার পণ্ডিতিয়ানা দেখে মুগ্ধ হন, এসবই সেই তোতা জন্মের ট্রেডিশনেরই কল্যাণে।

বস্তুত এককালে তোতাবিত্তে বিশেষরূপে পোক্ত হয়েছিলাম বলেই আজ আমি পণ্ডিত নেহরুর মত সর্ববিদ্যায় পারঙ্গম হয়েছি। এই ভারতরত্নটির ন্যায় আমিও পক্ষীরত্ন হয়েছিলাম। তাই তাঁরই মত আমি লেখক সম্মেলনে সাহিত্য বিষয়ে, ভাষা সম্মেলনে ভাষা বিষয়ে, বিজ্ঞান সম্মেলনে নিউক্লিয়ার ফিজিক্স বিষয়ে, বণিক সভায় বাণিজ্য বিষয়ে, সমাজতন্ত্র, নারী জাতির উন্নয়ন, দেশীয় সৈনিকের কর্তব্য, মার্ক-সবাদ, ডেমোক্রেটিক সেণ্ট্রালিজম,-ভূদান, সংবাদপত্রের আদর্শ, কুটির-শিল্পের উন্নতি, গ্রামোন্নয়ন, ক্লাসিক্যাল সঙ্গীতের মর্ম, বিশ্বশান্তি, নিরস্ত্রীকরণ ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয়ে অনর্গল বক্তৃতা দিতে পারি।

তোতাদির একটি বিশেষ সুবিধা এই যে, এতে মগজ খাটাতে হয়না; জোর দিতে হয় দুই চোয়ালের মাংসপেশীর উপর। কারণ ঐ পেশীদ্বয়ের কার্যকারীতার উপরই তোতাদির উন্নতি অবনতি নির্ভর করে। ঐ পেশী দুটির সাবলীল সঙ্কোচন ও প্রসারণের ফলে ঠোঁট দুটি নানাভাবে আন্দোলিত হয়। এবং স্বরযন্ত্র থেকে স্বতোৎসারিত ধ্বনি আন্দোলিত ওষ্ঠ যুগলের মধ্য থেকে নির্গত হবামাত্রই নানা প্রকার কথার আকার ধারণ করে। সবসুদ্ধটাই একটা যাকে বলে মেকানিক্যাল প্রসেস, তাই। তোতাদিগকে বিষয় সম্পর্কে ভাবতে হয় না, শব্দ নির্বাচন সম্পর্কেও কিছুমাত্র চিন্তা করতে হয় না। স্বীয় অভিজ্ঞতাতেই দেখেছি, প্রাণপণে শুধু চোয়ালের পেশী সঞ্চালন করে গেলেই হাত-তালি এবং অটোগ্রাফ দেবার খদ্দের দেদার পাওয়া যায়।

তোতা বহস্য বাদ দিয়ে আবার পক্ষীজন্মের কাহিনীই এখন বিবৃত করি। পিতামহ ব্রহ্মার অভিশাপের ফল ফলল। মনুষ্য দেহ থেকে আমার অদৃষ্ট প্রবাদ আত্মা একটি তোতার দেহে প্রবিষ্ট হল। কি প্রক্রিয়ায় এমন তাজ্জব কাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল সময় পেলে তা আরেকদিন বলব।

এখন শুধু এইটুকু বলি যে, মনে মনে

টিং টিং করে স্বাধীনভাবে উড়ে বেড়াতাম। আপন খাদ্য আপনি সংগ্রহ করতাম। যেদিন জুটতো খেতাম, না হলে উপোস দিতাম। কাক, চিল, বাজ, ফিঙের হাত থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্য প্রাণান্তকর পরিশ্রম করতে হত। মাঝে মাঝে, লাল লাল ঠোঁটওলা খাপ টু ডেট তোতানিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটলে, কোর্টশিপও চালাতাম। মনুষ্য-জন্মের প্যাসিফিক আলস্যটি, তোতাজন্মেও সারে নি। তাই, নিরন্তর যন্ত্রণা শুধু সেই-ই দিত।

বোধহয় আধখানি জন্ম এভাবে কেটে থাকবে। তারপর একদিন ধরা পড়লাম ব্যাধের হাতে। কাঠিতে আঠা লাগিয়ে ব্যাধটি একটি ফাঁদ তৈয়ারী করেছিল। সেই ফাঁদের উপর বসিয়ে রেখেছিল একটি পরমাসুন্দরী তোতানি। বড় বড় বিলাতী হোটেলে যেমন খুবসুরৎ রিসেপসনিষ্ট থাকে, অবিকল তেমনটি। তোতানির সঙ্গে একটু কর্টশিপ করব বলে যেই তার পাশে বসেছি অমনি ফাঁদে পড়লাম।

ব্যাধ আমাকে ধরে কিছুদিন বুলি কোটাবার তালিম দিল। তারপর বিক্রী করল এক বড়লোক ধনেদী পরিবারে। বাড়ীটির নাম "ভারত গৃহ"। কর্তাটি বৃদ্ধ। ঘোর ধার্মিক। গিন্নীটিও তথৈবচ। বড় ছেলেটি ব্যবসা দেখে। আয়কর ফাঁকি দেয়। আসল কারবার মুক্ত পথে চালায়। কংগ্রেসী এম এল সি। ছোট ছেলেটি মোটা মাসোহারা পায়। কট্টর কম্যুনিষ্ট। কর্তার কনিষ্ট ভাইপোটি পি এস পি। ভুদান আর ললিত কলা এক সাথে চালায়। মেয়েটি রক্তাল্পতার চাপে ভোগে। রবীন্দ্র সঙ্গীত শেখে। বড় বউটি শান্তিনিকেতনের ছাত্রী। বিকালে পটের বিবিটি সেজে বেরিয়ে দোকানে দোকানে ঘোরে আর ড্রয়িংরুম সাজাবার জন্য নানা প্যাটার্ণের পর্দা আর কুশনের কাপড় কেনে। আর দুপুর শুয়ে সিনেমা পত্রিকা পড়ে। এই বাড়ীটিই আমার গুরুগৃহ। এইখানেই আমার বোধোদয় আমার যাবতীয় বুলি এইখানে শেখা।

কর্তা আমার সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের ত্রুটি রাখেন নি। আমার খাঁচাটি ছিল সোনার। তার উপরে মিনে করা। আমার খাবার বরাদ্দ ছিল মিহি ছাতু, কাবুলি চানা। দুধ। পায়েস। এমন বাদশাহী বরাদ্দ আমার পিতৃ জন্মেও জোটেনি। স্বাধীনতার কালে বর্ষায় কত ভিজেছি। এখন বর্ষায় আমার খাচার উপর ওয়াটার প্রুফের ঢাকনা পড়ে। আগে কতদিন শীতে ঠক্ ঠক্ করে কেঁপেছি। এখন ঘরের উষ্ণ পরিবেশে কত আরাম। এখন আর খাবার খুঁটতে ছুটতে হয় না। ঘণ্টায় ঘণ্টায় নিয়ম মাফিক খাবার আসে। কাক চিল ফিঙে এখন আস্তুক দেখি পিছনে লাগতে। খাঁচার শিক যে নিরাপত্তা রচনা করেছে তারই আড়ালে আমি নিশ্চিন্ত আছি।

শুধু যখন ডানার আড়ষ্টতা কাটাবার জন্য পাখা ঝাপটাতে চেষ্টা করতাম তখন বড় কষ্ট হ'ত। কারণ খাঁচার ছোট পরিসরে ডানায় বড় ঘা লাগত। আমার কষ্ট লাঘব করবার জন্য বড়বাবুর চাকর একদিন আমার ডানা ছোট করে ছেঁটে দিল। বাস্, তারপর আমার সব উদ্বেগের শান্তি। আর কখনও ছুট ফট করিনি। দাঁড়ে বসে শুধু পুচ্ছ নাচিয়েছি।

স্বাধীনতার দায় আছে দায়িত্ব আছে, অনিশ্চিতিও আছে। স্বাধীনতায় ঝামেলা বিস্তর। স্বাধীনতা চায় কোন আহাম্মুখ। পিতামহের অভিশাপে তোতাজন্মে আমার সোনার খাঁচার নিরাপত্তা অটুট ছিল। হে ঈশ্বর, কর্তাবা সেটুকু যেন বজায় রাখেন।

বোধহয় চিড়িয়াখানার কর্তা ব্যক্তিটিও আমার ন্যায় পক্ষী জন্মের অশেষ সুখ ভোগ করে থাকবেন। নইলে আমার মনের কথাটি তিনি প্রকাশ করলেন কেমন করে?

শুধু আমার একটা আফশোষ এই যে, এর পরেও ভদ্রলোকটিকে খাঁচার বাইরে কেন রাখা হচ্ছে?•

হিন্দু বিবাহ আইনে বিবাহ বিচ্ছেদের হিড়িক

[দর্পণের নিজস্ব পর্যবেক্ষক]

১৯৫৩ সালের হিন্দু বিবাহ আইনের বিধান অনুসারে বিবাহ বিচ্ছেদের আবেদন করে যে দরখাস্ত এপর্যন্ত আলীপুর জেলা আদালতে পড়েছে তার সংখ্যা তিন চার ন'র কম হবে না। আবেদনপত্রগুলি স্বামী এবং স্ত্রী উভয়পক্ষ থেকেই দাখিল করা হয়েছে; তবে আবেদনকারিনীদের সংখ্যা বেশী বলে জানা যায়। অন্যান্য জেলা আদালতেও এই ভিত্তে কিছু কিছু আবেদনপত্র যে না পাওয়া গেছে এমন নয়, তবে আলীপুর জেলা আদালতের জুলাই সেসনেরা অনেক কম। এথেকে এটা অবশ্যই অনুমান করা স্বাভাবিক যে, শিগগীরকের পরিবেশে অসন্তোষপূর্ণ জীবন যাপন ওঠার সম্ভাবনা খুব বেশী।

আবেদনপত্রগুলিতে স্বামী অথবা পত্নী সত্যবক্তাদের অনুকূলে নানা কারণও যুক্তি দেখান হ'য়েছে। অনেক ক্ষেত্রে ব্যভিচার অত্যাচার, সতীত্বের অবহিত্তি, এমন কি পারিবারিক সংস্কার অবহানবায় আবেদন করা হ'য়েছে। আবেদনপত্রগুলি দেখে অবশ্য জোর করে এরকম কোন উপসংহারে পৌঁছান যায় না যে সেগুলি কেবলমাত্র অভিযোগ অথবা বনী অথবা মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে এসেছে; বস্তুতপক্ষে ঐগুলি ঐ তিন শ্রেণীর পরিবার থেকেই এসেছে।

মূল আইনটিতে জেলা বিচারকদের বিচ্ছেদের আবেদনেরার আগে আপোষের জন্য চেষ্টা করবার নির্দেশও আছে। যে কটা ক্ষেত্রে আপোষ হ'য়েছে, তা ঐভাবেই হ'য়েছে।

একটি ক্ষেত্রে এক তরুণী স্ত্রী স্বামীর অনুপস্থিতিতে নবজাত যাতে দাদিত্ব করা। বছরের তিনি তাঁর দুটি শিশু সন্তান নিয়ে শিকদার ক'রে বাপের বাড়ী হাটা দেন। আদালতে স্বামী এই বলে বিবাহ-বিচ্ছেদের আবেদন জানান যে, স্ত্রী স্বামী-গৃহ ত্যাগ ক'রে তাঁর পারিবারিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ ক'রেছে। আদালতের চেষ্টায় শেষপর্যন্ত এর একটা মিটমাট হ'য়ে যায়।

স্বামীর অন্য নারীর প্রতি আকর্ষণ ও ভালবাসেরার খবর পেয়ে অনেক স্ত্রী নিজেকে স্বামীসৌভাগ্যবঞ্চিতা বলে কল্পন এবং এরকম ক্ষেত্রে অনেক সময় স্বামী বঞ্চিতা স্ত্রী বিবাহ বিচ্ছেদের আবেদন জানিয়ে থাকেন। তবে এ বছরের কেন্দ্র দেখবার মত সবচেয়ে আদালতের মধ্যবর্তীর মিটমাট হ'য়ে যায়।

এরকম একটা ঘটনায় এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে:—এক যুবক এক বিধবা কন্যার প্রেমে পড়ে। কোন কারণে বিধবার সঙ্গে বিবাহ দিতে যুবকের পিতা রাজী হন না এবং এর বরলে অন্য একটি সুশ্রী বালিকার সঙ্গে ছেলের বিবাহ দেন। বিবাহের পর কিছু দিন যেতে না যেতেই স্ত্রীর মনে সন্দেহ জাগে। ক্রমশঃ এটা তাঁর কাছে স্পষ্ট হ'য়ে উঠতে থাকে যে প্রথম প্রেম স্বামীর চিত্ত জুড়ে রয়েছে। স্ত্রী বিবাহ বিচ্ছেদের আবেদন করেন—কারণ তাঁকে নাকি এভনা অপরিসীম লাঞ্ছনা সইতে হয়।

যেখানে প্রেমের সম্পর্ক সেখানে সন্দেহ ও অবিশ্বাসের অবকাশও বেশী। সুতরাং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সন্দেহ কোটেই অস্বাভাবিক কিছু ঘটনা নয়। কিন্তু স্ত্রী যখন অফিসে কাজ করেন অথবা স্বামী অফিসে কাজ করেন এবং স্ত্রী বাড়ীতে 'একা' থাকেন তখন সন্দেহ সাংঘাতিক হ'য়ে ওঠে। এ কারণে বহু বিচ্ছেদের আবেদন আদালতে পেশ করা হ'য়েছে।

হিন্দু বিবাহ আইন অনুসারে স্বামী অথবা স্ত্রী নিম্নোক্ত যে-কোন কারণে বিবাহ-বিচ্ছেদের আবেদন করতে পারেন:—(১) উভয়ের মধ্যে যদি কেউ বাড়িতরে রত থাকেন, (২) ধর্মান্তর গ্রহণ করে দুই বা তিন বৎসর দুসাধ্যেগ্য পারিবারিক বিকৃতিতে ভোগেন, (৪) দুরারোগ্য কুষ্ঠরোগিতে আক্রান্ত হন, (৫) সংক্রামক যৌনব্যাধিতে আক্রান্ত হন, (৬) সন্যাস অবলম্বন করিয়া থাকেন, (৭) সাত বৎসর বা ততোধিককাল জীবিত আছেন কিনা বা জানা না যায়, (৮) পুরুষ বলবারুসর বিবেচন ভারীর পর দুই বা ততোধিক বৎসরের মধ্যে সহবাসে বিরত থাকেন ও (৯) ডিক্রী জারী হবার পর দুই বা ততোধিক বৎসরের মধ্যে দাম্পত্য অধিকার বান্য না করে থাকেন।

এ ছাড়া, স্ত্রী নিম্নোক্ত কয়টি কারণেও বিবাহ বিচ্ছেদের আবেদন করতে পারেন:-(১) আইন বলবৎ হবার আগে যদি স্বামী আর একটি বিবাহ করে থাকেন অথবা আবেদনকারিণীর বিবাহকালে আইন বলবৎ হবার আগে বিবাহিত অন্য কোন স্ত্রী বেঁচে থাকেন (উভয় ক্ষেত্রেই উভয় স্ত্রীর বেঁচে থাকা চাই), (২) বিবাহের পর স্বামী যদি বলাৎকার, অস্বাভাবিকতার সঙ্গম করার অথবা পাশবিকতার দোষে দোষী হন।

হিন্দু বিবাহ আইন পাশ হবার আগে পর্যন্ত হিন্দু বিবাহ পবিত্র ও অবিচ্ছিন্ন বলে গণ্য হোত। হিন্দুর সাবারিক জীবনে বিবাহ ও যুদ্ধপ্রসারী পরিবর্তনের সম্ভাবনাময় এ আইনের পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দুর পারিবারিক জীবন কতটা জটিল হয়ে উঠেছে তার একটা চিত্র এ আবেদনগুলো থেকে পাওয়া যায়।

এ আইনে কেবল বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার স্বীকৃত হয়নি, এতে আরওদুটো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সমাবিষ্ট হয়েছে-(১) অসবর্ণ বিবাহ ও (২) এক জাতী বা এক স্বামী পরিগ্রহ। হিন্দু সমাজ-জীবনের উপর এ আইনের প্রতিক্রিয়ার হিসেব-নিকেশের সময় হয়ত এখনও আসে নি, তবু একথা বলা যায় যে, এ আইনের ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে পারিবারিক জীবনে কোথাও কোথাও যে সাংঘাতিক জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে তা অস্বীকার করা যায় না। 'সাম্যাজিক-কল্যাণ'-এর পরিধিকে ক্রমশঃ যে সীমিত করছে এতে সন্দেহ নেই।

স্বামী ও স্ত্রী উভয়পক্ষ হইতে একমাত্র আলীপুর আদালতেই তিন হইতে চারিশত দরখাস্ত পেশের সংবাদ

ব্লক রেক প্রোগ্রামের গলদে আবার কয়লার অভাব

ছোটখাট শিল্প প্রতিষ্ঠানে অসুবিধা

'কয়লা নেই', 'কয়লা নেই', বলে আবার রব উঠেছে। এবারকার আওয়াজ কিন্তু কলকাতাবাসীদের তরফ থেকে আসেনি। আওয়াজ তুলেছেন ছোটখাট ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠান ও চালের কলের মালিকেরা।

কিন্তু মাঝে মাঝে এই কয়লার অভাব হয় কেন? খোঁজ নিলে জানা যেন যে আমাদের কয়লার উৎপাদনও কমেনি, বা রেলওয়ে কতৃপক্ষ ওয়াগনের সংখ্যাও কমিয়ে দেন নি।

তবে এ অভাব কেন? আর এরকম বারবার বা কারা? কোল কন্ট্রোলারের অফিসে খুইজন অফিসার আছেন, যাঁরা 'ওয়াগন' বন্টন করার জন্য মুখ্যত দায়ী।

দুজনের বিষয় এই দুই মহাশয় ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে একটা 'বিজিন্যান' এর গল্প, যাঁরা এই ওয়াগন বন্টনের সুযোগ সুবিধাগুলো যথা করে ভোগ করছেন।

নাম-কা-ওয়াস্তে একটা 'কোল এলটমেন্ট এডভাইসারি কমিটি' আছে। কিন্তু কার জন্য ক'খানা ওয়াগন বন্টন করা হ'চ্ছে সে সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত বেবার কোন ক্ষমতাই তাঁদের নেই।

তেলুকি কোল কন্ট্রোলারই (বন্টন) এই ওয়াগন বন্টনের ব্যাপারে সর্বেসর্বা। অবশ্য তাঁর কাজে উপদেশ ও সাহায্য করবার জন্য আর একজন আছেন। তিনি ডাকতীর কোন ডাগাই বলেন না।

এই দুই মহাশয় ব্যক্তিই নাকি গত দশ বৎসর ধরে ওয়াগন বন্টনের ব্যাপারে জড়িত আছেন। এ সময় গুরুত্বপূর্ণ পদে একনাগাড়ে একই অফিসারকে রাখার ফলে বীরে বীরে একটা 'ভেটেরেন ইনফ্লুয়েন্স' গড়ে উঠে।

"ব্লক রেক প্রোগ্রাম" নামে কিছুদিন আগে যে ওয়াগন বন্টনের ব্যবস্থা করা হ'য়েছে তার পুরোপুরি সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন ওঁরি কয়েক বড় বড় কয়লার খনির মালিক ও তাঁদের এজেন্টরা।

এই স্কীমটি চালু করা হয় মূলত সরকারী বৃহৎ বৃহৎ কলকারখানা ও জনসাধারণের অত্যাবশ্যক বেসরকারী নিলম প্রতিষ্ঠানের কয়লার চাহিদা মেটাবার জন্য।

ব্লক রেক প্রোগ্রাম

'ব্লক রেক' প্রোগ্রামের মানে হচ্ছে যে একসাথে ৫০ থেকে ৭৫ খানি ওয়াগন কোন রেলওয়ে ইয়ার্ড থেকে কয়লা বোঝাই করে এক একস্থানে পাঠানো হবে, সেখানে একসাথেই কতগুলো শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এতে বলা হয়েছে যে এর সুযোগ সুবিধা সকলেই নিতে পাবেন।

কিন্তু খুচরো খদের বা ছোটখাটো শিল্পের মালিকেরা অনেকেই একেবারে ওঅথানা ওয়াগনের জন্য টাকা চালতে পারেন না। অতএব অবধী দাঁড়িয়েছে এই যে ১০০ খানা ওয়াগনের ভেতর ৯০ খানাই চলে যাচ্ছে "ব্লক রেক" প্রোগ্রামের ভেতর।

ওয়াগনের স্বাভাবিক বন্টন প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছে এবং শৌণাল ওয়াগনের যে ব্যবস্থা আছে তার নিয়মকানুন এতই কঠিন করা হয়েছে যে কোন বাসুনী অসুবিধে হলে কর্তৃপক্ষের এজাতীয় দরখাস্ত নাকচ করার কোনই অসুবিধা হয় না।

ছোট খাট শিল্পের সঙ্কট

সুতরাং ছোটখাটো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, যাদের কয়লার পুরোদমে, তাঁরা বাধার হাত দিয়ে পড়েছে। শুধু তাঁরাই বা কেন? মাঝারি কয়লার খনির মালিকদের অবস্থাও খুব ভালো নয়। কেননা তাঁদের মাল থেকেই রেলা কয়লা কেনেন, তাঁরা এজাতীয় কয়লার খনির মালিকদের থেকে 'ব্লক রেক' প্রোগ্রামের সুযোগ বা সুবিধা পাননা। এবং এই কোতারা নিজের ওয়াগনের জন্য নগী কয়া টাকা বেশী করে নেন তাঁদের 'নামে যাঁরা 'ব্লক রেক', প্রোগ্রামের মারফৎ নিবন্ধিতভাবে কয়লা বুকিয়ে যেতে পাবেন।

এভাবে বেশন চওয়ার ফলে প্রায় ২৫০টি ছোট এবং মাঝারি কয়লার খনি আজ আর্থিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন।

ঘোটা কয়েক 'ব্লক রেক' প্রোগ্রামের সুচি পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে একই ক্রেতা বার বার অনেক কয়লা পেয়ে যাচ্ছেন—এমন কি প্রয়োজনের অতিরিক্তও অথচ যাঁর বিশেষ প্রয়োজন তিনি পাচ্ছেন না কিছুই।

বছরে দু বার করে সুচি করিয়াবির জন্য 'লক্ষ কোড' এর ওয়াগন স্থির করা হয়; কিন্তু কিছুদিন আগে এমন ঘটনাও ঘটেছে যে কোটার বাহিরেও 'ব্লক রেক' প্রোগ্রাম বারবং 'লক্ষ কোর' চালান দেওয়া হয়েছে। এটা কিন্তু নিয়ম-বিরুদ্ধ। তাহ'লে কি হবে? কি আর হবে? খাতিরের লোকদের জন্য অনেক সময় অনেক কিছু করতে হয়। সব সময় অনেক কিছু করতে হয়। সব নিয়মই কি নিয়ম মানলে চলে? না কোথাও চলছে?

দ্বিতীয় পাঁচসাল্লা পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গ

[দর্পণের অর্থনৈতিক পর্যালোচক]

দ্বিতীয় পাচসালা পরিকল্পনা শেষ পর্যন্ত কোথায় এসে দাড়িয়েছে, সে সম্বন্ধে আমাদের কারুরই কিছু সঠিক জানা নেই।

কিছুদিন আগে জানানো হয়েছিল-যে, আমাদের সবশুদ্ধ খরচা হবে শেষ পর্যন্ত ৪,৮০০কোটি টাকা। এই হিসেবে কিন্তু ধরা হয়নি, ওটি কয়েক নূতন পরিকল্পনা, যা কার্যকরী হবে বলে ঠিক হয়েছে। এগুলোর ভেতরে আছে, রাশিয়া ও ওয়েষ্ট জার্মানির দুইটি কারখানা সাহায্যে ঔষধের কারখানা, ইষ্ট জার্মানির সাহায্যে একটি কাঁচা কিন্দ তৈরী করবার প্রতিষ্ঠান, এবং বাশিয়া ও জর্মেনীর সাহায্যে তৈল শোধনা-গারের প্রতিষ্ঠা হবে পোঃগাডি এবং বাঙ্গবীতে।

এই নূতন পরিকল্পনাগুলো খুবই প্রয়োজনীয় এবং কার্য করী হওয়াও উচিত, বিশেষ করে যখন আমরা বিদেশ থেকে সাহায্য পাচ্ছি এই পরিকল্পনা-গুলোর জন্য।

কিন্তু এ সবও পরিকল্পনাগুলো রূপায়িত করতে হবে যে মোট চাকার দরকার হবে, তার অর্ধেক কিন্তু আমাদের নিজেদেরই বহন করতে হবে। কিন্তু এ টাকা আসবে কোত্থেকে?

দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রথম দুই বছরই আমরা ধরচা করে ফেলেছি প্রায় ১,৩১৫ কোটি টাকা। এর ভেতর ৫৫০ কোটি টাকা এসেছে অতিরিক্ত নোট ছাপিয়ে। এর ফল হয়েছে মুল্যবৃদ্ধিতে ও দ্রব্যাভাব বৃদ্ধি। আরও ফল হয়েছে যে, আমাদের জমানো ষ্টার্লিং প্রায় সবই ঘরে শেষে গেছে, এবং ধার নিতে হয়েছে ইণ্টারন্যাশনাল বনিচারী ফাণ্ড থেকে প্রায় ৯২ কোটি টাকার মতো।

ভবিষ্যতে মুল্যবৃদ্ধিতে যাতে না হয় সেদিকে সজাগ আমাদের রাখতেই হবে। তা করতে হলে নূতন করে নোট ছাপানো কমাতে হবে; এবং তা যদি করতে হয়, তবে ভবিষ্যতে টাকা আসবে কোথা থেকে? ঘুরে ফিরে সেই পুরাতন খাপ্পরে।

সত্যিকারের সাম্যবাদী অর্থ-নীতিবিদ্রা হয়তো নানারকম পথ বাতলে দিতে পারেন কিন্তু বিশ্বস্ত ইঙ্গবনি যে সমাজ ব্যবস্থার কাঠামো তাতে এই অর্থনীতিবিদদের উপায়ি পথাগুলি আমাদের বর্তমান সরকারের পক্ষে কার্যকরী করা সম্ভব হয়ে উঠবেনা।

এই সরকারের টাকা পেতে হলে তিনটি পথা আছে। যথা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে নূতন কর বৃদ্ধি, সরল সেভিং বাড়ানো এবং অবাজব সরকারী ব্যয় সঙ্কোচন।

পরোক্ষভাবে হয়তো কাইবর্ন এবং একসাইজ ডিউটি বাবরুং কিছু টাকা পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু সেটার পরিমাণই বা কতটুকুন হবে? কিন্তু ডিরেক্ট ট্যাক্স বৃদ্ধি করার পরিবর বর্তমানে সীমাবদ্ধ বলেই মনেহয়; কেননা, আমাদের বতমান সরকার বড় লোকদের চটাতে নারাজ। এর প্রমাণ পেতে হলে খুব বেশী দূর যেতে হয়না; কেবল ওয়েল্থ এবং এক্সপোর্টগুলার ট্যাক্স চালু করার জন্য যে আইন করা হয়েছে সেটা যদিনা বলে বাধি। ঐ ট্যাক্স দুটি আদায় করার জন্য যে আইন করা হয়েছে তাতে বিশেষ কিছু সরকারী তহবিলে আসবে বলে মনে হয় না।

গতবছর 'সরল সেভিংস'এর বাবরুং ৬২ কোটি টাকার বেশী পাওয়া যায়নি। বলিও এবা হয়েছিল যে এর থেকে আসবে ১০০কোটি টাকা। এবছর এপর্যন্ত বোধহয় ৩৫ কোটি টাকার বেশী আদায় হয়নি।

সরকারী খরচা কমানোও বোধহয় নানা কারণে খুব একটা বেশী পরিমাণে হয়ে উঠবেনা।—সাধারিক বাহিনীর জন্য বোধহয় এবারে কিছুটা খরচা কম হতে পারে। কিন্তু সবে সবে এ কথাও আমাদের মনে রাখতে হবে যে 'কেন্দ্রীয় পে কমিশন' এরা পর্যন্ত তার পুরোপুরী রিপোর্ট দেয়নি। কিন্তু 'অন্তর্বর্তীকালীন' রিপোর্ট অনুযায়ী সরকারী কর্মচারীদের জন্য সরকারের অতিরিক্ত দরকার হবে ১২ কোটি টাকা।

যে ৪,৮০০ কোটি টাকা খরচা করা হবে বলে ঠিক হয়েছিল, তারমধ্যে বাইনিং ও বৃহৎ শিল্পের জন্য ধরা হয়েছিল ৬৯০ কোটি টাকা। কিন্তু এতদিনে সে হিসেবও ফেটে গেছে। এক একা যাচ্ছে যে 'হার্ডকোর' কলপনা-গুলি রূপায়িত করবার জন্যই নেবে যাবে ৭৪০ কোটি টাকার ওপর। তার উপর রয়েছে নূতন পরিকল্পনা গ্রহণ করবার জন্য খরচা।

সুতরাং এর অবশ্যম্ভাবী ফল দাঁড়াবে যে ছোট ছোট শিল্প ও বিদ্যুৎ পরিকল্পনা পড়বে মার। এবং ব্যাঘত হবে সাবারিক উন্নয়ন ক্রিয়াকলা।

এই কাটছাঁট করবার পর দ্বিতীয় পাচসালা পরিকল্পনা কি রূপ নিচ্ছে তা জানবার জন্য দেশবাসী স্বভাবতই খুব উৎসুক।

পঃ বঙ্গের বরাদ্দ হ্রাস

কিছুদিন আগে একটা খবর বেরিয়েছিল যে পশ্চিম বাঙ্গলায় ১৯৫৮-৬৯ সালে উন্নয়ন বরাদ্দ বাবদ যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল তা নাকি প্রায় পঞ্চমা ৫০ ভাগ কমিয়ে দেওয়া হবে।

পশ্চিম বাঙ্গলার ছোট ছোট পরিকল্পনাগুলো যাদ দিলে পরে যে বৃহৎ পরিকল্পনাগুলো বেওয়া হবে বলে ঠিক করা হয়েছিল, তার ভেতর নাম করা যেতে পারে 'কংসবতী রিভার্ভেরর' প্রোজেক্ট, ডামোদর ভ্যালি প্রোজেক্ট, তিনটি সুতোর কল ও দুর্গাপুর প্রোজেক্ট। একবার দুর্গাপুর প্রোজেক্টের ভেতর ইস্পাতের কারখানা ও কোক্ ওভেন্ প্লান্টকের কাজ খানিকটা অগ্রসর হচ্ছে বলে জানা গেছে।

কংসবতী রিভার্ভেরর-এর মুখ্য-উদ্দেশ্য হচ্ছে বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরের বন্যা প্রতিরোধ ও সেচের জন্য জল-সরবরাহ। এর জন্য পশ্চিমবঙ্গের পরিকল্পনাতে বরা হয়েছিল ২৫কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা।

ডুগ্রাম বর্ডারের বিদ্যুৎখোনার কাছে জলঢাকা নদীকে ২৫০ ফিট লম্বা ব্যারেজ দিয়ে বাঁধবার কথা আছে। এখান থেকে খালুরের কাছে জল নিয়ে একটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র খোলার কথা। উত্তর বঙ্গের চা-বাগানগুলোর বিদ্যুতের চাহিদা ঐ কেন্দ্র নাকি মেটাতে পারবে।

পশ্চিমবঙ্গের তাঁতশিল্প বেশ নামকরা। কিন্তু এদের সুতো আসে বেশীর ভাগই বাইরে থেকে। কিন্তু এদের স্বার্থসংরক্ষণ ও দ্রব্যের জন্য তিনটি সুতোর কল নাকি পুরোদমে করা হবে। দুটি হবে কল্যাণীতে এবং একটী হবে বাণাবতীতে।

পঃ বঙ্গের মোট ব্যয়

এসবও বৃহৎ পরিকল্পনা ছাড়াও আরও অনেক ছোট ছোট স্কীমের ব্যবস্থা আছে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ উন্নয়নের ব্যাপারে। সর্বাঙ্গসুন্দর দ্বিতীয় পাচসালা পরিকল্পনার খরচা করার কথা হচ্ছে ১৫৩ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা।

কিন্তু কাটছাঁট করার পর এ পরি-কল্পনার রূপ বাস্তবে যেগে পেষ পর্যন্ত কি এসে দাঁড়াচ্ছে সে সম্বন্ধে বাজেট আলোচনার সময় পশ্চিমবঙ্গ কর্তৃপক্ষ কিছুটা আলোকসম্পাত করবেন আশা করি।

দক্ষিণমেরু অভিযানকারী এডমণ্ড হিলারী ও ভিভিয়ান ফুক্‌সের প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিচিত্র কাহিনী

বিস্তর কথা কাটাকাটি হয়ে গেছে, অবশ্য আনুমাতিক হারে স্বল্পোত্তেজক।

যারা স্বলপথে অভিযান পরিচালনা করছে এদের মধ্যে কমনওয়েলথ অভিযাত্রী দল অন্যতম। এদলে যোগ দিয়েছে বৃটেন, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকা। আমেরিকানরা স্বলপথের চাইতে আকাশপথকে কুশলতর পুরাণ করছে বেশী। যানিয়ানদের পারদর্শিতা এখনো পর্যন্ত অনুলেখ্য।

অগ্রগতী কমনওয়েলথ অভিযাত্রী দল পরিচালনা করছেন ডাঃ ভিভিয়ান ফুক্‌স। স্যার এডমণ্ড হিলারী এই দলেরই সাহায্যকারী সদস্য। তাঁর কর্তব্য অভিযাত্রীদলকে সঠিক ও সহজগম্য পথ বাতলে দেয়া। কমনওয়েলথ অভিযাত্রী দলের স্বলপথে দক্ষিণ মেরু অভিযানের পরিকল্পনা রচিত হয় এক বৎসর পূর্বে। পরিকল্পনানুযায়ী কিছু রস উপকূল থেকে লাড মাইল দূরের ৭০০ নম্বর ডিপো তৈরী করে হিলারী অন্যান্যদের প্রত্যাগমন পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন, এবং ডাঃ ফুকসের বৈজ্ঞানিকদের দলবলসহ হিলারী ও অন্যান্যরা একবোগে দুআর অবাদলে অভিক্রম করবেন। পরিকল্পনায় সমত হয়ে ডাঃ ফুক্‌স ও হিলারী স্ব স্ব দলবল সহ দু'দিক থেকে যাত্রা সুরু করেন।

●

হিলারীর মত পরিবর্তন

ব্যাকবার্ডো ঘাঁটি থেকে যাত্রা করার সময় হিলারীর বেকুবে পৌছবার কোন উচ্চেশ্যই ছিল না, পথ নির্দেশই ছিল তাঁর লক্ষ্য। দিন করেক পরে ঘঠাৎ খবর যোগান হিলারী চলার নেশার মত পরিবর্তন করে ফুক্‌স ও তাঁর দলবলের জন্যে অপেক্ষা না করেই বরিয়া হয়ে ছুটে চলেছেন। এই সংবাদ ঘোষিত হবার সাথে সাথেই নিউজিলাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী সি: ন্যাশ হিলারীকে এক তারবার্তা প্রেরণ করলেন—"হিলারী খেয়োনা।" পরলা জানুয়ারীর পত্রিকার ছোট একটি খবর ঘেরালে 'নক-বর্ষের অভিনন্দন হিলারীর অপেক্ষায়।" হিলারী তখন দক্ষিণ মেরুর ১২০ মাইল দূরে। মাচকীর বড় পরিবর্তনের আট দিন পরে ওয়েলিংটনে সংবাদ পৌছিল, হিলারী দক্ষিণ মেরুতে পদার্পণ করেছেন। তখনকার খবরে প্রকাশ ডাঃ ফুকস দলবল সহ ২০০ মাইল দূরে তুআর ঘাঁটকার আক্রমণে বিপর্যস্ত।

খবরটি দেশ দেশ নন্দিত করি বস্তুত হলো। অভিনন্দিত হলেন স্যার এডমণ্ড হিলারী। ১৯৫৩ সালের ডেনজিং ও হিলারীর যুগ্ম পৃষ্ঠের দুর্লভ গৌরব লাভের দীর্ঘ পাঁচ বছর পরে হিলারীর দ্বিতীয় কীর্তি স্থাপনের স্মরণীয় সম্মান লাভ। দেরণা ডেনজিং-এর অভিনন্দন পত্রের ভাষায়—'He has addedyet another feather to his cap'. এ খবর ডাঃ ফুকসের কর্ণগোচর হতেই তিনি অভিযাণ আনলেন হিলারীর বিরুদ্ধে মারাত্মক বিশ্বাসঘাতকতার।

চতুর হিলারী সর্তভঙ্গ করেও স্বরণীয় হলেন, ভাগ্যদেবীর বরমালা। এমন-তর সর্তভঙ্গের অপরাধ নিশ্চয়ই মার্জনীয়, কিন্তু এ পর্যন্তীর ইতিহাসে এমনতর সর্ত ভঙ্গের নজীর অলভ্য। এ প্রসঙ্গে ১৯৫৩ সালের কথা স্মরণ করুন। ডেনজিং-এর গৌরব খর্ব করবার যে অপচেষ্টা চলেছিল, যার জন্যে ডেনজিং বলেছিলেন তাঁর ভাষণে, 'যদি এমনতর চেষ্টা আর করা হয়, তাহলে তিনি সত্য প্রকাশ করে দেবেন।' অবশ্য ডেনজিং সে কথা প্রকাশ করেননি, তবু সম্ভতভাবে প্রশ্ন তোলা যেতে পারে, 'হিলারী সত্যিই কি ওভারেষ্টে ছেঁচিয়ে?' সে কথা আপাতত থাক।

●

পূর্ব প্রসঙ্গ

রোনাল্ড এমাণ্ডসন ও ক্যাপ্টেন স্কটের পরে স্বলপথে হিলারীই প্রথম অভিযাত্রী যিনি দক্ষিণ মেরুতে পদার্পণ করলেন। ১৯১২ সালের ১২ই জানুয়ারী ক্যাপ্টেন স্কটের দক্ষিণ মেরু উপস্থিতির প্রমাণ এখানে উল্লেখযোগ্য। এই দু'সাহসী অভিযাত্রী সন্ধ্যাস্থলে পৌছে দেখলেন তিনিই বেরপ্রদেশে প্রথম অভিযাত্রী নন, তাঁর আগার একরাস আগে এসেছেন রোনাল্ড এমাণ্ডসন, একজন নরওয়ের অধিবাসী। স্কট হতাশ হলেন। প্রথম অভিযাত্রীর সন্ধান থেকে বঞ্চিত স্কট কিন্তু পথে প্রাণ হারালেন তুআর ঘটিকায়।

ক্যাপ্টেন স্কটের বেরপ্রদেশে পৌছুতে যে সময় লেগেছিল, হিলারী তার চাইতেও বেশী সময় নিয়েছেন, কারণ প্রথম দিকে তাঁর লক্ষ্য ছিল অন্য। এছাড়াও ক্যাপ্টেন স্কটের-কৃতিত্ব স্বরূপীর কারণ তিনি মোটর বাহিত লেজহাগাড়ীর সাহায্যে সন্ধ্যে পৌছুতে অসমর্থ হয়ে, পরে কুকুর ও টানুযোড়াবাহিত স্লেজ গাড়ীর সাহায্যে দক্ষিণ বেরতে উপস্থিত হন অন্যদিকে হিলারীর ছিল আধুনিক সজ্জাপাতিতে সজ্জিত বরফের উপর দিয়ে বাওয়ার মত উপযুক্ত ট্রাক্টর, স্লেজ ও কুকুর।' এবং কুকসের পথের অনুগামে হিলারীর পথ ছিল অনেক বেশী সরলগম্য।

মুরগীর বড়াই

চিত্ত সিংহ

হিলারীর প্রত্যাবর্ত্তন

যা হোক জয়ের গৌরব হিলারীই পেল। জয়গৌরবে উদ্ভাসিত হিলারীর দক্ষিণ মেরুতে পৌছবার পর দেরী করার বড় ধৈর্য ছিল না। তিনি যাবতীয় সরঞ্জামপাতি ফেলেই ফিরে এলেন ব্যাকবার্ডো ঘাঁটিতে। যুক্তি হিসেবে তিনি জানালেন—তাঁর ওয়েসেস ট্রান্সপোর্টটি (ভেচক) বিগড়ে গেছে। অন্যদিকে কুকস তখন দলবল সহ ২০০ মাইল দূরে। দুরন্ত ঝটিকা, দুআর-পাতে তাঁর দলবল বিপদগ্রস্থ। হিলারী এ সংবাদ পেয়েও প্রথমে গা করেন নি। তুন্তি কাটানোর জন্যে অবকাশ যাপন করছিলেন ৭০০ নম্বর ঘাঁটিতে। এ সময়ে হিলারী মাকিব ঘাঁটি থেকে কুকসের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে জানতে পারলেন কুকস দেরী হবার কারণ বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ ও অনুলেখন ইত্যাদি। এসময়ে কেন্দ্র প্রদেশের আবহাওয়া খুব ঠাণ্ডা। তাপমাত্রা ৩০ থেকে ৩৮ ডিগ্রি হিমাঙ্কের নীচে।

হিলারী আবহাওয়ার অবস্থা জানিয়ে ডাঃ ফুকসকে এখানের বত অভিযান পরিত্যাগ করে আগামী গ্রীষ্মে পুনরায় প্রধান চালানোর পরামর্শ দিলেন। ডাঃ ফুকস যে পুত্রার পুত্রাধ্যান করলেন। তিনি জানালেন—'হিলারীর সতর্কবাণীর জন্যে তিনি একবত হতে পারেন নি। এর পরদিনই জানা গেল, ডাঃ ফুকসের দলবল দক্ষিণ মেরু থেকে ৭'৩ মাইল নয়, ৩৫৭ মাইল দূরে আছে রয়েছেন।

হিলারী এসময়ে ঠিক করলেন (অবশ্য পরিকল্পনা কমিটির চাপে পড়ে) তিনি তাঁর দলবল সহ কুকসের দলবলকে উদ্ধার করতে যাবেন, এবং দক্ষিণ মেরুর সঠিক পথ পুনর্গঠন করবেন। ডাঃ ফুকস, জানালেন, তিনি হিলারীকে এখন আর সাহায্যের কথা বলতে পারেন না, এবং একথাও জানালেন যে নিজেদের পথ নিজেরাই বের করবেন। কারণ উভয়সঙ্কট চুক্তিভঙ্গের পরে এ ধরণের সাহায্যের প্রশ্ন উঠতেই পারে না।

এ সময়ে নওব কমিটির পক্ষ থেকে স্যার জন মুসোর ডাঃ ফুকসকে জানান যে—'ফুকসের সিদ্ধান্তই তাঁদের সিদ্ধান্ত। যেহেতু তিনিই দলের নেতা।'

নওব কমিটির কাছে হিলারী যে তারবার্তা প্রেরণ করেন ডাঃ ফুকসকে অভিযান পরিত্যাগে বাধ্য করার জন্যে তাতে তিনি জানান-'তুআরর আপনাদের নির্দেশের বলেই কুকস নিজের মুখ রাখতে পারেন। ডাঃ ফুকসের সঙ্গে ঘটবেন বাওয়ার জন্যে আমার একজন বৈজ্ঞানিকের কুকেতে থাকার প্রয়োজন বলে কুকস জানিয়েছিলেন। এই ঘট বেসুচ্চি নিউজিল্যাণ্ডের উপকূলবর্তী সদর কার্যালয়। কিন্তু এসবরে কুকেতে অবস্থান নুলাবয়, তাই আমার কোন সঙ্গী এ সুযোগে সমত হননি।'

ডাঃ ফুকসের কঠোর সংগ্রাম

এবশেষে হিলারী ডাঃ ফুকসের সাহায্যে এগিয়ে যান। দক্ষিণ বেরতে হিলারী ডাঃ ফুকসের দলবলের জন্যে অপেক্ষা করতে থাকেন। ডাঃ ফুকস তাঁর বৈজ্ঞানিক দলের প্রধান জন সমস্য সহ দুর্গম তুআর কর্ষণ, নীচার প্রদেশের বিশঙ্কনক ক্লাচর, প্রায় অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থার বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রামের পর দীর্ঘ ৩৬ দিনে ৯ শতেরও অধিক মাইল অতিক্রম করে ৩২বেতর সাগরে স্যাকেসটন ঘাঁটিতে পৌছান ২৩শে জানুআরী সোমবার পুত্যুষে ১টা ৮মিঃ সময়ে (মি,এম,টি)। স্বলপথে ২১শত মাইল কুকের বাহনেশ অতিক্রম করে তাঁদের দুর সাগরের তীরের কটমাঁটি ব্যাকবার্ডো ঘাঁটিতে পৌছতে আরো ১২শত মাইল চলতে হবে।

ক্যাপ্টেন স্কটের শোচনীয় অভিযানের ঠিক ৪৬ বৎসর ২দিন এবং স্যার হিলারী পৌছবার ১৭দিন পরে ডাঃ ভিভিয়ান কুক্‌স দক্ষিণ বেরতে উপনীত হলেন।

দ্বারার চাল

অবশেষে জানিবে রাখি, এ মহাদেশেও কুইনবিক দ্বারার চাল কুক্‌স হয়েছে। এবার মুরগীর লড়াই সুরু হবে অভিযাত্রীতে আভিযাত্রীতে নয়, রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে। এখানেও সজ্জ আসুন। অবিকারের প্রশ্ন নিয়ে হাতাহাতির সরঞ্জাম ঘনিয়ে এল।

এ মহাদেশের প্রতি লোভ পশ্চিমী সব দুষ্টর শক্তির। কারণ ইউরোপের চেয়ে এ মহাদেশ আয়তনে অনেক বড়। প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ আছে বলে সবারই ধারণা। কয়লা, ইউরেনিয়াম, পেট্রোল ও ম্যাঙ্গানিজের খনির সন্ধান ইতিমধ্যেই পাওয়া গেছে। হাজার মাইল দীর্ঘ পাহাড়ের শাদা-দেশে স্বর্ণ, রৌপ্য, টিন ও তাম্র আছে বলেও গবেষকদের ধারণা। এই প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যের জোরেই এর রাজনৈতিক গুরুত্ব আগামী, দিনের ইতিহাসে প্রচুর। তাই-তো সার কথা এই, পরবর্তী মুরগীর লড়াই (রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে) যার জন্য নাম 'কোল্ড ওয়ার' সুরু হবার পরেও যদি আমার কলম তাজা থাকে, শিগগীর ওলোর থেকে কোন প্রহটন না ঘটে, তাহলে মুরগীর লড়াইএর দ্বিতীয় পর্বের নাম দিয়ে আরেকটা প্রবন্ধ ক'ষে—সেসুযোগে আসলানের নিয়ে ধরাবীতি আসর জমানো আমার পক্ষে সম্ভব হবে।

এবং শেষ কথা হলো, শুটিনিক-আদলকা আবহ কুক্‌স-হিলারীর, দুরবীর লড়াই বাঁধবে কেন্দ্র করেই থোক না কেন মিথ্যে পতাশীর ঢাকিয়াতের ইউয়োর ধরনার, মূল্যমান নির্ণয়ে, মূল-যোবের পরিবর্তনে, সর্বোপরি মানুষের দুর্বার অগ্রগতিকে এসব ঘটনা ব্যাহরুক অর্থবহ। এসব লড়াইএ সজ্জিয়তেই যোগদানের ঘততা আমাদের থাক চাই নাই থাক, এ ধরণগুলোকে আপনারা এড়িয়ে থাকার চেষ্টা করবেন না, কারণ এগুলি আমাদের কাছে আজগুবি মনে হলেও, এসবই এ পতাশীর সব চাইতে রুচতর সত্য।

বরং বলি, এসবের বাধ্যবেই এ পতাশীর মুরু। এই হল আরম্ভ॥

গ্রন্থ বিভাগ

বিদ্যাসাগর—মণি বাগচী
প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরি দাম ৭৲।)
বিদ্যাসাগর ও বাঙ্গালী সমাজ
বিনয় ঘোষ (বেঙ্গল পাবলিশার্স
প্রথম খণ্ড ৩৲ দ্বিতীয় খণ্ড ৭৲)।

জীবনী সাহিত্য ঃ বিদ্যাসাগর

— আনন্দ বর্ধন —

জীবনী সম্পর্কে অনেক বিখ্যাত ব্যক্তিদের বিতৃষ্ণা আমরা জানি। আব্রাহাম লিংকন জীবনী পড়তে চাইতেন না। কারণ তা মিথ্যা এবং আমাদের মনে ভ্রান্ত ধারণা জন্মায়। থ্যাকারে ত স্পষ্টই আপত্তি জানিয়ে গেছেন, জীবনীর মধ্য দিয়ে 'Entombed' হওয়াটা তাঁর অনভিপ্রেত। তবু খ্যাতিমান ব্যক্তিদের জীবনচিত্রে আমাদের আগ্রহ চিরদিনই দুর্মর। বস্‌ওয়েল না থাকলে জনসন্ এবং তাঁর যুগকে কি করে জানতুম, বিশেষত আমাদের মত সাধারণ পাঠকদের যখন ইতিহাস পড়ার ধৈর্য এবং অবকাশ নিতান্তই কম।

ইতিহাস এবং জীবনকে গাঁটছড়ায় বাঁধাই জীবনী সাহিত্যের দুরূহ কাজ (আমরা এই প্রসঙ্গে আত্মজীবনী বাদ দিচ্ছি)। জীবনীর নামে শুধু নায়ক-প্রশস্তিতে এখন অনেকেরই অরুচি। বিখ্যাত পুরুষদের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে সাধারণের নিছক কৌতূহলই যে জীবনীর উপজীব্য সেটি একটি মনোরম সুখপাঠ্য কাহিনী হতে পারে, জীবনী সাহিত্যের মর্যাদা তাকে দেওয়া যায় না। কীর্তিমানদের জীবন ঘিরে অনেক গালগল্প কিংবদন্তী গড়ে ওঠে, যে চরিতকার এই সমস্ত বিশ্বাসাবাই অভিভূত তাঁর পক্ষে জীবনের পূর্ণ রূপায়ণ একেবারেই অসম্ভব।

সাহিত্যিক শিল্পীদের জীবনীতেই এই বিচ্যুতি বেশি ঘটে। বায়রণ বা হাইনের জীবনী সম্পর্কে সমালোচকদের বিক্ষোভের অন্ত নেই। ইদানীং ডিলান টমাস এবং তুলো লোত্রেক-এর জীবনী নিয়েও অসন্তোষের ঢেউ উঠেছে। কবি-শিল্পীদের কথায় এবং আচরণে বৈপরীত্যের অর্থ পাওয়া দুষ্কর, উৎকেন্দ্রিকতার ব্যাখ্যা খুঁজতে গেলে দিশেহারা হতে হয়। কিন্তু কার্যকারণ সম্বন্ধের ছকে অন্যদের মত তাঁদের জীবনকেও ধরা না গেলে জীবনী অসম্বদ্ধ তাৎপর্যহীন কাহিনীতেই পর্যবসিত হবে। যুগের ইতিহাস থেকে নিতান্ত উৎকেন্দ্রিক ব্যক্তিত্বকেও বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না। নিজের সম্বন্ধে হাইনের এই স্বীকারোক্তি অত্যন্ত মূল্যবান জগতের সমস্যা সন্ধিতে ফাটল ধরেছে, কবিহৃদয়ও সেই আঘাতে বিদীর্ণ।

কিন্তু ঐ ছকটা মনগড়া হওয়ার বিপদও উপেক্ষণীয় নয়। পূর্ব-নির্ধারিত স্বকল্পিত প্যাটার্নের ছাঁচে জীবনকে মনোমত ঢেলে সাজানোর দৃষ্টান্ত প্রচুর। যান্ত্রিক ব্যাখ্যার সরলীকরণে জীবনের সমগ্রতা ধরা দেয় না। প্রাচীন মতের রোমান্টিক জীবনীগুলোর পল্লবিত বর্ণনার মধ্যেই যেটুকু ঐতিহাসিক চেতনার পরিচয় আছে, হাল আমলের অনেক জীবনীতেই সেটা নেই। অনেক সময় ঐতিহাসিক তথ্যপরিবেশনের উৎকট উৎসাহেও জীবনী কেবল নিষ্প্রাণ তথ্য সংকলন হয়ে দাঁড়ায়, রক্ত মাংসের মানুষের প্রাণের উত্তাপ তাতে থাকে না। জীবনীতে যদি ব্যক্তিত্বের চিত্র—পোর্ট্রেটই না ফোটে তবে জীবনী পড়ব কিসের আকর্ষণে।

*

সমাজপটেই ব্যক্তিস্বরূপ পূর্ণ রূপ পায়, জীবন্ত হয়ে ওঠে। সমাজের ফ্রেমেই ব্যক্তির চিত্র সম্পূর্ণ, সার্থক। বটগাছের শাখাপল্লবের সমারোহের মূল উৎস মাটির গভীরে তার অজস্র শিকড় বিস্তারে। ব্যক্তি এবং সমাজের জটিল চলিষ্ণু সম্পর্কের সঠিক স্বরূপ নির্ধারণেই জীবনীকারের সাফল্য। যান্ত্রিক মনোভাব এক্ষেত্রে অচল। আসল কথা, জীবন সম্পর্কে চরিতকারের সত্যকারের কোনও জিজ্ঞাসা আছে কিনা। সেই জীবন জিজ্ঞাসার তাগিদেই ব্যক্তিচৈতন্যের গভীরতর উৎসের সন্ধান জীবনীকারকে নিতে হয়। সরলীকরণের মূলতায় তিনি আত্মতৃপ্তি পাননা, জীবনের প্রকৃত তাৎপর্য অনুসন্ধানেই তাঁকে নির্মোহ হতে হয়।

জীবন সম্পর্কে জিজ্ঞাসার অভাবেই বাঙলা সাহিত্যে সার্থক জীবনী বিশেষ নেই। বাঙলা জীবনীতে বিচারহীন অন্ধভক্তিই বেশি, কোথায়ও বা আদর্শগত বিরোধের ফলে ব্যক্তিগত বিরক্তি প্রকাশ। বস্তুনিষ্ঠা সহজে আমাদের হাতে আসে না। ভাবালুতার ঠুনকো রঙীন কাঁচে জীবনকে দেখার ফলেই যোগীন্দ্রনাথ বসুর, 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত' এর মত বিরক্তিকর জীবনী পাই। মধুসূদনের জীবনের মর্মবিক্ষোভের কোনও তাৎপর্যই এই লেখক বুঝতে পারেন নি, বোঝার চেষ্টাও করেননি, হিন্দু ধর্ম ত্যাগের 'পাপ' কবির কাঁধের ওপর চাপিয়ে দিয়ে করুণা প্রকাশ করেছেন যা আত্মপ্রসাদেরই নামান্তর মাত্র।

উনবিংশ শতাব্দীর মত আমাদের সময়েও জীবনী রচনায় উৎসাহ জেগেছে, কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভক্তির অন্ধতায় আমরাও জীবনীর নামে কিংবদন্তী, বিগ্রহকেই চড়ান্তের প্রসাধনে হাজির করছি।

বিদ্যাসাগর আমাদের অতি কাছের কিংবা অতিদূরের নন, তাঁর জীবনী রচনায় এমন কিছু দুরতিক্রম্য বাধা নেই। উনবিংশ শতাব্দীর চাকুরির প্রসাদজীবী মধ্যবিত্তের পঙ্গুতার মাঝখানে তাঁর বলিষ্ঠ মানবিকতা, মুক্ত নির্মল বুদ্ধি আমাদের আকর্ষণীয় বস্তু। কিন্তু বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিত্ব এতদিন পরেও আমরা বুঝতে পারিনি, এখনও তিনি আমাদের কাছে দয়া করুণা মাতৃভক্তি প্রভৃতি বিশুদ্ধগুণের বিশুদ্ধ উদাহরণ মাত্র। রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগর-চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য যে মনুষ্যত্বের কথা উল্লেখ করেছেন, তার উৎসসন্ধানে আজও আমাদের অনিচ্ছা. জীবনের শেষ দিকে যে তীব্র নিষ্ফলতার যন্ত্রণায় তিনি মধ্যবিত্তজীবনে আস্থা হারিয়ে ফেলেন, কার্মাটাঁড়ে অশিক্ষিত সাঁওতালদের মধ্যে কেন নতুনভাবে জীবন আরম্ভ করার স্বপ্ন দেখেন—সে সম্পর্কে আমাদের মনে কোনও প্রশ্ন জাগে না।

*

মণি বাগচির 'বিদ্যাসাগর' পড়ে একথাই বার বার মনে হয়েছে। আমরা যে এখনও স্বল্প হলেও সত্যি জাতীয় শিশুপাঠ্য জীবনী রচনার ঊর্ধ্বে উঠতে পারিনি এ বইটিই তার প্রমাণ। 'যুগাবতার' 'পরমপুরুষ' মার্কা জীবন-চরিতের ধাঁচে অন্তত বিদ্যাসাগরের জীবনী লেখা যায় না।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর লেখকের কাছে 'মানব-ঈশ্বর' 'নারায়ণ' রূপেই প্রতিভাত "নবীনচন্দ্র তাঁকে বৃথাই মানব-ঈশ্বর ও নরনারায়ণ বলে বন্দনা করেননি। * * প্রণাম মানব-ঈশ্বর ঈশ্বরচন্দ্রকে।" চরিতকার সগর্বেই ঘোষণা করেন মহাপুরুষদের জীবনে অকল্পনীয় ঘটনা ঘটে। মাইল-স্টোন দেখে বিদ্যাসাগরের ইংরেজি অক্ষর শেখার মধ্যে তিনি 'ইতিহাসের গভীরতা' খুঁজে পান। ছাত্রজীবনে আবশুলা ভোজনই ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনের সবথেকে 'বিস্ময়কর ব্যাপার' বলে তাঁর মনে হয়। শুধু মাত্র এই মন্তব্যই নয়, এই চরিতকথার আদ্যন্ত কাহিনী বিন্যাসে বিদ্যাসাগরের জীবনের এই দিকটির প্রতিই জীবনীকারের ঝোঁক সুস্পষ্ট 'উনবিংশ শতাব্দীর সেই সংঘাত-সংঘর্ষের যুগে, যুগপুরুষ বিদ্যাসাগর বিদ্যার দম্ভ নয়, প্রাণের কোমলতা, অন্তরের সরলতা নিয়েই বাঙালির সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন।"

লেখক যদি একখানা খাঁটি 'পরমপুরুষ' রচনা করতেন তাহলে হয়ত সত্যি আপত্তি জানাতে পারতুম না। রুচির ওপর জোর খাটে না সবিনয়ে স্বীকার করি। কিন্তু ইতিহাসের ভেজাল দিতে গিয়েই তিনি বিপদ বাধিয়েছেন।

দু' একটি জায়গা ছাড়া চারশ নব্বই পৃষ্ঠার বইটিতে ঘটনার পারম্পর্য কাল-চিহ্নিত নয়। 'বালক ঈশ্বরচন্দ্র কলকাতায় এলেন যে বছরে, সেই বছরে রামমোহনের ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা'—সনতারিখহীন এ রকম উক্তি অসংখ্য। একটি পরিচ্ছেদে তিনি জানান, ঈশ্বরচন্দ্র পলাশীযুদ্ধের তেষট্টি বছর পরে জন্মেছেন। অপর অংশেই বলেন—যুগসন্ধিক্ষণে ঈশ্বরচন্দ্রের জন্ম: গ্রাম্য পরিবেশের বদলে শহরের উদ্ধত রূপ দেখা দিচ্ছে, দেখতে দেখতে পলাশীযুদ্ধের পর তেতাল্লিশ বছর কেটে গেল। পরিশিষ্টে বিদ্যাসাগরের জীবন ও যুগের ঘটনাপঞ্জী দিয়ে লেখক দায়িত্ব সারতে চেয়েছেন। কুঞ্জুলরী মধুকাব্যের রচয়িতা শিশিরকুমার ঘোষ, এ তথ্য কোথা থেকে সংগৃহীত হয়েছে জানালে উপকৃত হতুম। চরিতকার অবিশ্যি অন্যান্য বহুপ্রসঙ্গেই রেফারেন্স দেবার প্রয়োজন বিশেষ অনুভব করেন নি।

ঐতিহাসিক মূল্যায়ন 'লেখকের মেজাজের সঙ্গে খাপ খায়না। তাই বিদ্যাসাগরের যুগবৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে গিয়ে তিনি কতকগুলো শিথিল অসম্বদ্ধ অসতর্ক উক্তি করেছেন মাত্র। গ্রন্থকারের মতে, বিদ্যাসাগর যখন জন্মগ্রহণ করেন 'বাঙলার ইতিহাসে তখন যুগসন্ধিক্ষণ।' এই যুগসন্ধিক্ষণের অর্থ কি? সেটা কোন যুগাবসান এবং যুগোদয়ের মধ্যবর্তী কাল? সে সম্পর্কে লেখক নীরব, তিনি পরে টীকা জোড়েন, 'সেটা জ্ঞান অন্বেষণ, জ্ঞান অর্জন আর জ্ঞান বিতরণের যুগ।' * * 'এই যুগে বাণিজ্য এবং রাষ্ট্রের পথ দিয়ে এল নতুন সভ্যতা'—বাণিজ্য এবং রাষ্ট্রের পথ এর অর্থ? নতুন সভ্যতাটাই বা কি জাতীয়? * * 'সাহিত্যে, সমাজে ও ধর্মে বিপ্লব দেখা দিয়েছে'—বিপ্লবটা কিসের, তার স্বরূপই বা কি? লেখক মতের মতই আওড়ান, রামমোহন, অক্ষয়কুমার, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি 'বাঙলার ভাবজগতে বুর্জোয়াভাবাদর্শ প্রতিষ্ঠার সাধনায় ব্রতী-ছিলেন' বুর্জোয়া ভাবাদর্শ বলতে কি বোঝায়, জিনিষটি আকাশ থেকে ঝরে পড়া দেবতার দান নয় নিশ্চয়ই। বাঙালি মধ্যবিত্ত ভদ্রসন্তানেরা কেনই বা এই আদর্শের সাধনায় ব্রতী হলেন? লেখকের সে সম্পর্কে কোনও মাথাব্যথা নেই, তিনি কথামালা সাজাতেই ব্যস্ত।

এমনি চিন্তা এবং দায়িত্বহীন উক্তি বইটিতে অজস্র। লেখক বলেন, বাংলার সমাজজীবন বলতে তখন বুঝাত ইংরেজের তৈরি শহর এই কলকাতাকেই বুঝতে হবে। তারপরেই 'ইয়ং বেঙ্গলে'র চিন্তাধারার প্রভাব সম্পর্কে উক্তি করেন-"সত্যের জন্য বাঁচা এবং সত্যের জন্য প্রাণত্যাগ করা—এই আদর্শ তখন বিদ্যুৎতরঙ্গে হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মধ্যে বিস্তৃতি লাভ করে এবং তাদের মাধ্যমে সমাজ জীবনের বৃহত্তর পরিসরে প্রসারিত হয়"। উনবিংশ শতাব্দীর কলকাতার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ সমাজজীবনের বৃহত্তর পরিসরই বটে।

"বিদ্যাসাগরের" ভাষাও অত্যন্ত আড়ষ্ট, অনাবশ্যক অলংকরণে ভারাক্রান্ত। 'মৃত্যুঞ্জয়ী রুচির বর্বরতা বিদ্যাসাগরী বাংলায় কোথাও নেই'-এই বাক্যটির অর্থ কি?

*

বিনয় ঘোষের 'বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজের' দুটি মাত্র খণ্ড প্রকাশিত, পরবর্তী খণ্ডগুলো হাতে না আসা পর্যন্ত তাঁর রচনা সম্পর্কে মতামত দেওয়া হয়ত সংগত হবেনা। তবু কার্যকারণ সম্বন্ধের যে ছকে তিনি বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিত্বকে বুঝতে চান সেটা যখন দুটি খণ্ডে স্পষ্টভাবেই দেওয়া হয়েছে তখন সে সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যেতে পারে।

এই জীবনীটি সমাজপটেই বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিস্বরূপ নিরূপণের চেষ্টার জন্য উল্লেখযোগ্য। বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিত্বের মূল লেখক অন্বেষণ করেছেন সমাজজীবনের শিকড়ে, তাঁর সমাজ সংস্কার প্রচেষ্টায় শুধু দয়া করুণা আবিষ্কার করতে যাননি। তিনি সঠিক ভাবেই ইয়ং বেঙ্গলের পরগাছা স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিত্বের পার্থক্য নির্দেশ করেন। ঈশ্বরচন্দ্রের মানবিকতায় ইয়োরোপীয় মুক্ত বুদ্ধির সঙ্গে দেশজ সংস্কৃতি মিলেছিল বলেই চিন্তায় এবং আচরণে সে যুগে তিনি ছিলেন প্রায় অনন্য। বিনয় ঘোষের তথ্যনিষ্ঠাও প্রশংসনীয়। কিন্তু মুশকিল হয়েছে ইয়োরোপের রেনেসান্স এবং রিফর্মেশনের ছকে বাঙলার উনিশ শতকী জাগরণকে বিশ্লেষণের চেষ্টায়। বিনয় বাবু যান্ত্রিকভাবেই রেনেসান্সের লক্ষণগুলি সেই যুগের বাঙলার শহরকেন্দ্রিক মধ্যবিত্তের আন্দোলনের ওপর আরোপ করেন। অথচ এই জাগরণের সীমাবদ্ধতা তিনি নিজেই উল্লেখ করেন... 'একটি ক্ষেত্রে, নতুন যুগের নতুন শহরে, নতুন উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে, কেবল নবজাগরণের সুর ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল।' কলকাতাকে তিনি 'নবযুগের ভারতের ফ্লোরেন্স' আখ্যা দেন, তারপরেই স্বীকার করেন কলকাতা শহর আর ফ্লোরেন্সের মধ্যে বিরাট পার্থক্য, পরাধীন পরিবেশে যে ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ খর্ব হয় ইয়ং বেঙ্গলের ট্র্যাজেডিতেই তা প্রমাণিত। তবু পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর ফ্লোরেন্সে—বাণিজ্যশিল্প জ্ঞানবিজ্ঞান জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিপুল কর্মচাঞ্চল্যের সঙ্গে ইংরেজ সাম্রাজ্যের উচ্ছিষ্ট নির্ভর কলকাতার মুষ্টিমেয় মধ্যবিত্ত সমাজের আন্দোলনের সমার্থক তুলনা দিতে হবে? আমাদের 'রেনেসান্সে' দেশের অতীতের কোন মানবমুখীন ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধার করা হোল, গ্রীক সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞানের মত যুক্তিসিদ্ধ মানবিকতার আদর্শই বা ছিল কোথায়? রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের হাতে প্রাচীন শাস্ত্র তাঁদের 'সংগ্রামের হাতিয়ার' রূপে ব্যবহৃত হয় সত্য, কিন্তু ইটালির হিউম্যানিষ্টদের মত প্রাচীন শাস্ত্র থেকে নতুন যুগের পক্ষে প্রয়োজনীয় কি মানবিক মূল্যবোধ তাঁরা অর্জন করেছেন তার পরিচয় দেবার কোনও প্রয়োজন লেখক অনুভব করেননি। বেদান্ত সাংখ্যকে বিদ্যাসাগর দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ভ্রান্তদর্শন বলে নির্দেশ করেন, বিধবা বিবাহের আলোচনার উপক্রমণিকায় স্পষ্ট বলেন, বিধবা বিবাহের স্বপক্ষে শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধারের প্রয়োজনীয়তার কারণ, দেশাচারপ্রভাবিত এই দেশে শাস্ত্রসমর্থন ছাড়া কোনও কিছু শুধু মাত্র যুক্তির ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত করা যায় না।

চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকে মধ্যযুগীয় ধর্মশাসিত সমাজ বিন্যাসে নবজাত বণিকতন্ত্র এবং শিল্পপ্রসারের প্রচণ্ড আঘাতের ফলেই ইটালির রেনেসান্স। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলার ঔপনিবেশিক জীবনের সংকীর্ণতার তার তুলনা কোথায়? বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ প্রচলন চেষ্টাকে বিনয় ঘোষ 'সামাজিক গণআন্দোলনের প্রাথমিক প্রকাশ' আখ্যা দেন। বিদেশী রাজশক্তির কাছে জনকয়েক শিক্ষিত লোকের আবেদনপত্র প্রেরণ বা বিচ্ছিন্নভাবে বিধবা বিবাহ কোন ধরণের গণআন্দোলন? ঐতিহাসিকদের আলোচনা থেকে জানি, রিফর্মেশন আন্দোলনের ব্যাপকতা এবং শক্তির মূলে ছিল কৃষক বিদ্রোহ, যদিচ লুথার শেষ পর্যন্ত সেই বিদ্রোহের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেন। স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্র, এবং নোবিলিটির সঙ্গে তাঁর আপোষরফা হয়। উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর সমাজ সংস্কারের কোন আন্দোলন ব্যাপক জনসমর্থনের দৃঢ় ভিত্তি খুঁজে পেয়েছে? লেখক বলেছেন, বিদ্যাসাগরের বহুবিবাহ রোধের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে, বিধবাবিবাহও তখনকার মত এখনও তেমন প্রচলিত হয়নি। কিন্তু কেন? পঞ্চদশ শতক থেকে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত ইয়োরোপের সমাজজীবনে যে সমস্ত মৌলিক পরিবর্তন ঘটে গেছে তার তুলনায় বহুবিবাহ রোধ বা বিধবা বিবাহ আন্দোলন কি খুব বেশি মাত্রায় বিপ্লবী ছিল? শেষ জীবনে যে নিদারুণ যন্ত্রণায়, গভীর অবসাদে বিদ্যাসাগরের বলিষ্ঠ মনও ভেঙ্গে পড়ে, তার তাৎপর্য কি আমরা বোঝার চেষ্টা করব না? বিনয় বাবু কোন অর্থে বলেন, উনিশ শতকে এদেশে রেনেসান্স এবং রিফর্মেশনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হল, এবং এর প্রধান কেন্দ্র হল কলকাতা শহর? তাঁর আলোচনায় বাঙালীর উনিশ শতকী জাগরণের সঠিক চরিত্র নির্ধারিত হয়েছে কিনা সন্দেহের বিষয়।

বিনয় বাবু পণ্ডিত, দীর্ঘদিন ধরে তিনি উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস চর্চায় রত, তাঁর কাছে আমাদের মত সাধারণ পাঠকদের প্রত্যাশা অনেক। 'বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ'-এর পরবর্তী খণ্ডগুলোতে আমাদের প্রশ্নের সদুত্তরের জন্য প্রতীক্ষায় রইলাম।

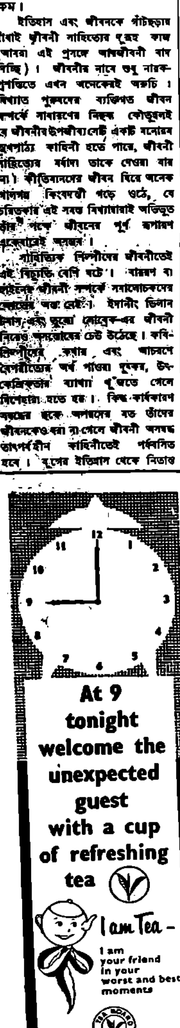

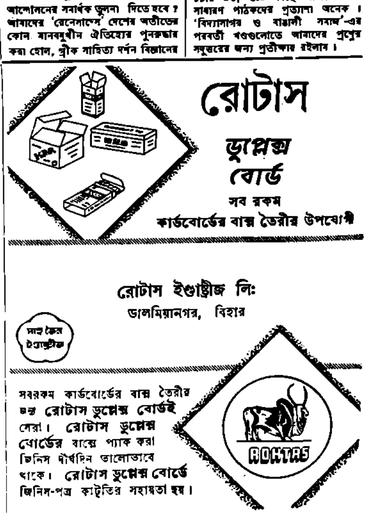

নিখিল বঙ্গ সম্মেলন

(৮ম পৃষ্ঠার পর)

(গ) রাজ্যের সর্বস্তরে শিক্ষার বাহন হবে সেই রাজ্যের প্রধান ভাষা। এই ভাষাতেই রাজ্যের শাসন, আইন ও বিচার-সংক্রান্ত কাজকর্ম চলবে এবং চাকরি সংক্রান্ত পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে। অবিলম্বে এ বিষয়ে সরকারী ঘোষণা করা হোক এবং ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র শতবার্ষিকীর পূর্বেই যেন এই প্রস্তাব কার্যকরী হয়।

(ঘ) বর্তমানে সর্বভারতীয় আইন, বিচার এবং শাসন সংক্রান্ত কর্মের ভাষা হবে ইংরেজি এবং একমাত্র এই ভাষাতেই সর্বভারতীয় চাকুরি-সংক্রান্ত পরীক্ষা নেওয়া হবে।

(ঙ) অন্তত পঁচিশ বছর কাল প্রত্যেকটি ভাষা সমান মর্যাদা পাওয়ার পর এবং কোনো একটি ভাষার প্রতি পক্ষপাতী ব্যবস্থার প্রত্যাহরণের পর, প্রতিটি রাজ্যের বিধান সভার দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সম্মতি থাকলে এক বা একাধিক ভারতীয় ভাষাকেও ভবিষ্যতে রাষ্ট্রভাষা করা যাবে।

(চ) কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্যের সরকারি যোগাযোগের ভাষা হবে ইংরেজি অথবা সেই রাজ্যের ভাষা, এক রাজ্যের সঙ্গে অন্য রাজ্যের যোগাযোগের ভাষাও হবে ইংরেজি অথবা পারস্পরিকভাবে স্বীকৃত কোনো ভারতীয় ভাষা।"

"ভারতবর্ষ অদ্ভুত দেশ। এখানে অন্তত চৌদ্দটি প্রধান ভাষা, সেই সব ভাষার সাহিত্য এবং সংস্কৃতি প্রচলিত রয়েছে। পৃথিবীর আর কোনো দেশের সঙ্গে এদেশের অবস্থার তুলনা চলতে পারে না। অবস্থা ভিন্ন বলেই আমাদের সমস্যাদের চরিত্র স্বতন্ত্র। সেইজন্যই [illegible] পদ্ধতিতে আমরা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংকল্প নিয়েছি। এবং সেই জন্যেই পূর্ব-পশ্চিম কোনো শক্তিমান রাষ্ট্রগোষ্ঠীর আশ্রয় আমরা চাইনি। আমাদের সমস্যা ভিন্ন, তার সমাধানও ভিন্ন হওয়াই স্বাভাবিক। বহুকালের সভ্যতা আমাদের—বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান করতেই শিখিয়েছে।

"বিকাশের অর্থই ঐক্যের মধ্যে পার্থক্যের বিকাশ। আপনাকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করিয়া অন্যের সঙ্গে একেবারে মিলিয়ে গিয়ে যে বড়ো হওয়া, তাহাকে কোনো স্বাতন্ত্র্য সত্তা বড়ো-হওয়া মনে করিতেই পারে না।...বস্তুত সে ছোটো হইয়া বাঁচিতে চায়, বড়ো হইয়া মরিতে চায় না।"—('পরিচয়' রবীন্দ্র রচনাবলী ১৮শ খণ্ড)

মাতৃভাষা সংরক্ষণ সংঘের উদ্যোগে নিখিলবঙ্গ ভাষা সম্মেলন যে সব প্রস্তাব দেশবাসীর সামনে উপস্থিত করেছেন তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মতো মনীষীদের দৃষ্টিভঙ্গীর কোনো প্রভেদ নেই। জাতীয় ঐক্যের নামে জাতীয় সংকীর্ণতাকে প্রশ্রয় দেওয়া অবিদ্যার লক্ষণ। ভারতের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ যাতে নেই তাকে সর্বউপায়ে বাধা দিতেই হবে। এখনো আশা আছে যে ভাবালুতায় মত্ত হয়ে, যুক্তিকে বিসর্জন দিয়ে, রবীন্দ্রনাথের মতো মানুষের পরামর্শ ডাষ্টবিনে নিক্ষেপ করে, মঙ্গলের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে, তাড়াহুড়ো করে ভারতের জটিল ভাষা সমস্যার আমরা কোনো আপাতমনোহর নকল সমাধান খুঁজে পাবোনা। যদি যাই তাহলে তার অনিবার্য পরিণামের কথা ভেবেই যেন যাই। অন্ধ হলেই প্রলয় বন্ধ থাকবে না।

শাস্ত্রচর্চার সমর্থনে

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

উপযুক্ত শাস্ত্র-চর্চার অভাবে আমরা আজকাল আমাদের প্রাচীন কালের মুনি-ঋষিদের সম্বন্ধে নানা রকম কিম্ভূতকিমাকার ধারণা পোষণ করে থাকি। উপনিষদের ঋষি বললেই মনে হয়, তাঁরা বুঝি শুধুই পরব্রহ্মের ধ্যান করতেন আর ভাবতেন, জগৎটাই মায়া; মিথ্যা মরীচিকার মতো। আসলে কিন্তু এধারণা নেহাতই অশাস্ত্রীয়। কেননা প্রকৃত শাস্ত্র অনুসারে তাঁরা মোটেই ওরকম নীরস মানুষ ছিলেন না।

ছান্দোগ্য-উপনিষদের জানশ্রুতি পৌত্রায়ণ ও রৈক্ক-র আখ্যায়িকাটি শুনলেই আপনারা আমার কথা মানবেন।

জানশ্রুতি পৌত্রায়ণ তখনকার কালের একজন খুব বড়োলোক ছিলেন। খুব দানধ্যান করতেন, অতিথিভোজনের জন্যে বহু অন্ন পাক করাতেন, চারদিকে অনেক পান্থশালা খুলেছিলেন।

একদিন হলো কি, রাতের বেলায় আকাশ দিয়ে হাঁসরা উড়ে যাচ্ছিল। তাদের মধ্যে এক হাঁস আর এক হাঁসকে বললো, "ওহে সাবধান! জানশ্রুতি পৌত্রায়ণের জ্যোতি আকাশের মতো বিস্তৃত হয়ে রয়েছে। স্পর্শ করলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।"

দ্বিতীয় হাঁস যেন একটু ঠেস দিয়েই বললো, "তুমি আবার কার কথা বলছো? তিনি কি শকটবান রৈক্ক নাকি?" অর্থাৎ কিনা, ওই শকটবান রৈক্ক হলেন খুব কেষ্টবিষ্টু ধরণের লোক; তুমি এমনভাবে জানশ্রুতি পৌত্রায়ণের কথা বললে যে মনে হয় তিনি বুঝি শকটবান রৈক্ক-র সমান।

প্রথম হাঁস প্রশ্ন করলো, "শকটবান রৈক্ক আবার কে?"

দ্বিতীয় হাঁস রৈক্কর গুণ বর্ণনা করতে লাগলো: কৃত নামের পাশার দান জিতলে যেমন পাশার বাকি সব ছোটো দানও তার অধীন হয় তেমনি সবত্রই—লোকে যা কিছু করে তা সবই রৈক্কর অধীন। রৈক্ক যা জানেন যে-ব্যক্তি তা জানে তার সম্বন্ধেও একই কথা।

অবশ্যই সে-কালের ওই পাশা খেলাটা যে-ঠিক কী রকম ছিলো তা-নিয়ে একালের পণ্ডিতেরা অনেক মাথা ঘামিয়েছেন, কিন্তু কোনো কূলকিনারা পাননি। তাই পাশার কথাটা বাদ দেওয়া যাক; তাছাড়া, ওটা তো নেহাৎ উপমা-প্রসঙ্গে এসেছে। মূল আখ্যায়িকাটির পক্ষে বোঝা কথা হলো, দ্বিতীয় হাঁসের মতে, রৈক্ক খুবই জ্ঞানী এবং শক্তিশালী; তাঁর মতো জ্ঞান পেলে তাঁর সমান শক্তিশালী হওয়া যায়।

*

এখন, জানশ্রুতি পৌত্রায়ণ হাঁসদের এই কথোপকথন শুনেছিলেন।

সকালে উঠে তিনি দ্বারপালকে ডেকে বললেন, "দুই হাঁসের মধ্যে এ-ধরণের কথাবার্তা হতে শুনেছি। অতএব, শকটবান রৈক্ক-কে বের করো।"

দ্বারপাল খোঁজখবর করে ফিরে এলো; বললো, "আমি তাঁকে খুঁজে পেলুম না।"

জানশ্রুতি পৌত্রায়ণ তাঁকে বললেন, "যেখানে যেখানে ব্রাহ্মণদের খোঁজ পাওয়া যায় সে রকম জায়গায় গিয়ে খোঁজখবর করো।"

দ্বারপাল আবার বেরুলো। যেতে যেতে দেখে, এক শকটের (ঠেলা গাড়ির বা গরুর গাড়ির) নিচে বসে একটি লোক খোস চুলকোচ্ছেন। দ্বারপাল তাঁর কাছে গিয়ে বসলো, আর প্রশ্ন করলো, "ভগবান, আপনিই কি শকটবান রৈক্ক?"

তিনি উত্তর করলেন, "হ্যঁ, আমিই।"

—যাক, জানা গেল,—এই ভেবে দ্বারপাল ফিরে এলো।

খবর পেয়ে, জানশ্রুতি পৌত্রায়ণ ছ'শো গাভী, স্বর্ণময় কণ্ঠহার, অশ্বতরীযুক্ত রথ উপহার নিয়ে শকটবান রৈক্কর কাছে গেলেন আর বললেন, "হে রৈক্ক। আমি এই সমস্তই আপনার জন্য উপহার এনেছি। আপনি যে দেবতার উপাসনা করেন আমাকে সেই দেবতার উপদেশ দিন।"

রৈক্ক তাঁকে বললেন, "ওহে শূদ্র। এই হার ও রথ এবং এই সমুদয় গাভী তোমারই থাকুক।"

তারপর জানশ্রুতি পৌত্রায়ণ সহস্র গাভী, অশ্বতরীযুক্ত রথ, স্বর্ণময় কণ্ঠহার এবং নিজের মেয়েকে উপহার নিয়ে রৈক্কর কাছে আবার উপস্থিত হলেন এবং বললেন, "হে রৈক্ক। আপনাকে এত গাভী, এই স্বর্ণময় হার, এই অশ্বতরীযুক্ত রথ, এই জায়া এবং আপনি যে-গ্রামে বাস করেন সেই গ্রাম এতোসব উপহার দিচ্ছি। আপনি আমাকে শিক্ষা দিন।"

*

তখন রৈক্ক করলেন কি, হাত দিয়ে সেই তরুণীটির মুখ তুলে ধরে বললেন, "ওহে শূদ্র। তুমি এতো কিছু এনেছো, কিন্তু শুধু এই মুখের টানেই আমার মুখ খুলেছে"—অর্থাৎ কিনা, শুধুমাত্র এই সুন্দর মুখের খাতিরেই আমি তোমায় উপদেশ দিচ্ছি। বলে তিনি উপদেশ দিলেন।

তস্যা মুখমুপোদ্‌গৃহ্নন্‌ বাচাজহারেমাঃ শূদ্রানেনৈব মুখেন লাপয়িষ্যথা ইতি॥ ছান্দোগ্য: ৪.২.৫॥

ঋষিমুখ থেকে যদি এ যেন কথা বেরিয়ে থাকে তাহলে মানতেই হবে, শকটবান রৈক্ক সেকালের যতো বড়ো ঋষিই হোন না কেন, একালের রসিক ব্যক্তির মতোই সুন্দর মুখের কদর তাঁর কাছেও বড়ো কম ছিলো না! অথচ এই সব মুনি ঋষিদেরই কিনা আমরা আজকাল মনে মনে একরকম নীরস প্রায়-অমানুষ জীবের সামিল করে নিয়েছি। শাস্ত্রচর্চার অভাবের বিষময় ফল ছাড়া একে আর কি বলবো?

বিষময় ফল শুধু এইটুকুই নয়। শুধুই যে আমরা ভুলতে বসেছি যে মুনি ঋষিরাও মানুষ ছিলেন—তাঁদের গায়েও খোস পাঁচড়া হতো, ঠেলা গাড়ির তলায় বসে তাঁরাও খোস চুলকোতেন, আর সুন্দরীর মুখ দেখে মোহিত হয়ে এমনকি যাকে শূদ্র বলে সম্বোধন করছেন তাকেও শাস্ত্র উপদেশ দিয়ে বসতেন, শুধু তাই নয়। আমরা এঁদের সম্বন্ধে আরো গুরুত্বপূর্ণ কথাও ভুলতে বসেছি। আমরা ভুলতে বসেছি যে এঁরা শুধুই মানুষ ছিলেন না, রীতিমতো অনুন্নত বা স্বল্প-সভ্য সমাজের মানুষ ছিলেন। প্রকৃত শাস্ত্রচর্চা বাদ দিয়ে শাস্ত্র সম্বন্ধে একটা মনগড়া বা কাল্পনিক ধারণা নিয়ে আমরা আজকাল এমনই মোহিত হয়ে থাকি যে এ হেন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কেউ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গেলেই আমরা প্রায় ক্ষেপে যাবার উপক্রম করি। ফলে আমাদের দেশের শাস্ত্র গ্রন্থগুলি আমাদের কাছে প্রায় অলীক হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

*

মুনি-ঋষিরা যে স্বল্প সভ্য সমাজেরই মানুষ ছিলেন, এখানে সে বিষয়ে সামান্য একটা নমুনা দেওয়া যায়।

শকটবান রৈক্ক যে এলাকায় বাস করতেন ছান্দোগ্য-উপনিষদ অনুসারে তার নাম হলো, মহাবৃষ-দের এলাকা। মহাবৃষ মানে বড়ো ষাঁড়; কিন্তু নামটা ছিলো এক জাতের মানুষের নাম—অথর্ববেদ, বৌধায়ন শ্রৌতসূত্র, জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ উপনিষদ প্রভৃতি অন্যান্য শাস্ত্র গ্রন্থেও এই মানবদলটির উল্লেখ পাওয়া যায়। এই মানবদলের নাম থেকেই এলাকার নাম হয় মহাবৃষ।

তাহলে, এ বিষয়ে একটু ভেবে দেখবার দরকার আছে। একদল মানুষ নিজেদের নামকরণ করেছিলো মহাবৃষ বা বড়ো ষাঁড়। কেন তা করেছিলো? উন্নত বা সভ্য সমাজের মানুষ নিজেদের এমনতরো নামকরণ করে না। তাই উন্নত ও সভ্য সমাজের মানুষদের কথা মনে রেখে শকটবান রৈক্কদের মধ্যে বাস করতেন তাদের সমাজ ব্যবস্থা বোঝবার উপায় নেই। তাহলে কি করে বুঝবো? আজো পৃথিবীর আনাচে-কানাচে যে সব অনুন্নত মানবদল টিকে আছে তাদের দিকে চেয়ে দেখলে একটা সূত্র পাওয়া যাবে। কেননা তাদের মধ্যে আজো এহেন নামকরণের প্রথা টিকে আছে। এক-একটি দল এক-এক জন্তুজানোয়ার বা গাছগাছড়ার নাম থেকেই নিজেদের নামকরণ করে আর দলের সবাই মনে করে যে তারা ওই জন্তু বা উদ্ভিদের বংশধর। এ বিশ্বাসের নাম দেওয়া হয় টোটেম বিশ্বাস; জন্তু উদ্ভিদটি হলো পুরো দলের টোটেম।

অবশ্যই টোটেম-বিশ্বাসের আদি-অকৃত্রিম রূপটির নমুনা পাওয়া যায় অতি নিম্ন—প্রায়-বন্য অবস্থায় মানুষদের মধ্যে। যেমন, অস্ট্রেলিয়ার জংলী আদিবাসী বা আমাদের দেশের কোনো কোনো জংলী আদিবাসী এবং এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই যে, উপনিষদের ঋষিরা মোটেই ওরকম জংলী আদিবাসীদের অবস্থায় জীবন যাপন করতেন না। তবুও এ বিষয়েও কোনো সন্দেহই নেই যে তাঁদের চিন্তা চেতনা থেকে ও-জাতীয় সমাজ জীবনের চিহ্ন মুছে যায়নি। অর্থাৎ কিনা, তাঁদের ধ্যানধারণায় এই টোটেম বিশ্বাসের স্পষ্ট স্মারক বহুলাংশে টিকে থেকেছিলো। আর যদি বা টিকে থাকে তাহলে বুঝতে হবে যে তাঁরা অনুন্নত বা স্বল্প সভ্য স্তরেই জীবন যাপন করতেন।

*

ছান্দোগ্য-উপনিষদ থেকেই ওই প্রাচীন বিশ্বাসের আরো অনেক স্মারক দেখানো যায়। যেমন ধরুন, শকটবান রৈক্কর ঠিক পরেই আর একজন ঋষির নাম পাওয়া যাচ্ছে—"শৌনক কাপেয়" (ছাঃ ৪.৩.৫)। শৌনক মানে কুকুরের পুত্র, কাপেয় মানে বাঁদরের পুত্র। শাস্ত্রচর্চা আরো গভীর হলে আমরা ভালো করে বুঝতে পারবো, একই ঋষি-নামের সঙ্গে এ-হেন দুটি টোটেমের যোগ কি করে সম্ভব হলো। কিন্তু আপাতত এ বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই যে ঋষিটি যদি এ-ভাবে নিজেকে কুকুর-বাঁদরের বংশধর বলে পরিচিত করে থাকেন তাহলে তাঁর মনে আদিম টোটেম-বিশ্বাসের জের বড়ো কম ছিলো না। অতএব, তিনিও স্বল্পসভ্য সমাজেরই মানুষ ছিলেন।

প্রকৃত শাস্ত্র-জ্ঞানের পক্ষে এই কথাটা কেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ? কেননা, আমরা সাধারণত অত্যন্ত অশাস্ত্রীয় ভাবে এই সব শাস্ত্র গ্রন্থগুলির মধ্যে এমন সব বিজাতীয় জ্ঞানের কল্পনা করে থাকি যার সঙ্গে ওই স্বল্পসভ্য স্তরের মানুষদের বাস্তব সম্পর্ক থাকা সম্ভবই নয়। অর্থাৎ, শাস্ত্রগ্রন্থের উপর আমরা অত্যন্ত অশাস্ত্রীয় ধ্যানধারণা আরোপ করবার আয়োজন করে থাকি।

যেমন ধরা যাক, উপনিষদের দর্শন। উপনিষদের দার্শনিক মতবাদ বলতে আজকাল আমরা এক অতি গূঢ় অধ্যাত্মবিদ্যার কথা কল্পনা করে বসি, এমন কি, অনেক সময়, খাপছাড়া ভাবে উপনিষদ থেকে এক-আধ টুকরো কথা উদ্ধৃত করে এবং তার দোহাই দিয়ে ওই উপনিষদের মধ্যেই কাণ্ট হেগেলের মতো সাহেব-দার্শনিকদের মতবাদ আবিষ্কার করবার আয়োজন করা হয়। এ চেষ্টা যে কতোখানি অবাস্তব তা আমরা বুঝতে পারবো, যদি খেয়াল রাখি যে উপনিষদের ঋষিরা আসলে কোন অবস্থায় মানুষ ছিলেন, এবং অতএব বিশ্বরহস্য উদঘাটনে তাঁদের পক্ষে কতোটুকু কথা চিন্তা করা একান্তই সম্ভবপর ছিলো।

*

জানশ্রুতি পৌত্রায়ণ ও শকটবান রৈক্কর আখ্যায়িকাটিই দেখা যাক। সহস্র গাভী, স্বর্ণময় কণ্ঠহার, অশ্বতরীযুক্ত রথ, একটি গ্রাম এবং সর্বোপরি একটি তরুণী মুখের প্রলোভন দেখিয়ে জানশ্রুতি পৌত্রায়ণ শকটবান রৈক্কর কাছে ঠিক কি উপদেশ পেলেন? কোন ধরণের জ্ঞানের কথা শুনলেন?

উপনিষদে তাকে বলা হয়েছে, সম্বর্গবিদ্যা। সংবর্গ মানে যা-গ্রাস-করে-সর্বগ্রাস। এবং এই সম্বর্গবিদ্যা হলো:

বায়ুই সর্বগ্রাস (অর্থাৎ সকলকে গ্রাস করে), (কারণ) যখন অগ্নি নির্বাপিত হয়, তখন (তাহা) বায়ুতেই লীন হয়; যখন সূর্য অস্তমিত হয়, তখন (তাহা) বায়ুতেই লীন হয়; যখন চন্দ্র অস্তমিত হয় তখন (তাহা) বায়ুতেই লীন হয়। যখন জল বিশুষ্ক হয় তখন তাহা বায়ুতেই গমন করে; বায়ু এই সমুদয়কে সংহার করে। ইহাই আধিদৈবত, অর্থাৎ দেবতাবিষয়ক উপাসনা।

অনন্তর অধ্যাত্ম (অর্থাৎ দেহ বিষয়ক) উপাসনা। প্রাণই সর্বগ্রাস; (কারণ) যখন পুরুষ নিদ্রিত হয় তখন বাক্ প্রাণে প্রবেশ করে, চক্ষু প্রাণে, শ্রোত্র প্রাণে এবং মন প্রাণে (প্রবেশ করে)। প্রাণই এই সমুদয়কে বিনাশ করে। এই দুইই সর্বগ্রাস—দেবগণের মধ্যে বায়ু এবং ইন্দ্রিয়-সমূহের মধ্যে প্রাণ"। (ছাঃ উঃ ৪.৩.১-৪)

ব্যাস, এই পর্যন্তই। শকটবান রৈক্ক বিশ্বসংসারের রহস্য বোঝবার চেষ্টা করেছিলেন। সেদিক থেকে তিনি দার্শনিক। কিন্তু যে-যুগে যে-অবস্থায় তিনি এ চেষ্টা করেছিলেন তার কথা ভুলে গেলে শাস্ত্রের কদর্থমাত্র করা হবে। বিশ্বের নানা বিষয় চিন্তা করতে করতে তাঁর মনে হয়েছিলো, সবকিছুই বায়ুর মধ্যে বিলীন হয়ে যায়; অতএব এই বায়ুই চরম সত্য, পরম সত্তা। খানিকটা হয়তো প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক আনেক্সিমেনিসের মতো কথা; কেননা তিনিও বায়ুকেই চরম সত্য বা পরম সত্তা মনে করেছিলেন।

* * *

মনে রাখা দরকার, শকটবান রৈক্ক এমন এক যুগে এমন এক অবস্থায় বিশ্বসংসারের রহস্য অনুসন্ধান করেছেন যখন মানুষের জ্ঞান বড় একটা এগোয় নি; ও-রকম স্বল্পসভ্য অবস্থায় তা খুব বেশী এগুবার কথাও নয়। চন্দ্র সূর্য অস্ত যাবার পর কোথায় যায়, কি হয়, এটুকু পর্যন্ত তখনো জানা যায়নি। কিন্তু শকটবান রৈক্কর দার্শনিক মন ছিলো; তাঁর মধ্যে তাই জিজ্ঞাসা জেগেছিলো। এবং এইখানেই তাঁর ঋষিত্ব, তাঁর গৌরব। সমসাময়িক মানবজ্ঞানের দৈন্য সত্ত্বেও তিনি এ প্রশ্নের জবাব চেয়েছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিলো, চাঁদ সূর্যও হাওয়ার মধ্যে বিলীন হয়ে যায়—যেমন আগুন নিভে গেলে হাওয়ার মধ্যে মিশে যায়, জল শুকিয়ে গেলে হাওয়ার মধ্যে মিশে যায়। অতএব এই বায়ুই তাঁর ধারণায় সর্বগ্রাসী, দেবতা-বিষয়ক জ্ঞানের চূড়ান্ত কথা। শুধুমাত্র প্রাকৃতিক বিষয় সম্বন্ধে নয়। মানুষের বিষয়ে ভাবতে ভাবতেও তাঁর এই একই কথা মনে হয়েছিলো। প্রাণ বলতেও ওঁরা প্রাণবায়ু বা শ্বাস-প্রশ্বাসই বুঝতেন। যতক্ষণ মানুষ বেঁচে আছে ততোক্ষণ শ্বাস-প্রশ্বাস চলেছে; মারা গেলে তা বন্ধ। অতএব, শ্বাস-প্রশ্বাস বা প্রাণবায়ুই হলো প্রাণ। এবং মানুষ যতো নিদ্রাচ্ছন্ন হচ্ছে ততোই তার ইন্দ্রিয় শক্তি, তার মন, সব কিছু লীন হয়ে যাচ্ছে এই শ্বাস-প্রশ্বাসের মধ্যে; কেননা শুধুমাত্র এই শ্বাস-প্রশ্বাসই থাকি থাকছে। এই সব দেখে শুনে এবং চিন্তা করে শকটবান রৈক্ক তাঁর সম্বর্গ বিদ্যায় উপনীত হয়েছিলেন। এবং সে-যুগে তিনি যে এতোখানি চিন্তা করতে পেরেছিলেন তা কম বিস্ময়ের কথা নয়।

আধুনিক জ্ঞানের উন্নততর মানদণ্ডে এই প্রাচীন জ্ঞানের মূল্য নির্ণয় করতে যাওয়া চলবে না। মনে রাখতে হবে, আজকের দিনের মানুষের জ্ঞান যে এতোখানি উন্নত হয়েছে তার কারণ প্রাচীন কালের পূর্বপুরুষদের মধ্যে শকটবান রৈক্ক বা ওই রকম অন্যান্য মুনি ঋষিরা জন্মগ্রহণ করেছিলেন—যাঁরা কিনা, তাঁদের সামান্য সঙ্গতির উপর নির্ভর করেই বিশ্বরহস্যের কিনারা করতে আগুয়ান হয়েছিলেন। উপনিষদের উপযুক্ত চর্চা হলে আমরা এ ধরণের আরো অনেক প্রচেষ্টার পরিচয় পাবো।

কিন্তু হায় আমাদের ভাগ্য। প্রকৃত শাস্ত্রচর্চা আমরা আজকাল বড়ো একটা করি না। তার বদলে শাস্ত্র আর মুনি-ঋষিদের সম্বন্ধে উদ্ভট ও আজগুবি কতকগুলো ধারণা আঁকড়ে বসে থাকতে চাই।

বিজ্ঞান আলোচনা :—

মহাশূন্যের বিদ্যুৎ বলয়

—কনাদ

আঠার মাসে বছর। কথাটা শোনা যায় বেশী বাংলা দেশে। প্রবচনটা কিভাবে, কেমন ক'রে চালু হ'য়ে গেল জানা নেই। তবে, এটা সবাই জানে যে, কুঁড়েমির সঙ্গেই কথাটা বিশেষভাবে জড়িয়ে আছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক জগতে বর্তমানে আঠার মাসের একটা বছর চ'লছে। তার অর্থ আর যাই হোক্ কুঁড়েমি নয়।

বরং এটা এমন এক বছর যার মধ্যে কর্মমুখর বৈজ্ঞানিক জগতের বিশেষ রূপটাই বেশী চোখে পড়ে। এই মাপ-ছাড়া বছর সুরু হ'য়েছে ১৯৫৭ সালের জুলাই মাসে। শেষ হবে এ বছরের শেষের দিকে। এই দীর্ঘ 'বছরের' নাম দেওয়া হ'য়েছে আন্তর্জাতিক ভূ-সমীক্ষা বছর, বা আ-ভূ-ব।

গোটা পৃথিবী জুড়েই শুধু নয়, ভূতলের ঊর্ধ্বে যে উদার আকাশ বা মহাশূন্য (Space) ছড়িয়ে আছে, সেখানেও এই আ-ভূ-ব সমীক্ষার ক্ষেত্র প্রসারিত করা হ'য়েছে। আ-ভূ-ব বৈজ্ঞানিক জগতের একটা বিশেষ আন্দোলন। কারণ, বৈজ্ঞানিকরা আগে থেকেই জানতেন যে, এই সময় সূর্যগোলকে প্রচণ্ড আলোড়ন ঘটবে। এই আলোড়নকে যদি মহাপ্রলয়ের সঙ্গে তুলনা করা সম্ভব হয়, তাহলে বলা যায় যে, এগার বছরে একবার এই মহাপ্রলয় ঘটে সূর্যগোলকে।

* * এই সূর্য প্রলয়ের একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে। কারণ, সমগ্র বিশ্ব যদি সূর্যকেন্দ্রিক হয়, তাহলে অনুমান ক'রতে অসুবিধা হয়না যে, সমগ্র বিশ্বের মহাশূন্যেও সূর্যপ্রলয়ের প্রতিধ্বনি উঠবে। উঠেছে। আ-ভূ-ব সুরু হয়েছে সূর্যপ্রলয়ের সঙ্গে সঙ্গে।

পৃথিবীর মানুষ আমরা। তাই এই পৃথিবীর কথাটাই বেশী মনে জাগে। সূর্যপ্রলয়ের সঙ্গে পৃথিবীর সম্পর্কটাও সেই কারণে ভেবে দেখা দরকার। সূর্য প্রলয় যখনই ঘটেছে তখনই দেখা গিয়েছে পৃথিবী জুড়ে একটা অদৃশ্য আলোড়নের সৃষ্টি হ'য়েছে। কেন? কেন এই আলোড়ন? কোথা থেকে আসে এই আলোড়নের ইঙ্গিত? কোন্ অদৃশ্য উৎস থেকে নেমে আসে শক্তি তরঙ্গ, যা সারা পৃথিবীতে আলোড়ন ঘটিয়ে দেয়? এমনি আরও কত প্রশ্ন আছে, যা সম্পূর্ণ মীমাংসা হয়নি।

প্রশ্ন যাই হোক সাধারণ মানুষও আজকাল অনুভব করে এই বিপুল আলোড়ন। কারণ, রেডিও খুলে বসলেই টের পাওয়া যাবে সূর্যপ্রলয়ের প্রভাবে শব্দতরঙ্গ বিক্ষিপ্ত হ'য়ে যাচ্ছে। সূক্ষ্ম অনুভূতির যন্ত্র বসিয়ে দেখা যায়, ভূতলের চুম্বকক্ষেত্র বিপর্যস্ত হ'য়ে যাচ্ছে। আর উত্তর মেরু বা দক্ষিণ মেরুতে যদি যাওয়া যায়, সূর্য প্রলয়ের সঙ্গে সঙ্গে দেখা যাবে মেরু বিচ্ছুরণ (অরোরা বোরিয়েলিস)। আ-ভূ-ব সমীক্ষা থেকে দেখা গিয়েছে ঠিক একই সময়ে উত্তর ও দক্ষিণ মেরুতে এই মেরু-বিচ্ছুরণে সারা আকাশ নানাবর্ণে উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে। কেন, কেন দেখা দেয় এমনি আরও কত শত প্রতিক্রিয়া? এমনি বহু প্রশ্ন নিয়েই চলেছে আ-ভূ-ব কর্মতৎপরতা।

* * * *

আ-ভূ-ব সাধারণ মানুষের মনে ইতিমধ্যেই বিপুল বিস্ময় সৃষ্টি করেছে। রাশিয়া ও আমেরিকার শিশু-উপগ্রহ নিঃসন্দেহে এই বিস্ময়ের বড় অংশ জুড়ে রয়েছে। কারণ, চমক লাগাবার মত শিশু-উপগ্রহের জুড়িদার নেই। কিন্তু আ-ভূ-ব-র অবদান শিশু-উপগ্রহ নয়। বিজ্ঞানের আসরে শিশু-উপগ্রহ পন্থা মাত্র; নতুন কোন তথ্য নয়। নতুন তথ্য পাওয়া যাবে শিশু উপগ্রহ থেকে।

বিজ্ঞানী মহলে চমক

কিন্তু নতুন তথ্য ইতিমধ্যেই যা পাওয়া গেছে, তা বৈজ্ঞানিক মহলে শিশু-উপগ্রহের চাইতেও বেশী চমকপ্রদ। তথ্য যা পাওয়া যাচ্ছে তার সব কিছুই প্রয়োজনীয় বা গুরুত্বপূর্ণ নাও হতে পারে। আবার সব তথ্যই যে জানা যাচ্ছে, তাও নয়। তবু যতটুকু বিক্ষিপ্তভাবে পাওয়া যাচ্ছে, তা দেখেই বৈজ্ঞানিক মহল রীতিমত চমকে উঠেছে।

চমকে ওঠার মত চমকপ্রদ খবর যা পাওয়া গেছে, তার মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ খবর পাওয়া গেছে মহাশূন্য থেকে। কেমন করে সে খবর পৌছল পৃথিবীতে, সেটা আমাদের কাছে অপ্রয়োজনীয়। খবরটুকুই প্রয়োজন।

* * *

এমনি একটা চমকপ্রদ খবর পাওয়া যাচ্ছে চুম্বকক্ষেত্র এবং মহাশূন্য থেকে ভেসে আসা তেজস্ক্রিয় শক্তিতরঙ্গ সম্বন্ধে। ব্যাপারটা একটু খুলে বলা দরকার।

● ● ● পৃথিবীর চুম্বকক্ষেত্রের কথাই প্রথম ধরা যাক। গোটা পৃথিবীকে যদি একটা বিরাট চুম্বক ব'লে মনে করা যায়, তাহ'লে অনুমান করতে অসুবিধা হয় না যে, উত্তর ও দক্ষিণ মেরু এই চুম্বকের দুই মেরু। তা যদি হয়, তাহ'লে পৃথিবীর যে কোন স্থানে যদি একটা কম্পাস রাখা যায়, তাহ'লে চুম্বকের স্বাভাবিক নিয়মে কম্পাসের কাঁটা উত্তর ও দক্ষিণ মুখী হবে। কিন্তু পরীক্ষা ক'রে দেখা গিয়েছে, সব জায়গায় তা হয় না। বহু ব্যতিক্রম বহু জায়গায় ঘটে। প্রশ্ন, কেন এরকম হয়? কোন বৈজ্ঞানিক অনুমান করেছিলেন যে যাবতীয় পদার্থের চুম্বকক্রিয়া সমষ্টিগতভাবে পৃথিবীর চুম্বক ক্ষেত্র রচনা ক'রেছে। কিন্তু এসম্বন্ধেও দ্বিমত দেখা দিয়েছিল। এমনি ক'রে বৈজ্ঞানিক মহলে বহুদিন থেকেই একটা বিতর্কের ঝড় চলেছে কিন্তু পৃথিবীর চুম্বকক্ষেত্র সম্বন্ধে সঠিক কোন তথ্য আজও প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

* * *

কারণ যাইহোক, এটা ঠিক যে, পৃথিবীর চুম্বকক্ষেত্রের রূপটা প্রায়ই বদলে যায়। এই চুম্বকক্ষেত্রের পরিবর্তনের সঙ্গে একটা জিনিষ লক্ষ্য করা হয়েছে যে, সূর্য প্রলয়ের সময় যখন সূর্যকলঙ্ক দেখা দেয়, তখনই চুম্বকক্ষেত্রে সবচাইতে বেশী পরিবর্তন দেখা যায়। অর্থাৎ অনুমান করতে হয় যে, সূর্য বিচ্ছুরণের সঙ্গে হয়ত পৃথিবীর চুম্বকক্ষেত্রের যোগাযোগ আছে। বর্তমানে ধরে নেওয়া হয়েছে যে, সূর্যের জন্য নিয়মিতভাবে চুম্বকক্ষেত্রে একরকম ব্যতিক্রম ঘটে। আর দ্বিতীয় ব্যতিক্রম ঘটে চাঁদের জন্য। আরও একরকম খামখেয়ালী আলোড়ন ঘটে সূর্যের প্রভাবে। কিন্তু কেন যে এইরকম পরিবর্তন ঘটে, তা জানা নেই সঠিকভাবে; অবশ্যি অনুমান বহু আছে।

বৈদ্যুতিক চক্র

এমনি একটা অনুমান ছিল যে, পৃথিবীর এলাকার বাইরে প্রতিনিয়ত ঘুরছে বৈদ্যুতিক চক্র। আর এই বৈদ্যুতিক চক্রের প্রভাবটাই সব চাইতে বেশী অনুভব করে পৃথিবীর চুম্বকক্ষেত্র। এটা কিন্তু অনুমানের গণ্ডীতেই সীমাবদ্ধ ছিল। আ-ভূ-ব তথ্য এই অনুমানের গণ্ডী অনেকটা পার হয়ে এসেছে।

বৈজ্ঞানিক তথ্য এখন যা পাওয়া যায় তাতে দুটো জিনিষ সঠিক জানা যায়। একটা, পৃথিবীর বহু উর্দ্ধে, মহাশূন্যে বৈদ্যুতিক স্রোত বয়ে চ'লেছে। প্রতিনিয়তই এই বৈদ্যুতিক কারখানা থেকে বিদ্যুৎ তরঙ্গ পৃথিবীর চারদিকে সীমাহীন মহাশূন্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। আর দ্বিতীয় তথ্য শুধু পৃথিবীতেই নয়, মহাশূন্যেও আছে বিরাট চুম্বক ক্ষেত্র।

বৈজ্ঞানিক সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে, মহাশূন্যের একটা বিদ্যুৎতরঙ্গ প্রতিনিয়ত ঘুরছে পৃথিবীর চুম্বকক্ষেত্রের বিষুবরেখার চারদিকে। কিন্তু এর পরিক্রমার অক্ষপথ সীমাবদ্ধ। এবং সেই কারণে, বিদ্যুৎ শক্তি এইপথে তীব্রভাবে ঘনীভূত। শক্তির তীব্রতাও এই একই কারণে সূর্যরশ্মি প্রভাবিত।

চুম্বকক্ষেত্রের বিষুবরেখার সমান্তরাল পথে মহাশূন্যে যে বিদ্যুৎ স্রোত বইছে প্রতিনিয়ত, তা থেকেই আর একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে অসুবিধা হয়না। সে সিদ্ধান্ত মেনে নিলে, এটা স্বীকার করতে হয় যে, উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর চারদিকেও এমনি বিদ্যুৎ-স্রোত বইছে।

চন্দ্র পরিক্রমার স্বপ্ন

আ-ভূ-ব-র এই সিদ্ধান্ত থেকে দুটো ইঙ্গিত খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রথমতঃ, মানুষ চন্দ্র পরিক্রমার যে স্বপ্ন দেখছে তা বাস্তবে রূপায়িত করতে হলে এই সিদ্ধান্তের স্বরূপটা জানা প্রয়োজন। মহাশূন্যের এই বিদ্যুৎপ্রবাহ হয়ত একদিন মানুষকে প্রত্যক্ষভাবে চন্দ্র পরিক্রমায় সাহায্যও করতে পারে।

* * দ্বিতীয় ইঙ্গিত মানুষের ব্যবহারিক জীবন সম্বন্ধে। মহাশূন্যের বিদ্যুৎ প্রবাহের শক্তি যদি অপরিমিত হয়, তাহ'লে তা থেকে বৈদ্যুতিক শক্তি আহরণ করা ভবিষ্যতে কোন এককালে অসম্ভব নাও হ'তে পারে। বরং এইটাই খুব স্বাভাবিক।

কসমিক রশ্মি

দ্বিতীয় তথ্য পাওয়া গেছে মহাশূন্য থেকে প্রতিনিয়ত যে তেজস্ক্রিয় শক্তি-তরঙ্গ পৃথিবীকে আঘাত করছে, সেই শক্তি সম্বন্ধে। ইংরেজীতে এই রশ্মিকে বলা হয় "কসমিক রে"। এই রশ্মি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক তথ্য অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। তবে এটা দেখা গেছে যে, পৃথিবীর চুম্বকক্ষেত্রের সঙ্গে এর একটা মৌলিক যোগাযোগ আছে।

আ-ভূ-ব তথ্য থেকে দেখা যায়,—এই যোগাযোগের একটা সেতুবন্ধ আছে। তা যদি না থাকত' তাহলে অদৃশ্য তেজস্ক্রিয় রশ্মির প্রভাব পৃথিবীর চুম্বকক্ষেত্রের বিষুবরেখা অঞ্চলে সব চাইতে কম হ'ত না। পরীক্ষা ক'রে দেখা এই বিষুবরেখা থেকে অত্যন্ত সন্তর্পণে দূরে সরে থাকে। কিছুতেই কাছে ঘেঁষতে চায় না। অথচ এই রশ্মির বিদীর্ণশক্তি অত্যন্ত তীব্র। এত তীব্র যে এর গতিপথ অবরোধ করা প্রায় অসম্ভব।

তা যদি মেনে নেওয়া যায়, তাহলে অনুমান করতেই হয় যে, পৃথিবীর এলাকা ছাড়িয়ে মহাশূন্যে এমন কোন চুম্বকক্ষেত্র আছে, যার প্রভাব কিছুতেই এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। এই অদৃশ্য রশ্মি প্রধানতঃ ধনাত্মক উদযান পরমাণু (প্রোটোন) এবং ঋণাত্মক পরমাণু। (ইলেকট্রন) বহন করে। এই বৈদ্যুতিক শক্তি আছে ব'লেই মহাশূন্যে অবস্থিত কোন এক চুম্বকক্ষেত্র এই রশ্মিকে বিকর্ষণ করে। এই বিকর্ষণের ফলেই পৃথিবীর চুম্বকক্ষেত্রের বিষুবরেখার অঞ্চল থেকে দূরে স'রে যায়।

আ-ভূ-ব তথ্য থেকেই মহাশূন্যের এই নূতন রূপটা ধীরে ধীরে ধরা পড়ছে। অসম্ভব নয় যে, অদূর ভবিষ্যতে এই তথ্যই হয়ত মানুষের জ্ঞানের সীমারেখাকে বিপর্যস্ত ক'রে দেবে।

* * *

গোড়াতেই বলা উচিত ছিল। কিন্তু বলা হয়নি। বক্তব্যটা আবার। ব'লে রাখা ভাল, আমি বৈজ্ঞানিক নই। নিতান্তই অ-বৈজ্ঞানিক। আমার কাজ শুধু বৈজ্ঞানিক সংবাদ পরিবেশন করা। তাই দুটো সংবাদ সব শেষ তুলে দিচ্ছি।

* * *

নিখিলবঙ্গ ভাষা সম্মেলন

[নরেশ গুহ]

(গত সংখ্যার পর)

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: "ভারতবর্ষে আজকাল ভাবের আদান প্রদানের ভাষা হয়েছে ইংরেজি ভাষা। অন্য একটি ভাষাকেও (নিশ্চয়ই হিন্দির কথাই তিনি ভাবছিলেন) ভারতব্যাপী মিলনের বাহন করার প্রস্তাব হয়েছে। কিন্তু এতে ক'রে যথার্থ সময় হতে পারে না; হয়তো একাকার হ'তে পারে, কিন্তু একত্ব হ'তে পারেনা। কারণ এই একাকারত্ব কৃত্রিম ও অগভীর; এ শুধু বাইরের থেকে দড়ি দিয়ে বাঁধা মিলনের প্রয়াসমাত্র। যেখানে হৃদয়ের বিনিময় হয় সেখানে স্বাতন্ত্র্য বা বৈশিষ্ট্য থাকলেই তবে যথার্থ মিলন হতে পারে, কিন্তু যদি বাহ্য বন্ধনপাশের দ্বারা মানুষকে মিলিত করতে বাধ্য করা যায়, তবে পরিণামে হয় পরম শত্রুতা। কারণ সে মিলন শৃঙ্খলের মিলন অথবা শৃঙ্খলায় মিলন মাত্র। বাহ্য সাম্যকে যারা চায় তারা ভাষাবৈচিত্র্যের উপর স্টিম রোলার চালিয়ে দিয়ে আপন রাজরথের পথ সমভূম করতে চায়। কিন্তু পাঁচটি বিভিন্ন ফুলকে জুটে দলা পাকালেই তাকে শতদল বলা চলে না।

——'সাহিত্যের পথে': রবীন্দ্রনাথ

এক ভাষাকে কেন্দ্র ক'রে ভারতের জাতীয় ঐক্যবোধ জন্মায়নি। তার উৎস ভারতীয় ঐতিহ্যের, জীবনবোধের একতায়। কাজেই হিন্দি শেখার একমাত্র ফল হ'তে পারে কেন্দ্রে চাকরী লাভ। এবং যে অন্ধ দেশপ্রেমের জননী হচ্ছে গালভরা ভাবাবেগ তার আত্মপ্রসাদ লাভ।

অন্যপক্ষে ইংরেজি ভাষা শেখাটা যে সবাই শ্রেয় জ্ঞান করছেন—"তার কারণ এ নয় যে বর্তমান অবস্থায় আমাদের জীবনযাত্রায় তার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। আজকের দিনে য়ুরোপের জ্ঞান বিজ্ঞান সমস্ত মানব লোকের শ্রদ্ধা অধিকার করেছে; স্বাজাত্যের অভিমানে একথা অস্বীকার করলে অকল্যাণ। আর্থিক ও রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে আত্মরক্ষার, পক্ষে এই শিক্ষায় যেমন প্রয়োজন তেমনি মনকে ও ব্যবহারকে মূঢ়তামুক্ত করবার জন্য তার প্রভাব মূল্যবান। যে চিত্ত এই প্রভাবকে প্রতিরোধ করে, একে অস্বীকার করে নিতে অক্ষম হয়, সে আপন সংকীর্ণ সীমাবদ্ধ নিরালোকে জীবনযাত্রায় ক্ষণজীবী হ'য়ে থাকে।" এ উদ্ধৃতি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৩৪৩ সালে প্রদত্ত রবীন্দ্রনাথের ছাত্র সম্ভাষণ থেকে তোলা। পাশ্চাত্য সংস্কৃতিকে আমরা যে স্বীকার ক'রে নিয়েছি—"এই ইচ্ছাকৃত অঙ্গীকারের স্বাভাবিক কারণ এই সংস্কৃতির বন্ধনহীনতা, চিত্তলোকে এর সর্বগ্রাসিতা, নানাধারায় এর অবাধ প্রবাহ। এরমধ্যে নিত্য উদ্যমশীল বিকাশ ধর্ম নিয়ত উন্মুখ, কোনো দুর্গম কঠিন নিশ্চল সংস্কারের জালে এ পৃথিবীর কোণে কোণে স্থবির ভাবে বদ্ধ নয়......সকল প্রকার যুক্তিহীন অন্ধ বিশ্বাসের অবমাননা থেকে মানুষের মনকে মুক্ত করবার জন্য তার প্রয়াস। এই সংস্কৃতির সোনার কাঠি প্রথম যেই তাকে স্পর্শ করলো অমনি বাংলাদেশ সচেতন হয়ে উঠল। এনিয়ে বাঙালি যথার্থই গৌরব করতে পারে।" রবীন্দ্রনাথের— 'সাহিত্যের পথে'।

এইজন্যেই আমরা কেন্দ্রে ইংরেজি ভাষার ব্যবহার এখনকার মতোই আরও বহুকাল বজায় রাখতে চাই। হিন্দি শিখলে চাকরী ছাড়া আর কোনো সুকৃতির সম্ভাবনা নেই, ইংরেজি শিখলে আছে। মাতৃভাষার পরে অপর যে ভাষা শিখলে আমাদের জাতির কল্যাণ তা ইংরেজি। এবং ইংরেজিকেই কেন্দ্রের কেজো ভাষায় পরিণত করলে উপরন্তু আরো একটা ভাষা শেখার দায় থেকে আমরা অব্যাহতি পাবো। তাতে জাতীয় ঐক্যের কোনো বিঘ্ন হবেনা, যেমন আজও হচ্ছে না।

ইংরেজি শিক্ষার ফলে আমাদের মাতৃভাষাগুলির এবং মাতৃভাষায় লেখা সাহিত্যের সর্বনাশ হয়েছে বলা ইতিহাস-জ্ঞানের অভাব মাত্র। আমাদের মতো অর্বাচীনের তুলনায় অন্ততঃ সাহিত্য বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতামত অধিক গ্রাহ্য। পূর্বে উল্লিখিত 'ছাত্রসম্ভাষণে'রই অন্যত্র তিনি বলেছেন "বাংলা দেশের এই গৌরব করবার কারণ আছে যে, য়ুরোপীয় সংস্কৃতির কাছ থেকে সে আপন প্রাপ্য গ্রহণ করতে বিলম্ব করেনি; এই সংস্কৃতির বাধাহীন সম্পর্কে অতি অল্পকালের মধ্যে তার সাহিত্য প্রচুর শক্তি ও সম্পদ লাভ করেছে।" "কালান্তরে" বলেছেন "যখন প্রথম ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হলো তখন শুধু যে তার থেকে আমরা অভিনব রস আহরণ করেছিলাম তা নয়, আমরা পেয়েছিলাম মানুষের প্রতি মানুষের অন্যায় দূর করবার আগ্রহ।" তাছাড়া ইংরেজিজানা লেখকদের বিরুদ্ধে যারা দল পাকাতে উৎসাহী তাদের লক্ষ্য ক'রে "সাহিত্যের পথে" নামক গ্রন্থে লিখেছেন: "আমাদের কালের লেখকদের মোটা অপরাধটা এই যে আমরা ইংরেজি পড়িয়াছি। ইংরেজি শিক্ষা বাঙালির পক্ষে বাস্তব নহে; অতএব বাস্তবতার কারণও নহে; আর সেই জন্যই এখনকার সাহিত্য দেশের লোকসাধারণকে শিক্ষা ও আনন্দ দিতে পারে না। উত্তম কথা। কিন্তু দেশের যে সব লোক ইংরেজি শেখে নাই তাহাদের তুলনায় আমাদের সংখ্যা তো নগণ্য। কেহ আমাদের তো কলম কাড়িয়া লয় নাই। অথচ এদিকে ইংরেজি পোড়োয়া যে সাহিত্য সৃষ্টি করিল, রাগিয়া তাহাকে গালি দিলেও সে বাড়িয়া উঠিতেছে, নিন্দা করিলেও তাহাকে অস্বীকার করিবার জো নাই। ইহাই বাস্তবের প্রকৃত লক্ষণ।"

নিখিলবঙ্গ ভাষা সম্মেলনে 'প্রস্তাব নির্বাচন সমিতি'র (সাবজেক্টস-কমিটি) যে অধিবেশন হয় তাতে সাধারণ সদস্য ছাড়া বাংলাদেশের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিরা যোগ দিয়েছিলেন। দীর্ঘ চার ঘন্টাব্যাপী এই অধিবেশনে দেখা যায় যে উপস্থিত প্রত্যেকেই নির্বাচিত প্রস্তাবগুলির আদর্শ এবং যৌক্তিকতা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করতে অতিমাত্র আগ্রহশীল। কিছু কিছু বিকল্প প্রস্তাব বিষয়ে ভোট গ্রহণ করতে হয়েছিল। এবং নিম্নে যে প্রস্তাবগুলির সারাংশ দেওয়া হচ্ছে—সে প্রস্তাবগুলি ছাপা পুস্তিকার আকারে মাতৃভাষা সংরক্ষণ সংঘের কার্যালয়ে পাওয়া সম্ভব—তা শেষ পর্যন্ত প্রায় সমস্ত সদস্যের অনুমোদন লাভ করে। সংক্ষেপে প্রস্তাবগুলি এই

"(ক) প্রচলিত প্রত্যেকটি প্রধান ভারতীয় ভাষাই আমাদের জাতীয় ভাষা: এর মধ্যে কোনো একটিমাত্র ভাষার প্রতি পক্ষপাতের পরিবর্তে প্রত্যেকটি ভাষারই যুগপৎ সমৃদ্ধি কাম্য। কাজেই অন্য ভাষাগুলির প্রতি অবিচার করে ভারতের কোনো একটি ভাষাকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া অনুচিত অসঙ্গত। ইংরেজিও ভারতের অন্যতম জাতীয় ভাষা।

(খ) সরকারি ভাষা-কমিশনের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রস্তাবগুলি এই সম্মেলন প্রত্যাখ্যান করছেন, কেননা সে প্রস্তাবগুলি অবাস্তব, হিন্দি ব্যতীত অন্য ভারতীয় ভাষাগুলির বিকাশের পক্ষে মারাত্মক, পক্ষপাতদুষ্ট এবং ভারতের রাজনৈতিক ঐক্যের পরিপন্থী।

(৭ম পৃষ্ঠার ১ম কলমে দ্রষ্টব্য)

চোখের জল

চোখের জল। অশ্রু দিয়ে কাব্য রচনা করা হয়। কারণ, প্রেমের সঙ্গে নাকি এর গভীর যোগাযোগ। কিন্তু আবেগ ছাড়াও অশ্রু ঝরে। যেমন পেঁয়াজ কাটবার সময়। বৈজ্ঞানিকরা পরীক্ষা ক'রে দেখেছেন, আবেগের অশ্রু আর পেঁয়াজ কাটা চোখের জল এক নয়। রাসায়নিক প্রকৃতি সম্পূর্ণ আলাদা। অর্থাৎ রাসায়নিক প্রকৃতি বিশ্লেষণ করেই বোঝা যায় অশ্রুটা আবেগের না পেঁয়াজের।

মধুসংযোগ

মধুসংযোগ। মাতালের মাতলামি বরদাস্ত করে এমন লোক খুঁজে পাওয়া মুস্কিল। তবু, মানুষ মদ খায়, নেশা করে, মাতাল হয়। বৈজ্ঞানিকরা সম্প্রতি আবিষ্কার ক'রেছেন, মধু খেলে মাতলামি চলে যায়। এক চামচে মধু, আর কিছু না; মাতলামির চিহ্ন পর্যন্ত থাকবে না।

চাগলা কমিশনের রিপোর্টে ভারতীয় সংবাদপত্রের মতামত

ভারতের প্রায় সব দৈনিক সংবাদপত্র চাগলা কমিশনের রিপোর্টের উপরে সম্পাদকীয় মন্তব্য করেছে, কোনো কোনো পত্রিকা একাধিকবার। পত্রিকার প্রকৃতি অনুযায়ে মন্তব্য বিভিন্ন আকার নিয়েছে। তবে কতগুলো বিষয়ে প্রায় সব পত্রিকার মন্তব্য একই প্রকারের।

কয়েকটি বাদে সব পত্রিকাই মি: চাগলার প্রশংসা করেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে অর্ধস্ফুট হিসেবে শ্রীকৃষ্ণমাচারীর কর্তব্য পালনেরও উল্লেখ করেছে। অসেকে আরও তদন্তের পুনরাবৃত্তিহীনতার উপর জোর দিয়ে বলেছে এমন কলঙ্কজনক কীর্তি ভবিষ্যতে যাতে না ঘটে তার বন্দোবস্ত করা প্রয়োজন।

যে কয়টি পত্রিকা মি: চাগলার রায়ের যথার্থতায় সন্দেহ করেছে, তাদের মধ্যে শ্রী রামনাথ গোয়েঙ্কার ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস (মাদ্রাজ, দিল্লী ও বোম্বাই) এবং গৌয়াটির কংগ্রেস-সমর্থক আসাম ট্রিবিউন অন্যতম। এক্সপ্রেস মি: চাগলার তদন্ত পদ্ধতিকে কমিউনিষ্টপন্থতির সহিত তুলনা করেছে।

প্রায় সব পত্রিকাই তদন্ত কমিশন নিয়োগ এবং শ্রী কৃষ্ণমাচারীর পদত্যাগ ভারতের গণতন্ত্রপ্রীতির উদাহরণ বলে মনে করেছে। সঙ্গে সঙ্গেকরেকটি পত্রে শ্রী নেহেরু কর্তৃক কমিশনকে আক্রমণের উপরে বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ পেয়েছে। এদের মধ্যে কলকাতার অমৃতবাজার পত্রিকা প্রধান।

বড় ব্যবসারী মহলের সঙ্গে যুক্ত প্রায় সব পত্রিকাই চাগলা কমিশনের রিপোর্টে সরকারী ব্যবসায়ী সংস্থাগুলো পরিচালনের যে সমালোচনা করা হয়েছে তার সুযোগ নিয়ে ব্যবসা স্বাতীকরণ নীতিকেই কঠোর আক্রমণ করেছে। কোনো কোনো পত্রিকা বীরা কর্পোরেশনকে উপুলে দিয়েছে, পর লক্ষ টাকা বেশী, দিয়ে গেজেরগুলো কেবল বেচার যে প্রস্তাব শ্রীবুজা করেছে তা গ্রহণ করতে।

কিন্তু সম্পাদকীয় স্তম্ভে শ্রীবিড়লার কাগজ, দিল্লীর হিন্দুস্থান টাইমস অতি সতর্কতা চালেছে। যেদিন কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয় সেই দিনই পত্রিকাটির ইংরেজী সম্পাদকীয় পৃষ্ঠা ছেপেছে। একটির মোদ্দা কথা হল, "তদন্ত খুব কাজের হয়েছে। আমরা বিশ্বাসের, যে দুষ্টেরজনক মুল্য দিতে হয়েছে তা বৃথা হবে না।"

পত্রিকাটি সংবাদের সে সাধারণিক সমালোচনা করে তাতে কঠোর মন্তব্য আছে, এবং কি শ্রীনেহরুকে ইঙ্গিত করেও। লিখেছে: "কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যি: চাগলা যে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে তদন্ত করেছেন তার উপর। বিচারপতি চাগলার একজন জাত হয়েছে এই যে তিনি তাঁর দায়িত্বের উপরে গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। অতিরিক্ত তদন্ত দেখা দেবে তিনি সরকারের অনেক খরচা বাঁচাবে করেছেন এবং জনসাধারণের ভোগেরও প্রবিধি করেছেন। সাধারণ আইনপদ্ধতি অনুসারে চললে, তিনি-তাঁকে যে খুসীর সময় দেয়া হয়েছিল তত্ত্ব তাই নিতেন না, আরও সময় চাইতেন।"

কোনো মহলে ভুল ধারণাপ্রসূত বলা হয়েছে যে শ্রীকৃষ্ণমাচারীর নিকট লিখিত প্রধান মন্ত্রীর চিঠিতেও মি: চাগলার উপরে সেভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। সম্ভবত, প্রধান মন্ত্রী তদন্তরই এই ধারণা দূর করবার চেষ্টা করবেন। যুক্তিসঙ্গত এবং ন্যায্য দলিল বলে চাগলা রিপোর্ট প্রশংসিত হচ্ছে। বিচার বিভাগীয় তদন্ত হলে, অন্তত ছয়মাসকাল তা চলত এবং তদন্তের বারফতে শ্রীনেহেরু যে উদ্দেশ্য সাধন করতে চেয়েছেন, তাই ব্যর্থ হত।"

অমৃতবাজার পত্রিকা

এখন কলকাতার সাংবাদপত্র মহলে কি প্রতিক্রিয়া হয়েছে দেখা যাক। অমৃত বাজার পত্রিকা লিখেছে: এই প্রথমবার তদন্তের ফলে কংগ্রেস সরকার তাঁর মান বাচিয়েছেন এবং সততার সহিত ও গভীর দিল পদ্ধতিতে সরকারী কাজ পরিচালনার উপরে বিশ্বের বিশ্বাস সৃষ্টি করেছেন।

দ্বিতীয় একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে, প্রত্যুত্তরাত্তার শ্রীনেহেরুর কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণমাচারীকে লিখিত চিঠির বিরুদ্ধে পার্লামেন্টের লবী মহলের প্রতিক্রিয়ার উল্লেখ করে বলেছে: "শ্রী নেহেরুর বিবেচনা-সমক্ষ সমালোচনার জন্য লবী মহলে অস্বস্তিকর প্রতিক্রিয়া হয়েছে। জনসাধারণের মধ্যে প্রতিক্রিয়াও অনুরূপ। অবশ্যই কমিশনের রায়ের সঙ্গে তাঁর মতপার্থক্য থাকতে পারে। কিন্তু রায় বেরুবার পরে নিয়েতাঁর মতপার্থক্য যেভাবে প্রকাশ করেছেন তার অনেক এবং বহু দূর প্রসারী প্রতিক্রিয়া হতে পারে। কমিশনকে সাহায্য করারসুবিধা সত্ত্বেও, যদি তা না করা হয়ে থাকে তার জন্য তদন্তের পদ্ধতি ও পদ্ধতিকে দায়ী করা অনুচিত। প্রধানমন্ত্রীর জনস্বার্থে প্রকাশ করা উচিত কেন তিনি তাঁর সন্দেহ পোষণ করছেন। তাঁর সমালোচনা অনেকের নিকট দুঃখজনক বলে মনে হবে।"

যুগান্তর

"বিচারপতি চাগলা যেরূপ দক্ষতার সহিত তদন্ত পরিচালনা করিয়াছেন এবং যেরূপ বিশ্বাসীন ভাষায় তাঁহার জ্ঞান-বিস্ফারসুলভ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার পূর্ব খ্যাতি আরও বৃদ্ধি পাইবে এবং দেশবাসী তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ করিবে। ইহার কৃতজ্ঞতা (তদন্তের) মন্ত্র দিয়া সর্বাগ্রে সরকারী অফিসে ক্রটিচ্যুতি এবং সেয়ার বাজারের যে কার্য কারসাজি প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা নির্মূল করার জন্য সরকার যদি দৃঢ়তার সহিত চেষ্টা করেন, তবে ইহার সুফলিষ্ঠিত শিক্ষা ব্যর্থ না হইতেও পারে।"

স্বাধীনতা

"যে ব্যক্তি কেন্দ্রীয় সরকারের একটি অত্যন্ত দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া জাতি, জনসাধারণ, দেশ ও দেশের উন্নয়নের যাবতীয় তত্ত্ব করিয়া কতিপয় অসাধু বৃহৎ ধনীর ব্যবসায়ীকে বহু করিয়া দেখেন, তদন্ত পোষণ ও দেশী বিদেশী বৃহৎ বণিক গোষ্ঠীর নির্লজ্জ তোষণের বাহার কান্ড, সেইরূপ ব্যক্তির পুনর্বার কার্য আসে কি করিয়া। দেশ ও জাতির স্বার্থের প্রতি বিন্দু মাত্র যাঁহারা পক্ষত্ব করেন বা করিতে পারেন, এরোচেষ্টাপ্রতিবের ব্যক্তিগত স্বার্থ রক্ষার জন্য ওকতর অপরাধ যিনি বা যাঁহারা করিতে পারেন, এরূপ ব্যক্তিদের যেগোনুরূপ শাস্তিকল্পনার মর্মস্থলে বসাইলে চলিবে না।"

ষ্টেটসম্যান

"প্রধান মন্ত্রীর দুঃখ বলে হয় অংশত এই জন্য যে তদন্ত যে রূপ নিয়েছিল তা যদি না হত, কম হত অন্যরূপ দাঁড়াত। (মি: চাগলা সবদে বলা উচিত যে তিনি তাঁর তদন্তের বিষয়ে অতিক্রে হিসেব এবং তীক্ষ্ণ তদন্ত মেজাবে পরিচালিত করেছেন। তাতে জনসাধারণ যে সবর্থন আশিহেছে তাতে সন্দেহ নেই।) কিন্তু প্রধানমন্ত্রী জানেন যে শ্রীকৃষ্ণমাচারীর পুনঃ স্থান পূরণ করা সহজ নয়।"

দ্বিতীয় একটি প্রবন্ধে পত্রিকাটি লিখেছে: "ইক এক্সচেঞ্জ-গুলোকে দীর্ঘ মন্দার অবস্থা থেকে উদ্ধার করা জীবনবীমা কর্পোরেশনের দায়িত্ব নয়। সরকার যদি বাজার চালু করতে চান তবে তাঁর উচিত যে কারণে মন্দা দেখা দিয়েছে তা দূর করা অথবা তার প্রকোপ কমানো।

অর্থ বিশেষ কোন দলী ব্যক্তি বা গোষ্ঠির সাহায্যে বিনিয়োগ করা সম্পূর্ণ অন্যায্য।"

হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড

"তদন্ত কমিশনের চেয়ারম্যান হিসাবে প্রধান বিচারপতি চাগলার নাম প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণ উৎসাহিত হয়ে ওঠে। তাঁরা প্রথমই বুঝে নিয়েছে যে তদন্ত সম্পূর্ণ, নিরপেক্ষ এবং নির্ভীক হবে। প্রধান বিচারপতি চাগলার উপর সাধারণের সকল আশা পূরণ করেছেন। তাঁর থেকে কেনী করেছেন। ব্যক্তি-বিশেষের বক্তব্য না পর তাঁকে বিচারিত করে নি। সরকার পুরো সত্য তদন্তে প্রকাশ পায় নি। কিন্তু তার জন্য কমিশনের ত্রুটি নেই। যে তথ্য প্রকাশ পেয়েছে তা অত্যন্ত গুরুতর এবং পূরণ করেছে যে কার্যপদ্ধতি আর এমন ঘটনা না ঘটে তার তা ব্যাপক অবশ্যন করা উচিত।"

টাইমস অব ইণ্ডিয়া

(বোম্বাই ও দিল্লী)—"বোধহয় অবশ্যম্ভাবী কারণে কমিশনের মানেনে যে তথ্যাবলী উপস্থাপিত হয়েছে তাতে এই কলঙ্ক-জনক বিষয়ে সম্পূর্ণ সত্য প্রকাশ পায়নি। কিন্তু যে তথ্য পাওয়া গেছে তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই যে মুন্দ্রার শেয়ার ক্রয়ের ব্যাপারে শ্রীকৃষ্ণমাচারীর গাফিলতি কম নয়। তথাপি পুনানবরীর নিকট লিখিত চিঠিতে শ্রীকৃষ্ণমাচারী বলেছেন যে তিনি মার রীতি অনুসারে এ বিষয়ে অভিত হবে পড়েছেন। রীতি হচ্ছে এই যে কোন অভিযান ভুল করলে তার গাফিড় শ্রীকে গ্রহণ করতে হয়।

'শ্রীকৃষ্ণমাচারীর বক্তব্য আরও এক কারণে উল্লেখযোগ্য। যে কাজ করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ সাধারণ কার্যপদ্ধতি ও রীতি বিরুদ্ধ কিন্তু ব্যাপারটির জন্য শ্রীকৃষ্ণমাচারী কোনো দুঃখ প্রকাশ করেন নি। শ্রীকৃষ্ণমাচারীর দক্ষতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। তাঁর দক্ষতার পুরস্ক উপাদান করা প্রাসঙ্গিক হতে পারে কেবলমাত্র এই কারণে যে তা সমগ্র বিষয়টিকে অধিক পোচনীয় করে তুলেছে।"

হিন্দু (মাদ্রাজ)

—তথ্য যা পাওয়া গেছে তাতে দেখা যায় যে এত ভত (চাকা দলীর) কার্য সম্পর্ক করার পদ্ধতি অত্যন্ত সন্দেহজনক কাজ হয়েছে। এর উপযুক্ততা সম্বন্ধেও সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এর জন্য কে দায়ী সে সম্বন্ধে পুরো এবং সংযোগ উত্তর পাওয়া যায় নি। এর জন্য আরও ব্যাপক তদন্তের জন্য অপেক্ষা হবে।

সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা যা হল তার পর একচেটিয়া জীবনবীমা কর্পোরেশনকে তেকে দিয়ে একতন্ত্র না আর কোন কোম্পানী-কেও কোম্পানীর সচিত্ত প্রাইভেট কোম্পানীও থুক থাকবে—স্থাপন না করবার কোনো কারণ নেই। জীবনবীমার একচেটিয়া ব্যবসায় তেকে দিলে জীবনবীমার কাজ নতুন জীবন ও উৎসাহ লাভ করবে। ভারীয় সবর্ণের পর যে দু বছর অতীত হয়েছে তাতে আমলাতান্ত্রিক পরিচালনা ও অভিসাবের দায়িত্বহীনতার দোষত্রুটি-গুলো প্রকাশ পেয়েছে।"

বোম্বে ক্রনিকল

—আরও অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে বলেছে "যদি তা না করা হয় এবং যদি দোষীদের শাস্তি দেয়া না হয়, জনসাধারণের মনে সন্দেহ থেকেই যাবে। বর্তমান সরকারের প্রশংসা করা উচিত যে সে চাগলা কমিশন গঠন করেছে এর তার সুপারিশ মেনে নিচ্ছে। এমন কথা মনে করা ভুল যে এমন কোন আছে যে অন্যায় করে কোন অভিযান ভুল করলে তার শাস্তি দেয়া না হয়, জনসাধারণের মনে সন্দেহ থেকেই যাবে। বর্তমান সরকারের প্রশংসা করা উচিত যে সে চাগলা কমিশন গঠন করেছে এর তার সুপারিশ মেনে নিচ্ছে। এমন কথা মনে করা ভুল যে এমন কোন আছে যে অন্যায় করে কোন অভিযান ভুল করলে তার শাস্তি শ্রীকে গ্রহণ করতে হয়।

'শ্রীকৃষ্ণমাচারীর বক্তব্য আরও এক কারণে উল্লেখযোগ্য। যে কাজ করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ সাধারণ কার্যপদ্ধতি ও রীতি বিরুদ্ধ কিন্তু ব্যাপারটির জন্য শ্রীকৃষ্ণমাচারী কোনো দুঃখ প্রকাশ করেন নি। শ্রীকৃষ্ণমাচারীর দক্ষতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। তাঁর দক্ষতার পুরস্ক উপাদান করা প্রাসঙ্গিক হতে পারে কেবলমাত্র এই কারণে যে তা সমগ্র বিষয়টিকে অধিক পোচনীয় করে তুলেছে।"

সার্চলাইট (পাটনা)

—"প্রশ্ন করা যেতে পারে, কন্যাধনুকের রাষ্ট্রে যে সব নিপদস্থতা অস্বস্তিকর পড়েছে কিন্তু যাদের প্রশংসনীয় কাজের রেকর্ড আছে তাদেরকে অর্থ সাহায্য দেয়া কি দোষের বলে পরিগণিত হবে? গ্রীও, ডি, গুপ্ত শ্রীবুজার চরিত্র ও আর্থিক সততি সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর বক্তব্যের গুরুত্ব একেবারে হ্রাস পায় যখন শ্রীমুন্দ্রা বেশী ধারে এবং বীমা কর্পোরেশনকে অনেক লাভ দিয়ে তার শেয়ারগুলো ক্রয় করবার প্রস্তাব করেন।"

এক্সপ্রেস

বিশেষ কারণ উপর জোরারোপ করতে করা যায় না, কিন্তু জনসাধারণের অনেকের মনে হয়েছে যে মর্যা বিষয়া সরকারী অফিসারদের প্রাইভেট ব্যবসায় দেয়া হয় নি যাতে তাঁরা তাঁদের ব্যাপারে কি দায়িত্ব ঠিক তা ব্যাখ্যা করতে পারেন। বস্তুত কেউ জানত না তদন্ত কি ভাবে চলবে।

"বলতেই হয় যে সবর সময় মনে হচ্ছিল কমিউনিষ্টরা যে ভাবে তদন্ত চালার প্রায় তাই চলে দাঁড়িয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ছিল, যাদেরকে দরি হিসাবে দাঁড় করান হয়েছে তাদের রক্ষের জন্য জনসাধারণের অত্যুৎসাহ। 'সত্য কি', জিজ্ঞেস করেছিলেন পাইলেট, কিন্তু উত্তরের জন্য অপেক্ষা করার তাঁর সময় হয় নি। চাগলা কমিশন আরও এক ধাপ এগিয়েছেন। নিশ্চিই প্রশ্ন করেছেন এবং উত্তরও দিয়েছেন নিজে।"

আসাম ট্রিবিউন

"জীবনবীমা কর্পোরেশনের অর্থ বিনিয়োগের মত ঘটনা সরকারের উপর জনসাধারণের আস্থার আঘাত করে। মুন্দ্রার শেয়ার ক্রয় যে সব প্রশ্ন তুলেছে তার গুরুত্ব খুব বেশী—কতটা অবিচ্ছি দলের ভবিষ্যৎ এবং বিপুল জাতীয়করণ নীতি সম্বন্ধে। চাগলা রিপোর্টের শেষ কথা হচ্ছে যেখানে সরকারী সংস্থার পরিচালনের জন্য নীতি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অপরিবের সম্পূর্ণ অংশ তদন্তের পদ্ধতির দোষে দুষ্ট।"

সুস্থবুদ্ধি জনসাধারণের উদ্দেশে...

উভয় সংকটের মধ্যে রেলকর্মী

(স্টাফ রিপোর্টার)

পনের মাসে দুইবার ধর্মঘাটের ধমকানি দুইবার ফলে বর্ধমান লোকাল (এস ১০৮ ডাউন) শ্রেণীটি দুইশতাধিক সকালে নির্ধারিত সময়ের দুই ঘণ্টারও পরে দিয়ালদহ স্টেশনে পৌঁছায়। যাত্রীদের 'নিয়মিত' অনুযায়ী শ্রেণীটি চালাইবার ব্যাপারে পক্ষপাতদের সৃষ্টি হয় এবং তাহার ফলেই একদল বিলম্ব হয় বলিয়া প্রকাশ।

ঐ ঘটনার ফলে বিছাই ফেল, পাঞ্চার মেল, বোম্বাই মেল এবং আপার ইণ্ডিয়া এক্সপ্রেস প্রভৃতি ট্রেণও অনেক দেরীতে পৌঁছায়।

হাওড়া ইয়ার্ডের পয়েন্ট বিকল হওয়ায় ট্রেণ চলাচলে বিলম্ব

অবৈধ জনতার হস্তে কতিপয় রেলকর্মীর লাঞ্ছনা

(স্টাফ রিপোর্টার)

দুইশতাধিক হাওড়া ষ্টেশনটি পরেও দুই দুইবার বিকল হওয়ায় দুই ঘন্টার ট্রেণ চলাচলে বিলম্ব হয় এবং হাজার হাজার যাত্রীকে কয়েক ঘন্টা-কাল আটকে থাকিতে হয়। ফলে এক শ্রেণীর অবৈধ জনতার হাতে কয়েকজন রেল কর্মচারীকে লাঞ্ছিত হইতে হয়। এই ঘটনার জেরেই ডেপুটি স্টেশন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, জনৈক ইনস্পেক্টর এ এস এস, তাহার সহকারী এবং অপর একজন কর্মচারী একদল জনতার প্রহারে আহত হন। হাওড়া স্টেশনের ঘোষণা করিয়াও কামড়াচ্ছি কলকাতার কাছ ইয়ার্ডারেলা ছুটিয়া চলিলেও কেলা হয় এই ঘটনার সম্পর্ক এক্টিভিস্ট বিকল হওয়ায় পয়েন্টগুলি হয়

হাওড়া ষ্টেশনে বিক্ষুব্ধ যাত্রিগণ কর্তৃক ওয়্যাসিষ্টেণ্ট ষ্টেশন মাষ্টার প্রহৃত

যান্ত্রিক গোলযোগে ট্রেণ-চলাচল বন্ধ হওয়ার জের

(স্টাফ রিপোর্টার)

হাওড়া স্টেশনে একটি মালবাহী লোকোমোটর ফলে দুইশতাধিক জনরাহে: ট্রেণ চলাচল প্রায় সম্পূর্ণরূপে বিপর্যস্ত হইয়া যাওয়ায় লোকাল ট্রেণের যাত্রীরা বিক্ষুব্ধ হইয়া একজন অ্যাসিস্টেণ্ট স্টেশন মাষ্টারকে প্রহার করে এবং ইণ্ডিয়ানকের ডাকিয়া করকেরি কাঁচের জানালা ভাঙিয়া দেয়।

চন্দ্র-সূরণ ও সার্ধনগরের মিছিল উপলক্ষে এইদিন যে সকল অফিস ছুটি ঘোষণা করা হইয়াছিল তাহার ফলে দুপুরে বেলার দুইটা আড়াইটা হইতেই ফিরিবার ট্রেণ বহিবার জন্য হাওড়া স্টেশনে জমিতে থাকে।

পূর্ব রেলওয়ে • দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের উপর ন্যস্ত দুরূহ দায়িত্বকে দুরূহতর করে তুলবেন না

নামজাদা ব্যবসায়ী ও সরকারী মহলের দুর্নীতি সম্পর্কে নীরবতা

মুদ্রার কাহিনী উদ্ঘাটনের ফলে অনেক তথ্য ফাঁস ও দুরপ্রসারী পরিণতি

(দর্পণের রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক)

আমাদের কল্যাণমূলক রাষ্ট্রে কতগুলো দুর্বোধ্য রীতি প্রচলিত আছে। উপরতলার ব্যবসায়ী ও সরকারী মহলে দুর্নীতির প্রাবল্য সত্ত্বেও নীরব থাকা তার অন্যতম। দোষীদের দণ্ডবিধান তো দূরের কথা, মুদ্রার ব্যাপারে বিশেষ বিশেষ ব্যবসায়ী মণ্ডলী ও উচ্চপদস্থ অফিসারদের মধ্যে সহযোগিতা কতদূর সক্রিয় হতে পারে তার প্রমাণ মিলেছে।

আরেক বিস্ময়কর কীর্তি দেখার ব্যাপারে সরকার যোগসীমাংসা অবলম্বন করে চলেন। জীবনবীমা কর্পোরেশনের ব্যাপারেও সরকারের উদ্যোগ অনাবশ্যক ছিল বলে মনে করার কোনও কারণ নেই।

কেলেঙ্কারী ঘটে অর্থদপ্তরের প্রধান সেক্রেটারী শ্রী এইচ এম প্যাটেলের আমলে।

প্যাটেল সাহেব জাঁদরেল অাই, সি, এস। তিনি যখন যেসরকম দপ্তরের সেক্রেটারী ছিলেন তখন তাঁর জাঁদরেল হিসেবে এক কেলেঙ্কারী ঘটে। পরে তিনি বাণিজ্য সচিবের দায়িত্ব নেন; সেখানে হয় চিরির কেলেঙ্কারী। প্রকাশ্য তদন্ত-এও কেলেঙ্কারিরই হদিস। সরকার দুটি কেলেঙ্কারীকেই ধামাচাপা দিয়েছেন।

ঘটনাচক্রে মুদ্রার দেনার ক্ষেত্রে কেলেঙ্কারী নাটকীয়ভাবে লোকচক্ষুর কাঁস হয়ে যায়। কেন্দ্রে-অবাধতা শ্রীকৃষ্ণমাচারীকে দায়ী করে তাঁর সরাসরি বক্তৃতাদিনে তিনি প্রচুর। তদন্তের আগেই দেয়া ছাড়া সরকারের গত্যন্তর ছিল না। শ্রীনেহরুকে যখন আশা করেছিলেন তদন্ত হবে খোলাখোলি প্রকাশ্যভাবে। রিপোর্টে অংশবিশেষ প্রকাশ করলেই চলবে। তাতে লাঞ্ছণা বরবে, মাত্রাও জানবে না।

শ্রীকৃষ্ণমাচারী প্রকাশ্য তদন্ত করে সব ব্যাপারটা ফাঁস করেছেন। দিনের পর দিন শতাধিক আগ্রহী দেশের লোক কমিশনে প্রত্যক্ষ তথ্য অনুধাবন করেছে। তাদের মত তা থেকেই তৈরী হয়েছে। সে মত শ্রীচাগলার মতের সঙ্গে মেলে।

শ্রীনেহরুর আক্রোশ

কমিশনের উপরে শ্রীনেহরুর চটেছেন। চটবার কারণ আছে বৈকি। আগে থেকেই যে তিনি শ্রীকৃষ্ণমাচারীকে নির্দোষ সাব্যস্ত করে রেখেছেন। তবু যে দায় আগেই শ্রীনেহরু শ্রীকৃষ্ণমাচারীর সঙ্গেই তাঁর রায় বরাবর প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন। কি উদ্দেশ্যে তিনি তা করছেন? অনেকে মনে করেন, শ্রীনেহরুকে কমিশনে সাক্ষ্য না দিয়ে বাইরে থেকে তাকে প্রভাবিত করবার চেষ্টা করেছেন। অভিযোগ গুরুতর, কিন্তু শ্রীনেহরুকে নিজেই এ অভিযোগের ভিত্তি রচনা করেছেন।

রিপোর্ট বখন শ্রীকৃষ্ণমাচারীকে দায়ী করা হল, শ্রীনেহরুর এক দফায় চেষ্টা হল কমিশনকেই জনসাধারণের চোখে বেহো করে তোলা আর লোকের মনের প্রতিক্রিয়াকে লঘু করা। কিন্তু ফল হয়েছে ঠিক উল্টো। শ্রীনেহরুকেই আজ তাঁর নিজের বক্তব্যের জন্য জবাবদিহি করতে হচ্ছে।

অবস্থা বুঝে শ্রীকৃষ্ণমাচারী পদত্যাগ পত্র পেশ করেন এই ফেব্রুয়ারী। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে কমিশনের রিপোর্ট পৌঁছায় ১৩ই। তার দুদিন পরে শ্রীনেহরুকে পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করেন এবং শ্রীকৃষ্ণমাচারীর কাছে লেখা তাঁর এক লম্বা চিঠি প্রকাশ করে দেন। একই সময়ে রিপোর্ট পার্লামেন্টের সভাদের দেয়া হয়।

চিঠিতে শ্রীনেহরু শ্রীকৃষ্ণমাচারীকে শুধু যে নির্দোষ বলেছেন তা নয়। সঙ্গে সঙ্গে তিনি শ্রীচাগলা ও এন্সী-জেনারেল শ্রীনীতকাশের উপর খড়্গ-হস্ত হয়ে উঠেছিলেন। কমিশনকে কঠোর ভাষায় আক্রমণ করা হয়েছিল। প্রাইভেটে নিজেই চিঠিটি প্রকাশ করেছিলেন।

বিচারপতি হিসাবে শ্রীচাগলার স্থান অতি উচ্চে। শ্রীনেহরু যদি তাঁর ক্রটি স্বীকার না করেন তবে ভবিষ্যতে বিচার বিভাগের পক্ষে একরূপ তদন্তের দায়িত্ব নেয়া কঠিন হবে।

দেশের সর্বত্র গ্লানী উঠেছে কেলেঙ্কারীটি সম্বন্ধে আরও তদন্তের এবং দোষীদের শাস্তি বিধানের জন্য। শ্রীকৃষ্ণমাচারী পদত্যাগ করেছেন। কিন্তু এত সত্ত্বেও আই,সি,এস এবং প্রধান বড় বড় কেন্দ্রেতারীর সাথে জড়িত শ্রীপ্যাটেল ১০০০৲ টাকা বাস মাইনে নিয়ে ছুটি ভোগ করছেন।

শ্রীফিরোজ গান্ধী দিল্লী থেকে শ্রীমুন্দ্রার কাছে পাঠার এক টেলি-গ্রামের নকল হস্তগত করেছেন। প্রকাশ বোম্বাইতে সেয়ার ক্রয়ের আলোচনায় বহু পুং ই এই টেলি-গ্রামে জানায় হয়েছিল, "সব ঠিক হয়ে গেছে"।

পুলিশ তদন্ত সুরু হয়েছে। শ্রীমুন্দ্রাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। দিল্লীর এক হোটেল থেকে। তাঁর জানিনের বরখাস্ত নামঞ্জুর হয়েছে। করেকদিন আগে শ্রীমুন্দ্রার দিল্লীস্থ প্রতিনিধি শ্রীএন, এস, নোধানীর বরে চার ঘণ্টা তল্লাশী হয়েছে। কিন্তু দলিলপত্র হস্তগত হয়নি।

লোকসভার আচার্য কৃপালনী আরও দুদুর পুলারী প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি দাবী করেছেন গত কয়েক বছরে এগেণে কি উপায়ে ছয় কড় পরিমাণ সাদাছা গড়ে উঠেছে তা অনুসন্ধান করতে হবে। গত কয়েক বছরের মধ্যে শ্রী ডি, ডি, কৃষ্ণমাচারীর নামের সহিত যুক্ত একটি কারবার কেঁপে প্রায় একটি নতুন আখির সাম্রাজ্যে পরিণত হয়েছে। আচার্য কৃপালনী এটি সম্বন্ধেও তদন্ত চান বিশ্বস্তই।

গণতন্ত্রের বিপদ

এতে সত্ত্বেও শ্রীনেহরু কমিশনকে খেলো করবার চেষ্টা করে গণতন্ত্রের পক্ষে এক বাস্তবিক বিপদ সৃষ্টি করেছেন। শ্রীনির্মল চট্টোপাধ্যায় ঠিকই বলেছেন, বিচারপতি হিসাবে শ্রীচাগলার স্থান অতি উচ্চে। শ্রীনেহরু যদি তাঁর ক্রটি স্বীকার না করেন তবে ভবিষ্যতে বিচার বিভাগের পক্ষে এরকম তদন্তের দায়িত্ব নেয়া কঠিন হবে।

দেশের সর্বত্র গ্লানী উঠেছে কেলেঙ্কারীটি সম্বন্ধে আরও তদন্তের এবং দোষীদের শাস্তি বিধানের জন্য। শ্রীকৃষ্ণমাচারী পদত্যাগ করেছেন। কিন্তু এত সত্ত্বেও আই,সি,এস এবং প্রধান বড় বড় কেন্দ্রেতারীর সাথে জড়িত শ্রীপ্যাটেল ১০০০৲ টাকা বাস মাইনে নিয়ে ছুটি ভোগ করছেন।

শ্রীফিরোজ গান্ধী দিল্লী থেকে শ্রীমুন্দ্রার কাছে পাঠার এক টেলি-গ্রামের নকল হস্তগত করেছেন। প্রকাশ বোম্বাইতে সেয়ার ক্রয়ের আলোচনায় বহু পুং ই এই টেলি-গ্রামে জানায় হয়েছিল, "সব ঠিক হয়ে গেছে"।

পুলিশ তদন্ত সুরু হয়েছে। শ্রীমুন্দ্রাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। দিল্লীর এক হোটেল থেকে। তাঁর জানিনের বরখাস্ত নামঞ্জুর হয়েছে। করেকদিন আগে শ্রীমুন্দ্রার দিল্লীস্থ প্রতিনিধি শ্রীএন, এস, নোধানীর বরে চার ঘণ্টা তল্লাশী হয়েছে। কিন্তু দলিলপত্র হস্তগত হয়নি।

লোকসভার আচার্য কৃপালনী আরও সুদুর পুলারী প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি দাবী করেছেন গত কয়েক বছরে এগেণে কি উপায়ে ছয় কড় পরিমাণ সাদাছা গড়ে উঠেছে তা অনুসন্ধান করতে হবে। গত কয়েক বছরের মধ্যে শ্রী ডি, ডি, কৃষ্ণমাচারীর নামের সহিত যুক্ত একটি কারবার কেঁপে প্রায় একটি নতুন আখির সাম্রাজ্যে পরিণত হয়েছে। আচার্য কৃপালনী এটি সম্বন্ধেও তদন্ত চান বিশ্বস্তই।

আঞ্চলিক বিরোধ সৃষ্টি

এক দিক থেকে ব্যাপারটি আশ্চর্য জনক রূপ নিয়েছে। দাক্ষিণাত্যে, অর্থাৎ প্রধানত মাদ্রাজে রব উঠেছে তদন্তের সুযোগে উত্তরাঞ্চলের লোকেরা অন্যুদ্দেশ্যের তাৎপর্য (তাৎ) কঠিন রত।

অনুমান করা যায় বাঙ্গলার কবিটি প্রস্তাবের বিরুদ্ধে এবং সংশোধন পরিত্যক্ত হয়েছে। তবে বিষয়টির সমাধান হয়নি। তাঁরা বলেন, তাঁরা এ বিষয়ে কি সিদ্ধান্ত করবেন, সে কোন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কিনা, অনুজানিত থাকে।

কিন্তু এ সমরেই সমাজতান্ত্রিক ১২টি দেশের নেতারা এক বৈঠকে মিলিত হন। তাঁরা বিশেষ ইতো করবার সময় জানান দেশের মহাদেশ উপস্থিত নেতৃবৃন্দের সহিত পরামর্শ করেন। তাঁরা ঘোষণা করেন যে কতগুলো সর্ত পালিত হলে কোনো দেশে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সহব।

মস্কোতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ

বিবৃতিতে বলা হয় যে বিশেষ অবস্থায় "কতগুলো পুজিবাদী দেশে প্রতিক্রান্তী তার অনুবাহিনীর নেতৃত্বে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণকে বাধ্য করবার ও গৃহযুদ্ধ বাধিয়েকেই বাধ্য করতা দখলের এবং তা দ্বারা উৎপাদনের সৌমিক উপকরণ সমূহ জনসাধারণের নিকট হস্তান্তর নিশ্চিত করবার সুযোগ নাও করেছে।"

আরও বলা হয় যে পার্লামেণ্টে দৃঢ় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করা, পার্লামেণ্টকে বুর্জোয়াদের শ্রেণীস্বার্থবেসী সংগঠন হতে জনসাধারণের স্বার্থদেবী সংগঠনে রূপান্তর, এবং প্রতিক্রিয়াশীলশক্তিসমূহের প্রতিরোধ বিলুপ্ত করে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পার্লিমেণ্ট ক্ষমাবলের প্রয়োজনীয় অবস্থা সৃষ্টিও সম্ভব।

শ্রী অজয় ঘোষ তখন মস্কোতে ছিলেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কমিউনিষ্ট নেতৃবৃন্দের নিকট কোনাদায় কমিউনিষ্ট পার্টি কর্তৃক গণতান্ত্রিক উপায়ে শাসন ক্ষমতা দখল কমিউনিষ্টদের অপোদনে একটি নতুন নজীর হ'য়ে রয়েছে নিশ্চয়। অন্যত্র ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির অধিকাংশ সদস্যের মনে কোনোরূপ উপায়ের যে গভীর বেখাপাত করেছে, কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক গৃহীত সংশোধনী প্রস্তাব হতে তাহা আন্দাজ করা যায়।

পুনিবীর আর কোনো দেশের কমিউনিষ্টরা না করতে সাহস পান নি, ভারতের কমিউনিষ্টদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ তা করছেন। বলে রহ, সংশোধনটি অবতলাবে গৃহীত হয়ে। কমিউনিষ্ট কার্যকলাপে কি করে তাদের নীতি প্রয়োগ করেন তা ভবিষ্যতই বলতে পারবে।

এ নিয়ে কমিউনিষ্টদের সঙ্গে প্রধা সোসাালিষ্ট ছাড়া অন্যান্য বামপন্থীদের মতভেদ হবত অন্যত্র সততাও হয়ে। —অন্তত: সামগ্রিকভাবে। আজ পশ্চিম বাঙ্গলার রাজনীতির হাওয়া গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের সম্মুখীন।

কম্যুনিষ্ট পার্টির নীতিতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন

পরিবর্ত্তিত গঠনতন্ত্র সম্পর্কে দলের অভ্যন্তরে মতবিরোধ ?

[দর্পণের ভাষ্যকার]

সম্প্রতি দিল্লীতে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয়েছে। প্রধান আলোচ্য বিষয়ছিল, পার্টির গঠনতন্ত্রে পরিবর্তন। সাধারণ সম্পাদক শ্রীঅজয় ঘোষ বৈঠকের শেষে সাংবাদিকদের বলেছেন, পার্টি সংবিধানের কতগুলো সংশোধনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, উদ্দেশ্য হিসাবে "শান্তিপূর্ণউপায়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা"—এই কথা কয়টি গঠনতন্ত্রের মুখবন্ধে উল্লেখ করা। এই কথাগুলো এতদিন ছিল না এবং পৃথিবীর কোনো কমিউনিষ্ট পার্টির গঠনতন্ত্রে এর উল্লেখ নেই।

কয়েকবছর পূর্বে কেন্দ্রীয় কমিটি কতৃকগুলো সংশোধনী প্রস্তাব নিয়ে প্রকাশ্য কমিটির নিকট পেশ করে তাদের অভিমতের জন্য পার্টির সর্বস্তরে আলোচনার পর কয়েকটি সংশোধন সবেত সংশোধনী প্রস্তাবগুলো কেন্দ্রীয় কমিটির নিকট ফেরত পাঠান হয়। পুনরালোচনার পর কেন্দ্রীয় কমিটি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা এবন পার্টির অনুসরণ কর্যোপযোগী করা হয়েছে। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত পোলেই গৃহীত হবে।

মুলবন্ধ বাদেও কমিটি যে সংশোধন সবর্ন করেছে, কালে পরিণত হবে পার্টির চেহারা বহলাংশে পরিবর্তিত হবে এবং পার্টির ভেতর গণতন্ত্র—সর্বাধ সম্প্রা

দক্ষিণাঞ্চলকে ভারতীয় রাজনীতিতে কোণঠাসা করতে চাইছে। দিল্লীতে পাকিস্থানের কিছু লোক এবন প্রচারও চালাচ্ছেন যে জীবনবীমা কর্পোরেশনের ব্যাপারে কর্তার বাবস্থা গ্রহণ করলে দেশের ঐক্যে কাটল ধরতে পারে। তাদের যুবপত্র হিসেবে, ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস শুধু শ্রীকৃষ্ণমাচারীর প্রশংসি করেই ক্ষান্ত হয় নি, কবিনেতের বিচার বুদ্ধির উপরও কটাক্ষপাত করেছে। কোথাকার মল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় কে জানে!

সম্পাদক—শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য

সম্পাদক—কর্তৃক ক্যালকাটা প্রেস (প্রাইভেট) লিমিটেড, ১নং ওয়েলিংটন স্কোয়ার কলিকাতা—১৩ হইতে মুদ্রিত এবং ৭নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা—১৩, দর্পণ কার্যালয় হইতে প্রকাশিত।

বুনিয়াদী শিক্ষার জন্য বরাদ্দ অর্থের অপচয়

বিদ্যালয় স্থাপনের পরিবর্তে • সদর দপ্তরের কলেবর বৃদ্ধি • অনুগ্রহভাজন ব্যক্তিদের অর্থ আত্মসাৎ

হিসাবের কারচুপি

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

পশ্চিম বঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক করা দূরে থাক, দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা অনুযায়ী বুনিয়াদী শিক্ষার দ্রুত প্রসারের নীতি বানচাল হতে চলেছে। এই খাতে বরাদ্দ কোটি কোটি টাকা শিক্ষিতের হার বৃদ্ধির কাজে ব্যয়িত না হয়ে মুষ্টিমেয় কিভাবে অপব্যয় হচ্ছে তার একটা চাঞ্চল্যকর বিবরণ সম্প্রতি আমাদের হস্তগত হয়েছে।

৩০,০০০ গ্রামের জন্য ১৫০০ নূতন বুনিয়াদী বিদ্যালয় মারফৎ আরও ২৫০,০০০ বালক - বালিকাকে শিক্ষাদানের আয়াস সরকারী অব্যবস্থার ফলে কি ভাবে ধূলিসাৎ হয়েছে তার একটা পূর্ণাঙ্গ চিত্র ঐ বিবরণীতে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

গ্রামে গ্রামে বুনিয়াদী বিদ্যালয় খুলে প্রথম ও দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার মধ্যে বালক বালিকাদের অধিকাংশকে কার্যকরী শিক্ষা দেবার যে আশার পরিকল্পনা করিদল বেপ-রোয়া লক্ষ্যে ছুটে এবংছিলেন পশ্চিম বঙ্গে তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে চলেছে।

কর্মপরায় জৌলুস দেখিয়ে পশ্চিম বঙ্গের ৩০,০০০ গ্রামের জন্যে আড়াই হাজার পূর্ণাঙ্গ বুনিয়াদী বিদ্যালয় খুলবার পরিকল্পনার মধ্যে দ্বিতীয় পাঁচসালা খাতে পৌঁনে সাত কোটি টাকা বেডাবে বরাদ্দ হচ্ছে তাতে আর বাই হোক না কেন, শিক্ষিতের হার যে দ্রুতীত হবার আশা নেই, ওয়াকেফহাল বহুল সেবিষয়ে একমত।

সম্প্রতি একজন সরকারী পরিদর্শক কলেকটী পক্ষন পরিবর্ণন করে যে বিবরণী পেশ করেছেন তাতে শিক্ষা প্রসারের নামে এই বিরাট কারচুপি উদ্ঘাটিত হয়েছে। সরকারী তালিকার বহুযে সব গ্রামে পূর্ণাঙ্গ বুনিয়াদী বিদ্যালয় কাজ করছে বলে দেখান হয়েছে উক্ত পরিদর্শক নাকি তার মধ্যে বেশীর ভাগ গ্রামেই কোন বিদ্যালয়ের চিহ্নমাত্র দেখতে পান নাই।

অনুসন্ধানে জানা হয়ে পড়ে যে, বিদ্যালয় খুলবার ভার করেকজন অনুপ্রর-ডাদন ব্যক্তির উপর ন্যস্ত করে যে মোটা টাকা দেওয়া হয়েছিল তারা যথা-নীতি তা আত্মসাৎ করে বসেছেন।

এই পূর্ণাঙ্গ উদ্রেখযোগ্য যে বছর বছরে যে সব গ্রামে নূতন বুনিয়াদী শিক্ষালয় খোলা হয়েছে বলে তালিকায় দেখান হয় তার নাম ও বিবরণী সরকারী থেকেই অথবা আইন সভার সদস্যে পেশ করায় কোন ব্যবস্থা নেই।

দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার দুই বৎসর কেটে গেছে কিন্তু এই ব্যাপার আরও আড়াই শত বালক বালিকাকে নূতন বুনিয়াদী বিদ্যালয় বারুক শিক্ষা দানের যে লক্ষ্য স্থীকরে বুকে বুকে ও পরিকল্পনার কার্যক্ষেত্রে বিঘোষিত হয়েছিল তা এখনও 'লেই তিমিরে'।

আরও একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় যে, গত কয়েক বৎসর ধরে বুনিয়াদী এবং প্রাথমিক শিক্ষকদের যে মোট সংখ্যা সরকার প্রকাশ করেন(৩০,০০০) তা মোটামুটি একই রয়ে গেছে। যদিও প্রত্যেক বছরই সাড়ম্বরে ঘোষণা করা হয় যে বাড়ো বহু নূতন বিদ্যালয় চালু হচ্ছে। এই বিদ্যালয়গুলিতে তবে কি বিনা শিক্ষকেই শিক্ষাদানের কাজ চালানো হচ্ছে?

আরও জানা যায় যে, নিষ্কিত কেরাবদের কর্মসংস্থানের জন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে আলাদাভাবে অর্থ সাহায্য নিয়ে যে ২০,০০০ যুবক-যুবতীকে তিন বছরের জন্যে শিক্ষকতায় নিযুক্ত করেছিলেন, তাঁদেরও বুনিয়াদী এবং প্রাথমিক শিক্ষকদের ঘোট সংখ্যার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অথচ কেন্দ্রের নিকট থেকে এই খাতে প্রাপ্ত টাকায়ের কোন হিসাবই বেলে না।

আগামী বছর থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থসাহায্যের মেয়াদ উত্তীর্ণ হবে, তখন ২৫,০০০ হাজার শিক্ষকের কি হাল হবে তা নিয়ে বাধা যাবাবোধ এখন পর্যন্ত কিছু বিভাবের সময় হয় ওঠেনি। বোধ হয় সব এলে তাঁরা হয়ত শোভা পথই বরবেন। অর্থাৎ এক কলমের খোঁচায় ২০,০০০ লোকের জবিজোবনার বড়ত করবেন।

ডাকণর বুনিয়াদী এবং প্রাথমিক শিক্ষকদের কথা। এ বিষয়ে সরকারের অবণা 'বয়াড' হাত। বিশেষজ্ঞাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত বুনিয়াদী শিক্ষকের বেতনের হার হচ্ছে৫৩, টাকা থেকে ৯০, টাকা। যাঁরা ম্যাট্রিক পাশ করার পর শিক্ষকের ট্রেণিং নিয়ে কাজ করেন, তাঁদের হার ৬৩, টাকা থেকে ৯৩, টাকা। এঁদের সমান বেতন বরাবর বাংলার ১, টাকা হারে বেতন বৃদ্ধির সুযোগ আছে। সাধারণ ম্যাট্রিক পাশ এবং বিশেষভাবে শিক্ষা-প্রাপ্ত নবম্যাট্রিক শিক্ষকরা পান ৫৩, টাকা, কোন বৃদ্ধির কথা নেই। আর যাঁরা ম্যাট্রিক পাশ নন এবং শিক্ষকতার কোন ট্রেণিং নেই তাঁদের বেতন মাসিক ৪৩, টাকা। চাকুরীর স্থায়িত্বের কথা কেউ যেন না বলেন, কারণ ইন্টারভিউর সময় তিন বাজবে তা সবকার নিজেই জানেন না।

পাঁচসালা পরিকল্পনার বচয়িতারা বলেছেন যে, বুনিয়াদী শিক্ষাকে জাতীয় শিক্ষা সম্প্রসারণ নীতির প্রধান সোপান স্বরূপ গ্রহণ করতে হবে। তাঁদের কথা পুঁথিতেই রয়ে থাক। ওগুলো যাঁরা পাঁচসালার পুঁথি পড়বেন তাঁদের কানে ডাল শোনাবে। চাকায়ে পাঁচসালার খাড় থেকে এসেও এবিষয়ে পরিকল্প সরকারের নীতি তাঁদের নির্দেশ। সে নীতিতে বুনিয়াদী শিক্ষার জন্যে বিদ্যালয় ডবন অনুমোজনীয়। স্থায়ী শিক্ষক নিয়োগ করাও অপ্রয়োজনীয়। গ্রাম এবং শহরবাসীদের ছেলেমেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষার স্থায়ী সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থার অবহেলাই মেন নিয়ম; অন্তত: পুরাক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে তা পরিস্ফুট হয়।

চাকায়ো কোন খাতে খায় তা দেখুন। মাসে মাসে নতুন নতুন অফিসার, পরিদর্শক প্রভৃতির খাবা পুষ্ট হচ্ছে সদর দপ্তরের কলেবর বৃদ্ধি হচ্ছে, আর সেই সঙ্গে কাবের অক্ষৌহিণী সরকারী সিনেমা বেলানো হচ্ছে। ১৩৫৮ সালে চালু হওয়া পশ্চিম বুনিয়াদী বিদ্যালয় প্রশিক্ষনের খোলা হয়েছে। কেউ যেন পুশ্ন না করে বসেন—গেওলি কোথায় এবং কেমন করে চলছে। আগামী বছরে (১৩৬৯-৩০ সালে) আরও ১৩২টি বুনিয়াদী বিদ্যালয় খোলার পরিকল্পনা খাড়াগছে আছে। পরিদর্শক পরিচালনের বহু ভেলার বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে ঘুরে এসে চলতি বছরে নতুন খোলা বিদ্যালয়গুলির কোথায় ছাপোষ্টে কোন চিহ্নমাত্র পান নি। অনেক অঞ্চলে টিকানামত গ্রামে গিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে ইস্কুলের পরিবর্তে বনবাদাড় দেখেই ফিরতে হয়েছে।

দ্বিতীয় পাঁচসালার আড়াই হাজার নতুন বুনিয়াদী স্কুলের আর কর্তব্যিক ?

অন্যান্য পৃষ্ঠায় পাবেন

- শিবরামের চিঠি (পৃষ্ঠা ২)
- চিং (,, ৩)
- বিধান সভার উত্তেজনা (,, ৪)
- নৌ বাহিনী আসাম সমাচার (,, ৪)
- টিকাটুটি (,, ৪)
- তৃতীয় শ্রেণীর খেলোয়াড়ের বাঙ্ময় বর্ষাদা (পৃষ্ঠা ৩)
- সবখারী সমাচারত্র (,, ৬)
- মুক্তোহর বাংলা উপন্যাস (,,৭)
- বাঙালী পাইলের কৃতিত্বপূর্ণ
- সিনেমায় লভীতের স্থান (,,

ভাসানী লীগ আঁতাত

চাগলা-কমিশনের রিপোর্টে নেহরুর উষ্মা

সাপ্তাহিক সংবাদ সাময়িকী

১ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা :: কলিকাতা—২৮শে ফেব্রুয়ারী শুক্রবার ১৯৫৮ :: মূল্য ২৫ নঃ পঃ

সম্পাদকীয় ঃ

মিঃ স্পীকার স্যার

পশ্চিমবঙ্গের স্পীকারের আসন থেকে শ্রীযুক্ত শৈলকুমার মুখার্জীর পদত্যাগ নিশ্চয়ই বিস্ময়ের ব্যাপার বড় ঘটনা নয়। বিশেষত বর্তমান স্পীকার শ্রীশঙ্করদাস ব্যানার্জীর যদি এই একটি ঘটনাই মনে রাখেন তাহলেই তাঁর পক্ষে যথেষ্ট হবে। শৈলকুমার অপিয় হয়েছিলেন তাহাতে আশ্চর্যান্বিত হবার প্রশ্ন নয়। সহিষ্ণু-তার অভাব এবং প্রসন্নতার অভিনয়ে তিনি আসন বিপদাপন্ন করেছিল বিধানের সময় থেকেই তিনি উচ্চ সাটি ফিকেট পাওয়া করতে পারেননি। শঙ্করদাস ব্যানার্জী কেউ অস্বীকার করবেন তাঁর বুদ্ধি, বাগ্মিতা এবং বিচার-শক্তি অসাধারণ। এবনকি, তাদাবের display-তে তিনি বিধানের প্রথম পুণ্যার সকাশিনেতাদের ছাড়িয়ে যান। তথাপি, আমরা শ্রীযুক্ত ব্যানার্জীকে বলব যে, বিধি বে-বিধানের করুণ দৃষ্টান্তই বিশ্বত না

গত তিন দিন তাঁর আসনের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হয়েছে, তার সংবাদটি অজানা নয়। শ্রীযুক্ত শৈলকুমার মুখার্জী তাকে "অপ্রাসঙ্গিক" বলে-ছিলেন, সেটা শোভনই বিদ্রূপবিরুদ্ধ হয়েছিল। বস্তুতপক্ষে তিনি যেন ধরণে শ্রীযুক্ত ধেবেন সেনকে কিছুতেই প্রিজি-নিকের পুশ্ন তুলতে দেবেন না। প্রিভিলিজের প্রশ্ন বাধা দেওয়ার অধিকার কোনো স্পীকারের নেই। সেই পর্যন্ত শ্রীযুক্ত সেনের কথা যখন তাঁকে শুনতেই হল, তখন তাঁর যথেচ্ছা চুড়ান্ত হাস্যকর হয়েছিল—স্পীকারমাত্রের ক্ষেত্রে কোনো ক্রমেই কমপ্লেমেন্টারি নয়। তাছাড়া সভায় তিনি সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী বটে, কিন্তু স্পীকার নিশ্চয়ই সভার একমাত্র বক্তা নন। কিন্তু বলল এবং বুধবার দুষ্টান্তিনই সভায় সর্বপেক্ষা উত্তেজনার মুহূর্তগুলিতে স্পীকারের বক্তৃতার মাঝ যদি নেওয়া হয় তাহলে নিশ্চিন্ত দেখা যাবে যে, তিনি একাই যে কোনো প্রশ্নতত্ত্ব বক্তার চেয়ে বেশী কথা বলেছেন। সাধারণ ন্যায়, আমরা ধৈর্যকের মিঃ স্পীকার স্যার, আমরা ধৈর্যকের বুধবারির কথা আপনাকে পুনরায় স্মরণ করাচ্ছি।

আরও একটি বেদনাদায়ক ঘীকা-রোক্তি আপনি করে করে বসেন। সরকারপক্ষের পালামেণ্টারী ইতিহাসে এমনও সেই কথনকার অন্যায়ীই উচ্চারণ, যখন ডাক্তার মাবিধানও ছিলেন, কংগ্রেসের পার্লামেণ্টারী ছিলেন না। তখন ১৯৫৬ সালের ডাক্ত পাসন আইনের ধারা দেন চলত এবং আইন সভায় বক্তা ছিলেন বুদ্ধিবিদ জীবা। আইনসভার ছিল ছাত্রই নবীন, মুক্ত পুণ্য এবং শ্রীবরেন। আজকের নবাদার না কিছু সেই নিদ্দন ইতিহাস স্মরণি হয়েছে—এটাই দুঃখের।

ধীরেনবাবুর পরে আর বেলেছা তার নিকরপেক্ষতার ঔজ্জ্বল্য ঘোষণা, তাঁহার ঋণ কি ছাড়া কি অপেক্ষিপন্ন কেহেই এখন পুরোহা। সলাই প্রতিনিধি বিধান সভার আন্তরিকতার প্রশ্ন আমরা সাঁহাদানক।

প্রাক্তন আইনমন্ত্রী শঙ্কর মিত্রের উপনির্বাচনের জন্য চেষ্টা

মনোনয়ন ব্যাপারে অভূতপূর্ব—বিধান দ্বন্দ্ব

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

শ্রীযুক্ত শঙ্কর প্রসাদ মিত্রকে বিধানসভায় পুনর্নির্বাচিত করার জন্য কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী পার্টিতে দ্বিতীয় চেষ্টা আরম্ভ হয়েছে।

বাঁকুড়ার স্বাধীনসেনাদের চাঞ্চল্যকারের দ্বারা শ্রীযুক্ত যে আসনটি শূন্য হয়েছে, প্রধান বিচারপতি যদি অনুমতি দেন তাহলে সেই আসনে শ্রীযুক্ত মিত্রকে উপনির্বাচনে পাঠানো হতে পারে।

শ্রীযুক্ত মিত্র মাত্র ৫ সপ্তাহ পূর্বে হাইকোর্টে বিচারপতি নিযুক্ত হয়েছেন এবং তাঁর ২ বৎসরের কনষ্ট্রাক্ট নির্দিষ্ট কার্যকাল যদি প্রধান বিচার-পতি সমাপ্ত করে দিতে রাজী নাহন তাহলে এই চেষ্টা অগ্রসর হতে পারবেন।

কিন্তু আসল বাধার প্রশ্ন বোধ হয় অনেকেই জানেন যে, এইখানে নয়। প্রধান বিচারপতির অনুমতি পাওয়া গেলেও শেষ পর্যন্ত শ্রীযুক্ত বিত্তকে কংগ্রেসের মনোনয়ন দেওয়া এবং নির্বাচন পার করিয়ে আনার পথে আর একটি প্রবল বাধা আছে। সে বাধা এও নয় যে ঐ আসনে বাঁকুড়ার জনপ্রিয় নেতা শ্রীবাধবেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দাঁড়াচ্ছেন। এমন কি শ্রীযুক্ত মিত্র যদি শেষ পর্যন্ত উপ-নির্বাচনে দাঁড়ান তাহলে হিন্দু বয়সভা প্রমুখ কংগ্রেসেরই সাহায্য পেতে পারেন—এমনে আমি আশ্চর্য হব না।

কেন এ কথা বলছি, তার কারণ বিশ্লেষণ করতে হলে আর একটি ঘোপন খবর দিতে হয়। শ্রীযুক্ত মিত্রকে উপ-নির্বাচনে দাঁড় করিয়ে পুনরায় নির্বাচিত ক'রে আনার জন্য চেষ্টা এই প্রথম নয়, এটা দ্বিতীয়। প্রথম চেষ্টা হয় গত ডিসেম্বর মাসে। অনেকেই জানেন না যে, ডাঃ রাধাকৃষ্ণ পাল ঐ সময় সদস্যপদ ত্যাগ করার জন্য চীফ হুইপের কাছে চিঠি দিয়েছিলেন। মহিমচন্দ্র একটি কুদ্র দল এবং পার্টির কয়েকজন সদস্য গত নির্বাচনের পর থেকেই শ্রীযুক্ত মিত্রকে ভারার পাটিতে এবং মন্ত্রিসভার পার্টিতে ভাবে অনুভব করছিলেন। একথা অনেকের কাছে মনে হয়েছিল যে, মিঃ মিত্র, নিরর্থক বার, শঙ্কর মিত্র, পূর্বের বুধারী এর শ্রেণীর বলেকজনের মধ্যে এক মন্ত্রিসভাকে শক্তির

তবে থেকে যে চেষ্টা আরম্ভ হয়, তার ফলে শেষ পর্যন্ত ডাঃ রাধাকৃষ্ণ পাল আসন ত্যাগ করতে সম্মত হন।

ডাঃ পালের আসনটি সংরক্ষিত নিরাপদ এ কথা মনে হয়েছিল। ডাঃ পাল নিজে শ্রীযুক্ত মিত্রের জয়লাভের দায়িত্ব নিতে সম্মত হয়েছিলেন। এদেরদিতে বঙ্গীয়ের ঘরে বসে ডাঃ পাল যেদিন ইস্তাফা দেওয়ার জন্য পত্র লেখেন আমি সেখানে ছিলাম। তাঁকে ডাঃ রায়ের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তার পূর্বে। ডাঃ রায়ই প্রথম সরকারীভাবে ডাঃ পালকে আসন ত্যাগের জন্য অনুরোধটি জানান। সমস্ত কথাবার্তা পাকা হয়ে যায়। ডাঃ পাল সেই রাত্রেই শ্রীযুক্ত মিত্রের বাড়ীতে গিয়েছিলেন বলেও আমার মনে হচ্ছে।

অতুল্য ঘোষের প্যাঁচ !

এই সংবাদ কংগ্রেসের সভাপতির কাছে পৌঁছুতে বিলম্ব ঘটেনি। অতুল্যবাবুর আশীর্বাদ হাড়া, শুধু ডাঃ রায়ের আশী-র্বাদের জোরেই কেউ কংগ্রেসী এর এম এ হয়ে, একথা আদৌ কহাই যায় না। তার উপরে আবার শ্রীযুক্ত মিত্রের শঙ্কর দিয়ে, যিনি কিনা অতুল্যবাবুর অভিভাপদ্রষ্ট।

যাই হোক, ইতিমধ্যে ডাঃ রায় নিজে একটি অসতর্ক কাজ করলেন। রাইটার্স বিল্ডিং সে একদিন শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল সেনকে ডেকে তিনি বললেন, শঙ্করকে nomination দেব, রাধাকৃষ্ণ পালের জায়গায়। এলে তাকে rehabilitation টা দেওয়া যাবে।',

(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় ১ম কলমে)

শিলংয়ের চিঠি

আসাম কংগ্রেসের অভ্যন্তরেই শ্রীবলিহাকে গদিচ্যুত করার ফন্দী

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

প্রভিন্সিয়াল অটনমির আমলে শ্রীকরুদ্দিন আলি আহমদ গোপীনাথ বরদলৈর কোয়ালিশন মন্ত্রিসভায় যোগদান করে কংগ্রেসের খাতায় নাম লেখান এবং তখন তাঁকে অরুণকুমার চন্দ ও শ্রীদেবেশর শর্মার সঙ্গে একই আসরের শরিক হিসেবে দেখা যায়। সে অনেকদিনের কথা। গোপীনাথ বরদলৈ ও অরুণকুমার চন্দ আজ নেই। এবং দেশে বিস্তর অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। তবে পুরাণো দিনের রেওয়াজ টেনে লোকে এখনো বিশ্বাস করতে চায় যে শ্রীকরুদ্দিন আলি আহমদ ও শ্রী দেবেশর শর্মার সৌহার্দ্য এখনো বর্তমান।

গত সাধারণ নির্বাচনে দুজনেই লোকসভার সদস্যপদ ছেড়ে আসাম রাজনীতিতে ফিরে এসেছেন। শ্রীশর্মা মুখ্যমন্ত্রীত্বে প্রত্যাবর্তন করতে পারেন নি। তবে শ্রীকরুদ্দিন কেন্দ্রিয় এবং শ্রীবিমলাপ্রসাদ চলিহার মন্ত্রিসভায় তাঁর পূর্বপদ অর্থ দপ্তরের গুরুদায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল। তিনি প্রথম থেকেই বন্ধপরিকর যে মুখ্যমন্ত্রিত্ব যদি তাঁর ভাগ্যে না জোটে অন্তত অর্থমন্ত্রিত্ব চাই।

এখানে প্রায় সকলেই জানেন যে শ্রীবলিহার মন্ত্রিসভার সদস্যদের শপথ গ্রহণের মাত্র আধ ঘন্টা পূর্বে শ্রীশর্মা প্রতিশ্রুতিটি আদায় করে তবে রাজভবনের দিকে রওনা হন। তখন থেকেই প্রশ্ন ওঠে যায়—তাহলে শ্রীকরুদ্দিন আলি আহমদ মন্ত্রিসভায় যোগ দিলে উপায় কি হবে? তিনি আসছেন জানা কথা এবং এখনও অজানা নয় যে, তাঁরও নজর ঐ অর্থ মন্ত্রিত্বেরই উপর।

কংগ্রেসী মহলে আড়ি পাতার সুযোগ বুঝিয়ে আছে এমন লোকের কাছে শুনেছি যে গত কয়েক দিনের মধ্যে প্রতিদিনই বন্ধুস্থানের মধ্যে একবার সোজাসুজি অথচ বোলচালের ভাবে গোলমেলে প্রসঙ্গটির আলোচনা হয়ে গেছে। (উপায়ও ছিল না কারণ শ্রীচলিহা ঘোষ হয় এই ব্যাপারে নিজে কিছু একটা যা হোক স্থির করতে চাচ্ছিলেন না)। শ্রীআহমদ বলেন অর্থ দপ্তরের ভার গ্রহণ তাঁর অনেক দিনের বাসনা। অবার যেন শ্রীশর্মা—"বেশ তো, দিন না আপনি।"

শ্রীআহমদ—"তাহলে আপনি কি নেবেন?"

শ্রীশর্মা—"কেন? আইন।"

শ্রীআহমদ চট করে বুঝতে পারেন সেটা আবার কি এবং গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর। তবে উপলব্ধি করতে বেশী সময়ও লাগেনি যে অর্থ মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করতে হলে শ্রীশর্মা একেবারে মন্ত্রিসভা থেকেই ইস্তফা দিয়ে আইন ব্যবসা সুরু করবেন বলে নোটিশ দিচ্ছেন।

শ্রীবিমলাপ্রসাদ চলিহা মুখ্যমন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেই ভোজবাজীর মত পাবত্য উপজাতীয়দের "হিল্‌স্ টেট" আন্দোলনের অবসান ঘটিয়ে আশার সঞ্চার করেছিলেন যে আসামের প্রধান সমস্যাগুলি দুর হবে তাঁর আমলে ও অবিলম্বে। সেই আশা যে একেবারেই দুরাশা এমন কথা বলা যায় না এখনো, তবে দেখা যাচ্ছে সামনে ঘনিয়ে বিঘ্ন রয়েছে। শ্রীদেবেশ্বর শর্মা বনাম শ্রীফকরুদ্দীন আহমদের অর্থ মন্ত্রিত্ব দিয়ে টানাটানির ফলাফলের ওপরেও মন্ত্রিসভার ভবিষ্যৎ অনেকখানি নির্ভর করছে। শ্রীশর্মার আসাম কংগ্রেসে নিজস্ব দল আছে এবং শ্রীআহমদ ও আসামের মুসলমানদের অবিসংবাদী নেতা।

পার্বত্য উপজাতীয় সংস্থা ট্রাইবাল ইউনিয়নকে মন্ত্রিসভায় এবং বিধান সভায় কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতা করতে রাজী করিয়ে শ্রীবিমলাপ্রসাদ চলিহা আসামের রাজনৈতিকবুদ্ধিসম্পন্ন প্রায় সকলেরই আন্তরিক অভিনন্দন কুড়িয়েছেন কিন্তু তাঁর নিজের কংগ্রেসী সতীর্থদের কেউ কেউ গোপনে বিরুদ্ধ প্রচার করতে ছাড়ছেন না। শাসনে শিথিলী রেখে তাঁরা চোখা চোখা বাণ ছুঁড়ছেন। শ্রীচলিহার বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ দাঁড় করাবার চেষ্টা হচ্ছে—তিনি নাকি টাইবাল ইউনিয়নের সঙ্গে কথাবার্তা চালাবার সময় কংগ্রেস দলের সঙ্গে পরামর্শ করেন নি এবং টাইবাল ইউনিয়নকে চটাতে ভাতে তুলে নাকি নতুন মুখ্যমন্ত্রী কংগ্রেসপন্থী উপজাতীয়দের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। অভিযোগগুলির মধ্যে যুক্তি যতখানি আছে তার চেয়ে স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা বেশী বলেই মনে হয়। কংগ্রেস-পন্থী উপজাতীয় নেতাদের জনপ্রিয়তা গত সাধারণ নির্বাচনে চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয়েছে এবং তার পরেও যারা তাদেরই জনসাধারণের আস্থাভাজন বলে জাহির করতে চেষ্টা করছেন তারা রাজনৈতিক বিচারে ঠিক বদ্ধ নয়, চক্রী। নীচলিহাকে গদীচ্যুত করবার ফন্দী আসাম কংগ্রেসেই পুষ্টিলাভ করছে এবং তাঁর উপজাতীয়দের সঙ্গে সখ্যতার নীতিকে নানা ছেঁদো কারণ দেখিয়ে বাঁকাচোরা করার চেষ্টা আরম্ভ হয়েছে। আশঙ্কা করছি এই বিষয় নিয়েই পরে কয়েকটি চিঠি ভর্তি হয়ে যাবে।

●

ট্রাইবাল ইউনিয়ন ২৪শে ফেব্রুয়ারী থেকে শিলং পাহাড়ের আইমুল সহরে সম্মেলন আরম্ভ করেছে। তাদের ভরফ থেকে লোখানে বিচার করা হবে কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতা করার যে নীতি দলের নেতৃত্বরা গ্রহণ করেছেন এবং এরই সঙ্গে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেছেন সেটা সমর্থনযোগ্য কি না।

●

অনেক দিন পরে সেদিন সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম। এখানে সিনেমা দেখা কিন্তু তেমন সোজা কথা নয়। আরো টিকিট বিক্রী হয় না- যথাসময়ে গিয়ে বরাতজোরে ছাড়া উপায় নেই। টিকিট যদি পান তাহলেও সমস্যা মিটলো তবে করবেন না, বন্ধু-বান্ধব নিয়ে যে সব সময় এক জায়গায় বসতে পারবেন তার কোন মানে নেই-সীটের কোন স্থিরতা নেই সুতরাং ছড়িয়ে যেতে হতে পারে। তবে সমাজবাদী রাষ্ট্রের আদর্শে অনুপ্রাণিত বড় সরকারী কর্মচারী যদি হন তাহলে আপনার কথা আলাদা। সেদিন গিয়ে দেখলাম পুলিশগারদের বাইরে এবং ভেতরে দুই পুলিস বোতায়েন। একটু চমকে গিয়েছিলাম- কোন দাগী পলাতক আসামীকে সিনেমা হলে গ্রেপ্তারের তোড়জোড় চলছে নাকি? সিনেমা আরম্ভ হোল তখনো ভেতরের পুলিস কনেষ্টবল ঠাঁর দাঁড়িয়ে - পেছনের দর্শকদের অস্বস্তি বোধ হচ্ছে তাতে তার কি? সেত হুকুম পালন করছে মাত্র। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল খাসি জয়ন্তিয়া পাহাড় জেলার উচ্চ পুলিস কর্মচারী সপরিবারে প্রবেশ করলেন এবং কনেষ্টবল পরে তাঁদের চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে প্রস্থান করলো। ঐ সারির চেয়ার-গুলি ডিফেন্স অফ ইণ্ডিয়া আইনের প্রেসটেজের পুঁজের মত জনসাধারণের পক্ষে রক্ষিত ছিল।

কলিকাতায় মাছ দুর্মূল্য কেন?

আড়ৎদারদের 'জোট' ও কায়েমী স্বার্থের গভীর চক্রান্ত

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

কায়েমী স্বার্থের চক্রান্তে কলিকাতায় বারমাসই মাছ দুর্মূল্য। শিক্ষিত জনসাধারণের চাপে সরকার মাঝে মাঝে মনস্থাটি সম্বন্ধে সজাগ হয়ে ওঠেন, কড়িপিস ব্যবসায়ীর জোট ভেঙ্গে দেবার চেষ্টা করেন। কিন্তু স্বল্পসংখ্যক ব্যবসায়ীদের ক্ষমতা, প্রভাব ও কূটবুদ্ধির কাছে সরকারকে এযাবৎ বার বার হার মানতে হয়েছে। সম্প্রতি নূতন করে এদের বিরুদ্ধে অভিযান (!!) সুরু হয়েছে।

বর্তমান অভিযানের প্রথম লক্ষ্য ছিল হাওড়ার শুটিচার আড়ৎদার। গঙ্গার সমুদ্রের মাছ কেনা-বেচার ব্যাপারে এরা সরকারকে নাজেহাল করে আসছে। জাপানী ট্রলারে ধরা প্রায় ৭০০ মণ মাছ সপ্তাহে আসে। এই মাছ বিক্রীর জন্য সরকার টেণ্ডার ডাকেন। যখনই টেণ্ডার ডাকা হয়, তখনই মাত্র একজন ব্যবসায়ী অন্যান্যদের সঙ্গে জোট করে টেণ্ডার দাখিল করে। টেণ্ডারে সঙ্গতভাবেই খুব কম দাম দেওয়া হয়। একমাত্র টেণ্ডার বলে সরকারকে সেটাই গ্রাহ্য করতে হয়। আড়ৎদারেরা অবশ্য বহুগুণ চড়া দামে এই মাল দৈনন্দিন বাজারে সরবরাহ করে।

এই ঘৃণ্য অপকৌশলের বিরুদ্ধে সরকার নূতন পথ অবলম্বন করলেন। টেণ্ডার ডেকে বিলি করার ব্যবস্থা বদলে, একাধিক আড়ৎদারদের মধ্যে নিলামের ব্যবস্থা করলেন। এতেও আড়ৎদারদের চক্রান্তের হাত এড়ান গেল না। নিলামের খরিদ্দার এদেরই কয়েকজন, দাদন খাওয়া লোক। আড়ৎদারের চোখের ইঙ্গিতে বা অঙ্গুলির ইসারায় এরা নিলামে দাম উঠান না। অবাভাবিক নিম্নমূল্যে মাছ নিলাম হক। যে দামে নিলামে বিক্রী হয়, সেটা খাতার লেখা হয় এবং সরকারকে সেই হারে দেওয়া হয়। বস্তুত: নিলামের খরিদ্দারের জন্য দাম, নিলামে যে দাম উঠান হয় তার চেয়ে কোন কোন সময় মিওগ্রেড্‌ বেশী। ফলে ১৫।২০ টাকা মণ দামে কেনা মাছ খুচরা ৭৫৲ টাকা থাকে বিক্রি হয়।

●

শুধু তাই নয়। সরকারকে জব্দ করবার বজ্জাতে এবং জনসাধারণের কাছে তাকে অপদস্ত করার জন্য, মাছ পাচারার ব্যবস্থা করা হয়। আড়ৎদারদের প্রত্যেকেরই নিজের আনাদানী মাছ আসে। আড়তে কেনাবেচার প্রশস্ত সময় সকাল পাঁচটা থেকে ছটা। ঐ সময় আড়ৎদারেরা নিজেদের আমদানী মাছ বিক্রী করতে ব্যস্ত।

দর্পণ

(একমাত্র বাংলা সংবাদ সাময়িকী)

চাঁদার হার

ত্রৈমাসিক——তিন টাকা

ষাণ্মাসিক——ছয় টাকা

বার্ষিক——বারো টাকা

দর্পণ প্রতি শুক্রবার নিয়মিত প্রকাশিত হয়, যে কোন সংখ্যা থেকে গ্রাহক হওয়া যায়।

টাকা কড়ি পাঠাবার ঠিকানা—

ম্যানেজার, দর্পণ

৭নং চিত্তরঞ্জন এভেনিউ

কলিকাতা—১৩

সরকারের মাছ নিলামে বরাতে ছুটা বেজে যায়। ইতিমধ্যে কেনবার লোক অপেক্ষাকৃত বিরল হয়ে উঠে। ফলে মাছ অবিক্রীত অবস্থায় পড়ে থাকে।

আড়ৎদারদের জোট

বৃহত্তর কলিকাতার আড়ৎদারদের এই জোট (ফিস বিং) মোট বড় ২৫টি ব্যবসায়ীকে নিয়ে। এদের বাইরে, কিন্তু বিশেষ পরিমাণে এদের কবলে, আরও প্রায় ৭৫ জন আড়ৎদার আছে। এদের কর্মক্ষেত্র আটটি আড়ৎ—হাওড়ার ২টি, পাতিপুকুরে দুটি, কোলে মার্কেটে, ছাগলহাটায় (বৌবাজার), শিয়ালদহে এবং কসবায় একটি করে। ৩,০০০ থেকে ৩,৫০০ মণ মাছ এদের হাত দিয়ে ৭২টি বাজারে ফুদে ব্যবসায়ীর ব্যাপরে জনসাধারণের কাছে চতুর্গুণ দামে বিক্রী হয়। এদের এসোসিয়েশন আছেএবং এদের পক্ষ নিয়ে লড়বার লোক সার্থে৷ক্ত স্তরেও রয়েছে। আড়ৎদারদের মধ্যে জাত ভেদে শতকরা প্রণব্বনের বেশী নয়। বাবুন, কায়েত ও সবাজের অন্যান্য তথা কথিত উচ্চশ্রেণীদের সংখ্যা বেশী। হিন্দুস্থানীও বেশ কয়েকজন আছে এর মধ্যে।

সরকার আড়ৎদারের কবল থেকে জনসাধারণকে মুক্ত করার এক নূতন রকম ট্রাটেজি অবলম্বন করছেন। তাদের মাছ পাইকারী বাজারে নিলাম করবার জন্য বহুসংখ্যক ছোট ছোট আড়ৎদার নিয়োগ করেছেন এবং তাদের অংশ মুলধনের সেই সামঞ্জস্য রেখে সরকারের নিকট যে টাকা গচ্ছিত রাখতে হয় তার পরিমাণ কমিয়ে দিয়েছেন। এর উপর খুচরা ব্যবসায়ীদিগকে সরাসরি মাছ সরবরাহ করার ও বন্দোবস্ত হয়েছে গার্ডেন রীচের ঘাঁটি থেকে।

কিন্তু বড় বড় আড়ৎদারদের কাছে বহু খুচরা ব্যবসায়ীর হাত বাঁধা এবং তাদের ভয়ে এদের অনেকে সরকারের নিকট থেকে সরাসরি মাছ নিতে নারাজ। ভাবছে, সরকারের কাছে গেলাম একদিন বা দুদিন মাছ পাওয়া যাবে; আর বাকী কদিন আড়ৎদারদেরই দ্বারস্থ হতে হবে। অতএব তাদের কট করার ঝুঁকি আছে। এদের এই আশঙ্কার ভিত্তি বড় করার জন্য পলিত বন্ধ সরকার ক্রিকা দুর থেকে নিজের নামে দ্বারীভাবে মাছ আনাবার ব্যবস্থা করছেন। উদ্বিগ্ন সরকার এবিষয়ে তাদের সাহায্য করার প্রস্তুতিও দিয়েছেন। চিল্‌লর কথা সরকার সবিধি ওদিও কতিপয় কমিশনার আড়ৎদারের গোপনের বিরুদ্ধে স্বাধীন সরকারের বিরুদ্ধ অভিযোগ করেছে।

হিঃ টিঃ ছট্

—কবি গোড়ানন্দ

ধর্মই যে জীবনের প্রধান অবলম্বন, একথা কিছু নাস্তিক ডারাপদ লোকের পাল্লায় পড়ে গোঁড়ারাণী একদিন তা ভুলতে বসেছিল। অন্তত মুখের কথা, এখন ধর্মে তার মতি ফিরেছে।

ধর্মের দিকে জাতির মন ফেরাতে গোঁড়ের বিদ্যাধর জজ, ডায়োবিটিসে আক্রান্ত বিনাত কেশব ব্যারিষ্টার, হাঁক করা হাইটাং, পলাশ-অলা বৃদ্ধ ডাক্তার, অবসরপ্রাপ্তা সিনেমা অভিনেত্রী এবং ইউনিভার্সিটির কিছু অধ্যাপ প্রভৃতি বহুদার ব্যক্তিরণ যে প্রাণপাত পরিশ্রম করেছেন তার তুলনা অলপই মেলে।

* * *

এঁদেরই সারবান ক্রিয়াকলাপে আমি, গোঁড়ানন্দ বেশ বুঝেছি: যার মনে ধর্মভাব নেই তার মূল্য দুআনা সরাধর এ সংসারে আর কে আছে?

ধর্মের মাহাত্ম্য কি, তা এক্ষিন সংসারেভারতের সব কেউ বোঝেনি। ভারত সেই প্রাচীন কাল থেকেই ধর্মের বর্ষা বয়তে পেরেছিল। আর পেরেছিল বলেই না ভেজিশ কোটি দেবদেবী এই ভারতভূমিতে অবাধে বিচরণ করতে পারছেন।

* * *

ভারত ঋষি পুণ্যস্থান। এর প্রতিটি ধুলিকণাও পরম পবিত্র। তাই সী, বিবাদরের নির্জন ওয়া কি রাজধানীর মধ্যস্থল পর্যন্ত-এর সুবিস্তীর্ণ ভূভাগের সর্বত্র বাসস্থান গড়বার জন্য দেবতাগণের মধ্যে এত হুড়োহুড়ি পড়ে যায়।

দেবতারা যে কিরূপ পক্ষিমান তা গোপুর করার পর নিতান্ত নাস্তিকীয় চৈতন্যোদ্রেকে হতে নিস্তারও বিলম্ব হয় না।

* * *

কলকিতাতার নিজস্ব একটা বাড়ী করতে পারে? আরার আপনার কথা ছেড়ে দিন, ভারত তাদের লোক ফেরু রীতিমত বিবাদির খেতে হয়।

এরূপ কি সর্বত্যাগী কেরিবেই বিশিষ্টার, বর্ষজয়প্রাপ্ত পুলিশ কমিশনারদিগের ন্যায় পেটমান পুরুষগণও কোনরিতে পুরুকটির বেশি আর এগুতে পারেন না।

* * *

কিন্তু দেবগণের মহিমা একবার দেখুন! সমরে যুক কুদিয়ে রাত্তারাতি কেবল পাহাণ মনির গেঁথে বসবার করতে লেগেছেন। আর তাও কত মিত্তাবড়ারে।

দেবতাদের কারেক্টারে একটি কালো শুট দিতে পারে, এমন সাধ্য বোধ করি পুলিশের এণ্টিকরাপশান ডিভাগের পিতৃদেবেরও হবে না।

* * *

দেবতাদিগকে জমি কিনতে হয় না। পুরান সাশেন করারার জন্য কপো রেসনের রিলিফ কমিটির সদস্যদের পায়ে তেল মাখাতে হয় না, সিটি আকিটেক্টের ডিভাগের পকেটে একটি নরা পয়সাও ফেলতে হয় না। ধর্মের গোরুকু, এখানে এখনওআছে বলেই বাস্তাহারা এখানে বসির ওঠে। দেবতারাও ঝটপট এসে পজেশন নিতে পারেন।

* * *

ধর্ম আমাদের তবু যে পরবোকের বেলাধারের রুড়ি, একথা কিছু ভুল। অধিকাশ লোককেই, বিশেষ করে আমাদের দেশের বিধবা চাপা-তুমা স্ত্রীলোক নিরক্ষর লোকদিগের মধ্যেই, এরাবরাবরি পুরাভাবে প্রচলিত আছে।

* * *

ধর্ম এবং পুরুত দাতব্যসক। অর্থ কাল থেকে বঞ্চনার কাজ অবশ্য এ বাবসাদের ধারাটি অবিচ্ছিন্নভাবে চলে আসছে। তবু বলতেই

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

আমি অসুস্থ: ডাঃ বাধাকে রোগীটে দেখেছি, তার মতো সজ্জনার তাঁর বহুভাষি নিয়মেতে সংবেদনশীল বলেও দেখেছি। নীরক্তিকোগাসের, নীরক্তি অর্থনাশ বাধ এবং ডাঃ বাধের নিজের জমি কেনা সম্বন্ধে নীরবতার কলকাতা সভার যে অভিযোগ উত্থাপন করেছিলেন, তাঁর বাড় তার সংগতাতীত জবাব দিতে পেরেছেন—একথা প্রেস গ্যালারীর বোধ হয় প্রায় সকলেই একবাক্যে স্বীকার করবেন। সুখবরঃ, ডাঃ রায়ের হাতে সরবার মতো তথ্য ছিল। দ্বিতীয়তঃ, বহুভাষি তিনি সাক্ষিতে-ছিলেন ভাল। তৃতীয়তঃ, যথার্থ ডাক্তা-বেথেরও হয়ত কাবন ছিল। সাধারণতঃ তাঁর বহুতা অনাবশ্যক দীর্ঘ, অস্পষ্ট এবং এত ভট পাকানো থাকে যে গ্যালারীতে কতজন লোক সেই বহুতার সারবত্তায় মুগ্ধ হন, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। কাহ বাসুর না হোক, বৃহৎ অনুমতের গাভালা-দেশে তাঁর সমকে প্রায় কিংবদন্তী চালু করা হয়েছে। কাজেই কিংবদন্তীর নায়ককে যখন দাঁড়িয়ে শুকাও মৈ বে বলে এক ঘণ্টার একটি বহুতা দেখ করেন এবং কংগ্রেস বেঞ্চগুলির একপুঞ্জ থেকে অপর পুঞ্জ পর্যন্ত করতালি মুখরিত হয়, তখন বর্ণকমের মুগ্ধ না হয়ে উপায় নেই। ইঙ্গুলের ছাত্রদের essay লেখ করার মতো ডাঃ রায়ও বহুতার উপসংহার টানবার সময় বাছা-বাছা দুই-একটি কোটে-শান কিংবা পুরুদন নাথাবার জন্য তৈরী হয়ে থাকেন। অবশ্য একথা স্বীকার করতেই হবে যে, এক ঘণ্টা বা দেড় ঘণ্টা একটা বক্তৃতিকর কণ্ঠস্বর শোনার পর, স্থেদ চাদরায় মুখে তিনি যখন ঐ স্তবাবদিত পুরুদনগুলি আবৃত্ত করেন এবং কংগ্রেস সদস্যরা ওঁৎ পেতে থাকেন কখন শেষ হবে এবং কখন চটপট করতালি আরম্ভ করতে হবে, আমার কাছে ঐ সবাপণপর্বটি অক্তিকর মনে হয়েছে।

বরনবাবের বহুতার উপসংহারের যদি তিনি ব্যক্তিকর করেননি, পুরুর দিয়েই বহুতা শেষ হয়েছে, তখনি একথা নিঃসন্দেহে যে বহুতাটি precise এবং তথ্যপূর্ণ হয়েছিল। পুখবতঃ, তিনি বেথাতে সরর্থ হয়েছেন যে, বর্ধমানের বহরাজা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছ থেকে কোনো অতিরিক্ত করুণা লাভ করেননি। দ্বিতীয়তঃ, তিনি বুলেন ষ্টীট এবং রাইলাও রোডের. অবির পুায় অর্ধ শতাব্দীব্যাপী ইতিবৃত্তের ধারা দেখতে পেরেছেন যে, বুল নীথে নির্ধারিত বুল্যের তিনি এক পয়সা কমও দেননি, এক পয়সা বেশীও দেননি। বাস্তবার এই পেথাংশটি তো নিঃসন্দেহেই সন্দি-গ্ধিচারের তৈরী করে দেওয়া। পুখবাংশটি ভূমি রক্তির প্রশ্ন থেকে দিনি তৈরী ক'রে দিয়েছিলেন, ডাঃ রায়ের উচিত সেই ব্যক্তিকেও পুরুত ধন্যবাদ দেওয়া।

অভূতপূর্ব প্রতিশ্রুতি

বহুভাষি আরও একটি কারণে গুরুত্বপূর্ণ। দুর্নীতির অভিযোগের জবাব দেওয়ার সময় কোনোদিন বুখা-মন্ত্রীর বুখে একথা শোনা যায়নি যে, কন্ত্রীপদের একটা পুথক মর্যাদা আছে এবং কোনো অভিযোগ যদি সভার নিঃসন্দেহ প্রতিভাত হয়, তাহলে তাঁকে এবং মন্ত্রি-সভাকেও কেন্দ্রা পদত্যাগ করতে হবে। নীতির দিক থেকে এই উক্তিটি বুনাবান এবং আরও বুলাবান এই জন্য যে, গত দশ বৎসরের মধ্যে এই প্রথমে কোনো উক্তি রাজ্যের কর্ণধারদের কাছ থেকে শোনা যায়নি। মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বে শ্রীসুরীন সাহ চৌধুরী যখন সভায় ক্যাপ লাইট বেডিড কোম্পানীর কেলেঙ্কারী উত্থাপন করেন, তাঁ বাহকে তখন এই ধরনের কোনো আশ্বাস পুরুদন করতে শোনা যায়নি। এবং অনেকেরই হয়ত স্মরণ আছে যে, সেই অভিযোগের উত্তর দেওয়ার সময় ডাঃ বাধের বহুতার ধরন-ধারণের মধ্যে স্পষ্টতার ছিল না, তথ্যও ছিল না। ১৯৪৯ ক-ত্বরে তিনি সভা-পুর সচকিত করতে পেরেছিলেন, কিন্তু সুরীনবাবুর অভিযোগের কোনো নির্দিষ্ট তথ্য তিনি খণ্ডন করেননি। অমত অভিযোগটি ছেড়ে আরও অনেক দুকতর ছিল। সুরীনবাবু দেখিয়ে-ছিলেন, বই বেডিড কোম্পানী ডাঃ রায় এবং তাঁর আত্মীয়দের দেড় লক্ষ টাকা বোকসান দেখেছে, অথচ কিনা

বিধান সভার ইতস্ততঃ

হেডাপের, কিনা প্রশ্নে কোম্পানীটি সরর্থ হেডেনি সাহায্যপুষ্ট হলে এবং কলাকৌশলে তার জন্য কারবারা করে দেওয়ারও বাবস্থা হয়েছে। যে নিজের সভার জন্য একদম আমার মনে আছে, তখনকার তাঁর স্তবাবিদ্ধ Precise বক্তৃতার বিকল্প, তথ্য এবং আবেগে মিশিয়ে-নিবিদে অভিযোগটিকে পুরাপুরি ওজন দিয়ে খাঁড় করিয়েছিলেন। সেই পুরাতন অভিযোগের সমুখে তাঁর বাদকে ঐ তিন অসুত: একবার বলে হয়েছিল, অত্যন্ত ক্ষুদ্র, দুর্বল একটি লোক। মজবার সে কথা মনে হয়নি। ডবিষ্যতে যাহা ইতিহাস পড়বে তাদের জন্য মজবার সেকথা মনে হয়নি। অসুত: একটা দিনও বিধানসভার কার্যা-বিবরণীতে লেখা থাকুক তো, ডাঃ রায় দুর্নীতির অভিযোগের জবাব দিতে সর্বথ হয়েছিলেন।

সভায় সদাচরণ এবং সৌজন্যের একটা পুথা তৈরী করা হচ্ছে এর, চেয়ে ভাল কথা আর কিছু নেই। এমন কি ডাঃ রায় করেকদিন পূর্বে—দীঘক বরবটের বীরাগের পরে—সভা দাঁড়িয়ে কমুনিষ্ট নেতা শ্রীমোহাড় বসুকে ধন্যবাদ দিয়েছেন। এমন অভাবিত কাণ্ড, বঙ্গ-দেশে ছিতীবার ঘটেনি। এবং ঘটার পরেও এখনও কংগ্রেস পার্লামেন্টারী পার্টির বেশ দায়িত্বশীল লোককেও পর্যন্ত বলছেন, "এতো ডাঃ রায়ের উচিত হয়নি। সভায় দাঁড়িয়ে জ্যোতিবাবুকে পুশংসা করার কি দরকার ছিল ?" এটা আমি সাধারণ সদস্যের উক্তি উদ্ধৃত করিনি, একদম অভিজ্ঞ সদস্যই একথা বলেছেন। আসলে সরকার এবং বিরোধীপক্ষের মধ্যে সম্পর্কের কোনো উন্নতি হয়েছে, কিংবা নূতন সৌহদ্য-নীতি পুতিষ্ঠিত হয়েছে—আমার তো অন্তত: একথা মনে হয় না। বর্তমানি শীকারের আবহে অনেক বৃহৎ সংস্কার চলছে (এই ধরণের ঘটনাকে তো প্রায় বিপুবই বলা যায়॥) বিরোধী-পক্ষের নেতাকে বেতন দেওয়ার জন্য বিল আনা হচ্ছে, বিধান-সভার ছোটখাট কাজ-কারবার দুই পক্ষের মধ্যে পরামর্শক্রমে স্থির হয়ে যাচ্ছে, ডিভিশান কেউ একবারের বেশী দুইবার চাইতে না এবং শীকার অনুরোধ করলে ইহাপোল পুণবিধি হচ্ছে। এবং বিরোধী-পক্ষের নেতা দুীযুক্ত বসু শীকারের পুতি যে পুশংসা বহনভূতি পোষণ করেন, একথা চাদবিবের সভার কার্যবিবরণী

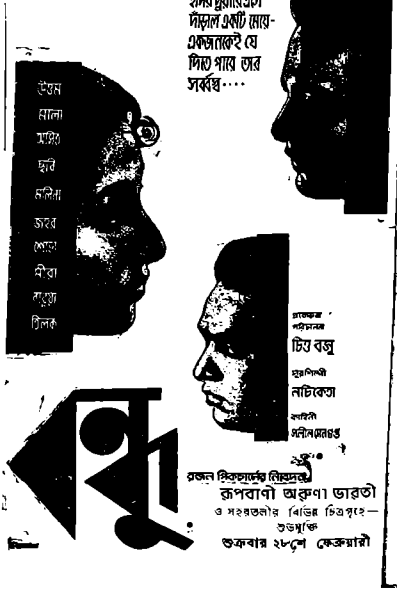

রঞ্জন শিল্পচক্রের নিবেদনে
রূপবাণী অরুণা ভারতী
ও সহশুতলীর বিভিন্ন চিত্রগৃহে—
শুভমুক্তি
শুক্রবার ২৮শে ফেব্রুয়ারী

মৌলানা আজাদ স্মরণে—

মৌলানা আবুল কালাম আজাদের পরলোকগমনে ভারত এক অসাধারণ রাজনীতিকের মহান নেতৃত্ব থেকে বঞ্চিত হল। তিনি ভারতের শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন—এ পরিচয় তাঁর কর্মজীবনের সামান্যতম অংশকেই স্পর্শ করে। ভারতের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণে অর্ধশতাব্দীকাল ধরে তিনি একটা প্রচণ্ড শক্তিরূপে দাঁড়িয়েছিলেন; এবং এটাই ছোকরি তাঁর শ্রেষ্ঠ পরিচয়।

ধর্ম, দর্শন ও ইতিহাসে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী এবং আরবী, ফারসী ও উর্দু ভাষায় সুলেখক ও বক্তা মৌলানা আজাদ ছিলেন হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের বড় প্রতীক। বহুবার গান্ধীর বক্তৃতার পর থেকে জাতির যে-কোন সঙ্কটমুহূর্তে মৌলানা যাহের শ্রীনেহরুকে সরবোচ্চ কর্তব্য সম্পাদনে নির্ভীক ভাবে পরামর্শ দিতে কখনও পশ্চাদপদ হন নি। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কোন কোন বিষয়ে মতান্তর ঘটলেও কখনও তা মতান্তরে বা সংঘর্ষে পরিণত হয় নি। শ্রীনেহরুর হিসাবে মৌলানা আজাদের শূন্য স্থান যথার্থই পূর্ণ হবে; কিন্তু আন্তরিক ও আন্তর্জাতিক ব্যাপারে নীতি নির্ধারণে শ্রীনেহরুর নির্ভীক সরামর্শ-দাতা হিসাবে তিনি যে স্থান অধিকার করে ছিলেন, তাঁর সে শূন্যস্থান পূর্ণ হবার নয়।

●

ভারতের রাজনৈতিক মঞ্চে গান্ধীজীর আবির্ভাবের বহু পূর্বেই মৌলানা আজাদ বুকি সংগ্রামের দুনিয়ায় আজাদের পূর্বের পথের যাত্রী হয়েছিলেন। নিন্দা ও প্রশংসাকে অবিচল থেকে, সাম্প্রদায়িক নেতাদের বিদ্বেষ ও হুমকী উপেক্ষা করে তিনি নিঃসঙ্কচিত্তে নিঃসঙ্গ সে পথে যাত্রা করেছিলেন। বাঙলার মাটিতেই আজাদের অগ্নিময়ী বীক্ষা হয় যখনী আন্দোলনের প্রভাবে ও পট-ভূমিকায়। তারপর পূর্বের পথে তাঁর যে যাত্রা শুরু হয়, সে পথে রাজরোষ, অন্তরীণ ও কারাবরণকে মুক্তিসাধনার আশীর্বাদরূপে মস্তকে ধারণ করে তিনি এগিয়ে গেছেন।

১৯১২ সালে তিনি প্রকাশ্য রাজনীতিতে যোগদান করেন। মাত্র ২৩ বৎসর বয়সে তিনি 'আল-হেলাল' পত্রিকা প্রকাশ করেন। এতে বর্ধমুচারের সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতি সম্বন্ধেও তাঁর বলিষ্ঠ মতামত পুচ্চ হতে থাকে। ভারতের আদর্শ যে পূর্ণ স্বাধীনতা একথা ঐ পত্রিকায় ঘোষণা করে তিনি বহু নেতাদের পথিকৃত হন, তাতে বৃটিশ নিয়ন্ত্রে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। ১৯১৪ সালে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাঙলা সরকার মৌলানা আজাদকে বাঙলা দেশ থেকে বহিষ্কার করেন। যুদ্ধশেষে, গুজব ও ঘোষাই সরকারও তাঁদের রাজ্যে তাঁর প্রবেশে নিষিদ্ধ করেন। ১৯১৫ সালে তাঁকে রাঁচীতে অন্তরীণ করা হয় এবং দীর্ঘকাল অন্তরীণে আবদ্ধ থাকার পর ১৯২০ সালে যুদ্ধ শেষে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়।

●

রাজনৈতিক মঞ্চে গান্ধীজীর আবির্ভাব এবং অহিংসা ও অসহযোগের পথে স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনাতেই মৌলানা আজাদ পুনরায় গান্ধীজীর নেতৃত্বে সে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

মৌলানা আজাদ ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলন এবং ১৯৩০ ও ১৯৩২ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করে কারাবরণ করেন। ১৯৪০ সালে ভারত রক্ষা আইনে গ্রেপ্তার হয়ে তাঁকে ১৮ মাস কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়। ১৯৪২ সালে 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে তিনি অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে গ্রেপ্তার হন। এরপর দীর্ঘ কারাভোগের পর ১৯৪৫ সালের ১৫ই জুন তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। রাজদ্রোহের লাঞ্ছনা ও দীর্ঘ কারাযন্ত্রণা মৌলানা আজাদের ব্যক্তিস্বভাবিত ধাতু দেহে অথবা বলিষ্ঠ মনে এতটুকু তাঁর আনতে পারেনি।

●

কংগ্রেস সভাপতিরূপে ক্রমতা হস্তান্তরের শেষমুহূর্ত পর্যন্ত মন্ত্রিমিশনের সঙ্গে অখণ্ড ভারতের দাবী নিয়ে তিনি লড়াই চালিয়েছিলেন। সে লড়াই ব্যর্থ হলেও, জাতির ইতিহাসে তাঁর ভূমিকা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

●

একদিকে ক্ষুরধার মেধা ও বাগ্মিতা, অন্যদিকে অকুতোভয় সত্যনিষ্ঠা ও বাস্তববুদ্ধি অচিরে তাঁকে সংগ্রামের পুরোভাগে ঠেলে দেয়। সাম্রাজ্যবাদী বিদেশী শাসকের পৃষ্ঠপোষকতায় বুলবীর দীপ ক্রমশঃ প্রবল হয়ে উঠেছে এবং তাদের পাকিস্থানের দাবীও দুর্বার হয়ে উঠেছে। বিদ্বেষও উত্তেজনার দুর্যোগঘন অন্ধকারে অনেক আদর্শ বাদীরও পদস্খলন ঘটেছে। কিন্তু সত্যনিষ্ঠ মৌলানা কিছুতেই বিচলিত হন নি। স্বাধীনতা সংগ্রামের একনিষ্ঠ সেবক ও বীর যোদ্ধা মৌলানা আজাদ কখনও সাম্প্রদায়গত স্বার্থের অনুযাতকে দেশ ও জাতির আদর্শ বলিন হতে দেন নি।

●

স্বাধীনতা লাভের পর মৌলানা আজাদের উপর কেন্দ্রীয় শিক্ষা দপ্তরের ভার ন্যস্ত হয়। শিক্ষামন্ত্রী হিসাবে তাঁর স্মরিত্ব নিয়ে যোগ্যতার সঙ্গে পালন করেছেন। শিক্ষামন্ত্রী হিসাবে দেশের শিক্ষা সংস্কার এবং শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর চেষ্টায় তাঁর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। তাঁর বহিত্বকালে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রাণ্টস কমিশন, বুলাচারি কমিশন ও আরও কয়েকটি কমিশন বসানো হয়। এ ছাড়া উচ্চ, মধ্য ও প্রাথমিক শিক্ষার মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধানের জন্যেও প্রস্তুতির কাজ অনেকখানি এগিয়ে যায়। তাঁর সময়েই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের শতবার্ষিক জন্মোৎসবটিকে কেন্দ্রীয় সরকারের চতুরবধানে এনে একে বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

মৌলানা আজাদের মৃত্যুতে ভারতের রাজনীতি থেকে যে শূন্যতা সৃষ্টি হবে তা সহজে পূরণ হবার নয়।

আমরা তাঁর বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

শ্রীনেহরুর উষ্মা

(১৩৯ পৃষ্ঠার পর প্রকাশের পর)

কৃষ্ণমাচারীর সমালোচনা করতে চাইছেন, তাঁর উপরই শ্রীনেহরু মারমুখী হয়ে উঠছেন। কৃষ্ণমাচারীকে তিনি নির্দেশ দানে ভাড়িয়ে করেছেন। চাগলা-কমিশনের তদন্ত শেষ হবার আগেই কৃষ্ণমাচারীর নির্দোষিতা সম্পর্কে তিনি বার বার প্রকাশ্যে বলেছেন। সাধারণ লোক এ রকম বললে তো তাঁকে আদালত অবমাননার দায়ে ঝুলিয়ে দেওয়া হত বা সৌজন্যজ্ঞানবর্জিত বলে দণ্ড কণা শুনিয়ে দেওয়া হত।

কৃষ্ণমাচারীকে শ্রীনেহরু যে চিঠি লিখেছিলেন এবং যে চিঠি তিনি নিজেই প্রকাশ করেছেন, তাতে বিচারপতি চাগলা ও এ্যাটর্নী জেনারেল শ্রীনীতলবাদের সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য শুধু সৌজন্যবর্জিত ও রীতিবিরুদ্ধই নয়, গণতন্ত্রের পক্ষেও অত্যন্ত ক্ষতিকর। হাই-কোর্টের বিচারপতিকে নিয়ে গঠিত তদন্ত কমিশন, বিশেষ করে যে কমিশন কোন একটি অন্যায় কাজের জন্যে একজন মন্ত্রীকেই দায়ী করেছেন, সেই কমিশন সম্পর্কে প্রধান মন্ত্রী যে রকম অসৌজন্যমূলক মনোভাব প্রকাশ করেছেন, তাতে এই ধরণের কমিশনের প্রতি ভবিষ্যতে জন-সাধারণও যদি আস্থাবান না থাকেন, তাহলে জাতির পক্ষে একটি বিপজ্জনক ব্যাপার হবে। তা ছাড়া দেশের প্রধান মন্ত্রী ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা যদি কমিশনের রায় নিজেদের মনঃপুত না হলে, প্রকাশ্যে তার বিরুদ্ধ সমালোচনা করতে থাকেন, তাহলে ভবিষ্যতে আর ভাল ভাল লোক, মর্যাদাজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিরা তদন্ত কমিশনে আসতে চাইবেন না। ফলে, তদন্ত কমিশনগুলি তখন প্রহসনে পরিণত হবে এবং জন-সাধারণও তার উপর আস্থা হারিয়ে ফেলবে। এবং তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হবে সর-কারের দপ্তরগুলিতে দুর্নীতি ও জাতির স্বার্থবিরোধী কার্য-কলাপের প্রসার। আর ভারতের দুর্ভাগ্য, এই রকম তদন্ত কমিশন বসাবার প্রয়োজন অদূর ভবিষ্যতে শেষ হয়ে যাবে বলে নিশ্চিন্ত হবারও কোন কারণ আপাততঃ দেখা যায় না।

চাগলা কমিশনের রিপোর্ট সম্পর্কে শ্রীনেহরু যে কথাগুলি চটে আছেন, তার একটা বড় প্রমাণ পাওয়া যায় রাজ্যসভায় পণ্ডিত কুঞ্জরুর উপর তাঁর অহেতুক আক্রমণের ঘটনা থেকে। মনে হয়, শ্রীকৃষ্ণমাচারীকে সমস্ত রকম সমালোচনা থেকে ঢেকে রাখার জন্য তিনি যেন অতিমাত্রায় মারমুখো হয়ে আছেন। পণ্ডিত কুঞ্জরু একজন বীর নির্বিরোধ ব্যক্তি; তাঁর উপরও শ্রীনেহরু রেগে গেছেন, তাঁর কথাও সহ্য হচ্ছেন্না। রাজ্যসভায় পণ্ডিত কুঞ্জরু মোটামুটি যা বলতে চেয়েছিলেন, তা হল,—কমিশন অর্থমন্ত্রীকেই কার্যতঃ দায়ী বলে রায় দিয়েছেন এবং সরকারেরও তা স্বীকার করে নেওয়া উচিত। চাগলা কমিশনের রিপোর্ট সরকার সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করুন। সরকারের ব্যবস্থান অসামাধারণের মনে এই ধারণার সৃষ্টি হয়েছে যে, বাস্তবপক্ষে সরকার নিজেকে অপ্রাধিগুলির সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারেননি—সরকার রিপোর্ট অগ্রাহ্য করার ভাব দেখাচ্ছেন। ডাঃ কুঞ্জরু আরও বলেছিলেন যে, কমিশন পুনরায় তাঁর সাক্ষ্য গ্রহণ করেননি বলে শ্রীকৃষ্ণমাচারী দুঃখ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু সরকার বা কৃষ্ণমাচারী যদি পুনরায় সাক্ষ্য দেওয়ার জন্যে প্রার্থনা না করে থাকেন, তবে কমিশন দোষী নন। পণ্ডিত কুঞ্জরু এই কথার পর প্রধান মন্ত্রী তাঁর বক্তৃতায় অভিযোগ করেন যে, পণ্ডিত কুঞ্জরু শ্রীকৃষ্ণমাচারীকে 'বেকায়দায়' ফেলার চেষ্টা করছেন। প্রধান মন্ত্রীর এই উক্তির পর ডাঃ কুঞ্জরু সাথে তাঁর এই নিয়ে তীব্র বাদানুবাদ হয়। ডাঃ কুঞ্জরু জোর দিয়ে বলেন, যে প্রধান মন্ত্রী যে ধারণা করেছেন, তা সম্পূর্ণ অসত্য; সুতরাং প্রধান মন্ত্রীর তাঁর মন্তব্য প্রত্যাহার করা উচিত। শ্রীনেহরু তাঁর মন্তব্য প্রত্যাহার করেননি।

চাগলা কমিশনের রিপোর্ট লোকসভার পেশ করে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু যে বক্তৃতা করেছেন, তাতে একটি বিষয়ে একটি বড় নীতির প্রশ্ন এসে পড়েছে। তিনি বলেছেন যে, একজন মন্ত্রী তাঁর অধীনস্থ অফিসারদের কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন কি না, সে সম্পর্কে তাঁর নিশ্চিত ধারণা নেই। কিন্তু সমগ্র দেশের স্বার্থে এই প্রশ্নের একটি সুনির্দিষ্ট মীমাংসা হওয়া দরকার। মন্ত্রী তাঁর অফিসারের কাজের জন্যে কতখানি দায়ী হবেন, তার একটি সীমারেখা নির্দিষ্ট হওয়া একান্ত আবশ্যক। কারণ, তাহলে মন্ত্রী অফিসারের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে সরে পড়তে পারবেন না (যা প্রায়ই হয়ে থাকে); আর অফিসারও মন্ত্রীর সুস্পষ্ট নির্দেশ ছাড়া, নিজের থেকেই আগ বাড়িয়ে গিয়ে মন্ত্রীর স্বজনদের নানাবিধ সুবোগ সুবিধের তোষণ করে বা মন্ত্রীর বিশেষ বিশেষ স্বার্থ রক্ষা করে পদোন্নতি, বা চাকুরীতে এক্সটেনশন, বা রিটায়ার করার পর পুনর্নিয়োগের ব্যবস্থা পাকা করার কাজে অন্ততঃ কিছুটা ইতস্ততঃ করবেন।

মুন্সী জীবনবীমা কর্পো-রেশন কেলেঙ্কারী প্রকাশিত হবার পর চারদিকে মুন্সীর বিরুদ্ধে নানাবিধ মামলা, তদন্ত ইত্যাদি সুরু হয়ে গেছে। স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে, এই একটি লোকের এত সব অপরাধ এত দিন চাপা ছিল কি করে এবং কেন? বিভিন্ন ফেত্রে ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা কি এতদিন বধির ছিলেন, এবং হঠাৎ তাঁদের চৈতন্যোদয় হল? না, তাঁরা জেনেশুনেও চুপ করে ছিলেন এবং এখন নিজেদের বাঁচাবার জন্যে নাটাবাড়ি সব উৎপর হয়ে উঠেছেন? অথবা ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মুখ বন্ধ ছিল অথবা ক্ষমতাবান কোন উর্ধ্বতন মহলের চাপে? যা-ই হোক এই সব প্রশ্নের উত্তর জানা দরকার এবং তার জন্যে প্রতোকটিরা পারেই সরকার তদন্তের ব্যবস্থা করুন। তাহলে অনেক মূল্যবান তথ্য প্রকাশিত হবে আশা করা যায়।

চিনাকুড়ি কয়লাখনি দুর্ঘটনায় দুর্গতদের মর্মান্তিক অবস্থা

সাহায্যদানকল্পে রাজ্যপাল কর্তৃক তহবিল গঠন

(দর্পণের প্রতিনিধি)

চিনাকুড়ি কয়লাখনি দুর্ঘটনা একটা ভয়াবহ ব্যাপার। ভয়ঙ্কর দুটি কারণে—প্রথমতঃ হতাহতদের সংখ্যা ও দ্বিতীয়টি হ'লো যে এটি এমন একটি কয়লাখনি যে এখানে সর্বাধিক পরিমাণে বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

ভারত সরকারের লেবার মিনিষ্টার শ্রীনন্দ বলেছেন যে সর্বপ্রকার নিরাপত্তার ব্যবস্থা থেকেও এ দুর্ঘটনা কেন যে ঘটলো সে সম্বন্ধে শীঘ্রই তদন্ত করা হবে। তদন্তের পর হয়তো জানা যাবে যে এ বিস্ফোরণের জন্য কে বা কারা দায়ী।

চিনাকুড়ির স্থানীয় লেবার ইউনিয়নের নেতারা কেহ কেহ আমাকে বলেছেন যে ঐ খনি দুর্ঘটনার দিন প্রথম নিম্নতর খনি-শ্রমিকেরা কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছিল যে ঐ খনিতে কোন এক স্থানে বিশেষ পরিমাণে গ্যাস জমা হয়েছে। এটা কতদূর সত্য তা' হয়তো সঠিক জানা যাবে শ্রীনন্দর ঘোষিত তদন্ত কমিশনের কার্য সুরু হ'লে।

এই খনি দুর্ঘটনার ভয়ঙ্কর রূপকে মর্মান্তিক করে তুলেছে হতাহতদের পরিবারবর্গের ক্রন্দনরোল।

শ্রীনন্দ যখন খনিশ্রমিকদের কোয়ার্টারে উপস্থিত হয়েছিলেন, তখন দেখেছি তাঁকে এক হৃদয়-বিদারক অবস্থার সম্মুখীন হতে। একজন বৃদ্ধশ্রমিক লুটিয়ে পড়লো নাটিতে আর চেচিয়ে বলতে লাগলো যে, সে তার ছেলে হারিয়েছে এই খনিদুর্ঘটনায়। আরও জানালো যে মাত্র তিনদিন পূর্বে তার এই মৃত পুত্রের একটি শিশুপুত্র জন্মেছে তার গোত্রখুঁজের বাড়ীতে।

এমনি করে কাঁদতে দেখলাম অনেক স্বামীহারা স্ত্রী, পুত্রহারা জননী এবং পিতাহারা শিশুসন্তানদের।

সরকার এবং কোম্পানী কর্তৃপক্ষ এদের ক্ষতিপূরণ দিচ্ছেন ও দেবেনও ঠিকই; কিন্তু এ টাকায় তাদের অপূরণীয় ক্ষতি মিটবেনা। তারা পাবেনা তাদের হারানো আত্মীয়-স্বজনদের ফিরে; কিন্তু টাকার পরিমাণ কিছুটা বেশী পেলে তাদের সাময়িক আর্থিক সমস্যার হয়তো কিছুটা সমাধান হবে।

রাজ্যপাল একটি সাহায্য তহবিল গঠন করেছেন, এ দুর্গত পরিবারদের জন্য। ১০০০, এক হাজার টাকা তিনি নিজে দিয়েছেন। এবং তাঁর হেফাজতে যে 'নন্-অফিসিয়াল চ্যারিটি ফাণ্ড' আছে তা থেকে দিয়েছেন ৪০০০, হাজার টাকা।

তিনি জনসাধারণকে সাহায্য তহবিলে তাদের সাধ্যমত টাকা পাঠাবার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। সাহায্য পাঠাবার ঠিকানা —ষ্টেট ব্যাঙ্কের যে কোন শাখা, অথবা রাজ্যপাল বা রাজ্য-পালের সেক্রেটারী, রাজভবন।

ক্রীড়া-জগৎ ঃ—

তৃতীয় শ্রেণীর খেলোয়াড়ের রাষ্ট্রীয় মর্যাদা

জাতীয় সংগ্রহশালায় নূতন উপাধিতে ভূষিত পদ্মভূষণ বিজয় আনন্দ

গত সাধারণতন্ত্র দিবসে রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ ভারতের অনেক বিশিষ্ট সন্তানের সঙ্গে বিজয়নগরের মহারাজকুমার বিজয় আনন্দকেও উপাধি ভূষণে সম্মানিত করেছেন। উপাধি লাভের ক্ষেত্রে বিজয় আনন্দের ভাগ্য খুবই সুপ্রসন্ন, একালে ও সেকালে রাষ্ট্রের পতিদের দাক্ষিণ্য লাভে তিনি বঞ্চিত হন নি। ইংরেজ আমলে তিনি ছিলেন স্যর আর স্বাধীন ভারতে হলেন পদ্মভূষণ।

ভারতের খেলাধুলার জগতে বিজয় আনন্দ সুপরিচিত, একাধারে পরম ক্রীড়ামোদী ও খেলাধুলার বিশিষ্ট পৃষ্ঠপোষক। খেলাধুলার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান নাকি অবিস্মরণীয়। এই অবদানের স্বীকৃতিতেই রাষ্ট্রপতি তাঁকে মর্যাদাভূষিত করেছেন।

অলোক মুখার্জি

ক্রীড়াক্ষেত্রে বিজয় আনন্দের অবদানের দুই দিক আছে। তাঁর কীর্তি কিছু যেমন আছে, তেমনি অপকীর্তিও রয়েছে যথেষ্ট। এই দুটি দিকই আজ কিঞ্চিৎ যাচাই করা প্রয়োজনীয় এই জন্যে যে সত্য উদ্‌ঘাটিত হলে বোঝা যাবে যে কোন পর্যায়ের ক্রীড়াবিদরা আজ রাষ্ট্রপতিপ্রদত্ত মর্যাদায় ভূষিত হতে চলেছেন। ভবিষ্যতে বাতাস কোন দিকে বইতে পারে, বিজয় আনন্দের উপাধি প্রাপ্তির দৃষ্টান্ত থেকে তা অনুমান করা শক্ত নয়। এরপর যদি কোনো কুশ্যাত ও অসৎ ক্রীড়াজগতের কর্ণধারকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সম্মানিত হতে দেখি আমাদেরও বোধকরি বিস্মিত হবার কিছু ঘটবে না। কারণ লালা অমরনাথের ভাষায় যিনি জীবনে কখনো সোজা ব্যাটে খেলেননি অর্থাৎ জীবনে যিনি কখনো সোজা পথে চলেননি, তিনিও আমাদের দেশে বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ তথা 'স্পোর্টসম্যান' রূপে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক স্বীকৃত।

ধনীর দুলাল বিজয় আনন্দ, পিতৃপুরুষের সঞ্চিত অর্থের কিছু অংশ ব্যয় করে খেলাধুলার পৃষ্ঠপোষক সাজবার চেষ্টা তাঁর নিষ্ফল হয়নি। এককালে বিদেশ থেকে কয়েকজন নামকরা খেলোয়াড় আনিয়ে তিনি একটা দলও গঠন করেছিলেন। বিদেশের প্রখ্যাত খেলোয়াড়েরা এসে পড়ায় ভারতে ক্রিকেট খেলার প্রসার ও উন্নয়নের পথ কিছুটা সুগম হয়েছে সন্দেহ নেই, তবে বিজয় আনন্দের এই চেষ্টা এক কীর্তি হিসেবে অভিনন্দিতও হয়েছে, একথা অস্বীকার করবো না।

ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি

তবে এই কীর্তিকে মূলধন করে তিনি নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধ করতে বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করেননি। পৃষ্ঠপোষক বনে যাবার ফলেই ভারতীয় ক্রিকেট নিয়ন্ত্রণ সংস্থার কর্মকর্তাপদে কায়েমী হয়ে বসার সুযোগ তিনি সহজে পেয়েছেন, পেয়েছেন বিদেশে ভারতীয় দলের নেতৃত্ব করার দুর্লভ অধিকার; যে অধিকার অনেক দিক্‌পাল খেলোয়াড় যার সি কে নাইডু পর্যন্ত পান নি। এবং সে অধিকার বিজয় আনন্দের মতো ব্যক্তি পাওয়ার ফলে তাঁর নেতৃত্বে ইংলণ্ড সফরকালে ভারতীয় দলের দায়িত্বিক আচরণে যে কলঙ্কময় অধ্যায় রচিত হয়েছিল যা এতদিনে ক্রীড়ামোদীদের মন থেকে মুছে গেল না।

ক্রিকেট বোর্ডে বিজয় আনন্দ ও তাঁর সমগোত্রীয়দের অনুপ্রবেশে এই ক্রীড়াসংস্থাটি গোপন রাজনীতির লীলাভূমিতে পর্যবসিত হয়েছে, সেখানে আজ ঠাঁই পান না সত্যিকারের তথা দিক্‌পাল খেলোয়াড়েরা, কিন্তু সেকথা থাক্, বিজয় আনন্দের ভূমিকাই আমাদের আলোচ্য।

ভিজ্জির কীর্তি ও অপকীর্তি

আগেই বলেছি যে বিজয় আনন্দের কীর্তি আছে, অপকীর্তিও রয়েছে। নিক্তির ওজনে যাচাই করলে কোনদিক ভারে ঝুঁকে পড়বে সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁর ভূমিকার মূল্যায়নে উপরতলার দৃষ্টিতে এই সব অপকীর্তি ধরা পড়লো না, এইটিই দুঃখের কথা। এই একদেশদর্শিতার যে সত্য চাপা পড়ে যাবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে সেই সত্যকে অন্ততঃ একবারের জন্যেও তুলে ধরা উচিত, উচিত দর্পণের সামনে পদ্মভূষণ বিজয় আনন্দকে মুহূর্তের জন্যে দাঁড় করানো।

বিজয় আনন্দ সংক্ষেপে 'ভিজ্জি' নামেই পরিচিত। ১৯৩৬ সালে অনেক যোগ্য ও দিক্‌পাল খেলোয়াড়কে ডিঙিয়ে তিনি ইংলণ্ড সফরকারী ভারতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়কের পদ দখল করে বসেছিলেন। ইংরেজ আমলের সেদিনে দাসমনোভাবসম্পন্ন ভারতীয় ক্রিকেট নিয়ন্ত্রণ সংস্থার বিচারে সাধারণ খেলোয়াড়দের কোনো মূল্য ছিল না, দলের নেতৃত্ব করার জন্যে কোনো রাজা, মহারাজা বা নবাবের প্রয়োজন দেখা দিত এবং সেই প্রয়োজন মিটোতেই ভিজ্জিকে সাজানো হয়েছিল অধিনায়করূপে।

ইংলণ্ড সফরের কেলেঙ্কারী

খেলোয়াড় হিসেবে ভিজ্জির ভূমিকা যাই হোক না কেন রাজার জাতের দৃষ্টিতে রাজকুমার ভিজ্জির নিজস্ব পরিচয় ছিল। তাই তাঁকে জাতে তুলে ভারতের মর্যাদা বাড়াবার কিঞ্চিৎ আঁচা হয়। কিন্তু ভিজ্জি নিজের আচরণেই সে সংকল্প ধূলিসাৎ করে দিয়েছিলেন। ইংলণ্ডে গিয়ে তিনি সমস্ত অর্থাৎ তিনটি টেষ্ট ম্যাচে দলের পক্ষে খেলে সর্বসাকুল্যে রাণ করলেন তেত্রিশ, দুর্বিনীত ব্যবহারে দলের অন্য অনেক সদস্যের কাছে অপ্রিয়ও হাস্যাস্পদ করে তুললেন এবং ইংরেজ ম্যানেজার বৃটেন জোন্সের সঙ্গে সলা-পরামর্শ এঁটে সেদিনের উঠতি তারকা লালা অমরনাথকে ইংলণ্ড থেকে তাড়িয়ে স্বদেশে ফেরৎ পাঠিয়ে আবার লোক হাসালেন।

১৯৩৬ সালে ভারতীয় ক্রিকেট দলের ইংলণ্ড সফরের কেলেঙ্কারীর কথা রাষ্ট্রপতি ভুলে গিয়েছেন কিন্তু ভুলতে পারেননি অনেকে, তাঁদের মধ্যে অন্যতম অষ্ট্রেলিয়ার বিশিষ্ট ক্রীড়ামোদী বিল কার্ডসন। কালসন পঞ্চাশ বছরেরও বেশী কাল বিদেশ সফররত দলের সঙ্গে ঘোরায় ছিলেন ও সদস্যদের মালপত্রের তত্ত্বাবধায়ক রূপে জড়িত ছিলেন অর্ধশতাব্দী ধরে বিভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন খেলোয়াড়দের সান্নিধ্যে এসে তাঁদের সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। এই অভিজ্ঞতা থেকে অনেকের সম্পর্কে বলতে গিয়ে ভিজ্জি সম্পর্কে তিনি যা বলেছিলেন তা আমি উদ্ধৃত করলাম।

●

'ভিজ্জি খেলোয়াড় ছিলেন না, তাঁকে দেখে মনে হয়েছে যে তিনি বুঝি আরব্যোপন্যাসের এক চরিত্রবিশেষ। ব্যক্তিগত প্রয়োজনে মালবোঝাই ছত্রিশটি ট্রাঙ্ক ও দুজন ভৃত্য তিনি সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন। ভৃত্য দুজন মালের খবরদারি করতো, ভিজ্জিকে জামাকাপড় পরিয়ে দিত আর রাত্রে শয়নকক্ষের সামনে মেঝেতে পড়ে থেকে তাকে পাহারা দিতো। ভিজ্জি মনে করতেন যে আমিও বুঝি তাঁর মাইনে করা চাকর, তাঁকে জামাকাপড় পরিয়ে দেবো অথবা খাওয়া দাওয়ার পর যখন তিনি বিছানায় এলিয়ে ঝিমুবেন তখন তামাক সেজে গড়গড়ার নলটি তাঁর দিকে এগিয়ে দেবো। ভিজ্জির সাজ-পোষাকের বহর দেখে অন্যেরা বিস্মিত হোতো। সফরের মাঝামাঝি ভিজ্জি কয়েকজনকে নিয়ে দল ছেড়ে প্যারিসে গিয়েছিলেন প্রমোদ ভ্রমণে।

স্মরণ থাকতে পারে যে ১৯৩৬ সালের সেই সফরে বাংলার বিখ্যাত খেলোয়াড় শুঁটে ব্যানার্জিকে কোনো টেষ্টম্যাচে খেলতে দেওয়া হয়নি, যদিও সফরে শুঁটে ব্যানার্জীর চেয়ে মাত্র দুজন খেলোয়াড় বেশী সংখ্যক উইকেট পেয়েছিলেন।

১৯৩৬ সালে লোক হাসাবার পর ভিজ্জি এখনও লোক হাসিয়ে চলেছেন। সম্প্রতি তাঁকে বেতার ভাষ্যকারের ভূমিকায় দেখা যাচ্ছে। তিনি যখন ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি ছিলেন তখনও তাঁকে টেষ্টম্যাচের ধারাবিবরণী দেবার চেষ্টায় ব্যস্ত থাকতে দেখেছি। বোর্ডের সভাপতি থেকেও ভারতীয় দলের সদস্যরা কেমন খেলছেন সে সম্পর্কে মন্তব্য করতে তাঁর শালীনতা ও রুচিবোধে বাধেনি। এর পর খেলোয়াড়েরা যদি বোর্ড সভাপতির কাজের সমালোচনা করতেন তাহলেই বা তাঁদের দোষ দিতো কে?

ক্লাউনের ভূমিকা

বেতার ভাষ্যকার হিসেবে ভিজ্জিকে মনে হয়েছে পুরোপুরি একটি ক্লাউন। সর্বদাই উত্তেজিত কণ্ঠে চীৎকার জোড়া, ঘটনার সঙ্গে তাল না রেখে বকে চলা, খেলা না বুঝেই অজস্র বেফাঁস কথা বলা এবং মাঝে মাঝে ভিজ্জি নিজে যে এক সময় খেলেছেন বা ভারতের নেতৃত্ব করেছেন সেই প্রসঙ্গটি অতি উচ্চরোলে জাহির করাই তাঁর স্বভাবসিদ্ধ প্রক্রিয়া। শুনেছি যে উপরতলায় ভিজ্জির যাতায়াত আছে, ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অনেক সদস্য তাঁর বিশেষ বন্ধুস্থানীয়, তাই বেতার প্রোগ্রাম পাওয়ায় তাঁর বিশেষ দাবী জন্মে গিয়েছে এবং আমাদেরও ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে সেই দাবীর জের মেটাতে হচ্ছে।

●

কমনওয়েলথ ক্রিকেট দলের ভারত সফরের সময় দিল্লীতে টেষ্টম্যাচ চলার সময় এক অনুষ্ঠানে দলীপ সিংজী ও ভিজ্জি বেতারে ধারা বিবরণী দিয়েছিলেন। সে বিবরণী শুনে সত্যিকারের অন্যতম সেরা ভারতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড় বিজয় মার্চেন্ট কি বলেছিলেন শুনুন:—

"একজন অর্থাৎ দলীপ সিংজী হলেন বিশ্ববিশ্রুত ক্রীড়াবিদ, সত্যিকারের সমালোচক, তাঁর তথ্যবহুল কথোপকথন উপভোগ্য। আর অপর ব্যক্তিটি নিজেই জানেন না যে 'লেগকাটার' ও 'আউটসুইং' বলের মধ্যে পার্থক্য কি এবং কোথায়। দলীপ সিংজীর পাশে ভিজ্জি শুধু ছেলেমানুষীই করেছেন, নিজেকে হাস্যাস্পদ করে তুলেছেন এবং তথ্য উদ্‌ঘাটনে মারাত্মক ভুলও করে বসেছেন। দলীপ সিংজী ও ভিজ্জিকে ক্রিকেট সম্পর্কে এক অনুষ্ঠানে কথা বলার সুযোগ দেওয়ার মানেই এক গাড়ীতে রেসের ঘোড়ার সঙ্গে একটি অশ্বতর জুতে দেওয়ার চেষ্টা।"

●

বেতারে ভিজ্জির মুখে তাঁর নিজের প্রশস্তি শুনে মার্চেন্ট আরও বলেছিলেন, "ভারতের ক্রীড়ামোদীরা জানেন যে কোন পরিস্থিতিতে একজন তৃতীয় শ্রেণীর খেলোয়াড় শুধু ভারতের পক্ষে খেলেই ক্ষান্ত হননি, সরকারী সফরে ভারতের নেতৃত্ব করে নিজেকে ও ভারতীয় ক্রিকেটকে হাস্যাস্পদ করে তুলেছিলেন। ভিজ্জি বলে কেউ কোনো দিন ভারতের পক্ষে খেলেছিলেন, ভারতীয় দলের নেতৃত্ব করেছিলেন একথা ভারতবাসী ভুলে যেতে চায় কিন্তু অদৃষ্টের এমনই পরিহাস যে সুযোগ পেলেই ভিজ্জি স্বয়ং সেকথাটি বারে বারে মনে করিয়ে দেন।"

বিজয় মার্চেন্ট খাঁটি কথাই বলেছিলেন। অদৃষ্টের পরিহাস ছাড়া আর কি। নইলে ভিজ্জির মতো একটি ভূষণকে আদরে যত্নে জাতীয় সংগ্রহশালায় সজ্জিত করে রেখে দেওয়াকে স্বয়ং রাষ্ট্রপতিই বা এমন উৎসাহ দেখাবেন কেন।

ভারতে নব্য রসায়নের পথিকৃৎ
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

কপোতাক্ষ নদের একটা বিশেষ মাহাত্ম্য আছে। তার ছায়াচ্ছন্ন তীর লালন করেছে অমিত্রছন্দের কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত আর ভারতীয় রসায়নে রেনেসাঁর স্রষ্টা আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়কে। দুজনের ভাবজগৎ ও কর্মধারার মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। বাংলার নবজাগৃতির ইতিহাসে উভয়েই অবিস্মরণীয়। মাইকেলের প্রতিভা বাংলা কাব্য সাহিত্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ। প্রফুল্লচন্দ্রের কর্মপ্রয়াসের এক ব্যাপকতর সার্থকতা রয়েছে, তিনি উদ্দীপ্ত করেছিলেন প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞান সাধনার স্তিমিতপ্রায় দীপশিখাকে।

মনোজ রায়

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ; নানা দৃষ্টিকোণ থেকে ভারত-উপলব্ধির প্রয়াস চলছে। সিপাহী বিদ্রোহের পরবর্তী অধ্যায়; রাষ্ট্রীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছে সারা দেশ। তার স্ফুলিঙ্গ বুঝি লেগেছিল প্রফুল্লচন্দ্রের মনেও। হেয়ার স্কুল, এলবার্ট স্কুল ও মেট্রোপলিটন কলেজে ভাষা, সাহিত্য ও ইতিহাস অধ্যয়নের মধ্যেই তাঁর মনে বিজ্ঞানের প্রতি অনুরাগ জেগে উঠলো। প্রেসিডেন্সী কলেজের বিজ্ঞান শ্রেণীতে যোগ দিয়ে তিনি পরম আগ্রহে পদার্থ ও রসায়ন শাস্ত্রে বক্তৃতা শুনে যেতে লাগলেন। পৃথিবীর বিজ্ঞান সমাজে ভারতবর্ষ তখন ব্রাত্য। এ কলঙ্ক দূর করবার সংকল্পই প্রফুল্লচন্দ্রের মানসিক রূপান্তরের মূল। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে গিলক্রাইষ্ট বৃত্তি নিয়ে তিনি বিজ্ঞান শিক্ষার উদ্দেশ্যে ইংলণ্ডে এলেন। বিজ্ঞান সাধনাকে তিনি জীবনের মূল মন্ত্র রূপে গ্রহণ করেননি—তাঁর সব কিছু কর্মপ্রয়াসকে সঞ্জীবিত করেছে স্বদেশপ্রেম—তা না হলে ইংলণ্ডের বুকে বসে "সিপাহী বিদ্রোহের পূর্বে ও পরে ভারতের অবস্থা" এবং "ভারত ও বৃটিশ শাসন" এই দুই পুস্তিকার মধ্য দিয়ে ইংরেজ শাসকের অপকীর্তির নগ্ন রূপ তুলে ধরেছিলেন কোন দুঃসাহসে।

এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষালাভ করেন অধ্যাপক টেইট্ ও ক্রাম ব্রাউনের কাছে। সতীর্থ ছিলেন জেমস্ ওয়াকার, আলেকজাণ্ডার স্মিথ প্রমুখ খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিকগণ। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে রসায়নশাস্ত্রে গবেষণার ফলস্বরূপ এ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টর অব্ সায়েন্স ডিগ্রী নিয়ে তিনি ফিরে এলেন দেশে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ভারতীয়গণের মধ্যে ইতিপূর্বে একমাত্র অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় (সরোজিনী নাইডুর পিতৃদেব) এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনুরূপ ডিগ্রী পেয়েছিলেন।

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের জুনমাসে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের রসায়ন বিভাগে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এ কলেজে রাসায়নিক গবেষণার সূত্রপাত করেন অধ্যাপক পেড্লার। কিন্তু তাতে তরুণ ছাত্রদের মনে কোন বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা জাগেনি। অধ্যাপনার মধ্যে প্রফুল্লচন্দ্রের কর্ম প্রয়াস সীমাবদ্ধ রইলো না। প্রথম দিকে তিনি এ দেশের ঘি, তেল ইত্যাদির খাদ্যমান নির্ধারণের চেষ্টা করেন এবং এ সম্পর্কে একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধও প্রকাশিত হয় এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে কলেজের নতুন বিজ্ঞানাগারে প্রফুল্লচন্দ্র গবেষণা সুরু করলেন। প্রথম পর্যায়ে তিনি কতকগুলি দুর্লভ ভারতীয় ধাতু বিশ্লেষণ করেন, আশা ছিল যদি কোন নতুন পদার্থের সন্ধান পাওয়া যায়। এমনি বিশ্লেষণের মধ্যেই মারকিউরাস্ নাইট্রেটের আবিষ্কার যার ফলে প্রফুল্লচন্দ্রের রাসায়নিক জীবনে অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন ঘটলো। পারদের সঙ্গে নাইট্রিক এসিডের ক্রিয়ায় হলুদ রঙের এ যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি হয়। আনুষঙ্গিক আরো অসংখ্য যৌগিক পদার্থের আবিষ্কার রসায়ন জগতে এক মৌলিক অবদান। এ সম্পর্কে সমসাময়িক জার্নালে শতাধিক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এ আবিষ্কৃতির জন্য রস্কো, ডাইভার্স, বার্থেলো, ভিক্টর মেয়ার, ফলহার্ড প্রমুখ খ্যাতনামা রাসায়নিকগণ প্রফুল্লচন্দ্রকে অভিনন্দিত করেছিলেন। বার্থেলো লিখেছিলেন, "আপনার গবেষণার চিত্তাকর্ষক ফলাফলের সংবাদে পুলকিত হয়েছি। ইয়োরোপ ও আমেরিকার ন্যায় এশিয়াখণ্ডেও যে বিজ্ঞানের সার্বভৌম ও নৈর্ব্যক্তিক রূপের সমাদর ও চর্চা চলেছে তা জেনে আনন্দ হল।"

১৯২২ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত 'কংগ্রেস অব্ দি য়ুনিভার্সিটিস্ অব্ দি এম্পায়ার'-এ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব করেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ও স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী। এ সম্মেলনে আচার্য রায় দেশীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে অবহেলিত বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণার কথা বলেন। তাঁর নাতিদীর্ঘ ভাষণে তরুণ ভারতীয় বিজ্ঞানিগণের প্রতিশ্রুতিরও উল্লেখ ছিল। এ সময় ডারহাম্ বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁকে ডক্টর অব্ সায়েন্স ডিগ্রি দিয়ে সম্মানিত করা হয়।

ভারতীয় রাসায়নিকগণের গবেষণা আজ যে সার্বদেশিক স্বীকৃতি পেয়েছে তাঁর মূলে প্রফুল্লচন্দ্রের একক গবেষণার অবদান কম নয়। কিন্তু তাঁর অবদানের মহত্তর সার্থকতা অন্যত্র নিহিত। মোগল ও ইংরেজ শাসনের ফলে ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষ যে অবস্থায় এসে পৌঁছেছিল তাকে এককথায় বলা যায় অতীত সভ্যতার জীবাশ্ম। প্রাচীন ভারতবর্ষে বিজ্ঞান অনুশীলনের মহত্তর বিকাশের কাহিনী মনে হত জনশ্রুতি। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের লাইব্রেরী, তাঞ্জোরের লাইব্রেরী, কাশীর লাইব্রেরী ও বৃটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত প্রাচীন পুঁথিপত্রের জীর্ণ পাতা থেকে উপকরণ নিয়ে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র লিখলেন হিন্দু রসায়ন বিদ্যার ইতিহাস—বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের বিগত মহিমার প্রামাণ্য নিদর্শন। তিনি এ মহান সৃষ্টিকর্মের অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন বিখ্যাত ফরাসী বৈজ্ঞানিক বার্থেলোর কাছ থেকে। ইংলিশম্যান, পায়োনিয়ার, টাইমস অব ইণ্ডিয়া, নলেজ, নেচার, আমেরিকান কেমিক্যাল সোসাইটি জার্নাল, আরকাইভস ফর দি হিষ্ট্রী অব সায়েন্স জর্নাল্ দি সাভাণ্ট প্রভৃতি অসংখ্য পত্রিকায় এ বিষয় রচনার সপ্রশংস সমালোচনা বেরিয়েছিল। হায়ম্যান, সেলেক, আলেকজাণ্ডার বার্টেক, আরহেনিয়াস্, কন্ লিপম্যান প্রমুখ পণ্ডিতবর্গ তাঁদের গ্রন্থে এ হিন্দু রসায়নের ইতিহাস থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করেছেন। রসায়ন বিজ্ঞানে, ভারতবর্ষের অতীত উৎকর্ষ এর মধ্যে দিয়ে স্বীকৃতি পেয়েছে।

অতীত মন্থন করেই আচার্য রায় বিরত হননি, রসায়ন বিজ্ঞানে গবেষণার ক্ষেত্রে তিনি রেনেসাঁ এনেছিলেন—এ শুধু ভাবপ্রবণতার অর্থহীন উচ্ছ্বাস নয়। সে রেনেসাঁ-উত্তর যুগে ভারতবর্ষে নব্য রসায়নের যে উদ্দীপ্তি তার মূলে রয়েছেন এক অনন্যপ্রতিভার অধিকারী শিষ্যগোষ্ঠী যা প্রফুল্লচন্দ্রের সৃষ্টি। এ নব্য রাসায়নিক গোষ্ঠী ও তাঁদের গবেষণায় ভারতবর্ষে রাসায়নিক রেনেসাঁর যে বলিষ্ঠ ইঙ্গিত দেখা দিয়েছিল সে সম্বন্ধে বিলাতের প্রসিদ্ধ জার্নাল নেচারে এক আলোচনা প্রকাশিত হয়। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দ; বিজ্ঞান কলেজ তখন সৃষ্টির পথে, স্যার আশুতোষের আহ্বানে প্রফুল্লচন্দ্র সরকারী কাজ থেকে অবসর নিয়ে পালিত অধ্যাপক রূপে বিজ্ঞান কলেজে যোগ দিলেন। এ সময় নব্য রাসায়নিক চক্র বহুতর তরুণ কৃতী শিষ্যে পূর্ণ হয়ে উঠে। উত্তরকালে তাঁদের বহুমুখী গবেষণার ধারা বিদেশে খ্যাতি লাভ করেছে। রসিকলাল দত্ত, নীলরতন ধর, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, মেঘেন্দ্র কুমার সেন, পঞ্চানন নিয়োগী, প্রফুল্ল চন্দ্র মিত্র, প্রিয়দারঞ্জন রায়, পুলিনবিহারী সরকার প্রমুখ খ্যাতিমান উত্তরসাধকগণের অনেকেই আজ লোকান্তরিত। ভারতবর্ষে রাসায়নিক গবেষণার মানোন্নয়নে তাঁদের অবদান অনস্বীকার্য। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটি প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে আচার্য রায় ভারতবর্ষের রসায়ন বিজ্ঞানী ও তাঁদের কর্মধারাকে কেন্দ্রীভূত করেন।

ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর অসাধারণ বৈদগ্ধ ও চিন্তাশীলতার স্বাক্ষর রয়েছে অসংখ্য প্রবন্ধ ও গ্রন্থে।

(শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায়)

পশ্চিম এশিয়া সংবাদ

ইরাক-জর্ডন সংহতি

(দর্পণের পর্যবেক্ষক)

মিশর আর সিরিয়ার সংহতির খবর প্রকাশিত হতে না হতেই, আরব রাষ্ট্রগোষ্ঠীর আরও দুটি রাজ্য ইরাক ও জর্ডনের মিলনের সংবাদ বিশ্ব-রাজনীতিতে এবং বিশেষ করে প্রাচ্য ভূখণ্ডে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করবে সন্দেহ নেই। একমাত্র বাগদাদ চুক্তির অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রগুলি ছাড়া, প্রাচ্যের প্রায় আর সব দেশেরই এতে খুসি হবার যথেষ্ট কারণ আছে। পশ্চিমী শক্তিরা সম্ভবতঃ ইরাক-জর্ডন সংহতিকে সুনজরে দেখবেনা, যদিও তাদের কেউ কেউ বাহ্যত এই সংহতিকে অভিনন্দন জানিয়েছে।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু রাষ্ট্রে বিভক্ত প্রাচ্য দেশে এই ধরণের সংহতির ফলে প্রাচ্যের মোট প্রতিরোধ শক্তি যথেষ্ট বৃদ্ধি পাবে এবং সেই কারণেই প্রাচ্যদেশীয়রা এই ধরণের সংহতিতে উৎসাহিত ও আশান্বিত হবে। কিন্তু পশ্চিমী শক্তির চালে এবং প্রাচ্য দেশে তাদের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখার স্বার্থে যে সব রাষ্ট্র পশ্চিমী শক্তির মুখ চেয়ে বাগদাদ জোটে ঢুকেছে তারা আরব জাতীয়তাবাদের এই প্রসারকে তাদের স্বার্থের পরিপন্থী মনে করবে। ইরাক-জর্ডন সংহতির সংবিধান অনুযায়ী যদিও উভয় রাষ্ট্রই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকবে এবং তাদের আগেকার আন্তর্জাতিক চুক্তি মেনে চলতে পারবে, তথাপি উভয় রাষ্ট্রের একই মিলিত সৈন্য বাহিনী গঠিত হলে এবং পরস্পরের আদান-প্রদানের ফলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বা চুক্তির ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন মত ও বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে চলা কি করে সম্ভব, তা রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের বিশেষ লক্ষণীয় বস্তু হবে। বাগদাদ চুক্তির সমালোচক জর্ডনের সাথে হাত মিলিয়ে ইরাক আর বেশী দিন বাগদাদ চুক্তির মধ্যে থাকবে কিনা, সে বিষয়ে বিভিন্ন মহলে যোরতর সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে।

ওয়াশিংটন থেকে ইরাক-জর্ডন সংহতিকে অভিনন্দন জানানো হয়েছে, কিন্তু ইরাক বাগদাদজোট থেকে বেরিয়ে যেতে পারে, এমন সম্ভাবনায় আমেরিকার পররাষ্ট্র দপ্তর বিশেষ উদ্বিগ্ন আছেন। লণ্ডনের রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা এই সংহতির 'কমনুরা' দেখে বিস্মিত হয়েছেন। এমনকি, ইরাক যদি বাগদাদ জোট থেকে বিদায় নেয়, তাহলে মধ্য প্রাচ্যে বৃটেনের মর্যাদা কতখানি ক্ষুণ্ণ হবে, তা নিয়েও সেখানে জল্পনা-কল্পনা সুরু হয়েছে।

বাগদাদ চুক্তির সমর্থকরা যেমন এক দিকে ইরাকের মতি-গতি সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হয়েছে, ঠিক তেমনই আবার বাগদাদ চুক্তির বিরোধীরাও জর্ডনের ভবিষ্যৎ নীতি সম্পর্কেও চিন্তান্বিত হয়েছে। তারা ভাবছে যে, বাগদাদ জোটের মধ্যে থেকে ইরাক যদি কোন শক্তিশালী শত্রুর কবলে গিয়ে পড়ে, তাহলে সম্মিলিত সৈন্য বাহিনীর মধ্যে জর্ডনের সৈন্যরা সরে থাকবে কি করে? মিশর এবং সিরিয়ার সংহতির নায়ক প্রেসিডেণ্ট নাসের ইরাক-জর্ডন সংহতিকে অভিনন্দন জানিয়েছেন বটে, কিন্তু কায়রোর প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া খুব উৎসাহব্যঞ্জক নয়। কায়রো এই সংহতির উভয় রাষ্ট্রকেই "পশ্চিম ঘেঁষা" বলে মনে করে এবং সেই কারণে এই সংহতি "আরবের জাতীয় স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করতে পারে" বলে সন্দেহ প্রকাশ করেছে।

ইরাক-জর্ডন ফেডারেশনের জন্যে যে ১২ দফা চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে, তার সঙ্গে মিশর-সিরিয়া চুক্তির যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে।

ইরাক-জর্ডন ফেডারেশনের দ্বার যে কোন আরব রাষ্ট্রের জন্যে খোলা থাকবে। ইরাকের রাজাই এই ফেডারেশনের প্রধান হবেন, আর তাঁর অনুপস্থিতিতে জর্ডনের রাজা তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবেন। উভয় রাজ্যের মধ্যে বাণিজ্য শুল্ক বাতিল করা হবে, মুদ্রায় একীকরণ হবে এবং আর্থিক নীতির সংহতিবিধানের জন্যে চেষ্টা করা হবে। ফেডারেশনের রাজধানী বাগদাদ এবং আম্মানে ছয় মাস করে থাকবে। এই ফেডারেশনের জনসংখ্যা হবে ৬০ লক্ষের বেশী।

অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে পর পর দুটি রাষ্ট্রের সংহতির ফল নিকট ভবিষ্যতে যাই হোক না কেন, দূর ভবিষ্যতে সম্মিলিত বৃহত্তর আরব রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করতে এই দুটি সংহতির অবদান সুদূরপ্রসারী হবে, আশা করা যায়।

সমবায়ী সমাজতন্ত্র

[অম্লান দত্ত]

এশিয়া ও আফ্রিকার সদ্য-স্বাধীন দেশগুলিতে পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রের প্রবর্তন করা হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে এ ব্যবস্থার সফলতার সম্বন্ধেও প্রশ্ন উঠেছে: গণতান্ত্রিক পরীক্ষা কতদূর সম্ভবনাময়? এ প্রশ্নের উত্তর নির্ভর করছে যে অবস্থায়, এই সমস্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে তার উপর।

এই অবস্থার দুটি দিক আছে। যে সব দেশের কথা বলছি তারা সকলেই অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য ব্যস্ত। কোন কোন দেশ আবার শিল্পপ্রসারের কাজেও অগ্রসর। প্রতিটি দেশে সমাজের মধ্যেও জাতি, ধর্ম, ভাষা প্রভৃতির ভিত্তিতে নানা বিভাগ রয়েছে। মালয়ে তিনটি প্রধান জাতি হচ্ছে মালয়ী, চীনা ও ভারতীয়। ভাষাও নানা দলে বিভক্ত পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানকে আলাদা করে রেখেছে ভাষা। ভারতেও স্বাধীনতার কিছু আগেপরে হিন্দু মুসলমানের ঝগড়াই ছিল সবার উপরে। এখন ঝগড়া চলছে ভাষা নিয়ে। কোন কোন জায়গায় জাতিভেদ নিয়ে। এই সমস্ত দেশেই সরকারের লক্ষ্য হচ্ছে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে সংগঠন করা। আর সেই সঙ্গে অর্থনৈতিক উন্নয়নের কাজ চালিয়ে যাওয়া।

পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রে পার্টির কথা আছে। তা এক পার্টি হতে পারে। একাধিক পার্টির কোয়ালিশনও হতে পারে। এক পার্টি বা কোয়ালিশনের হাতে ক্ষমতা থাকবে। আর অন্য এক বা একাধিক পার্টির কোয়ালিশন হবে বিরোধী দল। ক্ষমতালাভের রাজনৈতিক পথ তাদের জন্যও খোলা থাকবে। নির্বাচনে জয় লাভ করলে তারাও হবে ক্ষমতার অধিকারী। সরকারী পার্টি তখন ক্ষমতামুক্ত হয়ে বিরোধী দল হতে পারবে। কতকগুলো বিষয়ে খেয়াল রেখে সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালনা করতে পারবে। কিন্তু কথা হচ্ছে যে বিরোধীদল যখন স্বাধীন ভাবে সরকারের বিরুদ্ধে যেতে পারবে তখন অর্থনৈতিক উন্নয়নের সরকারী পরিকল্পনা কতদূর কার্যকরী হবে।

বিরোধীদল অনায়াসেই উন্নয়নের কাজ কঠিনতর করে তুলতে পারেন। অর্থনৈতিক উন্নয়ন মানেই সমাজের উপর চাপ। কিছু লোক উন্নয়নের কাজ চলার সময় ভুগবে। অবশ্য কল্পনা করতে বেশ লাগে যে যাকে আমরা 'কায়েমী স্বার্থের' লোক বলি দুর্ভোগটা শুধু তাঁদের মধ্যেই সীমিত করা যাবে। আসলে সাধারণ লোকই কিন্তু ভুগবে বেশী। কতটা ভুগবে তা নির্ভর করে উন্নয়ন নীতির উপর ও আরও কয়েকটা জিনিষের উপর। সংখ্যাগুরু শ্রেণীর লোক আরামে উচ্চতর অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় পৌছে যাবে তা সম্ভব বলে মনে হয় না। উন্নয়নের কাজ শুরু হওয়ার সঙ্গে কিছু কিছু কারিগরী কাজ বা পদ্ধতি পুরান হয়ে যায়। এ সব কাজে যাঁরা নিযুক্ত, নতুন ধরণের কাজ বা পদ্ধতি গৃহীত হলে তাঁদের দশা হয় করুণ। নতুন ধরণের অভ্যাস এবং কায়দা কানুন চালানোর প্রক্রিয়াটা মোটেই সহজ নয়। নতুন নীতিশাস্ত্র সৃষ্টি হয়। তার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে অনেক গণ্ডগোল বাধে। কাজেই শিল্প প্রসারের প্রথম অবস্থায় কিছু ত্যাগ প্রয়োজন। অন্যদিকে একই সময়ে আবার নতুন ক্ষুধাও আসে। খুব কম লোকই হাসিমুখে সব সহ্য করতে পারেন। অর্থনৈতিক উন্নয়নের সময়টা স্বর্ণযুগ নয়।

বিরোধী দল যদি কাজে বাগড়া দিতে চান সহজেই তা পারেন। অর্থ-নৈতিক উন্নয়নের শুরুতে তা তেমন কঠিনও নয়। বিভিন্ন গোষ্ঠির স্বার্থ রক্ষার বুলিতে নানা দল এগিয়ে আসতে পারে। প্রত্যেক দল মনে করতে বা করাতে পারেন তাঁদের ওপরই চাপ পড়ছে সব চেয়ে বেশী। দেখাতে পারেন এ চাপ কমাবার জন্য সরকারী নীতি কেমন সহজেই বদলান যায়। অর্থনীতিজ্ঞরা বলবেন কিছু চাপ ত অবশ্যম্ভাবী। আর জনকল্যাণের দোহাই দিয়ে নিজ পেশার ভ্রাতৃবৃন্দের জন্য নানা সুবিধার দাবী করবেন। বিরোধীদলের নেতা যথেষ্ট কুশলী হলে এ সমস্ত অসন্তোষের সুযোগ নিয়ে ক্ষমতা লাভ করা তাঁর পক্ষে বিশেষ কঠিন হয় না। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নতুন বিরোধীদল আবার পুরানদের সব সুবিধাই পাবেন।

একটা বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা দরকার। অর্থনৈতিক উন্নতি নির্ভর করে মূলধন যোগাড়ের উপর। অথবা উৎপাদন শক্তির ক্রমবৃদ্ধির উপর। তার মানে বর্তমান চাহিদার দিকে নজর না দিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সরিয়ে রাখতে হবে। চাষীকে তার উৎপাদনের সবটা খরচ করতে দেওয়া হবে না। তাকে বলতে হবে কিছু বাঁচাতে, কিছু লগ্নী করতে। তাকে করও দিতে হবে। এইভাবে সরকার সমগ্র সমাজের পক্ষ থেকে কিছু মূলধন লগ্নী করতে পারবেন। বেশীর ভাগ দেশেই দেখা গেছে যে চাষীর থেকে নেওয়া কর বা উদ্বৃত্তই শিল্প প্রসারের অন্যতম সহায়। শ্রমিকদের, তেমনি এমনভাবে বেতন দিতে হবে যাতে বেশ কিছুটা অর্থ ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করার জন্য পাওয়া যায়। ধনিকদের বলতে হবে যে তাঁরা একটু কৃচ্ছ্রসাধন করুন। কিন্তু এসব কথা বলাই সহজ। করান কঠিন। তার উপর ব্যাপারটা কঠিনতর হয়েছে অন্য কারণে। ধরা যাক্ দেড়শো বছর আগে পশ্চিমী দেশগুলিতে উৎপাদনের হার বর্তমানে অনুন্নত দেশগুলির মতই ছিল। কিন্তু তাদের সেই সময়ের ট্রেড ইউনিয়ন বা অন্যান্য গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে এ কথা বলা চলে না। অন্ততঃ একই মাপকাঠি ব্যবহার করা যায় না। তাই অর্থনীতিতে পিছিয়ে-থাকা কিন্তু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এগিয়ে-যাওয়া দেশের উন্নয়নের জন্য নতুন পদ্ধতি দরকার।

একটা সম্ভাব্য পথ হচ্ছে স্বাধীন ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে খতম করা। গণতন্ত্রকে পঙ্গু না করে এ সম্ভব নয়। সঠিক পথ হচ্ছে শ্রমিকদের বিশ্বাস করা। তাদের নিয়ে যুক্ত পরামর্শদাতা সমিতি গঠন করা। আর সেই সমিতির পরামর্শ মত নীতি নির্ধারণ করা। এইভাবে একটা সমবায়ী রাষ্ট্র গঠন করা। আসলে এই যুক্ত পরামর্শের নীতিটা আরও কিছুদূর এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। যেমন বিরোধীদলের প্রতিনিধিরা সরকারী পক্ষের সঙ্গে পরামর্শ করে সম্ভবমত যুক্ত নীতি নির্ধারণ করতে পারেন। যে সব দেশে গণতন্ত্রের পরীক্ষা সবে শুরু হয়েছে সেখানে দুটি জিনিষ দেখা দরকার। প্রথম মতান্তর এবং বিরুদ্ধ মত প্রকাশের গুরুত্বপূর্ণ গণতান্ত্রিক অধিকার। দ্বিতীয় আপোষ আলোচনায় সেই মতান্তরকে অতিরঞ্জিত না হতে দেওয়া। এটাও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

অন্যথায় গণ্ডগোল এবং যে ন্যূনতম সামাজিক স্থিতি গণতন্ত্রের ভিত্তি তার ইতি। আগেই বলেছি আলোচ্য দেশগুলিতে জাতিগত ও সম্প্রদায়গত বিভেদ অত্যন্ত তীব্র। রাজনৈতিক বিরোধ অনায়াসে সাম্প্রদায়িক হয়ে উঠতে পারে। রাজনৈতিক ক্ষমতার জন্য লড়াই গৃহযুদ্ধে পরিণত হতে পারে। এর জন্য গণতন্ত্র অনেক সাহায্য করতে পারে। গৃহযুদ্ধের অত্যন্ত সম্ভাব্য ফল হচ্ছে হয় বিশৃংখলা না হয় সামরিক একনায়কত্ব। অতএব গণতান্ত্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হওয়ার অন্যতম শর্ত কী? না, গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এমন কতকগুলি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে বা এমন ভাব সঞ্চার করতে হবে যাতে সামাজিক সূত্রগুলি ঐক্যবদ্ধ হয়, শক্তিশালী হয়। সংক্ষেপে সমবায়ী সমাজতন্ত্রের এই পথ।

দুটি বিভিন্ন দিক থেকে এই ধরণের সমাজতন্ত্র ব্যাহত হতে পারে। প্রথম আস্তে আস্তে তা ফ্যাসিস্ত রাষ্ট্রের মত হয়ে যেতে পারে। একধরণের সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের প্রচার হতে পারে। তাতে বিরুদ্ধ মতের প্রকাশ জাতীয়তা-বিরোধী বলে চিহ্নিত হতে পারে। শাসকদের পার্টি মনে করতে পারেন এ সব মত চেপে রাখা দরকার। স্বাধীন মানুষদের মধ্যে দায়িত্বপূর্ণ সমবায়ের আদর্শ থেকে এ হবে বহুদূর। এ হবে জাতীয় পর্যায়ে উপজাতীয়বাদ।

দ্বিতীয়, আঘাত আসতে পারে গোঁড়ামি থেকে। যেমন "শ্রেণী-বিভক্ত" সমাজে সত্যিকারের সমবায় সম্ভব নয়। এই মতাবলম্বীরা এক কথা সত্যের ভিত্তিতে সামাজিক অসন্তোষের পাহাড় তুলেছেন। অর্থনৈতিক প্রগতির সময় এটা স্বাভাবিক। কিন্তু প্রত্যেক শিল্পোন্নত সমাজেই একদল লোক লগ্নীর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত করেন। আরও বৃহত্তর এক দল ব্যবস্থাপনার কাজকর্ম চালান। এই কাজের জন্য যে এঁদের পারিশ্রমিক দিতে হয় এ কথাটা বিশেষভাবে স্মরণ করান প্রয়োজন। সমাজতান্ত্রিক সোবিয়েত রাষ্ট্রে তাঁদের জীবনযাত্রার মান নিঃসন্দেহে উচ্চ। এ কথা অবশ্য স্বীকার্য যে ধনতান্ত্রিক দেশে, এমন কি এশিয়ার অনেক অনুন্নত দেশে একদল লোক যা রোজগার করেন তার সঙ্গে তাঁদের কাজের সামাজিক মূল্যের কোন সম্বন্ধ নেই। এগুলি খতম করা দরকার। গণতন্ত্রেই তা সম্ভব। পেশার দিক দিয়ে একটা শ্রেণী বিশেষ হয়। কিন্তু সেই শ্রেণীগত মানুষগুলি বিশেষ নয়। তাঁরা নতুন ধরণের নতুন কাজ করতে পারেন। অনেক সময় করেনও। কোন এক সময়ে হয়ত একজন নিজের অভ্যাসমত পেশার জন্য বা "কায়েমী" স্বার্থের জন্য লড়তে পারেন কিন্তু নতুনতর পেশা গ্রহণের স্বাধীনতা তার থাকে। সমাজের প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন দিকে তাঁর ঔৎসুক্য জাগতে পারে।

এইভাবে কোন একশ্রেণীর প্রধান সভায় এমন কাজ করেন যাতে আস্তে আস্তে সেই শ্রেণী লুপ্ত হয়। এটা স্বীকার করার জন্য ধরে নিতে হবে না যে মানুষ কখনো কখনো নিজের স্বার্থ-বিরোধী কাজও করে। এটুকু ধরে নিলেই যথেষ্ট যে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি ক্ষেত্রান্তরেও প্রয়োগ করা যায়। আর কখনো কখনো তার দূরদৃষ্টি মানুষকে চালিয়ে নেয়। গণতন্ত্রের মৌল উপাদান হচ্ছে যুক্তিতে এবং মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির নমনীয়তাতে বিশ্বাস।

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় বিরোধী দলের বিরোধিতা করার অধিকার থাকা চাই। কিন্তু পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রের ঝোঁক হচ্ছে এই অধিকারকে কর্তব্যে পরিণত করা। অনুন্নত দেশগুলিতে অনেক গঠনমূলক কাজ রয়েছে। যেমন অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য মৌল সামাজিক মূলধন সৃষ্টি। এ ধরণের কাজে সব পার্টিরই সহায়তা দরকার। এ সত্য স্বীকার করে অনেকে "পার্টিহীন রাজনীতির" কথা ভাবছেন। নতুন ব্যবস্থায় পার্টি অবশ্যই থাকবে। কিন্তু তা রূপ নেবে বেসরকারী ক্লাব বা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের। এগুলির কাজ হবে মাঝে মাঝে সময়োচিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির আলোচনার ব্যবস্থা করা। পার্লামেণ্টের সদস্যরা হবেন শুধু মানুষ। তাঁদের আত্মেরী দায়িত্ব নিজেদের দেশের কাছে, নিজের নির্বাচনী কেন্দ্রের কাছে এবং নিজের বিচারবুদ্ধির কাছে। পার্লামেণ্ট কর্তৃক নির্বাচিত এক স্টিয়ারিং কমিটি তৈরী করা যেতে পারে। কমিটি কাজ করবে সম্পূর্ণ সমবায় নীতিতে। এই কমিটি পার্লামেণ্টের কাজের নির্দেশ দিতে পারে। সদস্যরা প্রতিটি প্রশ্ন নিজেদের বিচারবুদ্ধি দিয়ে বিবেচনা করে দেখবেন সকলের জন্য সবচেয়ে উত্তম ব্যবস্থা কী হতে পারে। পার্টিচালিত রাষ্ট্রে প্রত্যেকেই নিজের পছন্দমত পার্টিতে যোগ দিতে পারেন। কিন্তু সিদ্ধান্ত করার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ পার্টির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে যায়। জড়িয়ে পড়ে। যেমন উপজাতিরা দলে জড়িয়ে থাকে। আর প্রতিটিপার্টি এই বাধ্যতাকে গৌরবমণ্ডিত করার জন্য সব রকম কাজ করতে প্রস্তুত। পার্টিহীন রাজনীতিতে সব সময়েই খেয়াল রাখতে হয় যে মানুষের দায়িত্ব তার নিজের বিচারবুদ্ধির কাছে এবং দেশের জনসাধারণের কাছে। মানুষের আত্মা ও গণতন্ত্রের দেবতার মধ্যে মধ্যস্থতা করার কেউ নেই। এ সব কথা অনেকেই হয়ত স্বীকার করতে চাইবেন না। কিন্তু "পার্টিহীন রাজনীতির" ধারণাটা বর্তমান প্রয়োজনের সঙ্গে খাপ খায়। অন্যথায় গণতন্ত্র সফল নাও হতে পারে।

উপরে যে আলোচনা করা হল সংক্ষেপে তা এই। শিল্পপ্রসারের সময় জনসাধারণের উপর আর্থিক চাপ পড়ায় সমাজের ধ্বংসমূলক শক্তিগুলি সক্রিয় হতে চেষ্টা করে। যে সমাজে ভাষা জাতি ইত্যাদির বিভেদ প্রচণ্ড সেখানে এই শক্তিগুলি সামাজিক ঐক্যের পথে বাধা হয়। এই অবস্থায় পার্টিচালিত রাজনীতি প্রবর্তনের ফলে সামাজিক বন্ধন শিথিল হয়ে যেতে পারে যদি সঙ্গে সঙ্গে সমবায়ের দায়িত্বের উপর জোর না দেওয়া হয়। বা প্রয়োজনীয় সংস্থা অথবা নীতির ভিত্তিতে যদি সমবায় না গড়ে ওঠে। সমবায়ী সমাজব্যবস্থার বাধা হচ্ছে গোঁড়ামি। একদল অন্ধভাবে মানুষের স্বাধীনভাব যাথার্থ্যে অবিশ্বাসী। অন্যদল ঘোষণা করেন গৃহযুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। অর্থনৈতিক অনুন্নত দেশে যাঁরা গণতন্ত্রের এই বিরাট পরীক্ষার সফলতা কামনা করেন তাঁদের আশু কর্তব্য হচ্ছে এই ধরণের বিশ্বাস নষ্ট করা এবং এমন ধরনের নীতি নির্ধারণ করা বা সংস্থা গঠন করা যাতে সমাজব্যবস্থায় সমবায় পদ্ধতি সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করা যায়। *

* ইংরাজী থেকে

—ডলারের দেশে বেকার সংখ্যার নূতন রেকর্ড সৃষ্টি

(দর্পণের প্রতিনিধি)

আমেরিকার অর্থনৈতিক ফানুষ চুপসে যেতে আরম্ভ করেছে। ফলে দেশজুড়ে বেকারসমস্যা দেখা দিয়েছে। বর্তমানে ৪০ লক্ষের মত লোক বেকার। গত যুদ্ধের পর কখনো এত লোক এক সঙ্গে বেকার হয়নি। আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থার অবস্থাটাকে 'আশংকাজনক' বলা হয়েছে।

ডিসেম্বর মাসে আমেরিকার বিভিন্ন রাজ্যগুলি মাসে মোট ২১০ লক্ষ ডলার বেকারী ভাতা দিচ্ছিল। তখন বেকারের সংখ্যা ছিল ২০ লক্ষ। জানুয়ারী মাসের শুরুতে বেকারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩০ লক্ষে। গড়পড়তায় প্রত্যেককে সপ্তাহে ৩০ ডলার করে ভাতা দেওয়া হয়। বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন হার চলে। যেমন লুসিয়ানায় প্রত্যেককে সপ্তাহে ২৫ ডলার দেওয়া হয়। নিবাডায় দেওয়া হয় ৫৭ ডলার। এর তুলনায় কারখানার একজন কর্মী রোজগার করেন সপ্তাহে ৮৩ ডলারের মত। বেকার সমস্যা তীব্র হয়ে উঠেছে দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের কূলে নিউ ইংলণ্ডে, এবং পেনসিলভানিয়া, মিচিগান ও নিউ জার্সির কয়েকটি বড় বড় শিল্পপ্রধান শহরে।

দেশে উৎপাদন কমে গেছে শতকরা ৮ ভাগ। ব্যক্তিগত রোজগার কমেছে শতকরা এক ভাগ। অবশ্য এটা এমন কিছু নয়। কিন্তু ব্যক্তিগত খরচটা যেমন উদ্দামভাবে বাড়ান হচ্ছিল তার তুলনায় এটা কিছু বেশি। সব চেয়ে প্রত্যক্ষ হচ্ছে "বিজ্ঞাপনের ডলার" উবে যাওয়া। বড় বড় কোম্পানী বিজ্ঞাপন ব্যয় কমিয়ে দিয়েছেন। আর তা এমন যে, ব্যয় সংকোচ বললে তাকে কিছুই বলা হয় না।

এই সমস্যা সমাধানের জন্য যুক্তরাষ্ট্র সরকার প্রতিরক্ষা বাবদ ব্যয় বাড়িয়ে দিচ্ছেন। ভাবটা এই যে কারখানাগুলো নতুন কাজ পেলে নতুন লোক নিতে পারবেন। প্রেসিডেণ্ট আইজেনহাওয়ার মনে করেন এ বছরের মাঝামাঝিই অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হবে। তাই এবারে প্রতিরক্ষা ব্যয় হবে ২৩ বিলিয়ন ডলার। গত বছর হয়েছিল মাত্র ১৭ বিলিয়নডলার।

এতে আশানুরূপ ফল পাওয়া যাবে কী না তা নিয়ে তর্কবিতর্কের অন্ত নেই। সেদিন যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসের যুক্ত অর্থনৈতিক কমিটিতে অর্থনীতির বড় বড় পাণ্ডা সাক্ষ্য দিয়ে এলেন।

অবস্থা বিশ্লেষণ করে একজন বললেন এই দুরবস্থার আসল কারণ নতুন লগ্নীর অভাব, শিল্পপতিরা নতুন নতুন যন্ত্রপাতি বা প্ল্যাণ্টে আর টাকা ঢালতে পাচ্ছেন না। এই মনোভাব অত্যন্ত ব্যাপক। এর ব্যবস্থা চাই।

অন্যজন বললেন এই মনোভাব এত সংক্রামক যে শুধু নতুন অর্ডার দিয়েই তা আরোগ্য করা যাবে না। নতুন অর্ডারের আশায় শিল্পপতিরা যদি প্রচুরভাবে খরচ না করেন তা হলে কিছুই হবে না।

কেউ বললেন, নিম্ন এবং মধ্যবিত্ত পরিবারের রোজগার নির্মমভাবে ছেঁটে দেওয়া হোক। আর লোককে কিনতে বলা হোক।

আবার কেউ কেউ বললেন, যে ব্যবস্থা করা হচ্ছে তাই যথেষ্ট। এতেই ডলারের দাম অক্ষুণ্ণ থাকবে। ইউ এস চেম্বার অফ কমার্সেরও নাকি এই মত।

কিন্তু আসল কথা হচ্ছে আর্থিক অবস্থার উন্নতি। প্রতিরক্ষার খরচ নয়। এই সামরিক ব্যবস্থা কতদূর কার্যকরী? আর সব চেয়ে বড় কথা নিয়ন্ত্রীকরণ ব্যবস্থায় বিভিন্ন শক্তি যদি একমত হন তখন? অতএব মনে করা যায় যে সে সম্ভাবনা আপাততঃ নেই। এবং এ কথাটা ধরে প্রতিরক্ষার খরচ দিয়ে আশু বিপদ থেকে উদ্ধারের চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু পণ্ডিতরা বলছেন এ ওষুধে যদি কাজ হয়ও তা বোঝা যাবে এ বছরের তৃতীয়াংশে আর তার ফল পেতে পেতে ১৯৫৯ সাল।

এ দিকে বৃটেনেরও সমান দুরবস্থা। অর্থস্ফীতি বন্ধ করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চলেছে। এর সঙ্গে আমেরিকার অবস্থার কোন যোগ নেই বটে। কিন্তু এ বছরের মাঝামাঝি যোগাযোগ ঘটতেও পারে। তখন হবে সোনায় সোহাগা।

যুদ্ধোত্তর বাংলা উপন্যাস

শান্তি বসু

কলেজ স্কোয়ারে বাঙালী সৈনিকদের স্মৃতিফলক সত্ত্বেও আমরা জানি, যুদ্ধ আমাদের জীবনে বা দেয়ালে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত নেই। কথাটা এতোই জানা যে স্বীকারোক্তি হঠোক্তির মতো শোনায়। যুদ্ধই যখন দূরে দূরে এড়িয়ে গেছে, যুদ্ধের প্রভাব সাক্ষাতভাবে পড়ার কথা নয়। সেই অবশ্য কোন্ এককালে নজরুল যুদ্ধসাজে ভারতসীমা পেরিয়েছিলেন আর এ-কালে আমাদের অভিজ্ঞতায় জাপানি বোমা-বোমা কলকাতার হাতিবাগানে। অথচ আমরা যুদ্ধের প্রভাব বিষয়ে যথেষ্ট উত্তেজিত। আমাদের উত্তেজনা সব ব্যাপারে নিশ্চয়ই বেশি, তবু বহু হাত ফেরতায়, তিরিশ সাল থেকেই, আমাদের মননেজাহ যুদ্ধের আঁচ পেয়েছে; য়ুরোপের জীবনজ্বালা নানা সূত্রে আমাদের মনেও আলোড়ন তুলেছে। একদিকে ফ্রয়েডের মনোবিকলনতত্ত্ব ব্যক্তির জীবনে বিকৃত উত্তাল এবং তার আরোগ্যের প্রশ্ন; অন্যদিকে মার্কস গোটা সমাজব্যবস্থাকেই ভেঙে পাল্টে নতুনভাবে [illegible] আরম্ভের কথা বললেন। আমাদের চিন্তার সন্ধানে তখন থেকেই ফ্রয়েড ও মার্কস, ভাঙন ও পুনর্গঠনের [illegible] পেয়ে গেলো। বুঝি বা নাকি কবিতা, গল্প, উপন্যাসে সাবেকী [illegible] পাশাপাশি বা তার প্রতিবাদেই [illegible] লোচার হয়ে ওঠে। [illegible] প্রতিবাদের ভাষা [illegible] জবাব দিলে যে বয়ং [illegible] নয়ে, আধুনিক সাহিত্য [illegible] তিনি ঐতিহ্যের সঙ্গে [illegible] মূল্য যাচাই করতে চাইলেন। [illegible] ঐতিহ্যের [illegible]।

[illegible] মার্কস অবশ্য যুদ্ধের [illegible] যুদ্ধের কথা ছিলেনও [illegible] যুদ্ধ ছাড়াই আমাদের [illegible] তলায় তলায় টানাপোড়েন [illegible]। পরাধীন উপনিবেশে [illegible] জীবনের গতি রুদ্ধ [illegible] ও শাসনের সঙ্গে তাল [illegible] জীবনযাত্রার। অতীত ও [illegible] তাই ঠোকর খেয়েছে, বর্তমান [illegible] ভবিষ্যতে গাঁটছড়া বাঁধা যায়নি। [illegible] লেখাটার সম্ভাবনা যে পথে চলতে [illegible] শাসকশক্তি তার উল্টোটাই [illegible]ছেন। তাঁদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির বাহন হ'য়ে যেই আমরা চলতে চেয়েছি অমনি সর্বত্রই জীবনের বাঁধা খুলিয়ে [illegible]। লেখাপড়া শিখেছি, চাকরি করেছি, অমনি নিজেরা তফাতে সরে এসেছি দেশের লোকের কাছ থেকে। আমাদের চারপাশে বিরাট ফাঁক পড়ে গিয়েছে, দু-তরফকে পৌঁছবার সূত্র ছিঁড়ে গেছে। গ্রাম ছেড়ে শহরে ভিড় করেছি, নাগরিক জীবনযাত্রায় দিশেহারা হয়ে কানাগলির অন্ধকার আর অজ্ঞতায় মাথাতে দেরী হয়নি। নিজের নিজের মহিমায় দাঁড়াতে চেয়েছি, অবলম্বন জোটেনি। এই অত্যাচার আর শূন্যতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছি, দেশের মানুষ এসে দাঁড়ায়নি পাশে; আসবার উপায় রাখিনি নিজেরা সরে এসে। কলকাতার পথে দেশ খুঁজতে চেয়েছি, চৌরঙ্গী আর পার্কস্ট্রীট তফাতে টেনেছে, দেশের সন্ধান পাওয়া যায়নি। ফলে, নিজেদের এই শূন্যতার মধ্যে, ফ্রয়েড ও মার্কস যেন মুসকিল আসানের মতো এসেছে। ম্লান বুদ্ধি বিবেচনায় সব তলিয়ে যায়নি, হয়তো এতো স্পষ্ট ক'রে নিজেদের জীবনের বিড়ম্বনা সবাই বোঝেন নি। কল্লোলী লেখকরা খোঁজার চেষ্টা করেছিলেন কেউ কেউ নিজেদের মতো কমবেশি। কিন্তু খোঁজার এই প্রয়াস সফল হয়নি উপন্যাসে, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত বা প্রেমেন্দ্র মিত্রে; সাফল্য এসেছিলো কবিতায়, কিছুটা প্রেমেন্দ্র মিত্র বা প্রধানতই বিষ্ণুদের কবিতায়। বাকীটা ছোট গল্পে। এই সাফল্য অবশ্য খুব বড়ো কিছু নয়; আসলে জীবন সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গি ঠিক করবার ক্ষেত্র হিসেবেই মূল্যবান। উপন্যাসে যে কেউ সফল হননি তার কারণ, আগেই বলেছি, যুদ্ধোত্তর মনোভাব বা মূল্যজ্ঞান আমাদের জীবনে এসেছে পরোক্ষভাবে, হাতফেরতায়। আমরা প্রত্যক্ষ যোগের অভাবে আমূল নাড়া খাইনি। আর যা ছিলো আমাদের জীবনের তলায় তলায় তা এতো বেশি গভীরে যে তার কথা শুনবার ধৈর্য ও মানসিকতা ছিলোনা ওঁদের, পরিস্রুত তো দূরের কথা। উপন্যাসে স্পষ্ট করে প্রকাশ করার ক্ষমতা তাই ওঁদের আয়ত্তে আসেনি। শুধু কবিতায় যে হ'য়েছে তার কারণ কবিতায় জীবনের কথা প্রকাশ পায় পরোক্ষতায়, তাই জীবনের গভীর কথা কবিতায় ফুটেছে।

কল্লোলী যুগের একই সমস্যা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরেও বর্তমান। তবু সমস্যাটা আরো ঘোরালো হয়েছে। যুদ্ধটা যদিও তেমনিই পরোক্ষ থেকেছে তবু দুর্ভিক্ষ আর দাঙ্গা যুদ্ধের বীভৎসতা প্রকাশ ক'রে দিয়েছে। আমরা জীবনের মূল্য আর মূল্যজ্ঞানের পরীক্ষাটা স্বচক্ষে দেখতে সুযোগ পেয়েছি। যুদ্ধের প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে চারপাশে কি ভাঙে আর মানুষ কি হারায় আমরা এই কবছরে টের পেলুম। অভিজ্ঞতায় যা বাকি ছিল দেশভাগ আর শরণার্থীর উদ্দেশ্যহীন জীবনযাত্রায় সব পূর্ণ ক'রে দিলো। সুতরাং আশা জাগে যে তিরিশ সালের অক্ষমতা লেখকদের ঘুচবে এবার। এতোদিনে জীবনটাই যখন উল্টেপাল্টে গেলো, জীবনের তলার ময়লা, টানাপোড়েনের কার্যকারণ নিশ্চয়ই বর্তমানের লেখকরা ধরতে পারবেন। আমরা আমাদের সমাজ, জীবন ও নিজেদের দেখতে পাবো, চিনতে পারবো, ওঁদের জানার আলোয়।

●

অথচ সেই আশা কি পূরেছে? তারাশঙ্করকে বাদ দিলে, প্রবীণ অচিন্ত্য, প্রেমেন্দ্র, শৈলজানন্দ আমাদের আশা মেটাতে পারেন নি। তাঁরা নিজেরাই জীবনকে খোঁজার চেষ্টা ছেড়ে দিয়েছেন। ওপর ওপর মাটি আঁচড়ে সোনা যখন মেলেনি, সোনার সাধনাতেই মেতেছেন পরিশেষে। জীবনের মাঝে যাইহোক, নিজেদের জীবন মোক্ষকরি তার চেয়েও বড়ো। সিনেমা আর রামকৃষ্ণ, শিল্পচর্চা আর ধর্মের ভেক, সবই সর্বমূল্যাধার অর্থের টানে এক হ'য়ে গেছে। কল্লোলী চিরবিদ্রোহী বুদ্ধদেব যদিও সিনেমার শুরুতেই হোঁচট খেয়েছেন তবু সিনেমা-কাহিনী লিখতে কসুর বিশ্রাম পায়নি আর এখনো খোকাখুকুর মচমচে কাহিনী লিখে যাচ্ছেন যে খোকাখুকুরা কাচের ঘরে কেনো যে অন্যায়, কেনো যে ইংরেজি কবিতা আউড়ে মাখামাখি করে এবং মরে এ-কথা না বোঝেন স্রষ্টা, না বুঝি আমরা। পরের ধাপের মনোজ বসু ও গজেন মিত্র পাঠকদের চিনেছেন ভালো, ব্যবসা করেন, ব্যবসায়িক গল্প লেখেন, কাহিনী বানান। দায়িত্ব নেই, দাবীও করেনা কেউ।

●

কিন্তু এরা মরা ঘোড়া। প্রাণের বাজার যাঁরা ধরে রেখেছেন যেমন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় কি বিমল মিত্র, স্বাপদ চৌধুরী কি শ্রীঅবধূত এঁদের জেল্লা বেশি, দৌড়ের বাজীও জেতেন চোখের নিমেষে। কারণ এঁরাও ফ্রয়েড ও মার্কসে দোল খেয়ে ফেরেন, অবক্ষয় ও পুনর্গঠনের কথা জানেন ভালোভাবে। জানেন, কারণ জীবনের পাঠ এঁরা নিয়েছেন চতুরালিতে, নিজেদের কুশলী করেছেন পাঠক মনের অলিগলিতে। জানেন, জীবন রহস্যের উদ্ঘাটন জটিল প্রক্রিয়া, দুঃখের দুঃসাধ্য। তারচেয়ে সমাজের চর্চায় সহজে তাগা মেলে, চলচ্চিত্রের রূপকথার জগতে প্রবেশের ছাড়পত্র পাওয়া যায়। এঁরা জানেন নানা প্রবঞ্চনায় আমাদের সারা জীবন জুড়ে শূন্যতা রাজত্ব করছে, এই শূন্যতায় অর্থের মোহ প্রতিমুহূর্তে আমাদের পাকে-পাকে জড়াচ্ছে। টাকা সহজে মেলেনা, তাই টাকার কল্পনায় শুধু খুশির জগৎ তৈরী করছি। সেই জগতে ইচ্ছা পূরণের সরঞ্জাম থরে থরে। এই জীবনে ঘর নেই বাড়ী নেই, পরের দয়ায় দীন অস্তিত্ব তাই কল্পনার জগতে প্রাসাদ, আনন্দের বিলাসের সম্ভার কতো। চারপাশে মেয়ে নেই, সুন্দর তো দূরের কথা, কালো মেয়ের প্রেম বা মেয়ের স্পর্শ মেলেনা তাই ওই জগতে সিনেমা-প্রিয়ার অধরে দরিদ্র নায়কের মেলে অভিজাত আদর্শবাদী প্রেয়সী বা রাজকুমার নায়ক বিগতযৌবনা, রূপহীন নায়িকার দুয়ারে এসে দাঁড়ান। সর্বরিক্ততায় কখনো মরিয়া হ'য়ে উঠে শত্রুর মুখ খুঁজি, হিংস্র আবেগে আঘাত করতে চাই কাউকে, নিজেদের ছেলেমেয়েরা, ভাইবোন পকেট হাতিয়ে সিনেমার লাইনে দাঁড়ায়, দাঁত চেপে চেপে উত্তেজনা প্রকাশ করে। মেয়েদের দেখে তখন বুঝি জীবনের পরতে পরতে হিংস্রতা জমেছে, খুন, জখম, মারামারি, গুণ্ডামি, ধর্ষণ, মন টানে আর বিমল মিত্র, অবধূতদের কাহিনী জোর চলে বাজারে। অর্থাৎ যখন নিজেদের ভুলতে চাই, ভোলাতে চাই, জ্ঞানে অজ্ঞানে, বিমল মিত্র অবধূতরা এই সব কাহিনী ফেঁদে আমাদের খুশি করেন। আমাদের ইচ্ছাপূরণ হয়, কিছুটা মনের জ্বালা মেটে: দেখি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় মেয়েদের শরীর নিয়ে রসালো গল্প লেখেন, বিমল মিত্রের দিদিদের বৃত্তান্ত বেড়েই চলে, গ্রাম্য উজবুক ভূতনাথ বড়োবাড়ীর ছোটো রাণীর শরীরের চারপাশে অন্ধ চক্রে ঘোরে আর শ্রীঅবধূত সাধনায় সিদ্ধি পেয়ে উদ্ধারণপুরের ঘাটে নারী-পুরুষের আদিম বীভৎসতা নিয়ে সাহিত্যের বাজার মাৎ করেন। মনোবিকলনতত্ত্বে মানুষকে জানাচ্ছি বক্তৃতায় আসেন ফ্রয়েড আর ব্যক্তি স্বাধীনতা ও সামাজিক মুক্তির বক্তৃতায় কার্ল মার্কস। আমরা বাহবা দিই, শরৎচন্দ্রের একটি পিয়ারী বাইজী রাজলক্ষ্মী ও চাকরি-ছাড়া কেরাণী শ্রীকান্তের নজীরে তৈরী অসংখ্য শ্রীকান্ত ও রাজলক্ষ্মীর প্রেম কাহিনীকে। আমরা সহজেই ভুলি যে এঁরা কেউই সাহিত্যিক নন, আমাদের মতোই ভাগ্যের তাড়নায় হতভাগ্য, ভবিষ্যতের আশায় নেমেছেন ফাটকা বাজারে। এ বিষয়ে যথেষ্ট টনটনে জ্ঞান যে এঁদের আছে তা কাহিনীর গড়নে, গোয়েন্দা কাহিনী বা চলচ্চিত্র কাঠামো দেখলেই ধরা পড়ে। এঁরা জীবনকে খুঁজছেন না, জীবনের কার্যকারণ জানবার প্রয়োজন নেই, সহজে চোখের নিমেষে আপনা থেকেই কেমন সব ঘটে যাচ্ছে।

পরের ধাপের লেখকেরা, যেমন সমরেশ বসু বা অসীম রায়, তুলনায় অনেক বেশি সতর্ক, জীবন সম্পর্ক অনেক বেশি সচেতন হ'লেও ঔপন্যাসিকের সিদ্ধি লাভ করেনি। সমরেশের মেজাজ ঠিক ঔপন্যাসিকের নয়, ছোটো গল্পের কলে আজকাল লক্ষ্য করা যাচ্ছে সমরেশও চমকদার গল্পবলার ঝোঁকে বা জীবনকে একটা নির্দিষ্ট ছকে ফেলে দেবার চেষ্টায় মেতেছে। জানা, অজানা বিষয়বস্তু খোলস খুলিতে রূপ দিলেই হয় এমন একটা ভাব। অসীমের স্বপক্ষে সবচেয়ে বড়োকথা অসীমের গাম্ভীর্য এবং বিষয়বস্তু সম্পর্কে সচেতনতার গভীর প্রয়াস। যদিও অসীম এখনো জীবনকে মুঠোয় ধরতে পারেনি, সমরেশের যতোটা লোকপ্রসিদ্ধি অসীমের ততোটাই সত্যের অন্বেষা। নবীন ও প্রবীণ এই দুদলকে বাকি থাকেন তারাশঙ্কর। রবীন্দ্রনাথের মহৎ প্রচেষ্টার পর একমাত্র তারাশঙ্করেই জীবনকে ধরবার অনেকটা প্রয়াস ও অনেকটা সিদ্ধি মেলে। তবু তারাশঙ্করের কাছেই কি দাবি মেটে। আমাদের সমগ্র জীবনকে পরিপূর্ণভাবে আজও কেউ প্রকাশ করতে পারলেন না। উপন্যাস আজও লেখা হলোনা, যদিও লেখকদের নোবেল লরিয়েট হবার বাসনা সত্ত্বেও। চতুর্বর্গলাভ অবশ্য লেখকরা করেছেন, আমাদের মোক্ষলাভ ঘটেনি।

●

আসলে খুঁজছি উপন্যাসে জীবনের কথা রোজকার মানুষের চেহারায়। যদিও তারা নিত্যচেনা, তবু তাদের পরিচয় সহজে ধরা পড়েনা। তাদের বাইরের চেহারা আর ভেতরকার রূপ, কি তারা স্পষ্টভাষায় চায় আর কি চায়না বলেনা, কি তাদের জীবনের লক্ষ্য আর কি প্রতিবন্ধক সেই পথে, কি তাদের পরস্পরের সম্পর্ক আর কেনোই বা কি অবস্থায় তাদের চাওয়া-পাওয়া রূপ পায়, ভাঙেগড়ে সব জানতে হয়। তাছাড়া এই মানুষগুলো বা পাত্রপাত্রীরা শুধু নিজেরাই সব নয়, এদের আয়নায় নিজেদের মুখ দেখি আমরা, নিজেদের চেনাই। যে দেশে থাকি, যে সময়ে বাঁচি তার পুরো পরিচয় পেতে চাই। অতীতের সঙ্গে জীবনের যোগ আর ভবিষ্যতের সঙ্গে সম্পর্ক যাচাই করি, বাঁচতে চাই নতুনভাবে। এই অর্থেই রবীন্দ্রনাথ ঐতিহ্য খুঁজতে চেয়েছেন এবং দাম দিয়েছেন তারই স্বপক্ষে।

বাঙ্গালী পাঠকের রুচিবিপর্যয়

[বিশেষ প্রতিনিধি]

যাঁদের বই কেনার বাতিক আছে, তাঁরা নিশ্চয়ই কলকাতার ফুটপাতে পুরানো বইয়ের দোকানের খদ্দের। এ না হয়ে তাঁদের আর কোন উপায় নেই। কারণ ফুটপাতের দোকানগুলি সব রকম পুঁথির আড়ৎ। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত অর্থাৎ ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ থেকে হালফ্যাশনের শশধর দত্তের মোহন সিরিজ পর্যন্ত সব রকমের বই এখানে মেলে।

সমাজের সকল স্তরের লোককেই এখানে আনাগোনা করতে দেখা যায়। ক্ষীণচক্ষু প্রফেসর থেকে সুরু করে টোলের পণ্ডিত, গাঁয়ের হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার বা সিনেমাপত্রের পাঠিকা ভ্যানিটি ব্যাগ ঝুলিয়ে চলা আধুনিকার পর্যন্ত এখানে গতিবিধি। তাই একটু মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় বাংলাদেশের সংস্কৃতির হালচাল কি। কি ধরণের বই বাজারে চলে বেশী।

ফুটপাতের দোকানের বইয়ের শ্রেণীবিন্যাস কয়েক রকমের: (১) কলেজ-পাঠ্য দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ক গ্রন্থ; (২) বিবিধ পেশা সংক্রান্ত, যেমন আইন, চিকিৎসা ইত্যাদি বিষয়ক গ্রন্থ; (৩) বাজার চলতি পাঠ্য অপাঠ্য উপন্যাস ও কাব্যগ্রন্থ; (৪) গোয়েন্দা কাহিনী ভিত্তিক রোমাঞ্চ সিরিজ; (৫) পুরানো ক্লাসিকস্; (৬) নগ্নছবিওয়ালা যৌনভাবোদ্দীপক ইংরাজী উপন্যাস এবং সিনেমা পত্র; (৭) রাজনৈতিক গ্রন্থ।

উপরের তালিকার মধ্যে প্রথম দুই শ্রেণীর বই ছাত্রেরা এবং বিভিন্ন পেশাজীবী ভদ্রলোকেরা প্রাণের দায়ে কেনেন। কেনেন এজন্য না কিনে উপায় নেই বলে। সুতরাং এঁদের পুস্তক সংগ্রহের মাধ্যমে বাংলাদেশের পাঠকের ঠিক হালটি ধরা যাবে না। কারণ যে ছাত্রটি আজ সেক্সপিয়রের গ্রন্থ কিনলেন, তিনিই কলেজ থেকে পাশ করে ওটা পুরানো বইয়ের দোকানে ঝেড়ে দেবেন। কাজেই সেক্সপিয়ারের গ্রন্থ কিনলেও এর দ্বারা তাঁর সাহিত্যানুরক্তি বোঝায় না।

আমি পুরানো বইয়ের দোকানে খোঁজ নিয়ে দেখেছি যে, চার নম্বর এবং ছয় নম্বর শ্রেণীর বইয়ের গ্রাহকই বেশী। অবিশ্যি ছয় নম্বরের বইয়ের খদ্দের কলেজ পাড়ায় মেলে না, মেলে চৌরঙ্গী পাড়ায়। তবে চার নম্বরের গ্রাহক সব জায়গায়ই।

স্বাধীনতার আগে পর্যন্ত কলেজের ছাত্রদের মধ্যে রাজনৈতিক বইয়ের চল ছিল খুব বেশী। মার্কসবাদ সংক্রান্ত গ্রন্থই চলত। কিন্তু আজ অবস্থা বদলে গেছে। তাই পুরানো বইয়ের দোকানেও আজকাল মার্কস লেনিনের গ্রন্থ সকলন খুব কমই দেখতে পাওয়া যায়।

ছেলেদের আজকাল ঝোঁক পড়েছে সিনেমা আর গোয়েন্দা কাহিনীর উপর। যে সব গ্রন্থ কাদার তেলার মত নরম সবুজ মনে চিন্তার খোরাক যোগাতে পারে সেগুলি অনাদৃত অবস্থায় ফুটপাতে ধূলি-শয্যায় পড়ে থাকে। অভিনেত্রীর লাস্যময়ী পোজের মুদ্রিত ছবিওয়ালা সিনেমাপত্র শিক্ষিত (?) বাঙালী পরিবারের একমাত্র পাঠ্য গ্রন্থ হয়ে দাঁড়ায়।

এ নিয়ে চিন্তা করার দরকার আছে। এমন এক সময় ছিল এই বাংলা দেশেই যখন কলেজের ছাত্রমাত্রেরই সেক্সপিয়র মিল্টন কণ্ঠস্থ ছিল। এমন সব মানুষ ছিলেন যাঁদের সাহিত্যের 'সাত সমুদ্রের নাবিক' বলা যেত। এই বিদ্যাবত্তায় বাংলা দেশ ভারতের আর সকল রাজ্যকে ছাড়িয়ে হিমালয়ের তুঙ্গ শিখরের মত সমুন্নত গৌরবে দাঁড়িয়েছিল। আর আজ? আর্তনাদ করে বলতে হয় "Oh! What a fall!" আজ সেক্সপিয়র দূরে থাকুক আমাদের ঘরের কবি রবীন্দ্রনাথের কয়টি কবিতা কজন বাঙ্গালী মুখস্থ বলতে পারে? অথচ সেকালে ভারতচন্দ্র, নবীন সেন, মধুসূদন দত্তের কাব্য, এমন কি বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস থেকেও নির্বাচিত অংশ শিক্ষিত লোকেরা অনর্গল আউড়ে যেতে পারতেন।

এখন আর সেদিন নেই। আধুনিকতার জোয়ার ছাত্রসমাজকে ভাসমান কুটার মত [illegible] পঙ্কিল চিন্তাধারার আবর্তে ঠেলে নিয়ে চলেছে। তাই মোহন সিরিজের বই ফুটপাতের দোকানে পড়ে থাকে না। নায়করা সিনেমা পত্র বাজারে বেরোবার সঙ্গেই লোপাট হয়ে যায় এবং এই ঘোষণা প্রাচীরপত্রে সগর্বে জল জল করতে থাকে। কিন্তু এতে কারুরই চক্ষুপীড়া বোধ হয় না।

আর যৌন আবেদনমূলক হাল্কা ইংরাজী উপন্যাসের তো কথাই নেই। চৌরঙ্গী পাড়ায় এসব বইয়ের দোকানের সংখ্যা অনেক। হ্যাট-কোট-টাই পরা পুরা সাহেব যুবকদের আনাগোনাই এখানে বেশী। ট্রামে যেতে যেতে দেখেছি যে ঐ রকমের একজন যুবক একপ্রকার বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে বই পড়ে চলেছেন। তাঁর যে ষ্টপেজে নামবার কথা ছিল তার থেকে তিনি তিন ষ্টপ এগিয়ে গেছেন। হঠাৎ খেয়াল হতেই বইটি চট করে মুড়ে নেমে পড়লেন। তাকিয়ে দেখলাম একটি কুখ্যাত মার্কিণ শ্রেণীর ক্রাইম ও যৌন গ্রন্থ। আর হামেশাই দেখা যায় যে রুদ্ধশ্বাস ভিড়ের মধ্যেই ঝুলে ঝুলে কেউ হয়তো বই পড়ে চলেছেন। তাকিয়ে দেখুন মোহন সিরিজ।

এ খবরও আমার কানে এসেছে যে, আজকাল গ্রন্থাগার নাকি মোহন সিরিজ না হলে চলে না। এই সিরিজের বইয়ের জন্য সাহিত্যিক ভাষায় 'আবালবৃদ্ধবনিতার' মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়, বুড়ো থেকে গুড়ো পর্যন্ত সকলেই এই সিরিজের পাঠক। আপনার অন্দর মহলে খোঁজ নিয়ে দেখুন গিন্নী পান দোক্তা মুখে দিয়ে মাদুরের উপর অর্ধশয়ান অবস্থায় মোহন সিরিজ পড়ে দুপুর কাটাচ্ছেন। বঙ্কিমের উপন্যাসের পাঠিকাই নাকি ছিলেন বেশী বলে শোনা যায়। তখনকার দিনের গিন্নীরা বঙ্কিমের উপন্যাস পড়তেন। এখন কিন্তু কারুর বাড়ীতে বঙ্কিমের বইয়ের টিকিও দেখা যায় না। কোন বইয়েরই না, একমাত্র সিনেমা পত্র ছাড়া।

এই গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে চলেছে বাংলার যুবক ও ছাত্র সমাজ, তবে ব্যতিক্রম কি একেবারেই নেই? আছে বই কি। তাই যখন দেখি যে পুরানো-সোঁদা সোঁদা গন্ধ কীটদষ্ট শতজীর্ণ ক্লাসিক্যাল বই কেউ কেউ কিনলেন তখন মনে আশার সঞ্চার হয়। তখন স্তিমিত গ্যাসের আলোকে টিম টিম করা পুরানো বইয়ের দোকানের সামনে অত্যুজ্জ্বল বিদ্যুতালোকোদ্ভাসিত নূতন বইয়ের দোকানগুলি নিষ্প্রভ হয়ে যায়। নূতন বইয়ের চেয়ে আমার কাছে অনেক হাতফেরা অনেক সুখদুঃখ স্মৃতি-বিজড়িত পুরানো বই ভাল লাগে। হয়তো এ বইটি কোন মনীষী কিনেছিলেন। তাঁর অযোগ্য বংশধর বাজারের পুরানো বইয়ের দোকানে বিক্রী করে দিয়েছে। তাঁর অনেক দিনের চিন্তা, অনেক দিনের কর্মের প্রেরণা জুগিয়েছে এই গ্রন্থ হয়তো অনেক বিনিদ্র রজনীর সাক্ষী ছিল ভাবতে মনে কেমন একটা রোমাঞ্চ জাগে।

বাংলার সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র কলকাতা। পুরানো বইয়ের দোকান এই সংস্কৃতির বাহক। এমনটি আর কোথাও দেখতে পাওয়া যায় কি?

সিনেমায় সঙ্গীতের স্থান

(স্বচীন দেব বর্মণের মতামত)

আর পঞ্চাশটা আগে আগরতলা (ত্রিপুরা) রাজ পরিবারের জনপ্রিয় করেছিলেন কুমার শচীন দেব বর্মণ। কিন্তু সাহেব আর 'কুমার' উপাধিকে তিনি ব্যবহার করতে নারাজ; তাঁর ডেমোক্রেটিক মন তাতে সায় দেয় না। কুমে জন্মটা বৈথাকর, তাতে নিজের কোনো কৃতিত্ব নেই, তা নিয়ে গৌরব বোধ করারও কোনো মানে হয় না। আপন সাধনার বলে সঙ্গীত-জগতে যে প্রতিষ্ঠা তিনি লাভ করেছেন, তারই পরিচয়ে তিনি পরিচিত হতে চান, রাজকুলের নীল রক্ত তাঁর ধমনীতে বইছে এ পরিচয়ে নয়। তাই তিনি চান সাদাসিধে ভাবে শ্রীশচীন দেব বর্মণ নামেই অভিহিত হতে।

[গৌতম]

সম্প্রতি কয়েকদিনের জন্য তিনি কলকাতা এসেছিলেন। সে সময়ে একদিন গ্রামোফোন কোম্পানী তাঁকে সম্বর্ধিত করেন, আর একদিন আমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সঙ্গীত সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করি। কিছুদিন আগে ভারতীয় সঙ্গীত নাটক আকাদামি তাঁর সিনেমা সঙ্গীত পরিচালনা প্রতিভাকে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দিয়েছেন। সে কথা মনে পড়ে আমরা সিনেমা ও সঙ্গীত সম্বন্ধেই প্রথমে কথাবার্তা সুরু করলাম।

সিনেমা ও সঙ্গীত

কেউ কেউ বলে থাকেন সিনেমা আমাদের সঙ্গীতকে নীচু স্তরে নামিয়ে দিচ্ছে। নীচু স্তরে সঙ্গীত পরিবেশনীয়তে চালু করে। সিনেমা জগতের সঙ্গীত পরিচালকেরা চান খেলো চটকদার সঙ্গীত দিয়ে জনগণ বা 'মাস্' (mass) খুশি করে তাদের হাত করতে, কঠিনের সঙ্গে তাদের কোনো যোগ নেই। এবং এর ফলে সিনেমার মাধ্যমে খেলো ধরণের ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়ে সঙ্গীতের মানোন্নতি ব্যাহত করছে।

সিনেমার সঙ্গীতই আবার বিভিন্ন মেলেদের গ্রামোফোন রেকর্ডে রেকর্ডিত হয়ে শহিত-শীকারের মাধ্যমে পাড়ায় পাড়ায় আকাশবাতাসে ছোলাচ্ছ করছে। 'পাদনিক' বেতারে খেলো রুচিকে তুষ্ট করবার কোরস-বীণা পর করেই সিনেমা ক্ষতি করছে আমাদের সঙ্গীতের।

একথা সত্যি বলে বাবুতে রাজী নন শচীন দেব বর্মণ। আগেই বলেছি তাঁর মনটা ডেমোক্রেটিক ধাতুতে গড়া। জনসাধারণের রুচিবিকের ওপর সমস্ত আস্থা আছে তাঁর, উন্নতির অবকাশ আছে বলে তাঁর তাকে তিনি অশ্রদ্ধা করেন না।

তিনি বললেন, "সিনেমা সঙ্গীত আমাদের সঙ্গীতের যান নামিয়ে দিচ্ছে এ কথা কি করে বলা যেতে পারে? গত কয়েক বছরের মধ্যে সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন, সেখুতে পাবেন সিনেমা সঙ্গীত এগিয়ে চলেছে। তার কারণ সঙ্গীত পরিচালনা একটা বিশেষ প্রতিবেদিতার ব্যাপার। প্রত্যেক সঙ্গীত পরিচালক চাইছেন আরো ভালো কিছু দিতে, কারণ খেলে থাকার উপায় নেই—প্রতিবেদিতার ক্ষেত্রে খেলে থাকা মানেই পিছিয়ে যাওয়া, এবং পিছিয়ে থাওয়া মানেই বীরে বীরে বাতিল হয়ে যাওয়া। সিনেমা সঙ্গীত যখন ক্রমেই উন্নতির হচ্ছে, তখন সঙ্গীত জগতের সে খতি করছে এ কথা বলে দিই কি করে?"

একটু থেমেই আবার বললেন, "জনসাধারণের রুচিবোধ বা ডালোমন্দ বোঝে বলার ক্ষমতা যত কম বলে কেউ কেউ মনে করেন, আমাদের তত কম নয়। খেলো জিনিস যা তাকে চটকে দিয়ে তাদের হয়তো আর চমক দেওয়া যায়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত খেলো জিনিসের খেলোমি তাদের কাছে ধরা পড়ে যায়, ধোপে টেকে না। আমি তো জনসাধারণকেই আমার সঙ্গীতের 'জজ' বিচারক বলে মনে করি। আমার তৈরি কোনো সুর যদি তাঁরা সাদুরে গ্রহণ না করেন বুঝতে তাঁদের ঘোষ দিই না, বরং নিজের ত্রুটি কোথায় হয়েছে সেইটে খুঁজবার চেষ্টা করি।"

আমি বিরোদিতার তাঁর বক্তব্যও জানতে, কিন্তু সেকথা তাঁকে জানাতে নয়। তর্ক করতে চাইলাম না, কিন্তু মনে মনে ভাবলাম 'কিন্তু' ঘেলে বলি। আমার মনের ভাবটা বুঝে ফুটে উঠেছিল বোধ হয়। সম্ভবতঃ তাই বোধে তিনি বললেন, "অবশ্য সিনেমার অত্যন্ত বাজে এবং নিম্নস্তরের সঙ্গীত যে একেবারেই পরিবেশিত হয় না এমন দাবী আমি করছি না, বা আমৌ পরিবেশিত না হলেই ভালো হতো। কিন্তু তারা নিতান্তই সংখ্যালঘু, তাদের বহু অবাঞ্ছনীয় বাস্তিক্রম বলেই বিবেচনা করা উচিত। তাদের উদাহরণ দেখিয়ে সমগ্রসিনেমাকে দোষারোপ করার কোনো যুক্তি নেই।"

পাশ্চাত্য সঙ্গীত

প্রশ্ন করলাম, "এদেশী ছবিতে যে অনেক ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের প্রভাব আমদানী করা হয়েছে, হচ্ছে, এবং হয়তো আরো হবে, সে বিষয়ে আপনার মত কি?

তিনি বললেন, "এ বিষয়ে কোনো সোঁয়াগি আমার নেই, সোঁয়াগি আমি পছন্দও করি না। সিনেমা পরিচালককে সঙ্গীত রচনা করতে হবে ঘটনা-সংস্থান, সিচুয়েশান বা পরিবিহিত সঙ্গে খাপ খাইয়ে। পরিবিহিত অনুযায়ী যদি সেখা যায় পাশ্চাত্য সঙ্গীতই সব চেয়ে ভালো খাপ খাবে, তবে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের ব্যবহারই সেখানে করতে হবে। মনে করুন পুরোদস্তুর বিলিতি পরিবেশে থাকেন এক বাঙালী ব্যারিস্টার। তাঁর বিলিতি কায়দার মানুষকরা একমাত্র মেয়ে বিলিতি ক্যালানের দুষ্টু করে বলে পিয়ানো বাজিয়ে গান গাইছে। তখন বাঙলাকাব বাংশ্রেণী তো চলতেই পারে না, এমন কি ভারতীয় সুরের কোনো ভারতীয় গানও খুব জুতসই হবে না। তখন সঙ্গীত পরিচালকের উচিত হবে মেয়েটিকে দিয়ে বিলিতি সুরে বিলিতি গান গাওয়ানো। তাতে যদি আপনারকে আপত্তি থাকে তাহলে বরং পরিচালককে বলুন ভারতীয় ছবিতে ওরকম বিলেশী সুর এর পরিবিহিতি অবতারণা তিনি যেন না করেন। কারণ 'সিচুয়েশানগুলো' সঙ্গীত-পরিচালকের একিয়ারের ভেতরে নয়।"

আমি বললাম, "আপনি যে বিশেষ পরিবিহিতির উদাহরণ দিলেন তা ছাড়াও পাশ্চাত্য সঙ্গীতের চং সাধারণে ছবির থাকে অ-বিশেষ পরিবিহিতিতেও, যেখানে পশ্চিম থেকে বার করা অপরিহার্য নয়।

"অর্থাৎ এদেশী সঙ্গীত দিয়েও যেখানে কাজ চলে যায়? কিন্তু শুধু কাজ চলে যাওয়াটাই তো বড় কথা নয়, কাজটা আরো ভালো করে কিভাবে চালানো যায় সেইটেই হচ্ছে কথা এবং আমার মতে এ ক্ষেত্রে সঙ্গীত-পরিচালককে সংকীর্ণতার সংস্কার থেকে মুক্ত থাকতে হবে, স্বৈরাচার-বাঁচানো গুচিবাই থাকলে চলবে না। বিভিন্ন দেশের কৃষ্টি সম্বন্ধেও হয়ে ওঠে পারস্পরিক আধান প্রদান, এক দেশের কৃষ্টি আর অপর দেশের কৃষ্টির বাধ্যবাদের দুর্নিবার দুর্বোদ্য প্রতিরোধ তুলে নয়। অবশ্য এটা ঠিক যে অপর কৃষ্টির থেকে সেবা জিনিষ গ্রহণ করবো নিজের কৃষ্টির ভিত্তিতে খাড়া থেকে। পরের কাছ থেকে ধার করে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে নয়।"

অবতেষ্টা

পাশ্চাত্য সঙ্গীত প্রসঙ্গে তিনি বিশেষ করে বললেন অবতেষ্টার কথা। অবতেষ্টা জিনিষটা আসলে পাশ্চাত্য থেকে আমদানী করেছি, এবং অবতেষ্টা সঙ্গীতে আমরা পাশ্চাত্যের অনেক পিছনে পড়ে রয়েছি। আমাদের দেশের বাদ্যসরঞ্জামগুলো অবতেষ্টার হাতে একক বাদ্যনার পক্ষেই বেশী উপযোগী এবং আমাদের সঙ্গীত-শিল্পীদেরও একক কৃতিত্বেই (বা Solo demonstration)দক্ষতা এবং অনুরাগ বেশী।

আমি বললাম, "সিনেমা-সঙ্গীতে পাশ্চাত্য অবতেষ্টার, অন্ততঃ পাশ্চাত্য

সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

বেতার কেন্দ্রে যথেচ্ছাচার

গত ৭ই ফেব্রুয়ারীর দর্পণে'বিনেদ প্রতিনিধি' বেতার কেন্দ্রের কার্যকলাপ তথা ব্যবেচ্ছাচার সম্বন্ধে যা লিখেছেন তার জন্য তাঁকে অভিনন্দন জানাই। আর তাঁরই সমর্থনে কয়েকটি কথা বলতে চাই। আজ স্বাধীন ভারতের সরকারী আমলে সর্বত্রই উন্নতির আবহাওে যে চরম অবনতি ঘটে চলেছে তার অন্যতম প্রধান প্রশাখন বেতারকেন্দ্র।

বিভিন্ন সরকারী অফিসে নানান কারণে নানা অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছে। এমন কি শিক্ষক সম্পদায় পর্যন্ত তা থেকে রেহাই পাননি। তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এখনি সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে দিলে। তবু তাঁদের একটা সুবর আছে বলেই বোধ করি তাঁরা তাঁদের দাবী আদায়ের একটা সুযোগ পেলেও পেতে পারেন।

কিন্তু শুনেছি যে দিনেশীদের বিষয় যে সত্বর গ্রহণ হয়েছিল তারই মৃত্যু ঘটিয়ে, সেই মৃত সত্বের তৎকালীন কর্তাব্যক্তিদের মধ্যে থেকে স্বার্থপর জন-কয়েক ব্যক্তিকে বাছাই করে আর তার সঙ্গে বেতার কর্তৃপক্ষের বিশেষের পছন্দসই জনকয়েক বাধাবরা গোছের লোককে রাতারাতি 'বাতলর' বানিয়ে দিয়ে, তাঁদেরই আড়ালে বেতারের কুখ্যাত কিছু কর্মচারী বাদের অন্যে 'শিলশী সঙ্ঘ' ১৯৪৬ সালে বর্ষবট করতে বাধ্য হয়েছিলেন, তাঁদেরই বন্যে বে জনক কলকাতায় এসে আবার আসর অবাধার স্থবিধা করে নিয়েছিলেন তাঁরাই অন্যান্য বাহাদুরি করা ঐ বছরেরই কর্মচারীর সক্রিয় সহযোগিতায় শিল্পী-নির্বাচন বন্ধ করে সাকল্যের সঙ্গে নিজ নিজ মর্জি বা বাসনা চরিতার্থ করার চরম সুযোগ করে নিয়েছেন।

সঙ্গীত যন্ত্রের ব্যবহার আপনি পছন্দ করেন?"

তিনি বললেন, "হাঁ, সিচুয়েশান অনুযায়ী যদি প্রয়োজন হয়। তাহলে ছবিতেই প্রয়োজন হবে এমন কোনো কথা নেই। কিন্তু যেকেত্রে প্রয়োজন হবে সে ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য সঙ্গীত বা সঙ্গীতরত পাশ্চাত্য বলে আমার কাছে অস্পৃশ্য হয়ে থাকবে না। ধ্বনি-বৈচিত্র্যের দিক দিয়ে পাশ্চাত্য সঙ্গীত-যন্ত্রগুলো আমাদের সঙ্গীত যন্ত্রের তুলনায় বেশী সমৃদ্ধ; প্রয়োজন হলে তাদের সুযোগ গ্রহণ করবো না কেন?"

মার্গ সঙ্গীত ও সিনেমা

বললাম, "সিনেমায় ক্লাসিক্যাল বা মার্গ সঙ্গীতের স্থান সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?"

তিনি বললেন "ক্লাসিক্যাল সঙ্গীত যচ্ছেতাত্তর শেশপালাইজড্ জিনিষ। এ সঙ্গীতের শিল্পী যাঁরা তাঁরা বেতার সাধনা-সাপেক্ষ, এ সঙ্গীতের রস উপভোগ করাটাও কিছু পরিশ্রমে তাই। মার্গ সঙ্গীতের রস সমাকভাবে উপভোগ করতে হলে যে অভিবিবেশ ইত্যাদি দরকার, সিনেমাবোধী লক্ষ লক্ষ লোকের কাছ থেকে তা আশা করা বায় না। তাই খাঁটি মার্গ সঙ্গীত সবল করে সিনেমা চলতে পারে না। অবশ্য মার্গ-সঙ্গীত-প্রধান ছবি যে সাফল্য লাভ করে দি তা নয়, কিন্তু সে ছবিগুলোর কাহিনী এবং পরিবিহিতিগুলো মার্গ সঙ্গীতের কাঠামো হিসেবেই বিশেষ-ভাবেই তৈরী। এরা হচ্ছে সাধারণের ব্যতিক্রম।"

তারপর পাছে তুলে বুঝি এই ভয় করেই বোধ করি তিনি যোগ করে দিলেন, "অবশ্য মার্গ সঙ্গীতের গুরুত্ব আমি স্বীকার করছি না একথা বলে কাবলেন না। বরং আমার বিশ্বাস শিক্ষাব্যবস্থার ভালো সঙ্গীত শিক্ষার ডিভিত্তি তাঁর পাকা-পোক্ত হওয়া উচিত। বাগ-সঙ্গীতের যথেষ্ট জ্ঞান না থাকলে অবশ্যষ্টের পথে বেনীদূর তিনি অগ্রসর হতে পারবেন না। আপনাকে আগেই বলেছি জন-সাধারণের রসবোধ আছে। তাই মার্গ-সঙ্গীতে আনাড়ি হলেও যাঁরা সঙ্গীত পরি-চালনার আসনে, নামবেন তাঁদের পূর্তি কুবিধে মেতে দেবী হবে না; জনসাধারণের বিচারেই তিনি বাতিল হয়ে যাবেন।"

তারই ফলে জনকয়েক ব্যক্তি এই সুযোগে এটিকে কুপার যাতায়াতি বিভিন্ন বিষয়ে অথরিটি বনে বসে আছেনই শুধু নয়, গরীব দেশের গরীব শ্রোতাদের কাছ থেকে আদায়করা টাকা থেকে মোটা মাহিয়ার মুখে তো আছেনই তাকে রাজত্বথও বলা চলে।

এঁরা ছাড়া আরও কিছু ব্যক্তি আছেন যাঁরা বেতনে না কোনো ভাবে কর্তৃপক্ষের অনুগ্রহ লাভ করে নেশখো থেকে প্রয়োজন বা সুবিধামত কুচলিয়ারা করে চলেছেন এও জানি। সবচেয়ে মারাত্মক ব্যাপার হচ্ছে এই নিয়েছে থেকে যাঁরা এই সব ব্যক্তিকে দিয়ে কাজ হাসিল করছেন তাঁদের গতিবিধি ও কার্যকলাপ। তার ফলে তাঁদের চেয়ে-প্রীতি ভালো-বাসার চিক ভিত্তি লোক রাতারাতি সর্ব-বিষ্যাবিশারদ হয়ে উঠে পারছেন।

বিদ্যাবীদের জন্য, গুণগ্রাহকদের আসর বা ইরোরোপীয় অনুষ্ঠানের শিল্পীর সঙ্গে ভারতীয় শিল্পীর পারিপুর্বিক, পার্থক্য ইত্যাদি সম্পর্কে বিশেষ প্রতিবিধি না দিলেওে তাও বর্ণে বর্ণে সত্য। সবচ দেখেওনে বলতে হয় যে বেতারের ভিত্তিতে এই যে অনুষ্ঠান উন্নতির বাপ্পা এতে জনসবের কিছুমাত্র উপকার হয় বলে মনে হয় না।

'বাধাচাষী' কর পরিচালনায় ও এই ধরণ পরিকল্পনাবুক্ত পোষণোমোদ নীতির ফলে বহু শিল্পী, বহু ইত্যাদি চরম অপদস্থ।

সম্প্রতি এক নতুন চেষ্ট উঠেছে শুনতে পাচ্ছি যে বেতারে 'নি' কুশ শিল্পী আর রাখা হবে না। কর্তৃপক্ষের কাছে ন্যায়বিচার না পেয়ে বহু শিল্পীই পূর্বে বেতার ত্যাগে বলক করেন। তবন তাঁদের অনুরোধ বিনয় করে অনুর ভবিষ্যতে পারিপুর্বিক বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি দিয়ে 'নি' ফ্রেডেই রেখে গান গাইবে আসার পর আজ সেই ফ্রেডেদেরও চেয়েবেশির ভাগকেই তাঁদের চুচাঙ্ক অপমানের সমুখীন করা হচ্ছে এও আমরা জানি। কর্তৃপক্ষের অনুরোধে যাঁরা নিজ নিজ মর্যাদার চেয়ে জনপ্রিয়তার চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে সহযোগিতা করে এসেছেন আজ তাঁদের প্রায় নগ্ন-গত্তের পর্যায়ে ফেলে অপমান করবার এই ঘুনোয়ন বুদ্ধিরে করেছেন যার্থবাদীরা হয় কি করে তাই ভাবি। এখানেই শেষ নয়।

তারাপদ চক্রবর্তী, বিমল ঘোষ পরিচিতের মত গায়ক বা গায়িকা, মুকার্জ আদি, বিভেজ্ঞে যোষল সেনের মত রঙ্গী, বা ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য ইত্যাদিকে বাদ দিয়ে প্রকৃত অনপ্রিয় ও ভারী শিল্পীদের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করে নিজ দলীয় ব্যক্তিদের তবু প্রোগ্রাম দিয়েই নয়, বেতার জগৎ পত্রিকার বিশেষভাবে পৃষ্ঠপোষক করে এবং সাম্প্রতিক নতুন অভিনেতৃ যুগে তুলে বেতার কর্তৃপক্ষ দিনের পর দিন এইটাই প্রমাণ করে চলেছেন যে বেতারের ক্ষেত্রে শ্রোতৃসাধারণের দাবী বা মতামতের চেয়ে কর্তাদের মর্জি বা অনুমুখই চরম কথা।

দুর্ভাগ্যের বিষয় এসপর্কে অন্যান্য সংবাদপত্র বিশেষ আগ্রহ আজও দেখান নি। কে জানে তাঁদের মুখও কোনো উপায়ে বন্ধকরা হয়েছে কি না। যাই হোক আপনারা যে এই বিষয়ে এগিয়ে এসেছেন তার জন্য বন্যবাদ আপনাদের প্রাপ্য।

আর একটা অনুরোধ এই যে, যদি প্রতি সপ্তাহে বেতার অনুষ্ঠানগুলির নিরীক্ষিতভাবে সমালোচনা করে যাওয়া সম্ভব হয় আপনাদের পক্ষে তা হলে উপরে যে সমস্ত বিষয়ের বিস্তৃত সূত্রে অবগত হয়ে জানানোর তা বে ব্যাপ্ত নয় তাও প্রমাণ করব এবং আর দৃঢ় বিশ্বাস যে প্রকৃত সমালোচনার দ্বারা দেশবাসীকেও এসপর্কে সচেতন করে তোলা সম্ভব হবে যার ফলে এই সব অনাচার বন্ধ করতে কর্তৃপক্ষ বাধ্য হবেন।

সুবীরীন্দ্রনাথ নিয়োগী,
কলিকাতা-৩৭

দর্পণের নির্ভীক সত্যনিষ্ঠা

চিকবনাই সত্য অপ্রিয়—বহু পূর্বে সত্য বলা হত, লেখা হত। অধুনা সত্য জিনিষটা একেবারে লোপ পেয়েছে বলা যেতে পারে। আজকাল খাতিরে, চাকরীর ডরে, মায়ের ডরে, ডালবাসায় সত্য জিনিষটা কেউ বলতে চায় না—লিখতে চায় না। সেইদিক দিয়ে আপনাদের পত্রিকাকে সাদরে অভিনন্দন জানাচ্ছি। এইভাবে যদি সত্যকে সম্বুখে রেখে আপনারা নির্ভীক সৈনিকের মত পথ চলতে পারেন ত আপনাদের অবশ্যম্ভাবী।

একটা কথা—আপনাদের লেখার ভঙ্গিমাটা একটু রসাল করা প্রয়োজন বলে মনে করি। কারণ নীরস লেখা বেশীর ভাগ লোকেরই ভাল লাগেনা। কাজেই এবিষয়ে আপনাদের বিবেচনা করবার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি, আর অনুরোধ জানাচ্ছি প্রথম পৃষ্ঠাটিতে গল্প জন-সাধারণের দৃষ্টি যাতাতে পড়ে সেইভাবে সাজান। কারণ আগে দর্পনখানা, তারপর গুণবিচারী।

আর একটা কথা বলেই আমার বক্তব্য শেষ করব। আপনার 'দর্পণের' বুকে কলকাতা ছাড়াও পশ্চিমবাংলার ছোট ছোট সহর ও গ্রামাঞ্চলের ব্যথা-বেদনা, আশা-ভরসার কথা পৃষ্টিকলিত হয়ে উঠুক।

আশাকরি সাম্য ব্যাপারগের কাছে দর্পণ পত্রিকা একদিন বিশেষ সমাদর লাভ করবে।

কুকনগর, শ্রীসরীন্দ্রে নাথ সিংরয়ার
৫।২।৫৮

রসায়নের পরিক্রমে

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

কোনো প্রকাশ্য রাজনৈতিক আলোলনে তাঁকে নামতে কেন সাধারণ পদাতিকশ্রেণীও দেখা যায়নি। কিন্তু তাঁর রাষ্ট্রীয় চেতনার সন্ধান দেখা যায় বহুবিশ্রুত উক্তির মধ্যে, "বৈজ্ঞানিক গবেষণা বহু থাকতে পারে, কিন্তু স্বরাজ পুচেটার অপেক্ষা চলবে না।" দেশের কল্যাণকর বহু বহু চিন্তাধারা ও কর্মপ্রবাহের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। রাসায়নিক তথ্যকে তিনি অর্থকরী কাজে প্রয়োগ করবার যে বহান পরিকল্পনা করেছিলেন তার সার্থক পরিণতি আজকের ফেল ফেমিক্যাল—সারা এশিয়ার অন্যতম বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান।

দুঃখনজনক অকৃতজ্ঞতার এ একটী দৃষ্টান্ত কীর্তিমানের অভিলাষকে উপেক্ষা করেছেন দেশের কর্ণাধার সাধনের সংকলনে। তাঁর চিকিৎসে আর্তত্রাণের যে সংকেত ছিল তা পুরাণ পেয়েছে পুরনার দৃষ্টিতে আর উন্নয়নের প্রাঙ্গনে। অভাবটুকই সমনাগীর হাতে দেখিয়ে তিনি চকরা তুলে নিলেন দেখিব তাঁকে দেখলাম বহাম গান্ধীর মহেশীক্তি, অপর্যাপ্তার শিক্ষকে নিঃসংকোচ খোষনার ঔকে দেখলাম নিকেকাদেরও ডাবনিয়া-রূপে। কিন্তু ডাক্তরবর্ষে সবজায়রদের ইতিহাসে সুই। নিকেকে যে অসম কীর্তি ত: তাঁর ও তিতিক্ষার মহিমান্বিত। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "আমিসুকুমার-চন্দ্রকে তাঁর সেই আসনে অভিনন্দন জানাই, বে স্থানে প্রতিষ্ঠিত থেকে তিনি তাঁর দেশকে চিরদিন উপোষিত করেছেন। কেবলমাত্র জ্ঞান দেননি, নিজেকে দিয়েছেন, যে দানের প্রভাবে সে নিজেকে পেয়েছে। উপনিষদে কথিত আছে, বিনি এক, তিনি বললেন, আমি বহু হব। সৃষ্টির মূলে সেই আদিনির্দেশের ইচ্ছা। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রে সৃষ্টির সেই ইচ্ছার বিষয়। তাঁর ছাত্রদের কাছে তিনি বহু হয়েছেন, নিজের চিত্তকে সঞ্জীবিত করেছেন বহু চিত্তের মধ্যে। নিজেকে অকৃপণভাবে দান না করলে এ কখনো সম্ভবপর হত না। এই বে আত্মদান-মূলক শক্তি এ বৈশী পদি।" তেমো বহুর আগে এ আর্যভাষী পুরুষের জীবনত্রত হয়েছে। তাঁর চিত্ত আজো সঞ্জীবিত হয়ে নবীন থেকে নবীনতর রসায়ন-বিজ্ঞানীর চিত্তে।

(১৩শ পৃষ্ঠার পর)

একে অযৌক্তিক ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। কমেক নিমিটের সাক্ষাৎকার বলে মৌলানা এমন সব নতুন কথার অবতারণা করলেন পূর্বে যার বিন্দু বিসর্গ পর্যন্ত ও আলোচিত হয়নি এবং যাতে তাঁর পূর্ববর্তী সার্ধদণ্টাকালীন আলোচনা বাতিল হয়ে গেল। ব্যাখ্যামরূপ আর দুএকটি প্রশ্নের পরেই সম্মেলন সমাপ্ত হল। সমাপ্তির পর শ্রোতৃবৃন্দের অবস্থা হল বিমূঢ় হতে বিমূঢ়তর। অন্য যারা সম্মেলনের বিবরণী লোকমুখে জ্ঞাত হলেন তাঁরাও প্রায় তদ্রূপ।

মৌলানার দলের কোনো কোনো অংশ থেকে এই রকম মন্তব্য শোনা গেল, "কয়াদীতে থাকাকালে নিশ্চয়ই কেউ মৌলানা সাহেবকে হাত করেছে", "ডাঃ খাঁ সাহেবের বিপুলী কাউন্সিলের সভ্যত্ব লাভের নিশ্চিত নিদর্শন" ইত্যাদি।

মৌলানার অনুরোধরত তাঁর সাবরমতি সংবাদপত্রে ফলাও করে বের হল। এমতাবস্থায় যে বরণের আক্রমণাত্মক সম্পাদকীয় সাধারণতঃ লেখা হয় তার কোন দেখা পাওয়া গেল না। মুসলীম লীগ এবং অন্যদের সঙ্গে একটা নির্বাচনী আঁতাতে মৌলানার সম্মতি আছে বলে 'প্রেটসম্যানে'র স্থানীয় সংবাদদাতা যে ইঙ্গিত করেছিলেন কিছু দিন পূর্বে ভাসানী - সংবাদ' সম্পাদকীয় স্তম্ভে তার অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে লিখেছিলেন "অসম্ভব"। সংবাদ আরও বলেন, "এই ধরণের আঁতাতের কথা চিন্তা করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। জাতীয় আওয়ামি দলের কোনো নেতা যদি এই ধরণের প্রস্তাব উত্থাপন করেন তবে অচিরেই তিনি স্বীয় দলের আস্থাহীন হবেন। কিন্তু 'সংবাদে'র ভবিষ্যদ্বাণী দিখ্যা প্রতিপন্ন হয়েছে। কারণ মৌলানা সাহেব অপদস্থ হননি; অন্ততঃ প্রকাশ্যে তো নয়ই, যদিও তাঁর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কারও কারও সন্দেহ থাকা অসম্ভব নয়।

একথা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে সাংবাদিক সম্মেলনে মৌলানা সাহেবের মন দ্বিধাগ্রস্ত ছিল বলে আমার কখনও মনে হয়নি। মুসলীম লীগের নির্বাচনী আঁতাত গঠনের যুক্তি যখন তিনি উপস্থিত করেছিলেন তখন তাঁর কোনো দোলাচলচিত্ততা আমি লক্ষ্য করিনি। যুক্তিগুলি শুনে পরিবর্তন মনে হয়েছে, একথা এমন মানুষের যিনি, দলীয় রাজনীতির (তাঁর আখ্যানুযায়ী) পরিধিতে সম্পূর্ণ নিমেষিত হয়েছেন এবং পর পর তিনটি উপনির্বাচনে নিজের দলের পরাজয় বরণে হতাশ হয়েছেন।

বস্তুত মাত্র আট মাস পূর্বে জাতীয় আওয়ামি দল গঠনের পর মৌলানার উক্তিগুলির সঙ্গে তাঁর বর্তমান উক্তিগুলি মিলিয়ে দেখলে তাদের পার্থক্য স্বতঃ-প্রতীয়মান। নতুন দলের ভবিষ্যৎ ভূমিকার আলোচনা প্রসঙ্গে মৌলানা তখন বিশেষ জোর দিয়ে বলেছিলেন যে, জাতীয় আওয়ামি দলের প্রধান কর্তব্য হবে গ্রামের ভিত্তিতে একেবারে গোড়া থেকে দলের শক্তি সংগঠনে মনোনিবেশ করা। তিনি বার বার বলেছিলেন যে, তাঁর দল নির্বাচনী লড়াইয়ে আগ্রহী হবে না। তিনি বলেছিলেন যে, বরং এই নির্বাচনে কোনো আগ্রহ না দেখিয়ে তিনি পাঁচ বৎসর পরবর্তী নির্বাচনের জন্য শক্তি সংগ্রহ করবেন; এতে প্রাথমিক সাংগঠনিক প্রস্তুতির কল্যাণে জাতীয় আওয়ামি দলের সংখ্যা-গরিষ্ঠ দলে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা আরও দৃঢ়তর হবে।

ঢাকার সাংবাদিক সম্মেলনে মৌলানা ভাসানীর বিবৃতি সম্পূর্ণভাবে তাঁর নিজের দলের ভিতরে কিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে তা এত শীঘ্র পরিমাপ করা সম্ভব নয়। অবশ্য একথা না বললেও চলে যে মতবিরোধ অব-শ্যম্ভাবী।আগামী নির্বাচনেআওয়ামি লীগের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য যুক্ত ফ্রন্ট গঠনের জন্য মৌলানা ভাসানী নিঃ চুন্ত্রীগড়ের সঙ্গে কোনো আলোচনা করেননি বলে যে আশ্বাস দিয়েছেন তার জন্য ইতি-মধ্যেই দলের অভিযাত্রপন্থী অংশের প্রতিনিধিস্থানীয় ছয় জন নেতা এক বিবৃতিতে তাঁকে শুধু অভিনন্দন জানিয়েই ক্ষান্ত থাকেন নি, মুসলীম লীগের সঙ্গে হাত বেলাবার ইচ্ছা এবং বর্তমান প্রাদেশিক আওয়ামি লীগ মন্ত্রি-সভাকে সরাবার কল্পনার পর্যন্ত তাঁরা বিরুদ্ধতা এবং নিন্দা করেছেন।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে : "ক্ষমতা লাভের পর যে দলের নেতৃত্ব আমাদের দেশের বন্যার মজার সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়িয়ে দিয়েছে, যে দল বর্তমান সাম্রাজ্যবাদ - সমর্থক এবং প্রতিক্রিয়াশীল পররাষ্ট্রনীতির ভিত্তিস্থাপন করেছে এবং সর্বোপরি যে দল দেশের অর্থ-নৈতিক, সামাজিক এবং রাজ-নৈতিক জীবনের উপর মুষ্টিমেয় ব্যক্তির প্রভুত্ব কায়েম সাধারণ জন্য সর্বপ্রকার ব্যক্তিস্বাধীনতা হরণ করে সমস্ত দেশবাসীর জীবনে অবর্ণনীয় দুর্ভোগ সৃষ্টি করেছে সেই মুসলীম লীগ দলের সঙ্গে কোনো কারণেই জাতীয় আওয়ামি দল হাত মেলাতে পারে না।

আওয়ামি লীগ এবং প্রাদেশিক কোয়ালিশন সরকারের মন্ত্রীমণ্ডলের উদ্দেশ্যে তার প্রতি জাতীয় আওয়ামি দলের অনুসরণীয় নীতির আলোচনা প্রসঙ্গে এই বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে "এ কথা সত্য যে আওয়ামি লীগ যুক্ত নির্বাচনের সমর্থক এবং কোয়ালিশন সরকার ব্যক্তিস্বাধীনতার কিছুটা সম্প্রসারণ করেছেন। যদি বর্তমান কোয়া-লিশন সরকারের পতন ঘটে তবে, অন্য কিছু না হলে, হয় হবে গভর্ণরের শাসন, না হয় মুসলীম লীগ এবং অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তিবর্গের মন্ত্রিসভা। এর যে কোনো একটি বিকল্পের ফলে প্রদেশের রাজনীতিক আব-হাওয়ার অবনতি অবধারিত। কাজেই বর্তমান পরিস্থিতিতে কোনো গণতান্ত্রিক ব্যক্তিই আওয়ামি লীগের কোয়ালিশন সরকারের পতন কামনা বা তার জন্য চেষ্টা করতে পারেন না।"

যদিও এটা জাতীয় আওয়ামি দলের বৃহৎ অংশগুলির নজরতের সাধারণ সূচক তবু একথাও প্রায় নিশ্চিত বলা যায় যে, দলের সাধারণ সম্পাদক নিঃ মাহমুদ আলীকে কেন্দ্র করে যে উপদলটি রয়েছে তারা মুসলীম লীগ, নিজাম-এ-ইসলাম দলের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আতাহুর রহমানের কোয়ালিশন সরকারের পতন ঘটা-নোর প্রস্তাবকে স্বাগত জানাবে।

মুসলীম লীগের সঙ্গে হাত বেলাতে স্থবিধে হতে পারে বলে মৌলানা সাহেব তাঁর সাংবাদিক সম্মেলনে যে উক্তি করেছিলেন তা যে শুধু একটা কথার কথা নয় তার পরিচয় পাওয়া যাবে আগামী আওয়ামি নেতা বা আগুন পাকুর খণ্ডের নির্বাচিত কর্মী কর্মীর বিবেচনা করি। মাত্র দিন দুই আগে কলাচাঁর এক সাধারণ সম্মেলনে বক্তৃতা দা (লোকে তাঁকে এই নামেই জানে) এক ইউনিট ভেঙ্গে দিয়ে সমস্ত পূর্ববঙ্গকে অঞ্চল নিয়ে একটি প্রদেশ গঠনের উপর জোর দেন। তিনি জানান যে নির্বাচনের পূর্বেই এক ইউনিট ভেঙ্গে দেখাব জন্য জাতীয় আওয়ামি এবং বিপ্লাবিলনান দল এক চুক্তিতে আবদ্ধ করেছে।

কিন্তু সীমাবদ্ধনেতা আরও জানান যে মুসলীম লীগ নাকি জাতীয় আওয়ামি দলকে এক ইউনিট ভেঙ্গে দেয়া ছাড়া আরও প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। তাঁরা নাকি জাতীয় আওয়ামি দলের সদস্যদের পশ্চিম পাকিস্থান মন্ত্রিসভায় স্থান দিতে প্রস্তুত এবং সাধারণ নির্বাচনকালে দুই দলের মধ্যে একটা কার্যকর আঁতাত রচনাতেও তাদের আগ্রহ নাকি সমধিক।

জাতীয় আওয়ামি দলের উপদলগুলির মধ্যে কনিউনিষ্টরাই বোধহয় সব চেয়ে বেশী হতাশ হয়েছেন। কমিউনিষ্ট পার্টি বে-আইনী হওয়ার পর তাঁরা এই দলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। তাঁরা এই সব আঁতাতের আলোচনার মধ্যে একটা বিপদের সূচনা দেখতে পাচ্ছেন, কারণ মৌলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে তাঁরা যে নূতন কিষাণ সমিতি গঠন করেছেন তার মাধ্যমে আগামী নির্বাচনে দলের কর্তৃত্ব হস্তগত করার তাঁদের একটা সুপরি-কল্পিত প্লান আছে।

যদি এঁরা সদস্যবর্গ সমিতির অরাজনৈতিক দিকটার প্রতি সযত্নে অনুলি নির্দেশ করে থাকেন তবু শক্তিশালী রাজ-নৈতিক দলরূপে আবির্ভূত হওয়ার সমস্ত সম্ভাবনাই যে এর বিদ্যমান এ কথা অস্বীকার করা যায় না। সমিতির উদ্যোক্তারা প্রচার করেছিলেন যে সমিতি হবে কৃষকদের 'ট্রেড ইউনিয়নের মত। কৃষকদের বক্তব্য পেশা অভাব-অভিযোগের প্রতিকারে সমিতি সংগ্রামের করবে। কোনো বিরোধি দে প্রাদেশিক সরকার আগামী নির্বাচনে অংশগ্রহণের সময় সমিতির কার্যকলাপ বন্ধ করে দেবে এবং কৃষকদের বক্তব্য পেশা অভাব-অভিযোগের প্রতিকারে সমিতি সংগ্রামের করবে। কোনো বিরোধি দে প্রাদেশিক সরকার আগামী নির্বাচনে অংশগ্রহণের সময় সমিতির কার্যকলাপ বন্ধ করে দেবে এবং সমস্ত কর্মীবৃন্দ নির্বাচনে দলের সপক্ষে কাজে নিযুক্ত হবেন। কৃষকদের বক্তব্য পেশা অভাব-অভিযোগের প্রতিকারে সমিতি সংগ্রামের করবে। কোনো বিরোধি দে প্রাদেশিক সরকার আগামী নির্বাচনে অংশগ্রহণের সময় সমিতির কার্যকলাপ বন্ধ করে দেবে এবং সমস্ত কর্মীবৃন্দ নির্বাচনে দলের সপক্ষে কাজে নিযুক্ত হবেন। কৃষকদের বক্তব্য পেশা অভাব-অভিযোগের প্রতিকারে সমিতি সংগ্রামের করবে। কোনো বিরোধি দে প্রাদেশিক সরকার আগামী নির্বাচনে অংশগ্রহণের সময় সমিতির কার্যকলাপ বন্ধ করে দেবে এবং সমস্ত কর্মীবৃন্দ নির্বাচনে দলের সপক্ষে কাজে নিযুক্ত হবেন। কৃষকদের বক্তব্য পেশা অভাব-অভিযোগের প্রতিকারে সমিতি সংগ্রামের করবে। কোনো বিরোধি দে প্রাদেশিক সরকার আগামী নির্বাচনে অংশগ্রহণের সময় সমিতির কার্যকলাপ বন্ধ করে দেবে এবং সমস্ত কর্মীবৃন্দ নির্বাচনে দলের সপক্ষে কাজে নিযুক্ত হবেন। উদ্যোক্তারা বেশ ভালো করেই জানেন যে এই আনুগত্য অপরিবর্তনীয় নয় এবং আগামী নির্বাচনে যদি বা না হয়, অন্ততঃ তার পরবর্তী নির্বাচনে তাঁদের মনোনীত প্রার্থীরা এই সমস্ত সমিতি-সেবকদের সমর্থনে বঞ্চিত নাও হতে পারেন। কিন্তু পূর্ব পাকিস্থানে মৌলানা ভাসানীর জনপ্রিয়তা যদি হ্রাসপ্রাপ্ত হয় তবে কমিউনিষ্টদের পরিকল্পনা যে ব্যাহত হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

মৌলানার পূর্বেকার উক্তিগুলি কি ভাসিয়া গেল ?

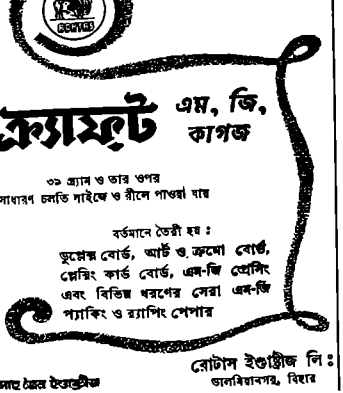

মুসলিম লীগের সহিত ভাসানীর আঁতাত ?

সাংবাদিক মহলে বিস্ময় কম্যুনিষ্টদলের হতাশা

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

ঢাকা—২৬শে ফেব্রুয়ারী, আমাদের এর আগে প্রকাশিত পাকিস্তান-সংবাদের ভবিষ্যৎবাণীতে যাঁরা বিশ্বাস স্থাপন করতে পারেন নি তাঁরা যদি গত বৃহস্পতিবারে মৌলানা ভাসানীর সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত থাকতেন তবে তাঁদের সংশয় অনেকাংশে নিরসন হত। দশ দিন করাচী বসবাসের পর চাকায় প্রত্যাবর্তনের চার ঘণ্টার মধ্যেই এই সম্মেলন আহূত হয়।

সম্মেলনে মৌলানা ভাসানীর ঘোষণা শুনে সমবেত ডজন দুই সাংবাদিক যে-পরিমাণ চমকিত হয়েছিলেন তার অংশ তাঁরাও কিছুটা গ্রহণ করতে পারতেন—এ আশ্বাস দিতে পারি বৈকি। মৌ: ভাসানী ঘোষণা করেন, "দরীয় রাজনীতির পথে নিমজ্জিত হয়েই পাকিস্তানের বর্তমান পরিষদীয় গণতন্ত্র বানচাল এতে বসেছে এবং এর প্রতিকারের জন্য প্রয়োজন, আগামী নির্বাচনে শুধু মাত্র শ্রেষ্ঠ গুণান্বিত প্রার্থিগণই যাতে নির্বাচিত হতে পারেন তার প্রতি নজর রাখা।" এ-কথায় অবশ্য কারও আপত্তি হবার কথা নয়। কিন্তু মৌলানার 'শ্রেষ্ঠ প্রার্থী' কথাটার অপরার্থ হল, 'সর্ব-স্বীকৃত প্রার্থী' অর্থাৎ একটি নিষুক্ত কর্মসূচীর ভিত্তিতে একতাবদ্ধ সমস্ত রাজনৈতিক দলের দ্বারা নিয়োজিত একটি সর্বদলীয় নির্বাচকমণ্ডলী এই সমস্ত প্রার্থীকে মনোনীত করবেন।

জনৈক দক্ষিণপন্থী সাংবাদিক তো তাঁর নিজের কানকেই যেন বিশ্বাস করতে পারলেন না। তিনি ফিসফিসিয়ে বললেন, "মৌলানার বক্তিতাটি পাবলে গোল নাকি? অতীতে হবু ডিরেক্টরদের মুখে এই যুক্তিতো হামেশাই শোনা গেছে।" অন্যান্য সাংবাদিকদের মুখেও একই বিস্ময়ের রেখা সুস্পষ্ট অঙ্কিত দেখলাম। তাঁরা অনবরত প্রশ্ন ছুঁড়ে মারতে থাকলেন মৌলানার দিকে। তিনি কি মুসলীম লীগ, নিজাম-এ-ইসলাম ইত্যাদি পার্টির সঙ্গে কোন নির্বাচনী আঁতাতের কথা ভাবছেন? একথা যখন সম্পূর্ণ নিশ্চিত যে আওয়ামি দল তাঁর কোনো পরিকল্পনায় কোনো অংশ গ্রহণ করবেনা তখন এই ধরণের চালে তাঁর দলের ভবিষ্যৎ কতখানি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে তা কি তিনি ভেবে দেখেছেন?

কিন্তু মৌলানা অটল! পুরো নব্বুই মিনিটের যুক্তিতর্কে তিনি এই কথাটাই বোঝাতে চাইলেন যে বৃহৎ দলগুলির একতা আজকের দিনে অত্যন্ত জরুরী। পাকিস্তান সৃষ্টির দশ বছরের মধ্যে এই দলগুলো কোনোদিন একত্র বসে বিবেচনা পর্যন্ত করে দেখল না, তাদের মত পার্থক্য কতটুকু। একত্র না বসলে আমরা কি করে বুঝতে পারিব যে আমাদের একতাবদ্ধ হওয়ার কোনে। সাধারণ ভিত্তি আছে কিনা।

এই সর্বদলীয় সম্মেলনের প্রতি আওয়ামি লীগের অনাগ্রহের কোনো কারণ মৌ: ভাসানী মানতে চাইলেন না, এমন কি সাংবাদিকরা যখন তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে বাগদত্ত পূর্বে আওয়ামী লীগ মৌলানার আহূত 'যুক্ত নির্বাচন দিবস' পালনে অস্বীকৃত হয়েছিল তাতেও মৌলানা ভাসানী ধমলেন না। তবে মৌলানা একথা স্বীকার করলেন যে আওয়ামী লীগ এতে এতে যোগ দানে দিলেও তিনি মুসলীম লীগ নিজাম-এ-ইসলাম বস্তুত সবনিম্ন কর্মসূচীর ভিত্তিতে কাজ করতে প্রস্তুত এমন যে-কোনো ব্যক্তির সঙ্গে তিনি সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। তিনি বলেন, "এখানে মাত্র পাঁচটি বড় দল আছে, তার তিনটিও যদি আমাদের প্রস্তাব সমর্থন করে তবে তাদের নিয়েই আমি কাজ আরম্ভ করব।"

এইভাবে তাঁর বক্তৃতা চলল, "প্রস্তাবিত সর্বদলীয় সম্মেলনে প্রত্যেক দল তার সর্বনিম্ন দাবী উপস্থিত করুক। তার পর পারস্পরিক আলোচনা এবং দেওয়া-নেওয়ার ভিত্তিতে একটা সাধারণ মিলন স্থান রচিত হবে। একদা যে সকল দলকে মৌলানা 'প্রতিক্রিয়াশীল' বলে আখ্যায়ত করতেন (এটি হল মৌলানার নব্যতম বিশেষণগুলির অন্যতম তাদের সঙ্গে একটা গোল টেবিল বৈঠকের জন্য মৌলানা ভাসানী কতখানি ব্যগ্র হয়েছেন, তাঁর নিম্নলিখিত কথাটি থেকে তার কিছুটা আঁচ পাওয়া যায়, "এমনও হতে পারে যে পশ্চিম পাকিস্থানে এক ইউনিট বাতিল করার দাবিকে অথবা আমাদের যুক্ত নির্বাচনের দাবীকেও হয়তো স্থগিত রাখতে হতে পারে।

মৌলানার শ্রোতৃবৃন্দ অতঃপর অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। অনেকেই ধৈর্য সন্ধানের উদ্দেশ্যে কক্ষ ত্যাগ করলেন; যাঁরা রয়ে গেলেন তাঁরাও প্রস্তাবিত সম্মেলনে কিভাবে মৌলানা ভাসানী আওয়ামি দলের স্বার্থের পরিপন্থী হতে পারে তার কল্পিত এবং ছেলেমানুষী প্রশ্ন মৌলানার দিকে ছুঁড়ে দিতে থাকলেন।

সাংবাদিকরা যখন এই আপাতঃ নূতন রাজনীতির গভীরতা পরিমাপে ব্যস্ত, তখন মৌলানা ভাসানী আবার বলে উঠলেন, "বন্ধুগণ! আমার বক্তব্য পরিষ্কার করে বলি। নির্বাচনী আঁতাত আমাদের প্রস্তাবিত সর্বদলীয় সম্মেলনের উদ্দেশ্য নয়।"

ঘরে একটা বোমা ফাটলেও বোধহয় সাংবাদিকরা এতটা বিমিত হতেন না। তাঁদের মনোগত ভাবনা বিদ্যুৎ মুহূর্তের উপরে ভেঙ্গে উঠল, "মৌলানার এ কি পরিবর্তন!" এক কোন থেকে একটি ক্ষীণ কণ্ঠের প্রশ্ন শোনা গেল, "তাহলে এই নব্বুই মিনিট ধরে আমরা কিসের আলোচনা করছি?" "আমার বক্তব্যের গাইডলাইন আমি বুঝিয়ে বলছি", মৌলানা ভাসানী উত্তর দিলেন এবং তার পরে তিনটি যুক্তির ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হলেন। সাংবাদিকরা তাতে মনোনিবেশ করলেন। সেগুলি হল-প্রথমতঃ করাচীর কোনো কোনো সংবাদে যেমন বলা হয়েছে আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে আঁতাত গঠনের জন্য মিঃ চুন্ডীগড়ের সঙ্গে তাঁর তেমন কোনো আলোচনা হয়নি। দ্বিতীয়তঃ তাঁর সবদলীয় সম্মেলনের আলোচনা দেশের আভ্যন্তরীণ, অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য বিষয়ের সীমাবদ্ধ থাকবে এবং পররাষ্ট্র নীতির সেই সমস্ত দিকগুলোর আলোচনা হবে যাদের সঙ্গে প্রথমোক্ত বিষয়গুলির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান; কিন্তু কোনো প্রকার নির্বাচনী আঁতাতের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক থাকবে না। তৃতীয়তঃ তিনটি সূত্রের সর্বনিম্ন কর্মসূচীতে, সম্ভব যে-কোনো দলের সঙ্গেই ন্যায্য নির্বাচনী আলোচনা চালাতে প্রস্তুত। এই তিনটি সূত্র হচ্ছে—যুক্ত নির্বাচনের নীতি গ্রহণ, নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতির প্রতি সমর্থন এবং ১৯৫৪ সালের যুক্ত ফ্রন্টের বিধ্বাত একুশ দফার মধ্যে বাকী চৌদ্দ দফার কার্যে রূপায়ণ।

(৯ম পৃষ্ঠার ১ম কলমে)

চাগলা কমিশনের রিপোর্ট সম্পর্কে শ্রীনেহেরুর অসহ্য মানসিক অবস্থা

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

জীবনবীমা কর্পোরেশনে মুন্দ্রার খেয়ার কেনার ব্যাপার নিয়ে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে সারা ভারতে এক আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে। এ আলোড়ন শুধু পার্লামেণ্টে, বা সমাজের উপর তলায় যাঁরা ব্যবসা ও শাসনের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট তাঁদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। জনসাধারণও প্রকৃত রহস্য জানবার জন্যে এবং এই কেলেঙ্কারীর কর্ণধারদের প্রতি ভারত সরকার কি আচরণ করেন, তা দেখবার জন্যে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। সর্ব স্তরের মানুষের এই আগ্রহ গণতন্ত্রের পক্ষে নিঃসন্দেহে এক বিরাট সৌভাগ্য ও আশার সূচনা করছে। প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু নিজেই লোক-সভায় এক বক্তৃতায় বলেছেন,—"এই সম্পর্কে (মুন্দ্রার খেনার ব্যাপারে) যে তদন্ত হয়েছে, তাতে ভারত ও বিশ্ববাসীর সমক্ষে ভারতের গণতান্ত্রিক কার্যপদ্ধতির প্রকৃত রূপ প্রকাশ পেয়েছে। এতে এই সংসদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ও নূতন দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছে।"

আর সরকারের বড় বড় উচ্চ পদে বসে সাধারণ মানুষের হৌয়াচ বাঁচিয়ে যে সব 'জবরদস্ত' লোকেরা জনসাধারণের টাকার শ্রাদ্ধ করে থাকেন, যা যে সব নেতারা সব ব্যাপারেই নেতৃবিচার ভোগে বাণী দান করতে চান, মুন্দ্রাঘটিত এই দেশব্যাপী আলোড়নের ফলে তাঁদের যদি কিঞ্চিৎ চৈতন্যোদয় হয়, তাহলে অনেকেই হয়ত শ্রীমুন্দ্রা ও তাঁর শেয়ার কেনার ব্যাপারে জড়িত ব্যক্তিদের 'শহীদ' বলে মেনে নিতে রাজী থাকবেন।

কিন্তু এত সব সত্ত্বেও সমগ্র ঘটনাটির মধ্যে একটি বড় রকমের খুঁত থেকে যাচ্ছে, যা অনেকের মনেই হতাশা ও বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে। এবং তার জন্যে দায়ী প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু নিজেই। এই ব্যাপারে তাঁর কিছু কিছু উক্তি, কোন কোন সময়ে বিরক্তি প্রকাশ, এমনকি আক্রমণাত্মক অসহিষ্ণুতা একেবারে সমালোচনার অতীত নয়। সহকর্মী শ্রীকৃষ্ণমাচারীর প্রতি অত্যধিক স্নেহবশতঃ তিনি অনেক সময়ে এমন সব উক্তি ও রূঢ় আচরণ করেছেন, যা তাঁর পক্ষে আদৌ গৌরবের নয় এবং যার ফল গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ ও দুর্নীতিদমন প্রচেষ্টার দিক থেকে ক্ষতিকর।

মুন্দ্রা-জীবনবীমা কর্পোরেশন কেলেঙ্কারীতে অর্থমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণমাচারী জড়িয়ে যাবার পর থেকে শ্রীনেহরু যেন সারা জগতের উপরেই চটে গেছেন—বিনিই

(শেষাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠার ৩ কলমে)

আজাদবিহীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় নেহরুর ডিক্টেটরি পুরাপুরি কায়েম

(দর্পণের বিশেষ প্রতিনিধি)

আমার এ চিঠি প্রকাশিত হ'বার আগেই নেহরু কেবিনেট পুনর্গঠিত হ'লে মোটেই বিস্মিত হ'বো না কেন না দিল্লীতে এখন ওটাই একমাত্র আলোচ্য বিষয়। শ্রীকৃষ্ণমাচারীর পদত্যাগের পর মওলানা আজাদের মৃত্যু—দু'দুজন কেবিনেট মন্ত্রীর শূন্যপদ বেশী দিন অপূর্ণ রাখা উচিতও নয় সম্ভবও নয়।

অর্থ মন্ত্রীর পদের মত শিক্ষা-মন্ত্রীর পদটা তেমন লোভনীয় নয় এবং এটা পুরণের সমস্যাও তেমন জটিল নয়। যিনি মওলানা আজাদের স্থলাভিষিক্ত হ'বেন তিনি শিক্ষাবিদ না হ'লেও ক্ষতি নেই, তবে তাঁকে মুসলমান হ'তেই হ'বে। এবং আমাদের ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের অংশে সৌভাগ্য একেবারে হাতের কাছে তিন জন মুসলমানকে পাওয়া গেছে যাঁরা, শুধু নীলেজকে একবার মাথা নাড়তেই লাইনে এসে দাঁড়াতে পারেন। আমি আলি ভাইার, জাফির হুসেন এবং হুমায়ুন কবীরের কথা বলছি-এঁদের যেকোন দু'জন আবার শিক্ষাবিদ। কবীর সাহেব আবার ছোটখাটো মন্ত্রীও।

শিক্ষাদপ্তর অবশ্য এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর নয় যে তার মন্ত্রীকে কেবিনেটের মর্যাদা পেতে হ'বে। আজাদ সাহেবের কেবিনেট মর্যাদা ছিল অন্য কারণে। কাজেই পরবর্তী শিক্ষা মন্ত্রীকে আইন মন্ত্রীর মতোই কেবিনেট পদমর্যাদা না দেওয়াও হতে পারে।

মওলানা আজাদের মৃত্যুতে দেশের অনেক ক্ষতি হোল সত্যি-তবে, বিশেষ করে ক্ষতি হোল বাংলা দেশের। নেহরু কেবিনেটে উনিই ছিলেন একমাত্র লোক যিনি বরাবরই বাংলা দেশের হ'য়ে টেনে কথা বলেছেন। বাংলা দেশের কংগ্রেস নেতারা একটু সক্রিয় এবং সচেতন হ'লে অনেক ব্যাপারেই মওলানার সাহায্য পেতে পারতেন—বাংলা দেশের দুর্ভাগ্য তার কংগ্রেস নেতারা সক্রিয় নয় তবুও মওলানা সাহেব স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বাংলা দেশের জন্যে যেটুকু করেছেন তাই যথেষ্ট। একটা দৃষ্টান্ত হোল রাজ্য পুনর্গঠনে বাংলা দেশ সম্পর্কে সরকারী সিদ্ধান্ত। কেবিনেট বৈঠকে মওলানা সাহেব উপস্থিত ছিলেন বলেই বাংলা দেশের লাবীকে একে বারে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হয়নি।

যে কেবিনেট বৈঠকে শ্রী টি, টি, কৃষ্ণমাচারীর পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করা হয় সে কেবিনেটের বৈঠকে মওলানা আজাদ উপস্থিত না থাকলে বোধ হয় ইতিহাস অন্যভাবে লেখা হোত।

একথা এখন আর অজানা নয় যে শ্রীনেহরু শ্রীকৃষ্ণমাচারীকে শেষ পর্যন্ত কেবিনেটে রাখতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন এবং একমাত্র মওলানা আজাদ ছাড়া আর কেউই তাঁর বিরোধিতা করেন নি। শুধুমাত্র, মওলানা আজাদ নাকি স্পষ্টই বলেছিলেই যে, যদি শ্রীকৃষ্ণমাচারীকে এখন বিদায় দেওয়া না হয় তো তিনি নিজেই বিদায় নেবেন।

আজাদ ছাড়া অন্য কেউ হ'লে শ্রীনেহরু হয়তো এই বিরোধিতাকে উপেক্ষা করতেন।

আজাদের মৃত্যুতে শ্রীনেহরুকে বলেছেন—সংকটকালে পরামর্শ নেবেন, এমন কেউ আর রইলো না। একথা খুবই ঠিক। জী-হুজুরদের কাজে নেহরু পরামর্শ নেন না। এখন যাঁরা রইলেন তাঁরা সকলেই ঐ জী-হুজুরের দলে।

ভালো হোক মন্দ হোক—নেহরু কেবিনেটে নেহরুই এখন রইলেন। সর্বেসর্বা হিসেবে। সর্দার প্যাটেলের মৃত্যুর পর যে পথ উন্মুক্ত হয়েছিল, কিশোয়াই এবং আজাদের মৃত্যুর পর সে পথ প্রশস্ত হোল-এইবার নেহরু ডিকটেটরী কায়েম হোল পুরোপুরি ভাবে।

সম্পাদক—শ্রীব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য

সত্যেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল প্রেস (প্রাইভেট) লিমিটেড, ২নং ওল্ডবিল্ডিংস কোর্ট হইতে মুদ্রিত এবং ৭নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা—১৩, দর্পণ কার্যালয় হইতে প্রকাশিত।

কেন্দ্রীয়দপ্তরের রেকর্ড উধাও

পুনর্বাসন বিভাগের ৪শত কোটি টাকার রেকর্ড জাল

সম্পাদকীয় ঃ

মহাপ্রভুর আফিম

কারও ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাসের উপরে আঘাত করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু গত বুধবার ক্যাবিনেটের বাজেটের উপরে যে দুশ্চিন্তা উদ্রেকচক্র করা হ'য়েছে, তাকে আমরা বাজনায়েশের একটা দুষ্টু দুর্ঘটনা বলে করি। সব চেয়ে পরিতাপের কথা, কতেকজন মন্ত্রীর প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় এই কাণ্ডটি সংঘটিত হয়েছে। মহাপ্রভুদের এই মহোৎসব উপলক্ষে ৩ মাইলব্যাপী শোভাযাত্রার নেতৃত্ব করেছেন শ্রীপুরুষ চন্দ্র সেন, যিনি বর্ত্তমানে দ্বিতীয় ব্যক্তি। যেখানে পার্কে মঞ্চের উপরে অধিষ্ঠান ছিলেন স্বয় পুলিশ মন্ত্রী কালিপদ মুখার্জী। দুর্ঘটনার প্রধান উদ্যোক্তা শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ উনবন দপ্তরের মন্ত্রী, অথাৎ কেন্দ্রস্থ পশ্চিমবঙ্গে আধুনিক প্রগতির বনিয়াদ তৈরী করবে বলে আমরা আশা করি।

পারীরিক এবং মানসিক উদ্বদ্ধির

থেকেই অর্দ্ধভুক্ত কতকগুলি হতভাগাকে এক শ্রেণীর মাতলামী এবং নির্বাধ অপৌরুষের মধ্যে নিমগ্ন করা হচ্ছে; দশ হাজার "লগ্গর" দুঃখজনক করতাল নিয়ে বিশ্ব পতাল্পীর রাজপথে "হরি হরি বোল" রবে মুক্তা করছে এবং কংগ্রেসের "সমাজতান্ত্রিক" নেতারা তার পুরোধা হয়েছেন—এ বেন বাঙ্গালাদেশের সভ্যতার পরাভব বরণ করা হচ্ছে।

মানুষকে যদ অনু দিতে না পারা যায় তাহলে এই ধরণের বনীয় আফিম দিয়ে ভুলোনো হয়। এবং প্রভুর চন্দ্র সেনের ন্যায় স্ত্রীরাই এই মাতলামীর উৎসাহদাতা হন। যেখানে পার্কের বস্তুতায় তিনি যথার্থ সংবেদনশ-প্রকাশ করেছেনেন। সেখানে তিনি বলেছেন যে, "বাইরে থেকে জীবনকে ঘিরে রেখেছে বহু অভাব ও দুঃখ।" এই দুঃখ ভুলবার (এবং শ্রীপুরু সেনের ন্যায় ব্যাবসায়ীকে পরিতে অব্যাহত রাখবার !) এক মাত্র উপায় হচ্ছে মহাপ্রভুর নাম কীর্ত্তনে মত্ত হওয়া।" কবেকটি স্ত্রী, কেরী ধর্মবতার এবং কিছু-সংখ্যক সিনেমার "পুে ব্যাক" গায়ক বিলে পশ্চিমবঙ্গে পরম সত্যনীর মহাপুরুষীয় কৃষ্ণকান্তের পুনরবতারণা করতে চাইছেন। কেন চাইছেন ? সেই উত্তর প্রত্যেকটি বস্তুতায় পরোক্ষে প্রকাশিত হয়েছে কতকগুলি ক্ষতিগ্রস্তোক, অল্পশাতগ্রস্ত নেতা এই ভণ্ডামীর দ্বারা দেশের লোককে বাস্তব জীবনবোধ এবং প্রাত্যহিক আদিম থেকে বিরাম করে দিতে চাইছে। নতুবা, পুরুষ চন্দ্র সেন— যিনি গান্ধীজীর শিষ্যত্বকে বিশ্বাস, তিনি অন্তত একথা জানেন যে, শান্তি ও অহিংসার বাণী প্রত্যক্ষর করার জন্য খোলকরতাল এবং কীর্ত্তনিয়ার আবশ্যকী করতে হয়না।

এই মন্ত্রীরাই একদিকে কর্ম-বিমুখ ভাগ্যানুধাপেক্ষিতার প্রশ্রয়দাতা। অন্যদিকে, এঁরাই রাজনৈতিক প্রাপ্তিফলে দাঁড়িয়ে থেপ্লেক্ষি করেন যে, বাঙ্গরার নোকেরা প্রগতির বধ্যে, তাদের বধ্যে আত্মোন্নতির চেষ্টা নেই। শ্রীপুরু সেন বরবার এক্সবিটে দাঁড়িয়ে বলেননি একথা ? তিনিই কি বরবার নিন্দা করেননি বাঙ্গালীর প্রবনিবুদ্ধতার ? অথচ মহাবুদ্ধীয় সংস্কার এবং আলস্যের বধ্যে মানুষকে দুঃ দাড়িয়ে রাখার বড় তিনিই উদ্যোগ করছেন। এবং সেইজন্য দেশবাসী ভণ্ডামীর মধ্যেকার প্রয়োজন হবেছে। কৈফবর্ধের বুল মাহাত্মা কিংবা বৈষ্ণব সাধনার যথার্থ মুল্য কেউ অস্বীকার করবে না। কিন্তু আদর মর্ম এবং বর্ত্তমান এই রাষ্ট্রসংকটে বৈষ্ণাব এক প্রকার নয়।

ভক্তশ্রেষ্ঠ গোপা তিনি স্বীয় কর্ত্তব্যাবোধের আইনসঙ্গত বেতন থেকে বঞ্চিত হবেন, তিনিই মহাপ্রভু অধিকন্তু কবেছেন। এবং

অকৃতকার্য, সবচেয়ে

সেই দুষ্টিক বিধাতা পুরুষ চন্দ্র অধিকের কৌতা হস্তে আবির্ভূত।

খোয়া রেকর্ড বদ্‌লে ভুয়া রেকর্ড তৈরী

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

লণ্ডনের ভারতীয় হাই কমিশনের কুখ্যাত স্টীল অথরিটি এবং লাইফ ইন্সুরেন্স কর্পোরেশনের টাকা নিয়ে কোথায় পুঁজিবাদী শ্রীমুন্দ্রার সঙ্গে দিল্লীর অর্থ দপ্তরের বিজ্ঞাপনকর লেন-দেন খুবই বড় রকমের কেলেঙ্কারী। এদেরই জুরী আবেকটি অ্যাওয়ের কথা শোনা যাচ্ছে। এবং শ্রীফিরোজ গান্ধী প্রমুখ অন্যান্য পার্লামেন্টের আর যে গুটিকয়েক সভ্যগ দন্যস্য আছেন, তাঁরা কেন যে এর এখনও খোঁজ পাননি, আশ্চর্য।

এই অপ্রকাশিত কেলেঙ্কারীর কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী, শ্রীমেহেরচাঁদ খান্নার দপ্তর সংক্রান্ত। শ্রীখান্নার দিল্লীর সেক্রেটারিয়েট থেকে অতি যত্নে রাখা একখানা দু'খানা নয়, একশ নও নয়, পাঁচ পাঁচ হাজার পশ্চিম পাকিস্থানী উদ্বাস্তুদের ক্ষতিপূরণের রেকর্ড উধাও হয়েছে বলে, বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়েছে। শুধু উধাওই হয় নি, তাদের প্রত্যেকটির বদলে, একটি করে নূতন রেকর্ড রাখা হয়েছে এবং এর প্রত্যেকটিই জাল রেকর্ড বলে দৃঢ় বিশ্বাস।

বর্ত্তমান রেকর্ড গুলি জাল বলে সন্দেহ জাগে, এগুলির মধ্যে ক্ষতি-পূরণের যে অঙ্ক লেখা আছে, সেগুলির পরিমাণ দেখে। প্রাথমিক সন্দেহের পরে পরীক্ষা করে দেখা গেল, পাঁচ হাজার রেকর্ডের প্রত্যেকটির মধ্যেই ক্ষতিপূরণের দাবীর পরিমাণ মুল রেকর্ডের অঙ্কের চেয়ে অনেক বেশী। এবং উদ্বাস্তরা গোড়ায় যা দাবী করেছিল, জাল করা রেকর্ডের অঙ্কগুলি হয়তার কাছা-কাছি না হয় তারও বেশী। গোড়ার দাবীগুলির পরিমাণ মোট 800 কোটিতে দাঁড়িয়েছিল।

বলা বাহুল্য, গোড়ার দাবীগুলি বহুপরিমাণে ফাঁপানো ছিল। এ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়ে ভারত সরকার দাবী-গুলির সত্যতা নির্ধারণের আদেশ দিয়েছিলেন, বছর সাতেক আগে। এ কাজের ভার পরে শ্রীমেহেরচন্দ খিন্না ও আব্বাজান পর্যবেক্ষক বিধ্বাস নিযুক্ত শ্রীজবোক সিং (ইনি এখন পরিকল্পনা কমিশনের সভ্যিকার বেহেন) এর উপর। পাঞ্জাবের রাজস্ব বিভাগের অন্যক কর্মচারী ছিলেন তিনি এবং এই প্রদেশের ভূমি ও রাজস্ব ব্যবস্থা সম্বন্ধে খুঁটিনাটি তাঁর নখ-দর্পণে।

পাকিস্থানের সঙ্গে দীর্ঘদিনব্যাপী আলাপ আলোচনার ফলে পূর্ব পাঞ্জাব থেকে যা কিছু রাজস্ব রেকর্ড পাওয়া গেল, তার সাহায্যে, পূর্ব পাঞ্জাবের গ্রাম পাটোয়ারীদের কাছ থেকে কাগজপত্র নিয়ে এবং সর্বোপরি নিজের জানা তথ্যের উপর ভিত্তি করে শ্রীসিং হাঙ্গামা বাধুনি থেকে প্রত্যেকটি দাবী পরীক্ষা করলেন। ফলে দেখা গেল, সগুলি দাবীই অসত্যভাবে বাড়ানো। তাই অনুসন্ধানের ভিত্তিতে উদ্বাস্তদের সত্যিকারের যা দাবী হওয়া উচিত, সেই রকম রেকর্ড তৈরী করা হল এবং এই রেকর্ড অনুযায়ী তাদের প্রাপ্য ধার্য্য হল, যা তারা দাবী করেছিল তার অর্দ্ধেকেরও অর্ধাৎ ২০০ কোটি টাকারও কম।

জাল রেকর্ড

একথা বাষ্ট্রহতেবেশী সময় লাগল না। এই সাবীনামের বধ্যে চতু ত্রে বিভিন্নীয় করচারীই আছে তা নয়। এর বধ্যে কেন্দ্রীয় ও রাজ্যের মন্ত্রী, পার্লামেন্ট এবং রাজ্য বিধানের বিধান সভা ও বিধান পরিষদের সভ্য এবং এ ছাড়াও বহু বনী ও প্রভাবশালী লোক এদের মধ্যে রয়েছে। এদের বিরোধিতা ও এদের মন্ত্রী সুপারিশ বাদ দিয়ে সত্যিও যখন তাদের দাবীর অঙ্কগুলি বেরিয়ে পড়ল, তখন এদের দুশ্চিন্তার সীমা রইল না। কলকাতায় পাকিস্থানে এদের আত্মীয়

(বাকী অংশ ৮ পৃষ্ঠায় দেখুন)

মেহেরবান মেহেরচাঁদ !

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

টাদ
খুতি
নিশ্চিন্ত।

* * *

পূর্বপাকিস্থান হতেছে নূতন উদ্বাস্তু আসার পথ বন্ধ করা, তাঁর সঙ্গে বহুবিধ বাধা অস্তিক্রম করে যারা এসে পড়ছে, তাদের সবরকম সাহায্য থেকে বঞ্চিত করা এবং সেসব হতভাগ্য বাস্তুহারা পশ্চিমবাঙ্গলার ক্যাম্পে রয়েছে তাদের বাইরে পাঠান—এ সবই তাঁর সুমহান চেষ্টার ফল।

* * *

পশ্চিম বাঙ্গলা এবং গোটা বাঙ্গালী জাতির প্রতি তাঁর দরদের একটি নূতন নজির আমাদের গোচরে এসেছে। কিছুদিন আগে দিল্লীতে বিভিন্ন ব্যাঙ্কের গভর্ণরদের বাৎসরিক সম্মেলন উপলক্ষে
শ্রীখান্না
এবং অন্যদের পশ্চিমে বাঙ্গা ও তাঁর অধিবাসীদের নিকাবার হক করেন অবশ্য রায় সম্পর্কে বিতুনা সংগতভাবে

* * *

ইতিমধ্যে পশ্চিম বাঙ্গার গভর্ণর সেখানে এসে উপস্থিত হন। শ্রীখান্না ভাবলেন শ্রীডেবী নাইডু ও তাঁর মত বাঙ্গালী বিদেষী এবং তাঁর নিন্দাবাদে সায় দেবেন শ্রীমতী নাইডু বাগ চেপে যতটুকু ভদ্রভাবে সম্ভব শ্রীখান্নাকে বললেন যে, তিনি যদি তার এই মনোবৃত্তি না বদলান, তাহলে তিনি প্রধান মন্ত্রীর নিকট রিপোর্ট করবেন।

* * *

অবশ্য এর পরেশ্রীখান্না শ্রীমতী নাইডুর নিকট ক্ষমা চাইলেন।

১ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা :: কলিকাতা—৭ই মার্চ শুক্রবার ১৯৫৮ :: মূল্য ২৫ নঃ পঃ

পুলিশের কথায় কি বিশ্বাস আছে ?

সোনারপুর রেল দুর্ঘটনা সম্পর্কে পরিশের ভুল তথ্য পরিবেশন

ডাঃ রায় অপ্রস্তুত !

পশ্চিম বাংলার পুলিশ বাহিনীকে হামেশাই নানা কারণে কড়া সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়, বিধান সভার বাইরে ও ভিতরে। প্রায় সর্বদাই ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় দাঁড়ান এই বাহিনীর সমর্থনে এবং তার কর্মদক্ষতার প্রশংসায়

পুলিশ বিভাগে, বিশেষত পুলিশ মন্ত্রী শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায় এবং পুলিশ প্রধান শ্রীহীরেন সরকারের দপ্তরের প্রমাণ ডাঃ রায় সম্প্রতি হাতে হাতে পেয়েছেন এবং বোধ হয় হাড়ে হাড়ে বুঝেছেন। তাঁদের কথা বিশ্বাস করে বিধান সভায় একটি বিবৃতি দিয়ে কি নাজেহালই না তিনি হয়েছেন !

বিবৃতিটি ছিল সোনারপুরের ট্রেণ দুর্ঘটনায় হতাহতের সংখ্যার উপরে। ডাঃ রায় পুলিশ মন্ত্রী ও পুলিশ প্রধানকে পাঠিয়েছিলেন ঘটনাস্থলে তদন্ত করে তাঁকে জানাতে। দুর্ঘটনা ঘটে সকাল ৬টায়, কলকাতা থেকে মাত্র ২৩ মাইল দূরে কিন্তু শ্রীমুখোপাধ্যায় ও শ্রীসরকার সন্ধ্যা ৬টার পূর্বে মুখ্য মন্ত্রীর নিকট তাদের রিপোর্ট পেশ করতে সক্ষম হন।

বিধান সভায় পূর্বাহ্নে তিনি কয়েকজনের পরিবারবর্গের প্রতি সহানুভূতি জানান এবং বলেন যে তিনি পুখানুপুখ তদন্তের জন্য কেরলাইকে অনুরোধ করেছেন। ইহরও শ্রীমুখোপাধ্যায় ও শ্রীসরকার ঘোনারপুর থেকে ফেরেন নি অথবা ডাঃ রায়ের সঙ্গে দেখা করবার সুযোগ পান নি।

তাঁদের সঙ্গে দেখা করবার পর ডাঃ রায় দ্বিতীয়বার বিধান সভায় দাঁড়িয়ে জানান যে দুর্ঘটনায় ৬ জনের মৃত্যু হয়েছে ৫ জন হাসপাতালে। কিন্তু সংবাদটী পাঠক নয়, হাসপাতালে কারও মৃত্যু হয় নি।

শ্রীমুখোপাধ্যায় ও শ্রীসরকার কি উপায়ে ভুল করেছিলেন আমরা তা জানতে না হলে বলা মুস্কিল। আর দশ জন লোক ওঘরে যেমন প্রভাবিত হয়, তাঁদের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। কারণ সোনারপুরে সাধারণ ভোর ৬ঘর ছিল যে একজনের হাসপাতালে মৃত্যু হয়েছে।

এই ৬ঘরই ছিল তাঁদের বিপোর্টের একমাত্র ভিত্তি। এরন কি কোন হাসপাতালে ওঁই ব্যক্তির মৃত্যু হল এবং তাঁর নাম কি তা পর্যন্ত অনুসন্ধান করবার প্রয়োজন তাঁরা বোধ করেন নি। অধিক রাত্রেও শ্রীসরকার সংবাদপত্রের ভোর দিয়ে বলেছেন, হাসপাতালে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে।

ডাঃ রায়ের বিবৃতির ভিত্তিতে তাদেরই প্রায় সব সংবাদপত্রে ৬ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়। বেতারে দেওয়া সংবাদটিকে হয়ত কেহ নি। বেলেঘাটা অভাটোর বাস নিয়ে থেকে টেলিফোনযোগে অনুসন্ধান করেন, সাঠিক সংবাদ কি।

ডাঃ রায় এবং পশ্চিম বঙ্গ সরকার একটি অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়েছিলেন। বিধান সভায় ডাঃ রায় এরূপ ভুল তথ্য পূর্ব বিষয়ে অসত্যভাব করেছেন স্বীকার করা নিতান্ত অসম্ভাবিক। কিন্তু না করে উপায় কি ? ডাঃ রায়ের অবশ্য আরও কারিত হল পরের দিন, যখন পূর্ব বেলওয়ে থেকে একটি তথ্য প্রেস নোটে জানান হল, মৃতের সংখ্যা পাঁচ, হাসপাতালে আরও ২জন মৃত্যু হয় নি। যে পুলিশ অফিসারের কথা ডাঃ রায় এত করেন, তাঁরাই তাঁকে এরেবারে বেকুব বানালেন। (২৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

শ্রমিকের অবস্থা ও সরকারী ব্যবস্থা

(বগত পৃষ্ঠার শেষাংশ)

শ্রমিকেরা পাবেন কিনা তারও কোন গ্যারাণ্টি পাওয়া যাবনি। একমাত্র ফল হয়েছে যে ১৯৫১ থেকে ১৯৫৬ সালের মধ্যে ৪৪ হাজার শ্রমিক ছাঁটাই হয়েছে।

র‍্যাশনাল ইকনমি, ছাঁটাই, লক-আউট

সরকার বিঘোষিত নীতি—র‍্যাশনালাইজেশন করতে গিয়ে ছাটাই করলে চলবে না। মালিকরা সে নীতিকে গ্রাহ্য করেন নি তা ওপরের তথ্য থেকে সুস্পষ্ট। গত অগাষ্ট মাসে র‍্যাশনালাইজেশন সম্বন্ধে তত্ত্ব করার জন্যে পশ্চিম বঙ্গ সরকার একটি ত্রিসদস্য 'এড হক' কমিটি বসান।

ভারতীয় ট্রেডইউনিয়ন সহ কমিটির সমস্ত শ্রমিক পক্ষ এক-বাক্যে সুপারিশ করেন যে অন্তত তদন্ত চলাকালে র‍্যাশনালাইজেশন তথা কর্মচ্যুতি বন্ধ থাক। সরকার সে সুপারিশ গ্রহণ করতে পারেননি। এবছর জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী মাসে র‍্যাশনালাইজেশনের নামে ১নং ব্রাউন স্যুটিং মিল সম্পূর্ণরূপে এবং নিউসেণ্ট্রাল জুট মিল আংশিকরূপে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। প্রায় দু হাজার বদলি ও স্থায়ী শ্রমিক কাজ হারিয়েছে।

পূর্ব বঙ্গে মালিকরা যখন খুশী শ্রমিক ও কর্মচারী ছাঁটাই করতে পারেন। এ ছাঁটাইয়ের পর কোনো শ্রমিক-মালিক বিরোধ বাধলে কোনো কৌশলে কেউ-না-কেউ সেটিকে বিচারের জন্যে ট্রাইবিউনালে পাঠান। কিন্তু বিচার চলা কালে ছাঁটাই শ্রমিক মাইনা পাবেনা। বিচারে যদি এক বছর বা দু বছর সময় লাগে। সুতরাং শ্রমিকের পক্ষে ব্যাপক লড়াইয়ে সক্রিয় থাকে না। তাদের সঞ্চিতি থাকে না। এবং কার্যদায় শ্রমিকরা পুরো সময় কাজ পায় না। তার-জন্য আইনত যা ক্ষতিপূরণ পাওয়া তাও অনেক সময় পায় না।

তার ওপর যখন তখন লক-আউট বা অবরুদ্ধতি কাজ বন্ধ। এ বিষয়ে পশ্চিম বঙ্গের মালিকদের বৈশিষ্ট্য আছে। ১৯৫৫ সালে সারা ভারতে মোট লক আউট হয়েছিল ৬৭টা, তার মধ্যে শুধু পশ্চিম বঙ্গেই ৪২টা, অর্থাৎ সারা ভারতের শতকরা ৬৩ ভাগ। ১৯৫৬ সালে সারা ভারতে মোট লক-আউট ৮৮টা, তার মধ্যে পশ্চিম বঙ্গে ৪৫টা, অর্থাৎ শতকরা ৫১ ভাগ। এই লক-আউট নিবারণ করতে সরকার অক্ষম।

ট্রাইবিউন্যাল

শ্রমিক যাতে তার ন্যায্য পাওনা পায় এবং শিল্পে শান্তি রক্ষা হয় সেজন্যে সরকারের ট্রাইবিউনালের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু শ্রমিকরা সতক্ষণ না স্ট্রাইকে নামবে বা নামবার উপক্রম হয় ততক্ষণ পর্যন্ত ট্রাইবিউনাল দেওয়া হয় না এই সাধারণ নিয়ম।

পুনরত ট্রাইবিউনালের বিচারকেরা কেউই শ্রমিক শ্রেণীর লোক নন। তাঁদের শিক্ষাদীক্ষা ও ধ্যানধারণা সাধারণত ধনবাদী অর্থ-নীতি তথা শ্রমিকশোষণ নীতির অনুকূল। অনেকে আবার অংশীদাররূপে বা অন্যরূপে প্রত্যক্ষভাবে মালিকশ্রেণীর সঙ্গে যুক্ত। এ অবস্থায় তাঁরা শ্রমিককে কতখানি সুবিধা দিতে রাজি হবেন তা অনুমান করা কঠিন নয়। বিচারকদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্বন্ধে দু একটা উদাহরণ দিলে কথাটা আরও বোঝা যাবে।

রায়ের নমুনা

এ আর মুখার্জি এণ্ড কোং ও তাঁদের শ্রমিকদের বিরোধে একজন শ্রমিকের ছাঁটাই সম্বন্ধে বিচারক রায় দিয়েছেন (কলিকাতা গেজেট, ২২ আগষ্ট ১৯৫৭):

"In the circumstances, I must find that the termination of the Scrvice of the workman was not justified, rather he was vindictively victimhised and this is a case of unfair labour practice.

"The normal relief is re-instatement, but in view of fact that the re-instatement, if granted, would seriously tell upon the industrial peace of the company and be detrimental to the discipline in the rank and file of the management, I do not grant re-instatement."

এর, কাণ্ডারি এণ্ড সন্সে একজন ড্রাইভারের ছাটাই সম্বন্ধে বিচারক রায় দিয়াছেন :

"I must, therefore, find that the action of the proprietor in summarily dismissing the driver is utterly unjustified and unreasonable.

"Next comes the question of relief. In the interest of both the driver and the proprietor, I feel reluctant to drive the driver back to his old master, who thus behaved crucllly with him. If I do so, I shall be really throwing the driver from the frying pan into the fireo In this view of the wattar the prayerof re-instate ment is refused."

সরকারী মজুরি নীতি ও ট্রাইবিউনাল

মিস্টীদের, ট্রাইবিউনালগুলি সরকার কর্তৃক নিযুক্ত। কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে তাঁরা যদিই বা কিছু এদিক ওদিক করতে পারেন, যেখানে কোনো ব্যাপক সংকট কর্মচারীর প্রধু মত কিংবা যেখানে কোনো রায়ের ফলে ব্যাপক প্রভাব সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা আছে সেখানে সরকারের সাধারণ নীতি থেকে তাঁদের বাইরে যাওয়া খুব কঠিন। সুতরাং সরকারী শ্রমনীতিই সাধারণ-ভাবে ট্রাইবিউনালের নীতি নির্দ্ধারণ করে, খুব বেশী, এদিক ওদিক হতে পারে না।

এই মুহূর্তে শ্রমিক ও কর্মচারীদের কাছে যা সব চেয়ে আশু প্রশ্ন—উৎপাদন বৃদ্ধি ও মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে অন্ততপক্ষে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেতন-বৃদ্ধি আদায় করা—সে সম্বন্ধে পশ্চিম বাংলা সরকারের নীতি কি? তাঁরা বলেন যে আরও উৎপাদন বৃদ্ধি না হলে বর্ধমান আয় বৃদ্ধি করা যেতে পারে না। ("চাহিদার সৃষ্টি করে অথচ সমপরিমাণ উৎপাদন বৃদ্ধি করে না—এরূপ কোন কিছুর আমরা প্রশ্রয় দিতে পারি না"—মুখ্যমন্ত্রীর বক্তৃতা, ১৯৫৮)। এ অবস্থায় সদিচ্ছা থাকলেও ট্রাইবিউনাল-গুলি কত দূর যেতে পারে? যে শ্রমিকদের অবস্থা সাধারণ মানের নীচে সেখানে হয়তো কিছু উন্নতির সুপারিশ করতে পারে। কিন্তু সাধারণ মানের ওপরে ওঠাতে কোন ট্রাইবিউনালই সাহস করবে না—এ সিদ্ধান্তই

(৫ম কলমে দ্রষ্টব্য)

কেন্দ্রীয় রেল কর্তৃপক্ষ এবং রাজ্য পুলিশের মধ্যে কলহ

(১ম পৃষ্ঠার ৫ম কলমের পর)

কিন্তু প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে শ্রীমুখোপাধ্যায় ও শ্রীসরকার কিসের জন্য সোনারপুর গিয়েছিলেন? শুধু প্রবল ভাতা আদায় করবার জন্য? ফুদে স্থানীয় অফিসারদের বক্তব্য জানবার জন্য তাঁদের ঘটনাস্থলে যাবার কোন প্রয়োজন ছিল না। তাঁর জন্য তো টেলিফোন ও পুলিশ বেতার ব্যবস্থাই আছে।

প্রসঙ্গত রেলওয়ে দপ্তরের সঙ্গে পশ্চিম বঙ্গ পুলিশের দীর্ঘদিন যাবৎ যে ঝগড়া চলছে তার উল্লেখ করা যেতে পারে। ঝগড়ার বিষয় হচ্ছে, রেলের ওয়াগন থেকে মালচুরি বন্ধ করার ব্যবস্থা নিয়ে। কিছুদিন যাবত প্রকাশ্যেই এ ঝগড়া চলছে একে অপরকে যা বলছে, তার নির্যাসটার্থ হচ্ছে "তুই চোর"। সত্য যে দুদিকেই আছে, কোন সন্দেহ নেই।

জল কতদূরে গড়িয়েছে দেখুন রাজ্য পুলিশ দপ্তর থেকে বহুবার রেলকর্মীদের সংখ্যা দেওয়া হয় যে রেলের মাল চুরির প্রধান কারণ হল রেলকর্মী ও দুর্বৃত্তদের যোগসাজস। এ যোগসাজসের ফলে রাজ্য পুলিশের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে বলে জানান হয়।

বহুদিন যাবত গোপনে দুপক্ষের মধ্যে আলাপ আলোচনা হয়। ফল তার কিছুই হয় নি। অচিরেই সংঘাতপত্র বারম্বার প্রত্যেক পক্ষ নিজ নিজ কাগজের চেষ্টা শুরু করে। কিন্তু শেষ অবধি অবস্থা এতদূর যায় যে, দক্ষিণপূর্ব রেলওয়ে একটি প্রেসনোট যারা মালচুরি প্রতিরোধ করবার ব্যবস্থার প্রধান পরিচয় দপ্তরকে দুষীরেল সরকারের পুলিশ বিভাগের উপর চাপায়।

এই প্রেস নোটে (জানুয়ারী মাসে) বলা হয় "দুর্নীতিপরায়ণ রেলকর্মীদের দুর্নীতির অনুসন্ধান যা কিছু সম্প্রতি হয়েছে তা কেবল সংপ্রতিষ্ঠিত কয়েকজন রেলকর্মী নায়িনী ও রেলকর্মীদের সাহায্যে, এ ছাড়ার পুলিশ যারা নয়। পাছে পুলিশ এক-দলবাসের অধিক অনুসন্ধান বা মাল-পুলকজারের কাজে অংশ গ্রহণ করতে পারে তি।" প্রেস নোটে আরও বলা হয় যে রেলরক্ষী বাহিনী দুর্বৃত্তদের গ্রেপ্তার করে রাজ্য পুলিশের হাতে দেয়া সত্ত্বেও অনুসন্ধানে গাফিলতির জন্য রাজ্য পুলিশ আদালতে রেলীয় ভাগ কোনকে সাজা দেয়ার দায়িত্ব পালনে অক্ষম হয়েছে।

শ্রীমুখোপাধ্যায় ও শ্রীসরকার সোনারপুর দুর্ঘটনার পর যা করেছেন, তাতে অবধা কোথায় পৌঁছে বলা কঠিন।

রেল কর্তৃপক্ষ তাদেরকে ও পশ্চিম বঙ্গ সরকারকে সোনারপুরে ব্যাপারে কিছুটা বুদ্ধিলে দেনেছেন। কিন্তু তাঁদের নিজেদের কাছে গাফিলতি সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই আজ আর উঠতে পারে না। পর পর দুর্ঘটনা যেকে ঝাঁক করা যায় যেন পরিচালন ব্যবস্থা কতদূর বিশৃঙ্খল হয়েছে।

মিঞ্জীর হিন্দুস্থান টাইম্‌স্ এ এই অব্যবস্থার উপর চমৎকার একটি কার্টুন বেরিয়েছে। কার্টুনে অনেক ভদ্রলোককে বিচারার্থে ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে উপস্থিত করেছে এবং সাথে বলছে: "হুজুর, এই ব্যক্তি ট্রেনে উঠবার চেষ্টা করছিল, আমি তখনই এঁকে গ্রেপ্তার করেছি।" বস্তুত ট্রেনে চলা প্রায় আত্মহত্যার চেষ্টার সামিল হয়ে উঠেছে!

জাল রেকর্ড তদন্ত ব্যাপারে শ্রীখান্নার ইচ্ছা অস্পষ্ট

(১ম পৃষ্ঠার ৯ম কলমের পর)

শুরু হয়ে গেল। এবং কিছুদিন, বেশ কিছুদিন, পরে কয়েকজন নিম্নপদস্থ কর্মচারীর অনুসন্ধানের ফলে ধরা পড়ল মূল রেকর্ডগুলি উধাও হয়েছে, এবং তাদের জায়গায় রয়েছে আসল কপি রেকর্ড।

ডীঘর কেলেঙ্কারী। শ্রীখান্নার কানে আসার পর, তিনি তাঁর সেক্রেটারীকে বরকানেন। সেক্রেটারী বরকানো তাঁর অধীনস্থ কর্মচারীদের। পরে দেখা গেল, এর জন্য দায়ী বহুসংখ্যক লোক। কাজেই একজন ক্ষেত্রে না হয়, তাই হল ব্যাপারটি চাপা দেওয়ার চেষ্টা হল। মস্ত শ্রীখান্না ইস্তাই চাইছিলেন।

কিন্তু ভিন্ন রাজ্যের কয়েকজন কর্মচারীদের মধ্যে চাপা গুঞ্জন আর বন্ধ হয় না। স্বয়ং শ্রীখান্না মুখে বলছেন, তিনি ব্যাপারটির রহস্য উদ্ঘাটন করবেনই। দু একজন বিশ্বাসীর দিনিয়র অফিসারকে এই কাজের ভার দিতে বলছেন, কিন্তু লিখিত কোন অর্ডার দিচ্ছেন না।

এতে শ্রীখান্নার সত্যিকার ইচ্ছা অস্পষ্ট থেকে যাচ্ছে। ফলে কোন অফিসারই কাজটি হাতে নিতে সাহস পাচ্ছে না। হাতে নেবার সাহসের অভাবের আরেকটি কারণ যে সব পশ্চিম পাকিস্তানী উদ্বাস্তুর স্বার্থ এতে জড়িত তাদের মধ্যে বহু প্রভাবশালী ব্যক্তি রয়েছে।

ইতিহাসে বা নেই

এই পশ্চিম পাকিস্তানে ফেলে আসা সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যাপারে এক বৃহৎ প্রশ্ন কোন কারণ যেন উঠেছে। প্রশ্নটি হচ্ছে নীতিগত? ঋণ, গ্রান্ট ও এরকম বিবিধ পুনর্বাসন সাহায্যের উপরেও ফেলে আসা সম্পত্তির দরুণ ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নজির পৃথিবীর অন্য কোন দেশের ইতিহাসে পাওয়া যায় না। অবস্থার চাপে ও ভাবাবেগের বশবর্তী হয়ে কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন দপ্তরের প্রধান শ্রী গোপালস্বামী আয়েঙ্গার বলে ফেলে-ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানী উদ্বাস্তুদিগকে তাদের ফেলে আসা সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। তাঁর তথা ভারত সরকারের এই দেওয়া প্রতিজ্ঞা কখন কখায় পশ্চিম পাকিস্তানী উদ্বাস্তুরা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। তাদের দরদেও নিজের এবং স্ব গোষ্ঠীর স্বার্থের তাগিদে শ্রীখান্না 'প্রতিজ্ঞা' রক্ষার্থে বদ্ধপরিকর।

কিন্তু তাঁর এই সত্যনিষ্ঠা হতভাগ্য পূর্বপাকিস্তানী এবং তাদের বন্ধু যেতে চলে আসা উদ্বাস্তুদের বেলায় সেই কেন? তাদের চলে আসার পথ উন্মুক্ত রাখা হবে এবং এলে পরে তাদের পুন-র্বাসনের দায়িত্ব ভারত সরকারের—এ সব প্রতিশ্রুতি কি দেওয়া হয় নি?

এরা যখন আসতে আরম্ভ করল, তখন অবশ্য ভারত সরকার উদ্বাস্তুদের ফেলে আসা সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নীতির অযৌক্তিকতা উপলব্ধি করে ফেলেছেন। তাই এদের সম্বন্ধে শুধু পুনর্বাসনের দায়িত্ব নিতে স্বীকার করলেন। কিন্তু এই অপেক্ষাকৃত কম দায়িত্বে এঁরাও বহুদিন শ্রীখান্না নির্বিকার-ভাবে অপূর্ণ।

(৩য় কলমের শেষাংশ)

যুক্তিসিদ্ধ। কার্য ক্ষেত্রেও প্রায় তাই হয়।

রায় কার্যকরী করা

তৃতীয়ত ট্রাইবিউনাল লড়ার দিক থেকে শ্রমিকের তুলনায় মালিকের সঙ্গতি ও সুবিধা অনেক বেশী তো বটেই, তার ওপর ট্রাইবিউনালের সিদ্ধান্ত বিলম্বিত করা বা অগ্রাহ্য করা মালিকদের মধ্যে খুবই প্রচলিত। একটি উদাহরণ দিই :

১৯৪৮ সাল নভেম্বর্স ব্যাঙ্কে ৪৪জন কর্মচারী ছাঁটাই হন। চার বছর ধরে বিচার ইত্যাদির পর ১৯৫৪ সালে ট্রাইবিউনাল রায় দেন যে ছাঁটাই কর্মচারীদের কাজে নিতে হবে। কিন্তু মালিকরা হাইকোর্ট, সুপ্রীম কোর্ট ইত্যাদি ক'রে আরও চার বছর ট্রাইবিউনালের হুকুম এড়িয়ে যান। গত ১০ই ফেব্রুয়ারী সুপ্রীম কোর্ট তাঁদের সমস্ত দরখাস্ত নামঞ্জুর ক'রে দিয়েছেন। কিন্তু তবুও ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ ট্রাইবিউনালের সন্ত মানছেন না, বরঞ্চ কমচারীদের কাজ নিতে অস্বীকার করছেন। সরকার এ সম্বন্ধে এখনও কিছু করতে পারেননি।

পশ্চিম বাংলার শ্রমিকদের অবস্থা আর সরকারী ব্যবস্থা—এই তার চিত্র। অবশ্য ও ব্যবস্থার আরও অনেক দিক আছে, সে সব কথা আপাতত তুলাইই না। যে ছবিটুকু এখানে তুলে ধরা হল সেটুকু থেকেই বোঝা যাবে যে, শ্রমিকদের অবস্থা অসহ্য, কিন্তু সরকারী ব্যবস্থার পাল্লা মালিকদের দিকেই ঝুঁকে আছে।

হিঃ টিঃ ছট্,

—কবি গৌড়ানন্দ

বর্ষের সূচনাটুকু দর্পণের পূর্বতনী সংখ্যায় আমি কেওয়ে বর্ষনা করেছি তাতে অনেকেই পুছুর উপায় বোর করেছেন। এবং কিওয়ে এই পথে চলা যায়, সে বিষয়ে আমার কাছে পরামর্শ চেয়েছেন। গৌড়ের তরুণ বয়সেরই আলোড়নটা বেশি পরিমাণে, দেখা যাচ্ছে। এবং অনেকে এও বলেছেন, অতঃ এই একটি ক্ষেত্রে আমরা প্রধান করতে চাই যে গৌড় বাসীর ব্যবসাতে সাফল্য অর্জন করতে পারে।

এ অতি উত্তম কথা। গৌড়বাসীর এই নবোদ্যম সফল হোক, এর চাইতে বড় প্রার্থনা আর আমার নেই।

* * *

ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে বর্ষকে শুপ্রতিষ্ঠি করবার মত সুবিধা এই যে, এতে বুলধন লাগে না। লেন দেন এবং চিত্ত বিনোদন এক সাথে চললেও তার জন্য বিক্রয় কর বা প্রমোদ কর দিতে হয় না। পরিশেষে লক্ষ লক্ষ টাকা মুনাফা হলেও জাতীয় নরকারের বর্ধপূণাতে কন্যাদে এক কানাকড়িও আহরণ দিতে হয় না।

* * *

একদিন দিয়ে নারিকেল বৃক্ষের মগডাল থেকে পড়ে একটি নারকেল যায়। কাণ্ড থেকে ফল ইচ্ছত ছোবড়া পর্যন্ত, তার সব টুকুতেই মুনাফা অর্জিত হয়।

* * *

ভাবলে মনে করবেন না, এটি নিতান্ত একটি সহজ কার্য। এই ব্যবসাতে সর্বাপেক্ষা কঠিন কর্ম হচ্ছে অবতারের একটি পেটেণ্ট আবিষ্কার। বহিত গৌড়বেদাদের আবহাওয়া যথেষ্ট অনুকূল, তথাপি কত শুত্র কি ঠাকুর মহাশয়দিগের আবির্ভাব ঘটে? না কি একদিনেই বাঘার মোহাম্মদিদের প্রতিষ্ঠি হয়?-

* * *

পেটেণ্টটার আবিষ্কারকালে একটি প্রধান জিনিষ মনে রাখতে হবে: আপনার পরিষদার যে বক্তেন না নিম্ন নিম্নাপর কোন প্রেণীর লোক? কুষক, শ্রমিক অথবা ব্যবসায়িক সম্পুদায়ের?

বর্তমান কালে, আমার পরাধর্ণ হচ্ছেএই যে, কৃষক এবং শ্রমিকদিগের সহায়তা না বাড়ানোই ভাল। ঐসব ক্ষেত্রে পরিশ্রমের তুলনায় রিটার্ণ ভাল আসে না।

* * *

ব্যবসিত এবং ধনী ব্যবসায়ীরাই এ যুগের বর্ষ ব্যবসায়ের পেটেন্টিয়ার পরিষদার। এক কথা বেন সর্বদা স্মরণ থাকে।

* * *

বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের এবং ব্যবসিত্ত ব্যবসায়ীগণের অধিকাংশই (যেহেতু ইনক্লুল কালেজে বিজ্ঞান বিষয়ে শুভূত পাঠ নিয়েছেন) বিজ্ঞানের পোঁড়া ভক্ত। কাজেই নবযুগের পেটেণ্টাটিতে সায়েণ্টিফিক টাচ্ একটু থাকা ভাল। তাতে কাজের সুবিধা হবে।

* * *

বিজ্ঞানের গাছে ধর্বের ফলন লাগিয়ে একটি চারাও যদি উৎপন্ন করা যায় তাহলে আমার ধারণা, এই ধর্ব-বিজ্ঞান-বৃক্ষের বর্ধান ফলনীল বেশ চড়াপাবে বাড়তে ছাড়া যাবে। এবং সেই ফল কেবলমাত্র জন্য বিশেষর বাজারে বার বার কাট কাট পড়ে যাবে।

* * *

পেটেণ্টটি যদি বিজ্ঞানের পি এইচ ডি ডিগ্রিধারী হ'ন তবে তো সোনায় সোহাগা। কেন, বলি। বিজ্ঞানের ছাত্র যদি বিজ্ঞানকে ব্যবসায় করে তবে তার ঘোর বেশি হয়। সত্যোন বস্তুর মত ওজনের কোন কেউ কেউ যদি আজ ইংরাজী সংবাদপত্রে এক বিবৃতি দেন যে, সারাজীবন বিজ্ঞান সাধনা করিয়া দেখিলাম যে ওপথে বেশি কুছ অগ্রসর হওয়া যায় না। অতএব বিজ্ঞানকে পরিত্যাগ পুর্বু ধর্মাদি করেনবু। তবে এ উক্তি লক্ষ টাকার সমান। অন্যথায় কেন করা এই এস সি অথবা অতাবপক্ষে বি এস দিতেও কাজ চলতে পারে। ইংরেজি সাহিত্য এবং ফিলসফিকে কিছু বাছা বাছা কোটেশনেও বিশেষ বুৎপত্তি অবশ্যই পুরোজন।

* * *

আর অবশ্য প্রয়োজন একখল ভূমিকির প্রচারকের। এদের মধ্যে বিখ্যাত সাহিত্যিক,ব্যারিষ্টার, দিলাত ফেরৎ যে কেউ (কারণ বিলাত ফেরতদের প্রতি ব্যবধিত নাগরিক নাম্বরিকাগণের শ্রদ্ধা অপরিসীম) এবং কিছু আধুনিক যুগের কনভাট করা ক্ষমাই বাঞ্ছা বাঞ্ছা বিশেষ দরকার। আর চাই কিছু সুকোমল কান্ত মুকণ্ঠ তরুণ। আমের ডাব নেই চুলু, সাদা দেখে নানা বয়সি নিশানা এসে পুছুর পারে লুটিয়ে পড়বেন।

* * *

সাহেব মেম আর আপদের মত মুর্গুড় নেই। অনেক জলতে আজকাল তাদের নিয়ে পুছুর বাহাদুর প্রচার করা যাচ্ছে। যে কারণ পরাধর্ণ দিই, বিজ্ঞাপনগুলি বের পুরুষের (চেহারা) বেশ যথেষ্ট পাবিত্যপূর্ণ হয়। এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞ প্রফেসরপণকে বিশেষভাবে কাজে লাগান যেতে পারে) আমাদের ইংরেজী সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।

* * *

এবারে আশ্রম। ওগুলির গঠন এমন হওয়া চাই, যেন ওগুলিকে নিত্য নিত্যরা তাঁদের শৈশবের ক্রীড়াক্ষেত্রে, যৌবনের উপবন ও বার্ধক্যের বারাণসী বলে ভাবতে পারেন। আশ্রমগুলি নদীর উপকণ্ঠে বেন হয়। খরগুলি ভর্যাপাটার্সে হওয়া চাই। রুচি ও আরাম বেন সবভারে বিদ্যমান থাকে। অবশ্য উদ্যান, ছোট ছোট সরোবর, পুলপবীথিকা ইত্যাদি তো রাখতেই হবে। তাছাড়া অনতার সেবা করা ও সরকারী গ্লাণ্ট প্রাণ্ড আমার কেরফিকাল ইনকুল, বিদ্যালয়, কলেজ এবং ছোট খাটো ওয়ার্কশপও আশুমে রাখতে হবে। বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে বেন আশুম আতার ও আশুম ডনিনীগণের অবাধ মেলা-মেশার কোন ত্রুটী না থাকে। এবং পৌঢ় বাতার অন্য তরুণী ডনিনী ও অপেক্ষাকৃত বয়স্কা ডনিনীর জন্য সুবর্ণন তরুণতর রাতার বেবার ধার বেন অনর্গল থাকে। আশুমের পৌঢ়া কন্যাদিগের অন্য ডাকের ডাবিত না হলেও চলবে। স্বয়ং পুভুই তাঁদের আশুম।

* * *

পানা পার্বণ উৎসব ইত্যাদিতে স্বানীয় এম এল এ, মন্ত্রী, রাজ্যপাল, উপরাষ্ট্রপতিকে, কণাচি রাষ্ট্র-পতিকেও আমন্ত্রণ করে আনতে হবে। কারণ এঁরা আসা মাত্রে সংবাদপত্রে বিপোর্ট বার আসা, তিনি ডিভিসনের কাবেবানায়ন আসা। এবং তার ফলে সবপু দেখে আশুম ও পুভুর বাহাদুর গোচরে পুচারিত হবে। বেন ধর্মপ্রাণ হবে।

* * *

পুনশ্চ সাংবাদপত্রের এডিটর-বিগকে কণাচ হাত ছাড়া করবেন না। সম্পাদকীয় স্তম্ভ তাঁদেরই হাতে। দেশের লোককে ভক্তির করতে তাঁদের চাইতে ওস্তাদ আর কেউ নেই।

❀ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু ❀

নিরাপত্তা ও ব্যক্তি স্বাধীনতা

কবি গৌড়ানন্দ দর্পণের একটি সংখ্যায় ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং নিরাপত্তা সম্পর্কে যে আলোচনা করেছেন, সেজন্য তাঁকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। তিনি যে পুশ্নটি সামনে তুলে ধরেছেন তা মানব সভ্যতার মূল পুশ্ন। সেটি হচ্ছে ব্যক্তি মানুষ বড়, না সমষ্টির ইম্পাত মানব জীবন নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে চূড়ান্ত বেন গণ্য করে। যে সমষ্টি যদি রাষ্ট্রিক কর্তৃত্বের রূপ নিয়ে ধাপট চালায় যথেচ্ছাচার চালায় তা হলেও?

মুখে মুখে সমষ্টির নামেই কি বর্বীর, কি সামাজিক, কি রাষ্ট্রিক পুভুত্ব মানুষের জীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে। এদের বৃত্তান্ত অবশ্যের বিজ্ঞানের অবরবাত্রা হয়েছে ব্যাহত, গ্যালিলিওকে বৈজ্ঞানিক সত্য বলার জন্য বীর্ঘাত পাদরীদের কোপে পড়তে হয়েছিল। বর্ষাধনব যীশুখৃষ্টকে সমাজ ও রাষ্ট্রের পাণ্ডাদের কোপে পড়ে ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু বরণ করতে হল। সক্রেটীসকে বিষপান করতে হল। কিন্তু রাজার অত্যাচার, সমাজের ধাপট—সবই কালের অবোবধিবাদে বুলোর নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। ব্যক্তি মানুষের অমর বাণী প্রুবতারার মতো বিরাজ মানব জাতিকে পথ দেখাচ্ছে।

মানব সভ্যতার বধাযুগে রাজা, সমাজ, বর্ণাশ্রম, সমষ্টির বীর্ঘাত যে ধাপট দেখা গিয়েছিল, তার চেয়ে ভয়ংকর হয়েছে বন্ধকল; বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বযুদ্ধ এসে গ্র্যানাইট পাথরের মত বজ্রবৎ রাষ্ট্রিক, বর্বীয় ও সাম্প্রদিক আধিপত্যের প্রাচীরে আঘাত করেছে। যেসে যেসে চিন্তানায়কেরা তাঁদের দেখবীর মারুষ্ব মানবের মুক্ত আত্মাকে আগুত করেছেন, তাদের পীড়িত ক্লিষ্ট পুাণকে বলিপিষার যীশু করে তুলেছেন। ফরাসী বিপ্লবের ডনতেরাঁ, রুশো, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন—মানব জাতির সভ্যতার অগ্রগতিতে এঁরা যে অবদান ইতিহাসে চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে।

কিন্তু এ সব সত্ত্বেও বুল পুশ্ন থেকেই যাচ্ছে। ফরাসী বিপ্লব, রুশ বিপ্লব কোন বিপ্লবের ফলেই মানুষের স্বাধীনতার বরজা খুলে যায়নি। ফরাসী বিপ্লবের প্লোগান ছিল সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা। কিন্তু ফরাসী বিপ্লবের পরে যা ঘটল তাতে কি এই তিনটি বরতী বাণীবাহী পতাকার মর্যাদা বুলোয় লুটিয়ে পড়েনি? কোথায় রইল সাম্য, কোথায় রইল স্বাধীনতা। দুনিকের একাত্ম পোষণের ওপর পুতিষ্ঠিত বর্ণিকতন্ত্রের পতাকা সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা কবর খুঁড়েছে। নেপোলিয়নের বুর্চের-ঔলার সবপু ইউরোপ লাভিত হল।

এর পর এল রুশ বিপ্লব। এর আদর্শ ছিল সকল পুকার শোষণের অবসান। এ বিপ্লব সাড়া জাগিয়ে তুলল দিকে দিকে—ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, আমেরিকায়। ইউরোপ ও আমেরিকার পুমিকেরা হয় পতাকার নীচে দাঁড়িয়ে পণপ করল যে তারা বিপ্লবের পুথম বষপুয় রাষ্ট্রকে রক্ষা করার অন্য জান কবুল করবে। পুমিকদের এই দৃঢ়তার অন্য রাশিয়ার উপর সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ হয়নি বেন। পুমিক রাষ্ট্র অবাধে তার সমাজতন্ত্র পুতিষ্ঠার অবসর পেল।

কিন্তু দেখা গেল কি? সমাজতান্ত্রিক দর্শনের বুনিয়াদ রচয়িতা এঙ্গেলসের ভাষায় "Withering away of the state" হওয়ার বদলে রাষ্ট্র যেন দিন এক বিরাট দানবের রূপ নিয়ে—পুলিশ আর মিলিটারীর শক্তি এই রাশনের দুটি বাহু। পুকৃতপক্ষে সোভিয়েট রাশিয়া আর তার তাঁবেদার দেশগুলিতে শুধু পুলিশ আর মিলিটারী বে বীভৎস রূপ নিয়ে দাঁড়িয়েছে তার কাছে তথাকথিত বুর্জোয়া দেশগুলির পুলিশ আর মিলিটারী বানকের হাতের খেলনা বলে মনে হবে। এঙ্গেলস বর বেছেন, ঠিকই বলেছেন বে, মিলিটারী, পুলিশ, জেল পুভৃতি 'নির্যাতনের যাতিয়ার' নিয়ে কতদ্রে তার অস্তিত্ব বজায় রাখে। এখনো তিনি ডবিষ্যদ্বাণী করেছেন বে, পুলেটারিয়ান ষ্টেট' যে মুহূর্তে দিবের আসো দেখবে, সে মুহূর্তে থেকে তার অস্ত হতে এই অমানবিক অঙ্গ-পুত্যঙ্গ বসে যেতে থাকবে আর ডবিষ্যতে এর অবয়ব হবে বে, "Administration of men will be replaced by administration of things" অর্থাৎ মানুষ আর মানুষের ওপর পুভুত্ব করবে না—সমাজে যা উৎপন্ন হবে তারই ববরদারী করবে তারা।

কিন্তু এঙ্গেলসের এই ডবিষ্যদ্বাণী কতদ্রে কি? অন্ততঃ রাশিয়ার চল্লিশ বছরের "সমাজতান্ত্রিক" ইতিহাস এই সাক্ষ্য বেয় না। সেখানে শুধু পুলিশ আর মিলিটারীর থাপট এখনও অপুতিহত, রাষ্ট্রের বুনিয়াদ হয়েছে আরও পাকা-পোক্ত। সেখানে ব্যক্তি মানুষের চুঁটি টিপে ধরেছে রাষ্ট্র "পুমিক শ্রেণীর" একনায়কত্বের নামে। সেখানে মানুষের চিন্তাকে "পাষ্ট মাইনের" ওঁতায় নদু করা হয়েছে, কবি ও সাহিত্যিক পাষ্টির মাইনের সঙ্গে তাল রাখতে না পেরে হয়েছেন লাঞ্ছিত—কাউকে কাউকে এজন্য জীবন দিয়ে চরম মূল্যও দিতে হয়েছে। বস্তুতঃ রাষ্ট্রের ধর্মই আজ মানব-কল্যাণকে তার রক্তচক্ষুর শাসনাধীনে বিপর্যস্ত করে দিচ্ছে। মানবীয় পুভাবের বর্ধাভিক্ত করে দিচ্ছে।

রুশ রাষ্ট্রের এই পুকট রূপাট বে মানব-কল্যাণের পরিপন্থী বরে উঠতে পারে তা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সতর্ক দৃষ্টি এড়ায় নি। জীবনের সকল ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রের খবরদারী তিনি ভাল চোখে দেখেন নি। তাই তিনি রাশিয়ার চিঠিতে লিখেছেন—কোন বিষয়েই নাম্বরিকানা আমি পছন্দ করি নি। নাম্বরিকানা বলতে তিনি অবশ্যই dictatorship বুঝিয়েছেন। মানুষকে যদি উঠতে বসতে তোতা পাখীর মত শেখানো হয়—"তুমি কিছু বেখো না, পাষ্ট'ই বোঝে, অতএব তাকে মেনে চল। না চললে তুমি অনসাধারণের শত্রু।" এতে করে আর যাই হোক মানুষের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ হয় না. তাকে 'চুঁটো অসপুাষ্ট' করে তোলা হয়।

অবশ্য এ কথা বলা হবে বে, রুশ বিপ্লবের পর রাশিয়ার উন্নতির দিকে তাকিয়ে দেখো। সেখানে মানুষ আজ অবিবার কলওয়ানার বাদিতে বাঁধা নেই। তাই উৎপাদনও সেখানে নাকিয়ে নাকিয়ে অগ্রসর হয়েছে। অবিবার আর কলওয়ানা নেই ঠিকই। তা হলেই কি স্বর্গরাজ্য বিসে গেল? সত্যি বিখ্যে বলতে গেলে বা, এই চল্লিশ বছরে রাশিয়ার "সমাজ-তান্ত্রিক ইংপাদন" আমেরিকার কাছে বাচ্চা খুকে যায়, বর্তমানে তৃতীয় শ্রেণীর বনতান্ত্রিক রাষ্ট্র বুলনাত্মকভাবে পাচ্চা দিতে পারে না। "সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার" এই শপ্তসপাবিতার কারবণ আছে নিশ্চয়ই। সেটা হচ্ছে এই—সেখানে অনুখাতুর অধিকার পদে পদে লাঞ্ছিত হয়েছে। মানুষের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের পথে পর্বতপুমাণ বাধাবরুণ দাঁড়িয়েছে রাষ্ট্র।

তবে কি বিপ্লবের দরকার নেই? নিশ্চয়ই আছে। করেকটি বিপ্লবের আদর্শ ক্ষুণ্ণ হতে দেখে আমরা যে ঐতি-হাসিক শিক্ষা লাভ করি, তাই আমাদের ডবিষ্যতের পথনির্দেশ করবে।

কবি গৌড়ানন্দকে ধন্যবাদ। শুধু সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করলেই সব কিছু পাওয়া হল না। মানুষের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের সুযোগ চাই। নানা রকমের চিন্তা, নানা রকমের আপর্ণ মানব সভ্যতার বুনিয়াদ তৈরী করেছে। এই বহু বিচিত্র ধারাকে শুধু এক খাতে বইতে দিলে অনাবিকে বিরাজ করবে বন্ধত্বি। সে তার বেনিয়ান জিন্সা দিয়ে সবপু মানব সভ্যতাকে গ্রাস করবে।

নিকট-ভবিষ্যতে তোতা ডাই বলে স্বাধীন আনন্দের অভিনাষী। সেখানে শুধু বিদ্যুৎ চিনের ঢেউ সবই আছে। থাকুক-সুবুরাষ্ট্রীয় পথে মানুষের সভ্যতা এগোয় নি—হাজারো বকবের ধারার কাঁচা মাড়িয়েই এগিয়েছে। ব্যক্তি স্বাধীনতার শুভ্র ঘোক-নীল আকাশের স্বাধীনতা বেন সোনার খাঁচার আড়ালে নষ্ট না হয়।

শ্রীপর্ণবেকর, কলিকাতা।

স্বত্বত্ব প্রকাশের স্বাধীনতা

আপনাদের 'দর্পণের' কয়েকটি সংখ্যা পড়ে মনে হল, ধন্যবাদ জাদিয়ে একটি চিঠি লেখা উচিত। আমরা এ-যুগে বাংলা দেশে যে-সব 'দর্পণ' আমাদের মুখাবয়ব দেখতে অভ্যস্ত তার কঁচির দোষ আছে, নিজেদের দেখা এবং চেনার পকে সুবিধের নয়। অর্থ স্বার্থ উদ্দেশ্য এই তিন যাদুকরের কল্যাণে সেই সব বায়না-দর্পণে যা দেখি তাতে আমাদের আসল চেহারা কণাচিৎ থাকে। আপনারা বিরাট দায়িত্ব মাথায় নিয়েছেন। ভেজালের দিনেও কাঁচি থাকবেন। দুঃসাহস ও বটেই।

যে কয় সংখ্যা দর্পণ পড়েছি তা থেকে আমার ধারণা-আপনারা লেখকদের স্বত্বত পুকাশের অবাধ স্বাধীনতা দিয়ে থাকেন। ব্যক্তি-গত ভাবে আমি এই বিষয়টিকে বিশেষ মূল্য দিই। আমার বিশ্বাস, এই একটিমাত্র কারণেই আপনা-দের পত্রিকা অন্য-স্বাধীন পাঠকের পুশংসা অর্জন করবে। পত্রিকাটির চরিত্রও এ-থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

আপনারা শিরোনামায় আপনাদের পত্রিকাটিকে সংবাদ সাময়িকী বলেছেন। দেখবার, সংবাদ নিয়ে আপনাদের বতটা নাথা ব্যথা—পুবন্ধ বিষয়ক রচনা নিয়েও ততটা দুশ্চিন্তা। ফলে আমাদের সুবিধাই হয়েছে।

এবার অন্য কথায় আসি। আপনাদের পত্রিকাটির যে-বব "শিয়রিত সংবাদ" পুকাশ পার—সেগুলি ঠিক এইধরণের পত্রিকার একমাত্র উপযোগ্য নিশ্চয় নয়। এবং যে-ভাবে এ-ধরণের সংবাদগুলি আপনারা পরিবেশন করেন তাতে অন্য কয়েকটি দিশি রাজনীতি সার সাপ্তাহিকের কথা মনে পড়ে। অগোচর-সংবাদ-গুলির আকর্ষণ পাঠকের পকে অপুতিরোধ্য ঠিকই। তবু, আমার ধারণা, এ-ধরণের সংবাদকে তাৎ-পর্যগত করা এবং মুল্যবান করার পুতি আপনাদের দৃষ্টি দেওয়া উচিত। পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের দলাদলি যে-ভাবে নিতিও তাতে দৈনিক কাগজের সংবাদ সর-বরাহের নীতি এবং কারুকলা ছাড়া—আরও বেশি কি কিছু আছে? অথচ, থাকতে পারত। ---উদ্যস্ত সম্পর্কেও আপনারা পাঠকদের পরিচ্ছন্ন কিছু সংবাদ দিতে পারেন। পুকৃতপকে এই সাবারাষ্ট্রিক সমস্যাটির শ্পষ্ট চেহারা অল্প পাঠকই জানেন। সরকার কি করেন নি এই সংবাদ যতটা গুরুত্বপূর্ণ—কি করেছেন তাও আমাদের জানা উচিত। রীতিবত তথ্য ও অভিজ্ঞতা থাকলেই চলে।----- অন্যান্য কিছু পুরোজনীয় বিভাগও আশা করি পরে দেখব। তা ছাড়া আমাদের নিত্য দিনের বহ সমস্যা আছে যার পুতি আপনাদের দৃষ্টি হয়ত অচিরেই পড়বে।

আর একটি বিষয় যদি ভেবে দেখেন বাঞ্ছিত হব। সপ্তাহে সম্ভব না হলেও পক্ষকাল অন্তর বিদেশের বিভিন্ন দেশের একটি ধারাবাহিক সামাজিক ও রাজনৈতিক বিবরণী থাকলে ভাল হয়। ফলে আপনাদের সাংবাদিকের ডাবায় বলে কায়েণ্ট ট্রেণ্ডস্—ওই ধরণের আর কি।

আপনাদের 'দর্পণের' আয়ু-বৃদ্ধি কামনা করি।

বিমল কর, কলিকাতা

সরকারী সেল্‌স্‌ এম্পোরিয়ামে স্বজন পোষণ অর্থের অপব্যয় ও নানা ত্রুটি

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরিচালিত সেলস্‌ এম্পোরিয়াম সম্পর্কে জনসাধারণের অভিযোগ ক্রমশঃই বেড়ে চলেছে। এই এম্পোরিয়াম চিত্তরঞ্জন এভিনিউএ অবস্থিত। অনেক অভিযোগই এর সম্বন্ধে শুনতে পাওয়া যায়। তাছাড়া কর্মচারী নিয়োগ, সংগঠন, বিক্রয় ও তত্ত্বাবধানের অব্যবস্থা এবং এম্পোরিয়ামে বিক্রয়ের জন্যে যে সমস্ত জিনিষপত্র রাখা হয় সেগুলি নির্বাচন সম্পর্কে অভিযোগগুলি বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে।

জনৈকা বৃদ্ধা মহিলা এই এম্পোরিয়ামের সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট। তাঁর মোট বেতন মাসিক ৩৭৫ টাকা। এই পদটির জন্যে সরকার কোন বিজ্ঞাপন দেননি। এই ভদ্রমহিলা একজন ব্যারিষ্টারের পত্নী এবং তিনি বেশ কয়েক বছর বিলেতে কাটিয়েছেন। কিন্তু বিলেতে কাটালেই কি হয় আসলে এই রকম একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান চালাতে হলে যে ধরণের শিক্ষা-দীক্ষা এবং অভিজ্ঞতার দরকার, তা আদৌ তাঁর নেই বলে অভিযোগ শোনা যায়।

এই এম্পোরিয়ামের যিনি সুপারিভাইজার তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনেক পদস্থ কর্মচারীর ভগ্নী। তাঁকে বেতন দেওয়া হয় মাসিক ২৫০ টাকা। অবশ্য এই ভদ্রমহিলা কিছুটা অভিজ্ঞতার দাবী রাখেন, কারণ তিনি আগেও কিছুদিন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনে এই ধরণের কাজে বহাল ছিলেন। তিনি ছাড়া আরও দুজন মহিলা বিক্রয়ের কাজে নিযুক্ত আছেন। এঁরা প্রত্যেকে মাসে বেতন পান ৭৫ টাকা হিসাবে এবং বিক্রয়েরওপর শতকরা ১৪ টাকা কমিশন পান। এঁদের নিয়োগ হয় ৬ জনের এক উপদেষ্টা বোর্ডের মাধ্যমে। সদস্যসংখ্যা ৬ জন হলেও আসলে এর কর্তৃত্ব করেন দুইজন।

এম্পোরিয়ামের সুপারিনটেনডেণ্ট ওই বোর্ডের সদস্য-সেক্রেটারী এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উপসচী শ্রীটহিরণ্ময় ঐ বোর্ডের চেয়ারম্যান। এই বোর্ডের আরও চারজন সদস্য আছেন কিন্তু তাঁরা বোর্ডের সভায় উপস্থিত থাকেন খুব কমই, আগে থাকতেন না বলেলেই বোধহয় সত্যি কথা বলা হয়।

এই এম্পোরিয়ামের লোকসানের অঙ্ক ক্রমেই বেড়ে চলেছে কিন্তু তা হলে কি হবে ? এর সম্পূর্ণদায়ের কাজ কিন্তু অব্যাহতই রাখা হয়। এর পাশেই একটি ক্যান্টেরিয়া খোলা হয় এবং এর জন্যে প্রায় ৩০ হাজার টাকার মাশিনারি ও অন্যান্য বিলিষপত্র কেনা হয়। কিন্তু গত্যন্ত এবলিন সেখা থেকে তুলে নেওয়া হচ্ছে ; কারণ এম্পোরিয়ামের অন্য আরও অনেক দাবী। সুতরাং ক্যান্টেরিয়াকে উঠিয়ে দেন এম্পোরিয়ামকে ধাক্কা করে দিতে। এর জন্যে কিছু অর্থ ও হয় নষ্ট কিন্তু কি করা যাবে, উপায় নেই যে।

প্রায় এক বছর আগে এই এম্পোরিয়ামের পক্ষ থেকে গ্র্যাণ্ড হোটেলে একটা শো রুম খোলা হয়েছে। যার এই শো রুমের জন্যে যে সব কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছে তাঁদের নিয়োগ পর্বও নীরবে সমাধা হয়েছে, কোন বিজ্ঞাপন এর জন্য দেওয়া হয়নি। কর্মচারীদের মধ্যে একজন ইউরোপীয় মহিলা আছেন। যাঁর স্বামী একজন অবসরপ্রাপ্ত পদস্থ রেলওয়ে অফিসার এবং পূর্ববঙ্গে এই ভদ্রলোকের বিরাট জমিদারী আছে। আর একজন হচ্ছেন এম্পোরিয়ামের সুপারিনটেনডেণ্ট-এর কন্যা। অপর একজন মহিলা কর্মচারী কিছুদিন আগে পদত্যাগ করেছেন। এঁরও চাকরীর মূলে ছিল প্রভাব প্রতিপত্তির ভাগ্য এঁর না হলেও সমাজের নিম্নস্তরের একজন একজন মহিলা (Society-lady) সরকারের উপর যাঁর প্রভাবও কম কম নয়।

সুপারিনটেনডেণ্ট-কন্যা বেতন পান বর্তমানে মাসিক ২০০ টাকা এবং যাকে যাকে দরকার হয় কিছু কিছু অনুবাদও তাঁর উপর বর্ষিত হয়। কিছুদিন আগে ঐ মেয়ে করেছে দরখা জানিনা সম্মিতি করার তার তাঁর উপর দেওয়া হয় এবং এরজন্যে তাঁকে দৈনিক অতিরিক্ত ১০৲ টাকা করে দেওয়া হয়।

এই সব দেখে শুনে এই প্রশ্নও ওঠাই স্বাভাবিক যে এই বেকারীর যুগে যাদ্য সরকারের এই ধরণের সরবরাহ চাকরী পাওয়ার ব্যাপারে প্রেসিডেন্সীর ওনারলী অপেক্ষা কম-কোলিন্যকেই গুরুত্ব দেওয়া হয় বেশী।

সেলস্‌ এম্পোরিয়ামে যাঁরা কেনাকাটা করতে যান তাঁদা বলি সোচনাটি ব্যবস্থাটা একটু ভাল পোড়ে তাহলে কর্তাদারী বিরোধের ব্যাপারে তাঁদের হয়ত যারা আমাদের চেনে তাদের বিশেষ কাছে ঘেঁষে না। কিন্তু সেখানে বেশ কয়েক রকমের জিনিষ রাখা আছেন, কেতাদাসারদের প্রতি তাঁদের ব্যবসায়ী চেনে অনুকূল নয় এবং অনেকক্ষেত্রে তাঁদের আচরণে যেন কিছুটা তাচ্ছিল্যের ভাবও প্রকাশ পেতে দেখা যায়। এবং এসবদের অনেক অভিযোগই এখনও অমীমাংসিত। আর যিনি এই প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের তো যেন্তা প্রায়ই তাঁর। কারণ তিনি তাঁর অনুপস্থিতে তক্ত থেকে যান হয়ে থুব কর্ম।

এই এম্পোরিয়ামে কিনীর জন্যে বিদিষপত্র কেনার ভার যাঁদের উপর দান্ত তাঁরা কোন নীতির ধার ধারেন বলে মনে হয় না। বহিত্য যা কোন দামী অবশ্যক ছত্র তাকে অজত্র পক্ষে দুইটি নিলেন উদ্যুক্ত ও প্রসাধনে অনুকূল কোনরকমই বলা চলে না। কোনিভাগ ছেড়েই দাদাদের যাকার, বাদাদের নয়। আর এই সব বাদাদের কোনে কোন কারণে চাকশাদে ঘুর ঘুর করতে দেখা যায়। কতগুলি সবরার নাদিষ্টিক বিশেষ অনুগ্রহ দেখান বহে থাকে বলেও অভিযোগ পাওয়া যায়।

এই পরিষ্ঠানের সংগঠনের সঙ্গে প্রাণী অঙ্গনের দাদিয় কর্মীদের যোগাযোগ খুব কমই আছে; দাদিও রাজ্যের নিজস্ব সংগ্রহের প্রতিনিধিরা বিভিন্ন জেলার ভাঁতিকে আছেন। রাজ্য সরকারের এইরূপ নির্দেশ আছে যে, জিনিষপত্রের ক্রয় মূল্য নিম্নে মূল্যের শতকরা ১৩৲াশ কম হবে; কিন্তু যে গাদে কাদিগরা তাদের নিজেদের এলাকায় জিনিষপত্র কিনী করে তার তুলনায় সেলস এম্পোরিয়ামে সেই সব জিনিষের অনেক বেশী দাম ধাঁকা হয়ে থাকে।

মূল্য নির্ধারণের জন্যে একটা বোর্ড আছে বটে কিন্তু স্থপারিনটেনডেণ্ট, বোর্ডের চোয়াকা রাখেন খুব কমই। স্থপারিনটেনডেণ্টের বিরুদ্ধে এই অভিযোগটা বেশ পুরন। প্রায় এক বছর আগে সুপারিনটেনডেণ্ট নিজের দায়িত্বে, কাশী থেকে প্রায় ৩ হাজার টাকার শাড়ী কিনে আনেন। 'একাউন্টেণ্ট-জেনারেল অব বেঙ্গল'-এর পক্ষ থেকে নাকি গভর্ণমেণ্টের কাছে এইকেনাকাটার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করে এক নিপোর্ট দাখিল করা হয়েছে। কেনীর ভার পাওয়ার একবছর এম্পোরিয়ামের দো-কেতেই শোডা পাচ্ছে।

আসল প্রকাশ যে সুপারিনটেনডেণ্ট একলা কাশী যাননি, তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলেন তাঁর আয়াকে এবং বিনিময়ে যাতায়াত বাবদ যে বিল করেছিলেন তার মধ্যে তাঁর আয়ার যাতায়াত বাবদটাও তার বহে তোলেননি ! সংশ্লিষ্ট বিভাগের একজন অফিসার নাকি এ বিল মঞ্জুর করতে প্রথম ব্যক্তি হন নি। কারণ তাঁর বহে আয়া বাবদ যে টাকা ধরা হয়েছে সেটা মঞ্জুরযোগ্য নয়। কিন্তু তাঁকেও পুরাধানী মন্ত্রীর হস্তক্ষেপে তাঁর বুকি চাপা পড়ে; এবং বিরাট পাপ রাধার পথে সকল বাধা অপসারিত হয়।

মানুষ ও মনীষা

(পর পৃষ্ঠার পর)

ধারার মধ্যে লাঠালাঠি লেগেই আছে। আচার্য জগদীশচন্দ্র যখন প্রথম ইংলণ্ডে যান, তখন সেখানকার মনীষীরা বিধিমতে তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন। এমন কি রয়্যাল সোসাইটীতে পঠিত তাঁর প্রথম প্রবন্ধ তাঁরা ছাপতেই দেননি, যা রয়্যাল সোসাইটির সম্পূর্ণ নিয়মবিরুদ্ধ। আর বাংলাদেশে বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ লেখকরা রবীন্দ্রনাথের মতো মনীষীকে কি রকম সংঘবদ্ধভাবে আক্রমণ করেছিলেন, সে কথা সর্বজনবিদিত।

মনীষীর মনীষা কখনো চাপা থাকে না। শত বাধা সত্ত্বেও তা বিকাশ পাবেই। কিন্তু বাধাও তাকে পেতে হবে, নির্যাতনও তাকে সইতে হবে। কেজরিটি রাজত্বের দেশে হবে, রাজরাজড়ার দেশে হবে। আজ পর্যন্ত কোনো মনীষীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়নি, যিনি সম্পূর্ণ বাধা-হীন, অতি সুলভ নিরুদ্বিগ্ন জীবন যাপন করেছেন। বরং দেখা গেছে মনীষা যতো বড়ো, চিন্তা তত সাংঘাতিক, বাধা ও নির্যাতন ততই প্রবল ও প্রচণ্ড। যথার্থ মনীষী, অর্থাৎ যিনি শুধু জ্ঞানী নন্, ধ্যানীও, এসব বাধা-নির্যাতন তাঁর প্রাপ্য বলে হাসিমুখে বরণ করে নেন। হয়ত মাঝে মাঝে ক্রুদ্ধ হন, হয়ত কখনো ধৈর্য হারান, কিন্তু বিলাপ করেন না। এঁদের হয়ে অন্য লোকের প্রতিবাদ করা তাই অহেতুক মনে হয়।

যুগে যুগে মনীষার উপর আক্রমণ হয়েছে, নির্যাতন হয়েছে। এটাই সাধারণ মানুষের স্বভাব। নিজের চাইতে কোনো বিষয়ে শ্রেষ্ঠ কাউকে সে সহ্য করতে পারে না। তাই সে মনীষার ব্যাপারেই হোক, ছেলেমারার সৌন্দর্যের ব্যাপারেই হোক, বা যে কোন ব্যাপারেই হোক। প্রাণপণে চেষ্টায় তাকে নিজের সমস্তরে নামিয়ে এনে তবে সে স্বস্তি পায়। মনীষার কাছে সে তখনই নতি স্বীকার করে যখন তার সঙ্গে উচ্চ স্তরের চরিত্রবলের সন্ধান পায়। সেকস্‌পীয়ারের মনীষা আমাদের কাছে চিরকালের বিস্ময়ের বস্তু, কিন্তু সেক্‌স্‌পীঅরার মানুষটির সম্বন্ধে আমাদের কোনো কৌতূহল নেই। রবীন্দ্রনাথকে আমরা শ্রদ্ধা করি তাঁর মধ্যে মনীষা ও চরিত্রবলের অপূর্ব সমন্বয়-দেখেছিলাম বলে।

আজ দেশে স্বৈরাচারের যে নির্লজ্জ আস্ফালন দেখছি, তার বাস্তবস্রোত কাউকে লক্ষ্য করে নয়, "সে কথা, সে বর্বর, সেবন্ধু। অতুরাত্মে সে একাধিপতি, প্রাণের পরে তার অন্ধ ঈর্ষা।" সব প্রাণবন্ত লোকই এর কাছে বন্দির পশু। এ যখন "গদা-হাতে রুধর-মাখে লওডও করছে সবন্ধ পরবর্তে", তখন কজন মনীষী তার বাধা পড়ছেন জানা নেই, শত শত সাধারণ মানুষ যে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে, তা জানা আছে।

এটা যদি মেজরিটির রাজত্বের বিষময় ফল হয়,তাহ লে সে রাজত্বের কিছুই পুতিবাদ করার নতো তেজস্বী মনাষী কই ? বহু মহাশয় রাজনৈতিক দলগুলোকে দলীয় স্বার্থে অন্ধ বলে বাতিল করে দিয়েছেন। এদের হয়ত যখন কিছু হবার নয়, এরা যখন শুধু ভোটের লোভে চিন্তা-পদ্ধতিকে বিসর্জন দিয়েছেন, তখন দলনিরপেক্ষভাবে, নিঃস্বার্থ ভাবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবে এমন লোকের একান্ত প্রয়োজন। সেরকম লোক কোথায় ?

আন্তর্জাতিক সংবাদ

পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের বৈঠকে যোগদানে রুশিয়ার সম্মতি

(দর্পণের রাজনৈতিক ভাষ্যকার)

অবশেষে রুশিয়া রাষ্ট্রপ্রধানদের বৈঠকের প্রস্তুতি হিসেবে পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের আলোচনার প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছে। বলে রাখা দরকার যে আলোচনার বৈঠক বে মাসে এবং রাষ্ট্রপ্রধানদের বৈঠক জুলাই কি আগষ্ট মাসে বসবে।

অবশ্য এখনও অনেক কঠিন সমস্যা রয়েছে যাতে শেষ অবধি হচ্ছে রাষ্ট্র প্রধানদের বৈঠক নাও বসতে পারে। পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের বৈঠকে প্রধান উদ্দেশ্য রাষ্ট্রপ্রধানরা কি আলোচনা করবেন এবং কে কে এ বৈঠকে অংশ গ্রহণ করবেন তা ঠিক করা। দুটি ব্যাপারেই রুশিয়ার সঙ্গে পশ্চিমীদের কঠিন মত পার্থক্য আছে।

রুশিয়া চায় রাষ্ট্রপ্রধানদের বৈঠকে অতলান্তিক এবং ওয়ারশ' জোটের সভ্য বাদেও অন্যান্য কয়েকটি রাষ্ট্র যোগ দেয়। এদের মধ্যে ভারতবর্ষ সমেত কয়েকটি নিরপেক্ষ দেশ আছে। জানুয়ারী মাসে শ্রীনেহরুর নিকট লিখিত এক চিঠিতে শ্রীবুলগানিন ভারতের নাম উল্লেখ করেছিলেন।

বুলেঁর ও ক্রুশ্চভ যখন এর বিপক্ষে নয়। রাষ্ট্রপ্রধানদের বৈঠকের জন্য এ দুটি দেশে প্রবল জনমত আছে, কিন্তু আমেরিকার পক্ষে তাতে সম্মতি দেওয়া সম্ভব নয় তাই মনে হয়েছে।

পশ্চিমী রাষ্ট্রপ্রধানদের নিকট শ্রীবুলগানিনের শেষ চিঠি বুঁকে ও ক্রুশ্চভ উৎসাহ সঞ্চার করেছে। কিন্তু আমেরিকা, না-কি একেবারে হতভম্ব হয়ে গেছে। নানা বিষয়ে পশ্চিমীদের মধ্যে মতপার্থক্য বিদ্যমান। কিন্তু তারা সর্বদা চেষ্টা করেন যাতে নিজেদের মধ্যে মতপার্থক্য সত্ত্বেও রুশিয়ার সঙ্গে এক ভাষায় কথা বলতে পারেন।

আর কয়েক দিন বাদে ন্যাটোভুক্ত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয় চুক্তিভুক্ত দেশগুলোর একটি বৈঠক বসছে। এই সুযোগে পশ্চিমীরা—যথাঃ, আমেরিকা, বুটেন ও ফ্রান্স—রুশিয়ার সঙ্গে যে সমস্ত আলোচনা করবেন এবং নিজেদের ইতিকর্তব্য ঠিক করবেন।

রুশিয়ার প্রস্তাব প্রকাশ করা হয়নি। এতে কোন কোন দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের বৈঠকে যোগ দেওয়া উচিত সে বিষয়ে কোন উল্লেখ আছে কিনা জানা যায় নি। তবে, বেতারবার্তা সূত্র থেকে যে সংবাদ পাওয়া গেছে, তাতে হয় তা, রুশিয়া বিষয়গুলি হিসাবে নয়টি প্রস্তাবের উল্লেখ করেছে।

●

ফেব্রুয়ারী মাসের গোড়ার দিকে শ্রীবাইসেনহাওয়ারকে লিখিত চিঠিতে যেমন প্রস্তাব করা হয়েছিল তাই। প্রস্তাবগুলোর সারবর্ম এই :

(১) দু' বা তিন বছরের জন্য আণবিক অস্ত্র পরীক্ষা বন্ধ করা হোক ;

(২) আমেরিকা বুটেন ও রুশিয়া অঞ্চীকার করুক যে তারা আণবিক অস্ত্র ব্যবহার করবে না ;

(৩) যথা ইউরোপে একটি আণবিক অস্ত্রবিহীন এলাকা নির্দ্ধারিত হোক ;

(৪) অতলান্তিক ও ওয়ারশ' জোটের বহে একটি অনাক্রমণ চুক্তি হোক ;

৫) ন্যাটোী এবং অন্যান্য ন্যাটো ও ওয়ারশ' চুক্তিভুক্ত দেশগুলোতে বৈদেশিক সৈন্য হ্রাস করা হোক ;

৬) নিরস্ত্রীকরণ ও তৎসংক্রান্ত বন্ধ করার উপায় সম্বন্ধে চুক্তি হোক ;

৭) আন্তর্জাতিক ব্যবসা বাণিজ্য প্রসার লাভ করুক ;

৮) পশ্চিম এশিয়ার সমস্যা সমাধানের জন্য বলপ্রয়োগের নীতি পরিহার করা হোক ; এবং

৯) পুর্বের ঘাটি তুলে নেওয়া হোক।

এর অনেকগুলোর সঙ্গে পশ্চিমীদের বিষাই মতপার্থক্য আছে। আমেরিকা ও বুটেন এর কোন প্রস্তাবই এখনও গ্রহণ করতে রাজী নয়। উপরন্তু তাঁরা পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানীর নিয়ন্ত্রণ উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করে। কোন আন্তর্জাতিক বৈঠকে পুরাই আলোচনা করা হবে না এ তাঁরা বরাবর বলে বলে এসে না।

উপরন্তু, পশ্চিম এশিয়ার পুরুষ "আইজেনহাওয়ার ডক্‌ট্রিন" আমেরিকা পরিত্যাগ করবে আশা করা যায় না।

কিন্তু কোন দেশই রাষ্ট্রপ্রধানদের বৈঠকের বিরুদ্ধে নয়। মতপার্থক্য ছিল শুধু কি পদ্ধতি অনুসরণ করলে এ বৈঠক সম্ভব হতে পারে তা নিয়ে। রুশিয়া এতদিন বলে আসছিল যে পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের বৈঠক এমন কি কুটনৈতিক স্তরদের বিষয়ে পূর্বাহ্নেই কিছু না করলেও বৈঠক হতে পারে। পশ্চিমীরা এর সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে ছিলেন। তাঁরা প্রথমে পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের বৈঠকের পুরোক্ষনীয়তার উপর জোর দিয়েছিলেন ; সেখা সুর কিছু নরম করে বলেছিলেন, বস্তুত কুটনৈতিক স্তরদে প্রাথমিক আলোচনা চলে।

শ্রীবুলগানিনের ফেব্রুয়ারী মাসের চিঠির উপর মন্তব্য করে শ্রীবাইসেনহাওয়ার বলেছিলেন "কি কি বিষয় রাষ্ট্রপ্রধানদের বৈঠকে আলোচিত হবে তা ঠিক না করে বদি বৈঠক আরম্ভ হয়, একে অপরের বিরুদ্ধে যত বড় বুদ্ধি বিবিষয় করা ছাড়া তাঁদের আর কিছুই করণীয় থাকবে না।"

যাই হোক, রাষ্ট্রপ্রধানদের বৈঠকে প্রস্তাব নির্ধারণ সম্পর্কে প্রাথমিক লড়াই পশ্চিমীরাই জিতেছেন। কিন্তু রুশিয়া যে প্রস্তাবগুলো করেছে, তার উপর পশ্চিমীরা পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের বৈঠকে বা রাষ্ট্রপ্রধানদের আলোচনায় কি মত প্রকাশ করে তার উপর নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলোর অনন্যাধারণের উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রতিক্রিয়া হওয়া সম্ভব।

শ্রীনেহরু বার বার বলেছেন, আবেদন করেছেন, যাতে আমেরিকা শুধু ব্যবহার নিষিদ্ধ হয়। রুশিয়া শ্রীনেহরুর প্রস্তাব গ্রহণের পক্ষে বহু দিয়েছে, এই সর্তে যে বুটেন ও আমেরিকাও তাই করবে। বস্তুপ্রচারের দেশগুলো নিজের পশ্চিমীরা বেকায়দায় পড়েছে। রুশিয়ার উদ্দেশ্য পরিষ্কার। এই গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় যাতে জাতীয়তাবাদ শক্তিশালী হয় এবং তেনের উৎসগুলো যাতে বুটেন ও আমেরিকার হস্তচ্যুত হয়, রুশিয়ার উদ্দেশ্য তাই।

গত অক্টোবর মাস থেকে রাষ্ট্রপ্রধানদের বৈঠকের পুরোক্ষনীয়তা সম্বন্ধে নানা ধরণে আলোচনা হয়েছে। রুশিয়ার বেগোরব প্রথম প্রকাশ পায় সর্বোচ্চ সোভিয়েট প্রীক্রুশ্চেভের একটি বক্তৃতায়, সতেরর মাসে। তিনি বলেন : বৈঠকে "বনডাকির ও সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ চাই।" এর পূর্বেই প্রধানী আকাশে স্থবিরতা নিষ্কেপ করে রাজপাত্রে তার প্রধানা প্রকাশ করেছে।

তিনেম্বর মাস থেকে শ্রীবুলগানিন পশ্চিমী রাষ্ট্রপ্রধানদের সঙ্গে এ বিষয়ে পত্রালাপ সুরু করেন। কয়েকবছর পূর্বে ফ্রেডিরাক রাষ্ট্রপ্রধানদের এক বৈঠকে অনেক সুফল পাওয়া গিয়েছিল। ঠাণ্ডা লড়াই বন্ধ হয় নি, কিন্তু অনেক পুর্ণমিত হয়েছিল। এরাকরণ প্রস্তাবিত বৈঠক বসলেও যে কিছু সুফল পাওয়া যাবে সন্দেহ নেই।

রুশিয়া কর্তৃক সমস্ত পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের বৈঠকের প্রস্তাবে বহু দেখার কয়েকদিন পূর্বে আমেরিকা ও বুটেনের বহে এক চুক্তি সম্পাদিত হয়। গতবছর বারমুডার শ্রীআইসেনহাওয়ার ও শ্রীম্যাকমিলানের আলোচনায় চিহ্নিতেই এই চুক্তি হয়েছে। চুক্তিটি নিয়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে বুটেনের পুতিক্রিয়া বহুীর একটি বক্তৃতা নিয়ে বেশ মোরগোল পড়ে গেছে।

(৯ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বিজ্ঞান আলোচনা

আকাশ বলাকা

(আন্তর্জাতিক ভূসমীক্ষা বৎসর)

আকাশটা কি নীল? যাঁরা কবিতা লেখেন, তাঁরা ত বলেন, নীলাকাশ। মহাবিশ্ব কি সীমাহীন, অন্তহীন?—লোকে বলে, অনীল বিন্দু। সূর্যদেবের রথ ছোটে উদয়াচল থেকে অস্তাচলে, নক্ষত্রখচিতরাত্রি কি এই রথ? রূপকথায় ত' তাই শোনা যায়।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর মনকে ছুটিয়ে দিয়েছিলেন মেঘের সঙ্গে দিক-দিগন্তে। তাই মনে পড়ে গেল মহাপুন্যের রূপকথা। আর সেই সঙ্গে মনে এল প্রশ্নগুলো। মানুষের মনের চিরন্তন প্রশ্ন। বৈজ্ঞানিকের মনেও প্রশ্ন। শুধু প্রশ্ন নয়, বিধাও।

বিজ্ঞানের আসরে বিধার 'কোনো অবকাশ নেই। তাই আ-ডু-ক নবীনতর বিধাট এক অংশ জুড়ে রইছে এই মহাপুন্য। পরীক্ষা নরীক্ষা শেষ হবে না কোনদিন। কারণ, বিজ্ঞানের পাত্তার শেষ কথা ব'লে কোন শব্দ নেই। মহা-পুন্যের অসংখ্যতায় শেষ নেই। তবু সেই রূপকথার ইতিকথা নতুন ক'রে রচনা করছে এই আ-ডু-ক।

এর আগে মহাপুন্যে বিদ্যুৎ তরঙ্গের কথা বলেছি। বলেছি, বিদ্যুৎ তরঙ্গ দূরত্বের মাঝে পৃথিবীর চারদিকে। বলেছি, সূর্যপুত্রের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর দূরত্ব কেমন বড় ওঠে, রেডিওর সম্প্রেরণ-ভোল্ট বিদ্বিষ্ট বিপর্যস্ত হ'য়ে যায়। এই পুন্যটা আরও একটু আলোচনা করলে আমাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘিন্না মহাপুন্যের সীমাহীন 'পরিধি'র বিচ্ছুরা মরত ক্রোধে পড়বে।

রাডার, "রাডার" না হ'লে খুঁজতে পাবে না। এটা আজকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। তাই এই "রাডার" তত্ত্ব আলোকের মতই প্রবল ধরা যাক।

রাডার দিয়ে কোন্ এই মহাকাশকে চলতি ভাষায় বলা যায় বায়ুমণ্ডল। এবং এই বায়ুমণ্ডলের আয়নোস্ফিয়ার পুঞ্জকে পৃথিবীর মধ্যে। সেই আয়নোস্ফিয়ার নয় চারটের কম, কম বায়ুর স্তর। সেই চারটা আস্তর কয়টাকে ব'লেই আমাদের নিত্যদিন পুন্যলোক কথাটা কাজে লাগে যে, কে-কোথা আছত কয়টাকে কখন লাগছে।

বায়ুর চাপের তারতম্য

কিন্তু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিচারের করলে দেখা যাবে এই আস্তারে কোন্ বায়ুমণ্ডলের স্তরভেদে আছে। অর্থাৎ বায়ুর চাপের তারতম্য আছে। সেই তারতম্য অনুযায়ের উপর ভিত্তি করে এই স্তরভেদ সম্বন্ধে মানুষের এমন একটা ধারণা ছিল, যা বর্তমান যুগের বৈজ্ঞানিক তথ্যের সঙ্গে প্রায় খাটের নেওয়া যায় না।

অনেকেরই ধারণা যে, বায়ুর ঘনত্ব পৃথিবী থেকে যত উপরে ওঠা যায় ততই ক'মে আসে এবং শেষ পর্যন্ত একটা আয়গায় এসে এই চাপ নিঃসেষ হ'য়ে যায়। অনেকের কথা কেন, এতদিন স্যালিলও অনেকটা এইরকম ধারণাই ছিল।

এতদিন স্যালির নাম বহু পরিচিত। জ্যোতিষির হিসেবে তিনি অষ্টাদশ শতকের একজন বিখ্যাত বনীধী। তাঁর নাম স্যালির ধূমকেতুর নাম হিসাবে জড়িয়ে আছে। তিনি নিঃসন্দেহে বিপ্লাস করতেন বায়ুমণ্ডলের রূপটা অত্যন্ত সরল ও সহজ। তিনি তখনকার বৈজ্ঞানিক তথ্যের উপর নির্ভর ক'রে অনুমান ক'রেছিলেন যে, পৃথিবী থেকে পঁয়তাল্লিশ মাইল উপরেই বায়ুমণ্ডলের সীমারেখা।

• কিন্তু আধুনিক কালে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার ফলাফল যা জানা গেছে, তা আর যাই হোক এতবাড় স্যালির অনু-মানকে সমর্থন করে না। বর্তমানকালের ধারণা যে, 'বাতাসে' ঠান্ডা আকাশটা অনেক অনেক উঁচু, পঞ্চত্রিশ মাইল নয়, হাজার দশেক মাইল হ'তে পারে।

এমন কি, দেখা গিয়েছে যে, এই বায়ুমণ্ডলের প্রকৃতিটা খুব সরল গোছা নয়। কিছু জটিলতা, কিছু অস্পষ্টতা বিদ্যমান পড়া এই বায়ুস্তর। আধুনিক বিজ্ঞানে এই সব বায়ুস্তরের কতকগুলো নামকরণ করা হ'য়েছে।

হাওয়ায় ঠান্ডা বেলুন

সবস্থ বায়ুমণ্ডলকে যদি হাওয়ায় ঠান্ডা বেলুন বলে ধরা যায়, তাহ'লে দেখা যাবে এই বেলুনের ভিতরে, অর্থাৎ বায়ুমণ্ডলে, চারটে ভিন্ন প্রকৃতির স্তরলোক আছে। প্রত্যেকটা স্তরের একটা ক'রে নামও আছে। যেমন, পৃথিবীর গায়ে গায়ে মেখে আছে যে স্তরটা, তাকে বলা হয় 'ট্রপোস্ফিয়ার' বা অধোমণ্ডল। এই স্তরের সীমানা পৃথিবী থেকে ধর যায়ের পর্যন্ত (বিষুবরেখা থেকে) আর পাঁচ মাইল পর্যন্ত (মেরু বিন্দু থেকে)। এর উপরের স্তরকে বলা হয় 'ষ্ট্রাটো-ফিয়ার' বা ঊর্ধ্বমণ্ডল। এই ঊর্ধ্বমণ্ডল আয়নোমণ্ডলের শুরু থেকে পঞ্চাশ মাইল উপর পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে।

• বিজ্ঞান

আর এই পঞ্চাশ মাইলের উপরে (অর্থাৎ পৃথিবী থেকে ৮০ মাইল উপরে) ছড়িয়ে আছে 'আয়নোস্ফিয়ার' বা অয়নমণ্ডল। অয়নমণ্ডলের পরিমাণটি সঠিক নির্ণয়ের হয়নি, তবে অনুমান করা হ'চ্ছে যে যত মাইল পার হ'লে অয়নমণ্ডল নিশ্চিহ্ন হ'য়ে চতুর্থ স্তর অর্থাৎ 'এক্সোস্ফিয়ার' বা বহির্মণ্ডলে বিলিয়ে যায়। এই বহির্মণ্ডলে এসে মহাপুন্যের বিদ্যু আভাস পাওয়া যায়, এবং সবস্থ বায়ুমণ্ডলের বিস্তৃতি ধরে। ধ'রে নেওয়া হ'য়েছে যে, বহির্মণ্ডল মরত আঠার হাজার মাইল পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে।

* * *

অপাস্তরমণ্ডলের কথা ধরা যাক। পৃথিবীর সঙ্গেই এর ঘনিষ্ঠ ও নিবড়তম সম্পর্ক। তাই পৃথিবীতে যখনই কোন ঝড়, বা ঝঞ্ঝা ওঠে, তখন অপাস্তরমণ্ডলের কথাটা বেশী মনে পড়ে। কারণেই এটা মুহূর্তে অস্থিরতা হয় না যে, অপাস্তরমণ্ডলের বস্তির ওপরেই পৃথিবীর 'আবহাওয়া' অনেকটা নির্ভরশীল। আ-ডু-ক নবীনতর অপাস্তরমণ্ডল আর 'আবহাওয়া'-র মধ্যে একটা যোগাযোগ-এর সূত্র খুঁজে বার করার চেষ্টা চলছে। এই সূত্র খুঁজতে গিয়ে একটা জিনিষ কিছুটা বোঝা যাচ্ছে যে, অপাস্তরমণ্ডলের মরত এবন একটা বায়ু প্রবাহ আছে, যা আবহাওয়াকে প্রভাবিত করে। মনে হ'চ্ছে, এই বায়ু প্রবাহগতিবেগ ঘণ্টায় পঞ্চাশ থেকে তিনশ' মাইল পর্যন্ত। তবে এর আসল রূপটা এখনও ধরা যাচ্ছে না।

আকাশের রূপ

এখানে আকাশের রূপটা একটু আলোচনা করা যাক। কারণ, গোড়ায় প্রশ্ন করেছি আকাশটা কি নীল। অনেকেই বললেন, হাঁ, নীল; কারও চোখে দেখেছি নীল। কথাটা ঠিক। অপাস্তরমণ্ডল থেকে আবহা আকাশকে দেখি নীল; কিন্তু স্তরমণ্ডলে গেলে আকাশের রংটা নাকি বদলে যায়। নীলিমার আভাস পর্যন্ত পাওয়া যায় না। স্তরমণ্ডল থেকে আকাশের রংটা হ'য়ে যায় শুকনো রক্তের মত কালচে।

* * *

এরপর যদি অয়নমণ্ডল আর বহি-র্মণ্ডলের আলোচনা করা যায়, তাহ'লে বিদ্যুৎ তরঙ্গের কাণ্ডকারখানা এসে পৌঁছুতে কোন অসুবিধা হয় না। বিদ্যুৎধর্ম বললে দেখা যাবে যে, বায়ুমণ্ডলের এই বাইরের স্তরগুলো আছে ব'লেই আমরা নিশ্চিন্তে পৃথিবীর বুকে বিচরণ করতে পারি।

কাব্য, পুস্তিনিষ্ঠ এই অয়নমণ্ডলকেই পূর্ণের এবং বহুপূর্ণের চাঙ্গায় করবের অত্যাচার সহ্য করতে হয়। এই অয়ন-মণ্ডলের বুকেই সঙ্গোরে আঘাত খেয়ে সুরধ্বনি, বেতারিকায় বনি, অডিয়ান (টেলিভিশন) ধ্বনি এবং টেলান ফটিকা। এই অয়নমণ্ডলের আছেই থাকা যায় মহাপুন্য থেকে ভেসে আসা কসমিক কণিকা, তারার ধূলো (যাকে সহজ ভাষায় বলা হয় উল্কা ব'লে পাকা)। এই অয়নমণ্ডল আছে ব'লেই ঘরে ব'সে শোনা যায় রেডিও প্রোগ্রাম।

কেমন ঘরে এই অয়নমণ্ডল থেকে রেডিও তরঙ্গ ফিরে আসে যে পুন্যটা আলোচনা করতে গেলে পুথবেই থেকে মানে যে, অয়নমণ্ডলের বর্ণনা যে বায়ুর (ions) ঠান্ডা আছে, তার টেনটে তরঙ্গ আছে। তড়াতাড়ি নীচের স্তরকে বলা হয় 'ডি'-স্তর, তার উপরে 'ই'-স্তর আর তারও উপরে 'এফ'-স্তর। রেডিও প্রোগ্রামে যে সচরাচর যে স্তরে তরঙ্গের উল্লেখ করা হয়, সেই তরঙ্গ ফিরছে আসে 'ই' এবং 'এফ' স্তর থেকে।

অর্থাৎ যেটা ছোট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ঘনি ছোট ছোট রয়বের বলা যাক, তার উপরে ওঠে যেতে পারে। কিন্তু বড় তরঙ্গ যেতে পারে না। তাই 'ডি'-স্তর ছাড়িয়ে যেতে পারে বিস্তৃত লম্বা তরঙ্গ ঠোহর যেতে যেতে পেয় পর্যন্ত বাঁধাপথেই চ'লে যায়।

* * *

সুলতরঙ্গ অয়নমণ্ডলে বিশ্বিত হয় ব'লেই আ-ডু-ক সবীনতর এই লম্বা তরঙ্গকেই আমরা ব্যবহার করতে লাগান হ'য়েছে নানা ভাবে। যেমন, পুথবেই বলা হ'য়েছে যে, অয়নমণ্ডলের পরিস্থিতি ঠিকভাবে নিরূপণ করা যাচ্ছে না এখনও। তাই আ-ডু-ক সবীনতম অয়নমণ্ডলের বনত্ত্ব বা পরিস্থিতি সঠিক নির্ধারণ করার একটা বিরাট প্রচেষ্টা চ'লেছে।

এর আগের পুথবে বলা হ'য়েছে যে, সূর্যপুত্রের সময় রেডিওতে সম্প্রেরণ-তরঙ্গ বিস্তৃত হ'য়ে যায়। সেই সময় আরও একটা দিনির বিপদ আসে রেডিও প্রোগ্রাম শুনতে করতেন যে, এইরকম বিপর্যস্ত অবস্থায় মধ্যে মধ্যে ঠান্ডা, তীব্র একটা ধ্বনি শোনা যায়। অনেকটা বাঁশীর আওয়াজের মত, ঠান্ডে একটানা শুরু ক'রে ওঠে। একে বলা হয় 'ইইসনার' এবং ১৯৫৩ সালে কানাডার বৈজ্ঞানিক ডাঃ হ্রোরী অনুমান করেন যে, অয়নমণ্ডলের বিশ্বিত অবস্থার জন্যই এই 'ইইসনার' শোনা যায়। কথাটা একটু খুলেই বলা যাক।

মহাপুন্যে বিপর্যয়

সূর্যপুত্রের সময় মহাপুন্যে যে বিপর্যয় ঘটে, সেই বিপর্যয়ের ধাক্কা অয়নমণ্ডলেও এসে লাগে। এই ধাক্কা যখন লাগে, তখন স্তরভঙ্গটাই আগে করা যেতে পারে যে, অয়নমণ্ডলেও একটা অস্থিরতা দেখা দেবে। অয়ন-মণ্ডলের 'অয়ন' (বা ওপাজ্জ পুন্য-কণিকা) এই অয়নের উত্তেজিত হ'তে থাকে। এমনি সময় যদি রেডিও সিগন্যাল ছুঁড়ে দেওয়া হয়, তাহ'লে তা অয়ন-মণ্ডলে ঢোল ক'রে ফেরত আসবার আগেই ছুটে যায়। এবং মহাপুন্য থেকে রেডিও তরঙ্গ পৃথিবীতে আবার ফিরে এসে 'ইইসনারে'র সৃষ্টি করে।

এটা যদি সত্যি হয়, তাহ'লে পুন্য ওঠে অয়নমণ্ডল ভেদ ক'রেও রেডিও তরঙ্গ মহাপুন্য থেকে ফিরে আসে কেন? উত্তরে বলা যেতে পারে যে, তরঙ্গ পৃথিবীর চুম্বকক্ষেত্রের আকর্ষণ এই তা ফিরে আসে। কিন্তু পৃথিবীর চুম্বকক্ষেত্রে রেডিও সিগন্যালকে আকর্ষণ ক'রে টেনে আনতে পারে না। কারেই ডাঃ হ্রোরী বলেন, তরঙ্গ ফিরে আসতে হবে যে অয়নমণ্ডলে, তার বাইরেও কিছু ফিরে আসে, যার ফলে রেডিও সিগন্যাল বাঁক খেয়ে আবার পৃথিবীতে ফিরে আসে।

এই অনুমানের ভিত্তিকেই আ-ডু-ক পরীক্ষাগার সম্প্রতি কাজে লাগান হয়েছে। কিন্তু রেডিও তরঙ্গ দিয়ে পরীক্ষা করার সময় দেখা গিয়েছে যে, প্রত্যেকটি তরঙ্গ রেডিওতে পোনার সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রতি-ধ্বনিও পাওয়া যায়। এই প্রতিধ্বনি পৌঁছুতে যে সময় লাগে, তা বিশ্লেষণ ক'রে একটা হিসেব জানা গেছে, ডাঃ হ্রোরীর অনুমান সত্য। এ-থেকে জানা গেছে যে পৃথিবী থেকে দূর হাজার মাইল উঠে রেডিও কম্বনিকা ভেসে বেড়াচ্ছে। শুধু তাই নয়, এটাও বুঝতে অসুবিধা হ'চ্ছে না যে, অয়নমণ্ডল কিন্তে হ'য়ে এলেও এই স্তরের পরিমাণটা ছয় হাজার থেকে দশ হাজার মাইল পর্যন্ত। তা যদি ঠিক হয়, তাহ'লে অপর অবিমাত্রে যেন দেখাতের পক্ষে বা বাড়ী পাঠাবার বীজানিতে অসুভবের হয়ত বন্দলে যাবে।

নাট্য সমালোচনা ঃ

বহুরূপী অভিনীত "পুতুল খেলা"

(শ্রীচিত্রভানু সেন)

বহুরূপীকে আন্তরিক ধন্যবাদ। বাংলাদেশের রঙ্গমঞ্চের দিকে দৃষ্টিপাত করলে যে স্বাভাবিক হতাশায় মন ভরে ওঠে সে হতাশা থেকে বহুরূপীর শিলিপ-গোষ্ঠী আমাদের বাঁচিয়েছেন। বহুরূপী কর্তা ইবসেনের "A Doll's House" এর বাংলা রূপ "পুতুল খেলা" দেখবার জন্যে তাই দিউ এম্পায়ার প্রেক্ষাগৃহে সুধী দর্শকমণ্ডলীর সমাবেশ ঘটেছিল।

আজ থেকে দশ পঁচিশ বছর আগেও বাঙালী-স্বাধীনতা সমাজের যে কাঠামো ছিল, তাতে ইবসেনের এ নাটকটির বক্তব্য অস্তরের সমর্থন পেলেও সামাজিক বাস্তবতার দিক দিয়ে একটু অসঙ্গতই ঠেকত। কিন্তু দ্রুত অর্থনীতির ঘূর্ণাবর্তে সমাজের ব্যক্তিসম্পর্কগুলি যেরকম তীব্র সংঘাতপ্রবণ হয়ে উঠছে, তার ফলে ইবসেনের আধুনিকা নারী আজ বাঙালীসমাজেও খুব অস্বাভাবিক বলে হয় না।

এতকাল পরে আমাদের মধ্যবিত্তসমাজে মানুষে মানুষে চিরাচরিত সম্বন্ধের গোড়া ঘেঁষে অনেক প্রশ্নকণ্টকিত সমস্যা আমাদের পরিবার বন্ধনের ঐতিহ্যকে আবূল পরিবর্তিত করতে উদ্যত হয়েছে। আজ আর এ সত্যকে কোন চিরন্তন ভাবাদর্শের ছুকে ফেলে বিশ্বা সান্ত্বনা লাভের উপায় নেই।

আজকের পরিবারগত মানুষ (স্ত্রী বা পুরুষ) নেরার মতই নতুন করে গোড়া থেকে ভাবতে চাইবে—"I believe that before all else I am a reasonable human being, just as you are—or at all events, that I must try and become one.....I must think over things for myself and get to understand them".

বলা বাহুল্য বাংলা নাটকের চরিত্র পরিকল্পনায় এই নিজত্বের বাণী ("আপন সুরে গান গাইবার অধিকারের কথা") উচ্চারিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। "পুতুল-রূপা"র এই নব উন্মেষ তাই আমাদের সশ্রদ্ধ অভিনিবেশের যোগ্য।

●

প্রশ্ন এই, এ নাটকের অগভীর ও প্রসারিত জীবনবোধ অভিনয়ের মধ্য দিয়ে আমাদের সমস্ত চৈতন্যকে উদ্বীপ্ত করতে পেরেছে কি না। ইবসেনের নাটক প্রসঙ্গে একটি কথা স্মরণীয়। আর সব নাটকের মত কোন একটা চূড়ান্ত মুহূর্তের উপরে ইবসেনের চরিত্রগুলির জীবনচেতনা নির্ভর করে না।

তাঁর নাটক জীবনের প্রতিটি স্তরের নিবিড় রহস্যকে একে একে উদ্ঘাটিত করে এক নূতন মূল্য-বোধের সন্ধানীন করে। বিশ্বে মঞ্চের ক্ষেত্রে ইবসেনের এই আশ্চর্য নৈপুণ্য খুব উঁচুদরের এবং অনেকটা হাল আমলের শল্য চিকিৎসকদের নিপুণতার সঙ্গে তুলনীয়। যেমন করুন—কিকুক্ষের মতো হৃদপিণ্ডের গতি বন্ধ রেখে অস্ত্রোপচার।

পুতুলখেলার শেষদৃশ্যে বুলুর আত্মবিশ্লেষণ এবং সেই সঙ্গে ব্যক্তি ও সমাজের সম্বন্ধ নিরূপণ অনেকটা ঐ ধরণের নয় কি? আবার তার চেয়ে অনেক বেশী কিছু। সেই বেশী কিছুটি মাত্র সমগ্র জীবননাটোর রহস্যঘনীর্ণ, যে রহস্যাবোধের অতল স্পর্শ না পেলে কোন শিলপীই সৃষ্টির সত্যকে খুঁজে পায় না।

বহুরূপী বুল নাটকটিকে প্রায় যথাযথ অনুসরণ করেছেন। এ নাটকের পক্ষে এমন অনুসরণের প্রয়োজন ছিল। কাহিনীটির বিন্যাস আমাদের সমাজে অনাঘাতে ঘটানো যায়। খৃষ্টীয়াসের বদলে পুজো, টারান্টেলা নৃত্যের বদলে রবীন্দ্র-নাথের 'ঝুলন' আবৃত্তি (কী আশ্চর্য সেই আবৃত্তি।') বলনাচের পার্টির বদলে বিদ্বরাসম্মেলন—এর কোনটিই অসঙ্গত নয়।

কিন্তু সব চেয়ে সম্ভব প্রতিটি চরিত্রের নিজস্ব অন্তর্বেদনা। এই বেদনাচেতনার পর্যন্ত ইবসেনের চরিত্রগুলি আমাদের সহমর্মিতা পায়। কৃষ্ণা ও কেইপর্ণর উপকাহিনীটি এ দিক থেকে আমাদের মুগ্ধ করে। অথচ নাটকের প্রধান চরিত্রটির আত্মোপলব্ধির ক্ষেত্রেও ইবসেন এদের কোন সহায়তাই করতে দেন নি। সম্পূর্ণ একাকী দাঁড়িয়ে নোরা (বুলু)-কে আপন ভাগ্য জয়ের অধিকার পেতে হয়েছে।

●

বুলুর জীবনের পুতুল খেলার দড়ি ধরেছিল দু'জনে—প্রথম জন তার বাবা, দ্বিতীয়জন স্বামী। এ দু'জনের ঘুঁণির জন্যে জীবন পরিচালনাতেই তার সুখ—এ কথা তাকে বিশ্বাস করতে বলেছে তার সবাই। এক হিসাবে বাবা এবং স্বামী বুল সমূহ সত্তাই দুটি রূপ। তাই স্বামীর সঙ্গে বুলু যাবে মাঝে বাবার বিন দেখতে পায়। আর বুলুর স্বামী তপন।

নিজের স্ত্রীকে ক্ষমা করার উদারতায় কিছুক্ষণের মতো স্ত্রীকে কন্যাস্বামীর মনে করে। নারী তাহলে রক্ষণীয়া, পালনীয়া—কন্যা, পত্নী, এবং মাতা,—কিন্তু তাকে নিজের সুস্থে গ্রহণ করতে সমাজব্যবস্থার অধিচ্ছুক।

বুলুর স্বীকারোপনদির এই উত্তাসন তৃপ্তি নিজের ব্যক্তনাময় অভিনয়ে যে রূপ পেয়েছে, সেটি তাঁর অভিনয় জীবনের আরেকটি স্মরণীয় সংযোজন। এ চরিত্রের সমস্ত বহুত্ব, তীব্র ও তিক্ত অনুভূতি-গুলি তাঁর মধ্য দিয়ে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। কেবল দু'এক জায়গায় চলাফেরায়, অঙ্গ ও ভঙ্গীতে একটু আতিশয্য আছে।

কিন্তু নোরার চরিত্রের গোটা অন্তর্দৃশ্য মনে রাখলে এ আতি-শয্যও কটু ঠেকে না।

তপন-চরিত্রের রূপায়ণে পশু মিত্র তপনের (বেলুমারের) স্বাধীনতাবিকার পিছনে যে একাত্ত

(অষ্টম পৃষ্ঠার পরক্ষ কলমে)

কলিকাতা কর্পোরেশনের পানীয়-জল সরবরাহ বিপর্যয়ের সম্মুখীন

পাম্পিং ষ্টেশনের সব কয়টি বয়লারের অবস্থাই শোচনীয়

(দর্পনের সংবাদদাতা)

কলিকাতা কর্পোরেশনের পলতা পাম্পিং ষ্টেশন, অর্থাৎ যেখান গঙ্গা থেকে দৈনিক কয়েক কোটি গ্যালন জল পাম্প করে তুলে শোধনের পর নাগরিকদের পানীয় জল সরবরাহ করা হয়, এ ষ্টেশন অত্যন্ত ভয়াবহ অবস্থায় এসে পড়েছে।

পাম্পের কাজে ব্যবহৃত হয় এমন সব কয়টি ষ্টীম বয়লারের অবস্থাই শোচনীয় এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনেকে মনে করছেন হঠাৎ যদি এর যে কোনও দুটি অকেজো হয়ে পড়ে, তার সম্ভাবনা খুবই বেশী, তাহলে কলিকাতার নাগরিকদের সমূহ বিপদ। আর এ অবস্থার যারা বয়লার চালাচ্ছে তাদের বিপদের সম্ভাবনা কম নয়।

এতে যদি কেউ মনে করেন কর্তৃপক্ষ এতদিন এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিয়ে একেবারেই চুপ করে বসে ছিলেন তাহলে ভুল হবে। প্রতিবছরই পলতার সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, অনরারি ভিজিটিং এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার এবং পাবলিক হেল্থ সার্ভিসের বহুবার সংক্রান্ত অফিসার এ অবস্থার দিকে কর্পোরেশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আসছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় কোনও না কোনও কারণে পরিস্থিতি কিছুই করা হয়ে ওঠে নি। অথচ একাজের হাত দেয়ার জন্যে কর্পোরেশন সেই ১৯৫৩ সালেই ২,০০,০০০৲ টাকা বরাদ্দ করে বসে আছেন আর প্রতি বছর শুধু শুধু বাজেটে।

সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র ঘাঁটলে বহু পড়ে এ সম্বন্ধে কিছু করার কথা কর্তৃপক্ষ ভাবতে বাধ্য হন সেই ১৯৪৫ সালে, অর্থাৎ প্রায় ১৩ বছর আগে। সেই বছর রাজ্য সরকার গঠিত এক ইঞ্জিনীয়ার বিশেষজ্ঞদল পলতা পরিদর্শন করে, পাম্পিং ষ্টেশনে শতকরা ৫০ ভাগ বৈদ্যুতিকরণের পক্ষে মত দেন। খুব ভাল কথা। কিন্তু কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যেবানুষ ব্যাপারটা চেপে গেলেন।

ঘটনার যবনিকা উঠলো একেবারে ১৯৫৩ সালে। সেই বছর অডিট বিশেষজ্ঞদলের মতের প্রতি কর্পোরেশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। তাই ত! যাক্, ঐ বছরই কর্পোরেশন একটি নূতন ষ্টীম টারবাইন কেনার প্রস্তাবে রাজি হন। সঙ্গে সঙ্গে কর্পোরেশন একাজ করার জন্য টাকার জোগাড় করে ফেলেন, কল্ক করে। অন্তত: এই একটা ব্যাপারে কর্পোরেশনকে বিলম্বের জন্য কিউকে কোনওদিনদারী করতে শোনা যায় নি।

কিন্তু একাজের এষ্টিমেট ইত্যাদি তৈরী হতে হতে আমরা এসে পড়লাম ১৯৫৬ সালের মে মাসে। ষ্টাণ্ডিং ওয়ার্কস সাপ্লাই কমিটির সামনে ব্যাপারটা আসে ঐ মাসের ২৯ তারিখে আর দেখা যাচ্ছে কমিটি তাঁরা বিবেচনা না করে চীফ ইঞ্জিনিয়ারের "মতামত" ভলব করেন। পরে এই কমিটিই ১৯শে জুন তারিখের মিটিংএ প্রস্তাবটিকে তুলে নেবার পারমিশন দেন এবং অনকলের একসি-কিউটিভ ইঞ্জিনীয়ারকে চীফ ইঞ্জিনীয়ারকে আদিষ্টে এক সংশোধিত পরিকল্পনা পেশ করতে বলে।

ইতিমধ্যে ১৯৫৬ সালের ১৫ই জুন কর্পোরেশন অধিনেতে টানা ও পলতার বৈদ্যুতিকরণের পক্ষে সিদ্ধান্ত করেন। এই সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে পলতার একটি ষ্টীম টারবাইনের পরিবর্তে ইলেকট্রিক মোটর আনার প্রস্তাব আবার ষ্টাণ্ডিং ওয়ার্কার সাপ্লাই কমিটির সামনে তোলা হয়। ১৯৫৬ সালের জুলাই মাসে। কিন্তু আবার এক ক্যাচ্ বাঁধালো ডেপুটি চীফ একাউণ্ট্যাণ্ট তিনি প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেন এই মর্মে যে ইঞ্জিনীয়ার বিশেষজ্ঞদল ১৯৪৫ সালে শতকরা ৫০ভাগ বৈদ্যুতিকরণের সুপারিশ করেছিল, সুতরাং সম্পূর্ণ বৈদ্যুতিকরণের প্রস্তাব আবার ভেবে দেখা দরকার। সেই থেকে ব্যাপারটা ঝুলে রয়েছে। সম্প্রতি ঐ কমিটি সিদ্ধান্ত করেছেন একটা। তাঁরা মার্চ মাসের প্রথমে পলতা পরিদর্শন করবেন। বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত বৈ কি।

●

এই ক'বছরের আরও কয়েকটা ব্যাপার এবং সুপারিশের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা দরকার। ইঞ্জিনীয়ার বিশেষজ্ঞদল ১৯৪৫ সালে শতকরা ৫০ ভাগ বৈদ্যুতিকরণের সুপারিশ করেছিল এই ভেবে যে বিদ্যুৎ শক্তি পর্যাপ্ত নাও পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু এই কবছরে সে দুর্ভাবনা, বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, গেছে। কারণ কলিকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন তার বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বাড়িয়েছে আর ডি, ভি, সি থেকে বিদ্যুৎ নিচ্ছে। হয় অবস্থার এই উন্নতির কথা ডেপুটি চিফ একাউণ্টাণ্টদের জানা নেই, বা নেহাৎ বিরোধিতা করার জন্যেই তাঁর এই প্রশ্ন। তাছাড়া, বৈদ্যুতিকরণের ফলে খরচা যে অনেক কমবে, সে কথা তিনি ভুললেন কি করে।

●

তারপর আসছে কর্পোরেশনের চীফ ইঞ্জিনীয়ারের ১৯৫৬ সালের ডিসেম্বর মাসে দেয়া মতামত, যা, মনে হচ্ছে, এখনও কমিটির ওপর চেপে বসে রয়েছে। তিনি তাঁর রিপোর্টে মোটামুটি বৈদ্যুতিকরণের বিরোধিতা করার আগে ঐ মাসের ২৯ তারিখে আর দেখা যাচ্ছে কমিটি তাঁর অপচেষ্টা না করে বরঞ্চ চেয়েছেন যে কয়লার দাম বাড়ার জন্যে যে খরচা বাড়ার কথা ভাবছে অনেকে তাদের বৈদ্যুতিকরণের বুদ্ধদনী ব্যাপার কথাটাও ভেবে দেখা দরকার।

তার ওপর তিনি বলেছেন, বয়লার-গুলোকে যদি সারিয়ে নেয়া যায় তাহলে তাদের আয়ু প্রায় ১২ বছর বেড়ে যাবে আর তাতে মুলধনী ব্যয় এরও কোনও তারনা নেই। তাছাড়া এটাও ভেবে দেখা দরকার যে বৈদ্যুতিকরণে লাগবে প্রায় ১২ বছর। এই সব কারণে তিনি বলছেন ইঞ্জিনীয়ার বিশেষজ্ঞদের শতকরা ৫০ জন বৈদ্যুতিকরণের প্রস্তাবই আপাততঃ মেনে নেয়া সম্ভত এবং তাতে কর্পোরেশনের পলতা ও চালার পুনর্নির্মাণের প্রশ্নটা ডালহাউসি বিবেচনা করার সময় পাওয়া যাবে।

●

ইতিমধ্যে কর্পোরেশন একজন দ্বিতীয়ে বিশেষজ্ঞের মতামত নেন এ ব্যাপারে। তিনি হলেন প্রফেসর এইচ, সি, ঘুঘ। ইনি একজনে ইাণ্ডিং কিনান্স কমিটির এসোসিয়েট সদস্য ছিলেন। তিনি পলতা ঘুরে কারজপত্র ঘেঁটে ও বাইরের অনেকের সাথে আলোচনা করে ১৯৫৬ সালের ডেসেম্বরী মাসে রিপোর্ট পেশ করলেন সম্পূর্ণ বৈদ্যুতিকরণের পক্ষে। তিনি জোর দিয়ে পুনরাবৃত্তি করেন এই কথাটার যে বৈদ্যুতিকরণে খরচা কমবে আর তাতে সবদিকেই সুবিধা হবে। তিনি এও বলেনেন যে কলকাতার বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থাটি, ডি,সি গ্রীডের সাথে যুক্ত হওয়ার পর বিদ্যুৎ পাওয়া না পাওয়ার কথাই ওঠে না। আর তাছাড়া, তাঁর এবং ঐকালে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সব্বা ও ইঞ্জিনীয়ারদের বৈদ্যুতিকরণে কত সব্ব লাগতে পারে তা ব্যক্ত করেন। সেটা হল তিন বছর, অর্থাৎ চীফ ইঞ্জিনীয়ারের রিপোর্ট বর্ণিত সময়ের এক চতুর্থাংশ। তিনি তাঁর রিপোর্ট শেষ করেন এই বলে যে তার তাড়াতাড়ি এই বৈদ্যুতিকরণ সম্ভব হয়, তজ্জন্য কর্পোরেশন আর মাননীয়দের পক্ষে মঙ্গল।

●

এ রিপোর্টের পরেও বুবছর কেটে গেল। বিশেষ কিছুই কাজ হয়নি। কর্পোরেশন পুরোনো বয়লারগুলো কিছু কিছু সারাই করতে আরম্ভ করেছেন। অর্থাৎ আরো অন্তত: দশবছর বেওনো দিয়ে কাজ চালানো হবে ও আগে-পাশের লোক সেই সময়টা আবার মৌয়ার উত্তাক্ত হতে থাকবেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মৌয়া নিবারণ সুবোধ মতে চানা পাম্পিং ষ্টেশনের কাছে বেঁধা আপোশাদের লোকেরাও কাছে একটা ডিসপেন্সারি খুলে বসেছেন।

ব্যাপারটা আর কতদিন ঝিমিয়ে রাখা দরকার। টানা-পলতার বয়লার চালাতে বছরে প্রায় ১৭।১৮ লাখ টাকার কয়লা লাগে। আর এই কয়লার টেণ্ডার নেয়া ও দেয়ার ব্যাপারে বিগত কয়েক বছরে অনেক চমকপ্রদ ঘটনা ঘটেছে।

১৯৫৬ সালের আগে এই টেণ্ডার কাকে কাকে দেয়া হবে তার লিষ্ট থাকতো চেয়ারম্যানের পকেটে পকেটে, আর এক এক জন কণ্ট্রাক্টার বছরের পর বছর কর্পোরেশনকে কয়লা সাপ্লাই দিয়ে আসতো। ঐ বছর থেকে কণ্ট্রাক্ট দেয়ার পদ্ধতির খানিক পরিবর্তন হয়। ঐবছরই টেণ্ডার যারা দাখিল করেছিল তাতে তাদের কয়লার দাম, বাবদাইদের খরচা ইত্যাদি আলাদা আলাদা ভাবে দেখাতে হয়। তাতে ইাণ্ডিং ওয়ার্কার্স সাপ্লাই কমিটির খেয়ালের কণ্ট্রাক্ট দেয়ার ব্যাপারে অনেক ছাতড়া বিষয় জানার সুবিধা হয়।

●

কিন্তু গোল বাঁধে কাকে কণ্ট্রাক্ট দেয়া হবে তা নিয়ে, কারণ তদানীতন কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীবি কে বাসাকী বাইরের চাপে পড়ে বিশেষ কাউকে কণ্ট্রাক্ট দেবার চেষ্টা করেন বিরোধিতা করবে। ব্যাপারটা এমন ঘোরালো হ'যে দাঁড়ায় যে কর্পোরেশনের পুরে আলোচনা হ'লে পাছে অনেক কেচ্ছা বেরিয়ে পড়ে বলেকা কমিটির কংগ্রেসী সদস্যদের তখনকার নেতার শ্রীনলেসরাও বুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে বৈঠক বসে দুদিন। কিন্তু শ্রীবাসাকী বাগেইবাগা। এবন কি তিনি শাসান যে এ ব্যাপারে প্রশেন কংগ্রেসের বা অন্তত বাম দুইপক্ষ দুটি নাম সেই মিটে এসে যায়। আর পরের বছরই শ্রীবাসাকী কমিটির চেয়ারম্যানের পদ থেকে সরে পড়তে বাধ্য হন। সে আজগাম আগীন হয় শ্রী জে এস গাং। সেই থেকে এ পর্যন্ত দেখতে কোনও সেক্রেণ্ডোল ঘটনা ঘটেনি বিশেষ।

তেজী – মন্দী

(বাজার সরকার)

তেজী আর মন্দীর খেলা। হৈ হৈ, হুল্লোড় আর গলাবাজি। অজানা পথিক, হঠাৎ পথ চলতে আপনার মনে হ'বে, মারা-মারি হচ্ছে নাকি? এদিক ওদিক তাকাবেন, কিন্তু লাঠি সোটা কই? কাজেতো পা ভাঙ্গছে না, হাত মচ্‌কাচ্ছে না, মাথা দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছেনা, তবে এতো হৈ হৈ কেন? সরকারী মহাকরণের আওতায় সারাটা পথ জুড়ে সেতো-বাজারের এই গলাবাজী কিসের জন্য?

ফাটকা বাজারের নাম শুনেছেন আপনি? যেখানকার নেংটিপর। মানুষ একদিন হঠাৎ দেখবেন বিরাট বিরাট বাড়ী তুলছে, গাড়ী কিনছে, ঘোড়ার পিছনে দু'দশ হাজার বিলিয়ে দিচ্ছে আর বাহবা দিচ্ছে ইডেন উদ্যানে দান খেলার মহরতে ছায়াছবির সবজান্তা বরালগবনাদের চলন দেখে।

আবার একদিন আসে, যখন দেখবেন সব ধূলিসাৎ। বাড়ী গেছে, গাড়ী গেছে, চোখের সুরমা গেছে—বাবুঘাটের পার-ঘাটার বসে আছে বিগত ঐশ্বর্যের চিন্তার বিভোর ফাটকাবাজারের একদিন-কার তেজী ওয়ালা সেই বানুষটি।

এরই নাম ফাট্‌কাবাজী।

ফাট্‌কা বাজারে হাতে হাতে কোন টাকাপয়সার কারবার নেই, সবই কাগজপত্রে। বাজার খোলার সঙ্গে সঙ্গে টাইপে দেওয়া হয় কতকগুলি কোম্পানীর শেয়ারের তখনকার মত দাম। তেজী মন্দীর খেলায় মধ্যমণি হলেন 'ইণ্ডিয়ান আয়রণ'। এর দামের উপরেই নির্ভর করে বাজারের ওঠা-নামা। এরপর, আজ বাজার খোলার সঙ্গে সঙ্গে ইণ্ডিয়ান আয়রণের দাম (ফাট্‌কা বাজারের ভাষায় 'ভাও') দেখা গেল একুশ টাকা তিন আনা।

তারপর সুরু হ'লো যাকে বলে, স্পেকুলেশান। তেজী-ওয়ালারাই এই সব স্পেকুলেশান চালান। তাদের মাথা দিয়ে অনেকরকম কাহিনী বেরোয়। যদি তারা ইচ্ছা করে যে তাদের গচ্ছিত বহুল পরিমাণে শেয়ারের খানিকটা বাজারে বিক্রী করতে হ'বে, তখন একশ টাকা তিন আনার শেয়ারকে তারা হয়ত দু' আনা কম দামে ছাড়তে সুরু করবে। অমনি ভুপেকরাণ জনতা, ছোটখাটো ফাট্‌কাওয়ালার দল, চিৎকার সুরু করবে, 'মন্দী হো গিয়া' 'মন্দী হো গিয়া'।

আবার যদি তাদের খেয়াল হয় যে কিছু শেয়ার কিনতে হ'বে, তখন বাজারে দেখা দেবে তেজী ভাব। অর্থাৎ, একশটাকা তিন আনা যে বাজার খোলার সময়কার দাম ছিলেন, সেটা ফাট্‌কাবাজীর দরুন উঠে গেলো একুশ টাকা পাঁচ কি ছয় আনায়। বাজারে অমনি কেনার হিড়িক পড়ে গেল এই আশায় যে দাম আরো বাড়বে।

আমার আপনার মতো ছোট-খাটো ব্যাপারীরা বেশ কিছু শেয়ার কিনে ফেল্লাম। কিন্তু হায়, হায়, খানিক পরে দেখা গেলো, তেজী-ওয়ালারা, ইংরেজীতে যাদের বলা হয় Bull, তাঁরা এমন একটা কারসাজী করে বস্‌লেন, যার ফলে আপনি যে দামে কিনেছিলেন, তার চেয়ে দাম অনেকটা পড়ে গেল।

অমনি, দাম আরো কমতে পারে, এই আশঙ্কায়, আপনি বেশ খানিকটা লোকসান দিয়ে বেচ্‌ী সুরু করলেন আর দিনের শেষে মাথায় হাত দিয়ে বসে রইলেন সায়েদের পামের লোকানের বেঞ্চিটার উপর।

●

ফাটকা বাজারে দাম ওঠা-নামা কেন হয় এবং কিভাবে হয়, আপনার জানা দরকার। ইংরেজীতে যাকে বলে Rumour আর বাংলায় আমরা বলে থাকি 'গুল' বা গুজব, তেজী-মন্দীর কারবারে অনেক সময় একে নির্ভর করে গণেশ বসানো হয় আবার উলটানোও হয়।

আমেরিকায় আইসেনহাওয়ারের সদি হবে নাক দিয়ে জল ঝরছে কিনা, রাশিয়ার বুলগেনিনের হাতের ফোড়াটার কি অবস্থা, পাকিস্থান কি কাশ্মীরে লড়াই সুরু করেছে—এ সবকম অদ্ভুত অদ্ভুত প্রশ্ন—আপনি যদি খবরের কাগজে চাকুরী করেন তবে প্রায়ই আপনার কাছে আসবে।

আইসেনহাওয়ারের সদি আর বুলগেনিনের হাতের ফোড়া —সহস্র সহস্র বাইল দূরের এই দুইটি কল্পিত ঘটনা—কলিকাতার ফাট্‌কা বাজারে অত্যন্তভাবে সময় সময় কাজে লাগানো হয়। তারপর আছে, অনেক দেশীয় ঘটনা।

যেমন ধরুন বার্ণপুরের কার-খানায় কি চাটার কারখানার খর্ঘট। চা' বাগানে মজুরদের গোলমাল। কলিকাতার ডকে জাহাজীদের কর্মবিরতি। এই সব ঘটনা ফাট্‌কাবাজারে বেশ কাজে লাগানো হয়। নোহার কারখানায় বেই কোন খর্ঘ-ঘটের খবর পাওয়া গেলো, অমনি বাজারে মধ্যমণি ইণ্ডিয়ান আয়রণের দাম কমতে সুরু করবে। সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল আরো কিছু অন্য ধরণের শেয়ার মন্দী হয়ে পড়েছে। ইংরেজীতে একে বলে 'Sympathetic decline', অর্থাৎ আপনি একজন গণ্যমান্য লোক, আপনার দুঃখে আমিও দুঃখ প্রকাশ করছি!

কলিকাতা সহরে এক ধরণের লোক আছে, যারা বলে থাকে যে ঘোড়ায় নাকি তাদের খাইয়ে রেখেছে, অর্থাৎ বেশ খেলেই নাকি তাদের দু'পয়সা কামাই হয়। আর এক ধরণের লোক পাবেন, তাদের যদি জিজ্ঞেস করেন কি করা হয় আপনার? সঙ্গে সঙ্গে উত্তর পাবেন: বাজারে বেরোচ্ছি।

অর্থাৎ সরকারী মহাকরণের পিছনের রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গলাবাজী আর হল্লোড়ের মতড়ায় কিছু রোজগারের চেষ্টা করছি। রোজগার যে কিছু না হয় তা নয়। নইলে, দিনের পর দিন এই মানুষগুলি ফুটপাথে আর চায়ের দোকানের বেঞ্চিওলোকে নির্ভর করে কেন ঝটলা করে বেড়ায়, হৈ হৈ করে।

তবে, অতি গোপনে আপনাকে একটা কথা বলে রাখি: আমার দু'চার জন পরিচিত ফুটপ্রেরত ফাটকা-ওয়ালাদের অভিজ্ঞতা যদি সত্যি হয়, তবে আপনি বরং বেকার হ'য়ে নিজের বাড়ীর রোয়াকে বসে খুলিয়ার রাজা বাস্সাদের নিপাত করুন আর গড়াচারী বিপ্লবের দিকে সতর্ক-নয়নে তাকিয়ে থাকুন, কিন্তু দোহাই আপনার, তেজী-মন্দী বাজারে গুলে হাতে সওদা করতে যাবেন না।

ছাব্বিশে জানুয়ারী সংখ্যা "দর্পণ"-এ শ্রীবুদ্ধদেব বসু মনীষার মহিমা কীর্তন করতে গিয়ে কতগুলো পরস্পর অসংলগ্ন কথা বলেছেন, যাতে করে এই মহিমাকে খর্ব করা হয়েছে।

মেজরিটির রাজত্বে ভারতে কি কি দুর্ঘটনা ঘটেছে, বা অদূর ভবিষ্যতে ঘটতে পারে, তার একটা মোটামুটি তালিকা তিনি প্রস্তুত করেছেন; এবং মেজরিটি রাজত্বের নীতিটাকেই আক্রমণ করেছেন; যে দেশে মেজরিটি রাজত্ব আছে এবং যে দেশে এরকম রাজত্ব নেই, এই দুই দেশকেই এক খাঁচায় পুরে বাইরে থেকে খুব চাবুক আস্ফালন করেছেন। তাঁর মতে দেশে মেজরিটি রাজত্বের স্থাপনার ফলে মনীষীদের কণ্ঠরোধ করার একটা বিরাট প্রচেষ্টা চলেছে, কিন্তু কয়েকটি বীর্যবান মনীষীর কণ্ঠ এখনো রুদ্ধ হয়নি, খুবই সম্ভব আছে। এই কথাটা প্রমাণ করার জন্য তিনি ডিটেক্টিভের কলম্বাস, হিন্দী-ভাষা, আধুনিক কবিতা, স্বাধীন-স্ত্রী, স্ত্রী ও পিতৃহন্তা পুত্র, এই নিয়ে সগর্বে ও উচ্চকণ্ঠে মনীষার অবতারণা করেছেন।

●

বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্ভাব্য শিক্ষার সম্বন্ধে তিনি যা বলেছেন, তা মানতে হলে আগে থেকে নিতে হয় কর্মসমিতির অধিকাংশে সদস্য অশিক্ষিত, মূঢ়। তা যদি তাঁরা হন, তাহলে মেজরিটি রাজত্বের জন্য হবেন না, হবেন সেশব্যাপী অধঃপতনের জন্য। এই অধঃপতনের জন্য দায়ী আমাদের "ঐতিহ্য", যা নিয়ে আমরা ছোটো, বড়, লায়ে লাপ্পায় ভক্ত ও পথের পাঁচালীর ভক্ত, সকলেই দিনরাত্র বড়াই করে থাকি। মেজরিটির রাজত্ব আমাদের এত পুরোনো হয়নি, যাতে করে দেশের অধিকাংশ লোকের উপর তার প্রভাব বিস্তার হতে পারে। আর মেজরিটির রাজত্বে যদি বিশ্ববিদ্যালয়ে কবিতা পড়া বন্ধ হয় ত অন্য কোনো রাজত্বেও তা হতে পারে, এবং সে সব রাজত্বে কবিতা পড়া কেউ ফের চালু করতে চাইলে তার সমূহ বিপদও হতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয় অধিকাংশের মতে না চলে একজনের মতে চললে ফল কি এখনকার চাইতে ভালো হোত?

মেজরিটির রাজত্বের বহু অসুবিধা আছে সত্য, কিন্তু কতগুলো সুবিধাও আছে, যা অন্য কোনো রাজত্বে পাওয়া সম্ভব নয়। একটা হোলো, কোনো দলেরই মেজরিটি হতে বাধা নেই। আরেকটা হোলো, দেশের সেই সব লোকের কথা বলার সুযোগ থাকে, যারা অন্য কোনো রাজত্বে "মুহ চুনমুক মুখে" বসে থাকত। সব চাইতে বড়ো সুবিধা হোলো, যে কেউ এই রাজত্বকে যা খুশী বলতে পারে—যেমন বসু মহাশয় পারছেন—তাতে কারো হাতে মাথা কাটা হয় না। সংখ্যাগরিষ্ঠরা যে সংখ্যালঘুদের চিবকাল পায়ের তলায় রেখে দেবে, এমন কোনো কথা নেই। তা যদি তারা করে, ত নিজেদের স্বভাবের দোষে এবং সংখ্যালঘুদের নির্বীর্যতার জন্য হবে। শতকরা ৫১ জনের শক্তি দেখাতে গিয়ে বসু মহাশয় বাকী ৪৯ জনকে অযথা দুর্বল করে ফেলেছেন। সংখ্যার এত সামান্য তারতম্যের জন্য যদি এই ৪৯ জন এত নিষ্ফল হয়ে পড়েন, তাহলে আর খুজন বাড়লেও তাঁরা নিষ্কর্মা হতেন। অবিশ্যি এই তারতম্য বেশী হতে পারে। তা যদি হয় ত সংখ্যালঘুদের বলার কিছু থাকে না, কারণ তাহলে বোঝা যাবে তাঁরা সত্যিই শক্তিহীন, তা না হলে এত তারতম্য হত না।

●

একটা কথা লোকের প্রায়ই বলে থাকে না। আমাদের দেশে মেজরিটির সত্য অথবা কাল্পনিক অত্যাচারের চাইতে চের বেশী সর্বনাশা জিনিষ হচ্ছে ব্যক্তিপূজা। যাঁরা সারাজীবনে দেশের জন্য বিন্দুমাত্র ত্যাগ স্বীকার করেন নি, তাঁরা মন্ত্রিত্বের আসন পাওয়া মাত্র আমরা তাঁদের পায়ে-লুটিয়ে পড়ি। এ দুষ্টান্ত দেখবার জন্য বেশীদূর যাবার দরকার নেই। এই নীললোহনকারীদের মধ্যে দুচারজন মনীষীও আছেন, যাঁদের আছে আমরা সাধারণ মানুষের জন্য আচরণ আশা করে থাকি। এটা মেজরিটি রাজত্বের দোষে হয়নি, হয়েছে আমাদের যুগ-যুগের দাস মনোবৃত্তির জন্য। যেখানে কোনো প্রতিবাদ নেই, আছে শুধু প্রণিপাত, সেখানে মেজরিটি মাইনরিটির উপর অত্যাচার করবেই।

●

রাষ্ট্র সব কিছু ঠিক করে দেবে বলে বসু মহাশয় আক্ষেপ করেছেন। আর কে করবে? রাষ্ট্রের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকা আমাদের চিরকালের স্বভাব। এর জন্য পঞ্চাশ বছর আগেও রবীন্দ্রনাথ বহুবার দুঃখ প্রকাশ করেছেন, এই নির্বীর্য মনোবৃত্তি দূর করার জন্য বহু প্রয়াস পেয়েছেন, কিছুতেই কিছু হয়নি। তখন মেজরিটির রাজত্ব ছিল না। এই অবস্থায় রাষ্ট্র যদি ক্ষমতা-মদমত্ত হয়ে অত্যাচার করে, সে কি রাষ্ট্রের দোষ? তবু ত আমাদের অল্প বয়সে নানা লোকহিতকর প্রতিষ্ঠান দেখেছি, বড়ো বড়ো শিক্ষাব্রতীদের দেখেছি। আজ যে সে রকম লোককে দেখা পাওয়া যায় না, সে কি মেজরিটি রাজত্বের জন্য? দেশে এখনো যে সব প্রতিষ্ঠান লোকহিতকর কাজ করে থাকে, রাষ্ট্র সেগুলোকে সংঘবদ্ধ করে, তাদের অর্থ সাহায্য করে তাদের কাজকে এগিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার বোর্ডের মারফৎ। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানগুলোর নিজেদের মধ্যে দলাদলির, দ্বেষা-দ্বেষির অন্ত নেই। তাও কি রাষ্ট্রের দোষ হোলো?

●

মেজরিটির রাজত্বের দোষাবলী কীর্তন করতে গিয়ে বসু মহাশয় একটা অদ্ভুত কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, "কোনো কোনো ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের মহত্তর (বৃহত্তর?) স্বার্থের জন্য সন্তানের পক্ষে পিতাকে বা স্ত্রীর পক্ষে স্বামীকে ধ্বংস করা শুধু সম্ভব নয়, সংকর্ম।" এটা কি তিনি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে লিখেছেন? এ দেশে এরকম "সৎকর্মের" দৃষ্টান্ত তিনি একটা দেখাতে পাবেন? যে দেশে এরকম ঘটনা ঘটে, সে দেশে মেজরিটির রাজত্ব আছে, এমন কথা তিনি কিসের করে বলতে পারেন? কয়েকটি কাল্পনিক মনীষীর উপর কাল্পনিক অত্যাচারের কথা বলতে গিয়ে গণতান্ত্রিক আর একনায়কত্বের দেশের এই অদ্ভুত বিনন ঘটালো আর যাই হোক বিচারবুদ্ধির পরিচয় নয়। "অত্যাচারে মরণারা" হয়ে এতটা কল্পনার আশ্রয় তিনি না নিলেও পারতেন। কল্পনা যেখানে সত্যের সঙ্গে সম্বন্ধ হারিয়ে ফেলে, সেখানে কল্পনা ভোজবাজীতে পরিণত হয়।

শ্রীজিতেন সেন

হিন্দীভাষা দেশের রাষ্ট্রভাষা হলে অ-হিন্দীভাষীদের প্রভূত ক্ষতি হবে, সে কথা সম্পূর্ণ সত্য। কিন্তু তাতে মনীষীরা মারা পড়বেন কেন? বসু মহাশয় তাঁর প্রবন্ধের শেষে বলেছেন, "এই রকম অবস্থার মধ্যেও যে জ্ঞানী ও ধ্যানী মানুষ একেবারে নির্বংশ হয়ে যাবেন এতে অন্তত এটুকু বোঝা যায় যে, মানুষের বিকাশ-প্রবণতা অফুরন্ত হলেও তার মুক্তির আশা নিরাশ্রীন।" এতে আরও বোঝা যায় যে, জ্ঞানী যখন ধ্যানী হন, অর্থাৎ মনীষার সঙ্গে যখন চরিত্রবলের সমন্বয় হয়, শুধু তখনই মনীষী অজেয়। সক্রেটিস্ জ্ঞানী ছিলেন, ধ্যানীও ছিলেন, তাই তিনি নিজ হাতে বিষপান করলেন, নীতিকে ত্যাগ করলেন না। তাঁর দুর্বল দেহ বিনষ্ট হোল, কিন্তু ধ্যানী মন নতি-স্বীকার করল না। গ্যালিলিও জ্ঞানী ছিলেন কিন্তু ধ্যানী ছিলেন না। তাই সাধ্যনা কারাবাসের পরই নীতিকে বিসর্জন দিলেন। মেজরিটির দুঃশাসনের জন্য এই দুই মনীষীর আচরণে তারতম্য ঘটেনি।

●

মেজরিটি রাজত্বের দেশে মনীষাকে দাঁড়িয়ে রাখা হয় না, দাঁড়িয়ে রাখা হয় স্বৈরতন্ত্রের দেশে।—যেমন রাখা হয়েছে মুসোলিনির মিলোভান জিলাসূকে। অন্যদিকে দেখি ইংলণ্ডের হাইড পার্কে যার যা খুশী বলে যাচ্ছে, যাকে যা খুশী গালাগালি দিয়ে যাচ্ছে, কোনো বাধা নেই। যদি কারো বক্তৃতা শুনে শ্রোতারা ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে আক্রমণ করে, ত তাকে রক্ষা করবার জন্য পুলিস আছে। এটা সত্য হয়েছে, ইংলণ্ডের মেজরিটির রাজত্বে সম্ভব হয়নি যখন সে দেশে রাজাদের ক্ষমতা অপ্রতিহত ছিল। ইংলণ্ডে দুটি প্রধান রাজনৈতিক দলের মধ্যে শক্তির তারতম্য ঐ ৫১-৪৯র মতোই, কিন্তু সেখানে মেজরিটিওয়ালারা এত নির্ভীক নয়, কারণ সংখ্যালঘু দলটি সেখানে প্রবল। আমাদের দেশে সংখ্যা-গরিষ্ঠরা যে একরকম বাধ্যতাঁন সে শুধু সংখ্যালঘুদের বাধার অভাবে। আজ যে সেশব্যাপী অনাহার, শিক্ষার অভাব, নানা অত্যাচার, তার বিরুদ্ধে ও কোনো প্রতিবাদ শুনি না, শোভাযাত্রা করে "চলবে না, চলবে না" ধ্বনি ছাড়া এইরকম অবস্থার মধ্যে এখনো যে দেশে কিছুমাত্র স্বাধীনতা রয়েছে, তাতে অন্তত এটুকু বোঝা যায় যে, ক্ষমতায় আসীন লোকদের মধ্যে সংঘবদ্ধ একেবারে নির্বংশ হয়ে যায় নি। কিন্তু তাতে রাষ্ট্রের দোষকীর্তনকারীদের কোনো কৃতিত্ব নেই। এটা সম্ভব হয়েছে এই সংঘলোকরা এখনও জীবিত আছেন বলে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে, তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে।" এই অন্যায় সহনকারীদের দল আজ সংখ্যা-হীন। সেটা মেজরিটি রাজত্বের দোষ নয়। বরং যেখা গেছে সেখানে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রবল, সেখানে মেজরিটিওয়ালা-দের নতি স্বীকার করতে হয়েছে।

●

মেজরিটির রাজত্বহীন যুগে মানুষের অগ্রগতির দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে বসু মহাশয় কলম্বাসের উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, কি করে রাণীর আনুকূল্য লাভ করে (রাজার নয়) কলম্বাস তাঁর অভিযানের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। অবিশ্যি তিনি স্বীকার করেছেন যে, তৎপূর্বে কলম্বাসকে রাজসভার দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াতে হয়েছিল। কলম্বাসের সৌভাগ্যক্রমে রাণী ইসাবেলা বুদ্ধিমতী রমণী ছিলেন। তা তিনি নাও হতে পারতেন। না হলে কলম্বাসের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হোত। প্রায় যে হয়েছিল তার প্রমাণ রাজা তাঁকে হাঁকিয়ে দিয়েছিলেন, শেষ পর্যন্ত তাঁর অভিযান ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরুৎসাহ ছিলেন, এবং রাণীর মৃত্যুর পর তাঁকে রাজসভায় ঢুকতে দেননি। রাজসভায় কলম্বাসের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র হয়েছিল, আজকের দিনে পুলানিং কমিশনে তার চাইতে বেশী হোত না। পুলানিং কমিশনকে বিলুপ্ত করার আগে বসু মহাশয় একবার ভেবে দেখলেন না কলম্বাসের ভাগ্য তাঁকে কতটা সাহায্য করেছিল ইসাবেলাকে বুদ্ধিমতী করে পৃথিবীতে পাঠিয়ে। একজনের আনুকূল্য লাভ করে কলম্বাস সাফল্য লাভ করলেন, আর আরেকজনের আনুকূল্য লাভ করতে না পেরে গ্যালিলিও জেলে গেলেন। সবই ঐ একজনের উপর। পুলানিং কমিশনে পাঁচ-জনের আনুকূল্য লাভ করা এর চাইতে কঠিন হোত না।

ইংরাজীতে একটা প্রবাদ আছে—নৈরাশ্যবাদীর কথা সে ভুল, তা প্রমাণ করতে হলে আশাবাদীকে সফলকাম হতে হয়। কলম্বাস যদি মাঝ সমুদ্রে জাহাজডুবি হয়ে মারা যেতেন, কিংবা তাঁর বিদ্রোহী নাবিকেরা যদি তাঁকে হত্যা করত, তাহলে শত আনুকূল্য সত্ত্বেও তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের কথাই সত্য প্রমাণিত হোত, অন্তত কিছুদিনের জন্য।

●

এই এক জায়গায় একটু ইঙ্গিত পেলাম বসু মহাশয় কি রকম রাজত্ব পছন্দ করেন। রাজা-রাজড়ার যুগে একজন লোকের উপর দেশের সব কিছু নির্ভর করত, এখন করে পাঁচজনের উপর। সে পাঁচজনের মধ্যে তিনজনের ভালো ও বুদ্ধিমান হওয়া অসম্ভব নয়। রাজারা বোজে থাকলে গলা থেকে মোতির মালা খুলে সভাকবির গলায় পরিয়ে দিতেন, মৌজে না থাকলে লোককে শূলে চড়াতেন। অর্থাৎ তাঁদের মৌজের উপর সব কিছু নির্ভর করত। এটা মনীষীদের পক্ষে খুব সুবিধের অবস্থা নয়।

●

কেবলমাত্র রাজানুগ্রহে মনীষার মনীষা বিকাশপ্রাপ্ত হয়েছে, একথা কোনোদিনই বিশ্বাসযোগ্য নয়। মেজরিটির রাজত্বের যুগে বিজ্ঞানের বত উন্নতি হয়েছে, শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীরা যত সম্মান ও শ্রদ্ধা পেয়েছেন এত অন্য যুগে হয়নি। কবিতাই মানসিক বিকাশের একবাত্র পথ নয়। চেকুনলিন একেবারে ফেলে দেবার জিনিষ নয়। সাহিত্যে বাঙালীর শ্রেষ্ঠতা অবিসম্বাদী ছিল। সেই শ্রেষ্ঠতা বাঙালী আজ হারিয়েছে। যারা সাহিত্যিক নয়তারাও চেকুনলিনকে গ্রহণ করেনি। একা আজ বাঙালী নোবেলবীর ভাইজের মতো ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে, কোথাও ঠাঁই নাই গাড়তে পারছে না। আধুনিক কবিতা "খুন-খুনির" মতো আওয়াজ না করলেও রসজ্ঞ ব্যক্তিরা তা উপভোগ করে থাকেন যদি তা কবিতা হয়, যেমন উপভোগ করেন রবীন্দ্র-নাথের শেষ বয়সে লেখা কবিতা-গুলো। কিন্তু যে কবিতা শুধু "শালগমের মত আওয়াজ" করে, তা আধুনিক হলেও পাঠযোগ্য নয়। বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতি আজ বন্ধ হতে চলেছে মেজরিটির রাজত্বের জন্য নয়, সাহিত্য জগতে রাষ্ট্রের অনধিকারচর্চার জন্য নয়, বাঙালী সাহিত্যিকের অন্তঃসার-শূন্যতার জন্য, সাধনা ও চিন্তা-নীলতার অভাবের জন্য, কঠোর শ্লোগানপ্রিয়তা ও অনর্থক শ্লোগান-বিরোধিতার জন্য।

●

মনীষীরা সাধারণের চাইতে ভিন্ন জগতের লোক, একথা অনস্বীকার্য। কিন্তু তাঁরা প্রায়ই নিজ নিজ ছাড়া অন্যান্য সব বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তাঁদের উপর দেশের ভবিষ্যৎ ছেড়ে দিলে কি সর্বনাশ ঘটবে তা বুঝিয়ে বলা নিষ্প্রয়োজন। তাছাড়া তাঁদের নিজেদের মধ্যে খাওয়াখাওয়ির অন্ত নেই। বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে সাহিত্যের নানা চিন্তা-

(৪র্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

কেন্দ্রীয় বাজেট—

বর্তমান বাজেটে জনসাধারণের ঘাড়ে নূতন বোঝা চাপে নাই

মোটামুটি গত বছরের কাঠামোই বর্তমান

(দর্পণের পর্যবেক্ষক)

কেন্দ্রীয় সরকারের এবারকার বাজেটে দেশের সাধারণ মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বেঁচেছেন। গত কয়েক বছর ধরেই বাজেটের সময় এলে জনসাধারণের সব স্তরেই একটা উৎকণ্ঠার ভাব দেখা যাচ্ছে। আগে বাজেটের ব্যাপারে বিশেষ করে কেন্দ্রীয় বাজেটে শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, বিত্তশালী শ্রেণীর লোকই বেশী মাথা ঘামাতেন। কিন্তু ইদানীং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার টাকা যোগাতে গিয়ে মধ্যবিত্ত, গরীব এক কথায় আমার ব্যাপারীদের কেন্দ্রীয় বাজেট সম্পর্কে উৎকণ্ঠিত থাকতে হচ্ছে। এবারকার বাজেটে সাধারণ মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন। তবে তা এইজন্যে নয়যে, তাঁরা অনেক কিছু পেয়েছেন তাঁদের খুশি হবার কারণ শুধু এইটুকুযে, এবারকার বাজেটে তাঁদের নতুন কোন দুর্ভাবনার কারণ সৃষ্টিনি। অর্থাৎ তাঁদের কোন প্রত্যক্ষ লাভ না হয়েও, আরও লোকসান হবার আশঙ্কা বিদূরিত হয়ে অপ্রত্যক্ষ লাভের আশা দেখা দিয়েছে।

জনসাধারণ কেন্দ্রীয় বাজেট মোটামুটি গত বছরের কাঠামো এবং নীতি বজায় রেখেই রচিত হয়েছে বলে মনে করেন। তাঁরা মনে করেন, এখন কি, সরকারের দপ্তরগুলিতেও যাঁদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি বিরাজমান এবং শুধু বিরাজমান নয়, ক্রমিকই বেপরোয়াভাবেই বিরাজমান, সেই শ্রেণীর চাপ সরকার উপেক্ষা করতে পারবেন কিনা, সে সম্পর্কে অনেকেরই আশঙ্কা ছিল। কিন্তু সে আশঙ্কা দূরীভূত হয়েছে—কেন্দ্রীয় সরকার বেশ সাহসের সঙ্গেই সে পরীক্ষার উত্তর্ণী হয়েছেন। প্রধান মন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতার বর্তমান কর-নীতি সম্পর্কে সরকারের দৃঢ়তাও প্রকাশ পেয়েছে। তিনি বলেছেন "বিগতাঁ অর্থ সচিব গত বছর কর-প্রস্তাব রচনা করার সময়ে আবার বিশ্বাস হইয়াছিল এবং আমও আমি বিশ্বাস করি যে, ইহাই আমাদের পথ এবং এই পথেই আমাদের কল্যাণ নিহিত আছে। সুতরাং আমাদের পক্ষে এই পথই অনুসরণ করা উচিত।"

এবারকার কেন্দ্রীয় বাজেটের প্রধান উল্লেখযোগ্য বিষয় হল 'উপহার কর' বা 'দান কর'। এইটিই হল এবারকার একমাত্র নতুন কর। এর পুঙ্খানুপুঙ্খ ফল যতটুকুই হোক না কেন, পরোক্ষ ফল বেশ ভালই হবে আশা করা যায়। আর, এর সঙ্গে সঙ্গে উত্তরাধিকার করের ক্ষেত্রে রেহাইয়ের সীমা হ্রাস হওয়ায় এবারকার বাজেটের আর একটি লক্ষণীয় বিষয়। বর্তমান পাঁচ-ভুক্তিকর এই দুটি কর-প্রস্তাবই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ এ থেকে সরকারের কর-নীতির পুঁচতা প্রকাশ পেয়েছে। সরকার যে বর্তমান কর-নীতিতে অবিচলিত আছেন এবং সাধ্যমত সেই নীতির প্রয়োগক্ষেত্র প্রসারিত করেছেন, তা এই দুটি কর-প্রস্তাব থেকে বেশ বোঝা যায়। "বর্তমান কর-ব্যবস্থাকে অধিকতর কর-নীতির উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় উন্নয়ন সাধনের জন্য এবং বর্তমান কর-ব্যবস্থার কোন ত্রুটি থাকলে তা নিরসনের জন্য" এবারকার নতুন উপহার করটি ধার্য করা হয়েছে বলে প্রধান মন্ত্রী ঘোষণা করেছেন। বছরে ১০ হাজার টাকার বেশী দান বা সম্পত্তি হস্তান্তর এই করের আওতায় পড়বে। আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবকে সম্পত্তি হস্তান্তরও এর আওতায় পড়বে। কিন্তু দাতব্য প্রতিষ্ঠান, সরকারী কোম্পানী, কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের আইন দ্বারা প্রবর্তিত কর্পোরেশন এবং যে সব পারিলিক কোম্পানী ছুর বা তাতোধিক ব্যক্তি দ্বারা পরিচালিত তাদের দান বা সম্পত্তি হস্তান্তর এর আওতায় আসবে না। এই করের হার উত্তরাধিকার করেরই সমান হবে। বিত্তশালী লোকেরা উত্তরাধিকার কর এড়াবার জন্যে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বিত্তের পরিমাণ গোপন করার জন্যেও দানের নামে সম্পত্তি হস্তান্তর করে যে সুযোগ নিচ্ছিলেন তা এবার বন্ধ হবে। অবশ্য উচিতক্ষেত্রে যাতে এই কর বাধার সৃষ্টি না করে, তার প্রতিও সরকার দৃষ্টি রেখেছেন। নারী পোষ্যদের বিয়ের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত এবং স্ত্রীকে এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত দান এই করের আওতা থেকে রেহাই পাবে। পোষ্যদের প্রদত্ত ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত দানের বীমাও এই কর থেকে রেহাই পাবে। সুতরাং এই করের দ্বারা ধনীদের উপর অন্যায় বা নির্মম আঘাত করা হয়েছে—এ ধরণের সমালোচনা সরকারের বিরুদ্ধে করেই পারবেন না।

উত্তরাধিকার করের রেহাইয়ের সীমা এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত মূল্যের সম্পত্তির স্থলে ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত হ্রাস করা হয়েছে। এর ফলেও ধনীদের সঞ্চিত সম্পদের উপর থেকে সরকারের আয়ও কিছু আয় হবে।

বাজেট সম্পর্কে লোকসভায় উৎসাহের অভাব

(লোকসভায় দর্পণের প্রতিনিধি)

দিল্লী, ৪ঠা মার্চ ২৮শে ফেব্রুয়ারী শুক্রবার অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকায় লোকসভার স্পীকার 'প্রধান মন্ত্রী'কে বাজেট পেশ করবার জন্য আহ্বান করেন। কয়েকজন সদস্য তখন বলে উঠেন "প্রধান মন্ত্রী নয়, অর্থ মন্ত্রী"। স্পীকার তাঁর ভুল স্বীকার করেন এবং বলেন, "অর্থ মন্ত্রী বলাই আমার উচিত ছিল।" প্রধানমন্ত্রী বাজেট পেশ করছেন। এছাড়া বছরের বাজেট সম্পর্কে পার্লামেণ্টে কোন উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়নি। প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী কৃষ্ণমাচারী গত বছর বাজেটের সময় বলেছিলেন যে আগামী কয়েকবছরের বাজেটে কোন চমকপ্রদ ঘটনা থাকবেনা। এবছরের বাজেটও তাঁরই তৈরী। তাই সদস্যরা এব্যাপারে আগা-গোড়াই নিরুৎসাহ ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী নেহরু শুধু বাজেট বক্তৃতায় তাঁর নিজস্ব দুয়েকটি অনুচ্ছেদ জুড়ে দিয়েছেন, তাছাড়া বাকী সবটাই মন্ত্র পাঠের ব্যাপার মাত্র ছিল।

এবছর বাজেটে দান কর ধার্যের প্রস্তাব করা হয়েছে। এষ্টেট ডিউটির আনুষঙ্গিক হিসাবেই এটা ধার্য করা আগেই উচিত ছিল। কেন যে ইতি-পূর্বে তা করা হয়নি বোঝা দুষ্কর। ওয়েলথ ট্যাক্স এবং কোম্পানী ডিপোজিট ফীস রহিত করা হবে বলে কৃষ্ণমাচারী আবেরিকান ব্যবসায়ীদের আশ্বাস দিয়েছিলেন বলে যে গুজব বাজারে প্রচলিত ছিল বাজেটে তা কার্যকরী করা হয়নি। ফলে ব্যবসায়ীদের মধ্যে হতাশা দেখা দিয়েছে।

প্ল্যানিংয়ের ফলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে গুরুতর অসুবিধা দেখা দিয়েছে এবছরের বাজেটে তা যে পরোক্ষে স্বীকৃত হয়েছে এটা অর্থনীতির যে কোন ছাত্রের কাছে বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ভারতীয় অর্থনীতি এখনও স্থিরত্ব হতে পারেনি—কোন কোন ক্ষেত্রে বাধা দুর্লঙ্ঘ্য হয়ে উঠেছে। বাধ্য এবং স্বল লেভি এর ক্ষেত্রে এই বাধার সুস্পষ্ট লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।

এ ছাড়া ১৯৫৮ সালের যে অর্থ বিল প্রধান মন্ত্রী উপাপন করেছেন তাতেও একটি গুরুত্ব-পূর্ণ পরিবর্তনের প্রস্তাব করা হয়েছে। উন্নয়নমূলক কাজের জন্য যে শতকরা ২৫ ভাগ রেহাই দেওয়া হয়, তা শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি জন্যেই খরচ করতে হবে-অন্যাভাবে খরচ করা যাবে না। অর্থাৎ উন্নয়নের নামে নিজের বা আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নয়নের জন্যে খরচ করে কর থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না।

ধনী- শিল্পপতি - ব্যবসায়ী শ্রেণীর উপর আরও করভার চাপিয়ে, তাদের পকেট থেকে আরও অর্থ সরকারী অর্থভাণ্ডারে আনা উচিত, কি উচিত নয় সে বাদানুবাদে না গিয়েও এ কথা স্বীকার করা যায় যে, সরকারের কর-নীতি অন্ততঃ ধনীদের ক্ষেত্রে মোটামুটি ঠিক পথেই চলেছে। নতুন দান কর বর্তমান কর-ব্যবস্থাকে পূর্ণাঙ্গ করবে বলে সরকার যে আশা করছেন, তার ভিত্তিটা বাস্তব ভিত্তি আছে বলে বিশ্বাস করার কারণ আছে। আয় কর, ব্যয় কর, সম্পদ কর ও উত্তরাধিকার কর দিয়ে অতিরিক্ত মুনাফাকে বেঁধে ফলবায় বাসিকী চেষ্টা সরকার গত বছর থেকেই করছেন। সেই বাঁধে যেটুকু ফাঁক ছিল, দান কর দিয়ে সেটুকু বন্ধ করার চেষ্টা হচ্ছে। এই সব কর প্রবর্তনের ফলে বড় বড় ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের অতিরিক্ত মুনাফার কিছু ভাগ হয় সরকারকে, না হয় কর্ম চারীদের, না হয় কল্যাণমূলক কাজের জন্যে দানের মাধ্যমে জনসাধারণকে দিতেই হবে- মুনাফার সবটাই তাঁরা পকেটস্থ করতে পারবেন না। এর জন্যে দরিদ্র কর্মচারী শ্রেণী এবং সাধারণ মানুষ সরকারকে সাধুবাদ জানাতে সব সময়ে রাজী থাকবেন, যদি কিনা সরকার কর-সংগ্রহ ব্যবস্থার উন্নতিবিধান করে, বিভাগীয় দুর্নীতি ও ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করে এবং কর ফাঁকি বন্ধ করে তাঁদের কর-নীতির সার্থকতা প্রমাণ করতে পারেন।

পুতুল-খেলা

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

আজুপরাধও রয়েছে সে সত্যটিকে ফুটিয়ে তুলেছেন। কিন্তু তাঁর এ অভিনয়টি দেখে মনে হয়েছে, যেন আরো তথ্যত হওয়ার প্রয়োজন ছিল। তাছাড়া, নাটকের শেষ মুহূর্তে তপনের কান্নায় ভেঙে পড়া দেখে সমগ্র চরিত্রটির বৃদ্ধিতদ্ধি সম্বন্ধে কেমন যেন সন্দেহ জাগে। এ ক্ষেত্রে পরিবর্তন না করে ইব্‌সেনের পুরো অনুসরণ করাই ভাল ছিল। আর একটি প্রসঙ্গে পরিচালকের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। বুলুর সংস্কার কেবল আংটি খুলে দেওয়াতেই বুঝে যাবার নয়—মনে রাখতে হবে সে হিস্টুমতের মেয়ে। সিঁদুর মুছে ফেলা তার পক্ষে দু'চার মিনিটের মধ্যেই সম্ভব নয়। বুলুর সমস্ত মনমজীতে যে আমূল পরিবর্তন ঘটেছে, তার সংকেতেই তা' যথেষ্ট প্রকাশ পেয়েছে। এর বেশী কিছু করার কি খুবই দরকার ?

সব মিলিয়ে দেখতে গেলে, একটি পূর্ণাঙ্গ রসঘন নাটক হবার মতো প্রচুর উপাদান "পুতুল খেলায়" আছে। কিন্তু সামগ্রিক অভিনয়ের দ্বারা সেই পরিতৃপ্তি যতখানি ঘটা উচিত ছিল, ততখানি ঘটে উঠে নি। অবশ্য আরো কয়েকবার অভিনয়ের দ্বারা বহুক্রণী এই অপূর্ণতা মোচন করতে পারবেন বলেই আমাদের বিশ্বাস।

অমর গাঙ্গুলী ও আরতি মৈত্রের অভিনয় অভিনন্দনের যোগ্য। সে তুলনায় কুমার রায়ের ভাঃ রায় একটু আড়ষ্ট। সে সত্ত্বেও কুমার রায়ের অভিনয়ে বৈশিষ্ট্যের ছাপ অনস্বীকার্য। সেইসঙ্গে নরুসজা এবং আলোকসম্পাতের কৃতিত্বও উল্লেখযোগ্য।

বহুরূপীর অভিনয়ে যে নিষ্ঠা ও রুচিবোধের পরিচয় রয়েছে, সে কথা মনে রেখেই তাঁদের কাছ থেকে আরো উন্নত মানের সৃষ্টির প্রত্যাশা রাখবো।

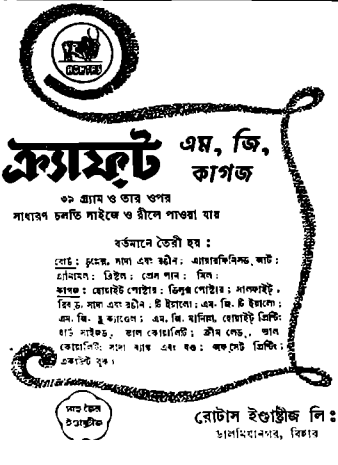

৩১ গ্রাম ও তার ওপর
সাধারণ চলতি সাইজে ও রীলে পাওয়া যায়

বর্তমানে তৈরী হয় :
বোর্ড : ডবল, সাদা এবং রঙীন; এ্যাডামিনিয়ম, আর্ট; ট্রেসিং; ডিউপ; ডেল পার; মিল;
কার্ডস : হোয়াইট গোস্টার : ডিলুক্স পোস্টার; সাদাসাইড, ব্রিস্টল, সাদা এবং রঙীন; ষ্টি ইনালো; এম- জি- ষ্টি ইনালো; এম. জি. ব্লু কার্বনে; এম. জি. ম্যানিলা, হোয়াইট্ প্রিন্টিং কার্ড সাইডড্, ডাল কোয়ালিটি; ক্রীম লেড্, ডাল কোয়ালিটি; সাদা ব্যাক এবং বক্ত; অফসেট প্রিন্টিং একসেট বুক।

সহযোগিতায়
রোটাস ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ
ডালমিয়ানগর, বিহার

'চন্দ্রবিন্দু'র বিচিন্তা

দুই তিন মাস আগেকার কথা। কি একটা যেন আনন্দ-মুনুষ্ঠানে আজুীম বাড়ী সপরিবারে গিয়েছি নেমন্তন্ন রাখতে সন্ধ্যার পর। ওওয়া পাওয়া হতে রাত ন'টা হবে জেনেও গোনার একটু সকালেই। মানে এমনিতে তো যাওয়াই হয় না। পাঁচটা আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব আসবে, কথাবার্তা কুশল পরিচয়েও খানিকটা সময় যাবে। তা ছাড়া নিজের কাজে ব্যস্ত থাকি বলে 'বেশে না' 'আসে না' বলে জ্ঞাতিগুষ্ঠি মহলে আবার নামে ইদানীং যে বদনাম রটেছিল, ভেবেছিলাম এই সুযোগে তারও কিছুটা খণ্ডন করে নেব।

সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ তো গিয়ে হাজির। গিয়ে দেখি, সব ভোঁ ভাঁ। কেউ কোথাও নেই; ঘরদোর সব খাঁ খাঁ করছে। কি ব্যাপার। খটকাই লাগলো। ভুল করলাম না তো নম্বর টিনে আসতে। ইতিমধ্যে দেখি গোপাল সান্যাল মশাই ভেতর থেকে সদরে আসছেন ছুটতে ছুটতে। দেখা হতেই একগাল হেসে বল্লেন, ভারপর ভায়া কতক্ষণ। যাও যাও ছাতে যাও। এতক্ষণে বুঝি বা ফুরিয়েই গেল। যাও যাও। পিঠে হাত দিয়ে, বলতে গেলে একরকম ধাক্কা দিয়েই, ছাতে পাঠিয়ে দিলেন অনুই মশাই।

নমাসে ছমাসে একটা নেমন্তন্ন, সন্ধ্যে রাত্তিরেই লুচি ফুরিয়ে যাবে, এ কি চালাকি ফুখা। স্ত্রীকে বললাম, চটপট বসে পড়বে যেখানে কাঁক পাবে, আদর-আপ্যায়নের কোন অপেক্ষা রেখো না। এক ছুটে একেবারে ছাতে গিয়ে হাজির পরিবার সমেত। গিয়ে দেখি, ছাত ভরতি লোক। পাতা পড়েছে ছাতেও নয়, আকাশে, সব হাঁ করে দক্ষিণের আকাশে শুটুনিক দেখছে। তারার মত ছোট্ট একটি স্ফুলিঙ্গ, জ্বলছে নিভছে—নিভছে জ্বলছে চক্কোরে ঘুরে ঘুরে। সাদা চোখেই দেখা যাচ্ছে স্পুটনিক।

সান্যাল মশাই আবার আকাশে হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে স্পুটনিকের আগে পরের গতিপথ বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন আবার স্ত্রীকে। বলছিলেন, আবারস্যে আসছে, আজ চতুর্দশী, সুতরাং নৈঋত কোণ ধরে ওকে বেরুতেই হবে। কাল এসে দেখবে ওর অফরেখা বদলে গেছে। কাল যাবে ঈশান কোণ ধরে। লেখাপড়া জানা মোটামুটিভাবে শিক্ষিত লোক সান্যাল মশাই, ফলিত জ্যোতিষে কিছু কিছু অধিকার আছে জানতাম, স্ত্রীকে বলছিলেন এই কথা।

আরও বলছিলেন, কেপণাস্ত্র শুনে আশ্চর্য হও, কেন তুমি আমাদের পাওপাতের কথা শোন নি? নতুনটা আর কি করেছে বলো? শেষটা বললেন আরও চমৎকার। বল্লেন, ছাড়লি ছাড়লি, কালীপুজোর রাত্তিরে ছাড়তে পারলি নে। মা আমাদের কালো, কালো মায়ের পায়ের তলায় ঐ আলোর নাচন কেমন জব্দতো বলতো?

সান্যাল মশাই'এর কথার প্রতিবাদ করিনা। কারণ আমি দেখতে পাই তখন উল্কুনতর কোনো আর এক জ্যোতিষ্ক—সান্যাল মশাই'এর চোখেমুখে নিভছে জ্বলছে, জ্বলছে নিভছে। এই জ্যোতিষ্কই বাসে ট্রামে হাটে বাজারে অফিস আদালতে নিত্য নৈমিত্তিকভাবে প্রদক্ষিণ করেন—বিপদে আপদে প্রতিবেশীকে সান্ত্বনা দেন, বুদ্ধি দেন, ন্যায়-অন্যায় বিচার করেন, ভোট দেন, জনবত গঠন করেন। এই সান্যাল মশাই আমার আত্মীয়, কিন্তু আপনারেরও অনাত্মীয় নয় জানবেন।

আবার যদি বা দানা বাঁধলো তো তখির তদারক পেড়ে ধরার নিরুৎসাহে ফসকে গেল। এই ফসকে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই ধসকে গেল অনেকগুলো মন—কতক-গুলো মানুষ। ফল আশাভঙ্গ, মনোবালিন্য,খেয়ওখেইয়ি,খাওয়া-খাওয়ী যার যার তার তার ভাব,—সেই একলা চলরে। চুড়ান্ত স্বার্থ-পরতা, এককুনোমী। অথচ স্পষ্ট বুঝতে পারা যাচ্ছে একজনের কাছে আর একজনের ধার ধারতেই হবে। একা একা বাঁচা যাবে না। অসামাজিক মানস সমাজজীবনে মানুষের ক্ষেত্রেও বাড়ছে।

সুতরাং সমাজ জীবনের বাধা-বাধকতা স্বীকার করে নিয়েই প্রশ্নগুলো ঠিক ঠিক তুলতে হবে এবং সবরেত চেষ্টার দ্বারা সেগুলোর হিল্লে করতে হবে। ফসকে না গেলে জনমানস ধসকাবার সম্ভাবনাও হবে কম। ফল একটা হবেই। কেউ আসবে না, কেউ দেখবে না, অতএব সেই অভিমানে দুগম পথযাত্রা আবার একার—এটাও ঠিক হবে না। এতে করেও সাপ মরবে না, আর লাঠিটিও ভেঙে যাবে। রইল শুধু কৌস আর তার দুর্দ্ধর্ষ বিষ ডঙ্কের তলায় আমি। অবস্থাটা কল্পনা করুন।

* *

এই রকমই দাঁড়িয়েছে অবস্থাটা। বধাবিত্ত মনে এই সঙ্কট ছাড়া কথা নেই। কৌস সামলাতেই নকড়াছকড়া, প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ। সর্বদিকে পর্দুদস্ত হয়ে বিপর্যস্ত। কোন দিকে সামলানো যাচ্ছে না। কি রাজ-নীতিক জীবনে, কি সমাজজীবনে, কি পারিবারিক জীবনে, কোথাও কোন আলো দেখা যাচ্ছে না। পঞ্চবার্ষিক, পঞ্চায়েতী ও পারিবারিক আসর মধ্যবিত্ত চিত্তে একেবারে ছত্রভঙ্গ। একে-বারে খেই হারিয়ে গেছে।

বিধুভ মধ্যবিত্ত প্রাণ ইত্য-বসরে বাইরে আগুন দিয়ে শুধু ঘর সামলাচ্ছে। অথচ বাইরে আগুন লাগলে সেই ঘরেরই যে কেন্দ্র কতক্ষণ, তা কিছুমাত্র চিন্তা করছে না। অথচ এই বিধুক্তির পেছনে কোন যুক্তি নেই। কারণ কমুনী নেহি ছোড়তা। কালো কম্বল ছেড়ে দিলেও কালো ডালুকের বাহুবন্ধন এড়ানো শক্ত।

সুতরাং বিধুক্তিতে মুক্তি নেই। মুক্ত হয়েই মুক্তির পথ উদ্ভাবন করতে হবে। পঞ্চশীল বুঝতে হবে, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা যতই আগওবি হোক চ্যান্স একটা দিতেই হবে, পঞ্চায়েতী বৈঠকে বসতে হবে, পারিবারিক জীবনে বাহুল্য ফ্যাচাং আর খুলবাবেনার অবকাশ না দিয়ে শৃঙ্খলা আনতে হবে। মধ্যবিত্ত আমরা প্রকৃতপক্ষে তাই-ই করছি বাধ্য হয়ে অবস্থার চাপে, ডুবে ঐ বিধুক্তিবোহ জলের ওপর ভেলের মত আবাদের ভাসিয়ে রেখেছে।

পথেঘাটে চলতে ফিরতে একভাবে না একভাবে দেখা একবার হবেই আপনার এই সান্যাল মশাই'এর সঙ্গে। ইনি একক কিন্তু প্রয়োজনে ইনি বহ-রূপে আপনার সামনে নিত্য প্রকাশিত। মানে কি এসে যায়? পদবীটাই যে ঠিক থাকবে এমন কোন কথা নেই। একটু খেয়াল করে দেখবেন, ঠিক চিনতে পারবেন। খেয়ালটাই দরকার।

●

সত্যি কথা বলতে কি, এই খারখেয়ালী করে করে অনেক দিন গেল। বৃটিশ আমল না হয় সাম্রাজ্যবাদী শোষণের যুগ, হাড়ে মাসে দুব্বো ঘাস গজিয়ে ছেড়েছিল আমাদের। কিন্তু এখন তো স্বাধীন। খারখেয়াল ছেড়ে এখনই বা খেয়ালটা থাকছে কোথায়? বলবেন, না অনেকটা শুধরেছে। আগেকার চাইতে হাল আমলের নম্বরটা পরিষ্কার, তাও ফাঁকিঝুঁকি আর চলছে না।

কিছুটা ঠিক কথা—প্রশ্ন উঠছে প্রত্যেক বনেই। কিন্তু ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে, সচরাচর যা দেখে থাকি, এই প্রশ্নের ধরণটা খানিকটা বুদ্বুদের মত। পুটপাট উঠেই ফুটকাই ফেটে যাচ্ছে। প্রশ্নের কোন নিরাকরণ হচ্ছে না। তার কারণ প্রশ্নটা অনেক ক্ষেত্রেই সমীচীন হচ্ছে না, আবার সমীচীন হয়েও অসমীচীন বনে দানা বাঁধছে না বহু জায়গায়।

অথৈ বারিধি থকে ভেলের এই স্বাতন্ত্র্য নিঃসন্দেহে সাময়িক। তাই ভেসে না থেকে মিশে যাওয়াটাই বুদ্ধির কাজ হবে। খোলা জলে বিশে গিয়ে স্বচ্ছ পানীয়ের অবস্থা সৃষ্টি করাই হবে ভদ্রলোকের কাজ। তাতে করে একটু ভেবে দেখুন, আমাদের ভয় ঐতিহ্যের কোন অপবান হবে না। বরং সেটা ঐতিহ্যসম্মতই হবে। অবস্থাস্তর বাপঠাকুর্দাদের কথা স্মরণ করুন। মজির আছে, নজির মিলবে। বদলালে বদলাতে হয়।

সবই বদলায়। চিরন্তন কিছু নয়। বিপুব, তাও যে সব সময় উপপুব করে নয় সে হিসেবেরও দিন এসে গেছে। শত পুশ, শত পথ-বহপণ্ডিত মাও-সে তুঙ-এর মৌলিক বিজ্ঞানী অবান-বন্দী। সেই পুশ্পিত সড়কের গতিপথ ধরে বিধুবের আভাস্তরীণ গুণাগুণের নয় নির্ধারণ সবুঃ, রক্তঃ, তমঃ'র পরিপ্রেক্ষিতে এসে গেছে। প্রলয়ঙ্কর হাইড্রোজেন বোমা আর কেপণাস্ত্রের গর্ভেই সৃষ্টির বীজ লুকিয়ে আছে—এ কথা সুনিশ্চিত।

তাই শান্তি চাই। মহা-অশান্তির দিনে শান্তির কামনা এমনই দুর্বার হয়ে উঠেছে। অযুত নয়ন করতে গিয়ে যে গরলটা উঠেছে তা খাবেন নীলকণ্ঠ। এই নীলকণ্ঠের স্বরূপ হচ্ছে সত্য শিব সুন্দর। মানুষের সমাজ-জীবনে এই নীলকণ্ঠের প্রতিরূপ হচ্ছে জাগ্রত জনমানস—নর-নারায়ণ। ত্রিনয়নে এঁর প্রজ্ঞার বিদ্যুৎবহ্নি আপৎকালে জ্বলে উঠেছে। এই চোখে দৃষ্টি নিমিয়ে এবার শুধু নজর রাখতে হবে এই অযুত অসুরে না পান করে।

'চন্দ্রবিন্দু'

আন্তর্জাতিক সংবাদ

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর)

চুক্তিটি হয়েছে, বৃটেনে আমেরিকার অস্ত্র রাখা ও ব্যবহার নিয়ে। অন্তঃদেশের উপর কর্তৃত্ব করবে আমেরিকা কিন্তু এদেশে ব্যবহৃত হবে কিনা তা বুঝে দিলে ঠিক করবে। 'এই সব অস্ত্রের জন্য যে ঘাঁটি করবার হবে তা বৃটেন তার খরচার তৈরী করবে। আমেরিকা বলে করে, বৃটেনের সঙ্গে এই চুক্তির পর ইউরোপের অন্যান্য কয়েকটি দেশের সহিত অনুরূপ চুক্তি করা সহজ হবে।

বৃটিশ পুত্রিকল্পা মন্ত্রী ঘোষণা করেছেন রুশিয়া যদি গতানুগতিক অস্ত্রসাধারও বন্ধ করবার আজ্ঞান চালায়, বৃটেন আনবিক অস্ত্রত্যা তার জবাব দেবে। আমেরিকার সঙ্গে চুক্তি ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর বিবৃতির উপর বৃটিশ পার্লামেন্টে এক পুত্র আলোচনা হয়ে গেছে। বেবার দল ভোটে পরাজিত হয়েছে এবং বৃটিশ সরকারের নীতির সবর্ধকপুত্রক প্রস্তাব ৩১৭বে৯১ ভোটে পাশ হয়েছে।

চুক্তি ঘাইহোক, বৃটেন ও আমেরিকার সব বিষয়ে যে মতৈক্য নেই তা নিঃসন্দেহ। সেদিন শ্রীমাকমিলানকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, আমেরিকারই তো হাইড্রোজেন বোমা আছে, বৃটেন কেন আবার তা তৈরী করছে?

শ্রীমাকমিলানের উত্তরে একথা বলা হয়নি যে বৃটেনের নিজস্ব হাইড্রোজেন বোমা থাকার দরুন রুশিয়ার সহিত আলোচনায় সুবিধা হবে। তিনি বলেছেন যুদ্ধ যাতে না হয় তার জন্য আমাদের হাতে একটা একটি অস্ত্র থাকার প্রয়োজন আছে। আমাদের হাতে হাইড্রোজেন অস্ত্র থাকায় আমেরিকা আমাদের মতের প্রতি অধিক শ্রদ্ধাশীল থাকবে। তার গুরুত্ব দুবই বেশী।"

কিন্তু তাতে তাঁর আমেরিকার চাপে বৃটেনে আমেরিকার আনবিক অস্ত্রের ঘাঁটি করতে দিতে আপত্তি হয় নি।

বিধান সভার ইতস্তত:

(১ম পৃষ্ঠার পর)

তাহার " দিক থেকে আমরা উনুততর ব্যবস্থার পৌছুব সন্দেহ নেই। কিন্তু অর্থ বন্ধী ডা: রায় বিধান সভার বিরোধী দলের সদস্য ডা: পুকুল চন্দ্র ঘোষ কিংবা শ্রীবুদ্ধ জ্যোতি বসুর সঙ্গে বসে এষ্টিমেটস কমিটিতে বাজেট তৈরী করছেন, এই সৌভাগ্য কল্পনা না করাই ভাল।

সোজা কথা বাস্তবে, এই কাজটি হবেনা। অর্থদপ্তরের সেক্রেটারী বিনয় দাশগুপ্তকে তিনি বিরোধী সদস্যদের সামনে হাজির করবেন না। এবং বাজেটের যেসব গুপ্ত রহস্য এই দুই ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ, সেটাকে বহি জগতে প্রকাশ করার কথা বলতে আমাদেরই সাহস হয়না। কার্যত: ডা: রায় যা বলেছেন, (অর্থাৎ বাজেট আরও নির্ভুল-ভাবে রচনা করার সুবিধা হবে) শুধু সেইটুকুই যদি হয়, তাহলেও প্রতিবৎসর বিরাট বিরাট Revised Estimate এবং Supplementary Budget এর খাবেদা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। এখন অডিচর জেনারেলের বার্ষিক রিপোর্টে দেখলে যে কোন লোক জানতে পারবেন যে, ডা: রায়ের বাজেট এবং আসল ব্যয় বরাদ্দের মধ্যে শতকরা ১০ থেকে ১৫ ভাগ পার্থক্য দাঁড়িয়ে যায়। এটাকে সামলাতে হয়, Revised Estimate এবং Supplement Budget দিয়ে। একে কেউ বিজ্ঞান সম্মত বাজেট বলেনা--গৃহিনীদের বাজেটও বোধহয় এর চেয়ে নিপুণতর। ডা: রায় যদি বলেন, এই পার্থক্য দূর করা যাবে, Supplementary Budget আর বিপুল হবেনা তাহলে জিনিষটা এই দাঁড়ায়: এখনও কাযত ২ কিস্তিতেই বাজেট হচ্ছে, আসল বাজেটের পরে সাপলিমেন্টারী বাজেট, অর্থাৎ উপস্কারের। নূতন পদ্ধতিতেও ২ কিস্তিতেই হবে, আসলের পূর্বে অগ্রিম বাজেট, অর্থাৎ উপক্রমণিকা। কিন্তু আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করেন-আমি এবিষয়ে নিঃসন্দেহ হব, সাপলিমেন্টারীর বহুর কমবেনা, কার্যত: এখন থেকে তিন কিস্তিতে বাজেট তৈরী হবে—উপক্রমণিকা, আসল এবং উপসংহার।

অতি সস্তায় ও সব রকম ধারে মোটর, অগ্নি ও প্রমিক বীমার জন্য বা গাড়ী ট্রাক প্রভৃতি যুবিধামত কিস্তিবন্দীতে কেনার জন্য অনুসন্ধান করুন:

মেসার্স এস এন বোস এণ্ড কোম্পানী
প্রাইভেট লিমিটেড
১৩১-সি, বালিগঞ্জ প্লেস, কলি:-১৯
(টেলি: ৪৬-১৮৮৫)
এজেন্ট
ন্যাশনাল এমরয়াস মিউচুয়াল জেনারেল ইনসিওরেন্স এ্যাসোসিয়েশন লিমিটেড
ইংলণ্ডে সমিতিবদ্ধ

বিধান সভার ইতস্ততঃ

(বিধান সভার প্রতিনিধি)

শেষ বয়সে ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় বহুবিধ "সূক্ষ্ম বিপ্লবের" কর্ণধার হতে চাইছেন। অনেকের এই রকম একটা ধারণা আছে যে, ডাঃ রায় রক্ষণশীল মনোবৃত্তির লোক এবং বাঁধা সড়ক থেকে তাকে সহজে বিচ্যুত করা সম্ভব নয় আবার মনে হয়, এই ধারণাটি নিতান্তই ভ্রান্ত। বরং ডাঃ রায় যদি কতকটা রক্ষণশীল হতেন, ওঁর dynamic চরিত্রের চেয়ে যদি static চরিত্রের অংশটাই কিঞ্চিৎ প্রবলতর হত, তাহলে বাঙ্গালাদেশের ভাগ্য অনেকপ্রকারের নির্পরধ থেকে বেঁচে যেত।

সম্প্রতি বিধানসভায় ডাঃ রায় বাজেট আলোচনার নূতন একটা পদ্ধতি সৃষ্টি করতে চলেছেন, প্রধানতঃ সেই ঘটনাটি স্মরণ রেখেই আমি এই লেখা আরম্ভ করেছি। কিন্তু তার আগে ডাঃ রায়ের চরিত্রের dynamic উপকরণগুলির কয়েকটি দৃষ্টান্ত পাঠকদের মনে করিয়ে দিতে হবে। বঙ্গ বিহার সংযুক্তির প্রস্তাব নিয়ে মাত্র দেড় বছর পূর্বে তাঁর বৃহৎ আন্দোলনের কথা নিশ্চয়ই এখনও বিস্মৃত হওয়ার সময় আসেনি। তাঁর গভীর জলে মৎস্য শিকারের উৎসাহ, কলকাতার ব্যোমপথে এক চাকার রেল চালানোর (mono railway) পরিকল্পনা, কল্যাণীর উপসহর, তের তলায় সেক্রেটারিয়েট এবং ডুগর্ভস্থ রেলপথ—এইসব ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তও উল্লেখ করা যেতে পারে।

ডাঃ রায়ের নবতম brain wave এর ফলে বাজেট প্রণয়ন এবং আলোচনা সম্পর্কে কতগুলি গুরুতর প্রশ্ন উঠেছে। বিষয়টি যদি গভীরভাবে বিবেচনা করা যায়, তাহলে দেখা যাবে যে, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য মন্ত্রী কার্যতঃ ভারতের সংবিধান পরিবর্তন করতে উদ্যোগী হয়েছেন। এতকাল পর্যন্ত ফেব্রুয়ারী মাসে আইন সভায় বাজেট উত্থাপিত হয়েছে এবং ৩১শে মার্চের পূর্বে বাজেট পেশ করিয়ে নিয়ে সরকার নূতন আর্থিক বৎসরের সূত্রপাত ঘটাইছেন। ভারতবর্ষে আইন-সভার পত্তন হওয়ার পর থেকে এই রীতি চালু আছে। অবশ্য সংবিধান পাশ করার সময় একটি নূতন ব্যবস্থা সংবিধানে যোগ করা হয়েছিল। কখনো যদি গভর্ণমেণ্ট প্রয়োজন মনে করেন তাহলে চার-ছয় মাসের ব্যয় নির্বাহের জন্য ভোটে একটা বাজেট অগ্রিম পাশ করিয়ে নিতে পারেন। দুই খণ্ডে বাজেট পাশ করানোর এই ব্যবস্থা সংবিধানে রাখা হয়েছিল ইমারজেন্সির জন্য, বিশেষতঃ ৫ বৎসর পর পর প্রত্যেক নির্বাচনের সময় এই ইমারজেন্সি দেখা দিতে পারে একথা সংবিধান প্রণেতাগণ চিন্তা করেছিলেন। তৎকালীন গণ-পরিষদ বা কনষ্টীটিউয়েণ্ট এসেম্বলির কার্যবিবরণী পাঠ করলে এবিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় যে, এই দ্বিতীয় পদ্ধতিটি স্বাভাবিক সময়ের জন্য কল্পনা করা হয়নি। সাধারণ নির্বাচনের প্রস্তুতি এবং বাজেট প্রণয়ন ও তার আলোচনা এই সময়ে ফেব্রুয়ারী মাসে হতে পারেনা। দ্বিতীয়তঃ যদি বা তাড়াহুড়ো করে বাজেট পাশ করানো সম্ভব হয়, তাহলেও একটা রীতিগত প্রশ্ন থাকে। ফেব্রুয়ারী মাসে যে বিধানসভা বাজেট তৈরী করছেন, হয়ত নির্বাচনের পর দেখা যাবে, সেই সভার আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে, হয়ত গভর্ণমেণ্টই পালটে গেছে। পুরাতন গভর্ণমেণ্টের বাজেট দ্বিতীয় নূতন গভর্ণমেণ্টকে এক বছর ধরে অনুসরণ করে চলতে হবে—এই অস্বাভাবিক অবস্থার প্রতিকারের জন্যই সংবিধানে দ্বিতীয় ব্যবস্থাটি রাখা ছিল। মুখ্যমন্ত্রী যদি তৎকালীন গণপরিষদের আলোচনাগুলি পাঠ করেন, এবিষয়ে তিনি নিঃসংশয় হতে পারবেন যে, তাঁর উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য সংবিধানে এই দ্বিতীয় ব্যবস্থাটি রাখা হয়নি।

সংবিধানের অপব্যবহার

কিন্তু ডাঃ রায় এই আপৎকালীন অথবা জরুরী অবস্থার জন্য নির্দ্দিষ্ট সংবিধানের Provisionটিকে স্বাভাবিক ও নিয়মিত ব্যবস্থায় পরিণত করতে যাচ্ছেন। পশ্চিম-বঙ্গে ইতিপূর্বে দুইবার এইভাবে দ্বিধাবিভক্ত বাজেট পাশ করানো হয়েছে—১৯৫১ সালে একবার সাধারণ নির্বাচনের সময়, ১৯৫৭ সালে দ্বিতীয়বার সাধারণ নির্বাচনের সময়। এখন ১৯৫৮ সালে ডাঃ রায় বলছেন, এই ব্যবস্থাটিই ভাল, চিরকালই এইভাবে বাজেট পাশ করানো হোক্। প্রথম কথা, এইভাবে দুই কিস্তিতে বাজেট তৈরী করার রীতির পিছনে যেসব যুক্তি থাকা সম্ভব (ডাঃ রায় নিজে কতকগুলি যুক্তি দেখিয়েছেন) সেগুলি বিশ্লেষণ করার পূর্বে আর একটি গুরুতর প্রশ্ন বিবেচনা করতে হবে। একথা সুস্পষ্ট যে, সংবিধানের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য এবং ডাঃ রায়ের নূতন প্রতিপ্রায়—এই দুয়ের মধ্যে কোনো সামঞ্জস্য নেই। ডাঃ রায় সংবিধানকে অপব্যবহার করছেন, এই প্রশ্ন যদি তোলো হয় তাহলে খুব অন্যায় হবেনা।

বাজেট পাশ করাবার রীতি কি?

স্পীকারের নিকট যদি বৈধতার প্রশ্ন উত্থাপন করা যায়, তাহলে ডাঃ রায়কে বাধা দেওয়া যাবেনা। কারণ, আইনগত বিচারে ডাঃ রায়কে বাধা দেওয়ার কোনো উপায় নেই। সংবিধানে এমন কোনো সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ নেই যে, আপৎকালীন ব্যবস্থা ছাড়া এই Provisionএর অন্য কোনো রূপ ব্যবহার চলবেনা। অতএব স্পীকার এই নবতম পদ্ধতিকে নিশ্চয়ই অবৈধ বলতে পারেন না। শ্রীযুক্ত বঙ্কিম মুখার্জী বৈধতার প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন, তাঁর দ্বারা ডাঃ রায়কে বাধা দেওয়া যায়নি। এবং স্পীকার অন্য কোন রুলিং দিতে পারতেন, একথাও আমার মনে হয় না। কিন্তু আইন বেআইনের প্রশ্ন ছাড়াও propriety'র প্রশ্ন একটা আছে। প্রথমতঃ একথা চিন্তা করতে হবে যে, ভারতীয় আইন সভাগুলিতে—রাজ্যের বিধানসভাই হোক্ আর পার্লামেণ্টই হোক্ বাজেট কিভাবে পাশ করানো হবে, তার রীতি নির্দ্ধারণ করার ক্ষমতা একমাত্র সংবিধানেরই অন্তর্গত। সংবিধান সুস্পষ্টভাবে একটা সাধারণ রীতি নির্দ্দিষ্ট করে দিয়েছে এবং সেই রীতিতে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র বাজেট প্রণীত হচ্ছে এবং অর্থ প্রয়োগ আইন পাশ হচ্ছে। এই রীতির যদি কোনো পরিবর্তন সাধন করতে হয়, তাহলে সেই পরিবর্তন একমাত্র লোকসভায় প্রথম প্রবর্ত্তিত হতে পারে। প্রয়োজন বোধ করলে লোকসভা সংবিধান সংশোধিত করতে পারেন এবং ভারতবর্ষে নূতন বাজেট রীতি চালু করা যেতে পারে।

এই সম্পর্কে সংবিধানের মূল Provision যেটা সেটাতে গৌণ এবং বিকল্পে পরিণত করে দেওয়া এবং পরিবর্তে যেটা গৌণ Provision বা দ্বিতীয় বিকল্পরূপে নির্দ্দিষ্ট আছে, সেটাকেই প্রধান বেওয়াজে পরিণত করা, নিশ্চয়ই কোনো বিধান সভার এক্তিয়ার নয়। ডাঃ রায় মতই বিপ্লবের কর্ণধার হতে চান না কেন, একথা মনে রাখতে হবে যে, তিনি পার্লামেণ্টের কর্ণধার নন, তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ-মন্ত্রীও নন। কাজেই বাজেট প্রণয়ন সম্পর্কে সংবিধানের সদর দেউড়িটী ছেড়ে দিয়ে, হঠাৎ এক দিন তিনি খিড়কির দরজাটা ধরবেন—এটা নীতির দিক থেকে কে সমর্থন করবে? এর সঙ্গে সংবিধানের ষ্টীকরণ পরিবর্ত্তনের প্রশ্ন জড়িত, একথা কিছুতেই অস্বীকার করা যায়না।

এই তো গেল সংবিধানের প্রশ্ন। ডাঃ রায় দুই কিস্তির বাজেটের কতকগুলি বাস্তব সুবিধা দেখিয়েছেন। আমি বলিনা যে, সেগুলি উপেক্ষণীয়। প্রথমতঃ যদি বাজেট অধিবেশন শীতের সময় না হয়ে, বর্ষার সময়ে হয়, তাহলে সদস্যদের পক্ষে গ্রামাঞ্চলে নির্বাচক মণ্ডলীর মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার কাজে সুবিধা ঘটবে; দ্বিতীয়তঃ জানুয়ারী দুই মাস ছিলা ও মহকুমার শাসন—কর্ত্তাদের ঘরে বসেবাজেটের এষ্টিমেট তৈরী করতে হবেনা, তাঁরা এই সময়টা গ্রামাঞ্চলের কাজে ব্যাপৃত থাকতে পারবেন। তৃতীয়তঃ ডাঃ রায় বলছেন, আর্থিক বছরের চার মাস অতিবাহিত হওয়ার পর আয় ব্যয় সম্বন্ধে ধারণা আরও স্পষ্টতর হয় এবং দ্বিতীয় কিস্তির বাজেট আরও নির্ভুলভাবে তৈরী হতে পারে।

হাউস অব কমন্সে এই প্রথা প্রচলিত আছে। কিন্তু ডাঃ রায়কে স্মরণ করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন যে, হাউস অব কমন্সে এই কথাও আরও একটি প্রথা প্রচলিত আছে, যা এই ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলা যায়। সেখানে প্রথম অগ্রিম বাজেট পাশ হওয়ার পর, দ্বিতীয় কিস্তিতে পূর্ণ বাজেট আসবার আগে মধ্যবর্ত্তী কয়েক মাস পার্লামেণ্টের এষ্টিমেটস কমিটি পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে ব্যয় বরাদ্দের হিসাব পরীক্ষা করতে থাকেন। শেষ পর্য্যন্ত হয় কিস্তিতে যে বাজেট তৈরী হয়ে আসে, প্রকৃতপক্ষে সেই বাজেট সরকার এবং বিরোধীপক্ষের প্রভূত সহযোগিতার ভিতর দিয়ে প্রস্তুত হয়। এবং সভায় অন্তঃপর কোনো প্রলয়িত, দীর্ঘ আলোচনার প্রয়োজনই থাকেনা। বিধান চন্দ্র রায় এষ্টিমেটস কমিটি যদি তৈরী করেন এবং হাউস অব কমন্সের পদ্ধতিটি যদি সম্পূর্ণ-ভাবে গৃহীত হয়, তাহলে গণ-

(শেষাংশ ২৮ পৃষ্ঠায়)

শ্রমিকদের অবস্থা আর সরকারী ব্যবস্থা

সোমনাথ লাহিড়ী

সারা ভারতের মধ্যে পশ্চিম বাংলাই সব চেয়ে বড় শিল্পকেন্দ্র। এক দিনে নয়, বহু দিন ধ'রে এই শিল্পকেন্দ্র গড়ে উঠেছে। সুতরাং এখানকার শ্রমিক ও কর্ম্মচারীদের অবস্থা অন্য অন্য প্রদেশের তুলনায় ভাল হওয়া উচিত। অন্ততপক্ষে অন্য কোন প্রদেশের চেয়ে খারাপ হবে না এ আশা অন্যায় নয়। সে আশা কি পূর্ণ হয়েছে?

বিভিন্ন প্রদেশে শ্রমিকদের উপার্জ্জনের কথাই প্রথমে ধরা যাক। যে সব কারখানা শ্রমিক দুপো টাকার কম মাহিনা পান তাঁদের বাৎসরিক গড় উপার্জ্জন (১৯৫৬) সম্বন্ধে ইণ্ডিয়ান লেবর গেজেটের হিসেবে, ১৯৫৭ সংখ্যায় হিসাব বার হয়েছে। কয়েকটি প্রদেশের হিসাব এই রকম:

	১৯৫৬ শ্রমিকদের প্রদেশ বাৎসরিক গড় উপার্জ্জন
বোম্বাই	১৪১৫ টাকা
বিহার	১২৩৫
পঃ বাংলা	১১৪২

ধনবণ্টনে অসাম্য দূর করা সরকারের বিঘোষিত নীতি। উৎপাদন বাড়লে শ্রমিক তার ন্যায্য অংশ পাবে, এও সরকারের প্রতিশ্রুতি। যে দেশে শ্রমিকদের উপার্জ্জন সাধারণভাবে অনশন সীমার কাছাকাছি সে দেশে উৎপাদনবৃদ্ধির অংশ শ্রমিকই বরং বেশী পাবে, মালিক কিছু কম পেলেও অন্যায় হবে না এ যুক্তি স্বতঃসিদ্ধ।

শ্রমিক ও মালিকের অংশ

কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে ফল হয়েছে বিপরীত। ১৯৫৪ সালের সেন্সাস অফ ম্যানুফ্যাকচার্স থেকে দেখা যায় যে ১৯৪৯—১৯৫৩ এই পাঁচ বছরে ম্যানুফ্যাকচারিং বা উৎপাদন-প্রক্রিয়ার দ্বারা বিভিন্ন দ্রব্যে যে মূল্য যুক্ত হয়েছে (যাকে অর্থনীতি বলা হয় value added by manufacture) সেই বর্দ্ধিত মূল্যের মধ্যে মালিকদের অংশ বেড়ে গেছে শতকরা ১০.২ ভাগ, আর শ্রমিকের অংশ কমে গেছে শত শতকরা ৫.৬ ভাগ।

এখানেও আবার সারা ভারতের তুলনায় পশ্চিম বাংলার শ্রমিকের প্রতি অবিচার হয়েছে অনেক বেশী। সারা ভারতে শ্রমিকের অংশ কমেছে শতকরা ৫.৬ ভাগ, কিন্তু পশ্চিম বাংলায় কমেছে ১১.৮ ভাগ। অন্যপক্ষে, পশ্চিম-বাংলায় মালিকরা সারা ভারতের তুলনায় আপেক্ষিক ভাবে অনেক বেশী লাভবান হয়েছেন। সারা ভারতে মালিকদের অংশ বেড়েছে শতকরা ১০.২ ভাগ, কিন্তু পশ্চিম বাংলায় বেড়েছে শতকরা ৭৪ ভাগ।

সেন্সাস অফ ম্যানুফাকচার্সে পরবর্ত্তী কালের হিসাব এখনও বার হয়নি। তবে যখন বার হবে তখন এই অবিচারে কোন ব্যক্তিক্রম হবেনা সে কথা নিঃসন্দেহ।

কর্ম্মসংস্থান

আধুনিক কালে ভারতের বড় বড় রাজ্যগুলিতে সর্ব্বত্রই কারখানায় নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা বাড়ছে। কিন্তু পশ্চিম বাংলার এর ব্যতিক্রম। ১৯৪৭ সালে পশ্চিম বাংলায় কারখানা-শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৬লক্ষ ৬৭ হাজার। ১৯৫৬ সালে সে সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৬ লক্ষ ৫০ হাজার। কর্ম্ম সংস্থান বাড়া দূরে থাক, ১৯৪৭ সালের সংখ্যাটিও আমরা এখনও পেঁছাতে পারিনি।

কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রশক্তি থেকে ২ কোটি টাকা সাহায্য দিয়ে পশ্চিম বাংলার চটকলে 'আধুনিকীকরণ' বা ন্যাশনালাইজেশনের ব্যবস্থাকে সাহায্য করা হয়েছে। তাতে চটকলের ওপর সরকারী নিয়ন্ত্রণের কোনো সুবিধা হয়নি, বিক্রী বাড়ানোর জন্যে, বিদেশের বা বাজারে চটের দাম সস্তা করা সম্বন্ধেও সরকার কোনো অধিকার পাননি। এবন কি, বর্দ্ধিত মুনাফার অংশ বরিষ্কার ও

(শেষাংশ ২৪ পৃষ্ঠায়)

ভিতরের পৃষ্ঠায়

- হিং টিং ছট (পৃষ্ঠা ৩)
- সেনস্ এণ্ডেসিরাদের স্বজন পোষণ (,, ৪)
- পঞ্চায়েৎ মন্ত্রী বৈঠক (,, ৪)
- বিজ্ঞান আলোচনা (,, ৫)
- বয়স্কদের "পুতুল খেলা" (,, ৫)
- বিপর্যয়ের মুখে পলতা পাম্পিং ষ্টেশন (পৃষ্ঠা ৬)
- ভেড়ী বন্দী (,, ৬)
- মানুষ ও মনীষা (,, ৭)
- কেন্দ্রীয় আলোচ্য (,, ৮)
- চন্দ্র বিদ্যুৎ বিচিত্রা (,, ৯)

সম্পাদক—শ্রীব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য

সম্পাদক—বঙ্গশ্রী ক্যালকাটা প্রেস (প্রাইভেট) লিমিটেড, ১নং ওয়েলিংটন স্কোয়ার কলিকাতা—১৩ হইতে মুদ্রিত এবং ৭নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা—১৩, দর্পণ কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

সিদ্ধার্থ রায়ের পদত্যাগের অন্তরালে ত্রিশক্তি-প্রভাব

দর্পণ

সাপ্তাহিক সংবাদ সাময়িকী

১ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা :: কলিকাতা— ১৪ই মার্চ, শুক্রবার ১৯৬৮ :: মূল্য ২৫ নঃ পঃ

দীর্ঘকাল ধরিয়া মন্ত্রিসভার নেপথ্য মণ্ডলীর প্রচেষ্টা

অতুল্য-প্রফুল্ল-কালীপদ প্রভাবিত মন্ত্রিসভা ত্যাগে শ্রীরায়ের স্বস্তি

(দর্পণের রাজনৈতিক সংবাদদাতা)

পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিসভায় যে অন্তর্বিরোধ গত অক্টোবর মাসে আরম্ভ হয়েছিল ১৪ই মার্চ রবিবার একটি চাঞ্চল্যকর নাটকের ন্যায় তার ক্লাইমেক্সের মুখ শেষ হয়েছে। শ্রী সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় রবিবার রাত্রি ১০ টার সময় তাঁর পদত্যাগ পত্র রাজ্যপালের হাতে তুলে দেবার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে একটা নূতন ঘটনার স্রোত প্রবাহিত হতে আরম্ভ করেছে।

এখনও পদত্যাগ পত্রটি গৃহীত হয়নি। কেননা এই ঘটনার স্রোত পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে যে আলোড়ন সৃষ্টি করবে মুখ্যমন্ত্রী এবং পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস আপ্রাণ চেষ্টায় সেটাকে বিলম্বিত করতে চাইছেন।

পদত্যাগের পর মন্ত্রীরূপে শ্রীযুক্ত রায় বিধান সভার যে-বিবৃতি দেওয়ার অধিকারী, সেই বিবৃতিটি বিধান সভার বর্তমান অধিবেশনে যাতে প্রদত্ত না হতে পারে, সমস্ত কংগ্রেস রাজনীতি এখন সেই চেষ্টা করছে। বিধান সভার বর্তমান বাজেট অধিবেশন শেষ হওয়ার পর যদি মুখ্যমন্ত্রী পদত্যাগপত্রটি গ্রহণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন, তাহলে সিদ্ধার্থ রায় বর্তমান অধিবেশনে বিবৃতি দেওয়ার সুযোগ আর পাবেন না। এবং আগামী অধিবেশন নাগাদ এই বিবৃতির মূল্য ও গুরুত্ব প্রায় তিরোহিত হয়ে যাবে।

মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা বিলম্বিত করা আরও প্রয়োজন হয়ে পড়েছে এই জন্য যে, সিদ্ধার্থ রায়ের বিবৃতিটি সভায় পেশ করার পরেই বিরোধী-পক্ষ ডাঃ রায়ের মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে একটি অনাস্থাপ্রস্তাব উত্থাপনের জন্য প্রস্তুত হয়েছেন। কংগ্রেস পার্লামেন্টারী পার্টির উপর শ্রীযুক্ত রায়ের পদত্যাগ যে সাংঘাতিক নৈতিক আঘাত দিয়েছে, যদি অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপিত হয় তাহলে সেই আঘাত হয়ত কংগ্রেস পার্লামেন্টারী পার্টিতে ছোটখাট ভাঙ্গনের সৃষ্টি করতে পারে। এবং রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকেরা জানেন যে, মন্ত্রিসভার পতনের জন্য কংগ্রেস পার্টিতে খুব বড় ভাঙ্গনের প্রয়োজন নেই—প্রায় ২০জন সদস্য যদি কংগ্রেস পার্লামেন্টারী পার্টির কক্ষচ্যুত হন, তাহলেই মন্ত্রিসভার পতন অনিবার্য হয়ে পড়বে।

অক্টোবর মাস থেকে মন্ত্রিসভার ভিতরে অন্তর্বিরোধ কিভাবে আরম্ভ হয়েছিল এবং সিদ্ধার্থ রায়ের সঙ্গে মন্ত্রিসভার নেপথ্য-মণ্ডলীর (অর্থাৎ শ্রীপ্রফুল্ল সেন, শ্রীকালীপদ মুখার্জী প্রভৃতির) ক্রমাগত সংঘর্ষের সংবাদ দর্পণের ১৪ই ফেব্রুয়ারীর সংখ্যায় পূর্বেই প্রকাশ করা হয়েছিল। বাঁকুড়ায় শ্রীশঙ্কর প্রসাদ মিত্রকে মনোনয়ন দেওয়ার চেষ্টায় এবং শিক্ষক ধর্মঘটের ব্যাপারে এই অন্তর্বিরোধ কিভাবে অগ্রসর হচ্ছে, আমরা তার আভাষ দিয়েছিলাম।

পদত্যাগের অব্যবহিত একটি কারণ অবশ্য কর্মচারীদের বেতন ও চাকরীর নিয়মাবলী সম্পর্কে ডাঃ রায়ের সঙ্গে তাঁর মতভেদ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, সিদ্ধার্থ রায় যখন দুর্নীতি বিরুদ্ধে লড়াই করাকেই তাঁর মন্ত্রিত্বের প্রধান লক্ষ্যরূপে স্থির করেন, তার পর থেকেই এই পদত্যাগের পথ প্রস্তুত হতে থাকে। অক্টোবর মাসে তাঁর রচিত দুর্নীতি দমন বিলটি শ্রীযুক্ত সেন ও শ্রীকালীপদ মুখার্জীর বিরোধিতার ফলে বাধাপ্রাপ্ত হয় (এই বিলের বিবরণ এবং ঐ সংক্রান্ত সমস্ত অন্তরালবর্তী রাজনীতি দর্পণের ১৪ইফেব্রুয়ারীর সংখ্যায় দেখুন)। তখনই শ্রীযুক্ত রায় পদত্যাগের জন্য প্রস্তুত হন। একমাত্র মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়ের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক সৌহার্দ্যের ফলে গত কয়মাস ঘটনাটি বিলম্বিত হয়ে ছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে অতুল্য ঘোষ, প্রফুল্ল সেন, কালীপদ মুখার্জীর ত্রিশক্তি সিদ্ধার্থ রায়কে কোণঠাসা করে আনবার চেষ্টা ক্রমাগত চালিয়ে গেছেন। এক-দিকে মুখ্যমন্ত্রীর স্নেহমুক্তি থেকে তাঁকে সরিয়ে ফেলবার চেষ্টা এবং অন্যদিকে কংগ্রেস সহলে তাঁর বিরুদ্ধে উষ্মার সঞ্চার করা—এই দুইটিক থেকে সিদ্ধার্থ রায়কে "অসম্পৃক্ত" করা হচ্ছিল।

(সেষাংশ দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়)

চূড়ান্ত নাজেহাল!

কে জানত ব্যাপারটা এতদূর গড়াবে অনেক দিন ধরে কারসাজি করে গুছিয়ে আনা মতলবটার বিরুদ্ধে নিজেকেই "No" লিখতে হবে এবং পরিশেষে অবশ্যম্ভাবী কর্মচারী মহলে একটা ঠাট্টা-তামাসার মসলা হয়ে দাঁড়াবে।

* * *

বিভাগীয় সর্বোচ্চ কর্মচারী, কমিশনার এবং exofficio সেক্রেটারী। কলকাতার বহাল, রাইটার্স বিল্ডিংএ অফিস। নগরীর কাছাকাছি এক গ্রামে পৈতৃক বাড়ী। মেরামত করে, হালফ্যাসানের আসবাবপত্র দিয়ে বাড়ীটি সাজানো হয়েছে। সপ্তাহে তিনদিন ওখানে গিয়ে থাকেন, বিশ্রামের জন্য।

* * *

কলকাতা ছেড়ে গেলেই কি স্বোয়ান্তি আছে। বিভাগের বড়কর্তা, দায়িত্ব অনেক; কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ রাখা দরকার। বাড়ীতে একটা টেলিফোন এলেই সমস্যা মিটে যায় প্রস্তাব নিয়ে নূতন কাইল তৈরী হল। কমিশনারের নিজের ব্যাপার। বিভাগের দশটা অংশ ঘুরে আসতে অন্যান্য "বিশেষ জরুরী" মার্কা ফাইলের মেথানে দশবার কেটে যায়। সেখানে এ ফাইল দিন সাতেকের মধ্যে কমিশনারের কাছে চলে এল। আদেশ এল, টেলিফোন বসাবার ব্যবস্থা করা হোক।

* * *

কিন্তু টেলিফোন ত আর বিভাগের কর্মচারী বা কৃতজ্ঞভাজন লোক দিয়ে হয় না। এ কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে টাকার লেন-দেনের ব্যাপার। ফাইলটা অর্থদপ্তরে পাঠানো দরকার। পাঠানো হল এবং পাঠিয়েই নুস্তির বাধলো। অডিট অবজেকশনের কথা ভাবতে গিয়ে, অর্থদপ্তর থেকে প্রশ্ন তোলা হল, টেলিফোন বসাবার প্রস্তাবটি বিবেচনা করার ব্যাপারে সর্বাগ্রে জানা দরকার, ডিউটিতে থাকাকালীন, কলকাতা ছেড়ে বাড়ীতে গিয়ে থাকবার অনুমতি সেক্রেটারীর কাছ থেকে নেওয়া হয়েছে, কিনা।

* * *

ফাইলে কমিশনারের সই আছে। কমিশনার এবং বিভাগের সেক্রেটারী, দুইই যে একই ব্যক্তি, এ অর্থদপ্তরের কাছে বর্তব্য নয়। প্রশ্নটি অ্যাডমিনিষ্ট্রেশন সংক্রান্ত, অতএব চীফ সেক্রেটারীর নিকট রেফার করা হল। তিনি বিভাগের "সেক্রেটারী"র নিকট ডিক্টেশ করে ফাইল পাঠালেন, "Has the Secretary given the Commissioner permission to go out and stay at his village while on duty?"

* * *

সেক্রেটারী লিখলেন, "No. The Commissioner has not the permission. নিজের হাতে নিজের অপ-কীর্তির নজিরে শিলমোহরের ছাপ দিতে হলো উপায় ছিল না। ব্যাপারটি চীফ সেক্রেটারী পর্যন্ত গিয়ে গেছে,কে কে জানত ?

ভিতরের পৃষ্ঠায়

- খবর পাঁচ এবং খবর বাইরের কে (পৃষ্ঠা ৪)
- ইমারত পুনরাসনের নামে প্রহসন (পৃষ্ঠা ৭)
- কাকাবাবু কিমাশ্চর্যম্ (.. ৭)
- সংস্কৃতি : সংস্কৃতি ও বৈশিষ্ট্য (.. ৭)
- আন্তর্জাতিক সংবাদ পর্যালোচনা (.. ৬)
- কংগ্রেসীদেরও পুনর্বাসন সমস্যা (.. ৮)

খিদিরপুরের পাশে ময়দানে —এদের চেনেন কি ?

নিশ্চিন্তে চুকে পড়ুন। অনেক বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। গাহেন, মেম, চীনা, নেপালী, তিব্বতী, যবনী, কাবুলিওয়ালা, আর আপনার স্বদেশোয়ালী ভ্রাতা ও ভগ্নীগণও—হেন জাত নেই যাদের এখানে না পাবেন।

●

আসুন, আপনার সঙ্গে দু' চারজনের পরিচয় করিয়ে দিই। ঐ যে খদ্দরপরা ভদ্রলোক—উনি একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ আর কোন্‌সিলার। ঐযে খাটো খাটো মানুষটি, যার ছবি খবরের কাগজে বেরোয়—উনি হলেন বাংলাদেশের একজন নামকরা কবি। প্যাণ্ট আর টাইয়ে ভোল বদ্‌লানো ঐ যে ভদ্রলোক, উনি হ'লেন একজন বড় সরকারী চাকুরিয়া। ঐ দিকে তাকিয়ে দেখুন—গাঙচেলার বসে যারা আড্ডা দিচ্ছে তাঁরা হলেন বঙ্গ সংস্কৃতির ধ্বজ, সরকারের দল। তাঁদের আশেপাশে দেখতে পাবেন নানান জাতের দলিলবিধায়ক ও দলিলনবীসের।

তবে একটা কথা চুপিচুপি বলে রাখি। পুলিশের পোষাক পরা যে খ্যাতনামা ভদ্রলোকটি এদিক ওদিক উঁকুন দিয়ে বেড়াচ্ছে—তার চারদিকে যাদের দেখবেন, তাদের এড়িয়ে চল্‌বেন। অবশ্যি সংলোক যদি আপনি হন তবে দুনিয়াতে কিসের ভয় ? কিন্তু যদি কোথাও গলদ থাকে-তবে সাবধান।

●

ব্যাভারে মাদু কিনিবার সময় যেমন টিপেটিপে দেখে থাকেন, তাড়া না নলন, তেমনি ঘোড়ার নাবিকেরাও তাদের জন্তুদের মাঠে নামাবার আগে দশজনের সামনে হাজির করাবে। ইংরেজীতে যাকে বলে প্যাডক অর্থাৎ মাঠের মধ্যে ছোট আর একটা মাঠ—সেখানে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখানো হয়—উস্কো, আনায় কেনো, আমায় কেনো। ধোড়া বা ঘোড়ীরা যেন বলছে—ভাই সব, আমিই হলাম সরকারের চেয়ে তেড়িওয়ালা। অতএব তোমাদের, যত শেখ, সব আমার ঘাস খাবারে সাধ্যি কর।

(সেষাংশ দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়)

সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়ের পদত্যাগ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

...যাই হ'ক যে এই ঘটনা ...ভাবে ঘটবে, একথা ...গ্রেসের উদ্ভব হবে ...সিদ্ধার্থ রায়ের ঘনিষ্ঠতর ...এবং রাজনৈতিক ...সকলের কাছেই ...। সৌরবাবু বোধ করি ...বাইটার্স বিল্ডিংয়ের ...এই সংবাদ জানতে ...হাজরার পত্র বেলওলা ...বাড়িতে ক্রমাগত ...মধ্যে তাঁরা আসতে করে। ...চার মধ্যে ডাঃ রায় ...সিদ্ধার্থ রায়কে ...চেষ্টা করেন। ...কংগ্রেসের অধিবেশনে ...সিদ্ধার্থ রায় ...বাড়ির বাইরের ...হিলনা-কোনো ...সৌরবাবাবাবন ...উদ্বেগ ও ...একটি দিন ...ছায় বিদ্যুত ...গিরিবিলি ...দির পরে ...খো মিত্রে- ...বিরায় প্রায় ...দেশবন্ধু ...পাঠ ...সুরব ...মুখ- ...একটি ...এবং ...ডাঃ ...কে ...ক্রো ...চীফ ...কেও ...ওয়া ...হয়। ...সরব ...তুমি ...আমি ...বাস ...ডাঃ ...কে ...অতুল্য ...করেন। ...তাঁদের ...হয়। ...সেদিন ...সিদ্ধেশ্বর ...দেখে মনে ...একটা ছোটখাট ...হয়েছে,অথবা কোনো ...সরকে এইবার ...কোনো আশ্বাস দিয়ে ...কংগ্রেস অফিসের ...তখন পূর্ব-অভিজ্ঞতা ...প্রকাশ করছিলেন—(১) সিদ্ধার্থ গেল বে, সকলেই ...জানতেন, (১) সিদ্ধার্থ ...কমিটিনিষ্ট; (২) সিদ্ধার্থ ...কংগ্রেসের সর্বনাশ করার ...বিভীষণের ন্যায় মন্ত্রি- ...ঢুকেছিল; (৩) সকলেই ...ডাঃ রায়কে নাকি ঘোবাবার ...চেষ্টা করেছিলেন সিদ্ধার্থকে ...মন্ত্রিসভায় নেওয়া বিপজ্জনক। এই সব আলোচনার পর সকলেই মাথা নেড়ে এবিষয়েও একমত হলেন যে, (৪) সিদ্ধার্থ বোকার মতো তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিয়ে কংগ্রেসকে বীচিয়েছে। অতুল্য বাবু গম্ভীর, ডারিকী লোক—তিনি বেশী কথা বললেন না। শুধু একটি মন্তব্য তাঁর কাছ থেকে পাওয়া গেল "মন্ত্রিসভা ছেড়ে দিয়ে যদি কংগ্রেসে সাধারণ এম এল এ হিসেবে থেকে যেত, আরও বিপদ ঘটাতে পারত।"

বহুলবার সিদ্ধার্থরায় যখন বিধান সভা ভবনে ডাঃ রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, সর্বশেষে ডাঃ রায় তাঁকে অনুনয়ের সুরে বলেছিলেন "সিদ্ধার্থ, তোমার দাদারপাই আর আমি একসঙ্গে কংগ্রেস করেছি। শুধু আমার সম্মানের জন্য তুমি একটা কথা রাখ, জুলাই মাসের আগে পদ-ত্যাগ করোনা।"

সিদ্ধার্থ রায় এর জবাবে বলেছিলেন, "আমার দাদারপাই এবং আপনি যে কংগ্রেসে ছিলেন, তা এখন আর নেই। এখনকার কংগ্রেস হচ্ছে অতুল্য ঘোষ, প্রফুল্ল সেন, কালীপদ মুখার্জীর কংগ্রেস। আমি তো বলে করি, এতে আপনারও থাকা উচিত নয়। আপনি পদত্যাগ ক'রে সেন্টারে চলে যান।"

ডাঃ রায় দেশবন্ধু-পত্নী বাসন্তী দেবীকেও বহুলবারই কোন করেছিলেন। তিনি ডাঃ রায়কে বলেন যে, তাঁর দৌহিত্র কংগ্রেসের মন্ত্রিত্ব যত তাড়াতাড়ি ত্যাগ করবে ততই তার মঙ্গল হবে, এবং তিনি দৌহিত্রকে বহু পূর্বেই বলেছেন।

সিদ্ধার্থ রায় চলে যাওয়ার অনেকক্ষণ ডাঃ রায়কে বিষণ্ণ দেখায়। অন্তরঙ্গ বহুলের সঙ্গে আলোচনায় একথা সুস্পষ্ট হয়েছিল যে, ডাঃ রায় নিজের অবস্থা আরও অসহায় মনে করছেন। সিদ্ধার্থ ডাঃ রায়কে বলেছিলেন, মন্ত্রিত্ব ত্যাগের কারণ মুখ্যমন্ত্রীর বিরোধিতা নয়। তিনি প্রফুল্ল সেন ও কালীপদ মুখার্জীর সঙ্গে এক মন্ত্রিসভায় কাজ করাকে কলঙ্কজনক মনে করেন।

কেন মনে করেন? তার কতকগুলি নির্দিষ্ট ঘটনা এবং কতকগুলি গুরুতর অভিযোগ ডাঃ রায়কে তিনি শেষ সাক্ষাতের সময় বলে এসেছিলেন। ডাঃ রায়কে বহুলবার বার বার একথা বলতে শোনা গেছে যে "সিদ্ধার্থ এসব কি কথা আমাকে শুনিয়ে গেল? তোমরাও এসব জানতে নাকি?" পদস্থ কর্মচারীদের সামনেও কয়েকবার স্বগতোক্তির মতো ডাঃ রায় একথা বলেছেন। বিধান সভায় বিকালে তাঁর বহু অপসারণ বিলের বক্তৃতায় সামান্য ভেজও ছিল না, বক্তৃতা আরও অসংলগ্ন বলে হচ্ছিল এবং কণ্ঠস্বর ক্লান্ত।

বহুলবার এবং বুধবার ডাঃ রায় এবং শ্রীঅতুল্য ঘোষকে কয়েকটি বৈঠকে একত্র হতে হয়েছে। প্রথম সভায় সিদ্ধার্থ রায়ের বিবৃতি ঠেকিয়ে রাখা। দ্বিতীয় সভায় মন্ত্রিসভায় বিচারমন্ত্রীর স্থান পূরণ করা। শেষ পর্যন্ত বহুলবার ডাঃ রায় হাওড়ায় শ্রীশৈলকুমার মুখার্জীকে ফোন করেন। তাঁকে বাঁকুড়ার আসন থেকে নির্বাচিত ক'রে আনার প্রস্তাব করলে, শৈলবাবু পূর্ণ সম্মতি দেননি। কিন্তু এর উপর আবার তৃতীয় সভায় আছে শ্রীকার শঙ্কর দাস বন্দ্যোপাধ্যায় অবিলম্বেই পদত্যাগ ক'রে আডভোকেট জেনারেলের পদে চলে যেতে চান। তাঁকে একমাস ঠেকিয়ে রাখা গেলেও, বেশীদিন ঠেকানো যাবেনা। এবং শঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের অসন্তোষ আর একজন প্রাদীর কথা ভাবতে হবে।

কিন্তু এ হলো বাক্তির কথা। স্বতাবতই ব্যক্তির সীমা অত্যন্ত সংকীর্ণ, ক্ষুদ্র। তার কর্ম-পরিধিও তাই। এই সীমার মধ্যে যদি তাকে আবদ্ধ রাখি তাহ'লে তাকে যেমন ক্ষুদ্র করা হয়, তার উপলব্ধিও অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। ব্যক্তির বৃহত্তর পরিধি সমাজ, তারও বৃহত্তর পরিধি দেশ, দেশকে ছাড়িয়ে বিশ্ব, সমগ্র চিত্রই সংস্কৃতি বিচারে অভাবিভাবে জড়িত। তারও কিন্তিৎ পরিচয় আবশ্যক ব্যক্তির পরিচয়ে।

সংস্কৃতির স্বরূপ

সংস্কৃতির এই ব্যক্তিগত পরিধি অতিক্রম করে যদি দেশের বৃহত্তর সীমায় উপনীত হই, তাহ'লে আমাদের একই প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। আমাদের দেশের সংস্কৃতির স্বরূপ কি, এই প্রশ্নের উত্তরে বলতে হয়, ইতি-হাসের এই বিশেষ লগ্নে, দেশের ব্যবহারিক জীবন-বিন্যাস ও তার ভাবজীবন-উভয়ের যে সম্বিলিত সমগ্র অভিব্যক্তি, তা-ই ঐ বিশেষ কালের সংস্কৃতি। প্রবাহিত জীবনধারায় যে অখণ্ড রূপ, তাই ঐ কালে ঐ দেশের সংস্কৃতি; ইংরেজীতে বললে কথাটা দাঁড়ায় এইরূপ,—Some total of human achievements in a particular historical period. এ ক্ষেত্রেও ব্যবহারিক জীবন থেকে ভাবজীবনকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা এবং সেটাকে সংস্কৃতি বলে পরিচিত করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হ'তে বাধ্য।

প্রসঙ্গত স্মরণ রাখা কর্তব্য, কোন দেশের সংস্কৃতিই গতি-বিরুদ্ধ স্থিতিশীল অক্ষয় অব্যয় পদার্থ নয়। মানুষের জীবন-স্রোতের মতই সংস্কৃতিস্রোত অব্যাহত গতিতে প্রবাহিত হয়ে চলেছে, কালের কোন এক বিন্দুতে তা থেমে নেই। সেজন্যই, এক যুগের ধ্যানধারণাশ্রিত জীবনের রূপ এক কথায় সংস্কৃতির সঙ্গে অন্য যুগের সংস্কৃতির হুবহু মিল বা ঐক্য দেখা যায় না। এবং শাশ্বত অপরিবর্তনীয় মূল্য-বোধ বলে কিছুর অস্তিত্বও নেই। যুগে যুগে মানুষের নব নব রূপায়ণ, তার সংস্কৃতিরও নব রূপ, নবতর অভিব্যক্তি। নতুন নতুন পথে জীবনের পরিক্রমা, নতুনভাবে এগিয়ে চলা।

●

আমাদের বর্তমান কালের জীবন তথা সংস্কৃতি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা এখানে করব না, শুধু একথা বললেই যথেষ্ট হবে যে, বিরাট এক পরিবর্তনের মুখোমুখী আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি। এই রূপান্তর আমাদের প্রচলিত সামাজিক আদর্শ, ধ্যানধারণা, সমাজসংগঠনইত্যাদি সমস্ত কিছুকে রূপায়িত করে দিয়ে সম্পূর্ণ অভিনব ভাবনা কামনা আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করবে, বিকশিত হওয়ার যে সম্ভাবনার অঙ্কুর উদ্গত হয়েছে, তা-ই পত্রপল্লবে শোভিত হয়ে পরিপূর্ণ হবে—এই আমাদের প্রত্যাশা। স্বতরাং এই সন্ধিক্ষণে, এ জিজ্ঞাসার উত্তর আমাদের দিতেই হবে যে, আমাদের লক্ষ্য কি, কোন্ অধ্যায় দিয়ে আমরা এই অনভিপ্রেত বাস্তব জীবনকে বদলাতে চাই। প্রসঙ্গত আমাদের দেশেরই গীতিকার রাধুপ্রসাদ সেনের একটি গানের কলি মনে পড়ছে—

মন তুমি কৃষিকাজ জান না।
এমন মানব-জমিন রইল পতিত আবাদ করলে ফলতো সোনা।

সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে এবং ভিন্ন ভাবের দ্যোতকরূপে ব্যবহৃত হলেও এই লাইন দু'টোতে আমাদের জীবনের সাধনার একটি অমূল্য সত্য প্রকাশিত হয়েছে। আমাদের ব্যক্তিগত জীবন শৈলন-কর্ষণ দ্বারা আমাদের ঊষর হতে হবে, তেমনি. শৈলন কর্ষণের সহায়তায় দেশের সমস্ত মানুষের জীবনে আবাদ করতে হ'বে সোনার ফসল ফলাতে হবে। আমাদের সমস্ত কর্মের লক্ষ্য হওয়া উচিত তাই।

খিদিরপুরের কাছে ঘোড় দৌড়ের ময়দান

(১ম পৃষ্ঠার পরের)

আমার এক দিল্লী প্রবাসী অবাঙালী বন্ধু এখানকার এই প্যাডকে এক ঘোড়াকে দেখে বলেছিলো দেখেছেন, ব্যাটা বেন হাসছে! ও নিশ্চয়ই বাঙ্গী মারবে।

আমার বন্ধুটি জহরী, ঘোড়ার হাসি-কান্নাও নাকি বুঝতে পারতো। কিন্তু রেস্ত সে সেই হাস্যমান অশ্ববাবকের পিছনে ঢেলেছিলো, কিন্তু দৌড়ের শেষে দেখা গেলো, অশ্বপুগবক নিজে হাসলেও অপরকে বেশ কাঁদাতে পারে।

●

একটা গল্প মনে পড়ে গেলো—সৈয়দ মুজতবাআলী সাহেবের। চাকরী কুস্তীদের এক ঘোড় দৌড়ের কাহিনী তিনি লিখেছেন।

এক মিয়াসাহেব শুধোচ্ছে; চাচা, কোন্ ঘোড়াতে ধরুছ। চাচা জবাব দিল পাঁচনম্বর।

মিয়াসাহেব— সেকি চাচা। ঐ ব্যাটা তো হকলের হাঁয়ে আইছে।

চাচা—; আইবোনা? ওডাতো ঘোড়া না, বাগের বাচ্ছা। দ্যাখলানা, হকল ব্যাটাদের তাড়াইয়া লইয়া আইলো।

সুতরাং ঘোড়ার হাসি দেখে আপনি ভুলবেন না আর অশ্ব-পুংগবের মধ্যে ব্যাঘ্রশাবকের প্রতিচ্ছবি দেখেই চেঁচা করবেন না।

ঐ যে ছেলেটিকে দেখছেন ও হ'লো বাপকো ব্যাটা, অর্থাৎ সিপাটীকা ঘোড়া। বাপ ছেলেকে তালিম দিয়ে শিখিয়েছে-অশ্ব-বংশের ইতিহাস, তাদের পিতৃ মাতৃ পরিচয়। একদিন কথা-প্রসঙ্গে ভিতেল করেছিলুম কিন্তু ছেলেটি তার ঠাকুর্দার নাম সঠিক বলতে পারলোনা।

উপযুক্ত ছেলেকে ঘোড়ার লাইনে নোকাবার পিছনে বাপের যুক্তি আছে। একদিন ভদ্রলোক বলেছিলেন: মোরে, বশাই, ছেলেটা ভালো লেখা-পড়া শিখে নাই আর চাকরী বাকরীর যা বাজার, তাতে মাসে হয়ত চল্লিশ পঞ্চাশ টাকার বেশী রোজগার করতে পারবেনা; কিন্তু এই যে বিদ্যে শেখাচ্ছি, এতে ভগবানের আশীর্বাদে (না ঘোড়ার দয়ায়), হয়ত এক হপ্তাতেই চার পাঁচ শ' টাকা বাড়ী আনতে পারবে।

ভদ্রলোকের কথা শুনে সেদিন অবাক হইনি। কারণ, তিনি হলেন বনেদী ঘরের ভদ্রলোক। কিন্তু কেবল যেন ঝাপছাড়া মনে হ'তো—যার বাড়ীতে হপ্তাভর হাসি হল্লোড়ের কোয়ারা বয়ে যায়, সে বাড়ীতে শনিবারের সন্ধ্যায় মনে হ'তো যেন হুতোম প্যাচারা বাসা বেঁধেছে।

●

চলুন-ঐদিকের গাছতলাটা দেখে আসি। ঐ যে বিদ্যেসাগরী চটি পায়, আর আদুর গায় মাত্র একখানি উত্তরীয় সম্বল করে বিরাট এক খাতা আর পেন্সিল হাতে পণ্ডিত-সন্তানকে দেখছেন-উনি অশ্ববাবনীর বংশ পরিচয় লিখে থাকেন। খাতার দিকে তাকিয়ে দেখুন-আমার, আপনার যেমন ঠিকুজী ছোটবেলার পণ্ডিত মশাই করে দিয়েছেন ঠিক তেমনি ছোটক ছোটকীদের কোষ্ঠি আর ছক্ নিয়ে ঐ ঘোড়া-পণ্ডিত মশাই গবেষণা করছেন। কোন লগ্নে ঐ ঘোটকের জন্ম-তখন কোন কোন গ্রহের শুভ আর অশুভ দৃষ্টি পড়েছিলো—আজকের শনিবারের এই সময়টায় কোন কোন গ্রহ ওর পক্ষে শুভ-অশুভ, প্রতিপক্ষকে ঐ ঘোটকশাবক ময়দানে যুদ্ধে হারাতে পারবে কিনা—এই সব গবেষণা করে চলেছেন ঐ পণ্ডিত মশায়।

না সরস্বতীর অংশে কলুণা—একদা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে অশ্ব-তত্ত্বের উপর গবেষণার জন্য কোন ডিগ্রী বা ডিপ্লোমা নেই—নইলে ইতিমধ্যে দু'দশখানা কেতাব বা থিসিস এ বিষয়ে দাখিল হয়ে যেতো।

আসুন, এবার আসল ঘোড় দৌড় দেখা যাক্। এক নাইলের বাজী, খোটক খোটকীরা লাইন দিয়ে সব দাঁড়িয়েছে। চং চং চং ঘন্টা পড়লো—আর সুরু হলো দৌড়। আপনার সামনে, পেছনে, উপরে, নীচে তাকিয়ে—দেখুন, অশুস্তি চোখ যে পথ দিয়ে ঘোড়ারা আসছে, সে পথের দিকে উৎসুক হয়ে তাকিয়ে আছে। মাঝে মাঝে শুনতে পাবেন—কেউ কেউ চিৎকার দিচ্ছে-বে বেই ঘোড়াটা খেলেছে তার নাম ধরে। বেই দলটা কাছাকাছি এসে গেলো—অমনি সুরু হ'লো-হৈ হৈ চিৎকার ঘোড়াদের নাম ধরে গালাগালী।

বাঙালী এক নাগাড় শাবনে দাঁড়ানো (বোধ হয় কেউ হ'বেন) ভদ্রলোককে বলছে: ওগো: যে ঘোড়াটা তুমি ধরেছো, তার নাম ধরে চিৎকার না কেন? ভদ্রলোকের চিন্তাধার ভাষা নেই। তার ঘোড়া বে বাজের বাচ্চা।

●

ব্যাস, দৌড় শেষ হ'য়ে গেলো। খুশী হ'লো কেউ, কিন্তু বেশীর ভাগই কেবল যেন বন-বরা ভাব। মাঠের এধারে ওধারে ঘাসের উপর ছোট ছোট দল বসে পড়লো। খানিকক্ষণ চুপ্ চাপ্-তারপর হিসেব নিকেশ। "মুনীর পাওনাটা আজও দেওয়া যাবেনা, ছোট ছেলেটার ওষুধটাও ফুরিয়ে গেছে, বৌয়ের শেষ সম্বল, গলার সরু হারটা সাকরার দোকানে আজই সকালে বাঁধা পড়লো। বড় আশা ছিলো-হাত বিঘুনির টাকাটা দিয়ে আর মাত্র থেকে সব তুলে নিয়ে যাবে।

হিসেব-নিকেশের পর আবার চুপ্চাপ্ দু একটা দীর্ঘশ্বাস। তারপর পকেট থেকে বের করে একটা এক পয়সা দামের সিগারেটে অগ্নিসংযোগ। তুলোর মতো ভাসা ভাসা ধোঁয়ার দিকে তাকিয়ে অন্তত: আর ছয়টা দিনের জন্য তখন চেষ্টা চল্লো-দার্শনিক হবার॥

উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের নামে প্রহসন

জনসাধারণের অর্থ ও স্বার্থ লইয়া সরকারের ছিনিমিনি খেলা

সম্প্রতি ষ্টেটসম্যান পত্রিকায় সালানপুরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের নামে জনসাধারণের অর্থ ও স্বার্থ নিয়ে ছিনিমিনি খেলার এক চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু সেই বিবরণীতে ওচিকয়েক জায়গায় ফাঁক ছিল, যেমন কার পরামর্শে সালানপুরে সরকার জমি কেনেন, উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের জন্য, বা কে সেই সৌভাগ্যবান অফিসার যিনি সালানপুরে হর্তাকর্তা হয়ে ছিলেন।

এ ব্যাপারে আরও অনুসন্ধানের পর আমরা যে সব নতুন তথ্য জানতে পেরেছি তা ষ্টেটসম্যানে প্রকাশিত তথ্য থেকেও চমৎকার। সালানপুরে পাঁচ লাখ টাকা দিয়ে যে ১,০০০ একর জমি কিনেছিলেন তা অধিকাংশই ছিল বড় বড় জমিদারদের এবং এ ব্যাপারে কার্যকারণ সম্বন্ধ ঘটাবার জন্য আমারের অর্থাৎ অমানবন্দু জোলাদা (জোলাজল মিত্রোগী) এঁরাকয় বছরেই পরিশ্রম করেছিলেন। তবে জমিদারী উচ্ছেদের পর জমিদারদের এখনকার মত "পাইয়ে দেয়া" নীতি সরকারের ছিল কি'না তা পাঠকই ভেবে দেখবেন।

এ হেন ডাঙা জমিতে গত কয়েক বছরে সরকার মোট ২০ লাখ টাকারও বেশী খরচ করেছেন ১৫টি উদ্বাস্তু পরিবারকে পুনর্বসিত দেখার জন্যে। এখন যাঁর দেখানে দেখবেন 'সারবন্দী কালো ছোট ছোট তাঁবু আর ধ্বসে পড়া মাটির ঘর'। কার ঐ ২০টি পরিবারের মধ্যে সবশুদ্ধ ২৫টির ছিলেন পাবেন, বাকী সবাই সরে পড়েছে হতাশায়।

সালানপুরের ঘটনা খুব পুরোনো নয়। সালানপুর চিত্তরঞ্জন ইঞ্জিন কারখানা ও রূপনারায়ণপুর কেবলুলের কারখানা থেকে প্রায় সমান দূরে। মাটি কালো জমি। চাষ করার উপযুক্ত নীচু জমি সবই স্থানীয় লোকেরা চাষ করছে।

ছাঃ রায়ের ইচ্ছে ছিল এখানে শিল্পবিভ্ না হাতেও কাজ জানা লোককে বসাতে হবে, যাতে তারা আশে পাশের কলকারখানায় কাজ জুটিয়ে নিতে পারে। এই উদ্দেশ্যে ১৯৫১ সালে যেখানে ট্রানসিট ক্যাম্প খোলা হয় প্রায় ১,২০০ উদ্বাস্তু পরিবারে নিয়ে।

কিন্তু হঠাৎ এক দিন পুরোনো সব প্ল্যান ভেস্তে গেল; ঠিক হল ওখানে কৃষি পরিবার বসাতে হবে। জমি উনুন কর। চালু জমি, কাঁকর মাটি, জলের অভাব, লেগুনো কি কল্যাণ রাষ্ট্রের বাধা হতে পারে? কাটাও ভাই পও ও পুকুর। জল ধ'রে রাখবো। আনো ট্রাক্টর।

এই ভাই পও জিনিষটা সরকারের বিচিত্র আবিষ্কার। ব্যাপারটা বিশেষ কিছু না। মাটি খানিক ছেঁচে ফেলো, ব্যস্, আপুসে বৃষ্টির জল তাতে ধরা পড়বে, আর সে জল কেতে দিলেই জলের অভাব ঘুচবে। কিন্তু কার্যতঃ দেখা গেল তাতে জল ধরা পড়ে না, শুধে যায়। দু' তিন হাত গভীর পুকুরের অবস্থাও তথৈবচ।

একটা কথা মনে রাখা দরকার এখানে। জমি উনুয়নের কাজ আরম্ভ হল স্থানীয় এস, ডি, ও'র মতের বিরুদ্ধে। তিনি বল্লেন সালানপুরের ঐ জায়গায় কৃষি-কাজ অসম্ভব। কৃষি বিভাগীয় বিশেষজ্ঞও জানালেন পুরোপুরি কৃষিকাজ আরম্ভ করা উচিত হবে না কতকগুলো ব্যাপার লক্ষ্য না করে।

ভাল কাজে বাধা সরকার বরদাস্ত করবেন কেন? একজন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার শ্রী এ এন রায়কে করে দিলেন সালানপুরের হর্তাকর্তা। তিনি শুধু রাইটার্স বিল্ডিং থেকেই আদেশ দিতেন, বিশেষ ওখানীস্তন অ্যাডিশনাল রিলিফ কমিশনার শ্রী এন, কে, রায় চৌধুরীর কাছ থেকে। শ্রী রায় চৌধুরী এক অফিস অর্ডারে শ্রী রায়কে প্রায় ব্ল্যাঙ্ক চেক্ কেটে দিলেন। বলা হল যে কোনও কাজেই শ্রী রায় চৌধুরীর মত পাবে মনে হলেই শ্রী রায় সে কাজ করতে পারবেন। আর কি চাই!

কাজ এগিয়ে চলল। আজ এই চালু জমিটা চষা হল; ওতে সারও দেয়া হল। শ্রী রায় বলে করলেন তাইতো? ও-সে দেওয়া দরকার। ওদাও চষা ক্ষেতের সার দেয়া ওপরের মাটি দিয়েই দেয়া হল। ৭ দিন পরেই বীরাজের খোলা চাপালো, ঐ আরসার একটা আই পও করতে হবে। বাস্, কতো আই পও চষা ক্ষেত কেটে।

এই রকম সালানপুরের কাজের পেছনে না ছিল কোনও প্ল্যান বা বিবেচনা। একজন কর্মীর সোক যেমন বল্লেন, "কাজ যে এভাবে তার নজির ত' আমরা দেখলাম এর চতুর্দশটি ছিলে!" সরকার এরই মধ্যে সবয় করে এক কিস্তি তুলে ফেলেছেন, সালানপুরের কাজ কি ভাবে সাধারিত এগুচ্ছে তা দেখবার জন্যে।

১৯৫৩ সালের ডাঙ্গ মাসে, অর্থাৎ বীজ বোনা বুনসার সময়ের অনেক পরে উদ্বাস্তুদের জমি বন্টন করা হয়। কৃষকরা জমিতে ধান দিতে না দিতে না। দ্বিতীয় ফসল হিসাবে বোনার কুমড়ো। বৃষ্টি এলো, জল গুমে গেল ৯০ ভাগ। ৩৫ পুকুরের ৩৪টি সেই জল জমে মাটির গড়া ক্ষেতের জল ধরে রাখার আল ভুবে নিয়ে গেল, কেত পাথরে ভর্তি হলো। বাকীর ডুমুরে নিয়ে কৃষকরা দেখলো জল পেতে জমি এমন কঠিন হ'য়েছে যে দা-বাংলা-ভাবে কোপ্ যাচ্ছে না, দই চষা বাদামের ফসল।

এই বছরই ওখানীস্তন রিলিফ কমিশনার শ্রীবিশ্বপ্ত বন্দোপা ধ্যায় মুখোপাধ্যায় করলেন খানাদমুরের কৃষি পরিকল্পনা বন্ধ করবার জন্যে। কিন্তু শ্রী রায় নাছোড়বান্দা। তিনি লিখলেন আরও ৫০ জন উদ্বাস্তুকে ওখানেই পুনর্বাসন দিতে হবে। আপত্তি শ্রী রায় রিলিফ কমিশনারের আদেশের বিরুদ্ধেতা করায় ছোট কোথা থেকে পেলেন?

পরের বছর হলো অবাবৃষ্টি। ফসল ফললো না। উদ্বাস্তরা হতাশ হলো। তাদের অনেকে ছেটা করলো চিত্তরঞ্জন বা রূপনারায়ণপুর বা কয়লার খাদতে কাজ পাবার জন্য। তারা বিফল হ লো। এটা উল্লেখযোগ্য যে গত দু বছরে মোটে একজন উদ্বাস্তুর চিত্তরঞ্জনে কাজ পাবার সৌভাগ্য হ য়েছে। তারা কয়লার খনিতে কাজ বেশী দিন করতে পারলো না, বা তাদের স্থায়ীভাবে অন্যান্য কর্মের ব্যাপারে সাঁওতালদের সাথে এঁটে উঠতে পারলো না। ১৯৫৬ সালেই সরকার সালানপুরে কৃষি পরিকল্পনার কাজ বন্ধ করে দেন। উদ্বাস্তু যারা বারা পুনর্বাসন নেবার চেষ্টা করেছিল তাদের অনেকেই হতাশায় আজে আস্তে সালানপুর ছাড়তে আরম্ভ করলো।

যারা এখনো সালানপুরে 'আছে তাদের অবস্থা এই যে তাদের জন্যে ক্যান্সের স্যুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাধারণ খরচাটি সাংসারের চেয়া করছেন বড় বু ঝতে ধরে। অনেকেরই মাটির ঘর ভেঙে গিয়েছে ১৯৫৭ সনের বৃষ্টিতে। তারা এখন বাস করে আশ্চর্য সব কুটারিতে, যার তুলনা দিলতো কিছুদিন আগেও যাওড়া মহকুমে। ট্রানজিট ক্যাম্পের ডাক্তারখানা তাদের ব্যাপারে নিলিপ্ত-ভাব পোষণ করে। ক্যাম্পের প্রাইমারী স্কুলে তাদের ছেলেমেয়েরা পড়ে। কিন্তু অন্যান্য ছাত্রের মত তারা কাপড় পেনিসল পায় না। ক্যাপ ডোল ত' অনেক দিনই বন্ধ হয়েছে, খরচা তারা ত' পুনর্বাসন পেয়েইছে।

অকৃতকার্যতাই যে এই রাজত্বে ইন্যুতির পোশাক তার স্বাস্থ্যও প্রথার শ্রী রায়'।' তিনি খাটো গলে এখন রিলিফ ডিপার্টমেণ্টের ডিরেক্টর অব প্ল্যানিং হয়ে ব'সে বসে আছেন।

কিন্তু সব চাইতে মোটা বড় কথা মোট চচ্ছে সালানপুরের হিসাব আউট করার সময় হয় নি এখনও।

বস্তিবাসীদের পুনর্বাসন সমস্যা

(অথর পূর্বাং লেখাং)

কর্পোরেশনের খেয়

কবি সমস্যা আলোচনার জন্যে কবিকাতা কর্পোরেশন এক বিশেষ সভা ডেকে গত ৩রা ডিসেম্বর বসেছিল। উদ্বোধ প্রকাশ করেছেন, বস্তি-বাসীদের জন্যে বলতে ঠিক যা বলা হবে না। আসলে তাঁদের উদ্বোধ প্রকাশের কারণ হচ্ছে বস্তিবাসীদের সম্বন্ধে কর্পোরেশনের ঔদাসীন্য ও নিষ্ক্রিয়তার কথা অত্যন্ত নগ্নভাবে ফাঁস হয়ে গেছে বলে। কলিকাতা মনগীর কর্মিবাহিনীর একটা বড় অংশের অনিবার্য নির্বাচনের ভার বস্তির ওপর ছাড়ে বিচ্ছেন এবং তা-ও কর্পোরেশনের কোন রকম পরামর্শ না নিয়ে, এমন কি তাদের না জানিয়েই। 'নগরপিতা'দের পক্ষে এটা চূড়ান্ত মর্মান্তিকের নয় কি? তাই দেদিনের সভায় কংগ্রেস ও ইষ্ট-কি-সি উভয়পক্ষেই কাউন্সিলারদের বলা ছেড়ে রাজ্য সরকারের এ মনোভাবের প্রতিবাদ জানান।

কিন্তু বুশোয় খুলে বেরুল ইকুপুডবেণ্ড ষ্ট্রাটের কেয়ারম্যান শ্রীবেরান গুপ্ত। শ্রীগুপ্ত না বলেন তার বর্ষাধ এই — কই এতদিন তো আপনারা বস্তিবাসীদের জন্যে কিছু করা সরকার, এমন কথা মনে করেন নি। আজ হঠাৎ যে দরদ একেবারে উথলে উঠল! বস্তিবাসীদের দরদবন্ধিতা করার এতদিন যখন তাঁরা অবসর পান নি, তখন কেন তাঁদের পরামর্শ নেওয়া হল না—সরকারকে এ কথা বলায় তাঁদের কোন বুধ নেই। তাঁরা যদি নিজেরা বস্তিবাসীদের অবস্থার উন্যুতিসাধনের চেষ্টা কোনদিন দেখাতেন তবে দেশে চেষ্টা করে বিদেশ হতেন, তাহলে অবশ্যই তাঁদের মুক্তিতে বাধ থাকত—এখন তাঁরা যে যুক্তি দেখাচ্ছেন সে যুক্তির বাধ নেই।

'নগরপিতা'দের উদ্যা

নগরশিভাগণ রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে উষ্মা প্রকাশ করেছেন এবং বস্তিবাসীদের জন্যে 'নাকিকান্না' কেঁদেছেন বটে, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায়, বস্তিবাসীদের জন্যে কর্পোরেশন তো কিছু করেই নি, উপরন্তু বস্তিগুলোকে তার শোষণের শিকারক্ষেপে ব্যবহার করা হয়েছে। কেন? তাই বলছি।

কলিকাতা কর্পোরেশন পাকা বাড়ীর জন্যে চ্যাক্স আদায় করে শতকরা ১৫, বেখে ১৯, টাকা মাত্রে, অথচ বস্তির উপর আদায় করা হয় শতকরা ২৩।৩ টাকার হারে। আবার সম্প্রতি ম্যানেজ-কমিশনার কর্পোরেশন বস্তি এলাকা থেকে এই অন্যায়ভাবে উচ্চহারে চ্যাক্স পাওয়ার জন্যে অবিবাদের 'রিবেট' দেয়; অথচ কুটিরের মালিক অথবা ভাড়াটিয়ারাও এই রিবেটসুযোগ এক পয়সাও পায় না। বস্তির উপর এই উচ্চহারে কর ধার্যের কারণ, পাকা বাড়ীর যেমন পৃথক পৃথকভাবে মূল্য নির্ধারিত হয় বস্তির বেলায় সেরূপ হয় না। বস্তির সমস্ত কুটিরগুলোর এক সঙ্গে করে সমষ্টিগতভাবে (consolidated) মূল্য ধার্য করা হয়। আর এ কারণেই নির্দিষ্ট মূল্যের পরিমাণ অত্যধিক হয় এবং চ্যাক্সের পরিমাণও বেশী হয়। কর্পোরেশন বস্তিবাসীদের কাছ থেকে সর্বোচ্চ হারে কর আদায় করে কিন্তু কর্পোরেশনের দেয় সুযোগ সুবিধাগুলি, যেমন জল, আলো, আবর্জনা পরিষ্কার প্রভৃতি কোন ব্যবস্থাই করে না। কর্পোরেশনের বুক্তি এই যে, যদি এলাকা-গুলো অভিপ্রায়ের অধিকারে সম্পত্তি এবং লেটেনেই বস্তিবাসীদের সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা করার দায়িত্ব পাইতে অভিপ্রায়ের, কর্পোরেশনের নয়। কিন্তু কথা হচ্ছে কর্পোরেশন যখন বস্তি-বাসীদের কাছ থেকে কর আদায় করে তখন তাদের সুখসুবিধার ব্যবস্থা করার দায়িত্বও তার গ্রহণ করা উচিত। এজন্যে মাঠিই আইনের ইপযুক্ত সংশোধন করবার। কর্পোরেশন যখন বস্তিবাসীদের মজলাকাঙ্ক্ষা করে তখন আইনত্ত বাধাবিঘ্ন দূর করার জন্যে তার পক্ষ থেকে চেষ্টা হওয়া উচিত—এটা আশা করা সঙ্গত বই কি? কর্পোরেশনের বিরুদ্ধে বস্তিবাসীদের ক্ষোভের কারণ তো এখানেই—কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে আইনগত বাধাবিঘ্ন দূর করার আন্তরিক চেষ্টা কোনদিনই হয়নি।

স্থায়ী সমাধানের উপায়

বস্তির মানুষগুলোকে বর্তমানের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ থেকে মুক্ত করবার জন্যে পাকা বাড়ী নির্মাণের বীধনেরী পরিকল্পনার মতে নেয়ে সরকারের পুনর্বসতি পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হওয়া উচিত। সরকারী নীতির ফলে যা করা হয়েছে যে নীতির সার্থক রূপায়নের জন্যে এত সুযোগবিধতা অভাব বেশী। এর পরিণতিতে সরকার বস্তি অপসারণী পরিকল্পনা বাচাই করে দেখতে গেলে এর অবাস্তব একটা দিক চোখে না পড়ে যায় না।

বিভিন্ন সময় বিরোধীপক্ষের সদস্যগণ বিধান সভার যে হিসেব দিয়েছেন, তা থেকে এই তথ্য পাওয়া যায় যে, বিভিন্নকল্পনা কার্যকরী করতে ৩০ কোটি টাকা হলে তো ১২০ কোটি টাকা পর্যন্ত লাগতে পারে এবং সময়ের ব্যাপারে ২৫ বছর থেকে ১৫০ বছর লাগতে পারে।

বিরোধী পক্ষের হিসেবের বাস্তবাদ্বিত দিকটা বদি ছেড়েও দেওয়া যায় এবং সরকারী হিসেব অনুসারে সবচ কম অনুমান ধরেও যদি বরা যায়, তাহলেও বস্তি অপসারণ ও বস্তিবাসীদের জন্যে আস্থানবত বাসগৃহের সংগঠন করতে ২০।২৫ বছরের কম সময় লাগবে বলে মনে হয় না। কারণ আমাদের সামের (স্বাস্তব্যশাসন মন্ত্রী) নিজমুখেই ঘোষণা করেছেন—এ পরিকল্পনার কাজে ৩০ কোটি টাকা লাগবে এবং বছরে আড়াই কোটি টাকা করে এজন্যে তাঁরা খরচ করবেন বিধ করেছেন। সুতরাং এই ২০।২৫ বছর ধরে বস্তির অধিবাসিগণের যেটুকু অংশকে (গুরুত্ব দিকে দিয়ে অংশ এবং ক্রমপ্রাধান্য দেবার জন্যে আগবে) বর্ষাবন্দের নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার মধ্যে দিনের পর দিন বাপন করতে হবে। একবার ভেটাকে সরকার নীতি বলে গ্রহণ করাহলে যে নীতির বাস্তব রূপায়নের জন্যেও তখন আন্দোলন ও দাবী উঠতে থাকবে—এটাই স্বাভাবিক।

সুতরাং বস্তি অপসারণ ও পাকাবাড়ী নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে অধিকাংশ বস্তির সংস্কার ও উন্নয়নের প্রতিও সরকারকে সমধিক লক্ষ্য দিতে হবে। এবং এজন্যে বিভিন্নবিশেষজ্ঞ আনে এবং এই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিধিব্যবস্থার প্রয়োগনীয় সংশোধনের ব্যবস্থাও করে সরকারকে একাজে অগ্রসর হতে হবে। এটাই বাস্তব পথ।

ই·এম·ইউ গাড়ীতে নিরাপদে ভ্রমণ করতে হলে — মনে রাখবেন

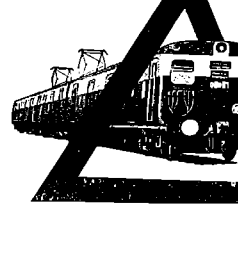

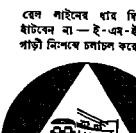

সাধারণ গাড়ী থেকে ই-এম-ইউ গাড়ী বেশী চওড়া। রেলের স্থায়ী গাঁথনি ইত্যাদি থেকে ই-এম-ইউ গাড়ী বাস্ত ১৫ ইঞ্চি তফাতে চলে। কামরা থেকে বাইরে মুঁ করবেন না।

রেল লাইনের ধার দিয়ে হাঁটবেন না — ই-এম-ইউ গাড়ী নিশ্চয়ই চলাচল করে।

বৈদ্যুতিক মালগাড়ী ইউনিট গাড়ী মুহূর্তেই দ্রুতগতি হয়, চলন্ত ই-এম-ইউ গাড়ীতে উঠানামার চেষ্টা করবেন না। চলাচলের সুবিধার জন্য কর বাসগত্র নিয়ে ভ্রমণ করবেন।

পূর্ব রেলওয়ে

চোখ মেললেই সংখ্যাহীন পাথরের কোণ ; সেগুলো ছাড়ালে অট্টালিকা অলিগলি, চওড়া সড়ক, অনেক মাথা মোড় ; পেরিয়ে এলে, ছড়ানো বহুদানের বুধ ; তিতোনে ধোঁয়াজল গঙ্গার কোল। খোলা আকাশের নীচে এই হলো পলকে দেখা কলকাতা। একটি স্থির-চিত্র।

তখনো ঘুম ভাঙেনি কল-কাতার।

কাকপক্ষী আগার আগে জাগে কলকাতা। বড় বউএর ঘুম ভেঙে গেল তারও আগে। ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। ছেলে মেয়েগুলো নিঃসাড় ঘুমুচ্ছে। ঘুমুক। কিন্তু ছোটো ? হাত বুলিয়ে দেখলে বিছানায়। না, ছোটো নেই। মনে মনে হাসল। এখনো বিলি কাটছে ছোটো ? কাটুক!

সে বলেছিল ছোটোকে, শুনেছিল বড়ও।—আগিয়ে দিও কিন্তু। নইলে কালির ঢেঁড়া পড়বে, মনে থাকে যেন।

বারান্দার উঠে এলো পারে পায়ে। দেখল ছোটো ঘুমুচ্ছে ওর পাশে। সন্তর্পণে পায়ে হাত রাখল সুবলের। নাড়া দিল বাঁয়ে ডাইনে।

পাশ ফিরে শু'ল সুবল।

এই ওঠো।—এবার আরেকটু জোরে।

—কে, ছোটো ?

—না, আমি।

—ও।

সুবল দাস চোখ রগড়ে উঠে বসল বিছানায়। অনেক মাটি এগিয়ে দিলে বড় বউ। মুখে চোখে জলের ছিটে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। ডিউটির পোষাক পরে পা বাড়াল ডিপোর পথে।

বড় বউ ওর চলে যাওয়া পথের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। অনেক অনেক ক্ষণ : দেয়ালে হেলান দিয়ে।

কলকাতা জাগল, কাক ডাকল। বড় বউ গতরাতের এঁটো বাসনগুলোকে জড়ো করল কুয়োতলায়। তারপর একল ছোটকে। ছোটো উঠল, তারপরে উঠল ছেলে মেয়ে তিনটি। আকাশে তখন রঙ ধরেছে। আঁশটে মেঘেরা প্রথমে সাদা, পরে রোদের রঙে নিজেদের রাঙাল। বিঠে আলোয় ভরে গেল আকাশ।

ঘরের পাঁচ, মুখ দেখছে পরস্পরের। ঘরে-বাইরের সে, ততক্ষণ ওপ্রান্তের ঙমতিতে ঘণ্টা দিচ্ছে গাড়ী ছাড়ার। ট্রাম-গাড়ী।

●

ফরিদপুরের মানুষ কণ্ডাক্টার সুবল দাস। গ্রাম, কালাসিরুধা। বাবার ব্যবসা ছিল বরিশালের পট্টুয়াখালিতে। মাও থাকতেন সেখানে, ছোট ভাইটিও। সুবল বড় হয়েছে জেঠার হেফাজতে, কালাসিরুধায়। কেউ ছিল না জেঠামশায়ের, এক সুবল ছাড়া। সেই জেঠা একদিন বলল। তখন কুাশ নাইনে পড়ে সুবল। ভাইকে দেখতে এলো ভাই। বারা যেতেই সুবলের বাবা সুবলকে সঙ্গে নিয়ে চললেন পটুয়াখালি। সুবল বলে : মন বসল না, তাই একরাতে পালিয়ে এলুম কলকাতায়।

চাকরী নিলুম কো-অপারেটিভে। দুধ বেচার। কিছুদিন চাকরী করতেই কেমন যেন লাগল। একমাসের ছুটি নিয়ে ছুটলুম গাঁয়ে। কালাসিরধায়। সেখানে হঠাৎ ঘটল অঘটন। ভালবাসল সুবল পাড়ার একজনকেই। আর ভালোবাসার টানে কলকাতার পঁচিশ টাকার চাকরী ছেড়ে ছুটে গেল গ্রামের প্রাইমারী স্কুলের মাষ্টারীতে। ছেলে পড়ায়, দিন কাটে। মেলামেশার ধান, খই হলো ভালোবাসার। একদিন এলো বিচ্ছেদের লগ্ন। দি, টি পড়তে যেতে হবে সুবলকে। সুবলের সে কাঁদল। অবশেষে বোঝাপড়া হলো দু'জনার। সুবল দি, টি, পড়তে চলে গেল। দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করে ফিরল গাঁয়ে। তখন বয়স কতো ? চব্বিশ পঁচিশ।

ভালোবাসার জোর থাকলে গলাজল ভাঙতেও গায়ে লাগে না। সুবল বলছিল : সে কি দিন রাত্তির। কোথা দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল কেউ কি টের পেরেছি।

হঠাৎ দুভিক্ষ এলো। এলো কি, ঝাঁপিয়ে প'ড়ল। তখন কার কে ? অবন সুন্দর আকাশবাতাস কেটে চৌচির হয়ে যায় বুঝি। বনের গাছে তখন তেবন ঘোরার ডাঁটা আর খেঁদে না। ছিপের দুলুনীতেও চেউ উঠে না জলে। পালাই, পালাই।' পালিয়ে এলুম কলকাতায়।

কলসীর জল নদীতে ঢেলে, নদীর জলে ভরালুম কলসী। এঁকে ওঁকে ধরে, অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে চাকরীতে ঢুকলুম ট্রাম কোম্পানীর। চাকরী পাকা হবার আগেই লোভ হলো ঘর বাঁধব। কলকাতায় যাওয়ার ছজ্জুতি কি কম ? কত কথা, কত মুখ দেখাদেখি। তা সুবল বললে, সে সব ঝামেলা আবার ছিল না। গ্রামের এক ছেলেকে বললুম সব কথা, সে বললে; আছে। ভোলাদার ঘোন। রঙ কালো হলে হবে কি, খুউব সংসারী। তোর সাথে মানাবে ভালো। তা ছাড়া এক গাঁয়েরই বেয়ে।

সুবল হাসলে। বললে : রাজ যোটক। লালে কালোয়। না ?

সুবলের গায়ের রঙ গৌর। বরং বলি, যেন গৌরাঙ্গ। সদের নয়, কালাসিরুধার।

●

প্রথম দেখাই হলো পাকা দেখা। বিয়ে হয়ে গেল। দু'বছর কাটল খুব আনন্দে। তারপর অসুখ বিসুখ ঢুকল সংসারে। নেয়েনী রোগ। ডাক্তার দেখানো হলো। ডাক্তার বললে নাড়ীর দোষ, অপারেশন করতে হবে। রাজী হলো না। অসুখ বাড়ল, তবুও না। এদিকে সুবলের চোখে স্বপ্ন। ছেলে হবে, সংসার বাড়বে। তাছাড়া, বাপ হওয়া কি কম কথা ? বংশধর যদি না বাড়ল কি লাভ ভার্যায়। শুধু ভৈব আনল। সুবল চাপ দিল, কাজ হল না তবুও। অবশেষে ফণী অঁটকে সুবল। বউকে পাঠিয়ে দিল বর্ধমান, বউ এরই এক আত্মীয় বাড়ীতে।

মাসখানেকের মধ্যে গোপনে পাত্রী ঠিক করে দ্বিতীয় বিয়ে করল সুবল। আগের বউ জানল না। পরের বউ, আর তার আত্মীয়েরাও জানল না, আরো এক বউ আছে সুবলের। সুবলের কথায় দ্বিতীয় বিয়ের দিন, আমার জীবনের স্মরণীয় দুটি দিনের একটি। আনন্দে পুলকে, উত্তেজনায় সে এক মারাত্মক অবস্থা। নিজেকে ধরে রাখতে পারি তেমন ক্ষমতাও যেন নাই। আর এক আনন্দের দিন আবার প্রথম মেয়ের অনুপ্রাশন উপলক্ষে পঞ্চাশ ষাট জনেরও বেশী অতিথি এসেছিল বাড়ীতে। সে কি ধুমধাম।

●

এরপরে জানাজানি হলো।' ছোট জানলো। এখন কি বড় বউও জানল। বড়কে আনতে গেল সুবল, রাজী হলো না বড় বউ। অনেক দুঃখ পেল, দুঃখ নিয়ে শহরে এল সে। কিছুদিন পরে প্রথমার মন গলল। নিজে থেকেই চলে এলো সুবলের কাছে। পুরোনো কানাঘুষো, ইর্ষা, দ্বষ, কণ্ডাক্টারি, কথাকাটা-কাটি মিটল।

দ্বিতীয় সুবলকে উপহার দিল একটি মেয়ে। যেমন ফুটকুটে তেমনি সুন্দর। বছর দুই পরে একটি ছেলে। ইতিমধ্যে বড় বউ উঠে-পড়ে লাগল। এবার সেও না হবে।' অপারেশন কেন, তার চাইতেও বড় কিছু করতে সে রাজী। অপারেশন হলো। বছর ঘুরতেই কোলে এলো মেয়ে।

দুই চার হয়েছিল, অবশেষে ছয়, এখন হলো বারো। সুবল সান্ধল চোখ মেলতেই আঁতকে ওঠে। আরো বাড়বে, অনেক অনেক। তখন ? কি করে কাটবে দিন, কুবোবে রাত্রি। বেতন তো মোটে একশ ষোল টাকা। অথচ ছ'টা মুখ। যদি বাড়ে, আরো বাড়ে। তখন ?

চুলে পাক ধরেছে। তেতাল্লিশ বছরের বানুষটিকে দেখায় যেন পঞ্চাশও পেরিয়ে গেছে। বুড়িয়ে যাচ্ছে দিনে দিনে। সুবল বলল : বড় আশা তেবন কিছুই ছিল না। ছোট বেলায় সাধ ছিল বড় চাকরী করবে। সংসার করবে। সুখে। আর আজ। ঐত ঘর, দৈর্ঘ্যে পাঁচ হাত, প্রস্থে একদিকে সাড়ে তিন হাত, অন্য দিকে আড়াই। ঐটুকু বারান্দায় রান্না বান্না, ঘরের ভেতরে তিন চারটে ট্রাঙ্কের আর রান্না বান্নার সরঞ্জাম, তাও রাখার জায়গা নেই। অবশ্য ভাড়া আটটাকা তাই পড়ে আছি। বেশি ভাড়া দেবো কোত্থেকে। খাইতো দুই তরকারী দিয়ে সকাল রাত্রি। তবে বেশি ভাবিনি, যা হবার তাই হবে। চিন্তায় তো কমম ফলবে না ? তাহলে ?

সুবল আরো জানালে উপরি পাওনা আমি চাইনে। বউড যত করে। তাছাড়া কি হবে দু'একে টাকায়। তবে হ্যাঁ, নয়া পয়সার হাত দেবতায় এখন কিছু হাতে আসে, পখেই উড়িয়ে দেই। ঘরে আনলে অবশ্যই হবে কিনা আপনারা বলুন ?

সুবলের প্রথমা স্ত্রীর বয়স এখন ত্রিশ। দ্বিতীয়ার ছাব্বিশ। বড় মেয়ের বয়স ছয়। ছোটরাও বড় হচ্ছে। হাঁটছে, খেলছে। সুবল বলে—ছেলেটা ভীষণ দুষ্ট। ওর দুই মাইই বলে,—বাপের গুণ পেয়েছে। হাসে সুবল। হবেও বা। তবে হ্যাঁ দুই সতীনে খগড়া নেই। দুজনেই বানিয়ে চলে। ভেতরে ভেতরে কে কি করে তাতে সুবলের কাজ কি ? সামনে তো বেশ বেড়াল।' সুবল বলে, তাহলে বুঝুন, কেমন ম্যানেজ করছি।

●

দুপুরের সূর্য গলছে। শেষ টি,পের পরে ঘরে ফিরছে সুবল। স্নান পা চেনে চেনে। ঘরের বারান্দায় দু'বউ মুখোমুখী বসে। ছেলে মেয়েগুলো ঘুমুচ্ছে। সুবল এসে দাঁড়াল। স্নান সারল। তারপর খাওয়া দাওয়া।

ট্রাম কণ্ডাক্টার সুবলের দিন কাটে, এমনিভাবেই। মাঝে মাঝে বৈচিত্র্য আসে, মাসের শেষের দিকে। তখন টানাটানির সময়। পরিচিত কারো কাছ থেকে দু'এক টাকা ধার নেয়, আবার ফিরিয়ে দেয় মাসের প্রথমে। বড্ড লজ্জা তার হাত পাততে। ভীষণ লজ্জা।

এ সুবলকে আপনিও চেনেন। গত্তীর মানুষটি। অবশ্য মুখ খোলে কোনো কোনোদিন, যখন আর খেই পায়না, চোখের সামনের আকাশ দাউ দাউ শিখায় জ্বলে ওঠে। এমনি একদিন একজনের কাছে বলেছিল,সে ছেলেটা কে যে দায়দায়িত্বহীন ছন্নছাড়া, ছিন্নবাধা পলাতক, যে বয়াঙ্ক বাঠে শুধু বাঁশি বাজিয়ে কাটায়, তাকে বলছে : ওরে চলো না দুজনে মিলে শেয়ারে পোলাট্রি করি। খুউব লাভের ব্যবসা। বছরে একটা মুরগী ক'টা ডিম পাড়ে জানো ? আর সে ডিমের সব গুলোতে যদি বাচ্চা হয় তাহলে অনেক অনেক। রাজী আছো ? খুব লাভের কিন্তু পোলাট্রি। একটা মুরগীর অনেক বাচ্চা হয় বছরে। অনেকগুলো—

কালাসিরধার গৌরাঙ্গের গৌর অঙ্গ তামাটে হয়ে গেছে, চুল সাদা হয়ে যাচ্ছে দিনে দিনে, চামড়া কুঁকড়ে যাচ্ছে, পাঁচ কোড়া চোখ চেয়ে আছে তার দিকে, আরো চোখ আসবে, বড় হবে সংসার। আট টাকার ভাড়াটে বাড়ীতে স্থান অকুলান হবে, ঘর ভাড়া করতে হবে আরো বেশী টাকায়। অথচ কণ্ডাক্টার সুবল দাস এখন খালি চোখে লেখা পড়তে পারে না, কেবল যেন ঝাপসা ঠেকে তার চোখে। আর

রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডুর পদত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ

(দর্পণের নিজস্ব প্রতিনিধি)

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু পদত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন বলে শোনা গেছে। সম্প্রতি তিনি প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহেরুকে জানিয়েছেন, কলকাতায় তাঁর শরীর টি কছেনা, তাই তাড়াতাড়ি পারা যায় রাজ্য-পালের দায়িত্বভার থেকে তাঁকে যেন মুক্তি দেওয়া হয়। এই বিষয়ে দিল্লীর উর্ধবতন মহলে আলোচনা চলছে।

স্বর্গত হরেন্দ্র কুমার মুখার্জীর মৃত্যুর পর শ্রীমতী নাইডু পশ্চিম-বঙ্গের রাজ্যপাল হয়ে আসেন বছর দেড় পূর্বে।

রাজ্যপালের গদিতে আসীন হবার অব্যবহিত পরেই শ্রীমতী নাইডু ঘোষণা করেন, কলকাতায় এসে তাঁর প্রথম কাজ হবে বাঙলা ভাষা শেখা (মাতৃকুলের দিক থেকে নিজেকে বাঙালীর আপন জন বলেও উল্লেখ করেন নানা সভাসমিতিতে)। এক বছরের মধ্যে কাজ চালানো বাঙলা আয়ত্তে আনবেন বলেও তিনি জানান।

সেই বহুবিঘোষিত একটি বছর পেরিয়ে গেছে। বাঙলা ভাষায় তাঁর কি পরিমাণ দখল হয়েছে, সে পরিচয় এখনও কেউ পায়নি। তবে গত রবিবার (৯।৩।৫৮) 'গীতবিতানের' বার্ষিক সাবাবর্তন উৎসবে শ্রীমতী নাইডুকে বলতে শোনা গেছে, "আপনাদের এমন মধুর বাঙলা ভাষা, আমি জানিনা, বলতে পারিনা, বুঝতেও পারিনা, তাই জন্যে আমার দুঃখের সীমাপরিসীমা নেই" ইত্যাদি ইত্যাদি।

এইরূপ দুঃখপ্রকাশ রাজ্যপাল পদ গ্রহণের সময়ও শোনা গিয়েছিল।

হাত দুটো। কদিন কাজ করতে পারবে ? কে জানে ? তবু সে স্বপ্ন দেখছে পোলাট্রির। ঝাপসা চোখে।

●

ঘরের পাঁচ, মুখ দেখছে পরস্পরের। ঘরে বাইরের সে এখন ঘরে ঘুমুচ্ছে। একটু পরে তাকে আবার বাইরে যেতে হবে, স্থির চিত্রের কলকাতার নয়, যে কলকাতা অহরহ ব্যস্ততার গজরাচ্ছে, সেই সোরগোলের হৈ হল্লার মাঝখানে। ভীড়ের ভিতরও খানী বাজাতে হবে গাড়ী ছাড়ার। লোক উঠবে, নাববে। অজস্র মুখ, অজস্র মাথা, শুধু সে টিকিট কাটবে, শুধুই টিকিট। অনেক টপৈথ পেরোলেই ওপারের ওমতি, অনেক টপৈথ ছাড়িয়ে এপারের ডিপো। ডোরের ডিউটি শেষ হয়েছে গতকাল, আজ থেকে সুরু হলো বিকেলের। এর পরে সন্ধ্যার; তারো পরে কি রাত্রির ? যে রাত্রি কোনদিন ফুরোবেনা, কিছুতেই না।

সেদিন ঘরের পাঁচ, মুখ দেখবে পরস্পরের; ঘরে-বাইরের সে থাকবে না, কোথাও না। না ঘরে, না বাইরে।

একশ'ষোল টাকায় কলকাতার আকাশ ত্রস্তিক শেষ করবে কণ্ডাক্টার সুবল দাস। কালাসিরুধার গৌরাঙ্গ ॥

কাকদ্বীপে কৃষকবিহীন কিষাণ সম্মেলন

পঞ্চাশ হাজার দর্শকের জন্য আয়োজিত ও বহু বিঘোষিত সভার মণ্ডপস্থল ফাঁকা

(দর্পণের প্রতিনিধি)

কাকদ্বীপের কাঁধে 'লাল' জুজু ভর করেছিল। বোর্ডের দাওয়াইয়ের ধাক্কায় সে জুজু নাকি মুলুক ছাড়া হয়েছে। কাকদ্বীপ 'কিষাণ সম্মেলনে' তারই উৎসব। এ খবর কাগজে কয়দিন ধরে ঘটা করে প্রচার করা হচ্ছিল। তাই কৌতূহল হল। জুজু বিদায়ের পালাটা কেমন জমে তা স্বচক্ষে দেখবার জন্য গাঁটের পয়সা খরচ করে ডায়মণ্ডহারবার থেকে বাসে চাপলাম। অকুস্থলে পৌঁছে দেখি, সে এক এলাহী কাণ্ড।

বিরাট জায়গা জুড়ে সামিয়ানা টাঙানো হয়েছে। সারা মণ্ডপ মাইকে মাইকে আচ্ছন্ন। মণ্ডপের মুকুটমণি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বক্তৃতা মঞ্চ। তাতে এ-আই-সি-সির কায়দায় ফরাস বিছানো। মহাত্মা গান্ধীর বিশেষ একটি পোজের পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতিও যথারীতি বক্তৃতা-মঞ্চের শোভা বর্ধন করছে।

ও হরি। আপনারা বুঝি ধরে নিয়েছেন সম্মেলনের উদ্যোক্তারা দর্পণের প্রতিনিধিকে আদরে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। মোটেই না। বিনা পয়সার খদ্দেরের মত আমি তো বিনা নেমন্তন্নে অনাহূত রবাহূতদের দলে ভিড়ে পড়েছিলাম। তবে সভার এত খুঁটিনাটি বর্ণনা করছি কি করে?

এ বিষয়ে একটা সুবিধা ছিল এই যে, সভা মণ্ডপ ঘেরা ছিল না। তাই আনাচে কানাচে ঘুরে উঁকি মেরে যতটুকু লক্ষ্য করতে পেরেছি, তাই বর্ণনা করছি। তা ছাড়া মাইক তো ছিলই, বক্তৃতা শোনার কোন অসুবিধা হয়নি।

উদ্যোগ আয়োজন সবই পাকা রকমের। সম্মেলন উপলক্ষে ডায়নামো বসিয়ে বিদ্যুতের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। না হবেই বা, কেন? চাষীরা তো আঁধার ঘেরা এঁদো পাড়াগাঁয়ে থাকে। বিশেষ করে ২৪ পরগণার চাষীকে তো সম্মেলনে তাদের এই আঁধার থেকে আলোকের পথে নিষ্ক্রমণের হদিসই বাতলে দেওয়া হবে।

তাই এই বৈদ্যুতিক ব্যবস্থাটাকে চাষীদের ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধির প্রতীক বলে মেনে নিতে কারুরই আপত্তি থাকতে পারে না। এ ব্যাপারে যাঁরা অপব্যয়ের প্রশ্ন তোলেন, তাঁরা নিতান্তই নিন্দুক, এ কথা আমি জোর গলায় বলতে পারি।

যা হোক্, বন্দেমাতরম্ গানের পর সভার কাজ সুরু হল। বক্তৃতা মঞ্চের দিকে তাকিয়ে দেখি, সেখানে মন্ত্রীর মেলা বসে গেছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, রাজ্য মন্ত্রী, রাষ্ট্র মন্ত্রী, ডেপুটী মন্ত্রী প্রভৃতির উপস্থিতিতে আসর সরগরম। স্বয়ং কংগ্রেস সভাপতি হাজির। ভেবে দেখলাম অখ্যাত কাকদ্বীপের চাষীদের বরাত ভাল। না হলে তাদের উদ্ধার করার জন্য এত হোমরা-চোমরাদের পায়ের ধূলো পড়বে কেন।

কিন্তু তখুনি মনে হল—ব্যাপারটা এত সোজা নয়, খবরের কাগজের মতে এ সম্মেলনের "রাজনৈতিক গুরুত্ব" অনেকখানি। 'লাল জুজুরা' আস্তানা ছেড়ে পালিয়েছে। এখন শাস্ত্র মতে সে জায়গা দখল করবেন ব্রহ্মদৈত্যরা। তারই পুরোহিত হচ্ছেন কংগ্রেস সভাপতি।

সম্মেলনের নিকটে সড়কের উপর সুন্দর সাইনবোর্ডে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের উদ্যোগে 'বিরাট' কিষাণ সম্মেলনের ঘোষণা ঝক্ ঝক্ করছে। মণ্ডপে ৫০ হাজার লোকের মত জায়গা করা হয়েছে। কিন্তু সম্মেলন সুরু হতে দেখা গেল মণ্ডপ একরকম ফাঁকা, বিভিন্ন জেলা থেকে যে সব 'কৃষক প্রতিনিধি' এসেছেন, তাঁরাই আসরের শ্রোতা। কৃষক প্রতিনিধিদের মধ্যে বিধান সভার প্রাক্তন ও বর্তমান অনেক এম-এল-এ, এমন কি প্রাক্তন উপমন্ত্রী জনাব আবদুস সত্তারকেও বসে থাকতে দেখা গেল।

কংগ্রেস সভাপতি হিন্দীতে বক্তৃতা দিলেন আর তা তর্জমা করে দিলেন অতুল্যবাবু। সভায় প্রকৃত চাষী খুব বেশী না থাকলেও চাষী মজুরেরাই যে সব, কংগ্রেস সভাপতি সেটা জোর গলায় ঘোষণা করিলেন। আর বল্লেন, যতদিন একজন পর্যন্ত বেকার দেশে থাকবে, ততদিন পর্যন্ত কংগ্রেস বিশ্রাম নেবে না।

খুব ভাল কথা, কিন্তু আমার মত লোকের মনে তখুনি ডি-ভি-সির কর্মীদের আসন্ন ছাঁটাই, ভারত সরকারের আমদানী নীতির জন্যে বহু ছোটখাট প্রতিষ্ঠানের 'লাল-বাতি' জ্বালার দরুণ সেখানকার কর্মীদের বেকারী ইত্যাদি হাজারো রকমের বেয়াড়া প্রশ্ন উঁকি মারছিল। ক্ষুধিত পাষাণের মেহেরালীর মত 'এ সব ঝুট হ্যায়' বলে যদি নেতাদের বক্তৃতায় গোলকধাঁধায় চক্কর মারতে পারতাম তবে হয়তো মনে কিছুটা স্বস্তি পাওয়া যেত।

কংগ্রেস সভাপতির পর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন এবং কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী শ্রীঅজিতপ্রসাদ জৈন বক্তৃতা দিলেন। তাঁদের মুখে নূতন কোন কথাই শোনা গেল না।

প্রথম দিনের সভা শেষে অতুল্যবাবু অবশ্য নাটকীয় ভঙ্গীতে সরকারী কর্মচারীদের ওপর এক-হাত নিলেন। তাঁর মতে সরকারী কর্মচারীরা সমবায় প্রথা, কৃষি ব্যবস্থার 'কিস্যু জানে না'। তীব্র সমালোচনার জন্য তিনি সমবেত প্রতিনিধিদের হাততালিও কুড়োলেন।

অতুল্য ঘোষের ডিক্টেটরী মেজাজ

পরদিন সকালে প্রস্তাব বিবেচনার জন্য 'কৃষক প্রতিনিধিদে'র বৈঠক বসেছে। আমিও হাজির। হোটেলের তক্তাপোষে শুয়ে আগের দিন ভাল করে ঘুম হয়নি। পৌঁছুতে একটু দেরী হয়ে গেছে। পৌঁছেই শুনি (মাইকে স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে) অতুল্যবাবু ধমকের সুরে বলছেন, "আণ্ডু পান্টুদের" জন্য এ সম্মেলন ডাকা হয়নি। প্রস্তাব সম্পর্কে যার যা বলবার আছে বলুন। স্থানীয় সমস্যার কথা তুলে "সম্মেলনের উদ্দেশ্য পণ্ড করবেন না।'

ধমকের চোটে কৃষক প্রতিনিধিরা কাহিল। মুখ দিয়ে বাংলার বদলে ইংরেজী বেরিয়ে পড়ল, এদের বয়ান শুনুন। শ্রী অতুল্য ঘোষের কি একটি কথার জবাবে একজন প্রতিনিধি অনুনয়ের সুরে বল্লেন, "না না আপনাকে contradict করছি না, Sir।" আর একজন বল্লেন, "ভূমিস্বত্ব স্থির করার মেয়াদ আরও extend করলে "administrative difficulty arise" করতে পারে।

শুনে খুব আনন্দ হ'ল। সরকারী পরিসংখ্যানে জানতাম যে বাংলা দেশে শিক্ষিতের সংখ্যা শতকরা ২৫ ভাগ। এর মধ্যে ইংরাজী শিক্ষিতের সংখ্যা শতকরা এক ভাগ হবে কিনা সন্দেহ।

কিন্তু কৃষক প্রতিনিধিরা যে তোড়ে ইংরেজী বলে চলেছেন, তাতে মনে হল, ঐ পরিসংখ্যান নিতান্তই ধাপ্পাবাজী। আর একটা জিনিষ লক্ষ্য করলাম। অতুল্যবাবু এম-এ পাশদের উপর ভয়ানক খাপ্পা। মাঝে মাঝেই বিদ্রূপের সুরে বলছেন, আমার হাতে যখন প্রস্তাবটা পৌঁছাল তখন সেটা দেখেই বুঝলাম, এ কোন এম-এর লেখা। কথায় কথায় তিনি কার উদ্দেশ্যে জানিনা 'আইন পণ্ডিত' বলেও খোঁচা দিলেন। এর কারণ কি ক্ষুদ্র মাথায় ঢুকল না।

বিজয় সিং নাহারের গর্জন

তারপর প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির বৈঠক। উঁকি মেরে দেখলাম নেমন্তন্ন পাওয়া সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরা সেখানেও হাজির আছেন। তখন সবে মাত্র ডাঃ নলিনাক্ষ সান্যাল মশায় সহরে কেন কংগ্রেস কল্কি পায় না তার কারণ সম্পর্কে নরম গরম বক্তৃতা সুরু করেছেন।

দু' এক মিনিটের মধ্যেই বক্তৃতা মঞ্চে একটু অস্বস্তির ভাব লক্ষ্য করা গেল। মনে হল, ডাঃ সান্যালকে যেন থামিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। অতুল্যবাবু একটু উত্তেজিত ভাবেই তাঁকে to the point বক্তৃতা করার জন্য নির্দেশ দিচ্ছেন। সাংবাদিকরা মাথা নীচু করে কি যেন লিখছিলেন।

এমন সময় শ্রীবিজয় সিংহ নাহার সিংহগর্জনে বলে উঠলেন, "সাংবাদিকরা যদি বক্তৃতার নোট নেন, তবে তাঁদের বের করে দেওয়া হবে।" দূর থেকে দেখলাম এ কথা শোনা মাত্র যে কয়জন সাংবাদিক ছিলেন, তাঁরা মুখ লাল করে সভা থেকে বেরিয়ে এলেন। আরও লক্ষ্য করলাম, তাঁদের পিছনে কংগ্রেসের কয়েকজন মাতব্বর লোক কি যেন বোঝাতে বোঝাতে চলেছেন। তাঁদের মধ্যে কি কথা হল জানিনা। কিন্তু দেখলাম সাংবাদিকরা আবার গুটিগুটি সভায় এসে বসলেন। এ দৃশ্য দেখে আমার মনে বিতৃষ্ণার উদয় হল। সভার আনাচ কানাচ ছেড়ে বাইরে চলে এলাম।

বিকেলে গেলাম কৃষি শিল্প প্রদর্শনী দেখতে। দু আনা পয়সা দিয়ে ঢুকলাম। ভীড় হয়েছে মন্দ নয়। নিয়ন আলোয় প্রদর্শনীর মাঠ ঝক্‌ঝক্ করছে। এক জায়গায় দেখলাম চাষী মেয়েরা (সেদিন ছিল কাকদ্বীপে হাটবার) থক্ থকে খদ্দরের শাড়ীর দিকে লুব্ধ চোখে তাকিয়ে আছে। 'কিনবে নাকি' প্রশ্ন করতে একজন চাষী মেয়ে বল্ল "কিনব যে, পয়সা কোথায়?" আমি নিজে একটি খদ্দরের শাড়ীর দর করলাম। শুনলাম ১৮৲ টাকা এক পিস্। শুনেই পিছু হটতে হল। বলতে লজ্জা নেই, পকেট যে একেবারে গড়ের মাঠ।

অনেক কংগ্রেস নেতাই দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করলেন, এত পয়সা খরচ হোল, এত পরিশ্রম গেল, এত ঢাক-ঢোল পেটান হোল, কিন্তু "বিরাট কৃষক সম্মেলনে" কৃষক আনা গেল না।

যে কয়জন এসেছিলেন তাঁরা অবশ্য চমৎকৃত হয়ে ফিরেছেন—বড় বড় গাড়ীর বহর দেখে। কয়েক হাজার টাকা খরচ করে একটা বিরাট গাড়ীর পার্ক (নিশ্চয়ই কৃষকদের সুবিধার্থে) তৈরী করা হয়েছিল।

নেতাদের অনেকেই এবং তাঁদের বড় বড় ব্যবসাদার বন্ধুরা রোজ কলকাতা থেকে যাতায়াত করতেন। সুন্দরবনের বুভুক্ষু কৃষক নর-নারী নানা রং ও আকারের পথ চলার যন্ত্রগুলোকে দূর থেকে দেখে নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিয়েছেন। কৃষক সম্মেলনে তাই দামী দামী গাড়ী দেখা গেছে কিন্তু কৃষক বড় একটা চোখে পড়েনি—এক হাটবারের দিন ছাড়া। ঐদিনও তাঁরা ভেতরে প্রবেশ করবার সাহস সঞ্চয় করতে পারেন নি। মণ্ডপ ও প্রদর্শনীর আশেপাশে ঘুরে দূর থেকেই বিদায় নিয়েছেন।

"চলে যাচ্ছেন কেন?" জিজ্ঞেস করাতে তাঁদের একজন বল্লেন: 'ভেবেছিলাম ডাঃ রায়কে দেখবো। তিনিই এলেন না, এদের বক্তৃতা আর কি শুনবো।"

শিলংএর চিঠি

'অনগ্রসর' রাজ্য আসামের সমস্যা

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

আসাম ভারতবর্ষের মধ্যে এক 'ব্যাকওয়ার্ড' রাজ্য এরকম একটা অখ্যাতি আছে। কথাটা যে খুব মিথ্যে নয়, তার প্রমাণও দেওয়া যায় অনেক। ধরুন রাজধানী শিলং সহরের প্রধান রাস্তাগুলো দিয়ে হেঁটে গেলেই দেখতে পাবেন এখন গোটা দুই তিন সরকারী ইমারত তৈরী প্রায় শেষ হয়ে এলো। বেশ কয়েক লাখ করে টাকা ঢালা হয়েছে কিন্তু তাদের বহিরাকৃতি দেখলে আপনি চমকে উঠবেন। এমন কিম্ভুত চেহারার বাড়ী আপনি কোথাও দেখবেন না আজকাল। মঁসিয়ে কর্বুসিয়েরর নাম ছেড়ে দিন, স্থাপত্য-সৌষ্ঠবের অ আ ক খ র সঙ্গেও যে আসামের পরিচয় আছে—বিশ্বাস করা শক্ত হয়ে পড়বে। এরকম উদাহরণ আরো অনেক ক্ষেত্র থেকেই খুঁজে বের করা যায় তবে আজ আর খুঁজবো না। আসাম সরকারের কর্ণধারগণই নানা বক্তৃতা বিবৃতিতে, বিশেষতঃ কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে নানা অজুহাতে সাহায্যের জন্য ধারস্থ হবার সময়, নিজেদের রাজ্যকে 'ব্যাকওয়ার্ড' প্রমাণ করবার জন্য সাক্ষ্য সাবুদ হাজির করেন। কিন্তু সব বিষয়ে যে আসাম পেছিয়ে নেই সেই কথাটাই এখন বলা দরকার হয়ে পড়েছে।

●

ফেব্রুয়ারী মাসের তৃতীয় সপ্তাহে হঠাৎ দেখা গেল গৌহাটি আর শিলঙে চিনির দাম বাড়ছে। মাসের শেষাশেষি দাম চড়ে গেল প্রায় দুগুণ—তা'ও পাওয়া শক্ত। এমন কি আসাম বিধান সভার ক্যাণ্টিনওয়ালা সদস্যদের জানিয়ে দিলেন যে বিনা চিনির চা দেওয়া ছাড়া তার অন্য উপায় নেই। আসামের জনসাধারণ পশ্চিম বাংলার চেয়ে অনেক বেশী সহিষ্ণু—এখানে জিনিষপত্রের দাম বাড়লে কারো গায়ে লাগে বলে মনে হয় না। কোন মিছিল বেরোয় না, সভাসমিতি হয় না; সুতরাং গরম বক্তৃতাও হয় না। এখানকার রাইটার্স বিল্ডিং জনসাধারণের থেকে পাঁচ হাজার ফুট উঁচুতে তাই কোন অভিযান সেদিকে চলে না আর ট্রাম বাস পোড়াবার রেওয়াজ আদৌ নেই। ট্রাম ত নেই-ই, বাসও খুব কম। তবে এবার চিনি অদৃশ্য হওয়ার পর দু একজন জিজ্ঞেস করছিলেন "কি হোল, চিনি পাওয়া যায় না কেন?" বোধ হয় বিধান সভার অধিবেশন চলছিল বলে সরকারও এই প্রশ্নটা একেবারে এড়াতে পারেন নি। সাপ্লাই দপ্তরের বড়কর্তা নাকি গৌহাটিতে মাড়োয়ারী ব্যবসাদারদের টেলিফোন করে খেদোক্তি করেন যে, তিনি মুখ দেখাতে পারছেন না, অ্যাসেম্বলি চলছে তখনই এরকম একটা গোলমাল হয়ে গেল। ব্যবসায়ীদের সঙ্গে মিটিঙের দিন ঠিক হোল।

তার মধ্যেই ব্যবসায়ীরা লক্ষ লক্ষ টাকা লুটে নিয়ে নিলেন। আসাম সরকারের সাহায্যে ব্যবসায়ীরা আসামে বিক্রীর উদ্দেশ্যে রেল ওয়াগন ভর্তি চিনি আমদানী করেন। হঠাৎ উত্তর বাংলায় চিনির ঘাটতি হওয়ায় আসাম থেকে চিনি আবার রেল ওয়াগন আর লরী বোঝাই হয়ে ফেরৎ রাস্তায় চলতে আরম্ভ করে। ফলে উত্তর বাংলায় ত বেশী দামে চিনি বিক্রী হয়ই, আসামেও অভাব সৃষ্টি করে দাম চড়িয়ে পুষানো হক চোরাবাজারের দরে ছাড়া হয়। এসব ব্যাপারে আসামে কোন 'ব্যাক-ওয়ার্ডনেস' পাবেন না, ব্যবসায়ীরা অন্য যে-কোন রাজ্যের মুনাফাবাজীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে পারে।

●

আত্মপক্ষ সমর্থনে সরকার আর ব্যবসায়ীরা অনেক কথা বলছেন। আসাম সরকার প্রেসনোট বের করে জানালেন যে কিছু দিন আসামে চিনি আসে নি, তার ফলেই এই মূল্যবৃদ্ধি এবং সরকারের সরাসরি দায়িত্ব এই ব্যাপারে কিছু নেই, কারণ চিনির উপর কোন কণ্ট্রোল নেই। তবে পরোক্ষভাবে আরো চিনি আমদানীর বন্দোবস্ত করে সরকার ব্যবস্থার উন্নতি বিধানের চেষ্টা করছেন। ব্যবসায়ীদের তরফ থেকেও একই কথা—কণ্ট্রোল যখন নেই, যেখানে বেশী মুনাফা পাওয়া যায় সেখানে বিক্রী করতে দোষ কি? আর তা ছাড়া কে গৌহাটির বাজারে চিনি কিনে উত্তর বাংলায় চালান দিলো সে গোয়েন্দাগিরির ভার ত তাদের উপর নয়। আইনের চুলচেরা তর্কে তাদের বক্তব্যে গলদ খুঁজে বের করা কঠিন কিন্তু কথা থেকে যায় যে কি উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারগুলিকে এসেনশিয়াল কমোডিটিস অ্যাক্ট পাশ করে নানা ক্ষমতা দিয়েছেন? কণ্ট্রোল নেই এই অজুহাতে যদি স্বার্থান্ধ ব্যবসায়ীর দল এক জায়গায় সাময়িক অভাবের সুযোগ নিয়ে অন্যত্র কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে একই সঙ্গে দুই তরফেই মুনাফা লুটতে থাকে তাহলে সমাজবাদী সরকারের দায়িত্বও কি দোষারদের মত ঐ 'কণ্ট্রোল নেই' পদকীর্তন করেই শেষ? এবার আসামে তাই দেখা গেল এবং সেজন্য আশঙ্কা হয় সরকারের উপর জনমতের চাপ না পড়লে ভবিষ্যতে অনুরূপ যে কোন সঙ্কটে আমলাতন্ত্র একই ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে।

●

ব্যবসায়ীদের শুধু দোষ দিই কেন? তারা ত সাইনবোর্ড ঝুলিয়েই বসেছে,—তারা ব্যবসা করে খায় এবং তাঁদের মধ্যে যাঁরা মুনাফা গ্রহণ করেছেন— লোককে যত ঠকানো যায় তত লাভ—তাঁরাও ত ব্যবসা ছাড়া অন্য কিছু করছেন না। সাইনবোর্ড ছাড়া ব্যবসার নজীরও ত আছে। যা ধরুন সাইনবোর্ড আছে জনসেবার, প্রতীক গান্ধীটুপি। একটা উদাহরণ দিই। শিলঙে দেখবেন পাহাড়ের পর পাহাড়ে পাইন গাছের বন সাফ করে নতুন বাড়ী তৈরী হচ্ছে। প্রায় সবই সরকারী অফিসারদের নিজেদের বসতবাড়ী—সরকারের থেকে হাউসিং লোন নিয়ে বাড়ী তৈরী করে আবার সরকারী অফিসকে ভাড়া দেওয়াই রেওয়াজ হয়ে উঠেছে। দু এক জন মন্ত্রীও নিজস্ব বাড়ী তুলেছেন। নতুন বাড়ী কিন্তু তাতে তাঁরা থাকেন না। তাঁরা নিজের বাড়ী মোটা ভাড়ায় সরকারী অফিসের কাছে ভাড়া দিয়ে বাস করেন সরকারের দেওয়া বাড়ীতে। নিজের বাড়ীতে বাস করলে নিয়ম অনুযায়ী মাত্র আড়াই শ' টাকা ভাড়া বাবদ সরকারের থেকে পাওয়া যায়। তার চেয়ে অনেক বেশী টাকায় নিজের বাড়ী ভাড়া দিয়ে সরকারী বাড়ীতে থাকাই লাভজনক। সরকারী বাড়ীতে থাকলে আসবাবপত্র বাবদ সরকারী খাতে খরচেরও কোন লাগাম নেই। সুতরাং দু দিকেই লাভ। মাত্র এক হাজার টাকা মাইনে পান মন্ত্রীরা (মুখ্যমন্ত্রী দেড় হাজার) সগর্বে বলা হয় কিন্তু মন্ত্রীদের বাসা খরচে সরকারের কত টাকা যায় সেকথা কখনো কাউকে বলতে শোনা যায় না।

দর্পণ

(একমাত্র বাংলা সংবাদ সাময়িকী)

চাঁদার হার

ত্রৈমাসিক——তিন টাকা

ষাণ্মাসিক——ছয় টাকা

বার্ষিক——বারো টাকা—

টাকা কড়ি পাঠাবার ঠিকানা—

ম্যানেজার, দর্পণ

৭নং চিত্তরঞ্জন এভেনিউ

কলিকাতা—১৩

আন্তর্জাতিক সংবাদ পর্যালোচনা

[নিজস্ব পর্যবেক্ষক]

পরবাষ্ট্র মন্ত্রীদের বৈঠকের জন্য আমেরিকার প্রস্তাব চঠাৎ গুরুণ করে রুশিয়া খ্রীশ্চেভদেকে হয়া ঔপরে ফেলেছে। কোনো সন্দেহ নেই, নিরাস্ত্র বৈঠকাবনা পড়লে, অর্থাৎ বিশ্ব জনমতের চাপে ছাড়া, আমেরিকা রাষ্ট্রপ্রধানদের বৈঠক আহ্বানে সম্মতি দেবে, না।

বলা এই যে, রুশিয়া যখন রাষ্ট্রপ্রধানদের বৈঠকের প্রস্তাব করল এবং বুটেন ও ফ্রান্সে তার সমর্থনে প্রবল জনমত দেখা গেল, খ্রীশ্চেভল পাল্টা প্রস্তাব হিসেবে পরবাষ্ট্র মন্ত্রীদের বৈঠকের উপর জোর দিয়ে বসল। খ্রীআইসেনহাওয়ারকে রাষ্ট্রপ্রধানদের বৈঠকের প্রস্তাব সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, বিশিদ্ধ ধরার পূর্বে রাষ্ট্র-প্রধানদের অন্তত জানা চাই, কি কি বিষয় তাঁরা আলোচনা করবেন। এই বিষয়গুলো স্থির করবার জন্যই পরবাষ্ট্র মন্ত্রীদের বৈঠক পুরোজন।

অনেক পত্রালাপের পর যখন রুশিয়া আমেরিকার প্রস্তাব মুলে করে বসল, খ্রীজলেস তাঁর সুর পাল্টাতে সুরু করলেন। তিনি বললেন, এবং খ্রীআইসেনহাওয়ারও ঘোষের সহিত তাঁর বক্তব্য সর্মথন করলেন যে, রাষ্ট্র-প্রধানদের বৈঠকে অন্তত করেকটি গুরুত্বপূর্ণ গুপ্ত ঐক্যমত হবে এ নিশ্চয়তা পাবার পূর্বে তাঁদের বৈঠক যওয়া অনুচিত।

শান্তিতে, রুশিয়া পিছু হটবার চেষ্টা করছে। ইতিমধ্যে, বুটিশ ও কানাডী সরকারী মহলে রুশিয়ার পরবাষ্ট্র মন্ত্রীদের বৈঠকের প্রস্তাব গুরুণে উৎসাহ-জনক আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছিল।

কিন্তু খ্রীজলেস যেই খাপছা দিয়ে সুরু করল অমনি বুটিশ ও কানাডী সরকারী মহলে অনাগ্রহ প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। বুটিশ কমন্স সভায় এ নিয়ে খ্রীঅ্যাক-মিলানকে কঠিন অবস্থা সামাল দিতে হয়েছে।

●

রাষ্ট্রপ্রধানদের বৈঠকের কর্তব্য সম্বন্ধে আমেরিকার মতের সঙ্গে রুশিয়ার মতের প্রধান পার্থক্য এই যে রুশিয়া চায় যে রাষ্ট্রপ্রধানরা প্রথমে বিভিন্ন বিষয়ে সমঝোতায় আসুন এবং পরবাষ্ট্র মন্ত্রীদের নির্দেশ দিন যাতে এঁ সমঝোতা অনুসারে কাজ করা হয়। রুশিয়া আগে যে এ বৈঠকে সব বিষয় নিষ্পত্তি হবে না, কিন্তু ১৯৫৫র জেনিভা বৈঠকের পর যেমন ঠাণ্ডা লড়াইয়ে কিছু ভাটা পড়েছিল, তেমনি আবার কিছু সমঝোতার পক্ষে অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি হবে। কোনো কোনো বিশ্লেষের হয়ত পাকাপাকি মীমাংসাও হতে পারে।

রাষ্ট্রপ্রধানদের বৈঠকে কি কি বিষয় আলোচিত হওয়া উচিত সে সম্বন্ধেও দুটি দেশের মধ্যে আকাশপাতাল মতভেদ আছে। গত সপ্তাহে আমরা উল্লেখ করেছিলাম যে রুশিয়া প্রধানতঃ নয়টি বিষয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। এর করেকটি সম্বন্ধে আলোচনার জন্য আমেরিকা একেবারেই রাজি নয়। অন্য পক্ষে, আমেরিকা প্রধানতঃ চারটি বিষয়ের নিষ্পত্তি চায় বলে মনে হচ্ছে: (১) জার্মানীর পুনর্বিলন; (২) পূর্ব ইউরোপকে কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রগুলো যাতে "নিজেদের ইচ্ছামত সরকার গঠন করতে পারে" তার ব্যবস্থা; (৩) নিরস্ত্রীকরণ আর আবিষ্কার্য্যে অল্প বিস্তের এবন নির্ভুল গণ্য আবিষ্কার যাতে গোপনে আণবিক অস্ত্রের পরীক্ষা অসম্ভব হয়; এবং (৪) যুদ্ধের উদ্দেশ্যে মহাণুর ব্যবহার নিষিদ্ধ করা।

আমেরিকা যদি এগুলো আলোচনার পুরোজনীয়তা সম্বন্ধে তার মত না পরিবর্তন করে, রাষ্ট্রপ্রধানদের বৈঠক অসম্ভব হবে, বিশেষ করে যদি সে পুরাস্থে পরবাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠকে ফটকো পুতিষ্ঠের জন্য জিদ করে। পূর্ব ইউরোপের রাষ্ট্র ব্যবস্থা কি হবে, তা নিয়ে রাষ্ট্রপ্রধানদের বৈঠকে আলোচনা হওয়ার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে। তার মতে এই পর্ব হল স্বাধীন দেশের উপর বৈদেশিক হস্তক্ষেপ। জার্মানীর ঐক্য সাধনও জনিবার্য বলে করে দুটি জার্মান দেশের নিজস্ব ব্যাপার। তবে সে নিরস্ত্রীকরণ ও যুদ্ধের জন্য মহাণুর ব্যবহার নিষিদ্ধ-করণ সম্বন্ধে আলোচনা করতে প্রস্তুত।

কিন্তু বিভিন্ন মহলে, এশিয়া ও ইউরোপের বেশওলোর কথা ছেড়েই দিলাম, এমন কি বুটেন, ফ্রান্স, কানাডা ইত্যাদি পশ্চিমী দেশগুলোতে রাষ্ট্র-প্রধানদের বৈঠক সম্বন্ধে জনমত ক্রমেই এত প্রবল হচ্ছে যে অবশেষে আমেরিকাকেও নতি স্বীকার করতে হবে। আমেরিকার ইতিবাচেই কথা উঠেছে যে অনিচ্ছাসত্ত্বেও খ্রীজলেসের দুনিয়ার জন মতের চাপে তাঁর মত পাল্টাতে বাধ্য হবার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।

এই পর্যালোচনা লিখবার সময় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া চুক্তিভুক্ত দেশগুলোর বৈঠক চলছে ব্যাসিলাগ। এই চুক্তির বিশোষত উদ্দেশ্য এশিয়াতে কমিউ-নিষমের প্রসার বন্ধ করা। পশ্চিমী দেশগুলো এ সুযোগে রাষ্ট্রপ্রধানদের বৈঠক সম্বন্ধে তাঁদের মতপার্থক্য দূর করবার চেষ্টা করবেন। আর কয়েক দিনের মধ্যেই পশ্চিমীদের মনোভাব পুরোপুরি প্রকাশ পাবে বলে আশা করা যায়।

তাঁদের আলোচনার ফল যাই হোক না কেন, বিশ্বের জনমতের নিকট ইতিমধ্যেই রুশিয়ার একঘরে করা বিরাট জয় সুচিত হয়েছে।

আমেরিকার উদ্দেশ্যঃ সীয়াটো ন্যাটো ও বাগদাদ চুক্তির সমন্বয়

উত্তর আতলান্তিক চুক্তি সংস্থার গত ইউরোপীয় সম্মেলনে বুটেন রাখি হয়েছে তার দেশে আমেরিকার আণবিক অস্ত্রের জন্য ঘাঁটি কায়েত। অন্যান্য কয়েকটি ইউরোপীয় দেশও সম্বরত শীঘ্রই বুটেনের পথই অনুসরণ করবে। বাগদাদ চুক্তি ছোটোর আভাস বৈঠকেও আমেরিকা আর এক ধাপ এগিয়েছে, রুশিয়াকে আণবিক মাধ্যমের ঘাটি দিয়ে বিরাধার পরিকল্পনায়।

এখন বলেছে, দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় ছোটোর বৈঠক। ওয়াশিংটন ও ব্যাসিলা থেকে যে খবর আসছে, তাতে আমেরিকার নতুন একটি উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকছে না। খ্রীজলেসের আধুনিকতম রহৎ পরিকল্পনা হল, পাকিস্তান, থাইলাণ্ড ও ফিলিপাইন-এ আণবিক অস্ত্রের ঘাঁটি তৈরী করা এবং এই চুক্তির সহিত ন্যাটো এবং বাগদাদ ছোটোর সামরিক সমন্বয় সাধন। অর্থাৎ, পশ্চিম ইউরোপে যদি কোন কারণে যুদ্ধ বাধে, পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার চুক্তিভুক্ত দেশগুলোও তাতে জড়িয়ে পড়বে।

এ ব্যাপারেও রুশিয়ার প্রচার এশীয় দেশের জনসাধারণের উপর পুরুর প্রভাব বিস্তার করছে। বহো ও তাসবও বেডিও মারফৎ খ্রীজলেসের উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে রুশিয়ার ভোর প্রচার চলছে।

সীয়াটো বৈঠকের প্রাক্কালে তাসওও বেডিও থেকে যে বিবৃতি প্রচার করা হয় তার মূল বক্তব্য হচ্ছে, এশীয় দেশগুলোর রুশিয়া দ্বারা আক্রান্ত হবে এমন কোনো শঙ্কা নেই। আমেরিকা নিজের দেশকে বাঁচাবার জন্য এশীয় দেশগুলোকে তাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত করতে চাইছে।

তাতে যদি এই দেশগুলো স্বংস হয়ে যায়, তাতে আমেরিকার কি? আমেরিকা তার যুদ্ধে আণবিক আক্রমণ চালিয়েছে—ইউরোপে নয়, এশিয়ার একটি দেশে—জাপানে। তাসওও বেডিওতে বলা হয়েছে: "এশিয়াবাসীদের জন্য দুশ্চিন্তার কারণ নাই। এদেশগুলোতে যত লোক বাস করা উচিত তার চাইতে অনেক বেশী আছে। কিছু বয়সেও বিশেষ কিছু আসে-যায় না।"

রুশিয়া প্রস্তাব করেছে যে, এশিয়াতে শান্তির চুক্তির ভোক এবং সমস্ত রহাদেশকে আণবিক অস্ত্রমুক্ত এলাকা বলে ঘোষণা করা হোক। এশীয়াবাসীদের উপর এই প্রস্তাবের প্রভাব অবশ্যম্ভাবী। আমেরিকা যদি এ মনোভাব অস্বীকার করে, সে তার অপূরণীয় ক্ষতি করবে। খ্রীজলেসকে যে নিয়ন্ত্রণ করবার প্রয়োজন আছে।

ইন্দোনেশিয়ার অন্তর্যুদ্ধে পশ্চিমীদের চক্রান্ত

পক্ষকাল হল ইন্দোনেশিয়ার বিদ্রোহীরা পাল্টা সরকার গঠন করেছে। তার সঙ্গে যুবাজার পাঁয়াচ্ছে বিদ্রোহীরা তাদের ঘাঁটি তৈরী করে ডাঃ সুকর্ণকে বলে আনবার চেষ্টা করছে। –

বিভিন্ন দেশে বিদ্রোহের প্রতিক্রিয়া যা হয়েছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আমেরিকা এবং সেই সঙ্গে বুটেন, ফ্রান্স এবং নেদারল্যাণ্ডস-এর সমর্থন কোন দিকে। রুশিয়া থেকে প্রচার করা হচ্ছে যে পশ্চিমীরা শুধু যে বিদ্রোহীদের অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করছে তাই নয়, নৌবহর সমাবেশ করে ডাঃ সুকর্ণের সরকারকে পরোক্ষে হুমকি দিচ্ছে। আমেরিকা থেকে এ অভিযোগ সরাসরি অস্বীকার করা হয়েছে।

আমেরিকার নেতৃত্বে পশ্চিমীরা যে দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় চুক্তি করছে, তার প্রধান দুর্বলতা এই যে, ভারত, বর্মা, সিংহল ও ইন্দোনেশিয়াকে তাতে ভিড়ানো যায় নি। একটি দেশ তাদের নিরপেক্ষ নীতি অনুসারে কোনো পক্ষেই যোগ দিতে অস্বীকার করেছে।

●

আমেরিকা অনেক চেষ্টা করেছে, যাতে ভারতকে দলে টানা যায়। সপ্তম অঞ্চলে ভারতের প্রভাব সর্বাধিক। আমেরিকা কাশ্মীর ও গোয়ার ব্যাপারে ভারতকে বেকায়দায় ফেলেও তার কাজ হাসিল করবার প্রচেষ্টা করেছে। কিন্তু শ্রীনেহেরুকে তাঁর নীতি থেকে বিচ্যুত করা সম্ভব হয় নি।

ভারতের পরেই গুরুত্বপূর্ণ স্থান ইন্দোনেশিয়ার। সেখানে ডাঃ সুকর্ণের নেতৃত্বে নিরপেক্ষ নীতির সম্পূর্ণ সমর্থক সরকার ইন্ডিনিয়ার জুয়াগ্রার প্রধান মন্ত্রিত্বে পরিচালিত হচ্ছে। বেদারল্যাণ্ডস-এর সঙ্গে পশ্চিম ইরিয়ান নিয়ে ইন্দোনেশিয়ার বিবাদ বহুদিনের। তিন হাজার দ্বীপ (যা নিয়ে বর্তমান ইন্দোনেশিয়া গঠিত) ছাড়েও নেদারল্যাণ্ডস বিদ্যুতেই পশ্চিম ইরিয়ান ছাড়তে রাজি হয় নি।

কয়েক মাস পূর্বে ইন্দোনেশিয়া সরকার ইন্দোনেশিয়ায় ডাচ সম্পত্তি ও কারবার পরিচালন ব্যবস্থার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেয়। উদ্দেশ্য ছিল, ডাচদের উপর চাপ সৃষ্টি করা।

পশ্চিমীদের সমর্থক কিছু সামরিক অফিসার এই গোলমালের সুযোগে সুবাত্রাও বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং পাল্টা সরকার স্থাপন করে। তাদের প্রধান উদ্দেশ্য হল যাতে ডাঃ সুকর্ণ তাঁর আতীয় কাউন্সিল থেকে কমিউনিষ্টদের বার দেন এবং আমেরিকার সমর্থক এবং কমিউনিষ্ট-বিরোধী ডাঃ হাতার নেতৃত্বে নতুন সরকার গঠনের অনুমতি দেয়।

●

ডাঃ সুকর্ণর পতন হলে এবং ডাঃ হাতার নেতৃত্বে নতুন সরকার গঠিত হলে, আমেরিকা তার এশীয় নীতির সফলতার দিকে অনেক দূর এগিয়ে যাবে। দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় চুক্তির একটি বড় ফাঁক দূর করা সম্ভব হবে। চীন, রুশিয়া ও উত্তর ভিয়েতনামকে অন্তর্বিবাদ ক্ষেত্রে যাবে। সর্বোপরি, চীন ও সিংহলের উপর নতুন করে চাপ সৃষ্টি করা যাবে যাতে তারা তাদের নিরপেক্ষ নীতি বর্জনে পাকিস্তান ও থাইল্যাণ্ডের মত আমেরিকার বশ্যতা স্বীকার করে।

ফিরোজ খাঁ নুনের হিটলারী হুঙ্কার

হিটলার একদা বিশ্বজয়ের স্বপ্নে বিভোর ছিলেন। বলেছিলেন, "বাধার চাই না, চাই 'লেবেনস্‌রাম'।" অনেক দেশ তিনি বিশ্বজয় করেছিলেন, কিন্তু বিশ্ব-জয়ের স্বপ্ন তাঁর সফল হয় নি। যাঁদেরকে বুটের নীচে পিষে মারবেন বলে মত করেছিলেন, তাঁদের বুটের চাপেই তাঁকে মরতে হয়েছে।

হিটলার মরেছে, কিন্তু পাকিস্তানের নুন সাহেব বুঝিয়ে দিচ্ছেন হিটলারী নীতি কোনো কোনো মহলে এখনও বেঁচে আছে। তিনি হিটলারী হুঙ্কার অনুকরণ করে বলেছেন, "বাধার পাকি-স্তানের চাই না, চাই 'লেবেনস্‌রাম'।"

নুনের সুখ এখনও অবশ্য হিটলারের সর্বগ্রাসী ক্ষুধার রূপ নেয় নি। আপাততঃ তাঁর কাশ্মীর দখলেই চলবে। পথের কাঁটা ভারত। তাই ভারতকে কানু করতে হবে। আর সে জন্যেই তো তাঁর চাই কাবান, গোলা-বারুদ।

পাকিস্তান জাতীয় সভার পরিবারের বৈঠকে তাঁর উদ্দেশ্য তিনি খোলাখুলি বলেছেন। অন্য কয়েকজন তাঁদেরকে নেতাও তাঁর সঙ্গে সুর মিলিয়ে অবকলো ভাষণ দিয়েছেন। আর চতুর্দিক থেকে করতালি ধ্বনি হয়েছে।

বিদেশ দেশের স্বাধীনতা আমেরিকার কাছে বন্ধক রেখে এ সব নেতারা কাশ্মীরীদের স্বাধীনতার জন্য বিশ্ব অনুপাত করেছেন। ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধের হুমকিও বেশ সমানাকী করে দিয়েছেন।

নুন বলেছেন "গুরাক বিশ্বের ফলে আমরা যদি কাশ্মীর না পাই, আমি আপনাদেরকে জানাব আমি কি পন্থা অনুসরণ করতে চাই। পাকিস্তান গরীব দেশ। তবুও আমাদের প্রত্যেক মনুষের, খাবারের নয়। আমাদের সামরিক শক্তি বাড়াতে হবে। দরকার হলে, দেশের উপর ট্যাক্সের বোঝা বৃদ্ধি করব।"

●

পাকিস্তানী নেতারা মাঝে মাঝেই দেশের জনসাধারণের বিরুদ্ধাবের পাত্র হয়ে থাকেন। যে নেতারা দেশের স্বার্থ-বিরোধী কাজ করেন, ওঁরা তাদের তাগের দিবস। জনতার ক্রোধ থেকে বাঁচবার উপায় হিসেবে তাঁরা এবার তোলেন রুশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ছিমির। এর পূর্বেও অনেকবার তা করা হয়েছে। কিন্তু নুন সাহেবের এবার যতটা সম্পাদীন হয়েছে আর কখনও তা হয় নি। ভারত এতে তীব্রসন্তুষ্ট হয়ে পড়বে, নুন অতটা আশাবাদী নন। কিন্তু কোনো সন্দেহ নেই, হিটলারের অভিযানগা থেকে পাকিস্তানের আর পুধান শত্রুর চৈতন্যোদয় হয় নি।

●

নুন সাহেব হুমকি আবার পাকি-স্তানের ঘোসর আমেরিকা ও বুটেনকেও দিয়েছে। এই কিছু দিন পূর্বে আজাদ বাকপাকী মোটর্ক বৈঠকে নুন সাহেব আমেরিকার নিকট আবদার তুলেছিল, "ভারত এক্ষেত্রে রুশিয়ার দলে, তাকে পক্ষাদিকী পরিকল্পনা সফল করবার জন্য ধ্বং দিচ্ছ কেন?" নুনের কথায় আমেরিকার নিজস্ব পূর্ব নির্ধারিত বৈদেশিক নীতি আছে।

নুন সাহেবের আবদার

আমেরিকা পাকিস্তানকে যুদ্ধের রসদ যোগাচ্ছে অঢেল। অধিকন্তু তার বাজেটের একটা বিরাট কাঁক তো যোদ্ধার সম্ভব হচ্ছে শুধুমাত্র আমেরিকার চলায়ে। এই চলায় ও যুদ্ধের রসদ নিয়ে পাকি-স্তানের এত গুমানাদি। নুন আবার আবার তুলছেন, আমেরিকার কাশ্মীর আদায়ের ব্যাপারে চাপ দাও; নইলে সব চুক্তি (অর্থাৎ, বাগদাদ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া) থেকে আমরা বেরিয়ে আসব। বুটেনকেও ভয় দেখান হয়েছে, যাতে সে ভারতের নিকট অস্ত্র-শস্ত্র না এরোপ্লেন বিক্রয় না করে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া চুক্তির ব্যাসিলা বৈঠকে যে পাকিস্তান বিসলেছে আমে-রিকার কাছে তার আবার আবার তুলবে—"ভারতকে ধ্বং দিও না, আমাকে আরও আণবিক ও সামরিক সাহায্য দাও।" এবন কি খ্রীজলেস যদি নরাসরি প্রস্তাব করেন তিনি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া চুক্তিভুক্ত দেশগুলোতে আণবিক অস্ত্রের ঘাঁটি বসাবেন, নুন সাহেব সোল্লাসে তা গ্রহণ করবেন।

অদ্য শুভউদ্বোধন
মেট্রোপলিটান শিক্ষায়তন নিবেদিত
শরীর ঠিকরে
মানময়ী গার্লস স্কুল
পরিচালনায় হেমেন্দ্রকুমার চন্দ ও রাজলক্ষ্মী সরকার
রূপায়ণে : অরুন্ধতী, উত্তমকুমার, ভানু বন্দ্যোঃ
মলিনা, অহর, বীরাজ, অহর রায় ও কমলা মুখার্জি
শ্রী ২।। ৫৯, ৯ | প্রাচী ২৯, ৫৯, ৮৯ | ইন্দিরা ৩, ৩, ৯ টার

ক্রাফট এম, জি, কাগজ
৩৯ গ্রাম ও তার ওপর
সাধারণ চলতি সাইজে ও রীলে পাওয়া যায়
বর্তমানে তৈরী হয় :
বোর্ড : ডুপ্লেক্স, লাল এবং রঙীন : এ্যাম্বারডিন্ড, আর্ট : ব্রাউনফেস : ব্রিষ্টল : ফ্রেঞ্চ পাস : বিন :
কাগজ : হোয়াইট শোয়ার : ডিপ্লেক্স শোয়ার : লাক্সহাইড, রিব্ড, সাদা এবং রঙীন : ফি ইলো : এম. জি. ফি ইলো : এম. কি. থ্রু ক্যাওেল : এম. জি. বাদামী, হোয়াইট মিল্কি: ব্লাড সাইডড্, ভাল কোয়ালিটি : কীব লেড্, ভাল কোয়ালিটি: সাদা ব্যাগ এবং বক্স : অফসেট মিল্কি: একাউন্ট বুক।
লাভ টেক্স ইণ্ডাস্ট্রিজ
রোটাস ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ
ডালমিয়ানগর, বিহার

ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলে অনুষ্ঠিত সারা ভারত ভাষা সম্মেলনটী যে সাম্প্রতিক কালের এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সে বিষয়ে কারুরই কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই; অবশ্যি ইংরাজির ভবিষ্যৎ কী হবে এ প্রশ্নের ওপর বিভিন্ন বক্তা যা বলেছেন তার সাথে সবাই একমত নাও হতে পারেন।

এই সম্মেলনে বক্তাদের মধ্যমণি ছিলেন শ্রীরাজাগোপালাচারী, আর এটা খুব ভুল বলা হবে না যে সম্মেলনের সাফল্য অনেকাংশে তাঁরই উপস্থিতির দরুণ। সম্মেলন উদ্বোধনের অনেক আগে থেকেই জন-সমাবেশ সুরু হয়। আর কর্মকর্তারা করে যে নিরপ্ত করে মনে হয় তাদেই করেছিলেন; তা না হলে ভীড় রোধা দায় হ'য়ে দাঁড়াত।

যাই হোক বক্তৃতা যাতে ঘাইরে দাঁড়িয়েও অনেক লোক শুনতে পায় তার ব্যবস্থা রয়েছিল। হলের মধ্যে যাঁরা আসনা পেয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে বাঙালী ছাড়া, দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতীয়রাই অন্যতম ছিলেন। প্রতি-নিধিদের মধ্যে ছিলেন বিভিন্ন ভাষাভাষী অঞ্চলের প্রতিনিধি, যেমন তামিল, তেলুগু, কানাড়ি, আসামীয়া, বৈষিণী, পাঞ্জাবী, সিন্ধি, গুজরাটী ও মারাঠী। অর্থাৎ, হিন্দী ছাড়া অবিকাংশ ভাষাবিই এই সম্মেলনে প্রতিনিধিত্ব করেছিল।

হিন্দি-ভাষার বিরুদ্ধে ইতিপূর্বে অনেক সভা সমিতিই হয়ে গেছে ভারতের বিভিন্ন জায়গায়; কিন্তু এক অখণ্ড ভারত সম্মেলনের অনুষ্ঠাতা আর কোথাও হতে পেরেছে কিনা সন্দেহ। এই সম্মেলনের প্রেসিডেন্ট পদে অতি উৎসাহী হিন্দি প্রচারকারী বিরেন্দ্রেলাল ধবরাজ শ্রীরাজাগোপালাচারী তাঁর বক্তৃতা সারুকল পরিচালনা করে বলেন। তিনি বুঝিয়ে দেন যে, ইংরাজীকে বিদ্যার্থীর ভাষা বলা ও হিন্দিভাষীদের অনুমোদনাই, অন্তত দক্ষিণ ভারতের অন্যান্যকে সন্তুষ্টকে বেশী সম্মান করে তুলবে।

"না, সেটা কাজ আরও যোগ বলেছেন সভীত দিয়ে। মনের ওপর ও আপেলাদের বাংলার সাহিত্য অন্তরের কালো বং লাগান হয় নি।" যাই হোক বাগাচারী সভায় সবাই খুব উপভোগ করেছিল।

রাজাজীর বক্তৃতার মূল কথা ছিল ইংরাজীকে পরভাষা আখ্যা দেয় মুর্খেরা। কমনওয়েল্থ থেকে, আইনসভা, আদালত রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক সংগঠনে সবই বিদেশী চঙে গড়ে তুলে একথা বলা ত' অকৃতজ্ঞতা। সুতরাং তাঁর মতে ইংরাজীকেই সরকারী ভাষাকপে গ্রহণ করা যোক।

তাতে আতীয় ঐক্য ব্যাহত হবে না; কিন্তু হবে যদি হিন্দীর মত আন্তর্লিক ভাষাকে জনগণের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়। তিনি আরও বলেন, এখন আতি একতাবদ্ধ। হিন্দীর মারফৎ যদি এই একতা বাড়াবার চেষ্টা করা হয় তাহলে তার ফল হবে বিষময়। আর নীতির দিক থেকেও কোনও আন্তর্লিক ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা দেয়া মানেই হিন্দি ভাষের মাতৃভাষা তারা বিশেষ সুবিধার অধিকারী হবে। আর তার ফলে তারা কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চপদগুলি আত্মসাৎ করবে এবং অন্যান্য ভাষাভাষীরা অবশ্য পশ্চিমকেই ঠাঁদের অধস্তন শ্রেণীতে পরিণত হবে।

সংস্কৃতি ঃ সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য

[অরবিন্দ সোদ্দার]

সংস্কৃতি কি, এবং তার বৈশিষ্ট্যই বা কি—এই জিজ্ঞাসার আগে সাধ্যকি কার। সংস্কৃতি মানুষের। এই মানুষকে নিয়ে আমাদের ভাবনার অন্ত নেই; অথচ ভাবনারও তাকে সম্পূর্ণ পাওয়া যায় না। সমস্ত ভাবনার শেষেও বিস্ময় থেকে যায়। সে যেন নদীর স্রোতধারার মত প্রবাহিত এক সত্তা। নতুন নতুন রূপে নতুন অভিব্যক্তিতে অগ্রসর হয়ে চলেছে। এ যাওয়ার কোন শেষ নেই।

মানুষের জীবনের অন্তর্ভুক্ত বিশেষত্বকে ছাপিয়ে এই বৈশিষ্ট্যই বোধ করি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এবং মৌল যে, জীবন-পরিবেশের সঙ্গে তার জীবনের নিরন্তর বিরোধ।

জীবনের রূপ যাই হোক না কেন, যে সমাজ সংগঠনে তার জীবন আশ্রিত তার রূপ যাই হোক না কেন, তাকে নিরন্তর এর চেয়েও ভাল, এরচেয়েও কল্যাণকর, এর চেয়েও সুব্যবস্থিত, এর চেয়েও আনন্দবর্ধক অন্য কোন পরিবেশে অন্য কোন জীবনভূমিতে উপনীত হওয়ার আকাঙ্খার উন্মেল থাকতে হয়, জীবনের অন্য কোন মায়া-মোহে রঙীন চিত্র কল্পনায় বিভোর থাকতে হয়। এবং এইখানেই তার সব চেয়ে বড় গৌরব, জীবনভূমিকে চাষ করে, অবাঞ্ছিত আগাছা পরিস্কার করে, সংস্কৃত-কর প্রাঙ্গণে পৌঁছানোর গৌরব। প্রাণিজগতের এর এক-মাত্র অধিকার মানুষের। এই গৌরবের অধীকার, যদি মানুষ না হতো, তাহ'লে সম্ভবতঃ মানুষের, সভ্যতা-সংস্কৃতি কোনদিন দানা বেঁধে উঠত না। সুতরাং, সৃষ্টির মধ্যদিয়ে অন্য কিছু হওয়া, অন্য-ভাবে বিকশিত হওয়ার যে অন্তর-গরজ মানুষের সভ্যতা তথা সমস্ত প্রকাশের মূলে, মানুষের কর্ম-চিন্তা-ভাবনা-কল্পনায় তা কোন না কোন ভাবে উপস্থিত থাকবে তা একান্তই স্বাভাবিক।

সভ্যতা সংস্কৃতি এই মানুষের, ইতিহাসও তাই। ইতিহাসের যাত্রাপথে, স্তরে-স্তরে তার বিশেষ রূপ, বিশেষ সমস্যা।

●

ঐতিহাসিক স্থানকালাশ্রিত মানুষের জীবনকে কখনও খণ্ড খণ্ড বা বিচ্ছিন্নভাবে বিচার করা যায় না, তার বিকাশের রূপটা সামগ্রিক। তাকে গ্রহণও করতে হবে সমগ্রভাবে। অথচ কিছুকাল আগে পর্যন্ত এমন একটা ধারণা ছিল যে মানুষের ব্যবহারিক জীবন ও তার সাংস্কৃতিক জীবন সম্পূর্ণ আলাদা জিনিষ—একের সঙ্গে অন্যের কোন সম্পর্ক নেই। তার সাংস্কৃতিক জীবন এক এবং তার ব্যবহারিক জীবন আর। সাংস্কৃতিক জীবনের পরিধিতে শুধু সেই সব জিনিসই গ্রাহ্য হতো যা সাধারণত মানুষের মনোজ্ঞ।বনের ফসল বলে গৃহীত হয়ে থাকে, যা একান্ত-ভাবেই অন্তর সম্পদ, যা বিশুদ্ধ-ভাবেই মনশ্চিত্ত, এবং যার ওপর ব্যবহারিক জীবনের দৈনতার ধূলোতার এবং ক্ষুদ্রতার কোন স্পর্শ নেই। কিন্তু, মানুষের জীবনের মধ্যে এমনিভাবে একটা ভৈতভাব সৃষ্টি করা নিতান্তই একটা ভ্রান্তি-বিলাস। কারণ, যে মানুষ ব্যব-হারিক জীবনের ক্ষেত্রে দুঃখবেদনা উৎপীড়নে উৎপীড়িত হয়, সেই মানুষই সজীবের বাধ্যনে তার মনোবেদনাকে প্রকাশ করে, ব্যথার পীড়নকে সৃষ্টির আনন্দলীলার প্রবাহিত করে দেয়। অথ্যাবের আনন্দ দিয়ে দুঃখের নিবৃত্তিকামনা করে। এবং করতে পারে বলেই সে বেঁচে থাকে। পুনশ্চতঃ, রবীন্দ্র-নাথের একটি কথা মনে পড়ছে। উনবিংশ শতাব্দীতেবৃটিশ সাম্রাজ্য-বাদ আমাদের দেশে যে কল্পনা-তীত শোষণ অত্যাচার চালিয়েছিল, তার পরেও, আমাদের দেশের মানুষ কী করে বেঁচে রয়েছে, তাই ভেবে কবি আশ্চর্য হয়ে-ছিলেন;—আর তখুতা-ই নয়, সেই মানুষ আবার গানও গেয়েছে। সেটা আরও বিস্ময়ের বস্তু। দুঃখ-ভাবে অবনত মানুষ গান গায়, সৃষ্টি করে—এ তার অসাধারণ প্রাণশক্তিরই স্বাক্ষর। এই প্রাণ-শক্তিই সমস্ত সৃষ্টির মূলে।

●

মানুষ সমগ্র জীবনভূমিতে চাষ বা কর্ষণ করে চলেছে, অবিশ্রান্ত চলেছে তার সাধনা; প্রকৃত জীবনের অপরিচ্ছন্নতা দূর করে উন্নত হওয়ার প্রেরণাও যে সৃষ্টি, সেই সৃষ্টিই তার অন্তিত্বের মৌল প্রক্রিয়া। এই অভিব্যক্তি আবরা সর্ব কাজে সর্বত্র প্রত্যক্ষ করি। মানুষের সভ্যতার ক্রমবিকাশই তার সাক্ষ্য বহন করছে। একটি বীজ থেকে অসংখ্য বীজের সৃষ্টি, একটি বীজ থেকে অসংখ্য তরুর সৃষ্টি; একটি মানুষ থেকে অসংখ্য মানুষ সৃষ্টি হচ্ছে; এক অর্থে এও মানুষের শিল্পকর্ম। এই শিল্পকর্মকে সফলতর সার্থকতর উন্নততর করার জন্য জীবন-প্রাঙ্গণের পরিবর্ত্তন প্রয়োজন। বিশেষ বিশেষ কালে মানুষ যদি এই পরিবর্ত্তনের কাজে হাত না লাগায়, তবে তার সভ্যতা এক সীমায় স্তব্ধ হয়ে যেতে পারার আশঙ্কা। এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হওয়ার লগ্নথেকে অপরিমেয় প্রাণশক্তির অধিকারী মানুষ তার-প্রতি পদক্ষেপেই এ কাজ করে চলেছে, তার যাত্রায় কোথায়ও ক্লান্তি নেই।

●

সেজন্যই বলছিলাম, খণ্ডিত-ভাবে মানুষের জীবনকে যে জানা, সে জানা সত্য জানা নয়। সমগ্র-ভাবেই তার জীবন ও সংস্কৃতির পরিচয় গ্রহণ করতে হবে। আমি যা অন্যায় করেছি এবং অন্যায়ের মারফৎ যা অর্জন করেছি, তা-ই আমার সংস্কৃতির পরিচায়ক নয়। সেই অতীত এবং অজিত বিদ্যাকে ব্যবহারিক জীবনের ক্ষেত্রে কতটা প্রয়োগ করে পরিমার্জিত হয়েছি, তাই আমার সংস্কৃতির পরিচয়। অর্থাৎ, চর্চাকে জীবনচর্যায় পরিণত করতে হ'বে, এবং তা করতে পারলেই মানুষ হিসেবে আমি সার্থক। আমাদের দেশে প্রাচীন-কালে অনেকটা প্রায় এমনিভাবেই মানুষের পরিচয় গ্রহণ করা হতো। কোন অপরিচিত ব্যক্তিকে প্রথম সাক্ষাতের সময় তার কুলশীল সম্পর্কে প্রশ্ন করা হতো। এই কুলশীল সংক্রান্ত জিজ্ঞাসার অন্ত-নিহিত অর্থ সম্ভবত এই যে, যে কুলে তোমার উদ্ভব সেই কুলের পরিচয় কি, জীবনের ক্ষেত্রে সে কি মূল্যবর্ধণা অর্জন করেছে, তার জীবনপদ্ধতি কি, ইত্যাদি। তেমনি, অধ্যয়ন বিদ্যার্জন, জীবন-চর্যার ভেতর দিয়ে তুমি নিজে কি অর্জন করেছ, অনুশীলনের মাধ্যমে কতটা পরিশীলিত হয়েছে, তার সমগ্র বিচারেই হবে তোমার প্রকৃত পরিচয়। অর্থাৎ, একদিকে ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে তাঁর পিতৃ-পিতামহের রক্তস্রোত প্রবাহিত, তাই তার কুল, এবং এই কুলের সূত্রে উত্তরাধিকারক্রমে সে লাভ করেছে পূর্বপুরুষার্জিত মূল্য-বোধকে। তেমনি, অপর দিকে তার মধ্যে অজস্র চিন্তা, ভাবনা, কল্পনা, স্বপ্ন, ধ্যানের সমারোহ; সেই সমারোহ তাকে নতুন নতুন প্রশ্ন নতুন নতুন সমাধানের পথে ধাবিত করে দিচ্ছে, সে চাষ করছে, এই তার শীল। কুলশীলের সংশ্লিষ্টেই গড়ে উঠে তার ব্যক্তি-গত সংস্কৃতি, তার অখণ্ড সত্তা, একটি সমগ্র ভঙ্গ।

●

আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতার আমরা এমন অনেক লোকের সংস্পর্শে আসি যাঁরা শিক্ষাদীক্ষায় ভূউন্নত, অথচ যাদের জীবনচর্যায় আমরা এমন অনেক অভিব্যক্তি দেখতে পাই যাতে তাঁদের সম্বন্ধে আমরা ইংরেজী cultured শব্দটি ব্যবহার করতে কুণ্ঠিত হই। পক্ষান্তরে, এমন অনেক লোক দেখা যায়, যাঁদের শিক্ষার অভিমান বিশুনাত্রও নেই, অথচ তাঁদের সম্পর্কে হঠাৎ cultured শব্দটি ব্যবহার করতে আমাদের কোন কুণ্ঠা হয় না। তার কারণ এই যে, প্রথমজন তাঁর অতীত বিদ্যাকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে পরিশীলিত পরিমার্জিত হ'তে দেখেননি, কিন্তু, দ্বিতীয়জন ফোটুক বিদ্যার্জন করেছেন সেইটুকুকে জীবনচর্যায় রূপায়িত করে পরি-মার্জিত হয়েছেন। সেজন্যই বলছিলাম, সংস্কৃতির আলোচনার জীবনচর্যার প্রশ্নটি অত্যন্ত বেশি গুরুত্বপূর্ণ, অপরিহার্য।

(২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জোর করিয়া হিন্দী ভাষা প্রবর্তনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

অপরিচিতি অনেকেরই দেখা যাচ্ছিল। কখন কে বক্তৃতা করবেন তা ঘনিষ্ঠ শ্রীমতী বৈরেরী দেবী বাগচীই ঘোষণা করছিলেন, সভার সভাপতি অন্যান্য কাজ হয়েছিলেন হয়। দুই বক্তৃতার মাঝে দুটি দক্ষিণ ভারতীয় কণ্ঠে সংগীত পরিবেশন করে শ্রোতাদের আনন্দদান করেন।

সভার সাধারণতই সভাপতিতে উল্লেখযোগ্য ভাষণ দেন শ্রীরাজাগোপালা-চারী। তিনি ছিলেন প্রথম দিনের শেষ বক্তা। তাঁর আগেই শ্রীযুক্তা এছমী, এম, পি; আকালি নেতা মাষ্টার তারা সিং প্রমুখ বক্তা হিন্দির বিরোধিতার করে শ্রোতাদের যথেষ্ট তৈরি করেই তুলেছিলেন। সেই সময় শ্রীরাজা-গোপালাচারীর বাগ্মিতা ও বয়োবৃদ্ধ শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে এক আলোড়ন সৃষ্টি করে তুলেছিল। তাঁর বক্তৃতার চটুলতা দেখে মনে হয়েছিল তিনি যেন বর্ষীয়ুক্ত দেখেছেন। এই বয়সের বক্তৃতার উপযোগিতার প্রভাব পাওয়া যেন একই পরেই, যখন তিনি সভার সবাইকে জিজ্ঞাসা করবেন, "আপনারা কি হিন্দির পক্ষে ও অন্য ভাষার বিপক্ষে যে বৈধনা করার চেষ্টা চলছে তা মেনে নেবেন?" চলাই "না, না" ধ্বনিতে ভরে উঠলো। অনতাকে প্রভাবিত করতে এই উপায়ে আপ্লুত তিনি নিয়েছিলেন আরও দু তিনবার।

বক্তৃতা দেয়ার প্রথমেই সবাই উন্মুক্ত হয়েউঠলো শ্রীরাজাগোপালাচারীর হাতে একটা খোলোনো কাগজ দেখে। তিনি সেটা খোলবার চেষ্টা করছিলেন। যখন খোলা হল তখন হল হাসি ও হাততালিতে ফেটে পড়লো। ওটা ছিল তারতের একখানা রাজনৈতিক মানচিত্র, তাতে হিন্দিভাষী অঞ্চলগুলো মনিবিত। সেটা সবাইকার সামনে মঞ্চের ওপর ধুলিয়ে দেয়া হল। অবশ্যি রাজাজী পরে বক্তৃতার এর প্রয়োগার হাতুড়ে হাতুড়ে বলেন "হিন্দি সম্বন্ধে কোনও বিরুদ্ধ মনোভাব গড়ে তোলার জন্যে ব্যাপে এব্যাপারে রাজাজী কেন্দ্রীয় সরকারকে দোষারোপ করেন। বলেন তিনি যদি সত্যিই চাহিতে দেয়া হয় তবে যে কি করে বসতে পারেন, তার কোন অবস্থার পর, তা তখনই জানেন। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা।

আরও একটা কথা রাজাজী তার দিয়ে ঘোষণা করেন। বিভিন্ন রাজ্য সরকারগুলিকে অধিনেই আকর্ষিত ভাষা প্রবর্তন করার সুপারিশ করে তিনি বলেন যে, এটা করলে প্রকৃত সৌহার্দ্য গড়ে উঠবে বিভিন্ন রাজ্যের জনগণের মধ্যে। পুলিস এবংউচ্চ যেসব কোনো ভাষায় ইংরাজী সরকারী ভাষা থাক একথাটা ঘোষণা করেন। কিন্তু সভাটাতে ঘোরালো হয়ে দাঁড়ালো তাঁর সরকারী ভাষার ওপর যে পার্লামেন্টারী কমিটি গঠিত হয়েছে তার উপর আক্রমণ। তিনি তাঁর অভাবের কথায়, কি কমিটিতে তাঁর নিজের অসহায় অবস্থা বর্ণনা করতে বিয়ে বলেন "কমিটির হিন্দিভাষী সদস্যরা ছাড়া অন্য যেসব সদস্য আছেন তাঁরা স্বাধীন মত ব্যক্ত করতে অত্যন্ত ভয় পান পণ্ডিত পন্থের সামনে। সুতরাং এ কমিটি কি সিদ্ধান্ত নেবে তা ত' জানা কথা।"

কিন্তু রাজাজী ও শ্রী এছমীর বক্তৃতা থেকে মাষ্টার তারা সিং, দিনি বলেন, হিন্দি প্রচারের নামে সাম্প্রদায়িকতা ও বর্ণবিদ্বেষ ছড়ানো হচ্ছে, সম্মেলনের সভাপতি ডাঃ সাধারিলাল পাল বা অভ্যর্থনা সমিতি ডাঃ নাগের সেনগুপ্তর বক্তৃতা একই আবাদা করলেন। বিশেষ তাঁরা হিন্দির বিরোধিতা করবেনও সরাসরি ইংরাজীকেই সরকারী ভাষা করে নিতে দ্বিধাগ্রস্ত বলে হচ্ছেন। তাঁদের বলে হয় বরাব উদ্দেশ্য ছিল এত তাড়াতাড়ি হিন্দি না চাপিয়ে দিয়ে, রাষ্ট্রভাষা জনগণের হাতেই ছেড়ে দেয়া ভাল, তাদা চাপিয়ে দিয়ে, রাষ্ট্রভাষা তাই করবে।

শ্রী এছমী হিন্দির অসারত্ব প্রমাণ করতে গিয়ে সভায় হাসির খোরাক যোগান। তিনি বলেন তার ইঞ্জিন বেড়িও থেকে যে হিন্দি প্রচার করা হয়, তা শুতকরা একজনও বোঝেন কি'না সন্দেহ। আর তাতেই তিনি পরিভাষা অধিকাংশই অসাধ্য ও নিষদ্ধে।

উদাহরণ দেন বাইকেলের পরিভাষা নিয়ে। সাইকেলের সরকারী পরিভাষা করা হয়েছে "দ্বিচক্রবাহন", যার বাংলা মানে দাঁড়ায় "এমন একটি যন্ত্র যার দুটো চাকা আছে ও তত করে।"

রাজাজী যে হাসির খোরাক যোগান তা আদৌ বাস্তাযুক্ত। তার একটি হচ্ছে আইন দিয়ে যখন বিভৈষিমার বিবাহ বন্ধ করার কথা তাঁরা হচ্ছে তখন নাতুভাষার সাথে সংযোগের ভাষা অর্থাৎ হিন্দি ছাড়ে দিয়ে বুঝ যখনে তিনি তাঁর মাথাকে বিভৈষ বিবাহে বাধা করতে পারেন না।

যাই হোক, সভার শেষে দেখিব কয়েক হাজার নবনারী নিশ্চয়ই হিন্দির বিরুদ্ধে আরও বক্তৃতা ধারণা ও মনোবৃত্তি নিয়ে বেরিয়ে আসেন।

পরের দিন সম্মেলনে যে কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়, দুটি তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য। একটিতে বলা হয় ইংরাজীকেই সরকারী ভাষাকপে মেনে নিতে হবে, অন্যটি, বিভিন্ন অঞ্চলিক ভাষা রাজ্য সরকারগুলো গ্রহণ করুক'

পঃ বঙ্গের বিভিন্নস্থানে খাদ্য সঙ্কটের তীব্র ও ভয়াবহ রূপ

সেক্রেটারিয়েটের নিষ্ক্রিয়তায় জিলা শাসন ব্যবস্থা প্রায় বিপর্যস্ত

অফিসার মহলে হতাশা ও দুর্নীতি

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

পশ্চিমবঙ্গের জেলা পরিক্রমায় বেরিয়েছিলাম কয়েকদিন আগে, খাদ্য সঙ্কটের আসল চেহারাটা জানার জন্য। সেখানে সঙ্কট তীব্র এবং এর তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে শাসন ব্যবস্থায় সংগঠনের অভাবে। কলিকাতার সেক্রেটারিয়েটের খামখেয়ালীর ফলে, জেলা শাসন ব্যবস্থা আজ প্রায় বিপর্যয়ের মুখোমুখি। এর স্বাভাবিক পরিণাম জেলা অফিসার মহলে হতাশা ও দুর্নীতি।

অনাবৃষ্টির দরুণ শস্যহানির সম্ভাবনার কথা জেলার অফিসাররা সেক্রেটারিয়েটকে বলে আসছেন গত অক্টোবর মাস থেকে। খাদ্যাবস্থা আয়ত্তাধীনে রাখার উদ্দেশ্যে কঠোর ব্যবস্থার জন্যও তাঁরা লেখালেখি করেছেন। কিন্তু গোড়া থেকেই সেক্রেটারিয়েট নীরব। এমন কি কেন্দ্রীয় ভাণ্ডার চিঠির প্রাপ্তি স্বীকারই তাঁরা করেন নি। খাদ্যনীতির বোটামুটি একটা কাঠামো জেলা দাবী করেছে যার ভিত্তিতে তারা কাজ করতে পারে। কিন্তু এ ব্যাপারে কোন নির্দিষ্ট নীতি কখনই জানানো হয় নি।

নভেম্বর মাসে ঠিক হল —সরকার এজেন্ট (শাওয়ালেস কোম্পানী) মারফৎ ধান খরিদ করবেন খোলা বাজারে কম দামে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই। আর ঠিক হল জেলাতে সবচে চাল কল মালিকরা তাঁদের উৎপাদনের শতকরা ৭৫ভাগ সরকারকে দিয়ে দেবেন নির্দিষ্ট মূল্যে। এর বদলে অবশিষ্ট ২৫ ভাগ তাঁরা রাজ্যের যে কোন অংশে বিক্রী করবার অনুমতি পাবেন। ডিসেম্বর-জানুয়ারী মাসে এই অনুপাত ৫০-৫০এ নেমে এল। এজেন্ট সরকারকে খোলা বাজারে সরকারের চাল খরিদের সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করা হল।

এখিকে আভ্যন্তরিকভাবে কলল ওঠার সঙ্গে ধানের দাম মণপ্রতি ১০।১৪, টাকা থেকে ৯।১০ টাকায় নেমে এল। চাল কলওয়ালারা প্রচুর ধান খরিদ করলেন। বিরাট ইক গড়ে তুললেন। চাষীরাও ন্যায্য দরুণ সেটোয়ার জন্য অপেক্ষায় রইলে কেউ কেউ আংশিক ১০।১৪, টাকায় চড়ে গেল। তখন কিন্তু এল সরকার চাষীর হাতে নয়। ধান ব্যাপারে দরুণ বেশী আয়ের সুযোগ তারা পায় নি; পেয়েছে কলওয়ালারা। ফুটবে অর্থনীতি এমনই তাদের, নিজেদের স্বার্থিবের জন্য এরা দরের ওঠানামা নিয়ন্ত্রণ করে। সরকার এদের কাছে ধারনীতিও ঠিক করে দেয়।

বাঁকুড়াতে প্রায় ৮০ভি চাল কল আর ছোট ছোট ধানভানা কল প্রায় ১২৫টি। কেন্দ্রোরীয় সাধারণি এই ৮০টি চাল কলের ওপরভাগে ধানের পরিমাণ ছিল প্রায় ৬ লক্ষ মণ। আলোচনা সারকৎ এদের প্রতিনিধিরা আমায় কাছে স্বীকার করেছেন যে, তারা কলিকাতার দরবার করেছেন কলল কর্তন তোলার জন্য। এই আলোচনার ২।৩ দিন পরেই দেখলাম সরকারের নতুন ধারানীতির ঘোষণা। সমস্ত জেলা কর্তন তুলে দেওয়া হল। কলের মালিকরা যে কোন দামে কাছের যে কোন অংশে তাদের চাল বিক্রী করতে পারে। কেবল তাদের উৎপাদনের শতকরা ২৫ ভাগ দিতে হবে সরকারকে নির্দিষ্ট মূল্যে। এবং দিতে তাদের আপাত্তি নেই। কারণ ৭৫ ভাগে তারা বহু লাভ করবে।

এই ধারানীতির ঠিক করার ব্যাপারে সরকার জেলার অফিসারদের কাছারও, এবংকি জেলার কংগ্রেস কমিটিওনির পরামর্শের কোন বুলাই ধের নি। জেলা থেকে কংগ্রেসী নেতারা ধানচালের কাছে দরবার করেছেন বারুর দৃষ্টিভঙ্গীর কথা করে। তাঁরা দেখেছিলেন খোলা বাজারে ধান চালের দাম বেঁধে দেওয়া হ'ক—ধানের দাম মণপ্রতি ১১।৩ ও চালের দাম ১৮।১০ টাকা। তাদের সে দাবী গৃহীত হয় নি। জেলার কংগ্রেস কমিটিগুলোর মধ্যে তাই অসন্তোষ দেখা দিয়েছে।

জেলা কংগ্রেসের অভিযোগ

বীরভূম জেলা কংগ্রেস কমিটি সরকারী নীতির তীব্র নিন্দা করে প্রস্তাব গ্রহণ করেছে আর জানিয়েছে সরকারী নীতির ফলে তাদের পক্ষে এখন আর জেলার রাজনৈতিক কাজ করা প্রায় অসম্ভব। কারণ আজ সাধারণ মানুষের কাছে এটা স্পষ্ট যে সরকারী নীতির নিয়ামক চাল কল- ওয়ালারা, সংসদ হিসাবে জেলা কংগ্রেসের মতামতের কোন মূল্যই নেই।

পুরুলিয়ার কংগ্রেসী নেতা, শ্রীধীরেন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের সঙ্গে আলোচনা হয়েছিল—জেলার অবস্থা সম্পর্কে। তিনি বললেন সরকারী নেতাদের কাছে ধর্ণা দেওয়ার কোন মানে হয় না। বরঞ্চ তাঁরা যেটা করেছেন, জানিয়েছেন, জেলার দুর্দশার কথা। ভাজার বিধান রায়কে সরাসরি তাঁরা সব কথা বলেছেন। কিছুই হয় নি।

১৯৫৬ সালে সভেরর মাসে পুরুলিয়া পশ্চিমবঙ্গে যুক্ত হল। এবংও পর্যন্ত পুরুলিয়ার বিহারী আইন চালু আছে, পশ্চিমবঙ্গের আইনকানুন চালু করা সম্ভব হয় নি। জেলায় জেলুসী কবিসংঘ, নী ভে নি, সেনওপ্ত খুব উদ্যমের সঙ্গে কাজে লেগেছিলেন। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে জেলার উন্নয়ন কমিটি গঠন করা হয়েছিল। বহু পরিকল্পনাও তাঁরা তৈরী করেছিলেন পুরুলিয়ার অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের জন্য। কিন্তু কিছুই কাজ হয় নি কমিকাতার সেক্রেটারিয়েটের নিষ্ক্রিয়তার জন্য। হতাশ হয়ে শ্রী সেনগুপ্ত ২৪ দিনের ছুটি নিয়ে জেলা ছেড়ে চলে গেলেন। তাঁর জায়গায় যিনি এলেন তাঁর অবসরের সময় আসন্ন। তিনি জেলার ব্যাপারে তত মাথা ঘামান না—আর ঘামিয়ে লাভও নয় না।

সেক্রেটারিয়েটে আকসারদের খুব কাজ করার প্রয়োজন হয় না, কারণে খুশী করাই তাঁদের বড় দায়িত্ব। আর এ ব্যাপার সম্পর্কে নির্দিষ্ট হয়েছি একটি ঘটনার। পুরুলিয়া থেকে জেলা অফিসার ১৯৫৬ সাল নিবেদন পেশ করেছিলেন লাক্ষা শিল্পকে আধুনিক ধারায় সংগঠন করার জন্য। এ নিবেদন মাফিক ডাবতবর্ষ বছরের ১২ কোটি টাকা বুলের বিদেশী বুদ্ধা অর্জন করে। কিন্তু সংগঠনের অভাবে এই নিবেদন অবহা পোচনীয়।

পুরুলিয়া জেলার কৃষি বিভাগ বহু অনুন্নত বিষয় করেছেন, নাকা চাষ সম্পর্কে বিশেষ ব্যবস্থা করার জন্য। নিবেদন পেশ করা হয়েছে। এবং এইসব ব্যবস্থা যে কি-ধরণীতের ফলে অনেকটা ঘাটেই অনুকূল হয়েছে এতে সন্দেহ নেই। সিলেক্ট কমিটির এই সব সুপারিশের ফলে বিদেশীদেরকে প্রতিযোগিতা অন্তত অনেকটা ঠোঁটা হয়ে গেছে।

(৩য়-পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জেলা থেকে ফেরার পর, সেক্রেটারী মহলে খোঁজ করতে শুনলাম, ব্যাপার কি জানার জন্য। কোন বিভাগই কোন খবর দি দিই চাইতে পারেন না। পারিতু এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেন।

সেক্রেটারিয়েটের নিষ্ক্রিয়তা

কলিকাতার সেক্রেটারিয়েটের নিষ্ক্রিয়তা জেলা শাসন ব্যবস্থাকে পঙ্গু করে দিচ্ছে। কোন বিভাগেই কাজে উৎসাহ নেই। চাকরী বজায় রাখার জন্য যেটুকু করা দরকার তার বেশী কিছু করতে জেলা অফিসাররা রাজী নন। আর চাকরী বাঁচাবার একমাত্র পথ মন্ত্রীদের খুশী রাখা এবং এর জন্য আই, সাহসের মর্যাদা রীতিমত প্রতিযোগিতা চলে।

কয়েক দিন আগে বাঁকুড়ায় এক কৃষি পুনর্বাসনী আয়োজন করা হল, এক মন্ত্রীর উদ্বোধন করার কথা। কৃষি বিভাগ থেকে এর আয়োজন কল, ওর জমির খড় পুনর্বসতির টেলে সাজিয়ে রাখলেন উদ্বোধনের উপলক্ষে। মাঝার বেয়াল হল পুনর্বসতী মেলা প্যাণ্ডেলের মধ্যে পুকুরটার কিছু ব্যবস্থা করা দরকার। সঙ্গে সঙ্গে সরকারী কর্মচারীরা ছিপ নিয়ে ছুটলেন। দূর দূর গ্রাম থেকে পদ্ম কুল এনে পুকুর সাজান হল, ঘোটা ঘোটা সাদা মাঁস পুকুরের পোভাবৃদ্ধি করল। মন্ত্রী মহাশয় মহাখুশী গ্রামের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি দেখে। অফিসারের আসল তিনি চাকরী বজায় রেখেছেন।

অফিসার মহলে হতাশা

অভ্যন্ত দুঃখের সঙ্গে এক অফিসার আমাকে বলেছেন : "আমরা চাই না এই বক্তব্যের মধ্যে বাস করতে, সকলের মত আমাদেরও দেশপ্রীতি আছে, বিবেক আছে। কাজ করতে আমরা চাই। কিন্তু তার আমরাওয়া আজ নেই, হতে বা নতুন গণতন্ত্রের প্রাথমিক অবস্থার এটা অবশ্যম্ভাবী।" তিনি আমাকে অনুরোধ করেছেন কাগজের মারফৎ দেখালেবিধি করে অবস্থার উন্নতি বিধানের চেষ্টা করতে।

কিন্তু যেখানে সরকার জেগে ঘুমোয়, সেখার সার্বকতা সেখানে নেই।

(৩য় কলমের পর)

মুল দিনে বস্তিবাসীদের কতগুলি অত্যাবশ্যকীয় ব্যাপারে ক্ষতিপূরণ দেবার কোন ব্যবস্থার কথা ছিল না। সিলেক্ট কমিটি যে সুপারিশ করেছেন তাতে বস্তিবাসীদের বহি ঘেকে অপসারণের জন্য যে ব্যয় হবে তা এবং তারা যে পেশা থেকে বিচ্যুত হলে সেজন্যেও তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এ ছাড়া ব্যবসার অধবা নিজের জন্যে ক্ষতিপূরণ এবং পুনঃ সংস্থাপনের জন্যে যে খরচ হবে তার জন্যেও ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথাও এ সুপারিশে বলা হয়েছে।

জমি অধবা তাদের যা সাব দেশীয় স্বার্থসংদ্বিষ্ট ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের ব্যাপারে কমিটি "স্যার" সিইে প্রযুর্তন দ্বারা এরূপ ব্যবস্থা করেছেন যে যেন চাকার পরিমাণ বড় বাড়ে ক্ষতিপূরণের হারও সেই অনুপাতে কম হবে। ১৯৪৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর জমির যে দর ছিল তাই আজ ক্রয়ের দর বলে ধরা হবে। জমির মালিক জমি থেকে আয়ের উপর কোন ক্ষতিপূরণ পাবেন না, তবে তিনি যদি কোন কুটীর অধবা গৃহাদির মালিক হন তবে ঐগুলির আয়ের উপর ক্ষতিপূরণ পাবেন।

বস্তি এলাকা বলে ঘোষণা সম্পর্কে আপত্তি সংক্রান্ত আবেদনাদির বেলায় এক মাসের আবণ্ডায় মিটিয়ে দু মাস করা হয়েছে। যে এলাকাকে যেদিন বস্তি এলাকা বলে ঘোষণা করা হবে সেদিনের পর থেকে এক বছরের মধ্যে সরকার জমি দখল করবেন।

বস্ত বিলে যে সমস্ত ব্যবস্থা ছিল সিলেক্ট কমিটির এই সব সুপারিশের দ্বারা সে সব ব্যবস্থার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। এবং এইসব ব্যবস্থা যে বস্তি-বাসীদের অনেকটা স্বার্থের অনুকূল হয়েছে এতে সন্দেহ নেই। সিলেক্ট কমিটির এই সব সুপারিশের ফলে বিদেশীদেরকে প্রতিযোগিতে অন্তত অনেকটা ঠোঁটা হয়ে গেছে।

(৩য়-পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বস্তী অপসারণ ও বস্তিবাসি পুনর্বাসন সমস্যা

সংস্কার ও উন্নয়নই একমাত্র সমাধানের বাস্তব পথ

যুক্ত সিলেক্ট কমিটি সেসব সুপারিশ করেছেন তাতে বস্তি-বাসীদের স্বার্থের অনুকূলে অবস্থার অনেকটা উন্নতি ঘটলেও বিলটিতে এখনও এমন কতগুলো দোষত্রুটী রয়ে গেছে যার কোন কোনটি বাস্তবক্ষেত্রে বস্তিবাসীদের পক্ষে বিপদ ডেকে আনতে পারে বলে মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে।

আমরা বিকল্প ব্যবস্থারের তাদা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতির অভাব এবং দ্বিতীয়তঃ বস্তির আয়ধীন মজুর বাড়ী নির্মিত হলে বরিদ্ধাতাদের সে বাড়ী দেওয়াই হবে এমন কোন সাটোইও বিলে নেই। বিলে যা আছে তা হচ্ছে নতুনভেরী বাড়ী বস্তির অধিবাসী বা যদল উপার্জনশীল ব্যক্তিদের ভাড়া দেওয়া হবে।

ভাড়া সম্বন্ধে বলা যদি বরিদ্ধাতত অধিবাসীদের পক্ষে সাধ্যায়ত্ত না হয়, তাহলে আগে থেকে, পরে থেকে, একদিন তাদের কলিকাতার বাইরে চলে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না। কারণ যারা দুঃস্থ ব্যবসায় এবং কুটীর শিল্পজীবী, বরিদ্ধাতত হওয়ায় বলে একেই তাদের অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হবে এর পর অতিরিক্ত ভাড়ার চাপ সংগ্রহ করাও কি তাদের পক্ষে সম্ভব ?

কলিকাতার বুক থেকে ঘোরো ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ দূর করতে গিয়ে যদি মহানগরীর এক-ষষ্ঠাংশ অধিবাসীর পারিবারিক ও অর্থনৈতিক জীবনে সঙ্কট ডেকে আনার মত কিছু করা হয় সেটাই হবে উদ্বেগের কারণ। বিলের উদ্দেশ্য প্রকরণে বলা হয়েছে—বস্তিবাসীদের উদ্দেশ্যে বাসস্থানের ব্যবস্থা করবার জন্য কলিকাতার বস্তিঞ্চলি অপসারণ করে এবং বস্তির অত্যন্তরস্থ বর্ত্তমান কুটীর ও অন্যান্য গৃহাদি (সিলেক্ট কমিটির সুপারিশে 'অন্যান্য গৃহাদি' কথাটি যোগ করা হয়েছে) ধ্বংস করে যেখানে যেখানে সম্ভব সেখানে সেখানে পরিকল্পনা অনুযায়ী পাকা বাড়ী নির্মাণই বিলের উদ্দেশ্য বলা হয়েছে। মূলত ইং নীতিগত ভাবে দেখতে গেলে, রাজ্য সরকারের সদুদ্দেশ্য সত্ত্বেও সম্পন্ন প্রকারের কোন অবকাশ থাকে না। কারণ এখন যারা ঘোরো ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে থাকি বাপন করছে তাদের আধুনিক সুবিধাযুক্ত পাকাবাড়ীতে বসবাসের সুযোগ করে দেওয়াই সরকারের উদ্দেশ্য বলা হয়েছে। তবে বাস্তব ক্ষেত্রে এই নীতি কার্যকরী করতে গিয়ে কিরূপ কর্মসঙ্কট অনুসৃত হবে সেটাই হবে আসল প্রশ্ন।

কলিকাতার অধিবাসীগণের একটা বড় অংশ—অর্থাৎ গৃহ-এক-ষষ্ঠাংশ বস্তিতে বাস করে। তাদের সংখ্যা সরকারী হিসাব অনুযায়ী ৫,৩১,৪০০ (১,৩৫, ৪০০ পরিবার)। অপসারণের ক্ষেত্রে এই বিপুল সংখ্যক মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন ঘাতে অব্যাহত থাকে তার জন্যে বহুটে পরিমাণে বসবাসের ব্যবস্থা হওয়া দরকার। আর প্রস্তাবিত আইনে যে কথা বলাহবে যদি উপযুক্ত ব্যবস্থা বিবেবনা না হয় তবেই উদ্বেগের কারণ ঘটবে।

১৯৫৬ সালে বস্তি সম্পর্কে সরকার ৯টী ওয়ার্ডে ব্রিপোর্টের ভিত্তিতে বস্তিবাসীদের আর্থিক অবস্থা পর্যালোচনা করতে গেলে নিম্নলিখিত তথ্যাদি পাওয়া যায়:— বস্তিবাসীদের আয় ঘোট পরিবার সংখ্যা হিসাবে শতকরা ৫৮·৭৮ ভাগের মাসিক আয় ১০ থেকে ১০০, টাকা শতকরা ৩২·৮২ ভাগের মাসিক আয় ১০১, থেকে ২০০, টাকা শতকরা ৬·৪৯ ভাগের মাসিক আয় ২০১, থেকে ৩০০, শতকরা ১·৩৩ ভাগের আয় ৩০১, থেকে ৭০০, টাকা এবং শতকরা ৩·৩৮ ভাগের আয় ৭০০, টাকার ওপর।

সম্পাদক শ্রীবসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য

সম্পাদক—কর্তৃক ক্যালকাটা প্রেস (প্রাইভেট) লিমিটেড, ১নং ওল্ডলিংদ্রে ষোয়ার কলিকাতা—১৩ হইতে মুদ্রিত এবং ৭নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা—১৩, দর্পণ কার্যালয় হইতে প্রকাশিত।

Regd : No.C 4047

১বর্ষ, ৮ম সংখ্যা

প্রফুল্ল সেন ও কালী মুখার্জিকে বিতাড়নের চেষ্টা

সাপ্তাহিক সংবাদ সাময়িকী : কলিকাতা—২১শে মার্চ শুক্রবার ১৯৫৮ : মূল্য ২৫ নঃ পঃ

চরম মুহূর্তে বাঙ্গলার পার্লামেণ্টারী রাজনীতি

কংগ্রেস দলের মধ্যে দ্বিমুখী দ্বন্দ্ব

(দর্পণের রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক)

শ্রীযুক্ত সিদ্ধার্থ রায়ের পদত্যাগ পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে একটা সন্ধিক্ষণ উপস্থিত করতে পেরেছে—যে সন্ধিক্ষণ থেকে পশ্চিমবঙ্গের পার্লামেণ্টারী রাজনীতিতে একটা বহুর দিক পরিবর্তন আরম্ভ হবে।

দুই-দুইটি সাধারণ নির্বাচন এবং গত ১০ বৎসরের বহুবিধ উত্থান-পতন সত্ত্বেও যে-সন্ধিক্ষণ সৃষ্টি করা যায়নি, মাত্র একজন মন্ত্রীর পদত্যাগের ফলে তা ঘটবে, একথা এখনও সম্ভবতঃ অনেকের কল্পনাতীত। কিন্তু আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে—সম্ভবতঃ দর্পণের আশামী সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার পূর্বেই এই পরিবর্তনের সূত্রপাত হবে।

আমরা বলছিনা যে, এক সপ্তাহের মধ্যে বিধানচন্দ্র রায়ের রাজনৈতিক আদর্শ ও মতবাদের মূল্যায়নের অবসান ঘটবে কথা বলবেন। বলবেন যে, তাও পারে। কিন্তু এ কথা নিশ্চিত যে, সিদ্ধার্থ রায়ের সেখানে, কেন তাঁকে মন্ত্রিসভা পদত্যাগ কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী ত্যাগ করতে হয়েছে। তার একটা পার্টিকে দুইটি অনিবার্য দিক হচ্ছে প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক সম্ভাবনার সম্মুখীন করেছে। বিপর্যয়ের সুনিশ্চিত সম্ভাবনা। একটি ঘটি না ঘটে, অপরটি আর একটা দিক, হিসাবি দুর্নীতির ঘটতেই হবে। ২৭শে মার্চ কুখ্যাতি ও দুর্নীতি দমনে এঁদের অন্যথা প্রস্তাবটির বিতর্কের বাধাদান, যে কোনো প্রগতিশীল পর, হয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় গতির বিরুদ্ধে এঁদের চক্রান্তের সম্পর্কহীনে শ্রীঅতুল্য ঘোষের কথা। সর্বশেষে তিনি প্রগতিবাদী কুক্ষিগত হবেন এবং আগামী সর্বদলীয় কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার সপ্তাহ থেকে সুস্পষ্টভাবে জন্য দাবী জানাবেন।

কার্যেণ্ডারে .দিন গোনা যাবে কবে অতুল্য ঘোষ মুখ্যমন্ত্রীর আসনে উঠবেন। অথবা বাংলা-দেশের রাজনীতি থেকে অতুল্য ঘোষের বিদায়ের সূচনা—beginning of the end—আরম্ভ হবে। এবং দর্পণের রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মনে করেন, এই দুইটির মাঝখানে আর কোনো তৃতীয় সম্ভাবনা নেই।

সিদ্ধার্থ রায়ের পদত্যাগ এই সন্ধিক্ষণটি সৃষ্টি করেছে, কিন্তু তার বিবৃতি এই পরিস্থিতিকে এগু চেয়েও আর এক ধাপ অগ্রসর করে দিতে পারে। যদিও সাধারণের মধ্যে অনেকের ধারণা হয়েছে যে, এই বিবৃতিতে আত্মাক্ত ধরণের দুর্নীতির কোনো ঘটনা বর্ণনা ও প্রমাণ সরকারে উপাদিত হবে, তবু দর্পণের রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক একথা এখনই বলতে পারেন যে, বিবৃতিতে সে ধরণের জিনিষ কিছু থাকবে না।

(১) কিন্তু ধারাবাহিকতার ব্যাপারে তিনি এমন কতকগুলি ঘটনা উত্থাপিত করবেন, যাতে চিন্তাশীল ও সচিন্তাপ্রসোদিত মানুষের বিবেকে প্রচণ্ড আঘাত লাগতে পারে।

(২) এমন ২১টি নীতি-বিপর্যয়, মিথ্যা ভাষণ ও বিশ্বাস-ঘাতকোচিত কার্যের বিবরণ থাকবে, যাতে যে কোনো সভ্য দেশে মন্ত্রিসভার পতন ঘটতে পারে।

(৩) বিবৃতিটি প্রথমতঃ ডাঃ রায়কে প্রধান আঘাত দেবেনা। দেবে সেন-ঘোষ-মুখার্জির দিশাহিকে। দ্বিতীয়তঃ বিবৃতি কোনো কর্মপন্থিকেপের পথাদেশ নামবে না।

(৪) ২ ঘণ্টাব্যাপী বিবৃতির অর্ধেকের চেয়েও বেশী অংশে আলোচিত হবে গভর্ণমেণ্টের আর্থিক দৈন্য ও ডেভিলিয়া অবস্থা, বেকার সমস্যার ব্যাপারে সুনিশ্চিত বিপর্যয়ের দিক সম্বন্ধে আলোচনা।

(৫) প্রথমে সিদ্ধার্থ রার তাঁর পদত্যাগ আগামী চার বৎসরের ঘটনাকে টেলিস্কোপ করে একেবারে আসন্ন ভবিষ্যতের মধ্যে এনে দাঁড় করিয়েছে। চার বৎসর পরে যা ঘটত, সেই পরীক্ষা আজকেই আরম্ভ হচ্ছেছে। কংগ্রেস পার্লা-মেণ্টারী পার্টির মধ্যে তাঁর পদত্যাগ একটা সরকম্পের এবং একটা ভাঙ্গনের প্রচেষ্টা, যুগপৎ দুটি প্রচেষ্টার সূত্রপাত ঘটিয়েছে। যদি সংরক্ষণের চেষ্টাটি শেষ পর্যন্ত সফল হয় তাহলে ডাঃ রায় মুখ্যমন্ত্রীর পদে অব্যাহত থাকবেন, একথা সত্য। কিন্তু তাঁর পূর্ববর্তী সমস্ত ব্যক্তির এবং তাঁর অবিসম্বাদী ক্ষমতা অন্তর্হিত হবে। কার্যতঃ ডাঃ রায়কে এর পর থেকেই স্বয়ংসেত অতুল্য ঘোষের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর আসন তৈরী করতে হবে এবং এমন কি, শ্রীযুক্ত ঘোষ গাঁদতে বসার পূর্বেই সম্ভবতঃ তাঁর নির্দেশে মন্ত্রিসভার কাজ চালানো আরম্ভ হবে। কেননা, এই মুহূর্তে যদি কেউ মন্ত্রিসভার পতন রোধ করতে পারে তো সে হচ্ছে কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী পার্টির অতুল্য ঘোষ-গ্রুপ্তবিরণ। এবং এঁরা মন্ত্রিসভার পতন রোধ করলেও শুধু কংগ্রেসের খাতিরেই তা রোধ করবেন। এবং রোধ করার পূর্বে তাঁরা ডাঃ রায়ের সমস্ত ব্যক্তির ও মর্যাদা নিজেরা হস্তগত করে নেবেন।

বর্তমান মুহূর্তে, কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী পার্টির ভিতরে সবচেয়ে ,উজ্জ্বল এবং সব চেয়ে বিচলিত—যাঁরা চূড়ান্তভাবে অতুল্য ঘোষের আত্মবাহক এবং যাঁরা চূড়ান্তভাবে অতুল্য ঘোষের বিরোধী। এই দুইটি চরম শক্তি কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী পার্টিকে দ্বিধাবিভক্ত করে দেওয়ার ,মুখে এসেছে।

(দশম পৃষ্ঠায়)

সম্পাদকীয় :

বোরখার রাজনীতি

তেরাত্ত কার্টোন, বলাদেশের লৌহমানব তাঁর অর্দ্ধেক উঁচি প্রত্যাহার করেছেন। শুক্রবার ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় রিপোর্টার-দের শাসিয়েছিলেন যে, সেক্রে-টারী এবং ডিরেক্টরের আর কোনো খবর বলতে দেওয়া হবে না। অর্থাৎ রাইটার্স বিল্ডিংস-এর উপরে লৌহ যবনিকা টান-বার হুমকি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সোমবার, সেই বিধান-চন্দ্র রায়ই নিজের উক্তির ভাষ্য দিয়েছেন। তিনি নাকি বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, খবর দেওয়াতে কোন নিষেধ নেই, অফিসারেরা অভিমত দিতে পারবেন না। বিধানচন্দ্রের জিহ্বার সরম আছে, এমন প্রশংসা তাঁর প্রিয়তম চাটুকারেরাও করে না। কিন্তু এসেম্বলিতে ৫ দিনের বিতর্কে যদি ৬ বার কোনো মুখ্যমন্ত্রীর উক্তি অর্দ্ধসত্য বা অসত্য প্রমাণিত হয় এবং তিনদিন অতি-বাহিত হওয়ার পূর্বেই মুখ্য-মন্ত্রীকে যদি স্বীকার করতে হয় যে, তাঁর উক্তি অসত্য হয়েছিল, তাহলে গভর্ণমেণ্টের উচ্চতম আসনের মর্যাদা কোথায় থাকে?

মুখ্যমন্ত্রীর উক্তির বিরুদ্ধে প্রেসক্লাব যে সংসাহস দেখিয়ে-ছেন, প্রধানতঃ তার জন্যই এই প্রত্যাহার সম্ভব হয়েছে। একথাও ঠিক যে, বিধানচন্দ্র রায় ছাড়া আর কোনো মন্ত্রীর কাছ থেকে এই শৈবমুহূর্তের শুভবুদ্ধি-টুকুও আশা করা যায় না। তথাপি, একথা চিন্তা করার বিষয় যে, তাঁর ন্যায় দায়িত্বশীল ব্যক্তির কাছ থেকে এই close-door এর হীন মনোবৃত্তি কিভাবে প্রকাশিত হয়? আমরা সবটুকু দোষ মুখ্য-মন্ত্রীকেও দিই না। সংবাদপত্রের ধারা মালিক, তাঁরা ক্রীতদাসের খাতার সাগ্রহে নাম লিখিয়েছেন। এবং বিধানবাবু মূর্খ নন যে, বেতন এবং সাংবাদিকের সম্মান দুই-ই এই ক্রীতদাসের দেওয়া হবে। কিন্তু মর্যাদার কণ্ঠস্বর তুলতে পারলে তাঁর চৈতন্যও ফেরানো যায়, প্রেসক্লাবের প্রস্তা-বের দ্বারা একথা প্রমাণ হয়েছে।

কাজেই মুখ্যমন্ত্রী নিশ্চয়ই একথা উপলব্ধি করেছেন যে, তাঁর লাগাম-পরানো-মালিকেরা ছাড়াও সংবাদপত্রে আর এক-শ্রেণীর লোক আছে। সৌভাগ্য-ক্রমে সেইসব রিপোর্টার ও কর্ম-চারীদের মধ্যে নীতিবোধ এবং আদর্শবাদ এখনও তিরোহিত হয়নি। এবং হাতে কলমে যারা সংবাদপত্র প্রতিদিন তৈরী করে,

(দশম পৃষ্ঠায়)

বার লক্ষ বেকারের চাপে ভগ্নপ্রায় পশ্চিম বঙ্গের অর্থনীতিঃ মধ্য-বিত্তের ধূমায়িত বিক্ষোভ

(অর্থনৈতিক ভাষ্যকার)

'সম্প্রতি বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ব্যাঙ্ক, সওদাগরী আফিস, বীমা কোম্পানী, কারবারী সংস্থা, পেট্রোল বিক্রী কেন্দ্র প্রভৃতি ছয়টি প্রধান কর্ম্মী প্রতিষ্ঠান এক স্মারকলিপিতে জানিয়েছেন যে বাংলার মধ্যবিত্তসমাজে বেকার সমস্যার দরুণ উদ্বেগ, অশান্তি ও ক্ষোভ ধূমায়িত হয়ে উঠেছে। মুদ্রাবিনিময় ও আমদানী রপ্তানীর নিয়ন্ত্রনে ছাঁটাই, অসঙ্গত বিশ্বেষে কর্ম্মচ্যুতি, শিল্প ও ব্যবসায়ী সংস্থাগুলির খেয়ালখুসীমত চাকুরীর সর্ত্তপরিবর্ত্তন ইত্যাদি কারণে শত শত মধ্যবিত্তের কর্ম্মচ্যুতি আসন্ন বলে। তাঁরা বিশেষ ভাবে শঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। এই পরিস্থিতির উদ্ভব হঠাৎ একদিনে হয়নি। বাংলার সমাজজীবনে বেকার সমস্যা অনেকদিন ধরেই আগু-নের মত ধিকি ধিকি জ্বলছিল, আজ তার বিপুল প্রসার বাংলার আর্থনৈতিক আকাশে আশঙ্কার ঘন ধূম্রজাল সৃষ্টি করেছে মাত্র।

হিসাব করে দেখা যায় পশ্চিম বাংলার মত ক্ষুদ্ররাজ্যে বেকার সংখ্যা ১২ লাখের ও বেশী এবং যারা ম্যাট্রিকুলেশন বা ততোধিক কোন পরীক্ষা পাশ করে কর্ম্মহীন হয়ে বসে আছেন সেই শিক্ষিত বেকারদের সংখ্যা ১।১৬,০০০ এর বেশী। এই সংখ্যার পেছনে দারিদ্র্য কত করুণ, ক্ষতি ও ব্যর্থতা কত হৃদয় বিদারক তার হিসাব করবার সময় এখন এসে গেছে।

কি ভাবে এই বিরাট সমস্যা আজ পশ্চিম বাংলাকে গ্রাস করতে বসেছে ও এর কোন প্রতিকার আছে কিনা এ সম্বন্ধে সরকারী বা বেসরকারী মহলে কোন প্রণালীবদ্ধ চিন্তা ও পরিকল্পনা হয়েছে কিনা আমাদের জানা নেই। হয়ত আমাদের রাজনৈতিক নেতারা স্থিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার গণ্ডীর মধ্যেই তাঁদের শুভেচ্ছা ও আদর্শ সীমাবদ্ধ রেখে নিশ্চিন্ত হয়ে আগামী নির্বাচনের দিকে চেয়ে আছেন। এবে কত বড় সর্বনেশে ভুল তা বুঝতে খুব বেশী বুদ্ধির প্রয়োজন নেই।

প্রথমতঃ সেই পাঠশালার উপমা ধার করে বলা যায় যে পশ্চিম বাংলার অর্থনৈতিক চৌবাচ্চায় শুধু বাইরে থেকে জল ঢুকবার নল যোগানো থাকেনি, ভেতর থেকে জল বের করে নেবার নলও আছে এবং সেই নলগুলি যে সংখ্যায় অনেক বেশী, অনেকবেশী প্রশস্ত ও সক্রিয় তা আমাদের ভুলে গেলে চলবেনা। স্থিতীয়তঃ, পশ্চিম বাংলার চৌবাচ্চার মধ্যেই যে অনেক জলশোষক আছে এবং বাইরে থেকে অবিরাম জলশোষক আসছে তার খবর আমরা জেনেও জানতে চাইনে, জেনেও নাঁরব থাকতে চাই। কেন?

স্থিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পশ্চিম বাংলায় কতগুলি উন্নয়ন কাজ হতে যাচ্ছে এবং তার ফলে দুই লাখের মত চাকুরী তৈরী হবে। কিন্তু তা যদি সত্যি ঘটে—অবশ্য সে সম্বন্ধে কিছু কিছু সন্দেহের অবকাশ আছেই—তবু বাংলার বেকার সমস্যার সামান্যতম সমাধানই সম্ভব হবে। সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির অধিকাংশ কর্ম্মসুযোগ বাংলার ভাগেই জুটবে এ আশা করা যায়, কিন্তু সব চেয়ে বড় সমস্যা আজ এই দাঁড়িয়েছে যে বেসরকারী শিল্পবাণিজ্য প্রতিষ্ঠানে বাংলালীর প্রবেশ সুযোগ অতি দ্রুত নিরুদ্ধ হয়ে আসবে। শিল্পবাণিজ্য ক্ষেত্রেই কর্মসুযোগ সব চেয়ে বেশী বলেই এই সমস্যার গুরুত্ব বাঙ্গালীর জীবন সংগ্রামে বিশেষভাবে বিশ্লেষন করে দেখবার যোগ্য।

(দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়)

কেন্দ্রীয় সরকারের বাঙ্গালী বিরোধী নীতি

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

কিছুদিন আগে বাঙালীর কর্মসুযোগ বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিতে কেন ক্রমশঃ হ্রাস হয়ে যাচ্ছে এই সমস্যা সম্বন্ধে একটি তদন্ত কমিটি নিয়োগের দাবী বিধানসভায় পেশ করা হয়েছিল। এই দাবী অত্যন্ত জরুরী ও সময়োপযোগী। বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে বাঙালীর সংখ্যা কত, গত দশ বছরে বাঙালীর সংখ্যা কত হ্রাস পেয়েছে এবং নতুন কর্মসুযোগে কতখানি আগে গ্রহণে তারা সমর্থ হয়েছে সে সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের দ্বারা একটি বিস্তৃত অনুসন্ধান হওয়া বাঞ্ছনীয়। বর্তমান পরিস্থিতি বিশেষ করে পর্যালোচনা করলে এই অনুসন্ধানের জরুরী প্রয়োজন আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

মোট ১২ লক্ষ বেকার

বাংলার বত্রিশ লাখ রাষ্ট্রে এক লক্ষ ষোল হাজার শিক্ষিত বেকার ও দেড় বার লক্ষ বেকার একটি ভয়াবহ সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সূচনা বলেই মনে করছে। যে রাষ্ট্রের শতকরা ৫ জন ও শতকরা শিক্ষিত ১২ জন কর্মহীন তার ভবিষ্যৎ যে সত্যি দুর্যোগপূর্ণ তা অস্বীকার করবার উপায় নেই।

বাংলাদেশের অধিকাংশে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসা-বাণিজ্য অবাঙালীর করতলগত হওয়ায় সমস্যা এত জটিল হয়ে উঠত না, যদি বাঙালী উদ্যোক্তরা কর্মসুযোগ লাভ করত। তারা শিক্ষা বা শিল্পগুণের অভাবে কর্মসুযোগ হতে বঞ্চিত হচ্ছে তা নয়। প্রধান কারণ এই যে, গত দশ বছরের মধ্যে অবাঙালী শিক্ষা ও ব্যবসায়ের বাঙালী বিত্তহীন ও বাঙালী বিরোধী নীতি যারা-বাহিক নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসৃত হয়ে এসেছে। নানা ধরণের অন্যায়ের ফলে বাঙালীরা চাকুরী হারাচ্ছে এবং নতুন বাঙালীদের প্রবেশ দ্বার রুদ্ধ করা হচ্ছে। বৈদেশিক প্রতিষ্ঠানসমূহিতে এখনো আভিজাত্যনির্বিশেষে কিছু অভিজ্ঞতার সুযোগ কিছু কিছু কিন্তু অবাঙালী ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতে সেও নৈব চ।

কেন্দ্রীয় সরকারের বাঙ্গালী বিরোধী নীতি

এমন কি কেন্দ্রীয় সরকারের কোন কোন বিভাগে বাঙালী বিরোধী নীতি লোক নিয়োগ ব্যাপারে দিন দিন প্রকট হয়ে উঠছে। কেন্দ্রীয় বিভাগগুলির অধিকাংশই তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের মারফৎ নিয়োগ করে থাকেন, কিন্তু রেলওয়ে ও ডাক বিভাগ এ নিয়ম মেনে চলেন না। ফলে দেখা যায় বাংলাদেশের প্রত্যেকটি রেল কেন্দ্রে বাঙালীর কর্মসুযোগ সঙ্কীর্ণ হয়ে আসছে। কিছুদিন আগে খড়্গপুরে কেন্দ্রে কয়েক হাজার খালাসী নিয়োগ ব্যাপারে বাঙালী প্রার্থীরা তেমন সুযোগ পায় নি বলে অভিযোগ মুখর হয়ে উঠেছিল। উত্তর আসাম ও বিহার রাষ্ট্রের অনুপাতে বাঙালী প্রার্থীদের দাবী যে অনেক ভাবে ন্যূন হচ্ছে এরূপ অভিযোগও পাওয়া যাচ্ছে।

দুর্গাপুরে বাঙালীর চাকুরী নাই

আসানসোল-দুর্গাপুরে বাংলাদেশের Rhur অঞ্চলরূপে পরিণত হচ্ছে; অনেক বড় বড় শিল্পের আয়োজন চলেছে। কিন্তু এ সব স্থানেও বাঙালীর যথাযোগ্য স্থান হচ্ছেনা। আসানসোল হতে প্রকাশিত ৬ই নভেম্বর (১৯৫৭) তারিখের 'ডি টি রোড' সাপ্তাহিকে লেখা হয়েছে :

"বার্নপুর যদিও পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত তথাপি বার্নপুর কারখানায় বাঙালীর স্থান ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইয়া আসিতেছে। ১৯৫৭ সালে শতকরা ২.১ জন হারে বাঙালী এই কারখানায় নিযুক্ত করা হইয়াছে।

"বড় বাবুর দুর্গাপুরে ইস্পাত কারখানা বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হইতে যাইতেছে, কিন্তু এখানেও বাঙালীর স্থান নাই। সি সিনেমটোন প্যাটেল এই কারখানার সর্বশ্রেষ্ঠ বড় 'কনট্রাকটর' ঠিকাদার কোম্পানী। এই কোম্পানীতে হাজার হাজার শ্রমিক নিযুক্ত আছে, কিন্তু একজন বাঙালী শ্রমিকও নাই।"

নিজ ঘরেও পরবাসী

আসানসোল-বর্ণপুরের অঞ্চলের মত দমদম, আগড়পাড়া, বেলঘরিয়া, নৈহাটি অঞ্চলেও অনেক নতুন কল-কারখানা শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে। সেগুলিতেও বাঙালীদের অবস্থা বিশেষ করে অনুসন্ধানের যোগ্য। এ অঞ্চল সম্বন্ধেও অনেক অভিযোগ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছে।

বাংলাদেশের শিল্প-বাণিজ্য বাঙালীর স্থান কতটুকুতে সে সম্বন্ধে খুব নির্ভরযোগ্য তথ্য নেই, তবে 'স্যামপেল সার্ভে' প্রক্রিয়ায় যে সব তথ্য সংগৃহীত হয়েছে তার ভিত্তিতে হিসেব করে দেখা যায় শুধু শিল্প ক্ষেত্রেই শতকরা ৪২ জন অবাঙালী। বাঙালীরা যে স্বদেশে ক্রমশঃ বিদেশী হয়ে যাচ্ছে এ একটি বেদনাদায়ক পরিস্থিতি। খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল সেনের হিসাব যদি মোটামুটি ঠিক হয় তবে দেখা যায়, প্রতি বছর কয়েক কোটি টাকা মণিঅর্ডার মারফৎ বাংলাদেশের বাইরে চলে যায়। তারপর ব্যবসা-বাণিজ্য ও ব্যাঙ্কের লেনদেনের মাধ্যমে আরও কত কোটি টাকা বাংলাদেশ হতে চলে যায় তার হিসাব জানা নেই। না জানা থাকলেও এই সব সংখ্যাতত্ত্ব থেকে এই প্রমাণ হয় যে, শতকরা ৪২ জন বাইরে থেকে এসে বাংলার শিল্প-বাণিজ্যে জীবিকা অর্জন করছে এবং কোটি কোটি টাকা বাইরে নিয়ে যাচ্ছে। ক্রমশঃ এই সংখ্যা বাঙালী বিরোধী নীতির ফলে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বাংলার অর্থনৈতিক চৌবাচ্চা ক্রমশঃ নিঃশেষ হতে চলেছে। ভিন্ন রাষ্ট্র থেকে কেউ এ রাষ্ট্রে কাজ করতে আসবেন না বা ব্যবসা-বাণিজ্য করতে আসবেন না তা নয়। উড়িষ্যা সরকারের মত আমরা আশাকি তুলছি না যে, বাংলার শিল্প-বাণিজ্য দরিয়ায় ভিন্ন রাষ্ট্রীয়রা মাছ ধরতে আসতে পারবেন না। ভারতীয় সংবিধানে এ নীতির সমর্থন নেই। বাইরে থেকে যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করতে আসেন বাংলা চিরদিন তাদের স্বাগত জানিয়েছে, এখনো জানাচ্ছে। তবু এ দাবী আমাদের করবার দিন এসেছে যে, বাংলা-দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানে বাঙালীদের যথোপযুক্ত স্থান দিতেই হবে।

সমস্যার সমাধান কোথায়

এ সমস্যার সমাধান কি? বাংলা সরকার এবং বাংলার বেসরকারী নেতাগণ এ সম্বন্ধে কোন বিশেষ পরিকল্পনার কথা ভেসেছেন কিনা আমাদের জানা নেই। আমরা কয়েকটি প্রস্তাব করতে চাই :

(১) অতি শীঘ্র একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি নিযুক্ত করে পরিস্থিতির ব্যাপ্তি, জটিলতা ও কারণ পরম্পরা সম্বন্ধে বিস্তৃত-ভাবে তথ্য নির্ধারণ একান্ত করণীয়।

(২) বাংলা সরকার হতে এমন একটি সুচিন্তিত ও নির্দিষ্ট নীতি গ্রহণ করা কর্তব্য যাতে সমস্ত সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে বাঙালী ছেলেমেয়েদের উপযুক্ত স্থান লাভ সম্ভব ও সহজ হয়ে ওঠে। এ বিষয়ে আসাম, উড়িষ্যা ও বিহারের কর্মনীতির দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য।

Public Service Commission-এর এলেকার বাইরে যাবতীয় কর্মনিয়োগ—এম্‌প্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে প্রচলিত করা বাঞ্ছনীয়। প্রত্যেক রাজ্যেই এই প্রতিষ্ঠানগুলি কাজ করছে, কাজেই সর্বজনগ্রাহ্য ভিত্তিতে এই নীতি সমর্থনীয়।

(সপ্তম পৃষ্ঠার পর)

ইংরেজির কদর

জন্য বই লেখেন? সে কি শুধু মুষ্টিমেয় ইংরেজী শিক্ষিতদের জন্য? তারা যে জ্ঞানের ভাণ্ডারী, তা কেবে বিচ্ছেদ্রিত 'আলোক দীপ্তি কি ইংরেজী জানে না এমন স্বদেশবাসীদের মনের আঁধার দূর করবার জন্য নয়? আর কতদিন এই ধরণের "কপি-বৃত্তি" (নকলনবিশী), আমরা চালাব?

বাঙ্গালীর আদর্শ

আমাদের কথাবর্তায়, সাজ-পোষাকে, চালচলনে খাঁটি বাঙ্গালী হতে হবে। এই বাল-খিল্যদের দেশে বিদ্যাসাগর মহাশয় যে বাঙালীয়ের গরিমায় নিজের ধুতিচাদর এবং তালতলার চটি পরে বনস্পতির মত মাথা উচু করে দাঁড়িয়ে-ছিলেন, সেই আদর্শ আমাদের অনুকরণ করতে হবে। মনে রাখতে হবে কোন এক জাতির বাইরের সাজপোষাক, চালচলনের অনুকরণের দ্বারা নয়, ঐ জাতির অন্তরের চিন্তাধারা ও ভাব-সমৃদ্ধির স্বীকরণের দ্বারাই জাতি সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে পারে। 'খাঁটি সাহেব' হওয়ার মাইকেল মধুসূদনের এটা বুঝেছিলেন। তাই তার পক্ষে "এঁকেই কি বলে সভ্যতা" প্রহসনের মধ্যে তৎকালীন ইংগ-বঙ্গ সমাজের চৈতন্য সম্পাদনের জন্য কশাঘাত করা সম্ভব হয়েছিল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ সকলেই এই সত্যই উপলব্ধি করেছিলেন বলে তাঁরা ইংরেজ-দের অনুকরণের বদলে তাঁদের ধ্যানধারণা, ভাবসম্পদ স্বীয়-করণের দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যকে বিশ্বে মর্যাদার উত্তুঙ্গে শিখরে বসিয়ে গেছেন।

অনুকরণ বৃত্তিকে ধিক্‌। আমাদের আত্মশ্বিত ফিরবে কবে?

দেশীয় সংবাদের উক্তিটাক্তি

(চতুর্থ পৃষ্ঠার পর)

ফিরোদরকে একটি গাছের সঙ্গে বেঁধে পুলিশ তাঁকে গুলি করে হত্যা করে। বাঙ্গালায় মাকারীর উপর ভীষণ অত্যাচার চালানো হয় এবং তারই ফলে তিনি মারা যান।

উদ্বাস্তুদের কদর্শন

ভারত সরকার সম্প্রতি এক হিসেব প্রকাশ করে জানিয়েছেন যে, ১৯৫৭ সালের শেষ পর্যন্ত পুনর্বাসন অর্থ সাহায্য সংস্থা উদ্বাস্তুদের মোট ১২ কোটী ২৫ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা ঋণ মঞ্জুর করেছেন। তার মধ্যে পশ্চিম পাকিস্থানের উদ্বাস্তু-দের ৭ কোটী ১৭ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা এবং পূর্ব বঙ্গের উদ্বাস্তুদের ৪ কোটী ২৮ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। ১৯৫৭ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ঋণের জন্যে ৮৮,৪৮৭টি আবেদনপত্র এসেছিল এবং তার মধ্যে ৬,৪৭২টি ছাড়া আর সব ক্ষেত্রেই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে।

মেয়েরাও সমান দোষী

সম্প্রতি লোক সভার ও রাজ্য সভায় কয়েকজন সদস্য ব্যাভিচার সংক্রান্ত আইনের ক্ষেত্রে মেয়ে-দেরও শাস্তি দেবার ব্যবস্থা করার জন্যে দাবী জানিয়েছেন। এখনও পর্যন্ত ব্যাভিচার সংক্রান্ত আইনের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র পুরুষেরই শাস্তি দেবার ব্যবস্থা আছে — মেয়েদের শাস্তি দেবার বিধান নেই। রাজ্যসভার ডাঃ পি এন সপ্রু নারীর কবল থেকে পুরুষকে রক্ষার জন্যে একটি বিল উত্থাপন করতে চেয়ে বলে-ছেন যে, বর্তমান যুগে মেয়েরাও পুরুষকে কম প্রলুব্ধ করেনা — এ যুগে প্রলুব্ধ করার ব্যাপারটা আর এক তরফা নেই। লোক-সভায় শ্রীরঙ্গনাথ সিং বলেছেন যে, তাঁর এমন বহু ঘটনা জানা আছে, যেখানে মেয়েরাই পুরুষকে প্রলুব্ধ করেছে।

ডাঃ সপ্রু ও শ্রী সিং উভয়েই খুব সময়োপযোগী দাবী করে-ছেন। বর্তমান কালে আইনের এই ধরণের ত্রুটী থাকা ঠিক নয়। সংবিধানে উভয়াধিকারের ক্ষেত্রে এবং অন্যান্য সমস্ত ব্যাপারেই নারী ও পুরুষের সমান অধিকার স্বীকৃত হবার পরও পুরুষের প্রতি আইনের এ রকম পক্ষ-পাতিত্ব থাকা ঠিক নয়। বিবাহ করে এই ধরনের বিধান নারীর ক্ষমতা ও শক্তিকে হেয় প্রতিপন্ন করছে — নারী সমাজের পক্ষে এই বিধান সবিশেষ মানহানিকর। সুতরাং জাতির অধিকার সচেতন প্রতিটি নারীর এই আইনের সংশোধনের জন্য আন্দোলন করা একান্ত কর্তব্য।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা

শ্রী টি, টি, কৃষ্ণমাচারীর পদত্যাগ এবং মোলানা আজাদের মৃত্যুর ফলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার যে দুইটি পদ খালি হয়েছিল, পুরণের জন্যে মন্ত্রিসভায় ব্যাপক পরিবর্তন ও রদবদল হয়েছে। শিল্প ও বাণিজ্য দপ্ত-রের পদে নিযুক্ত করা হয়েছে। প্রীলাল বাহাদুর শাস্ত্রী শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের ভার পেয়েছেন আর তাঁর জায়গায় যানবাহন ও যোগাযোগ দপ্তরের ভার দেওয়া হয়েছে শ্রী এস, কে, পাটিলকে। উত্তর প্রদেশের অর্থমন্ত্রী হাফিজ মহম্মদ ইব্রাহিম কেন্দ্রীয় মন্ত্রি-সভায় সেচ ও বিদ্যুৎ দপ্তরের মন্ত্রী হিসাবে নিযুক্ত হয়েছেন। রাষ্ট্রমন্ত্রী ডাঃ কে, এল, শ্রীমালি শিক্ষা দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত হয়েছেন। অন্যের অর্থমন্ত্রী শ্রী বি, গোপালন রেলওয়ে অর্থনৈতিক দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী এবং আরও চারজন নতুন উপমন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছেন।

এই দপ্তর পুনর্বণ্টন এবং নতুন মন্ত্রী নিয়োগের ব্যাপারে একটি বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় হল এই যে, স্বাধীনতালাভের পর থেকে এই সর্বপ্রথম শিক্ষা দপ্তর একজন রাষ্ট্রমন্ত্রীর অধীনে গেল।

মন্ত্রিসভায় মাত্র দুইটি শূন্য আসন পূরণ করতে গিয়ে যে রকম ব্যাপকভাবে দপ্তর পুনর্বণ্টন করা হয়েছে, তা অবশ্যই সমা-লোচনার বিষয়। মাঝ পথে হঠাৎ এভাবে কাণ্ডারী পরিবর্তন হলে দপ্তরগুলির কাজে যে বেল অসুবিধা হয়, তা সকলেই স্বীকার করবেন। এত ওলট পালট করার একান্ত দরকার ছিল কি?

খনি দুর্ঘটনার তদন্ত

চিনাকুড়ি খনি দুর্ঘটনার তদন্তের জন্যে যে কমিশন নিযুক্ত হয়েছে, তার তিনজন এ্যাসেসরের মধ্যে চাঁফ ইনেস্পে-ক্টার অফ মাইনস শ্রী এস, এস, ত্রোবলের নিয়োগে আপত্তি জানিয়ে বিভিন্ন শ্রমিক ইউনিয়নের পক্ষ থেকে দরখাস্ত করা হয়েছে। ভারত সরকার খনি-দুর্ঘটনা সম্পর্কে তদন্ত কমিশন নিয়োগ-কালে সময়ের কার বার এই ভুল করছেন। খনি দুর্ঘটনার ব্যাপারে চাঁফ ইনেস্পেক্টার অফ মাইনস-এর অধীনস্থ বিভাগের বিরাট দায়িত্ব রয়েছে। তাঁর বিভাগ, এমনকি তিনি নিজেও দুর্ঘটনার জন্যে কতখানি দায়ী, তাও তদন্ত কমিশনকে বিচার করতে হবে। সুতরাং তাঁকে এ্যাসেসর রাখা কোনমতেই ঠিক নয়। খনিতে দুর্ঘটনা নিবারণের জন্যে প্রত্যেকটি খনি খুব ঘন ঘন পরিদর্শন এবং কোথাও কোন সামান্যতম ত্রুটী দেখলেই তার সংশোধন ও সে বিষয়ে খনির কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করে দেওয়া ইত্যাদি তাঁর বিভাগের দায়িত্ব এবং সে জন্যে মোটা মোটা বেতনে অনেক খনি ইনেস্পেক্টারও আছেন— আবার সেই সব ইনেস্পেক্টারদের পরিচালনার দায়িত্ব চাঁফ ইনেস্পেক্টারের। তাই, তাঁর এবং তার বিভাগ সম্পর্কে তদন্ত করতে হলে, তাঁকে তদন্তকারীর দলে রাখা ঠিক হবেনা।

বড়ঘেমো খনির দুর্ঘটনা সম্পর্কে তদন্তের ব্যাপারে ভারত সরকার এই একই ভুল করেছিলেন।

তদন্ত চলবার সময়ে জনৈক খনি বিশেষজ্ঞ একজন সাংবাদিকের কাছে মন্তব্য করে-ছিলেন যে, তদন্তের ফলাফল সম্পর্কে তিনি কোন আশা পোষণ করেন না। কারণ দু-র্ঘটনার ব্যাপারে যাঁর বিভাগ এবং নিজেরও কার্যকলাপ সম্পর্কে বিশেষভাবে তদন্ত হওয়া দরকার, তিনিই হয়েছেন একজন তদন্তকারী। এই প্রসঙ্গে আরও বলা আবশ্যক যে, এই চাঁফ ইনেস্পেক্টারই ছিলেন সেই কমিশনের একমাত্র খনি-বিশেষজ্ঞ এবং তার ফলে তদন্তের সময়ে 'টেক্‌নিক্যাল' খুটিনাটি বুঝবার জন্যে কমি-শনকে তাঁর উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হয়েছিল।।

চিনাকুড়ি দুর্ঘটনার তদন্ত করার ব্যাপারে সেই একই ভুল আবার অনুষ্ঠিত হতে চলেছে।

গুলবাহাদুর

শ্রীগুলবদন

আমার বাড়ীতে একটা টিয়া-পাখী আছে —তার নাম রেখেছি গুলেবাহাদুর।

নামের পেছনে কোন ব্যক্তি বা ইতিহাস আছে বলে আমি অন্ততঃ মনে করিনা। কারণ, এই যে আমি—বুঝে আলতা না হলেও গায়ের রং আমার শত্রুরাও চল্‌বেনা কৃষ্ণ বর্ণ। কিন্তু নাম আমার রাখা হয়েছে কালোবরণ। আর আপনি—মনে কিছু করবেননা—দেহে লাবণ্যের যে অভাব সেটা আয়নার সামনে দাঁড়ালে স্বীকার আপনাকে করতেই হবে অথচ, আপনি কিনা লাবণ্যলীন।

গুলেবাহাদুরের নামের পেছনে কিন্তু একটা ইতিহাস আছে—সে কাহিনীই আপনাদের শোনাবো।

চড়ে এসে পাখীটা যখন আমার বাসায় জুড়ে বসলো—এর একটা নামকরণের প্রয়োজন হলো।

শ্রীমুলনাথ বেঁচে নেই—সাহিত্যিকেতনের টিকিটও আমার মনে নেই। বাংলা আধুনিক সাহিত্যিক কেউ নামের কারণ—তারা সত্যিকারের [illegible] কুকুরকে করে বেঁচে [illegible] নিজেদেরই বড় [illegible] পরীক্ষার খাতা [illegible] সম্পাদক, করে রসগোল্লার পেছনে কেউ [illegible] আর, অনেকাতাকুর্ণ [illegible] বড়ো সাহিত্যিকদের এতেই [illegible] নিজের নাম ও নাকি [illegible] বাংলার মন্ত্রীমণ্ডলীর [illegible] একবার মনে এলো। সামাজিক ব্যাপারে এদের উৎসাহ [illegible] কারণ এরা যে গণতান্ত্রিক দেশের কর্ণধার। আমার আপনার মরা-বাচা সমস্যার বিরাট বোঝা কাঁধে গজিতে বসবার সাধে সাধেই বাঁধব এরা গতরে বসে ভারী হতে থাকবে, তবু হলনা ব্যাপারও এদের উৎসাহ সর্বজন পরিচিত। বিশ্বাস না হয়, খবরের কাগজের পাতা উল্টান। আমার আপনারই প্রতিবেশী — যারা এই সব মন্ত্রী উপমন্ত্রীদের কাছ থেকে সোজা পথেই হোক আর বাঁকা পথেই হোক, কিছু বাগিয়েছে বা বাগাবার ভরসা পেয়েছে — তাদের বাড়ীর অন্নপ্রাশন থেকে সুরু করে বৌভাত —এমনকি সাধ-ভক্ষণ সব ব্যাপারেই দেখবেন, অন্ততঃ খবরের কাগজে তাই ঘটাকরে ছাপা হয়— কোননাকোন মন্ত্রী উপমন্ত্রীর আবিভাব। এরা হলেন বেহেস্তের পাঁর—এদের বাদ দিয়ে নাকি বিয়ে সাদী ও আদ্যাশ্রাদ্ধ বন্ধ হয়ে যাবে।

সুতরাং উর্ধ্বলোকের এই সব সামাজিক প্রাণীদের কাছে আমার এই ক্ষুদ্র টিয়া পাখীটার নামকরণের আর্জি নিয়ে যখন যাবো যাবো করছি, অমনি এক অঘটন ঘটে গেলো। যখন শান্তিপুরে ডুবুডুবু নদে ভেসে যায় আর বাসবাজারের খালের জল আসা-যাওয়ার পথেরও তুফানে কালীঘাটের মন্দির চৌ চুকোরে, তখন শোনা গেলো, টিয়া ব্যাপার। বৈকুণ্ঠ ভেঙারীদের মধ্যে যে এক পাখি নাকি ছিলো সে নাকি ধরা পড়েছে; সুতরাং সুরে বাঁধানো ভাঙা বিণাতারা এখন কয়েকদিনের জন্য অন্য মাংসে বিরক্তি করবেন, তাদের সাময়িক এ উপবাস কয়েক রাত্রির জন্য [illegible] পড়েছে।

এই [illegible] উৎসাহ [illegible] উৎসাহ [illegible] মনাইয়ের কাছে [illegible] কিন্তু সেখানেও [illegible] হলো। সম্পাদক, [illegible] সময় কোথায়? প্রতি [illegible] তাদের বাংলাদেশের সবই নিয়ে নখদর্পণে। প্রতিষ্ঠানের কোন না কোনটার উৎসবে গিয়ে সভাপতিত্ব করতে হয়, নয়তো প্রধান অতিথি হয়ে কিছু ভাষণ দিতে হয়। প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারাও ভালো হয়ে দেখেন—তারা চেয়ে পেয়েছেন যে, সম্পাদক মনাইয়ের ভাষণ না হলে কাগজে তাদের উৎসবের খবর বেরুবেনা। অতএব সভাপতিত্ব মনাইরাও আমাকে নিস্তার করলেন।

এবং এই নৈরাশ্যের সময়ে যখন হাবুডুবু খাচ্ছি তখন—আপনার হয়ত বিশ্বাস হবেনা—উদ্ধার করলেন প্রতিবেশী এক ভদ্রমহিলা।

আফিস ফেরতা ঘরের বারান্দায় বসে যখন আকাশের গ্রহ নক্ষত্রাদি নাম নিয়ে গবেষণা করছি, তখন শুনতে পেলাম ছেলে-ছানে কথা হচ্ছে—

ঃ তা' হলে দিদি থাওয়াচ্ছেন কবে?

আসুন না একদিন। উনিতো এবার মোটরগাড়ী পাবেন, গাড়ী করে সাহেব পাড়ার কোন হোটেলে গিয়ে খাবো দাবো।

আর কিছু শোনা গেলো না। সাহেব পাড়া আর মোটর গাড়ীর রহস্যটা হঠাৎ বুঝতে পারলুমে না। ক্রমে ক্রমে জানা গেলো—ভদ্রমহিলা তার পাশের বাড়ীর বাসবাটীকে খবর দিচ্ছিলেন তার স্বামী নাকি হঠাৎ লটারী পাওয়ার মতো রাতারাতি একে মন্ত বড় চাকরী পেয়েছে—বাংলাদেশের লেবার কমিশনার, হাজার বারোশ মাইনে। (সেত্যিকারের লেবার কমিশনার মশাই মনে কিছু করবেন না)।

আজ সকালেও স্বামী বেচারীর সঙ্গে একচাট বাদ্‌ড় কোলা করতে করতে আফিসে বেরিয়েছি। ভদ্রলোক বল্‌ছিলো—আর মশাই, সব হলো পালা-পরবারির ব্যাপার। দশ বছর ধরে আমার ভিভিএন, কেরানীই রয়ে গেলুম, ইলেসপেক্টার হবার চান্সও পেলাম না।

তিনিই আজ গিন্নীর কল্যাণে লেবার কমিশনার হয়ে গেলেন—আপনাকেও ছাড়ে ভালো।

যাক, আমার টিয়াপাখীটার নামের একটা হিল্লে হয়ে গেলো। খুঁজে তার নাম দিলুম—গুলবাহাদুর।

নিস্তরঙ্গ চক্কোত্তি মশাইকে বাংলাদেশের আরো অনেক ব্যাপারে প্রয়োজন আছে। তার আত্মীয় স্বজনদের হিসেব নিকেশ যেমন নিয়মিত রাখেন তেমনি রাখেন তাদের ও দেশের জন্য কম কিছু করেন নি। অনেক পরিবারখানি, অনেক সরঞ্জাম, অনেক সংখ্যাতত্ত্ব—তিনি আগুলিয়ের সামনে রেখেছেন। কবুও, আজকে তাকে আমার যেতেই হবে। বাংলাদেশের গুলে-বাহাদুরদের একটা সরঞ্জামদিন করা আশু প্রয়োজন এবং চক্কোত্তি মশাই-ই এর জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি।

গুলেবাহাদুরদের কোন জাত-বেজাত নেই—স্ত্রী-পুরুষে ভেদ নেই। বিবাহার এক অপূর্ব সৃষ্টি এরা। এদের জিবে জড়তা নেই, চোখে পরদা নেই, মাথায় দ্বিধা নেই, বরসের স্পর্শও নেই। এরা না শৈব, না বৈষ্ণব, না শাক্ত। এদের জীবনের একমাত্র ধর্ম হ'লো গুলমারা।

বাজার থেকে লুঙ্গী পরে যে ভদ্রলোকটি ফিরছে—তার থলেটার একটু ঝুঁকি মারুন—দু' আনার কুচো চিংড়ি, এক আনার এক ফালি কুমড়ো আর হয়তো টুকিটাকি আনা চারপাচকের, কচু, আলু, আর আনা।

হঠাৎ মুখোমুখী হ'য়ে গেলে আপনি শুধোলেন ঃ কি বাজার হ'লো শ্রীমান মশাই?

অমনি সারা মুখে একটা অদ্ভুত ভাব ছড়িয়ে তিনি বলবেন—আর মশাই বাজার! ইচ্ছে করে বাড়ীতে কোনো আগুন ছেলেদিই। রোজ পাঁচ টাকা করে বাজার করাই; অথচ সব যেন নাসা, মুখে লাগেনা।

আর একটু এগিয়ে যান। বাসবাজারের বড় রাস্তার মোড়ে পাশ হাতে আর এক শ্রীমান মশাইকে দেখবেন—একটি সিগারা সহযোগে চা পান করছেন। তার বাড়ীতে নাকি রোজ পনের টাকার বাজার হয়। হিসেব চান? তবে শুনুন। সকাল বেলায় সিঙ্গারা খরচ আট আনা, বিকেল বেলায় মুড়ি দু' আনা, আর এক কাপ চেলে থেকে সুরু করে এক পোয়া মাছের বাজার—খরচ হ'লো এক টাকা দশ আনা। অর্থাৎ মোট খরচ হ'লো দু' টাকা চার আনা। বাদ্-বাকি টাকাটা কোথায় গেলো? এটা হ'লো কল্‌কাতার বনেদী ঘরের গুলে—এর বেশী আর নাই বা শুনলেন।

এক ভদ্রমহিলাকে বল্‌তে শুনেছি, তার এক খুড়শ্বশুরে মশাই খেলে হাটি হাটি পা পা তখন থেকেই নাকি তিনি ইংরেজীতে কবিতা লিখ্‌তেন।

আর এক ভদ্রমহিলার ভাইরের অন্নপ্রাশনে এদের পিতৃদেব একজন ফুল মার্চাণ্ট, অবশ্য বলে বেড়ায় প্রফেসর) নাবিদ দশ হাজার লোক কল্‌কাতার ছাদে বসে খেয়েছে।

আমার এক সহকর্মীর দেশের বাড়ীর পুকুরে (বর্তমানে পাকি-স্থানে) জলে-মাছে এক, অর্থাৎ সেই পুকুরের নাকি মানুষে মার পর্‌তে খেতো না, খেতো জল্ পর্‌তে।

তবে একটা কথা সব ভদ্রিলারাই বলে থাকেন—তাদের স্বামীরা কেউ-ই পাঁচ সাত শ টাকার কম মাইনে পান্ না। যারা স্বামী নন্, তাদের এটা চিরন্তার বিষয়।

আর যাঁর আমার গুলে-বাহাদুরের কাছে জিজ্ঞেস করেন, এটা সত্যি কি মিথ্যে—বাটো অমনি গলা বাড়িয়ে জবাব দেবে—গুলে' গুলে'—সব গুলে'।

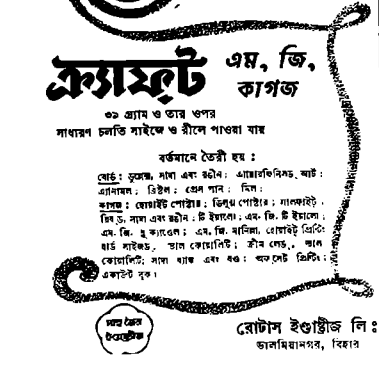

সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মহাপ্রভুর আফিম?

দর্পণের একজন একনিষ্ঠ পাঠক এবং আপনারের নির্ভীক সাংবাদিক-তার একজন দৃঢ় সমর্থক হওয়া সত্ত্বেও গত সংখ্যার সম্পাদকীয় মন্তব্যের (মহাপ্রভুর আফিম) সঙ্গে একমত হতে পারলাম না।

মহাপ্রভুর জন্মদিবসে কোলকাতায় যে বিরাট নগর কীর্ত্তনের শোভা-যাত্রা বেরিয়েছিল তাকে আপনারা সরাসরিই 'ভন্ডামির মহোৎসব,' 'একচেরাঁর মহাপ্রভুর আফিম' সহে একমত হতে পারলাম না।

মহাপ্রভুর জন্মদিবসে কোলকাতায় যে বিরাট নগর কীর্ত্তনের শোভা-যাত্রা বেরিয়েছিল তাকে আপনারা সরাসরিই 'ভন্ডামির মহোৎসব,' 'একচেরাঁর মহাপ্রভুর আফিম' সহে একমত হতে পারলাম না। মতবিরোধ 'নিরবীয়' অপৌরুষ', মধ্যযুগীয় কুসংস্কার', ধর্মের রন্ধ্রান্বেষিক মোতাত' প্রভৃতি গালভরা বিশেষণে ভূষিত করেছেন। আপনার এ মন্তব্যের মধ্যে সূক্ষ্ম বাগ্‌বৈদগ্ধ্য থাকতে পারে কিন্তু বোধ হয় যুক্তিবত্তা নেই।

শ্রীচৈতন্যের প্রেম-ধর্মের আধ্যা-ত্মিক ব্যাখ্যা কি এবং দেশের বর্ত্ত-মান পরিস্থিতিতে সে প্রেম ধর্ম একেবারে অচল কি না তা নিয়ে হয়ত বিতর্কের অবকাশ আছে, কিন্তু সে আলোচনা এখানে করতে চাই না। তবে মহাপ্রভুর জন্মদিনে স্বতস্ফূর্ত জনতার আনন্দোল্লাসে আপনারের মত আলোড়িত হতে পারি নি।

আপনি নিশ্চয়ই অস্বীকার করবেন যে ইহানই জীবন যুদ্ধে ক্ত বিক্ষত হয়ে মানুষ যে ধর্মকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরতে চাচ্ছে তার একমাত্র কারণই হোল্ ধর্মের মাঝে শান্তির অন্বেষণ করা এবং পর পর দুটো মহাযুদ্ধের আঘাতে পঙ্গু মানুষেরা আজ যদি ধর্মের বন্ধিতে ভর করে আবার নোতুন ভাবে উঠতে চেষ্টা করে তা কি করে নিন্দনীয় হবে বুঝতে পারলাম না। মানুষের হৃদয় যদি উপবাসী না থাকে তাহলে সুস্থ ও শুভ প্রবৃত্তি ও সংগ্রাম করবার মত শক্তির অভিসে সে উদরের ক্ষুধা-বাড়ীতে নাকি রোজ পনের টাকার বাজার হয়। হিসেব চান? তবে শুনুন। সকাল বেলায় সিঙ্গারা খরচ আট আনা, বিকেল বেলায় মুড়ি দু' আনা, আর এক কাপ চেলে থেকে সুরু করে এক পোয়া মাছের বাজার—খরচ হ'লো এক টাকা দশ আনা। অর্থাৎ মোট খরচ হ'লো দু' টাকা চার আনা। বাদ্-বাকি টাকাটা কোথায় গেলো? এটা হ'লো কল্‌কাতার বনেদী ঘরের গুলে—এর বেশী আর নাই বা শুনলেন।

এক ভদ্রমহিলাকে বল্‌তে শুনেছি, তার এক খুড়শ্বশুরে মশাই খেলে হাটি হাটি পা পা তখন থেকেই নাকি তিনি ইংরেজীতে কবিতা লিখ্‌তেন।

আর এক ভদ্রমহিলার ভাইরের অন্নপ্রাশনে এদের পিতৃদেব একজন ফুল মার্চাণ্ট, অবশ্য বলে বেড়ায় প্রফেসর) নাবিদ দশ হাজার লোক কল্‌কাতার ছাদে বসে খেয়েছে।

আমার এক সহকর্মীর দেশের বাড়ীর পুকুরে (বর্তমানে পাকি-স্থানে) জলে-মাছে এক, অর্থাৎ সেই পুকুরের নাকি মানুষে মার পর্‌তে খেতো না, খেতো জল্ পর্‌তে।

তবে একটা কথা সব ভদ্রিলারাই বলে থাকেন—তাদের স্বামীরা কেউ-ই পাঁচ সাত শ টাকার কম মাইনে পান্ না। যারা স্বামী নন্, তাদের এটা চিরন্তার বিষয়।

আর যাঁর আমার গুলে-বাহাদুরের কাছে জিজ্ঞেস করেন, এটা সত্যি কি মিথ্যে—বাটো অমনি গলা বাড়িয়ে জবাব দেবে—গুলে' গুলে'—সব গুলে'।

কেও অনতিবিলম্বে মোটেও পারে। আজ তাই হতাশা জর্জরিত জাতির হৃদয়ের ক্ষুধা মেটাবার মত উপা-সান চাই এবং ধর্ম ও আধ্যাত্মিক প্রবৃত্তিকে যদি অফিডংপুপে নিয়ে করা হয় (পাশ্চাত্যের অনেক ভদ্র-বাদী রাষ্ট্রই যা করছেন) তাহলে বিকৃত রুচি ও উচ্ছৃঙ্খলতার সড়ক পথে সে আপনার ক্ষুধা চরিতার্থ করবেই। আমার তো মনে হয় ভদ্র-বাদী বিকৃত পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব আজ দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়া সত্ত্বেও দশ হাজার বার্ষি খোল করতাল নিয়ে মহাপ্রভুর নাম-গান যে করেছে এটি দেশের পক্ষে অত্যন্ত শুভ লক্ষণ। এই দশ-হাজার ব্যক্তি যদি কোথাই ছবি দেখার জন্য সহরের সিনেমার ভীড় জমাতো, কিংবা খেলার মাঠে হাংগামা বাঁধাত তাহলে কি তারা অধিকতর 'পৌরুষতার' পরিচয় দিত "সভ্যতার শব সামাধি ক্ষেত্র" থেকে পুনর্জীবিত হয়ে উঠত? আমার তো মনে হয় মহাপ্রভুর নামগানে দেশবাসীর যদি কিছু পিয়ে থাকে তাহলে সে আফিম নয় মৃত-সঞ্জীবনী সুধা।

কোন মহাপুরুষের জন্মদিনে বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সেই মত ও পথে বিশ্বাসী ব্যক্তিরা যদি ধর্মীয় প্রথা অনুসারে (যা আদৌ রুচি বিগর্হিত বলে প্রমাণিত হয়নি) কোনরূপ মিছিল বা শোভাযাত্রার বোগ দেয় এবং তাতে যদি কোন উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবর্গ যোগ দিয়েও থাকেন সেটি যে 'বাস্তব জীবন বোধ' এবং 'প্রাত্যহিক তাগিদ' থেকে জনতাকে দূরে ঠেলে দেবার অপচেষ্টা হবে একথা মানতে পারলুম না। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে শিখ, পার্শী এবং মুসলমানদের এ রকম অনেক বড় শোভাযাত্রা নির্দিষ্ট দিনে রাজপথে বেরিয়ে থাকে, এবং সেই সঙ্গে সেই ধর্মাবলম্বী অনেক পদস্থ ব্যক্তি সে শোভাযাত্রায় যোগ দিয়ে থাকেন, তাদের বিরুদ্ধে এরূপ অভ্যুত অভিযোগ পূর্বে কখনও উত্থাপিত হয়েছে বলে শুনিনি।

স্বিতীয়ত এও বলা যায় ব্যক্তি অবশ্য আছেন যে, বৈষ্ণব ধর্মের অনুশাসনে যদি নামগানের বিধানই থেকে থাকে তাহলে দেশবাসী সব কিছু ছেড়ে দিয়ে কেবল নাম-সংকীর্তনই করবে এমন কোন বিধান নিশ্চয়ই নেই—বাঁধও তাকে তাহলে সে সেটিই মেনে চলতে ক্রবে উৎসবের বক্তায় এমন কথা জনগণকে নিশ্চয়ই বলেন নি।

আপনার সম্পাদকীয় মন্তব্যে কয়েকজন মন্ত্রীর ব্যক্তিগত চরিত্র সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছেন তাতে বোধ হয় এই ধারণাটিই প্রবল হয় যে, আপনারের আসল রাগ মহা-প্রভুর আফিমের বিরুদ্ধে বরটা নয় ততটা মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে। কংগ্রেসের সমাজতান্ত্রিক নেতারা এই সংকীর্তনের পুরোধা হয়েছেন বলে আপনি সবিশেষ ক্ষুব্ধ হয়ে-ছেন। কিন্তু আমার মনে হয় আপনার এই ক্ষোভ 'অমূলক'। আজ এই সংকীর্তনকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের প্রত্যবশালী নেতৃবর্গ এবং রাষ্ট্র পরিচালকেরা সাধারণ মানুষের মঞ্চে নেমে এসেছেন; তুচ্ছতম, দীনতম সাধারণ মানবটিরও সাথে মিশে আজ নেতৃবর্গ' বে এরূপে একটি সাধারণ মিছিলে যোগদান করতে সক্ষম হয়েছেন তাতে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নেতৃবর্গের মর্যাদাই রক্ষিত হয়েছে বলে আমার বিশ্বাস।

শ্রীপার্থকুমার চট্টোপাধ্যায়, গোবরা-ডাঙ্গা, ২৪ পরগণা।

দেশীয় সংবাদের খুটিনাটি

কাশ্মীরের প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী শেখ আব্দুল্লার কার্যকলাপ ভারত ও কাশ্মীরের জনসাধারণের মনে উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে। তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মধারা সম্পর্কেও যথেষ্ট জল্পনা-কল্পনা চলছে। তাঁর সাম্প্রতিক বিবৃতি ও বক্তৃতাদি কাশ্মীর ও ভারতে সাম্প্রদায়িক মনোভাব সৃষ্টি করছে এবং তার ফলে দেশের অভ্যন্তরীন আইন ও শৃংখলা এবং সামগ্রিক নিরাপত্তা ব্যাহত হবার আশংকা আছে বলে অভিজ্ঞ মহল বিশ্বাস করেন।

শ্রীনগর থেকে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায় যে, উদ্ভিগ্নিত কারন-গুলির জন্যে শেখ আব্দুল্লাকে হয়ত আবার গ্রেপ্তার করা হতে পারে। অন্য দিকে কাশ্মীরে এবং উত্তর ভারতে শেখ আব্দুল্লার কার্যকলাপ এবং বক্তৃতাদির ফলে তাঁর বিরুদ্ধে বেশ বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। কাশ্মীরের জনগণ সন্দেহ করেন যে, শেখ আব্দুল্লা কাশ্মীরের উত্তর ভারতের প্রভাব দূর করার জন্যে এক প্রত্যক্ষ আন্দোলন আরম্ভ করার পরি-কল্পনা করছেন। তাঁর এবং তাঁর অনুচরদের কার্যকলাপে যে সন্দেহ আরও ঘনীভূত হচ্ছে, শেখ আব্দুল্লার অনুচররা নানা ভাবে, এমনকি ভয় দেখিয়ে ও লোভ করে লোকের কাছ থেকে টাকা আদায় করছে। কুখ্যাত রাজাকার বাহিনীও গঠিত হচ্ছে, যদিও এই রকমের বাহিনী গঠন বেআইনী। এ ছাড়া তিনি বিদেশী সাংবাদিকদের প্রভাবিত করছেন ভারতের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করার জন্যে। এত সব সত্বেও কাশ্মীর সরকার এখনও ধৈর্য ধরে আছেন। কিন্তু কেন? এখনও কি শিক্ষা হয়নি?

বিশ্ববিদ্যালয় সাহায্য কমিশন

বিশ্ববিদ্যালয় সাহায্য কমি-শন লোকসভায় যে রিপোর্ট পেশ করেছেন, তাতে ভারতীয় বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলির শোচনীয় ব্যর্থ-তার কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ছাত্র ভর্তির সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে বলা হয়েছে। কমিশনের রিপোর্টে দেখানো হয়েছে যে, ছাত্র সংখ্যা যে ভাবে বেড়েছে, শিক্ষাদানের ব্যবস্থা সেই তুলনায় সম্প্রসারিত হয়নি। বড় বড় সহরের কলেজ-গুলিতে ছাত্রের ভিড় খুব বেশী অথচ সেই অনুপাতে শিক্ষকের সংখ্যা খুবই কম।

তাই কমিশন মনে করেন যে, দেশের সামাবাস্থ সামর্থের দ্বারা শিক্ষার মান উন্নত করতে হলে ভর্তির সংখ্যা নিয়ন্ত্রন করা দর-কার। কমিশন আরও বলেছেন যে, শিক্ষাদান পেশার প্রতি দেশের প্রতি নবনারীদের আক-র্ষণ প্রায় নষ্ট হয়ে গেছে। সুতরাং সর্বস্তরের শিক্ষকদের প্রারম্ভিক বেতন ও বেতনের হার বৃদ্ধি করা উচিত। কমিশন তাঁদের রিপোর্টে বিশ্ববিদ্যালয়-গুলির উন্নতিসাধন, ছাত্র কল্যাণ ইত্যাদি বিষয়ে করেকটি গুরুত্ব-পূর্ণ সুপারিশ করেছেন।

ছাত্র কল্যাণ

ছাত্রদের মধ্যে যে সব উচ্ছৃংখলতা দেখা যায়, কমিশন তার করেকটি কারন উল্লেখ করেছেন। সেই কারণগুলির মধ্যে রাজনৈতিক দল কর্তৃক নির্বাচন অভিযানে ছাত্রদের ব্যবহার, করেকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের পরিবেশের অনুপযুক্ত ব্যবস্থা, আর্থিক অনটন, তার বহু বোঝাতাহীন ও অনুপযুক্ত বেতনভুক্ত শিক্ষক, সমাবর্তন পদ্ধতির অভাব, ডিগ্রি লাভের পর কর্মসংস্থানের অনিশ্চয়তা ইত্যাদি বিষয় উল্লেখযোগ্য।

কমিশন এই সমস্যা সম্পর্কে বিশেষভাবে চিন্তা করেছেন এবং অবশ্যই উন্নতির জন্যে কিছু কিছু ব্যবস্থারও অবতারণা করে ছেন। বিভিন্ন স্থানে ছাত্রদের জন্যে 'হোম' ক্লাব' ইত্যাদি স্থাপনের কথা তারা বিবেচনা করেছেন। সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের চিকিৎসার ব্যবস্থাও কমিশন করবেন।।

কমিশনের সুপারিশ বা মতামত যেরূপই হোক না কেন, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষায় ছাত্র ভর্তি নিয়ন্ত্রন করার ব্যাপারে যথেষ্ট মতভেদ আছে। দেশের তরুণ-দের যখন অন্য কোন পথ করে দেওয়া যাচ্ছেনা, তখন তাদের অন্ততঃ কিছুকাল উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে নিযুক্ত রাখার পথ বন্ধ করে দিলে তার ফল ভাল হবেনা সমাজে তার বিষময় প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে।

সুতরাং ছাত্র ভর্তি নিয়ন্ত্রন করে সমস্যার সমাধান হবেনা। বরং এক একটি কলেজে ছাত্রের ভিড় কমাবার জন্যে কলেজের সংখ্যা বাড়াবার দরকার। এর জন্যে দরকার হলে একই কলেজ ভবনে আলাদা আলাদা পরি-চালকমণ্ডলী ও শিক্ষকদের নিয়ে বিভিন্ন শিফটে ক্লাস করানো যেতে পারে। যত টাকাই লাগে কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধি করতেই হবে—ছাত্র সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা চলবেনা।

গোয়ায় অত্যাচার

গোয়ার জেল থেকে পালিয়ে ভারতে এসেছেন এমন কয়েকজন গোয়ার পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষের অমানুষিক অত্যাচারের কাহিনী প্রকাশ করেছেন। তাঁরা বে বিব-রণ দিয়েছেন তাতে প্রকাশ বে, ১৯৫৫ সালের আগষ্ট মাসে কৃষ্ণ

(নবম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

গত সপ্তাহে দুটি বিষয় পরিষ্কার হয়েছেই প্রথমত, আমে-রিকা এখন শুধু শীর্ষ সম্মেলনই নয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের বৈঠকের প্রস্তাব থেকেও পিছু হটবার আগ্রাণ চেষ্টা করছে এবং তা নিয়ে তাকে বৃটেন ও ফ্রান্সের সঙ্গে কঠিন মতবিরোধের সম্মুখীন হ'তে হয়েছে।

(২) আমেরিকার নেতৃত্বে কয়েকটি পশ্চিমী রাষ্ট্র ইন্দোনেশীয় সরকারের পতন ঘটিয়ে পশ্চিমী সমর্থক বিদ্রোহী সরকার স্থাপনের জন্য সামরিক সাহায্য দিচ্ছে। আমেরিকা বিদ্রোহী "সরকারকে" স্বীকৃতি দানের কথাও চিন্তা করছে।

আন্তর্জাতিক সংবাদ পর্য্যালোচনা—

ম্যানিলায় দক্ষিন-পূর্ব এশীয় চুক্তির বাৎসরিক বৈঠকের সুযোগে বৃটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকার পররাষ্ট্র মন্ত্রীরা শীর্ষ সম্মেলন সম্পর্কে ঘরোয়া আলোচনা করছেন। কোনো সন্দেহ নেই যে বৃটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীলয়েড এবং ফরাসী পররাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীপিনো শ্রীডালেসের মত বদলাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন।

তাঁদের অবশ্য বৈঠকের পর সাংবাদিকদের বলা হয় যে "সামান্যভাবে" তাদের মতভেদ দেখা দিয়েছে। কিন্তু লেদিনই শ্রীলয়েড বলেন, "আমাদের এখন কথা অল্পভাবে বলা উচিত যাতে বিশ্বের জনমত, আমাদের বিরুদ্ধে না যায়।" বিশ্বের জনমত বিরুদ্ধে যাচ্ছে, দেখে তিনি নিতান্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়েছেন।

শ্রীডালেস, শ্রীলিন্ডন এবং আরও অনেক আমেরিকান নেতা শীর্ষ সম্মেলন সম্পর্কে তাঁদের মত প্রকাশ করেছেন। সেগুলো আমার মারফাৎ বিভিন্ন; কিন্তু উদ্দেশ্য এক। শ্রীলিন্ডন বলেছেন, "ইতিহাস আমাদের দেখিয়েছে যে ব্যর্থ সম্মেলন স্নায়ুই যুদ্ধের পথ প্রশস্ত করা হয়।"

শীর্ষ সম্মেলন নিয়ে বৃটেনে এখন আমেরিকার বিরুদ্ধে বড় রড় বইছে। সরকারী মহল খোলাখুলি তাদের মত প্রকাশ করতে সাহস পাচ্ছে না, কিন্তু নানা সূত্রে যে ইঙ্গিত দিচ্ছে তার একমাত্র অর্থ হল এই যে, শ্রীডালেসের এক-গুয়েমি পরিত্যাগ করা উচিত।

শ্রমিক দলের নেতৃবৃন্দ তো উঠে পড়ে লেগেছেন। শ্রীবেভান শ্রীডালেসকে একহাত ইতিমধ্যেই নিয়েছেন ঃ কেন তিনি শীর্ষ সম্মেলনের বিষয়সূচী তৈরী করবার জন্য বুলগা পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের বৈঠকের প্রস্তাবে সম্মতি দেবার পর এখন পশ্চাদপসরণ করছেন। শ্রীগেটস্কেলও টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে বলেছেন, শীর্ষ সম্মে-লন হওয়া উচিত।

* * *

উদার পন্থী দৈনিক ম্যানচেষ্টার গার্ডিয়ানে লো সাহেবের এক কার্টুনে বৃটেনের মনোভাব চমৎকারভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। কার্টুনটিতে দেখান হয়েছে, শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেবার জন্য শ্রীম্যাকমিলান ও শ্রীলয়েড বাক্স-পেটরা গুছোচ্ছেন। কিন্তু তাঁদের মুস্কিল হয়েছে শ্রীডালেসকে নিয়ে। ডালেস সাহেব টান টান হয়ে দুটি চেয়ারের উপর শুয়ে পড়েছেন। বৃটিশ নেতৃদ্বয়ে সমস্যার পড়ে-ছেন—"এই অনমণীয় জিনিসটিকে বাক্সে পুরি কি করে?"

এদিকে দুশিয়া শীর্ষ সম্মেলনের আলোচনার বিষয়বস্তু হিসেবে নতুন চারটি প্রস্তাব করেছে—এর বিশ্বের জনমতের সামনে আমে-রিকা, এবং সেই সঙ্গে বৃটেন ও ফ্রান্সকে আর এক প্রস্থ বেকায়দায় ফেলেছে। দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্রে রুশিয়া এখন আমেরিকা থেকে অনেক এগিয়ে আছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও সে প্রস্তাব করেছে—শ্রীআইজেনহাওয়ার তা ইতিপূর্বে করেছিলেন—যে, যুদ্ধের জন্য মহানুন্যে ব্যবহার নিষিদ্ধ হোক এই সর্তে যে বিদেশ থেকে, বিশেষ করে ইউরোপ, পশ্চিম এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকা থেকে, সব সামরিক ঘাঁটি তুলে নিতে হবে।

আমেরিকা বলেছে সে এতে সায় দিতে পারে না। আমেরিকা মনে করে "স্বাধীন" দুনিয়াকে (এই স্বাধীন দুনিয়ার অবশ্য ফরমোজা, সাইপ্রাস, আলজিরিয়া ইত্যাদি দেশ-গুলো আছে) কমিউনিজমের জুজু থেকে রক্ষা করবার জন্যে রুশিয়ার চতুর্দিকে তার যুদ্ধের ঘাঁটি চাই। আবার এই, রুশিয়া তার সুবিধা-টুকু পরিত্যাগ করুক, আমার যা আছে তাই থাক'।

ইন্দোনেশীয়ার বিরোধে আমেরিকার উস্কানি

এশিয়ার "স্বাধীন" দুনিয়াওলার বিশেষ অস্বস্তিতে আছে। কর-মোজার কথা ছেড়েই দিলাম, পাকিস্তান, শ্যামদেশ ও ফিলিপাইন তাদের দলে ভিড়েছে, কিন্তু এশিয়ার এদের প্রভাব আর কত-টুকু। রুশিয়া ও চীনকে সামরিক ঘাটি দিয়ে ঘিরবার পরিকল্পনায় এখনও অনেক ফাঁক রয়ে গেছে।

ভারত, বর্মা ও ইন্দোনেশীয়াকে কিছুতেই বাগে আনা যাচ্ছে না। লোভ দেখান হয়েছে, ভয় দেখান হয়েছে, বহুরের পর বছর। কিন্তু এদেশগুলো নিরপেক্ষ নীতিতে নড়বড়োনাথা।

এবার তাই শুরু হয়েছে নতুন খেলা। ইন্দোনেশীয়াকে একঘরে আনতে পারলে, ক্রমে ক্রমে বর্মা ভারত, সিংহল ও আফগানিস্থানের সঙ্গে বোঝাপড়া করা সহজ হবে।

ইন্দোনেশীয়ার প্রেসিডেন্ট ডাঃ সুকর্ণ এতদিন পরে সন্দেহাতীত ভাষায় দুনিয়াকে জানিয়ে দিয়ে-ছেন, তার দেশে বিদ্রোহের পেছনে ইষ্টার্ন যোগাচ্ছে কে। আমেরিকা এমন কি, বৈদেশিক অস্ত্রশস্ত্রও বিমানযোগে সুমাত্রার বিদ্রোহীদের নিকট পৌছান হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমীদের নৌবহর ইন্দো-নেশিয়ার চতুর্দিকে টহল দিচ্ছে।

মানিলায় পৌছে শ্রীডালেস তো স্পষ্টই বলেছেন, সুমাত্রার বিদ্রোহী সরকারকে অনুমোদন দেওয়া যায় কিনা, আমেরিকা বিচার করে দেখছে।

* * *

ডাঃ সুকর্ণ বলেছেন ঃ বিদ্রোহীরা এমন কয়েকটি রাস্তের চর, যারা ইন্দোনেশিয়াকে তাদের শক্তিজোটে জড়াতে চায়। "আমরা কোনো জোটে যোগ দেব না। আমরা সকল দেশের সঙ্গে মৈত্রীর ভাব রাখতে চাই।"

শীর্ষ সম্মেলন ও পর-রাষ্ট্রমন্ত্রী বৈঠকের প্রস্তাবে মতবিরোধ

দক্ষিন-পূর্ব এশিয়া চুক্তি-গোষ্ঠীর বৈঠকে কমিউনিজমের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্ট বেশগুলো যে ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে তাতে সন্তোষ প্রকাশ করা হয়। পাকি-স্তান, শ্যামদেশ ও ফিলিপাইন আমেরিকার সন্তুষ্টির জন্য কি-না করছে?

নামোল্লেখ করা হয় নি, কিন্তু বৈঠকে ভারতের মত দেশগুলোর "অজ্ঞতার" চুক্তিভুক্ত দেশগুলো বিস্মিত হয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, দক্ষিনপূর্বে এশিয়ার নিরেষ বিপদ এই যে, এই অঞ্চলের কয়েকটি সরকার কমিউনিষ্ট না হয়েও "স্বাধীন" দুনিয়ার উপেক্ষা ও আদর্শের সংগে আন্তর্জাতিক কমিউনিজমের মতলবে পার্থক্য বুঝতে পারছে না। বৃটেনের শ্রীলয়েড এই সব দেশগুলোকে আশ্বাস দিয়ে বলেছেন, চুক্তির মধ্যে তোমরা না থাকলেও আমরা তোমাদের প্রতিরক্ষার জন্য কাজ করছি।

ম্যানিলায় একমাত্র পাকিস্তান ছাড়া ভারতের বিরুদ্ধে খোলা-খুলি বিষোদ্গার কেউ করে নি। আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রের প্রতিনিধ নবাব মোজাফর আলী খাঁ কিজিবলাগ দেশের চোখের পানী ফেলে প্রবানভ আমেরিকার উদ্দেশ্যে বলেছেন, এ কি ব্যাপার, এশিয়ার তোমরাও সত্যিকারের বন্ধু এবং বারা নিরপেক্ষ তাদের মধ্যে পার্থক্য দেখছ না ?

* * *

এই বৈঠকে কেউ কেউ আবার দুঃখ প্রকাশ করেছেন, এশিয়া আফ্রিকার দেশগুলোকে রুশিয়া আর কতটুকু সাহায্য দেয়; কিন্তু পশ্চিমীরা এত সাহায্য দেওয়া সত্ত্বেও কেবল বদনামেয় ভাগী হচ্ছে কেন ?

এর উত্তর অবশ্য কঠিন নয়। আমেরিকা সাহায্য দিয়ে মোটা দেশকে তার মোলাম বানাবার চেষ্টা করে, এবং তার ফলেই তার নীতি ব্যর্থ হয়।

রুশিয়া বিভিন্ন অকমিউনিষ্ট দেশকে আমেরিকার চাইতে অনেক অনেক কম সাহায্য দিয়েছে, কিন্তু কোনোদিন কোনোরূপ সর্ত আরোপ করবার চরাশত্ত করেছে বলে আজ অবধি সাহায্যপ্রাপ্ত দেশ-গুলোর মধ্যে কেউ অভিযোগ তোলে নি। নিশ্চয়ই অভিযোগ তুলবার কারণ ঘটে নি বলেই তোলে নি।

* * *

কমিউনিষ্ট বিরোধী জেনারেল নাসেরও রুশিয়ার বিরুদ্ধে এ দোষারোপ করেন নি। অবশ্য এমন পর্যায়ে পৌছেছে বে জেনা-রেল নাসের আজ মিশরের স্বাধীনতা রক্ষা করবার জন্যই পশ্চিমীদের থেকে ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছেন এবং মিশর যতই পশ্চিমীদের থেকে দূরে যাচ্ছে ততই সে রুশিয়ার উপর বেশী নির্ভর করতে বাধ্য হচ্ছে।

আমেরিকা যতদিন দুষরপনাম না করবে বে, এশিয়া-আফ্রিকার সবা সদা স্বাধীন হওয়া সব দেশ-গুলোকে টাকার লোভে বা কমিউনিষ্ট জুজুর ভয় দেখিয়ে দলে ভিড়ানো যাবে না, ততদিন তার বদনাম দূর হবার নয়। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য পশ্চিমীরাও তার বদনামের অংশীদার হতে বাধ্য।

(অষ্টম পৃষ্ঠার পর)

অপরদিকে তার দুঃখ। আত্মস্থ হবার যে ক্ষমতার ° বড় ঔপন্যাসিকের চেষ্টা দানা বাঁধে সে ক্ষমতা তাঁর পরবর্তী জীবনে বড়ই বিরল।

এ প্রসংগে থুজটি প্রসাদের উপন্যাসত্রয়ের স্বরূপকে বুঝে প্রণিধানযোগ্য। যে প্রয়োজনীয় Sophistication নাগরিক মনের গোড়ায় জল ঢালে, লেখকের মধ্যে বর্তমান। যদিও সাম্প্রতিক "মনে এলো"-র এলোমেলোমি থেকে থুজটিবাবুর চিন্তা একে-বারে মুক্ত নয় তবু আধুনিক মনের সমস্যাকে ধরায় লেখকের দান এক অনস্বীকার্য আরম্ভ।

এ ছাড়া একান্তে উপন্যাসের ক্ষেত্রে যাঁরা দারুণ নামডাকা তাঁদের চেয়ে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে আধুনিকতার বহিরপণা অনু-সন্ধানেই সীমাবদ্ধ। বিষয়বস্তুর বিস্তার হয়েছে কিন্তু আধুনিক মনের বিকাশ হয় নি। প্রকাশ-ভংগী, চরিত্র ও ঘটনা সন্নিবেশে বোধের অপমৃত্যুতে আধুনিক মনের সমস্যা প্রায় নির্বাসিত।

বাঙ্গলোর অপরাধ ও রাজনীতি

'৪১ সালের প্রথম দিকের কথা। ঢাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বেধেছে। কলকাতা থেকে হিন্দু-মুসলমান ছাত্রদের এক শুভেচ্ছা মিশনের সঙ্গে ঢাকা গিয়েছিলাম ছাত্রজীবনে অসম্প্রদায়িক প্রশমনের প্রচেষ্টায়। প্রথম দিকে আমরা ছিলাম রমনায় একজন সুপরিচিত মুসলমান অধ্যাপকের বাড়িতে। কয়েকদিন পরে মিশনের অন্য সদস্যরা কলকাতা ফিরে আসেন; কিন্তু আমি ওখানেই থেকে যাই দাঙ্গা রোধ করার কাজ নিয়ে। সমস্ত সহর হিন্দু-মুসলমান অধ্যুষিত এলাকার ভাগ হয়ে গিয়েছে। নালার পাশ দিয়ে, কার, বাড়ির আঙিনার মধ্যে দিয়ে নতুন পথ হয়েছে। ঐ অস্বাভাবিক পরিবেশের মধ্যে বসবাস রাজনৈতিক জীবনে নতুন এক অভিজ্ঞতা সম্ভাবনার ইঙ্গিত পাই।

ডাকনাইটে, সাহসী এবং উপদ্রবী ছেলেদের নিয়ে দল পাকানোর খবর জানতাম। কিন্তু, ঢাকার রাজনৈতিক দলের সঙ্গে অপরাধীদের সম্পর্ক আরও অনেক ঘনিষ্ঠ বলে মনে হয়েছিল। পাড়ায় পাড়ায় নামকরা গুণ্ডাছেলেরা পাল্টি আত্মীয়তাবোধের স্থান নিয়েছে। সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার সুযোগ নাগরিকদের স্বাভাবিক নিরীক্ষ্যের অন্তর্হিত হয়েছে। দেশভাগাভাগির আগে ঢাকা শহরেই সব থেকে বেশি রাজনৈতিক খুন, উপদ্রব ছিল, এবং তাদের মধ্যে প্রায়ই কলহবিবাদ হতো। আবার কখনও হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার মধ্যে রাজনৈতিক খুন-উপদ্রবরাও ভাঁড়ে পড়তো। ৪১ এ ঘটনার পটি ছিল ভিন্ন রকমের। দুই পক্ষেই রাজনৈতিক নেতারা প্রত্যক্ষভাবে অপরাধীদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেন। অন্য সব কেন্দ্রার মাল-মসলাও যোগান এবং নক্সকরা অপরাধীদের নিজেদের দলভুক্ত করেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া বাঙালী সমাজ জীবনের উপর দেখা যেতে আরম্ভ করলো ৪২ এর মোড়ার দিক থেকে। ঢাকা সহরেই সবপ্রথমদিকে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীকে নৃশংসভাবে হত্যা করার অধ্যায় সূচিত হয়। পরে, নারায়ণগঞ্জ, ময়মনসিং এবং আরও কয়েকটা কেন্দ্রে রাজনৈতিক খুনো-খুনি হয়। '৪২-৪৫ এর রাজনৈতিক সন্ত্রাস-সম্বর্ষ, নৃশংসে আক্রমণ, প্রতিদ্বন্দ্বীকে প্রহার বা হত্যার প্রচেষ্টার আড়ালে যাঁরা ব্যাপদস্থী মিলন-মঞ্চের পুরোধা তাঁদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। আরও পরিষ্কার করে বলতে গেলে মত ও পথের স্বন্দ-দ্বেষ এর দুই প্রধান প্রতিপক্ষ ছিল কমিউনিস্ট এবং অ-কমিউনিস্ট বামপন্থী দল, উপদল। বিভক্ত বাঙলার বেন নির্বাচনের সময় মুসলিম লীগ প্রতিদ্বন্দ্বী জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতা ও তাঁদের সমর্থকদের বিরুদ্ধে ঐরকম কাওয়াই প্রয়োগ করে।

'৪৬ এর আগষ্ট মাসে মুসলীম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস উপলক্ষে যে সর্বনাশা গৃহযুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠে তা বাঙালীর সমাজজীবনকে পঙ্গিয়ে ছারখার করে। কলকাতার ইতিহাসের এই অভিশপ্ত অধ্যায়ের সমস্ত ঘটনা আজও প্রকাশিত হয়নি। সে পথে বাধার অন্ত নেই। সম্প্রতিক কাহিনীর অনেকেরও অজানা উদ্দেশ্যের সঙ্গে দায়িত্বজ্ঞানহীন এক-দেশদর্শী কর ছেলের। ফলে, সত্যনিষ্ঠা অপেক্ষাকৃত চাল হয়। বর্তমান প্রজন্ম '৪৬-৪৭ এর লাঞ্ছনার কারণ বা তাতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ভূমিকা আলোচ্য বিষয় নয়। তাই, বড় কথার অবতারণা না করে শুধু এইটুকু বললেই বর্ণেষ্ট যে একবছরের সাম্প্রদায়িক হানাহানির মধ্যে দিয়ে বহু তরুণ বাঙালী অপরাধীদের সঙ্গে সংযুক্ত হয় এবং নানারকম সমাজবিরোধী কাজ করে।

ঢাকার '৪১ সালে যে ঘটনা সীমিত পটভূমিতে হয়েছিল, '৪৬-৪৭ এ কলকাতা, শিলপাঞ্চলে এবং অন্যান্য কয়েকটা শহরে তা আরও

নিখিল মৈত্র

অনেকের বিরাট, বীভৎস ভাবে অনুষ্ঠিত হয়। সামরিক অস্ত্র (বিশেষ করে মার্কিন বাহিনীর) নানাভাবে দাঙ্গাকারীদের হাতে আসে। দেশী রাজা-রাজড়াদের অস্ত্রশালা থেকেও কিছু কিছু আগেয়াস্ত্র বাইরে যায়। সাম্প্রদায়িক দ্বেষবহ্নিকে প্রজ্জ্বলিত করা ও তাতে ইন্ধন যোগাবার জন্যে নানাদিক থেকে প্রচুর অর্থও পাওয়া যেতো। পাড়ার সাধারণ মানুষে পয়সা কড়ি তুলে দিয়েছিল গুণ্ডাছেলেদের হাতে। বিস্তশালী গৃহস্থও সঞ্চিত বিত্ত রক্ষার জন্যে বেশ মোটা রকম সেলামি নিতে পেছু পাও হয় নি। অনেক ক্ষেত্রেই এই অর্থ ঠিক ঠিকভাবে ব্যয়িত হয়েছিল। ব্যবকরা ছাড়া অন্য কোনও আক্রমণাত্মক কাজও হয়তো করেন নি। মাঝে মাঝে স্থানীয় ভিত্তিতে ভিন্ন সম্প্রদায়ের পল্লী নেতাদের সঙ্গে মিলে মিশে শান্তি কমিটি বা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সৃষ্টির চেষ্টা হয়েছে। এত বড় দ্বেষ দাবাগ্নির মধ্যে এই শুভে প্রয়াসের প্রতিক্রিয়া খুব বেশি হয় নি।

খুন, জখম, গৃহদাহ, বোমা ফাটানো, স্টেনগান, রিভলবার, পিস্তল প্রভৃতি ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে যে যুবকের হাতে খড়ি হলো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মধ্যে দিয়ে, স্বাধীনতার পর তারা সবাই সুস্থে, শান্তিতিত্তে, নাগরিক হতে পারলো না। রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে সম্পর্ক'ও পরিবর্তিত পরিবেশে বাড়লো, দাঙ্গার ভয় দেখিয়ে ব্যবসায়ী বা বাঁধকৃ পরিবারের লোকজনের কাছ থেকে টাকা কড়ি আদায়ও আরম্ভ হলো। সুবিধে পেলে ডাকাতি, লুটেপাট করতেও এরা দ্বিধা করতো না। রাজনৈতিক নেতারা বাঙলাদেশে সর্বপ্রথম রাষ্ট্রক্ষমতার আস্বাদ পেয়েছেন। তরিও প্রতিপক্ষের লোককে ঠেঙ্গা-বার জন্যে এই সব যুবকদের ব্যবহার করতে আরম্ভ করলেন। মিটি ভাঙ্গা, সভায় সৃষ্টি করা, প্রতিদ্বন্দ্বী সংগঠনের অফিস চড়াও করা, জিনিষপত্র তছনছ করার কাজও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের নির্দেশ অনুষ্ঠিত হলো। ডাকাতি, রাহাজানির সঙ্গে রাজনৈতিক দলের সমর্থনও কোথাও কোথাও জুটলো।

এই সব সমাজবিরোধী কার্যাবলীদের উৎসাহ এবং অনুপ্রেরণা সরকার এবং বিরোধী পক্ষ দুই দিক থেকে এসেছে। সরকারী কর্মচারীদের যে দলের চাকরি, তাদের পক্ষে নানাভাবে এই সব সমাজ-বিরোধী কার্যকলাপের নায়ক ও উপ-নায়কদের সহায়তা ও পৃষ্ঠ-পোষণা করা সম্ভব। কিন্তু তবুও একটা সীমা আছে। বড় ক্ষেত্রে এই সহায়তা ও পৃষ্ঠপোষণা সকল সময়ই প্রকাশ্যভাবে দেওয়া যায় না। তাই, বড় বড় ব্যাপারে এই সব সমাজবিরোধী কার্যকলাপের উৎসাহ এবং অনুপ্রেরণা বিরোধী পক্ষের কাছ থেকেই এসেছে বেশি। এই সব সমাজবিরোধী কার্যকলাপের উৎসাহ এবং অনুপ্রেরণা বিরোধী পক্ষের কাছ থেকেই এসেছে বেশি। এই সব সমাজবিরোধী কার্যকলাপের উৎসাহ এবং অনুপ্রেরণা বিরোধী পক্ষের কাছ থেকেই এসেছে বেশি।

(শেষাংশ পৃষ্ঠা ১৩ দ্রষ্টব্য)

শিলংয়ের চিঠি

অর্থমন্ত্রী পদের জন্য শ্রীশর্মা ও ফকরুদ্দিনের মধ্যে দ্বন্দ্বের সমাপ্তি

অনা কোথাও আগে এরকম হয়েছে কিনা জানি না তবে আসামে এবারে হোল—বিধান সভায় বাজেট পেশ হবার আগের দিন পর্যন্ত প্রায় সবাই, ইস্কক সেক্রেটারিয়েটের আমলারা, পরস্পরের মুখে চাওয়াচাওয়ি করেছেন বাজেট বক্তৃতা দেবেন কে?

শ্রীদেবেশ্বর শর্মা এবং শ্রীফকরুদ্দিন আলি আহ্‌মদের মধ্যে অর্থ দপ্তর নিয়ে টানাটানি চলছিল জোর। মহাসমস্যা উপস্থিত হয়েছিল বাজেট পেশ করার ঠিক আগে।

শ্রীশর্মা মুখ্যমন্ত্রী শ্রীচলিহার কাছে চিঠি লিখে জানালেন অর্থ-মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করতে হলে তিনি আদৌ মন্ত্রী থাকবেন না এবং তকনই পদত্যাগ করতে তিনি রাজী। পরিষ্কার জবাব না পাওয়া পর্যন্ত তিনি হাতমুখিরে বসাই উচিত সাব্যস্ত করলেন।

ওদিকে সময় চলে যায়—বাজেট বক্তৃতা ছাপাতে পাঠানো দরকার। অগের শোভাযাত্রার উদ্দেশ্যে আলোকৃত বাজেট বক্তৃতার বস্তরার ছাপাখানায় যাওয়ার পথে অর্থমন্ত্রীর ঘরটা ঘুরে যাওয়াই যেওয়া। কিন্তু এবার প্রসাধক কে তাই ঠিক করা নিয়ে না সুতরাং কাঠখোট্টা চেহারার ওপর আর মোলায়েম কথার প্রলেপ পড়লো না।

বক্তৃতা পাঠ করলেন শেষ পর্যন্ত শ্রীশর্মাই। অর্থাৎ তাঁর পদত্যাগের প্রশ্ন আপাতত মুলতুবী রইলো। বাজেট পাশ হবার পরে দিনের আবার কথাটা উঠবে। শ্রীআহ্‌মদ মন্ত্রী হয়েছেন বটে তবে এখনো তাঁকে কোন দপ্তরের দায়িত্ব দেওয়া হয় নি, হয়ত বাজেট পাশ না হওয়া অবধি এমনি করেই চলবে।

ফকরুদ্দিন সাহেবের মাতব্বরী

তবে কোন বিশেষ দপ্তরের ভার না থাকা সত্ত্বেও শ্রীআহ্‌মদ যে আসাম মন্ত্রিসভায় বিপুল প্রভাবশালী তা পরিচয় তিনি দিতে চেষ্টা করছেন পদে পদে। তিনি বিধানসভার মুখ্যমন্ত্রীর পাশের আসনটি দখল করেছেন।

তা ছাড়া ইতিমধ্যে এক বক্তৃতায় তিনি বিধানসভাকে জানালেন যে তিনি ট্রাইবাল এরিয়াস দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীউইলিয়ামসন সংমাকে এটা করতে বলেছেন সেটা করতে বলে-ছেন। কোন অধিকারে তিনি তাঁর সমপদস্থ আরেকজন মন্ত্রীর উপর হুকুমজারী করবার চেষ্টা করলেন তা কিন্তু বোঝা গেল না।

কথাটা অনেক জায়গায়ই আলোচিত হয়েছে পরে এবং শুনেছি শ্রী আহ্‌মদ নাকি শেষ পর্যন্ত সাফাই গাইতে চেয়েছেন যে ৬টা কিরকম হঠাৎ তাঁর মুখে লিস্ট বেরিয়ে গিয়েছিল। তাও যদি চয় তাহলে ত বলতে হবে ইউনাইটেড নেশান্স যে আমাদের কেন্দের প্রতিনিধির করতে পাঠিয়ে ভারত সরকার যাঁর ধীগণনাদিতে আপত্তি করছেন তাঁর মুখে প্রস্তুত উক্তি অত্যন্ত নিম্নরের কথা।

গত সাধারণ নির্বাচনের পর

গঠিত মেঘী মন্ত্রিসভার আয়ু ছিল ২৫০ দিন। হিসেব করে দেখা গেছে তার মধ্যেই নক্সন মন্ত্রী গড়পড়তা ১৮ দিন করে 'টুরে' বাইরে ছিলেন। আর মন্ত্রীদের 'টুরে' ত চারটিমাত্র কাজ নয় সুতরাং সেই খাতেই গেছে সরকারী তহবিল থেকে ১,০৭,৫০০.।

এই অঙ্কের মধ্যে অবশ্য উপমন্ত্রীদের সফরের খরচও ধরা আছে। আসামের উপমন্ত্রীরাও টুরের ব্যাপারে কম যান না—তাঁরা সাতজনে মিলে পাল্লা দিয়েই এ নক্সন মন্ত্রীর সমান গড়পড়তা প্রায় ১৮ দিন করে বাইরে ছিলেন।

অত টুরের কি দরকার আপনি আমি বুঝবো না। আমাদের মনে হয় আসামের বিধানসভায় বেদিন অভ্যাবকারক খাদ্যদ্রব্যাদির মূল্য-বৃদ্ধি সম্বন্ধে বেসরকারী প্রস্তাব আলোচনা হয়, খাদ্য ও সরবরাহ মন্ত্রীর উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু মন্ত্রী মহাশয় নিশ্চয়ই মানের সঙ্গে একমত নন নইলে তিনি "Farmers' Forum Convention and other official duties" এর জন্য ঐ বিতর্ক ফেলে দিল্লী ছুটলেন কেন?

আসামে জিনিষপত্র অগ্নি-মূল্য বললেও ঠিক অবস্থাটা বোঝানো যায় না—কলকাতার মানের সঙ্গে তুলনা করে দেখুন মাসের শের ৮, অর্থাৎ উঠলে ব্যাপারখানা কি রকম। এ সম্বন্ধে সরকার অবহিত আছেন বলিয়া থাকলে কতখানি তাও খাদ্যসর-বরাহ মন্ত্রী শ্রীমহেন্দ্র হক চৌধুরী বিধানসভাকে নিজে জানানো প্রয়োজন মনে করলেন না, ফার্মার্স ফোরাম 'কনভেনশন্' হোল তাঁর কাছে বেশী জরুরী।

তিনি তাঁর সহকর্মী শিক্ষা ও শিল্প বিভাগীয় মন্ত্রী শ্রীকামাখ্যাপ্রসাদ ত্রিপাঠীর ওপর দায়িত্বটি চাপিয়ে দিয়ে ভাইকাউন্ট বিধান-চোপে দিল্লী রওনা হয়ে গেলেন। শ্রী হক চৌধুরী মেঘমিশ্রসভায় ২৫০ দিনেই টি এ বাবদ নিয়েছেন ১০,১৪০.।

তাঁর চেয়ে বেশী নিয়েছেন মাত্র একজন—প্রাক্তন আই-এন-টি-ইউ-সি নেতা শ্রীকামাখ্যাপ্রসাদ ত্রিপাঠি—১২,৯২৯. আর ইয়ো-রোপ আমেরিকা সফরের জন্য আরো ২৮,০০০.।

'আসাম গেজেট' খুলুন, দেখ-বেন এমন সফিস্টিকেট মন্ত্রীদের টুরে প্রোগ্রাম ছাপা হয় যে অনেক সময় কতটা কত মিনিটে তাঁরা দম নন্ধ ছেড়ে কতটা কত মিনিটে কলকাতা পৌঁছোবেন বা কখন পালম ছেড়ে কখন নয়া দিল্লী পৌঁছোবেন সে তথ্যও থাকে। জাতির পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ খবর কিনা!

রেকর্ড লাইব্রেরী চাই

সৌতম

সেদিন মিঞা তানসেনের গান শুনছিলাম দীর্ঘ মেয়াদী রেকর্ডে। প্রত্যেকটি রেকর্ডের বাজবার মেয়াদ পুরো এক ঘণ্টা। এই এক ঘণ্টা ধরে আলাপ বিস্তারাদি সহ এক একটি রেকর্ডে এক একটি রাগের গান গেয়ে শুনিয়ে রেখে গেছেন তানসেন — মিঞা-কি-টোড়ী, দরবারী কানাড়া, মিঞা-কি-মল্লার ইত্যাদি। চমৎকার কণ্ঠস্বর, চমৎকার গায়নভঙ্গী। তানসেন নেই, কিন্তু রেকর্ডে তাঁর কণ্ঠের গান অমর হয়ে আছে।

এরপর শুনলাম "বৈজু" বাওরার এবং "নায়ক গোপালের গানের রেকর্ড। এঁদের কণ্ঠও অসাধারণ, গায়নভঙ্গীও আলাদা। তিনজন সঙ্গীতের তিনটী আলাদা ধরণের সমুদ্র।

রেকর্ডে এঁদের গান শোনার পরে আগেকার গানের সঙ্গে এখনকার গানের তুলনা করে দেখবার জন্য আবদুল করিম এবং ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের গানের রেকর্ডও শুনলাম।

আহা, এতক্ষণ যা বললাম তা যদি পুরোপুরি সত্য হতো! কিন্তু হায়, সত্য তো নয়! তানসেন, বৈজু, নায়ক গোপাল —এঁরা ঠিক কেমন গাইতেন তা প্রত্যক্ষভাবে জানবার আর কোনো উপায় নেই। এঁদের সময় রেকর্ডিং পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয় নি। হলে কি ভালোই হতো! এঁদের অনবদ্য সঙ্গীত রেকর্ডে বুকে আমাদের সঙ্গীতের ভাণ্ডারে স্থায়ী সম্পদ হয়ে বেঁচে থাকত, অসংখ্য গায়ক গায়িকাকে প্রেরণা যোগাত।

তানসেন, বৈজু বাওরা, নায়ক গোপালের সময়ে রেকর্ডিং কৌশল আবিষ্কৃত হয় নি, কিন্তু এই বিংশ শতাব্দীতে তো রেকর্ডিং-বিজ্ঞান বিস্ময়করভাবে এগিয়ে গেছে, তবু আবদুল করিম, আলাদিয়া খাঁ, ফৈয়াজ খাঁ প্রমুখ বরেণ্য গায়কদের অতুলনীয় গান আমরা যথোচিত ভাবে ভাবীকালের জন্যে দীর্ঘমেয়াদী রেকর্ডে ধরে রাখিনি। অমূল্য সুযোগ চিরদিনের তরে হেলায় হারিয়েছি। নেই-মামার- চে সে কানামামা-ভালো গোছের কিছু কিছু সাড়ে তিন এবং সাড়ে চার মিনিটের রেকর্ডে অবশ্য এঁদের কয়েকজনের গান ধরে রাখা হয়েছে, কিন্তু সে সব রেকর্ড শুনে এঁদের গায়ন প্র তি ভা র পরিচয় কতটুকু পাওয়া যাবে? এ যেন অন্ধের হাতী দেখবার প্রয়াসের মতো, অথবা কয়েক টুকরো ইঁট থেকে এ যেন গোটা দালানের সামগ্রিক রূপ কল্পনা করবার চেষ্টা!

এ যুগের সঙ্গীত

সঙ্গীত জগতে বিরাটের যুগ বিদায় নিয়ে যেন মাঝারির যুগ সুরু হয়েছে। ফৈয়াজ, আবদুল করিম, আলাদিয়া খাঁ প্রমুখ বিরাট শিল্পীদের জায়গা নেবার মত শিল্পী কোথায়? উচ্চ সঙ্গীতের ক্ষেত্র ব্যাপক তর হচ্ছে; শ্রোতা শিক্ষার্থী এবং শিল্পীর সংখ্যা বেড়েছে এবং বাড়ছে। আগেকার চাইতে অনেক বেশী লোক গান শুনছে, শোনাচ্ছে, লেখাচ্ছে, কিন্তু একক হিসাবে কোনো শিল্পী আগেকার বিরাটদের কাছাকাছি ও যেতে পারছেন না।

নবাব আর রাজা রাজড়াদের পৃষ্ঠপোষকতার দিন চলে গেছে। সেকালে এঁদের পৃষ্ঠপোষিত সভাগায়কেরা পরম নিশ্চিন্ত মনে অহোরাত্র সঙ্গীতের সাধনায় ব্যাপৃত থাকতে পারতেন, জীবিকার ভাবনা তাঁদের ভাবতে হতো না। কিন্তু এখন এসেছে ডেমোক্রাসির যুগ, ওস্তাদ গায়ইয়েদের এখন পঁসার জমাতে হলে জন-নারায়ণকে তুষ্ট করতে হবে। এখন জনসাধারণ তাঁদের পৃষ্ঠপোষক।

শাস্ত্রীয় রাগ সঙ্গীত শাস্ত্র-সম্মত এবং সুষ্ঠুভাবে গাওয়া যেমন প্রচুর সাধনা সাপেক্ষ, তার সমাক রসগ্রহণেও তেম্নি অনেকখানি বুদ্ধিচর্চার, অভিনিবেশ এবং শিক্ষার প্রয়োজন। জনসাধারণের কাছ থেকে অতটা আশা করা যায় না। তাই "জনপ্রিয়" ওস্তাদ হতে হলে এহুঁদে উচ্চ সঙ্গীতের খাঁটি সোনার সঙ্গে খাদ মেশাতে হয়।

কিন্তু তাই বলে সাধারণ শ্রোতাদের সঙ্গীত-রসবোধ উন্নত করবার চেষ্টা না করে খেলো, চুটকি গানের চটকে চট্ করে ভুলিয়ে তাদের বাহবা এবং পুরস্কার আদায় করাও বিবেকবান গায়কদের উচিত নয়। কারণ শুদ্ধ খেলো হাল্কা জিনিষ দিয়ে সাধারণের মনোরঞ্জন করতে থাকলে সঙ্গীতের মান তো নেমেই চলবে।

উচ্চ-সঙ্গীতের রেকর্ড লাইব্রেরী

এই প্রসঙ্গ নিয়েই সেদিন প্রখ্যাত সঙ্গীতাচার্য শ্রীতারাপদ চক্রবর্তীর সঙ্গে আ লো চ না হচ্ছিল। একটি চমৎকার কথা তিনি বললেন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত রেকর্ডের একটি ন্যাশন্যাল লাইব্রেরী স্থাপনা সম্বন্ধে। আমাদের জাতীয় সরকারের তরফ থেকেই এটা করা উচিত।

সাহিত্যের মত রাগ সঙ্গীত ও আমাদের অমূল্য সম্পদ। এর ঐতিহ্য যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে সেদিকে আমাদের সজাগ দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। অনেক সাধনার ধারা বেয়ে সংগীতের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ঘরানার সৃষ্টি হয়েছে, প্রত্যেক ঘরানা, তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। আমরা বলি বটে এই 'ঘরানা' বংশ বা গুরু-শিষ্য পরম্পরায় চলে আসে। কিন্তু ভেবে দেখুন 'কিরানা' ঘরানার যে মহান রূপ মূর্ত্ত হয়ে উঠত আবদুল করিম খাঁ সাহেবের গানে, অথবা 'রাঁগিলা' ঘরানার রূপে ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের গানে, তাঁদের লোকান্তরের পর তাঁদের ঐ ঘরানার উত্তরাধিকারিদের কণ্ঠে তেমনটি পাওয়া যাচ্ছে কোথায়? সাহিত্য, শিল্প বা সংগীত জগতে বিরাট শিল্পীরা ক্ষণজন্মা তাঁরা নিয়মিত পালাক্রমে জন্মান না। সংগীত জগতের একটা দিক্‌পাল চলে গেলে তাঁর স্থান আর পূর্ণ হবার নয়।

আধুনিক কবি "হিয়া" অথবা "মোর" লেখেন না এ-রকম যান্ত্রিক যুক্তির অবতারণা সত্ত্বেও আধুনিক কবিতার স্বপক্ষে যেটি অনাত্ম যুক্তি তা কবিতার মারফতই হাজির হয়েছে পাঠকের সামনে। সেটি নিশ্চয় শব্দব্যবহারে অভিনবত্বের অনুসন্ধানে সীমাবদ্ধ নয়। সত্যের বিষয় কোন কোন কবি "হিয়া" অথবা "মোর" এবং আরও নিশ্চিৎ শব্দ ব্যবহার করেছেন স্বিধাবাদীহতে। আর তাঁদের কয়েকজনের এ নিশ্চিত উপলব্ধি হয়েছে যে আধুনিকতা মূলত আমাদের চৈতন্যেরই বিবর্তন। এ বিবর্তন যদি অনায়ত্ত থাকে তাহলে কবিতা লেখা হবে দুর্বল অভ্যাস।

চৈতন্যের এই হাওয়া পাল্টানোর রূপ ছাড়া আধুনিকতাকে চিহ্নিত করা মুস্কিল। তবে আরও একঘাপ বোধহয় এগুনো যেতে পারে। খোঁজা যেতে পারে ইতিহাসের প্রত্যেক যুগের আধুনিকতা অপেক্ষাও আর এক নির্দিষ্ট সংজ্ঞা। সে সংজ্ঞা

যাঁরা চলে গেছেন তাঁদের সংগীত ধারা যথোচিত ভাবে রেকর্ডে ধরে রাখা হয় নি ভবে দুঃখে কপাল চাপ্‌ড়ে এখন আর কোনো লাভ নেই। এখনও যে করেকজন বিরাট শিল্পী অবশিষ্ট আছেন তাঁদের দিকে মন দেওয়া দরকার। কণ্ঠসংগীতে শ্রীমতী কেশর বাঈ কেরকার, বেহেরে বুয়া, ওস্তাদ মুস্তাক হুসেন খাঁ প্রভৃতির নাম করা যায়। এঁরা বিশিষ্ট ঘরানার বিশিষ্ট প্রতিনিধি। এঁরা চলে গেলে মাঝারিদের যুগ সুরু হবে।

ভোর থেকে সুরু করে গভীর রাত পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে গাইবার, এবং প্রচলিত দশটী ঠাটের বিশিষ্ট কতকগুলো রাগ বাছাই করে নিয়ে এঁদের দিয়ে গাইয়ে সে সব গান আমাদের সংগীত লাইব্রেরী বা মিউজিয়ামের জন্য অনেকক্ষণ চলা টেপ্ রেকর্ড ধরে রাখা হোক। প্রত্যেকটী রেকর্ডে নিজ নিজ ঘরানার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী আলাপ, তান ইত্যাদি সহ রাগরূপ ফুটিয়ে তোলবার তাঁরা যথেষ্ট সময় পাবেন—সাড়ে তিন বা পাঁচ মিনিটের চাকুচি রেকর্ডে যা সম্ভব নয়। পাশাপাশি এই তিনটী বিরাট ঘরানার সঙ্গীতধারা যদি এই তিনজন বিশিষ্ট শিল্পীর কণ্ঠস্বরে দীর্ঘমেয়াদী টেপ রেকর্ডে ধরে রাখা হয়, তাহলে রেকর্ডগুলো আমাদের জাতীয় সংগীত লাইব্রেরীর অমূল্য সম্পদ হয়ে থাকবে। ভাবীকালের সঙ্গীত শিল্পীরা লাইব্রেরীতে এসে এই রেকর্ড সংগীত শুনে বুঝতে পারবেন বিভিন্ন ঘরানার 'খায়লী' একই রাগ বিভিন্ন ঘরানা অনুযায়ী কি রকম ছিল, এবং ঘরানা কি রকম বিভিন্ন রূপে সাজিয়ে তিনি দাঁড়াতে চেষ্টা করেছেন কিনা সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ আছে। চরিত্রকে দেহ দান করতে গেলে পরিবেশের পটাভূমিয় যে আরও অনেক খানি সত্য প্রয়োজন তাকেও রূপায়িত করার প্রয়োজনে সে প্রসঙ্গে তাঁর ত্যাগিদ বেশী নেই। অথচ তা না হলে আইডিয়া আইডিয়াসই সীমা-বদ্ধ। তা সীমা অতিক্রম করে চরিত্র হবার গৌরব অর্জনে

বাংলা উপন্যাস ও আধুনিক মন

অসীম রায়

অনুযোয়ী আধুনিক মন মানে নগরে সঞ্জাত এবং নগরে লালিত মন। আর এ নগর পাটলীপুত্র কিংবা উজ্জয়িনী নয়। যন্ত্র-সভ্যতার চাপে গড়ে ওঠা এ নগর—লন্ডন, প্যারিস কিংবা কলকাতা।

তিরিশ সালের গোড়া থেকেই বাঙালী কবিদের কেউ কেউ এই হাওয়া পাল্টানো টের পেয়েছিলেন। তাঁরা বুঝে-ছিলেন কালিদাস রায় অথবা কুমুদরঞ্জন মল্লিকের প্রয়াস প্রশ্নের হলেও সে প্রয়াসের পেছনে এই হাওয়া পাল্টানোর খবর নেই। তাঁরা তাই সোজা পথে না এগিয়ে পথ হাতড়ে-ছিলেন। আর এই হাতড়ানের ফল কিছুটা ফলেছে। বাংলা কবিতায় আধুনিক মনের বিন্যাস কিছুটা ধরা পড়েছে বৈকি।

আবেদের প্যাটার্ণ

কিন্তু বাংলা উপন্যাসে বোধহয় এ খবর আজও ঠিকমত পৌঁছয় নি। মানুষের মেজাজ যে পাল্টাচ্ছে, তার আবেগের প্যাটার্ণের বদলোট বদলেছে, তার প্রশ্নের ঝোঁক পড়েছে নতুন ক্ষেত্রে, তার প্রেম কিংবা অপ্রেম কিনারা খুঁজছে ভিন্ন খাতে, সে কথা আমাদের গদ্যে পাওয়া দুষ্কর।

অবশ্য আধুনিকতার পোষাক অনেকে পরেছেন। "হিয়া" অথবা "মোর" না লেখার মত অনেকে ভয়ানক স্মার্ট হয়েছেন, লেখার দারুণ নাটকীয় পরিবেশ সৃষ্টি করার দুঃসাহস দেখিয়েছেন। কেউবা কাল্পনিক গ্রামে নিয়ে গিয়েছেন পাঠককে, কেউ রাসবিহারীর এভিন্যুয়ের দিকে। কেউ নায়িকার বসন কেড়েও আধুনিক হয়েছেন। মন্বন্তরেই, উদবিলে শতাব্দীতে, কলকাতার শহরতলীতে কারখানার, গান্ধিজীর স্মরণে, কারাগারে, কাফেতে বাংলো উপন্যাসের ঘোড়া ছুটেছে। বিষয়-বস্তুর অভিনবত্বের দিক থেকে প্রায় একটা রেস চলেছে। কিন্তু লোকের জীবনের সমস্যার দিকে চোখ কান খোলা সেই মন এখনও অনুপস্থিত।

আয়নাচক্রব ও বক্রধেব

এদিক থেকে অন্নদাশঙ্কর এবং বুদ্ধদেবের কাছে পাঠকের আশা মোটেই অযৌক্তিক নয়। আধুনিক মনকে ধরবার বনেদে তাঁদের জীবনচর্চা। তাঁরা লক্ষ্য-ভ্রষ্টভাবে দিগ্বিদিকে ঘোড়া ছোটান নি। কিন্তু অন্নদাশঙ্কর থেকে সমাধানের অপেক্ষায় তার সামনে তিনি দাঁড়াতে চেষ্টা করেছেন কিনা সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ আছে। চরিত্রকে দেহ দান করতে গেলে পরিবেশের পটাভূমিয় যে আরও অনেক খানি সত্য প্রয়োজন তাকেও রূপায়িত করার প্রয়োজনে সে প্রসঙ্গে তাঁর ত্যাগিদ বেশী নেই। অথচ তা না হলে আইডিয়া আইডিয়াসই সীমা-বদ্ধ। তা সীমা অতিক্রম করে চরিত্র হবার গৌরব অর্জনে পিছু হটে। অন্নদাশঙ্করের চরিত্রের যে সব সমস্যা সেগুলো উপন্যাসের পরিপ্রেক্ষিতে গুরুত্ব লাভে বঞ্চিত হয়। পাঠকের আনন্দ তাই তাঁর বিষয় নয় তিনি "অরকরে বাংলা লেখেন" এই কারণে।

বুদ্ধদেব বসু দুঃখ করেছেন "An acre of green grass" —এ কোন বাঙালী লেখকের শিক্ষার অনগ্রসরতায়। এ দুঃখের কারণ যে যথেষ্ট তাতে সন্দেহ নেই। লেখকের শিক্ষার মান তাঁর বোধকে আরও সংহত ও শক্তিশালী করে সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁর নিজের উপন্যাসের ক্ষেত্রে তাঁর শিক্ষার উচ্চ মান তাঁর বোধের বিকাশে কতখানি সাহায্য করেছে সে বিষয়ে কারুর প্রশ্ন স্বাভাবিক মনে হতে পারে। তাঁর সুস্থ নগরসভ্যতায় লালিত মানুষগুলির জীবনে এ কালের প্রশ্নগুলি বিশেষ ছায়াপাত করে নি।

তাঁর "কালো হাওয়া" বাদ দিলে দেখা যাবে যে তাঁর প্রথম যুগের উপন্যাস "বেদিন ফুটল কমল"-এর একটি ছোট্ট জগতের বাইরে তিনি কখনই এসে দাঁড়াতে পারলেন না। একজন বয়স্ক লেখক আধুনিক জগত খুঁজে-ছেন ক্রমাগত চরিত্রের নামকরণে একথা প্রায় দুর্বোধ্য ঠেকে। করেকটি পার্শ্বচরিত্র বাদ দিলে তাঁর সাম্প্রতিক দীর্ঘ উপন্যাসও আধুনিকতার এইই বাঁধরণা খোঁজার চেষ্টা থেকে মোটেই মুক্ত নয়।

তারাশঙ্কর ও মাণিক

তাহলে নিশ্চয় পাঠক খুঁজে-বেন তাঁর ইষ্ট একালের সবাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য লেখক তারাশঙ্করের। কারণ বাইরে কিন্তু গ্রামের ওপর নগর সভ্যতার চাপে গ্রাম-জীবনের যে মূল্যবোধের পরিবর্তন তার আওতায় কিছুটা নাগর সঞ্জাত এবং নগরেই পক্ষে আধুনিক মন। লেখকের নিরলস চেষ্টা তাঁকে নগরের নিয়ে এসেছে কিন্তু সেখানে তাঁর বিচরণ আগের মত স্বাচ্ছন্দ নয়। বাঁরুড়ের লাল-মাটিতে বে ভাবে কথা বলে, তাঁর চরিত্র বে স্বাভাবিকতা বজায় থাকে না সহরের রাজপথে। তাঁর "মন্বন্তরের" উল্লেখযোগ্য চেষ্টার আধুনিক পরিবেশ তৈরী হয়েছে কিন্তু আধুনিক মন অনুপস্থিত।

বরং মানিক বন্দোপাধ্যায়ের "পুতুল নাচের ইতিকথার" শশীতে এসে পাঠকের যাত্রা কিছুটা পূরণ হয়। রাজপথে নয় মেঠো রাস্তার পাশেই সুস্থিতের ছোয়া পাল্টে গেছে। তাঁর এ উপন্যাসে কখনই মনে হয় না আধুনিকতার পোষাকে শরৎচন্দ্রের নায়ক হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন, সাম্প্রতিক কালের অনেক নামজাদা লেখকের ক্ষেত্রে যা প্রায়ই ঘটে। তবে একথা বলা যায় মানিক বন্দোপাধ্যায়ের আধুনিক মনের সন্ধানে বেশ কিছুটা বিহরল। পরবর্তী কালে তাঁর শক্তির প্রকাশে পাঠক যেমন আনন্দিত তেমনি তাঁর শক্তির

(চতুর্থ পৃষ্ঠার দ্রষ্টব্য)

বিজ্ঞান আলোচনা

উপেক্ষিতা নায়িকা

শ্রীজ্ঞান

আকাশমণ্ডল আর বহির্মণ্ডলের সংযোগ মহাজাগতিক মিতালি। তাই আকাশমণ্ডলে পৌঁছুতে পারলে মহাজাগতিক চিরন্তনী মহাকাব্যের কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়। কসমিক রশ্মি এই মহাকাব্যের উপোদ্ঘাতা নায়িকা। কারণ, কসমিক রশ্মির উপস্থিতিটা উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্তও বৈজ্ঞানিকদের কাছে অজানা ছিল। আধুনিক যুগে এই রশ্মির সন্ধিৎসুই শুরু পাওয়া গেছে। যুগটা এখনও ধরা ছোঁয়ার বাইরে। আ-ভূ-ক পরীক্ষার মধ্যমণি এই উপেক্ষিতা নায়িকা, কসমিক রশ্মি।

* * *

আগে ভাবার এর নাম রাখা হয়েছিল মহাজাগতিক রশ্মি। আমি সে নামে গুরুত্ব করছি না। কারণে। তবে এই রশ্মি মহাজগতের [illegible] আধুনিক, নায়িকার [illegible] নয়। তাই আমি [illegible] বলছি। তাতে আর [illegible] অনুবিধা হবে না।

[illegible] একটি, [illegible] উচ্চ এটাই [illegible] বিশেষ সভ্যতার [illegible] পরিচয় বলে। এই [illegible] প্রথম দেখা হয় [illegible] সালে। তিনি [illegible] নিয়ে খেলা [illegible] বিদ্যুৎ [illegible] পরীক্ষা করে [illegible] ইচ্ছে তিনি দেখলেন যে [illegible] কণিকা শক্তি অত্যন্ত [illegible] কণিকাকে কেন্দ্র করে [illegible] তা জানা যায় যে বায়ু- [illegible] এর উর্ধে ওঠা যায়, তত [illegible] প্রবাহিকা শক্তি বৃদ্ধি পায়। বৈজ্ঞানিকরা এবং বিশেষ করে ডাঃ মিলিকান পরীক্ষা করে দেখেন যে, মহাশূন্য থেকে প্রতিনিয়ত অসংখ্য তেজস্ক্রিয় কণিকা পৃথিবীর দিকে ছেটে আসছে। ডাঃ মিলিকান-ই এই কণিকা আবিষ্কার করেন এবং মহাশূন্য থেকে ছুটে আসছে বলে, তিনি এর নাম দেন কসমিক রশ্মি।

ডাঃ মিলিকান এবং অন্যান্য বৈজ্ঞানিক, যেমন ওটিস, এবং কামেরন পরীক্ষা করে দেখেন যে উচ্চ পাহাড়ের উপর কোন কোন হ্রদে গামা রশ্মির চাইতে কসমিক রশ্মির বিদীর্ণ করার ক্ষমতা অত্যন্ত বেশী। বৈজ্ঞানিকদের ধারণা ছিল যে, এই কসমিক রশ্মির মধ্যে শক্তি কণিকা (ফোটোন) এবং ইলেকট্রন (ঋণাত্মক শক্তি) আছে। এবং সেই। কারণেই আকাশমণ্ডলে বিদ্যুৎ (ঋণাত্মক) কণিকা ছেয়ে আছে।

* *

পরবর্তীকালে বৈজ্ঞানিকদের ধারণা ধীরে ধীরে নানা প্রশ্নের বেড়াজালে আটকে পড়ে। তার ফলে, কসমিক রশ্মি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক খুব বেশী সচেতন হয়ে পড়েন।

তাঁরা দেখলেন যে, প্রতিনিয়ত এই মহাশক্তিশালী কসমিক রশ্মি পৃথিবীর বুকে এসে আঘাত করছে। গামা রশ্মির চাইতেও বেশী শক্তিশালী এই রশ্মি ছুটে আসছে মহাশূন্য থেকে। (গামা রশ্মি মণ্ডলে যে সংঘর্ষ ঘটায়, তার ফলে সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা যাবে।

তবে বর্তমান ক্ষেত্রে এটুকু বুঝে নিতে হবে যে, গামা রশ্মি বহন রশ্মির মত শক্তিশালী বিদীর্ণকারী রশ্মি।)

কসমিক রশ্মি কোন এক অদৃশ্যলোক থেকে ছুটে আসে। অথচ তার শক্তি লক্ষ লক্ষ উদযান বোমার চাইতেও বেশী। কাজেই, যে কোন কারণেই হোক মহাশূন্যে এমন কোন এক অদৃশ্যলোক আছে যেখানে এই রশ্মি উৎপন্ন হয়। সেই অদৃশ্যলোক থেকে ছুটে আসবার সময় এখন কোন অবস্থার সৃষ্টি হয় যার ফলে এই রশ্মি বিপুল শক্তি সঞ্চয় করে।

প্রশ্ন তাই, কোথা থেকে ছুটে আসে এই রশ্মি? আর প্রতিনিয়ত যদি ছুটেই আসে, তাহলে পৃথিবী কি করে সহ্য করে এই বিরাট তেজস্ক্রিয় আঘাত? এমনি নানা প্রশ্ন রয়েছে জড়িয়ে এই কসমিক রশ্মির সঙ্গে।

* * *

তবে এটা জানা গেছে যে, যে শক্তি নিয়ে এই রশ্মি মহাশূন্য থেকে ছুটে আসে, পৃথিবীর বুকে ঠিক সেই পরিমাণ শক্তি ঠিকরে পড়ে না। বায়ুমণ্ডলের কাছে এসে কসমিক রশ্মির প্রাথমিক কণিকাগুলো ভেঙ্গে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে পড়ে। এই গুঁড়োর কিছু অংশ বৃষ্টির মত পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে পড়ে। একে বলা হয় কসমিক বর্ষণ। এই বর্ষণ সব চাইতে বেশী হয় সেতু প্রদেশে, আর সব চাইতে কম বিষুবরেখার কাছাকাছি। এ থেকে বোঝা যায় যে, পৃথিবীর চুম্বকক্ষেত্রের প্রভাব এই রশ্মির উপর অত্যন্ত বেশী। অর্থাৎ চুম্বক বলি এই রশ্মিকে আকৃষ্ট করতে পারে, তাহলে বুঝতে হবে যে, এই রশ্মি কণিকা নিশ্চয়ই বিদ্যুৎবাহিত।

আধুনিককালের রকেট ও বেলুন-এর সাহায্যে এটুকু জানা গেছে যে, রশ্মি কণিকার শতকরা ৮৫ ভাগ প্রোটোন (উদযান বৈদ্যুতিক কণিকা), শতকরা ১২ ভাগ হিলিয়ামের পরমাণু -কেন্দ্র বা আলফা কণিকা এবং বাকীটুকু ভারী পদার্থের পরমাণুকেন্দ্র।

গত কয়েক বছরের মধ্যে, বিশেষ করে ১৯৫৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে যে সূর্যে প্রলয় ঘটে, তখন দেখা গিয়েছে যে, সূর্যে প্রলয়ের সঙ্গে সঙ্গে কসমিক রশ্মির বর্ষণ অনেক গুণে বৃদ্ধি পায়। তা যদি হয়, তাহলে অনুমান করতে অসুবিধা হয় না যে, সূর্যের সঙ্গে নিশ্চয় এই রহস্যময়ীর সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।

১৯৫৬ সালের সূর্যে প্রলয়ের সময় চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসার সিমসন পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, সেই সময় কুড়ি মিনিটের মধ্যে প্রায় একশ কোটি নুহ্বকারক উদযান বোমার শক্তি বিচ্ছুরিত হয়েছে।

*

তাই এই রহস্যময়ীকে নিয়ে আ-ভূ-ব বৈজ্ঞানিকদের এত মাথা-ব্যথা।

কসমিক রশ্মি বর্ষণের কথা আগেই বলেছি। এখানে এটুকু বলাদরি যথেষ্ট হবে যে, এই বর্ষণের শক্তিও কিছুটা জানা গেছে। জানা গেছে একটিমাত্র প্রাথমিক কসমিক কণিকা বায়ু-মণ্ডলে ঢুকে লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র কণিকা পৃথিবীতে বর্ষণ হয়। অর্থাৎ, প্রাথমিক কণিকার একশ কোটি কোটি (একের পিঠে আঠারটি শূন্য বসালে যা হয়) ইলেকট্রন ভোল্টের চাইতে বেশী শক্তিশালী। (এ পর্যন্ত যা রাশিয়াতে যন্ত্রের সাহায্যে এক হাজার কোটি ইলেক্ট্রন ভোল্ট শক্তি উৎপন্ন করা সম্ভব হয়েছে)।

এই সব দেখে শুনে আ-ভূ-ব বৈজ্ঞানিকরা বলেছেন যে, কসমিক রশ্মি সম্বন্ধে আগেকার ধারণা-গুলো অনেকটা পরিবর্তন করে নিতে হবে। শুধু তাই নয়, তাঁরা মনে করেন যে, মহাশূন্যের বাত্যা-পথে ছায়াপথের কাছে এসে কসমিক রশ্মির গতি ক্রমে বৃদ্ধি পায়। এমনকি তাঁদের ধারনা যে, প্রথম অবস্থায় কসমিক রশ্মির শক্তি খুব কম থাকে তারপর নানা জায়গায় ঠোক্কর খেয়ে আর ঘুরে-পাক খেয়ে বায়ুমণ্ডলের কাছে যখন আসে তখনই বিপুল শক্তি আহরণ করে। তা যদি হয়, তাহলে তাঁকের আগুরে বলা যেতে পারে যে, ছায়াপথেই লক্ষ লক্ষ নাঁহারিকা কি করে এই শক্তি জোগায়? এর উত্তরে অনেকে বলেন যে, হয়ত ছায়াপথ ঘিরে এমন কোন শক্তি-ক্ষেত্র আছে যা কসমিক রশ্মির শক্তি জোগায়। অথবা হয়ত নীহারিকামণ্ডলীকে আমরা যত ছোট ভাবি, বা যত সরল সহজ মনে করি হয়ত ঠিক তা নয়। কোনটা সত্যি, আ-ভূ-ব জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা হয়ত বলতে পারবেন, কে জানে?

এই বর্ণাঢ্যময় কসমিক রশ্মিই আধুনিক মহাকাব্যের উপেক্ষিতা রহস্যময়ী।

ইংরেজীর কদর ও সাহেবীয়ানার আদর

(নিজস্ব পর্যবেক্ষক)

ইংরেজ এ দেশ ছেড়ে চলে গেছে। কিন্তু আমাদের 'ইংরেজিয়ানা দিনের পর দিন কিভাবে বেড়ে চলেছে, তা বোধ হয় নিতান্ত স্থূল-দৃষ্টি লোকেরও চোখে পড়ে। কথাবার্তায় সাজ-পোষাকে চালচলনে আমরা যেন আগেকার চেয়েও আরও বেশী সাহেব হয়ে উঠেছি।

কলকাতার আফিস পাড়া ডালহৌসী স্কোয়ারের দিকে সকাল-বিকেলে তাকিয়ে দেখো। অবিরাম জনপ্রবাহ অফিসমুখী। কিন্তু এই হাজার হাজার লোকের মধ্যে ধুতিচাদর পরা বাঙ্গালী মূর্তি হাতে গুণে বলা যায়। মার্কিণী ঢঙে পিছন দিকে পকেট-ওয়ালা প্যান্ট এবং হাওয়াইয়ান সার্ট পরা লোকই বেশী। প্রচন্ড গরমে গলাবন্ধ নেকটাইওয়ালা বাবুও ঘর্মাক্ত কলেবরে অফিসের দিকে ছুটেছেন। গরমে নেকটাই পরে চলাফেরা করতে রীতি-মত কষ্ট হয়, নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। তবুও নেকটাই খোলা চলবেনা। সাহেবরা পরে যে! আর 'সাহেব' না সাজলে সভ্যই বা হওয়া যায় কি করে?

কোট-প্যান্টের কদর

অফিস, হোটেল, রেস্তোরাঁ, সর্বত্র কোটপ্যান্ট পরা বাবুর মর্যাদা বেশী। আপনি বাঙ্গালী, ধুতি চাদর পরে ঐ সব জায়গায় যান—কেউ আপনার দিকে ফিরেও তাকাবে না। কিন্তু প্যান্ট-কোট পরা বাবু? তাঁদের কথাই আলাদা। গেটের দরোয়ান তক্ষুণি সেলাম ঠুকবে, খটাং শব্দে 'কোলাপ্সিবল্' গেট খুলে যাবে। আর আপনাকে বলবে "এ বাবু, কাঁহা যাতা হ্যায়, লাই সে কার্ড।" "সাহেব" বাবুদের কার্ড না থাকলেও বহুত অবাধ গতি-বিধি। অন্ততঃ দারোয়ান কার্ড দাবী করবেনা। কিন্তু ধুতি-চাদর পরা বাবুদের বেলায় কার্ড পরীক্ষা করে দেখা চাই।

সাংবাদিকের হয়রাণি

অবশ্য ব্যাপারটা অনেক দিনের। তবুও উল্লেখ করতে হল। রাষ্ট্রপতি প্রেসিডেন্সী কলেজের কোন এক উৎসবে যোগ দিতে এসেছেন। প্রধান প্রবেশপথে কড়া পাহারা মোতা-য়েন। যে সব সাংবাদিক কোট-প্যান্ট পরেন, তাঁদের পাহারাদার যেতে দিল। কিন্তু দু'একজন সাংবাদিকের পরনে কোটপ্যান্ট ছিল না। পাহারাদাররা হয়তো ভাবলেন কোটপ্যান্ট পরনে নেই, আবার সাংবাদিক কিসের? প্রেস কার্ড দেখিয়েও রেহাই নেই। রাষ্ট্রপতির অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া নিতান্তই সাংবাদিকের গরজ। কাজেই তাকে ঘুর-পথে অনুষ্ঠান স্থলে ঢুকতে হল।

অনেকে এ ধরণের ব্যাপারকে নিতান্ত ঠাট্টার ছলে উড়িয়ে দিতে চান। কিন্তু আমাদের যদি বিন্দু-মাত্রও মানসম্মান জ্ঞান থাকত তাহলে এই "কপি বুকিস" জন্য আমরা লাঞ্ছিত হতাম এবং অনুকরণ-প্রিয়তা যে বিকৃতির স্তরে গিয়ে পৌঁছেছে তা উপ-লব্ধি করতে পারিতাম।

আর একটি ঘটনা বলি। জনৈক সাংবাদিক বন্ধু মাদ্রাজে কি একটা অনুষ্ঠান উপলক্ষে গেছেন। তিনি হ্যাট কোট প্যান্ট নেকটাই পরা খাঁটি সাহেব, কিন্তু রংটি নিকষ কালো এবং দেখতে মাদ্রাজীদের মত। কাজেই মাদ্রাজীরা তাঁকে মাদ্রাজী বলেই ভেবেছে আর তাঁর সঙ্গে তাদের মাতৃভাষায় কথা বলার চেষ্টা করেছে। এ রকম ভুল হওয়া আশ্চর্য নয়। কিন্তু ভুল হল কেন? তিনি যদি বাঙ্গালীদের পরিচ্ছদে ভূষিত থাকতেন, তাহলে নিশ্চয়ই মাদ্রাজীরা তাঁকে মাদ্রাজী বলে ভুল করত না।

অনুকরণ প্রীতি

কাজেই দেখা যাচ্ছে আমরা কোন জাতি তা পরনের বাইরের সাজ-পোষাক দেখে বুঝবার উপায় নেই। অন্য কোন সভ্য দেশে এরকম হয় না। কি কোন ইংরেজ তো আমাদের দেশে এসে "যখিন দেশে যদাচার" এই রীতি মেনে নিয়ে ধুতি চাদর পরা সুরু করে না? তবে আমরাই বা কেন বিলাত-আমেরিকায় গিয়ে তাদের সাজপোষাক পরে ঘুরে বেড়াব? আমাদের জাতীয় স্বাতন্ত্র্য কি এভাবেই বিসর্জন দিতে হবে? আজ্ঞা, ইংরেজ মুলুকের কথা না হয় ছেড়ে দিলাম। কিন্তু স্বদেশে? এখা-নেও কি সাহেব সেজে চলতে হবে? মাতৃভাষার মধ্যে শতকরা ৮০টি ইংরেজী শব্দের ফোঁড়ন জুড়ে দিতে হবে? কেন আমরা সাদা বাংলায় কি সম্পূর্ণ মনের ভাব প্রকাশ করতে পারি না? বাংলা ভাষা কি সমৃদ্ধ ভাষা নয়?

হিন্দী প্রেম

ভারত সরকার যে নতুন মুদ্রা চালু করেছেন তাতে ইংরেজী আর হিন্দী ছাড়া, আর কোন ভাষা নেই। ইংরাজীর কথা ছেড়ে দিলেও ভারত সর-কার কি মনে করেছেন যে, হিন্দী-ভাষা-বহির্ভূত এলাকার লোকেরা হিন্দী পড়তে পারে? ডাক বিভাগ যে পোস্টকার্ড খাম টিকিট ছাপিয়েছেন তাতেও এক হিন্দী ভাষা ছাড়া ভারতের আর কোন আঞ্চলিক ভাষা ছাপা হয় নি। উড়িয়া, পাঞ্জাবী, তামিল তেলেগু, গুজরাতী, উর্দু, মারাঠী প্রভৃতি সমৃদ্ধ আঞ্চলিক ভাষা সম্পর্কে ভারত সরকারের এত উপেক্ষার কারণ কি? বিদেশী আমলেও তো কয়েকটি প্রধান প্রধান ভাষা (তার মধ্যে বাংলাও ছিল) টাকা, খাম পোস্ট-কার্ড ইত্যাদিতে ছাপা হত। এখন স্বদেশী সরকারের আমলে সবই উল্টো ব্যবস্থা।

ইংরেজী বুকনি

অবশ্য এজন্য আমরাই দায়ী। আমরা কিছুতেই ইংরেজী বুকনি ছাড়ব না। বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে কোন 'থীসিস' লিখতে গেলে ইংরেজীতে লিখব। শুনলে অবাক্ লাগে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন দিনও গেছে যে, ইংরেজীতে উত্তরপত্র লিখে সাহিত্যে 'মাস্টার অব আর্টস্' ডিগ্রী পাওয়া গেছে। এখন অবিশ্যি সেরকম ঘটে না। তবে এরকম অদ্ভুত ব্যাপারও ঘটেছে, তাই উল্লেখ করতে হল।

কোন এক বাঙ্গালী মন্ত্রীবর বলেছিলেন যে, ইংরেজী শিখতে হলে সে ভাষায় চিন্তা করতে হবে, সে ভাষায় স্বপ্ন দেখতে হবে। তিনি ঠিকই বলেছিলেন। বাংলা ভাষাকে যদি আমরা 'সকল কাজ' জ্ঞানবিজ্ঞান, দর্শন, ইত্যাদির বাহন হিসাবে পেতে চাই, তবে মনে প্রাণে আচার আচরণে খাঁটি বাঙ্গালী হতে হবে। মনের চিন্তা সহজবোধ্য মাতৃভাষায় প্রকাশ করতে হবে, বাহা-দুরি নেবার জন্য অথবা বাহা-দুরি নেবার জন্য ইংরাজীতে লিখলে চলবে না।

বাংলা ভাষার উন্নত ও প্রসার সম্পর্কে যে প্রামাণিক গ্রন্থ আছে (যা একজন প্রখ্যাত বহুভাষাবিদ ও ভাষাতত্ত্ববিদের লেখা) তা ইংরেজী ভাষায় লিখিত হয়েছে। অর্থাৎ ইংরেজী ভাষা অনভিজ্ঞ বাঙ্গালীর কাছে নিজের ভাষার উন্নত ও প্রসারের ইতিহাস অজানা রয়ে গেল। এ ধরণের ব্যাপার কি লজ্জার বিষয় নয়? বাঙ্গালী মণীষীরা কবের

(২য় পৃষ্ঠায়)

টালিনালার ইতিবৃত্ত

কানাইলাল চৌধুরী

টালি নালা থেকেই কোলকাতার জন্ম।

১৫৩০ খৃঃ পর্তুগীজরা যখন গোয়া থেকে বাংলা দেশের সংগে বাণিজ্য সুরু করলে তখন সমুদ্রে জাহাজ যাবার পথ ছিল এই টালি-নালা। অবশ্য তখন এর অবস্থা এখনকার মত ছিল না। তখন হুগলী নদীটিই ছিল গংগার প্রধান প্রবাহ। আর হুগলী ব'য়ে যেত এই টালিনালারই খাতে। খাতটি ছিল খুব গভীর ও প্রশস্ত। মস্ত গংগা এই খাত বেয়ে জীরাট্ ব্রীজের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত গিবের প্যা ছুঁয়ে মিশতো বংগোপসাগরে। পর্তুগীজ বণিকগণ এই স্রোত বেয়ে গিয়ে গার্ডেন রীচে বাঁধতো তাদের জাহাজ, কারণ তার ওধারটা ছিল অগভীর। এইভাবে গার্ডেন্ রীচ্ আমদানী-রপ্তানীর ছোটখাটো কেন্দ্র হ'য়ে উঠল। তাই হুগলীজেলার সাতগাঁয়ের ব্যবসায়ী 'শেঠ আর বসাকরা এসে নিকটেই গোবিন্দপুর গ্রামটি গড়ে তুললো।

যা একদিন ছিল হুগলীনদীর খাত তার নাম কেন হ'ল টালি নালা। আগেই বলেছি, হুগলী নদী ছিল গঙ্গার প্রধান প্রবাহ। তাই নালাটিকে এখনো অনেকে আদিগংগা বলেন। এই নামটিই সবচেয়ে সার্থক। টালি নালার মধ্য দিয়ে তো আর পর্তুগীজদের বড়ো বড়ো 'গ্যালিয়াশিস্' যেতে পারে না। পরে অবশ্য এ হয় মন্দাক্রান্তা ছন্দা, কারণ গংগা নূতন পথ বেছে নিল মেঘনা-হরিণঘাটার মধ্য দিয়ে। আর দুর্দশার দিনে আদি গংগার নাম হল "গোবিন্দপুর শাখানদী।"

১৭১৫ খৃঃ এড্ওয়ার্ড সার্মান্ সম্রাট ফারুকশিয়রের রাজসভায় এক দৌত্য নিয়ে যান ইংরেজদের জন্য কিছু সুযোগ সুবিধা হাঁসিল করতে। তাঁর বাড়ী ছিল পরে বিখ্যাত 'হেস্টিংস্ হাউস্‌টি'। এই সাহেবই প্রথমবার এই শাখা নদীর দেহে অস্ত্রোপচার করেন। সম্ভবতঃ ১৭২০ খৃঃ হ'তে গোবিন্দপুর ক্রীকের নাম হয় 'সার্মান্ নালা'।

অধিকারে। তিনি ঐ বছরেই কাজ সুরু করেন। কাজ চলে ১৭৭৬ খৃঃ কিছুদিন ধ'রে। আয় তার বেশই হ'য়েছিল কারণ ইনিই সেই টলি যিনি ১৭৮০ খৃঃ ইটালির রেগেলা ধাঁচের বেলভেডিয়ার্ ভবনটি হেস্টিংস সাহেবের কাছ হ'তে কেনেন। তাঁর নাম হ'তেই টালিগঞ্জ, তাঁর নাম হ'তেই "টালি নালা"।

নালার প্রবাহ

টালি নালাটি ওয়াটগঞ্জ ঘাট আর কুলী বাজারের মধ্যে হুগলী নদী হ'তে বের হ'য়ে লম্বা ১৭½ মাইল পথ বেয়ে গিয়ে পড়ছে শামুকপোতার বিদ্যাধরী নদীতে। এই যাত্রাপথের সংগে বহু প্রাচীন স্মৃতি বিজড়িত। ওয়াটগঞ্জ ঘাট থেকে একটু গিয়ে দেখতে পাওয়া যায় হেস্টিংস্ ব্রীজ্ (খিদিরপুর ব্রীজ্)। এরই পাশে হ'য়েছিল নন্দকুমারের ফাঁসি। ভারতবর্ষে এটিই প্রথম লোহার সেতু। এই সেতু থেকে পূর্বমুখে নালা ধ'রে কিছুদূর গেলে কাছেই দেখা যায় 'খিদিরপুর হাউস্'। এই বাড়ীটি ছিল বারওয়েলের বাসভবন। চিড়িয়াখানার কাছে যে জীরাট্ ব্রীজটি র'য়েছে ওর উত্তর-পশ্চিম-

নালা সংস্কারে সরকারী ঔদাসীন্য

এখন যেখানে কোর্ট উইলিয়াম্ রয়েছে এ-স্থানটিও ছিল গোবিন্দপুরের সীমানাভুক্ত। কিছুদিনের মধ্যে সুতা ব্যবসার সুবিধার জন্য কিছুদূরে একটি ছোট মেছো পাড়ায় তারা সুতার হাট বসালো বর্তমান হাটখোলার পাশে। হাটটি আস্তে আস্তে হ'য়ে উঠল সুতানুটি গ্রাম। চার্ণক পিপুল গাছের ছায়ায় ব'সে হাজার হুঁকো খেলেও কোলকাতার জন্ম হ'ত না, যদি না থাকতো এই সুতানুটি গ্রাম।

স্বতঃই মনে হ'তে পারে যে

ক্যাপ্টেন টলি

হেস্টিংস্ সাহেব বোধ হয় অত্যন্ত ভালবেসেই এটিকে 'কালীঘাট নালা' বলতেন। তাঁর ইচ্ছাতেই ১৭৭৫ খৃঃ ক্যাপ্টেন টলি নামে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এক ইঞ্জিনিয়ার অফিসারকে ১০ বছরের জন্য নালাটি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়। সর্ত ছিল যে তিনি নিজের খরচায় এর গভীরতা ও প্রস্থ বাড়িয়ে তুলবেন, বিনিময়ে পারেন ১০ বছর ধ'রে এর টোল ভোগের

দিকে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে শৈব জিঙ্গল্ গির চৌরঙ্গীর আখড়া ছিল। তাঁরই নাম অনুসারে চৌরঙ্গী নাম হ'য়েছে। আবার এই সেতুটিরই উত্তরদিকে বটগাছের নীচে ছিল 'ডুয়েল এভেন্যু' যেখানে হেস্টিংস্ ফ্রান্সিসের মধ্যে গুলি বিনিময় হয়। ফ্রান্সিস্ সাহেবের পাঁজরে গুলি লাগে। তাঁকে গাড়িতে ক'রে জীরাট্ ব্রীজের ওপর দিয়ে বেল্‌ভেডিয়ারে ক্যাপ্টেন টলির কাছে নিয়ে যাওয়া হয়।

আমরা এখন আলিপুর জেলের পূর্বগায়ে টালিনালার ধারে 'থ্যাকারে রোডের' প্রান্তে উত্তর-মুখো যে বড় বাড়ীটি দেখতে পাই—যেটিকে আমরা ২৪ পরগণার শাসকের 'অফিসিয়াল্ রেসিডেন্স্' বলেই জানি—ঐটিই ছিল জেনারেল ফ্রান্সিস্ সাহেবের 'লজ্'। 'ভ্যানিটি ফেয়ারে'র বিখ্যাত লেখক উইলিয়াম্ মেক্‌পিস্ থ্যাকারেও ১৮১২ খৃঃ হ'তে ১৮১৫ খৃঃ পর্যন্ত এই বাড়ীতেই বাস ক'রেছেন। বাড়ীটিতে ঢুকতেই দেখা যায় দুদিকে দুটি মার্বেল ফলক। এরা অতীত-দিনের স্মরণচিহ্ন বহন ক'রে চলেছে আজও।

জজ্ কোর্ট রোড্ ধরে সোজা দক্ষিণে চলে যেতে টালি নালার তীরে দেখা যায় হেস্টিংস্ হাউস্। ১৯১৫ খৃঃ বাড়ীটিকে স্কুল বানানো হ'য়েছে।

আমরা বলতে পারি যে কোম্পানী শাসনের 'অফিসিয়াল্ রেসিডেন্স্' গড়ে উঠেছিল টালি নালারই কূলে।

সরকার নালাটি সম্বন্ধে বরাবরই সচেতন ছিলেন। ১৮০৪খৃঃ পূর্বেই এর পরিচালনভার সরকার নিজ হাতে তুলে নেন। ১৮০৪ খৃঃ প্রতি ১০০ মন ওজনের খালি নৌকার টোল লাগতো ৪ আনা আর প্রতি ১০০ মনের ওপর টোল ছিল ২, টাকা। হারটা কম মনে করবেন না, কারণ তখন মাসিক ৩০০, টাকা ভাড়ায় বেলভেডিয়ারের ভাড়াটে জুটতো না যদিও দেশে [illegible] সংখ্যা বড় কম ছিল

নালাটির পরিচালনা [illegible] সরকারের [illegible] নিয়ন্ত্রণের [illegible] একটি [illegible] সেক্রেটারী [illegible] জন্য।

টালি নালার উপযোগিতা

টালি নালার মধ্য দিয়ে যেসব মালপত্র যায় সেগুলিকে দু'শ্রেণীতে ভাগ ক'রে টোল বসানো হয়। টন হিসাবে টোল ধরা হয় ইঁট, বালি, চূন ইত্যাদির ওপর, আর ঘনফুট হিসাবে টোল ধরা হয় বাঁশ, কাঠের গুঁড়ি ইত্যাদির ওপর। নালার মধ্য ১৯৫৫-৫৬খৃঃ (মার্চ শেষে) ১৪৪৫১৭ টন ও ২২৩৭৪২ ঘনফুট মাল আমদানী-রপ্তানী হ'য়েছে। মোট টোল আদায় হ'য়েছে ৮১৮৮২ টাকা।

১৯৫৭-৫৮খৃঃ (মার্চ শেষ) ১০৮০৬৭ টন ও ১৫০৬৯২ ঘনফুট মাল যাতায়াত ক'রেছে এই নালার মাধ্যমে। মোট টোল আদায় হয় ৬১৫০৬ টাকা।

কিছুদিন আগে পর্যন্ত একটা ২৫ মনে শালতিকে টোল দিতে হ'ত ৭½ আনা, ২৫ মনের বেশী ৫০ মনের কম হ'লে ১৫ আনা, ৫০ মনের বেশী ৭৫ মনের কম হ'লে ১।৵১০ আনা। খুব কম করে হ'লেও প্রতি নৌকাকে দিতে হ'ত ৯ আনা। —

প্রতি বর্গাকার সাইজ্‌করা কাঠের জন্য দিতে হ'ত ৬ আনা. কাঁচা কাঠের গুঁড়ি প্রতি ৩ আনা এবং বাঁশের চালি প্রতি শ'তে হ'ত ৩ আনা।

সম্প্রতি এ হার দেড়গুণ বাড়ানো হ'য়েছে।

নালাটির তীরে দুটি স্থানীয় টোল অফিস আছে: খিদিরপুরে একটি আর টালিগঞ্জে রসা টোল অফিস।

এ ছাড়াও হেস্টিংস ব্রীজের কাছে নালার মুখে মাল পড়ে থাকলে তার ওপর মাশুল আদায় করে পোর্ট কমিশনার।

নালা সংস্কারে সরকারী ঔদাসীন্য

আমরা শুধু এর থেকে আদায় করতেই শিখেছি। সেই ১৭৭৫ খৃঃ পর হ'তে এর উন্নতি বা উজ্জ্বল সম্ভাবনার দিকে একবারও চেয়ে দেখলাম না। আমরা ভুলে যাই যে একমাত্র টালি নালা আর সার্কুলার কানেলের মধ্য দিয়েই দেশী নৌকা কোলকাতায় আসতে পারে। আমরা ভুলে যাই যে বাংলাদেশেই পূর্বাঞ্চলের গ্রামগুলি হ'তে ধান ব'য়ে এনে মুখ্যতঃ টালি নালাই বসিয়েছে টালিগঞ্জের ধানকলগুলি; সুন্দরবন হ'তে কাঠ ব'য়ে এনে খুলেছে কোলকাতায় কাঠের কারখানা; উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে সম্ভব ক'রে তুলেছে বহুল পাট রপ্তানী।

আজও কি এ বহু লোকের কর্ম সংস্থানের সুযোগ দিচ্ছে না? আজও কি এ রেলপথের অভাব কিছুটা মেটাচ্ছে না? প্রাচ্য সাগরের রাণী কোলকতা নগরীর দেহ সৌন্দর্য্য গড়ে তুলতে আজও কি তাকে হরিশ চাটার্জি স্ট্রীটের ইট্-সুরকীর আড়তগুলির ওপর একটুও নির্ভর করতে হয় না? আদিম নৌকার প্রয়োজন কোলকাতায় কি নিঃশেষে আজও মিটেছে?

তবে নৌকার প্রয়োজনকে আমরা বোধ হয় গলা চেপে আজ মেরে ফেলতে চাই তাই এর ক্রমশঃ চড়া-পড়া খাতের ওপর একবারও 'ড্রেজার' এললো না আজও। এভাবে আর কিছুদিন চলতে থাকলে দক্ষিণ কোলকাতার ড্রেনের জল ব'য়ে নিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোন কাজ হবে না এর দ্বারা। যার স্বভাবজোয়ারের ক্ষমতা নাই পাঁক সরাতে কে বাঁচাবে তাকে।

অপরাধীদের পুনর্বাসন

(পঞ্চম পৃষ্ঠার পর)

দেন, সৎ পথে থাকার সদুপদেশ দিতেও কসুর করেন না। কিন্তু তাঁদের আসল দরকার আমার ও আমার মতো ছেলেদের দল। খুব জরুরী কিছু হলে—অস্ত্র ব্যবহারের হুকুমও তাঁরা আকারে ইংগিতে দেন।

রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংযুক্ত এই সব অপরাধীদের পরিচয়ও একটু ভিন্ন রকমের। সাধারণ গুণ্ডাদের দলভুক্ত এদের কোনও-ক্রমেই করা যায় না। সবাই মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক ঘরের ছেলে। প্রায় সবাই স্কুলের লেখা পড়া করেছে, কয়েকজন কলেজেও পড়েছে। কেউ কেউ বিবাহিত, পারিবারিক জীবনও সুখী। রাজনৈতিক নেতা ও দলের সঙ্গে সম্পর্ক থাকায়, অনেকেই নিজেদের অভিজাত অপরাধী বলে মনে করে। বিভিন্ন অপরাধে অভিযুক্ত হলেও, সাজা পেয়েছে খুব কম লোকেরা। আইনের ফাঁক, বাইরের প্রভাব এবং অপরাধী দল সম্বন্ধে সাধারণ নাগরিকদের ভীতি তাদের আদালতের সাজা থেকে বাঁচিয়েছে।

বাঙলার মধ্যবিত্ত সমাজ এতদিন নিজস্ব অলিখিত অনুশাসনে সমাজবিরোধীদের শাসন করেছে। আজ, সে ক্ষমতাও তার নেই। অর্থ এবং রাজদণ্ডের কোপে ও প্রকোপে সাধারণ মানুষ অন্যায়, অপরাধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভাষা হারিয়ে ফেলেছে। তাই, অপরাধীদের সঙ্গে সংযুক্ত ভ্রষ্টাচারী, রাজনৈতিক নেতাদের বিরুদ্ধে ঘৃণার প্রকাশ নেই।

সম্প্রতি কয়েকজন নিরাপত্তা আইনে ধৃত যুবককদের সঙ্গে কথাবার্তা বলার সুযোগ ঘটেছিল। কারাপ্রাচীরের মধ্যে তাদের চিন্তায় কিছুটা স্থৈর্য্য এসেছে। নিরাপত্তা আইনের চোখে রাজনৈতিক বন্দীদের যে মর্যাদা তা তাদের নেই। সবাই তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত। এক বছর জেলে আটক থাকার সম্ভাবনা সবাইকেই পীড়িত করেছে। বাইরে গিয়ে সাধারণভাবে জীবন যাপন করবো এ কথাও অনেকে বলছে। পুলিশ বাইরে গেলে তাদের সম্পর্কে কি মনোভাব নেয় তার উপর তাদের ভবিষ্যৎ কার্যক্রম অনেকখানি নির্ভর করছে। অতীতে তারা যে অপরাধ করেছে, তার সাজা আদালতে পুলিশ দিতে পারে নি। কিন্তু, তাদের কার্যাকলাপও ভুলতে পারে নি। নানাভাবে তাদের উপর হয়রানি চলে। তাদের সঙ্গে সম্পর্ক থাকুক বা না থাকুক, কোনও অপরাধ অনুষ্ঠিত হলেই প্রথমে সন্দেহ গিয়ে পড়ে তাদের উপর, যে আইনী অস্ত্র সমর্পনের জন্যেও পুলিশ যথেষ্ট চাপ দেয়। অথচ, এই সাধারণ কথাটা বোঝে না যে কলকাতায় অপরাধী দুনিয়ায় দুই একদিনের মধ্যেই কয়েক শো টাকা খরচ করলেই মরণাস্ত্র সংগ্রহ করা যায়। সুতরাং, ভবিষ্যৎ জীবন অনিশ্চিত।

যুদ্ধ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং রাজনৈতিক কলহবিবাদের মধ্যে দিয়ে যে অবাঞ্ছিত অপরাধী দলের সৃষ্টি হয়েছে, তার বিরুদ্ধে বাঙলার সুস্থ জনমতকে জাগ্রত করে তোলার প্রয়োজন। নিজেদের রাজনৈতিক মতলব হাসিল করার জন্যে যারা সমাজ জীবনকে এভাবে কলুষিত করছেন, তাঁদের মুখোস অতি নির্মমভাবে টেনে খুলে দিতে হবে। তারই সঙ্গে, দরদ দিয়ে এই সমস্ত অপরাধী যুবকদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছাড়া, অন্য সবাইকে স্বাভাবিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

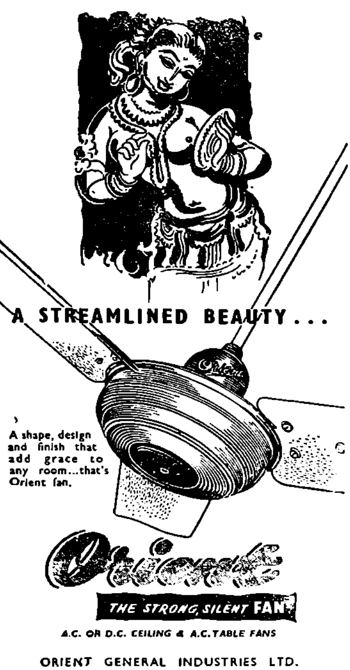

শিক্ষাজগতের কর্তাব্যক্তিদের বিদ্যার বহর!

(বিশেষ প্রতিনিধি)

কিছুদিন পূর্বে [illegible] বাংলার শিক্ষামন্ত্রী রায় হরেন্দ্র নাথ চৌধুরী এবং শিক্ষা বিভাগের সেক্রেটারী ডাঃ নীরেন্দ্র-মোহন সেন নিম্নোক্ত ঘোষণা জারি করেছিলেন — প্রদেশের মাধ্যমিক স্কুলের সমস্ত শিক্ষক সমাজকে পারিক সার্ভিস কমিশনের সামনে হাজির হতে হবে পরীক্ষা দেবার জন্য।

কিন্তু কিছু, শিক্ষক পরীক্ষা দিয়েছিলেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক সমিতির নেতৃত্বে অধিকাংশে অনুসূচিত থেকে শিক্ষকরা এই নির্দেশের বিরুদ্ধে আন্দোলন সুরু করেন। করেছিলেন। সংবাদ ব্রাহ্মিক চত্বরে অনশনও করেছিলেন। এই সমাজের বিরোধীতার জন্য এবং জনমতের চাপে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তার আদেশ প্রত্যাহার করেছেন।

কিন্তু পরীক্ষা একটা হওয়া উচিত। মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষক-গণের নয়, পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা বিভাগের কর্তা ব্যক্তিদের।

কয়েকমাস পূর্বে আমার এক রিপোর্টার বন্ধুর নিকট তথকালীন আইন বিভাগীয় মন্ত্রী দুঃখ করে-ছিলেন, আমাদের দেশের ছাত্রসমাজের জ্ঞানের অভাব দেখে। সরকারী কি কতগুলো কাজে নিয়োগের জন্য শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় ইন্টার-ভিউ নিচ্ছিলেন। সখ্য, সয্য কলেজ ছেড়ে আসা ছেলেরা জ্ঞানের অভা-বের যে নজির দেখিয়েছিলেন, শ্রীরায় তাতে বিস্মিত হয়েছিলেন।

সাংবাদিক বন্ধুটি শ্রীরায়কে অনুরোধ করেছিলেন, ছাত্রদের সম্বন্ধে মন্তব্য করার পূর্বে তিনি যেন সেক্রেটারী সমেত শিক্ষাবিভা-গের অফিসারদের একবার পরীক্ষা করে দেখেন।

শিক্ষা বিভাগের কর্মচারীদের লেখা পাঠ্য বই

শ্রীরায়কে এর পর দুখানা স্কুল পাঠ্য বই পড়বার জন্য দেওয়া হয়। একখানা লিখেছেন, "শ্রীপ্রমোদচন্দ্র ঘাস, এম-এ, বি-টি, স্পেশাল অফি-সার, বোর্ড অব সেকেন্ডারী এডু-কেশন, ভূতপূর্ব্ব চীফ্ ইন্‌স্‌পেক্টর অব সেকেন্ডারী এডুকেশন (ওরেঞ্জ বেঙ্গল)" এবং অন্যটি লিখেছেন "S. C. Sen, M.A., B.T., Dip. in Spk. Eng., S.I. of Schools (special), Govt. of W. Bengal",

বইদুটি পড়ে শ্রী রায় আর বাক্যস্ফুরণ করেন নি। সাংবাদিক বন্ধুটি আরও এক ধাপ এগিয়ে-ছিলেন। তিনি শ্রী প্রমোদচন্দ্র দাসের বইটি ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে পাঠিয়েছিলেন এবং অনুরোধ করে-ছিলেন যেন তিনি বইটি পড়ে দেখেন আমাদের মধ্যশিক্ষা পরি-চালন ব্যবস্থা যাদের হাতে তাদের মধ্যে কারুর কারুর বিদ্যার বহর কত।

সে কয়েক মাস আগের কথা। ডাঃ রায় বইটি পড়েছিলেন কিনা জানি না। কিন্তু আমার সাংবাদিক বন্ধুটি তাঁর পত্রের উত্তর পান নি। শ্রীদাস যথাসম্ভবে বহাল আছেন।

প্রমোদ ঘাসের সংশোধন

শ্রীপ্রমোদচন্দ্র দাসের বইটির নাম "সাধারণ জ্ঞান"। ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্য। গত বছর মুখ্যতঃ শ্রী নিরপেক্ষ বইটির উপর মন্তব্য করেছিলেন। সম্প্রতি বইটির একটি নতুন কপি আমাদের হাতে এসেছে। পুরোনো বইটিরও এক খণ্ড যোগাড় করেছি।

মিলিয়ে মিলিয়ে পড়ে চমৎকৃত হয়ে গেছি। শ্রীদাস বাজারে নতুন বই ছেড়েছেন, কারণ স্কুলের নতুন সেসন লাঁচই সুরু হবে এবং বই বিক্রির মরশুম পড়ে যাবে।

এমন কোনো জ্ঞান নেই যা শ্রী দাস তাঁর বইতে বিতরণ করেন নি। বইটি মুখস্থ করলে ছাত্র-ছাত্রীদের আর কোনো দুশ্চিন্তা থাকবার কথা নয়, বিশ্বজগতের সব কিছু তারা জেনে ফেলবে। শ্রীদাস আবার এমন অনেক জ্ঞানের অধিকারী যা পূর্ববর্তীতে আর কারুর জানা নেই। সে সব জ্ঞানও বইটিতে পরিবেশন করা হয়েছে।

শ্রী নিরপেক্ষ চাকুষের পর বইটির কতকগুলো অংশ পরিবর্তন করা হয়েছে; নতুন তথ্য যা করা হয়েছে তাতেও শ্রীদাসের নিজস্ব জ্ঞানের সাক্ষ্য পরিচয় মিলবে। শ্রী নিরপেক্ষ যে যে বিষয় উল্লেখ করেন নি, তা যেমনটি ছিল, তাই আছে।

এমন একটি অমূল্য গ্রন্থ যে "কুচবিহার স্টেট" এবং পশ্চিম বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের সর্বত্র পাওয়া যাবে তাতে আর সন্দেহ কি? ভাবছি, শ্রীদাসকে এখন "কুচবিহার স্টেটের" চীফ্ সেক্রেটারী করে পাঠালে কেমন হয়! তাতে যদি কুচবিহার জিলার (১৯৫০ হতে কুচবিহার বাংলার একটি জিলা মাত্র) ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের চাকুরী যায়, তাতে কি?

ভারত স্বাধীন না পরাধীন

"সার্বীয় জ্ঞানের" পরেরোনো বইটিতে (১৯৫৭ সনে প্রকাশিত হয়) শ্রীদাস "ভারতবর্ষের কথা" পরিচ্ছেদে লিখেছিলেন ঃ "বর্তমানে ভারতবর্ষ স্বাধীন না পরাধীন?—উঃ ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ভারতবর্ষ স্বায়ত্তশাসন লাভ করি-য়াছে। ১৯৪৮ সালের জুন মাসে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে।"

হালে প্রকাশিত বইটিতে তিনি উত্তরটি খুঁজবারও চেষ্টা করে বলেছেন ঃ "১৯৪৭ সালের ১৫ই ২৬শে জানুয়ারী নূতন শাসন-লাভ করিয়াছে। ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী নূতন শাসন-তন্ত্রের প্রবর্তন হইয়াছে।"

নতুন শাসনতন্ত্র তো বৃটিশ আমলেও কতবার প্রবর্তিত হয়েছে। তাই নতুন শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হয়েছে বললেই তো আর বোঝা যায় না দেশ স্বাধীন কি পরাধীন। সরাসরি উত্তর লিখতে শ্রীদাসের এত সংকোচ কেন?

তবে শিক্ষা জগতের এই দিক-পালের কোনো সন্দেহই নেই যে ১৯৫৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করে নি, কেবলমাত্র "স্বায়ত্তশাসন লাভ করিয়াছে।"

আর স্বায়ত্তশাসন মানে কি তা তিনি পরের প্রশ্নোত্তরেই প্রকাশ করেছেন ঃ "দেশের আভ্য-ন্তরীণ শাসনব্যবস্থা যখন দেশীয় অধিবাসীগণ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয় তখন সেই অবস্থাকে স্বায়ত্তশাসন বলে।"

অর্থাৎ ১৯৫৭ সালে শ্রী নেহেরু ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রী হলেও আমাদের পররাষ্ট্রনীতি বৃটিশ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ও পরিচালিত হত। ভাগ্যি শ্রী নেহরু যা জানেন না। ডাঃ নীরেন্দ্র-মোহন সেন—যিনি শ্রীদাসকে মাধ্য-মিক শিক্ষা সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ পদে বসিয়েছেন—তিনি এ-সম্বন্ধে কি বলেন?

এত লোককে ভারতরত্ন খেতাব দেয়া হচ্ছে, শ্রীদাস এখনও এ খেতা-বটি পাচ্ছেন না কেন? দেখুন এক কলমের খোঁচায় ভারতের সীমানা তিনি কোথায় নিয়ে গেছেন ঃ

"ভারতের ফিজিক্স্‌ফ্রন্টিয়ার"

"ভারতের প্রধান গিরিসঙ্কট-গুলির নাম কি?—উঃ খাইবার, বোলান, গোমাল এবং জোজিলা।" আর ডিস্তা কি? খাইবার, বোলান ও গোমালকেও শ্রীদাস ভারতের মধ্যে এনে ফেলেছেন। এমন কি, আরেকটি প্রশ্নোত্তরে সিন্ধুও ভারতের একটি প্রধান নদী হয়ে দেখা দিয়েছে। এত অবলীলাক্রমে পশ্চিম পাকিস্তানকে কি কেউ আর নসাৎ করতে পেরেছেন?

বাংলা দেশের শিল্প সম্বন্ধি সম্বন্ধে শ্রীদাস তাঁর অনন্যকরণীয় ভাষার অপূর্ব তথ্য দিয়েছেন। "বাংলা দেশের শিল্পজাত দ্রব্য কি কি?—উঃ কাগজ, কাপড়, পিতল ও কাঁসার বাসন। পাটের দ্রব্য, বাঁশের দ্রব্য, মাটির দ্রব্য ও খেলনা, তাঁত শিল্প, মুর্শিদাবাদ সিল্ক, বাংলার প্রতিমানির্মান শিল্প ও প্ল্যাস্টিক শিল্প বিশেষ বিখ্যাত।"

শ্রীনিরপেক্ষের চাকুষের পরেও উত্তরে কোনো পরিবর্তন করা হয় নি। আরেকটি উত্তরে কিছু সংশো-ধন করেছেন। গত বছর অবধি তিনি বলেছিলেন কয়লা, লোহ ও ম্যাঙ্গানীজ বাংলার খনিজ সম্পদ। এবার বলেছেন ঃ "কয়লা। আসান-সোল অঞ্চলে সামান্য লোহও পাওয়া যায়।" আসানসোল অঞ্চলের লোহের আকরগুলো কার হেফাজতে আছে জানালে শ্রীদাস বাংলার শিল্পপতি ও জনসাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হতেন।

বইটি পড়লে কোন সন্দেহ থাকে না যে জাঁইত বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের মধ্যে একমাত্র "কর্ম-বীর" আলামোহন দাসই বিখ্যাত আর বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের মধ্যে এই "কর্মবীরের" স্থান "বিড়লা ব্রাদার্সের" অনেক উপরে।

আলামোহনের আস্ফালন

শুনেছি, আলামোহন বাবু প্রমোদবাবুর আত্মীয়। সুতরাং আলামোহন যে ভারতের ৪৮ জন জীবিত ও মৃত বিখ্যাত ব্যক্তির একজন হবেন, তাতে আশ্চর্য করার কি আছে? শুধু বাংলাদেশের জীবিত ব্যক্তিদের হিসাব নিলে তাঁদের মধ্যে মাত্র দুজনেই বিখ্যাত বলে ধরা নিতে হবে। প্রথমে, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। দ্বিতীয়—"আলা-মোহন দাশ"। দাশের বানানটা একটু বদলেছে, কেন, প্রমোদ-বাবুই জানেন। শ্রীদাস ডাঃ রায়কে দিয়েছেন ১৬ লাইন, আর আলা-মোহনকে ১৯ লাইন।

নতুন বইটিতে তিনি বিখ্যাত ব্যক্তিদের হতে আলামোহনকে বাদ ছেন। অথবা, হয়ত নতুন বইটি ছাপাবার সময় তিনি ঢের পেয়ে-ছিলেন, জালিয়াতি, তৎবিল তছ-রূপে ইত্যাদি নাম করা ধারায় "কর্মবীর" মহাশয়কে বিচারার্থ প্রেরণ করা হবে। বইটিতে আলা-মোহনের স্থান এখন শ্রীতারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায় দখল করেছেন।

৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় প্রমোদবাবু স্যার পি. সি. রায়কে বাংলার একজন বিখ্যাত রাজনৈতিক নেতা বানিয়ে-ছেন। কিন্তু ১২৯ পৃষ্ঠায়, যেখানে চার লাইনে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের জীবনী লিখেছেন, সেখানে প্রফুল্লচন্দ্র "নীরব কর্মকর্মী" হয়ে দেখা দিয়েছেন।

ফুটবল ক্লাবগুলোর নতুন নাম

কলকাতায় ৪০ লক্ষ লোক শ্রীদাস কোন সূত্র থেকে জানলেন? কলকাতার মরদানের সব খুটি-নাটি শ্রীদাসের নখদর্পণে। বিখ্যাত ক্লাবগুলোর নাম নামকরণও তিনি করেছেন ঃ "মোহনবাগান স্পোর্টিং, ইষ্টবেঙ্গল স্পোর্টিং, ক্যালকাটা স্পোর্টিং, এরিয়ান স্পোর্টিং।"

শ্রীদাস যাদের জন্য বই লিখেছেন, অর্থাৎ ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রী, তাদের কাউকে জিজ্ঞেস করে বরং তিনি তবে এতগুলো "স্পেলিং"এর ফ্যাসাদে পড়তেন না!

দুটি বইতেই কেন্দ্রীয় ও পশ্চিম বাংলার মন্ত্রিসভার সদস্য-দের তালিকি আছে—১৯৫৭র পূর্বে যা ছিল, এখনও তাই। ১৯৫৭-র সাধারণ নির্বাচনে যে সব মন্ত্রী, রাষ্ট্রমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীরা হেরে ভূত হয়ে গেছেন, তাঁদেরও নাম বাদ পড়েনি। ডাঃ জীবনরতন ধর ও ডাঃ অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় গত নির্বাচনের বহু পূর্বেই ডেপুটি মন্ত্রিত্ব থেকে প্রমোশন পেয়ে মিনিস্ট্রার অব স্টেট্ হয়েছিলেন। কিন্তু নতুন বইটিতেও তাঁরা ডেপুটি মন্ত্রীই রয়ে গেছেন।

১৯৫৭ সালের বইটিতে শ্রীদাস আমাদের জানিয়েছিলেন "কংগ্রেস দল ও উপদল কোন্-গুলি।" তিনি লিখেছিলেন ঃ "কংগ্রেস একদলীয় প্রতিষ্ঠান নহে। অনেকগুলি দল ও উপদল লইয়া ইহা গঠিত। ইহা প্রধানতঃ দুইটি ভাগে বিভক্ত—(১) দক্ষিণ পন্থী ও (২) বামপন্থী। বামপন্থী দল কয়েকটি উপদলে বিভক্ত ঃ—(ক) সমাজতান্ত্রিক, (খ) ফরোয়ার্ড ব্লক ইত্যাদি। ইহারা বর্তমানে পৃথক।"

শ্রীনিরপেক্ষ এই অংশটুকু তুলে শ্রীঅতুলা ঘোষকে দুশ্রিয়ার করেছিলেন। এবার শ্রীদাস বইটি থেকে এই অমূল্য তথ্য সম্পূর্ণে কেটে দিয়েছেন।

শ্রীদাস মহাজনী শিক্ষক। ডাঃ নীরেন্দ্রমোহন সেন তাঁর কদর বুঝেছেন। সরকারী চাকুষী হতে অবসর গ্রহণ করবার পরও তাঁকে কর্ম থেকে রেহাই দেয়া সম্ভব হয় নি। রাইটার্স বিল্ডিং থেকে তাঁকে সোজা পাঠান হয়েছে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোডে অব-শিক্ষা ,পদকে এক গুরুত্বপূর্ণ পদে—স্পেশাল অফিসার। মধ্যশিক্ষা পর্ষদে সেক্রেটারী ও সেক্রেটারীর পরই তাঁর হাঁক-ডাক।

তিনি যা লিখেছেন তাতে ভূগোল, রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজনীতি সম্বন্ধে আমাদের সব ধারণা বদলাতে হবে। "ভূগোলের বিবিধ জ্ঞান" শিরোনামায়ও পরিচ্ছেদে তিনি যে সব বিষয়ের অবতারণা করেছেন, তার মধ্যে এগুলোও আছে ঃ "বর্তমান পৃথিবীতে ভিন্ন ভিন্ন দেশে কি কি শাসন-প্রণালী প্রচলিত?" "ফ্যাসিজম্-এর অর্থ কি?" "গণতন্ত্রের অর্থ কি?" "কম্যু-নিজম কি?" "পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনী কাহারা?" "হ্যারিকিরি কি?"

শ্রী এস সি সেনও পশ্চিমবঙ্গ সরকারী শিক্ষা বিভাগের একজন পদস্থ ব্যক্তি। তিনি ৫ম শ্রেণীর জন্য লিখেছেন ইংরেজী পাঠ্য বই —Dev Readers' Primer. বারবার বইটি শিক্ষা দপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

শ্রীসেনের স্বাজাত্যের দেশ

"আমাদের দেশ" সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি একটি ম্যাপ দিয়ে-ছিন। একজন নিরক্ষ ছাত্র-ছাত্রীদের বলছে ঃ 'নীচে এ্যাট দি ম্যাপ ওন দি ওয়াল। ইট ইজ দি ম্যাপ অফ ইণ্ডিয়া"। দ্বিতীয় বাক্যটিতে "এ" ব্যবহার না করে "দি" কেন ব্যবহার করলেন শ্রীসেন বলে দিলে, ছাত্র-ছাত্রীরাই নয়, তাদের অভিভাবকরাও প্রভূত উপকৃত হতেন।

বইটি ১৯৫৬ সালে প্রকাশিত হয়েছে। এই অংশে যে ম্যাপটি দেখিয়ে বলা হয়েছে "ইট ইজ দি ম্যাপ অফ ইণ্ডিয়া" সেটিতে শুধু পাকিস্থানই নয়, বর্মাও ভারতের অংশ। শ্রীদাস ও শ্রীসেনের জ্ঞান সমযোগ্যের, কোনো সন্দেহ নেই।

শিক্ষা বিভাগের এই সব কর্তাব্যক্তিদের লেখা বইগুলো চট চট করে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। স্কুলে পাঠ্য হয় কি করে এবং বছর বছরই বা নতুন সংস্করণের দরকার হয়ে পড়ে কেন, কেউ যদি অনুসন্ধান করেন, শিক্ষা জগতের অনেক বিস্ময়জনক সংবাদ জানতে পারবেন।

কর্পোরেশনের ঋণের অর্থলগ্নীর ব্যাপারে কাহারা দায়ী

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

দর্পণের ৭ই ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় কলকাতা কর্পোরেশনের ঋণের কোটি কোটি টাকা নিয়ে একপ্রকার ফাটকাবাজি খেলা হয় বলে অভিযোগ করা হয়েছিল। স্ট্যান্ডিং ফিনান্স কমিটির চেয়ার-ম্যান শ্রীকিশোরীলাল চলচাঞ্চল গত মঙ্গলবার একটি সাংবাদিক সম্মেলন আহ্বান করেছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল কর্পোরেশন বাজেটের মূল বিষয়গুলো সাংবাদিকদের বুঝিয়ে বলা।

প্রশ্নোত্তরের সময় যে সব তথ্য প্রকাশ পায় তাতে দর্পণের গুরুত্বের অভিযোগের কয়েকটির সমর্থন পাওয়া যায়। কিশোরী-লাল বাবু তাঁর দায়িত্ব অস্বীকার করেন এবং বলেন যে ঋণের অর্থ লগ্নীর ব্যাপারে কর্পোরে-শন, কমিশনার শ্রী বি. কে. সেন ও ফিন্যান্স অফিসার শ্রীপরিতোষ মিত্রের উপর সম্পূর্ণ ভার অর্পণ করেছে।

পরিতোষ বাবু বলেন যে কয়েকজন দালাল মারফৎ ঋণের টাকার সরকারী ও আধাসরকারী পত্র ক্রয় করা হয়—চলতি দরে নয় পূর্বের দিনের বাজার বন্ধের সময়ের দরেই।

জীবন বীমা কর্পোরেশন কর্তৃক শ্রী হরিদাস মুন্দার কোম্পানীগুলোর শেয়ার ক্রয়ের ব্যাপারে দেখা গেছে এই দাম নিয়ে কি কারনাজি চলে। সেখানে তো মাত্র ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার লেনদেন হিল। কর্পোরে-শনের হাতে ঋণের টাকা এখন আছে প্রায় সাড়ে তিন কোটি।

আরও তথ্য প্রকাশ পায় যে যদিও ঋণের টাকা কাজে লাগান বহুক্ষেত্রে অসম্ভব হয়ে পড়েছে, তবুও বৎসরের পর বৎসর নতুন ঋণ করা হচ্ছে। অবশ্যটা সন্দেহজন বৈকি!

আগামীবারে আমরা শ্রী চলচ্চিহ্নায় সাংবাদিক সম্মেলনের আলোচনার বিশদ রিপোর্ট করব।

ভারতীয় বন্দর ও কারখানায় বহুসংখ্যক পাকিস্থানীর অবস্থিতিতে ভারতসরকারের উদ্বেগ

(দর্পণের সংবাদদাতা)

কলকাতায় প্রায় ৩০ হাজার জাহাজীর মধ্যে এখনও অর্দ্ধেকের বেশী পাকিস্থানী। বোম্বাইয়ে ১৭ হাজার জাহাজী, তার মধ্যেও শতকরা পঞ্চাশ জন পাকিস্থানী। পোর্ট এলাকা ছাড়া কলকাতার অন্যান্য জায়গাতেও প্রায় এক লক্ষ পাকিস্থানী নাগরিক আছে। অনেকেরই পাসপোর্ট সংশিল্ষ্ট কাগজপত্র নেই। এদের মধ্যে যাদের ভারত ত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল তাদের মধ্যেও কিছু সংখ্যক লোক নানা অজুহাতে এখন পর্যন্ত এখানেই রয়ে গেছে।

সম্প্রতি ফিরোজ খাঁ নূনের নেতৃত্বে পাকিস্থানে ভারত-বিরোধী প্রচার কার্য যেমন জোরদার হয়ে উঠেছে তাতে করে ভারত সরকারকেও ভারত-প্রবাসী পাকিস্থানীদের সম্পর্কে তাঁদের নীতি পাল্টানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়েছে।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে সম্প্রতি ভারত সরকারের ডাইরেক্টর জেনারেল অব শিপিং কলকাতায় এসে হাজির হন এবং এখানকার শিপিং অফিসের উর্ধ্বতন কর্মচারীদের সঙ্গে জরুরী বৈঠকের পর জাহাজীদের পরে ভারতীয় নিয়োগের গতি দ্রুততর করার জন্যে কড়া নির্দেশ জারী করেন।

ক্রাশ্চীর সম্বন্ধে ভারতের বিরুদ্ধে বিষোদগার, ক্ষমতার অধিকারী বা ক্ষমতা লোভী স্বার্থান্বেষী পাকিস্থানী নেতা-দের রাজনৈতিক পেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই পেশার সফলকে ছাড়িয়ে গেছেন বর্ত্তমান প্রধান মন্ত্রী জনাব ফিরোজ খান নূন। সম্প্রতি পাকিস্থান জাতীয় সভায় কাশ্মীরের পরিপ্রেক্ষিতে বলতে গিয়ে, তিনি হুঙ্কার ছেড়েছেন, "আমরা মাথন চাই না, চাই বন্দুক"।

এইরকম হুঙ্কার ভারত সরকারকে ভারতে পাকিস্থানী-

নন্দাকরীর

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

তাদের বিবেক মালিকের বিবেকের ন্যায় মোছোহাটায়ও বিক্রী হয় না। এঁদের সংগে পার্টি গভর্ণমেণ্টের ঐক্যমতের কোন প্রশ্নই সর্বদা ঘটবে কিংবা ঘটানো সম্ভব, একথা কেউ বলছে না। কিন্তু এই শিক্ষিত মানবেন্দ্রলিকে বাদ দিয়ে জনসংযোগ কিছুতেই সম্ভব নয়—গভর্ণমেণ্ট সম্বন্ধে এঁদের মধ্যে অন্ততঃ ন্যূনতম মর্য্যাদাবোধ থাকা দরকার।

সে জিনিষ যদি না থাকে গভর্ণমেণ্ট বে পন্থাই গ্রহণ করেছেন, (১) মুখে চোখে চুনি পরিয়ে, (২) কিংবা মালিকদের দ্বারা হুকুমনামা বলবৎ করিয়ে, (৩) অথবা সরকারী কর্মচারীদের মুখ বন্ধ করে দিয়ে, কংগ্রেস গভর্ণমেণ্টের সংগে সঙ্গতির সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। কতকগুলি চাকর ও চাটুকারের সমর্থনের দ্বারা নিশ্চয়ই গভর্ণমেণ্টকে জনপ্রিয় করা যায় না। কাজেই বিধানচন্দ্র অনা জায়গায় সমর্থন খুঁজুন যেখানে মনুষ্যত্ব ও সৎ-বুদ্ধির ভিত্তিতে সমর্থন সম্ভব। দালালী অথবা হুকুমের দ্বারা সেই সমর্থন পাওয়া যাবে না। কেননা নাৎসীবাদী মবলিকা যতই নিষিদ্ধভাবে প্রয়োগ করা হবে, ততই সংবাদপত্রের স্বাধীন মানুষ এবং সরকারের সং কর্মচারীদের মধ্যে মানসিক যোগাযোগ ঘনিষ্ঠতর হবে। তারপর, মালিক এবং গভর্ণমেণ্ট যদি বোঝাপার রাজনীতির মধ্যেও প্রবেশ করেন, তাহলেও সত্যের মুখ চাপা দেওয়া যাবে না।

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

তাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কঠোরভাবে নাড়া দিয়ে দেয় এবং শঙ্কাকুল করে তোলে। নূনের গত হিটলারী নিনাদের সংগে সংগে ভারত সরকারের ডাইরেক্টর জেনারেল অফ শিপিং কলকাতায় এসে হাজির হন এবং শিপিং আফিসের উর্ধ্বতন কর্ম্মচারীদের সংগে জরুরী আলোচনা করেন।

আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল, শিপিংএ পাকিস্থানী অধিবাসী-দের আধিপত্য। আলোচনার পর দেখা গেল গত কয়েক বৎসরে ভারতবিরুদ্ধকল্প নীতি অনুসরণ করা সত্ত্বেও এখনও কলকাতায় প্রায় তিন হাজার জাহাজীদের মধ্যে অর্দ্ধেক পাকি-স্থানী। বোম্বাইএ সতের হাজার জাহাজী; তাদের মধ্যে শতকরা পঞ্চাশ জন পাকি-স্থানী।

শত্রু ভাবাপন্ন ও আক্রমনো-ন্মুখী দেশের, বিশেষ করে প্রতিবেশী রাজ্যের, বহু সংখ্যক অধিবাসীর অবস্থিতি, ভারত সরকারের পক্ষে বরদাস্ত করা নিরাপত্তার দিক থেকে একে-বারেই অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

কিন্তু চট্‌করে কলকাতায় এদের রিক্রুটমেণ্ট একেবারে বন্ধ করে দেওয়ার ব্যাপারে অসুবিধা অনেক।। হঠাৎ বন্ধ করে দিলে, বিদেশী জাহাজের মালিকেরা পূর্ব্বপাকিস্থানের চট্টগ্রাম ও খুলনা থেকে তাদের প্রয়োজন মত জাহাজী রিক্রুট করবে। ফলে, ভারতীয়রা কর্ম্মসংস্থানের একটি নিশ্চিত সুযোগ সুবিধা থেকে চিরদিনের জন্য বঞ্চিত হবে।

তাই পাকিস্থানী জাহাজীদের স্থান যাতে ভারতীয়দের দ্বারা তাড়াতাড়ি ভর্তি করা যায় তারই সিদ্ধান্ত সরকারকে নিতে হয়েছে। ডাইরেক্টর জেনারেল অফ শিপিং কলকাতার বৈঠকে ভারতীয় রিক্রুটের গতি বাড়া-বার সুপ্রশস্ত নির্দ্দেশ দিয়েছেন।

এই লঞ্চগুলির সারেংও খালাসী সবই পাকিস্থানী। কিছুদিন আগে এদের ধর্ম্মঘটের ফলে লঞ্চগুলি অচল হয়ে যায় এবং মাঝ গঙ্গায় জাহাজগুলিতে মাল বোঝাইয়ের কাজ বন্ধ হয়। এই জাহাজগুলি পাটের জাহাজ এবং এগুলিতে পাট বোঝাই বন্ধ হওয়ায় রপ্তানীকারীদের নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিদেশে মাল পাঠাবার চুক্তি পালনে বিশেষ বিঘ্নের সৃষ্টি হয়। চুক্তি-ভঙ্গ হলে বিদেশের বাজারে ভারতের বদনাম এবং পাকি-স্থানী পাট-শিল্পপতিদের প্রত্যক্ষ সুবিধা হয়।

পোর্ট এলাকা ছাড়া কলি কাতার অন্যান্য জায়গায় প্রায় একলক্ষ পাকিস্থানী অধিবাসী আছে। এদের সম্বন্ধেও ভারত সরকারকে এঁদেরই সরকার অবিশ্বাসী করে তুলেছে। গত বৎসর পশ্চিম বাংলার পুলিশের কাছ থেকে "বাসস্থানের অনু-মতি" নিতে বাধ্য করিয়ে এদের সম্বন্ধেও অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য যোগাড় হয়েছে। অনেকের পাসপোর্ট সংশিল্ষ্ট কাগজপত্র ছিল না ঃ অনেকের আবার 'জল পাসপোর্ট' ছিল। যাদের ভারত ত্যাগের আদেশ দেওয়া হয়েছিল, তাদের মধ্যে কিছুসংখ্যক এখনও নানা অজুহাতে এবং ভারত সরকারের উদারতার সুযোগ নিয়ে রয়ে গেছে।

এই সব পাকিস্থানীদের কেউ কেউ ইলেক্‌ট্রিক ইঞ্জি-নিয়ারিং এবং এমন কি ভারতের নিরাপত্তার ব্যাপারে সংশিল্ষ্ট কোন কোন কোম্পানীর বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পদে রয়েছে। এ সকল পদে এদের রাখার অযৌক্তিকতা স্মরণ করিয়ে দিয়ে এবং এদের স্থলে দেশীয় লোক নেবার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে সরকার কোম্পানীগুলির কর্ত্তাদের. ঘন ঘন তাগিদ দিচ্ছেন।

এদের মধ্যে দেশী বিদেশী উভয়ই রয়েছে—বর্ত্তমানে যারা রয়েছে, তাদের সরালে উৎ-পাদনের ক্ষতি হবে বলা হচ্ছে।

কংগ্রেসে দ্বিমুখী দ্বন্দ্ব

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

অতুল্য ঘোষের আজ্ঞাবাহকেরা তিনটি কথা—যা প্রায় একাদশেই প্রচার করছেন, (১) সিদ্ধার্থ রায়কে মন্ত্রিত্বে নেওয়ার জন্যই মন্ত্রিসভাকে এই বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছে, অর্থাৎ ডাঃ রায়ের নির্বাচিতা এই বিপদের সৃষ্টি করেছে; ,(২) ডাঃ রায় পার্লা-মেণ্টারী পার্টিকে উপেক্ষা করে-করে যে অবস্থার সৃষ্টি করেছেন, তাতে মন্ত্রিসভা আর বেশী দিন টেঁকানো কঠিন হবে;. এবং (৩) ডাঃ রায়কে প্রদেশ কংগ্রেসের আরও ঘনিষ্ঠ তত্ত্বাবধানে আনতে হবে. লক্ষ্য করবার বিষয় যে, এই প্রচার-কার্যের মধ্যে ডাঃ রায়ের বিরুদ্ধে উক্তি ও অনাস্থা যে-পরিমাণে আছে, সেই পরিমাণে গভর্ণমেণ্টের প্রশাসনিক দুর্বলতা বা দুর্নীতির প্রতি দৃষ্টি নেই। প্রকৃতপক্ষে, এই অংশটি দেখতে চাইছেন যে, মন্ত্রি-সভার দৃষ্টি এসেছে, ডাঃ রায়ের কৌশলহীন এবং চুটিপূর্ণ নেতৃত্বের জন্য। যদি কংগ্রেস পার্লামেন্টারী পার্টির মধ্য থেকে অন্য কোনো অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার উপক্রম ঘটে এবং অনাস্থা প্রস্তাবের পর সত্যই যদি স্পষ্ট দেখা সে, এঁরাই মন্ত্রিসভাকে দাঁড় করিয়ে রাখবেন। সেই রক্ষা কবচের পর, একথা একেবারে নিশ্চিত যে, ডাঃ রায়কে অতুলাবাবুর কুক্ষিগত করে ফেলা হবে এবং অতুলাবাবুর মুখ-মন্ত্রিত্বে আসবার সম্ভাবনাও নিশ্চিত হবে।

কিন্তু অপর অংশটি (যে ৩৭ জন পার্টির বৈঠক ডাকবার জন্য চিঠি দিয়েছেন, তাঁদের সকলে নয়) মনে করেন, কংগ্রেসের কাছে অপ্রিয় হওয়ার প্রধান কারণ--অতুলা ঘোষের প্রতি ডাঃ রায়ের নরম নীতি। তাঁরা অতুলা ঘোষের (১) আরও উত্থান বন্ধ করতে চান এবং তাঁরই প্রস্তুতিক্রমে (২) প্রফুল্ল সেন ও কালীপদ মুখার্জিকে অপসারণের দাবী করা হবে।

এই দ্বিতীয় অংশটি যদি শক্তি অর্জন করতে পারেন তাহলে তাঁরা ডাঃ রায়কে নেতৃত্বসে বহাল রাখবেন, কিন্তু মন্ত্রিসভার পুনর্গঠন চাইবেন। এমন পুনর্গঠন, যাতে করে দুর্নীতির পথ অনেকটা রোধ করা যায় এবং অতুল্যবাবুর কথা আলাদা হয়।

কিন্তু রাজনৈতিক দিক থেকে দেখলে এঁদের পক্ষেই অগ্রসর হওয়া সব চেয়ে কঠকর। কেননা, এখন পর্যন্ত ডাঃ রায় প্রফুল্ল-কালীপদ-অতুল্যের বিরুদ্ধে যতগুলি সহযোগিতার অভিযোগ এনেছেন, একেনা প্রফেসর আরম্ভে এঁদের ডিনাই করিনি বলে নিতে হচ্ছে—অতুল্যবাবুর বিরুদ্ধে নিজেদের প্রকাশ করা, ব্যক্তিকভী ডাঃ রায়েরও বিরাটভাবে হওয়া এবং অন্যদিকে আবার বিরোধীপক্ষ যাতে অতিরিক্ত এই চেষ্টায় সুযোগ না নিতে পারে সেজন্য সতর্ক থাকা. এই অবস্থায় করেকজনের চেষ্টাতেই অবশ্য ৩৭ জনের স্বাক্ষর সম্বলিত দুইটি চিঠি তৈরী হয়ে ডাঃ রায়ের কাছে গেছে। চিঠিতে এঁরা পার্টির বৈঠক রবিবার চেয়ে-ছেন। কিন্তু সেই সংগে পার্টির নেতাদের মনোভাব সম্বন্ধে কতকটা সমালোচনাও স্বিস্তৃতিভাবে আছে। প্রথম মনে হয়েছিল যে, এই সমালোচনায় অনেকে হয়ত স্বাক্ষর করতে সাহস করবেন না; তাই ২টি পত্রের খসড়া তৈরী হয়ে-ছিল। দেখা গেছে, ২টিতেই প্রায় সমান স্বাক্ষর উঠেছে। এবং এই রবিবার সাহস পার্টির সদস্যদের মধ্যে গত ১০ বছরে আর দেখা যায় নি।

রবিবার কুমার সিং হলে এই দুই পক্ষের ভাগ্য নির্ধারিত হবে।

কলিকাতা কর্পোরেশনের কমিশনার শ্রীবি কে সেনের বরখাস্ত দাবী

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

পৌরশাসন পরিচালনায় দুর্নীতি প্রভৃতির গুরুতর অভি-যোগের কথা বিবেচনার জন্য কলি-কাতা কর্পোরেশনের কয়েকজন উর্ধ্বতন কর্ম্মাধ্যক্ষকে এক বিশেষ শিসনারের কাছ থেকে সম্প্রতি করছেন।

.....প্রকাশ, মেয়র ডাঃ হিরণ্ময় সেন এই সম্পর্কে কতিপয় কাউ-সিলারের কাছ থেকে সম্প্রতি প্রাপ্ত এক প্রস্তাব বিবেচনা করছেন।

যে সকল গুরুতর অভিযোগ উক্ত প্রস্তাবে মেয়র মহোদয়ের গোচরে আনা হয়েছে তাদের মধ্যে এসেসমেণ্ট বিভাগ কর্তৃক উচ্চমূল্যকে অযথা কলিকাতার বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির গৃহাদি সম্পত্তির কর নির্ণয় ব্যাপারে নিম্ন মূল্য ধার্য্য করা অন্যতম। ইহা ছাড়া এই মহানগরীতে নূতন গৃহ নির্ম্মাণের পরিকল্পনা অনুমোদন সম্পর্কে বিল্ডিং ডিপার্টমেণ্টের দুর্নীতির বিষয়ও এতে উল্লেখ করা হয়েছে বলে জানা যায়।

এই সকল ব্যাপারে বর্ত্তমান কমিশনার সিটি আর্কিটেক্ট এবং এসেসরের হাত আছে বলে যে সকল রটনা হচ্ছে তাহার সত্যা-সত্যতাও উক্ত বিশেষ সভার বিচার বিবেচনার দাবীও ঐ প্রস্তাবে করা হয়েছে।

সম্প্রতি কর্পোরেশনের এক সভায় করেকজন স্বতন্ত্র সদস্য অনুরূপ অভিযোগের উত্থাপন করে করেকজন উর্ধ্বতন অফি-সারকে এই সব ব্যাপারে দায়ী করলে, ঐ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যানুসন্ধানের জন্যে দুইটি তদন্ত কমিটি গঠিত হয়।

মেয়রের নিকট যে বিশেষ সভা আহ্বানের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে তার স্বাক্ষরকারীও কয়েক-জন স্বতন্ত্র সদস্য। ইউ সি সি দলের পক্ষ থেকেও ঐ প্রস্তাবের প্রতি পূর্ণ সমর্থন দেওয়ার এক সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে সংশিল্ষ্ট রাজনৈতিক মহলে শোনা যাচ্ছে।

প্রস্তাবের পূর্ণ বিবরণ

কলিকাতা কর্পোরেশন পৌর শাসন পরিচালন ব্যবস্থার নৈতিক পরিবেশ এবং কর্ম্মকতার ক্রমাবনতি লক্ষ্য করে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে এবং এজন্যে বর্ত্তমান কমিশনারই সম্পূর্ণরূপে দায়ী বলে মনে করছে।

তিনি (ক) তাঁর নিজের এবং বন্ধুবর্গের গৃহাদি ও সম্পত্তির কর নির্ণয়ের ব্যাপারে নিম্নমূল্যে নির্দ্ধারণে উৎসাহ দিয়ে দুর্নীতির প্রশ্রয় দিয়েছেন; (খ) ব্যক্তিবিশেষের গুণাবলীর প্রতি যথারীতি নজর না দিয়ে নিজের খেয়াল খুশীমত লোক নিয়োগ করে তিনি অনুগ্রহ ভাজনদের পোষণের সহায়তা করেছেন; (গ) বিল্ডিং ডিপার্ট-মেণ্টের দুর্নীতিকে সক্রিয় ভাবে প্রশ্রয় দিয়েছেন; (ঘ) এবং বিভিন্ন বিভাগের কর্ম্মচারী-দের মধ্যে দলাদলি ও দুর্নীতির উৎসাহ জুগিয়েছেন। পৌরশাসন ব্যাপারে তিনি কোনই উন্নতির লক্ষণ দেখাতে পারেন নি এবং এইজন্যেই তিনি করদাতাদের আস্থা হারিয়েছেন।

সুতরাং কর্পোরেশন বিশ্বাস করে যে পৌর পরিচালন ব্যবস্থার ধ্বংসের আর তাঁর উপর ন্যস্ত রাখা কোন মতেই নিরাপদ নয় এবং সেইজন্যে অবিলম্বে তাঁকে কমিশনারের পদ থেকে বরখাস্ত করার জন্যে সরকারকে অনুরোধ জানানর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে।

মেয়র ডাঃ হিরণ্ময় সেনকে এই প্রস্তাবের সংগে যে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে তাতে ১৯৫১ সালের কলিকাতা মিউ-নিসিপ্যালি আইনের ১৯(৩) ধারা মতে ঐ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কর্পোরেশনের একটি বিশেষ সভা ডাকার অনুরোধ জানান হয়েছে।

হওয়ার সূচনা তৈরী হবে। তখনও সিদ্ধার্থ রায়ের পদত্যাগের কারণ-গুলি স্থিতীর পক্ষের হস্তগত হবে না; হলে তাঁরা আরও শক্তি-শালী হতেন। সেইজন্য ইতিমধ্যে কৌশল হিসাবে স্থির করা হয়েছে যে, তাঁরা প্রধানতঃ হাওড়ার ঘটনাবলী ও আই-জির ব্যাপার নিয়ে পার্টির নেতৃত্বকে আঘাত করবেন এবং কালীপদবাবুকে হঠাবার চেষ্টা হবে। অর্থাৎ এর দ্বারা নিজেদের জোর ও প্রতি-পক্ষের জোর আন্দাজ করে নেওয়া হবে।

ইতিমধ্যে বিরোধীপক্ষ চেষ্টা করছেন যাতে কোনোক্রমে কংগ্রেসের একটি অংশকে বিচ্ছিন্ন করে আনা যায়। তার ২টি উপায় আছে ঃ একটি হবে বিরোধী, অসন্তুষ্ট অতুল্য ঘোষ বিরোধী গভর্ণমেণ্ট সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট পরিকল্পনা দেওয়া। এর জন্য কম্যুনিষ্ট পার্টি ও পি-এস-পি এবং অন্য বামপন্থীরা শনিবার ও রবিবার ২টি বৈঠকে মিলিত হচ্ছেন। স্থিতীর সম্ভাবনা হচ্ছে, পার্টির বৈঠকে গোলমাল ও বিরোধিতা যদি তীব্র হয়, তাহলে করেকজন সদস্যকে আপনা থেকেই আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে বাইরের দিকে তাকাতে হবে।

সম্পাদক—শ্রীরজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য

সম্পাদক কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস, ৭নং ওয়েলিংটন স্কোয়ার, কলিকাতা—১৩ হইতে মুদ্রিত এবং ৭নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা—১৩, দর্পণ কার্যালয় হইতে প্রকাশিত।

Regd No.C 4079

১বর্ষ, ৯ম সংখ্যা

পঃ বঙ্গ মন্ত্রীসভার অভ্যন্তরে বিরোধী গোষ্ঠি তৈরী

খাদ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে আরও তিনজন মন্ত্রী কর্তৃক লিখিতভাবে অভিযোগ পেশ

অতুল্য ঘোষের অপ্রতিহত ক্ষমতা খর্ব করিবার চেষ্টা

(দর্পণের রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক)

মন্ত্রিসভার ভিতরে যে বিক্ষোভ আশা করা হয়েছিল, সিদ্ধার্থ রায়ের পদত্যাগের ঠিক ১৫ দিন পরে তার সূত্রপাত আরম্ভ হয়েছে।

শ্রীযুক্ত রায় ২৪শে মার্চ তাঁর বিবৃতি বিধানসভায় পেশ করার পরের দিন, মন্ত্রিসভার আর একজন সদস্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছে একটি পত্র দিয়েছেন। ঐ পত্রে শ্রীযুক্ত রায়ের বিবৃতিটি আলোচনার জন্য মন্ত্রিসভার একটি জরুরী বৈঠকের দাবী জানানো হয়েছিল।

দর্পণের রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক একথা বিশ্বস্তসূত্রে জানতে পেরেছেন যে, এই বৈঠকপূর্ব বৈঠকটি আগামী ২৯শে মার্চ অনুষ্ঠিত হবে বলে ইতিমধ্যেই নোটিশ দেওয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, শ্রীযুক্ত রায়ের পদত্যাগের পর এযাবৎ যতগুলি প্রতিক্রিয়া কংগ্রেস পার্লামেন্টারী পার্টির মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে, তার মধ্যে এই একটি পত্রের তাৎপর্যই সবচেয়ে বেশী।

একথাও এখন অনুমান করা যায় যে, অন্ততঃ ৩ জন মন্ত্রী ২৯শে মার্চের মন্ত্রিসভার বৈঠকে খাদ্যমন্ত্রী ও পুলিসমন্ত্রীর বিরুদ্ধে সুস্পষ্টভাবে আক্রমণাত্মক করবেন। আমাদের নিজস্বযোগ্য সংবাদ এই যে, উক্ত ৩ জন মন্ত্রী খাদ্যমন্ত্রী সম্বন্ধে কতকগুলি নির্দিষ্ট অভিযোগ লিখিতভাবে মন্ত্রিসভার বৈঠকে পেশ করার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন।

অর্থাৎ এই বৈঠকের পর পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিসভা প্রকাশ্যভাবেই শিথাবিভক্ত হয়ে পড়বে। এবং রাজনীতির দিক থেকে এই ধরনের ঘটনা অভূতপূর্ব বলে, মন্ত্রিসভার ভিতরেই একটি অংশ অপর অংশকে দ্বিধাহীনভাবে দুর্নীতির অপরাধে দায়ী করছেন।

সাধারণভাবে একথা মনে হতে পারে যে, এই ধরনের প্রতিবাদের স্বাভাবিক পন্থা হচ্ছে অভিযোগকারীদের সরাসরি মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করা। কিন্তু এই ক্ষেত্রে উপরোক্ত ৩ মন্ত্রী পদত্যাগ করার পরিবর্তে মন্ত্রিসভার ভিতরে একটি বিরোধী গোষ্ঠী তৈরী করার সিদ্ধান্তই সঠী মনে করেছেন। সম্ভবতঃ কল্পনা করছেন সাধারণ সদস্যের পুলিসমন্ত্রী সম্পর্কে যেসব উত্থাপন করবেন সেগুলি এঁদের অভিযোগের মিলিত হবে মন্ত্রিসভার পুনর্গ করবে। অর্থাৎ এখনও ডাঃ রায়ের নেতৃত্বের উপরে আস্থা রাখা এবং ডাঃ রায়কে খাদ্যমন্ত্রী ও পুলিসমন্ত্রীর সহযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন করে আনাই এঁদের লক্ষ্য।

দর্পণের বিগত সংখ্যায় লেখা হয়েছিল যে, সিদ্ধার্থ রায়ের পদত্যাগ দুইটি অনিবার্য সম্ভাবনা সৃষ্টি করছে — একটি সংরক্ষণের চেষ্টা; বিকল্পে অপরটি হচ্ছে মন্ত্রিসভা পুনর্গঠনের চেষ্টা। প্রথমটি অতুল্যবাবুর শক্তি বৃদ্ধি করবে। দ্বিতীয়টি অতুল্যবাবুর ক্ষমতার তিরোভাবের সূচনা। ২৯শে মার্চ মন্ত্রিসভার বৈঠকের জন্য ডাঃ রায়কে যে স্মারক লিপি দেওয়া হয়েছে, সেটি এই দ্বিতীয় সম্ভাবনাকে একটা প্রাথমিক এবং দৃঢ় ভিত্তিতে দাঁড় করাচ্ছে।

তাছাড়া, ২৮শে মার্চ ডাঃ রায় কংগ্রেস পার্লামেন্টারী পার্টির বৈঠক ডেকেছেন। ২৭শে মার্চ সভায় যে অনাস্থা প্রস্তাব আলোচিত হবে; তার ফলাফল ফলাফল (এই কপি লেখার সময় পর্যন্ত আমরা অবগত নই) কোনো গুরুত্বে আরোপ করার কারণ নেই। কেননা, পার্টির সন্তুষ্ট ও অসন্তুষ্ট দুই পক্ষের সদস্যরাই অনাস্থা প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে ভোট দেবেন। ভোটের হিসাবের অন্ততঃ ফাটোর কোনো আশঙ্কা নেই। কিন্তু অনাস্থা প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোটের গুরুত্ব অন্য যাবে। প্রকৃতপক্ষে শ্রী বিধানচন্দ্র পার্টির মধ্যে কংগ্রেসের অসন্তুষ্ট সদস্যদের মনোভাব ও কর্মপন্থা সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত হবে। এই বিবেচনা ডাঃ রায় যে কেন্দ্র করেন, উপরে পার্টির আসল [illegible] করছে।

[illegible] কংগ্রেস

সাপ্তাহিক সংবাদ সাময়িকী : কলিকাতা—২৮শে মার্চ শুক্রবার ১৯৫৮ : মূল্য ২৫ নঃ পঃ

কর্পোরেশনের কমিশনার বি কে সেনের পদচ্যুতি সম্পর্কে ডাঃ রায়ের ধমক

(দর্পণের সংবাদদাতা)

সম্প্রতি কলিকাতার রাইটার্স বিল্ডিংএ এক গোপন বৈঠকে ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় কর্পোরেশনের কমিশনার শ্রী বি কে সেনকে পদত্যাগ করতে বলেন। বৈঠকে মেয়র ডাঃ জিতেন সেন ছিলেন। শ্রীঅতুল্য ঘোষকেও ঐ বৈঠকে ডাকা হয়েছিল।

শ্রীসেনের মস্ত বড় পৃষ্ঠপোষক ডাঃ রায়। তাঁর উষ্মার কারণ কিছু খুঁজে না পেয়ে, শ্রীসেন জিজ্ঞেস করলেন, আমি এমন কি অপরাধ করেছি, যার জন্য আমাকে পদত্যাগ করতে বলছেন?

অপরাধ কি করেছ, বুঝতে পারছ না, ডাঃ রায় রেগে বললেন। তোমায় এত বড় একটা সুযোগ দেওয়া হল, এত ক্ষমতা দেওয়া হল : কিন্তু কর্পোরেশনের কাজ না করে কি করে মিউনিসিপ্যালিটির শাসনব্যবস্থার উন্নতি হতে পারে তা না ভেবে কর্মচারী ও কাউন্সিলারদের নিয়ে দল পাকিয়েছ। পদত্যাগ না করলে, বাধ্য হয়ে ছেড়ে দিতে হবে, তা জান?

শ্রীসেনের স্মৃতিসঙ্গে অমনি ভেসে উঠল তাঁকে তাড়াবার জন্যে কতিপয় কাউন্সিলারের প্রস্তাব। তিনি কাঁপ কাঁপ হয়ে ডাঃ রায়কে বললেন, তাহলে আমার কি হবে? আমি এ বয়সে এখন বেঁধায় নতুন করে চাকুরী খুঁজে বেড়াব।

তাঁর কাকুতি-মিনতিতে ডাঃ রায়ের মন কিছু নরম হলো। তিনি মেয়রের দিকে তাকিয়ে বললেন, এঁরই হাতে তোমার ভবিষ্যৎ; ডাঃ সেনই তোমাকে রক্ষা করতে পারেন। অতুল্যও তোমার উপর বিরূপ। এই বলে ডাঃ রায় শ্রী সেনকে বিদায় করলেন।

শ্রীসেন তখন বাইরে এসে ডাঃ সেনকে তাঁর দুরবস্থার কথা বললেন। ডাঃ সেন কোন ভরসা দিচ্ছেন না দেখে, শ্রীসেন নাকি কথার সুর বদলে বললেন, আমাকে তাড়াবার প্রস্তাব আনতে পারেন, কিন্তু নির্দিষ্ট সংখ্যক (৪৪) কাউন্সিলারের সমর্থন যোগাড় করেন কি করে, দেখব।

আপনি ত পাকা খেলোয়াড়; যে ভাবে এতদিন চাকুরী বজায় রেখেছেন, তাবই চেষ্টা দেখুন গিয়ে, এই বলে ডাঃ সেন রাইটার্স বিল্ডিং থেকে চলে এলেন।

শ্রী সেনকে চার দফা অভিযোগে অভিযুক্ত করে এক প্রস্তাব ডাঃ সেনের নিকট কয়েকদিন আগেই দেওয়া হয়েছে। অভিযোগে বলা হয়েছে, তিনি (ক) তাঁর নিজের এবং বন্ধু-বর্গের গৃহাদি ও সম্পত্তির কর নির্ণয় ব্যাপারে নিম্নমূল্য নির্ধারণে উৎসাহ দিয়ে দুর্নীতির প্রশ্রয় দিয়েছেন; (খ) ব্যক্তিবিশেষের গৃহাবলীর প্রতি যথারীতি নজর না দিয়ে নিজের খেয়াল খুশীমত লোক নিয়োগ করে তিনি অনুগ্রহভাজনদের পোষণের সহায়তা করেছেন, (গ) বিল্ডিং ডিপার্টমেণ্টের দুর্নীতিকে সক্রিয় ভাবে প্রশ্রয় দিয়েছেন; (ঘ) এবং বিভিন্ন বিভাগের কর্মচারীদের মধ্যে দলাদলি ও দুর্নীতির উৎসাহ জুগিয়েছেন।

প্রস্তাবটি আলোচনার জন্য রিকুইজিশন মিটিং-এর দাবী পেলেই, ডাঃ সেন কর্পোরেশনের মিটিং ডাকবেন। এদিকে কাউন্সিলারদের মধ্যে বিভিন্ন দলে এ নিয়ে খুবই জল্পনা-কল্পনা চলছে।

বিরোধীদলের সভ্যরা একযোগে শ্রী সেনের বিতাড়ন দাবী করবার সিদ্ধান্ত নিয়েও ফেলেছেন। কংগ্রেসী সভ্যদের মধ্যে শতকরা ৪৪ই এই নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে।

সম্পাদকীয়

আনন্দবাজারী চপলতা

চপলাকান্ত বাবু আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। আমরাও তাই ভাবছিলাম আনন্দবাজারের হল কি? গত কয়েকদিন ধরে শ্রী সিদ্ধার্থ রায়ের পদত্যাগসম্পর্কে আনন্দবাজার পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা মোটা হরফে শিরোনামা লাগিয়ে যে সব চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ করছিলেন তাতে আমরা গভীর বিস্ময়-বোধ করছিলাম। ভাবছিলাম এক্ষেত্রে মুখ্যতরের বিশেষ অনুবিধের কথা ভেবে কি আনন্দবাজার প্রচার সংখ্যা বাড়াবার দিকে মন দিল না হতাশাবিক্ষুব্ধ চপলাকান্ত বাবু কংগ্রেসকে একহাত নিচ্ছেন? বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলারের গদী, দ্বিজেন মসনদ কোন কিছুই জটলেনা আবার ওয়েজবোর্ডের ধাক্কায় আনন্দ-বাজারের সম্পাদকের গদী এবং লোকসভার পঁচিশ টাকায় মাসো-হারা-এর একটিকে যখন ছাড়বার দায়ুন দুশ্চিন্তার টাক ফেটে বেরিয়ে তখন কার না রাগ হয়? কিন্তু চপলাবাবু হাসিরার লোক। তিনি স্থান ভেদো ভিক্ষে নাম করতে চান্ না। ওয়েজ বোর্ডের ফাঁড়াটাও এদিকে বেরোচ্ছে তাই একবার শেষ চেষ্টা করলে কেমন হয়? সিদ্ধার্থ রায় ছাড়া কি আর আইন মন্ত্রিত্ব করবার লোক বাঙ্গালা দেশে নেই?

ভারতবর্ষে মন্ত্রীর নিয়োগ এমন পদত্যাগ তো হামেশাই হচ্ছে। কিন্তু কই তা নিয়ে এত হৈচৈ তো কোথায়ও হয় না। এ নিশ্চয়ই সিদ্ধার্থ রায়ের কারসাজি। তিনিই গোপনে প্রেস মানেজ করেছেন এবং আগেভাগেই নিতান্ত অনায়াস-ভাবে তাঁর বিবৃতির কপি বিতরণ করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছেন। কাজেই চপলাকান্তবাবু শ্রীরায়ের এই বে-আইনী কাজের প্রতিবাদ করতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু চপলা-কান্তবাবু ভোট নিলেই বেশকে পেতেন যে কেরকতার আউট্রিডো-বাদী সংবাদপত্রের বাঘা বাঘা রিপোর্টাররা তাঁকে কাগজের বিশেষ সংখ্যা টেলিগ্রামে বের করবার জন্য রবিবার রাত্রে শ্রীরায়ের বাড়ীতে তাঁর বিবৃতির আসল কপিতে হানা দেবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। বিবৃতিদানের অব্যবহিত পূর্বে তার নকল বিতরণে অনায়াসে সরকারের এমন যে অসুবিধা ঘটতে তাঁর তো বিধেয় ছিল। অধিবেশনে মন্ত্রীমহাশয় বক্তৃতা দেবার পূর্বে বিবৃতি পড়ে ফেলেন।

(১০ম পৃষ্ঠায়)

সিদ্ধার্থ রায়ের বিবৃতি • • • •

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মুখ্যমন্ত্রী বলেন যে, তিনি যতদূর জানেন তাহাতে সব জেলাতেই ধান-চাউলের দর নিয়ন্ত্রিত আছে। তখন জোরের সঙ্গে তিনি (শ্রীরায়) বলেন যে, অবস্থা তাহা নহে এবং দিল্লীর খাদ্য দপ্তরের অফিসার তাঁহাকে যাহা বলিয়াছেন তাহা ভিন্নরূপ। মুখ্যমন্ত্রী অবিলম্বে তখন খাদ্যমন্ত্রীকে ডাকিয়া পাঠান এবং শ্রীরায় যাহা বলিয়াছেন তাহার মধ্যে কিছু সত্য আছে কিনা জানিতে চাহেন। তখন তিনি (শ্রীরায়) খাদ্যমন্ত্রীর যথার্থ স্বরূপ দেখিতে পান। খাদ্যমন্ত্রী সমস্ত বিবৃতিকে কিছুক্ষণ ধরিয়া ঘোলাটে করিয়া দিবার চেষ্টা করেন। তখন তিনি নিজেকে অসহায় [illegible] করিতে থাকেন। শেষ ব্যবস্থা [illegible] তিনি তখন মুখ্যমন্ত্রীকে [illegible] খাদ্য দপ্তরের প্রধান [illegible] শ্রী বি বি ঘোষের সহিত [illegible] কথা বলিয়া প্রকৃত [illegible] জানিতে অনুরোধ করেন। [illegible] তাঁহার অনুরোধ গ্রহণ [illegible] মিনিটের মধ্যে [illegible] মুখ্যমন্ত্রী কথা [illegible] তাঁহার (শ্রীরায়ের) [illegible] এবং জানান [illegible] সাতটি জেলাতে [illegible] সহিত মুখ্য- [illegible] যে আলোচনা [illegible] তাহাতে [illegible] পশ্চিমবঙ্গের [illegible] অনুরোধে [illegible] হইবে এই কথা [illegible] হয়। আমার এবং [illegible] উপস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রী [illegible] সেক্রেটারীকে [illegible] সাংকেতিক ভাষায় ঐ [illegible] তারবার্তা প্রেরণের নির্দেশ দেন, [illegible] চাউল কল মালিকের [illegible] যে জেলাতেই অবস্থিত থাকুক না কেন, পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেক চাউল কল মালিকের নিকট হইতে তাহার মজুতের কিছুটা অংশ কেবলমাত্র সরকারই নিয়ন্ত্রিত মূল্যে বাধ্যতামূলকভাবে ক্রয় করিতে সক্ষম হইবেন না, পরন্তু কোন মিল মালিকই নিয়ন্ত্রিত দর ১৬৲ টাকা হইতে ১৯॥০ টাকার ঊর্দ্ধ দরে পশ্চিমবঙ্গের কোন স্থানে পাইকারী হারে চাউল বিক্রয় করিতে পারিবেন না এই ধারণা লইয়া আমরা গৃহে ফিরিয়া যাই।

বিস্ময়কর সিদ্ধান্ত

কিন্তু দুইদিন পরে আমি যখন জানিতে পারিলাম যে, ঐ তারবার্তা প্রেরণ এবং আমাদের আলাপ আলোচনা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গের অনধিক সাতটি জেলায় লেভি নির্দেশ প্রয়োগ না করিবার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, তখন আমার যে মনোবেদনা ও অসন্তোষ দেখা দিয়াছিল তাহা আপনারা অনুমান করিতে পারেন। এই সিদ্ধান্তের ফলে কেবলমাত্র সরকারই যে রাজ্যের অবশিষ্ট নয়টি জেলার চাউল কল মালিকদের নিকট হইতে চাউল ক্রয় করিতে সক্ষম হন নাই তাহাই নহে, এই নয়টি জেলার জনসাধারণও নিয়ন্ত্রিত দরে চাউল পাওয়ার সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। নিক্ষুব্ধ মনোভাব লইয়া ইহার পর ক্রমান্বয়ে এমন কতকগুলি নির্দেশ জারী হইতে দেখিয়াছি যাহার সম্পর্কে মন্ত্রিসভার সদস্য হইয়াও আমরা কিছুই অবগত ছিলাম না এবং ঐসব নির্দেশ সম্পর্কে কোনরূপ আলোচনাও হয় নাই। **আমাকে যদি স্পষ্ট কথা বলিতে হয়, তবে বলিতে হইবে যে, দায়িত্বহীন একটি সরকার যে বিনাশকর খাদ্যনীতি অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে উহার অকার্যকারিতা আমরা ক্ষমতাহীন নীরব দর্শকরূপে দেখিয়া যাইব ইহাই হয়ত আশা করা হইয়াছিল।**

বীরভূমের জেলা শাসক নিয়ন্ত্রণাদেশ ভঙ্গ করিবার অপরাধে কয়েকজনের (সম্ভবতঃ মিল মালিক) বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের ব্যবস্থা করিতেছেন—এই মর্মে বীরভূম হইতে এক সংবাদ খাদ্যমন্ত্রীর নিকট আসিয়া পৌঁছিয়াছে। খাদ্যমন্ত্রীর হাতে একখানা চিঠির খসড়া ছিল এবং উহা তিনি গোপনভাবে জেলা শাসকের নিকট পাঠাইবার কথা চিন্তা করিতেছিলেন। ঐ চিঠিতে জেলা শাসকের প্রতি এই মর্মে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল যে, তিনি (জেলা শাসক) [illegible] অপরাধীদিগকে [illegible] না [illegible] নিয়ন্ত্রণাদেশ যেন [illegible] চালু না করেন। [illegible] খাদ্য- [illegible] তিনি যেন [illegible] ইহাতে তিনি [illegible] এবং [illegible] চিঠি [illegible] হাতে [illegible] এখনও [illegible] হইলেই [illegible] খাদ্যমন্ত্রী [illegible] আমাদের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী।

উপরোক্ত চিঠি তিনি যে কোন কারণেই হউক প্রেরণ করেন নাই। কিন্তু পরে আমি জানিতে পারি যে, চিঠি লেখার পরিবর্তে তিনি (খাদ্যমন্ত্রী) সাতটি জেলার অফিসারদিগকে মৌখিকভাবে এই মর্মে নির্দেশ দিয়াছেন যে, চাউলের পাইকারী বিক্রয় মূল্য সম্পর্কে নিয়ন্ত্রণাদেশের সর্তগুলি যেন তাঁহারা চালু না করেন। উপরোক্ত সাতটি জেলায় যে নিয়ন্ত্রণাদেশ সাময়িকভাবে চালু আছে এবং সেখানে নিয়ন্ত্রিত দর অপেক্ষা চড়া দরে চাউলের পাইকারী বিক্রয় যে নিষিদ্ধ হইয়াছে এই তথ্যটি মুখ্যমন্ত্রী, পুলিশমন্ত্রী ও খাদ্যমন্ত্রী ব্যতীত মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্য, বিধানসভার সদস্য এবং খাদ্য উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যদের নিকট গোপন রাখা হয়।

আমি যেদিন শুনিলাম যে, মাত্র সাতটি জেলাকে মূল্য নিয়ন্ত্রণাদেশের আওতাভুক্ত করা হইবে, ঠিক সেইদিনই আমি বুঝিয়াছিলাম, ইহাতে নানারূপ অসুবিধা ও জটিলতার সৃষ্টি হইবে। খাদ্যমন্ত্রী আমাদের নিকট যে অসুবিধার কথা বলিয়াছিলেন তাহা হইল ইহাই যে, এইসব খাদ্য নিয়ন্ত্রণাদেশ লঙ্ঘন করার জন্য কাহারও বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ বলিবেন যে, যেসব জেলায় চাউল ও ধান্য মূল্য নিয়ন্ত্রণাদেশ বিদ্যমান রহিয়াছে সেইসব জেলার কোথাও তাহা লঙ্ঘন করা হয় নাই। কিন্তু যে জেলায় এই আদেশ প্রযোজ্য নয়, সেখানকার বেলায় কি হইবে? এইরূপ সরকারের খাদ্যনীতি যেভাবে অনুসরণ করা হইতেছে, তাহাতে আমি মনে করি, উহা সমর্থনযোগ্য নহে এবং বিবেকবুদ্ধি সহকারে যাহা আমি সমর্থন করিতে পারি না, বিশ্বাস বজায় রাখিবার জন্য তাহা মানিয়া চলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। উহা দরিদ্র কৃষকদের স্বার্থের পরিপন্থী, অথচ সরকারের খাদ্যনীতির সুযোগ লইয়া মিল মালিকগণ মুনাফা লুটিয়া লইবার সুবিধা ভোগ করিবেন। কৃষকগণ নিয়ন্ত্রিত দরে তাহাদের ধান বেচিয়া ফেলিতে বাধ্য হইবে, অথচ সেই ধান লইয়া মিল মালিকগণ অতিরিক্ত মুনাফা আদায় করিয়া লইবেন, ইহা আমি রীতিমত অন্যায় ব্যবস্থা বলিয়া মনে করি।

সুতরাং আমি বুঝিতে পারিতেছি যে, সরকার যে খাদ্যনীতি অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন, ন্যায় ও নীতির দিক হইতে তাহা কোনরূপেই সমর্থনযোগ্য নহে, অর্থনৈতিক দিক হইতেও তাহা রাজ্যের বিপদকেই ডাকিয়া আনিবে। এই নীতি যে পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে সব দিক হইতেই বিপর্যয়কর তাহা সহজ বুদ্ধিতেই উপলব্ধি করা যাইবে।

জমিদারী উচ্ছেদের পর গ্রামীণ অর্থনীতিকে সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে সরকারের ব্যর্থতা সম্পর্কে উল্লেখ প্রসঙ্গে শ্রীরায় বলেন যে, জাতির খাদ্যোৎপাদনের বিভিন্ন পদ্ধতি আছে। তন্মধ্যে জমি একটি এবং উহাই একমাত্র বাঙ্গালীর হাতে ছিল। সরকার উহা জাতীয়করণ করিয়াছেন। কিন্তু চাউলের কল ইত্যাদি খাদ্যোৎপাদনের আর যে সব পন্থাগুলি আছে, তাহা একটি বিশেষ শ্রেণীর হস্তগত— শ্রেণীর লোকেরা সাধারণতঃ ধনী এবং এই রাজ্যের লোক নহেন। সরকার এই সব পন্থাগুলিকে আর জাতীয়করণ করেন নাই। ফলে, খাদ্যের বণ্টন, বিক্রয় ইত্যাদি প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিগত ব্যবসায়ী ও ফাটকাবাজদের হাতে রহিয়া গিয়াছে। শ্রীরায় দৃঢ়তার সহিত সরকারের ও সরকারী দলের এইরূপ আধা-খেঁচড়া মনোবৃত্তির প্রতিবাদ করেন এবং বলেন যে, খাদ্যকে যে কি করিয়া ব্যক্তিগত ব্যবসায়ী ও ফাটকাবাজদের মুনাফার বস্তু হিসাবে ছাড়িয়া রাখা যায়, তাহার তিনি কোন কারণ খুঁজিয়া পান না। জাতির খাদ্যের উপর হইতে ব্যবসায়ীদের মুনাফা করিতে দেওয়া হইবে কেন? তাঁহার মতে, সরকারের এই বিষয়ে দৃঢ় ব্যবস্থা অবলম্বনের সময় আসিয়াছে, কিন্তু তাহা হয় নাই এবং কখনই হইবে না। যাহা হইবে, তাহা হইল এইমাত্র যে, জমি সরকারের হাতে যাইবে কিন্তু ঐ ব্যাপারে আর কোন প্রগতিশীল ব্যবস্থা গৃহীত হইবে না।

নেহরু-পন্থ চালিত ভাষাচক্রান্তে ডাঃ রায়ের আত্মসমর্পণ

(নিজস্ব পর্যবেক্ষক)

ভাষার ব্যাপারে পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় সম্প্রতি শুধু ভাসা-ভাসা কথা নয়, একেবারে উল্টো গাইতে সুরু করেছেন। এবং এটা সুরু করেছেন এবার রাজধানী থেকে ফিরে এসে।

গত ১১ই মার্চ ভাষা সম্পর্কে বেসরকারী প্রস্তাব আলোচনাকালে তাঁর বক্তৃতায় যে সুর ফুটে ওঠে তা সব পক্ষ থেকেই অভিনন্দন লাভ করে। হিন্দীভাষাকে অহিন্দী ভাষাভাষীদের ঘাড়ে অবরদস্তিমূলকভাবে চাপানোর যে অপচেষ্টা সরকারী ভাষা কমিশনের সুপারিশ স্পষ্ট, তার বিরুদ্ধে তথ্যাদির সমাবেশে মুখ্যমন্ত্রী সেদিন সুস্পষ্টভাবে একথা ঘোষণা করেন, হিন্দীর পক্ষে একটা বিশেষ আবেদন সৃষ্টির বদ্ধমূল ধারণা ভাষা কমিশনের সুপারিশে ফুটে উঠেছে এবং এর দ্বারা পরোক্ষভাবে অহিন্দী ভাষাভাষীদের জোর করে এটা মানিয়ে নেওয়ানোর চেষ্টা হয়েছে।

কেন্দ্রের সরকারী ভাষার প্রসঙ্গে তিনি উপযুক্ত তথ্যাদির সমাবেশে যে যুক্তির অবতারণা করেন তা শুধু কংগ্রেস পক্ষই নয়, বিরোধী পক্ষও সে যুক্তির সঙ্গে একমত হন।

ভারতের জাতীয় ঐক্যের জন্যে একমাত্র হিন্দীকেই কেন্দ্রের সরকারী ভাষারূপে স্বীকৃতি দিতে হবে এবং সরকারী ভাষারূপে একমাত্র হিন্দী ভাষাই ইংরেজীর স্থলবর্তী হবে—এই যুক্তির অসারতা দেখাতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সেদিন সুইজারল্যান্ড, কানাডা, সাউথ আফ্রিকা, রাশিয়া প্রভৃতি দেশের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে এ কথাও দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন যে, ভারতবর্ষে নানা ভাষাভাষী লোক বাস করে এবং এখানে একাধিক ভাষাকে সরকারী ভাষারূপে স্বীকৃতি দেওয়ার কোন বাধা থাকতে পারে না।

শ্রীযতীন চক্রবর্তীর মূল প্রস্তাব এবং এ সম্পর্কে শ্রীশ্যামাপদ ভট্টাচার্যের (কংগ্রেস) সংশোধনী প্রস্তাবের উপরও ডাঃ রায়ের বক্তব্য একধাপ এগিয়ে গেছে। কারণ কংগ্রেসের সংশোধনী প্রস্তাবে কেন্দ্রে সরকারী ভাষা প্রবর্তন সম্পর্কে সময়ের সীমা (১৯৬৫ সাল) তুলে দিয়ে, যতদিন হিন্দীভাষা উপযুক্তভাবে সমৃদ্ধ হয়ে না ওঠে ততদিন পর্যন্ত ইংরেজী চালু রাখার অনুকূলে দাবী করা হয়।

কিন্তু অধিকাংশ সদস্য এবং প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গবাসী—এই একমাত্র হিন্দীকেই ইংরেজীর স্থলবর্তী কেন্দ্রের সরকারী ভাষারূপে স্বীকৃতি দেওয়ার ঘোরতর বিরোধী। সুতরাং মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়ের বক্তৃতায় কেন্দ্রে একাধিক ভাষা ইংরেজীর স্থলবর্তী হতে পারে বলে যে যুক্তির অবতারণা করা হয় তা সকল দলেরই মনঃপূত হয়।

বস্তুতঃপক্ষে ভাষার প্রশ্নে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সকল দলের মধ্যে একটা ঐকমত প্রতিষ্ঠিত হবার ব্যাপারে ডাঃ রায়ের মন্তব্যাদি অনেকখানি অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। এবং এরই পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেসী সংশোধন — 'কেন্দ্রের সরকারী ভাষারূপে স্বীকৃতি দেবার মত সমৃদ্ধি যতদিন হিন্দীভাষার না হচ্ছে ততদিন ইংরেজী ভাষাকে কেন্দ্রের ভাষারূপে চালু রাখা হোক',—এর জায়গায় 'কেন্দ্রের সরকারী ভাষারূপে স্বীকৃতি দেবার মত সমৃদ্ধি যতদিন এক বা একাধিক ভারতীয় ভাষা না হচ্ছে, ততদিন ইংরেজী চালু রাখা হোক',—এইভাবে সংশোধন করা হয়।

কংগ্রেসের সংশোধনীটি উপরোক্ত মর্মে পরিবর্তনের প্রস্তাবে কংগ্রেস তথা বিরোধী দলগুলির মধ্যে মতৈক্য প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বেশ একটা অনুকূল পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল।

কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, দিল্লী থেকে ঘুরে আসার পর গত রবিবার কুমার সিং হলে কংগ্রেস পার্লামেন্টারী পার্টির সভায় অকস্মাৎ ডাঃ রায় ঐ সম্পর্কে তাঁর মূল বক্তব্যটুকু অস্বীকার করে বসেন। শ্রীশ্যামাপদ ভট্টাচার্য ভাষার প্রসঙ্গ ওঠালে ডাঃ রায় বলে বসেন—'কৈ এমন কথা তো আমি বলিনি।' ডাঃ রায় সদস্যদের বোঝাতে চান—কেন্দ্রের সরকারী ভাষা ইংরেজীর স্থলে হিন্দী না হয়ে একাধিক ভারতীয় ভাষা হতে পারে অথবা ভাষা কমিশন হিন্দীর একটা বদ্ধমূল ধারণার বশবর্তী হয়ে হিন্দীভাষার প্রতি অহেতুক আনুকূল্য দেখিয়েছেন—এমন কথা তিনি আদৌ বলেন নি। শ্রীভট্টাচার্য এবং আরও কয়েকজন সদস্য এর প্রতিবাদ জানান। ডাঃ রায় একটু বেকায়দায় পড়েন। কিন্তু কথা ঘুরিয়ে বলেন—'এমন কথা বলেছি বলে তো আমার মনে পড়ছে না; হ্যাঁ যদি বলেও থাকি তবে আমি তা প্রত্যাহার করে নেব।'

অগত্যা শ্রীভট্টাচার্য মন্ত্রী শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহের সহায়তা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় আসার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর সে চেষ্টাও বিফল হয়। শ্রীসিংহ কিছু বলার আগেই ডাঃ রায় তাচ্ছিল্যের সুরে বলেন—'আরে ও কি বলবে, ও কি আর পলিটিক্স কিছু বোঝে?'

আসল কথাটা অসতর্ক মুহূর্তে ডাঃ রায়ের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছে। শ্রীসিংহকে থামাতে গিয়ে তিনি প্রকারান্তরে বলে ফেলেন ভাষা নিয়ে পলিটিক্স চলছে এবং সে পলিটিক্সের খেলা থেকে তিনিও নিজেকে মুক্ত রাখতে পারেন নি। তা তাঁর অস্পষ্ট কথাবার্তা থেকেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অবশ্য তাঁর মুখের ওপর জবাব দেবার সাহস খুব কম লোকেরই আছে! তা না হলে তাঁর কথার উত্তরে নিশ্চয়ই এই জবাব আসতো যে, ভাষা নিয়ে পলিটিক্স করার মত নোংরামির কথা তারা চিন্তাও করতে পারেন না।

প্রসঙ্গটি সেদিন ঐখানেই চাপা পড়ে।

কিন্তু ডাঃ রায়ের এরকম উক্তি ও আচরণের ফলে সদস্যদের মধ্যে গভীর বিস্ময় ও হতাশার সঞ্চার হয়েছে।

অনেকের মধ্যে এ রকমও একটা ধারণা হয়েছে যে, ডাঃ রায়কে এবারে রাজধানীতে গিয়ে হিন্দীর বিরুদ্ধে কথা বলায় ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে কথা শুনতে হয়েছে এবং নেহরু-পন্থ ভাষা চক্রের চক্রান্তের কাছে শেষ পর্যন্ত নিশ্চয়ই তিনি নতি স্বীকার করে এসেছেন **এবং এই** জন্যেই তিনি ভাষা প্রসঙ্গে আবোল-তাবোল বলতে সুরু করেছেন।

গ্রন্থ পরিচয়

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা ও রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্র . শিক্ষা-দর্শন—শ্রী ভূজঙ্গভূষণ ভট্টাচার্য। অধ্যাপক শিক্ষণ-শিক্ষা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। প্রকাশক—বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড্। ৭২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৯। মূল্য পাঁচ টাকা।

রবীন্দ্রনাথ একবার মৈত্রেয়ী দেবীকে বলেছিলেন যে মৃত্যুকে তিনি ভয় পান বলেই তিনি তাঁর কাব্যে মৃত্যুর মনোহর রূপ এঁকেছেন এমন কথা অনেকেই বলে থাকেন। কিন্তু তা' ঠিক নয়। এ পৃথিবী ছেড়ে যেতে তিনি সর্বদাই প্রস্তুত আছেন, কেবল একটা জায়গায় তাঁর মন আবদ্ধ আছে এবং তার জন্যেই তিনি সতত চিন্তিত। সে হলো শান্তিনিকেতন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি মহাত্মা গান্ধী এবং জওহরলাল নেহরুকে শান্তি-নিকেতন সম্পর্কে তাঁর মনের উদ্বেগের কথা জানিয়েছিলেন। শান্তিনিকেতন রক্ষা করবার জন্য তাঁদের অনুরোধ জানিয়ে-ছিলেন। বিশ্বভারতীর গত সমা-বর্তন উৎসবে প্রীতিনেহরুও এই কথার উল্লেখ করেছেন।

কাব্য নয়, কবিতা নয়, স্মৃতি নয়, স্মৃতিস্তম্ভ নয় শান্তিনিকেতন রূপে বেঁচে থাকে, এই ছিল কবির জীবনের শেষদিন পর্যন্ত একমাত্র চিন্তা। শান্তিনিকেতনের মধ্য দিয়ে তিনি সমগ্র জাতিকে নূতন শিক্ষায় দীক্ষিত করতে চেয়ে-ছিলেন। অরফোর্ড, কেম্ব্রি-জের ঐশ্বর্য অনুকূলে আমাদের দেশে যে সকল বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছে তাদের দ্বারা যে প্রকৃত শিক্ষালাভ সম্ভব নয়—এই শিক্ষা যে জনসাধারণের কল্যাণ করতে পারেনা ঋষিকবি তা সর্বাগ্রে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। এই শিক্ষা "পাথরে গাঁথা কুণ্ডের মত স্থানে স্থানে আবদ্ধ হয়ে রইল, তাঁরই পাণ্ডাকে দর্শনী দিয়ে দূর থেকে এসে গণ্ডূষ ভরি করতে হয়, নানা নিয়মে তার আচমনী বাঁধা। মন্দাকিনী থাকেন শিবের ঘোরালো জটা-জুটের মধ্যে বিশেষভাবে, তবুও দেবললাট থেকে তিনি তাঁর ধারা নামিয়ে যেন, বহে যান সাধারণভাবে ঘাটে ঘাটে মর্ত্য-জনের সম্পর্কে দিয়ে, ঘটে ঘটে ভরে যেন আপন প্রসাদ। কিন্তু আমাদের দেশে প্রবাহিনী আধুনিকী বিদ্যা তেমন নয়। তার আছে বিশিষ্ট রূপ, সাধারণ রূপ নেই। সেই জন্যে ইংরেজি শিখে যাঁরা বিশিষ্টতা পেয়েছেন তাঁদের মনের মিল হয় না সর্বসাধার-ণের সঙ্গে। সেই সকলের চেয়ে বড়ো জাতিভেদ এইখানেই, শ্রেণীতে শ্রেণীতে অন্যপাত।" এই কবিদুঃখ বুকতে পেরে-ছিলেন যে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর যত কিছু দুঃখ আছে তার একমাত্র কারণ হচ্ছে অশিক্ষা। জাতিভেদ, ধর্ম-বিরোধ, কর্মজড়তা, আর্থিক দৈর্বলতা সমস্তই আকিড়ে আছে এই শিক্ষার অভাবকে।"

যে ইংরেজি বিদ্যা আমরা শিখি তাতে কখনই আমাদের মনের প্রসার হতে পারে না। কারণ, 'ইংরেজি ভাষায় অব-গুণ্ঠিত বিদ্যা স্বভাবতই আমা-দের মনের সহবর্তিনী হয়ে চলতে পারেনা। সেই জন্যেই আমরা অনেকেই বহু পরিমাণে শিক্ষা পাই সে পরিমাণে বিদ্যা পাইনে। চারিদিকের আব-হাওয়া থেকে এ বিদ্যা বিচ্ছিন্ন, আমাদের ঘর আর ইস্কুলের মধ্যে টাম চলে মন চলে না। ইস্কুলের বাইরে পড়ে আছে আমাদের দেশ, সেই দেশে ইস্কুলের প্রতিবাদ রয়েছে কিন্তর, সহযোগিতা নেই বল-লেই হয়। সেই বিচ্ছেদে আমা-দের ভাষা ও চিন্তা অধিকাংশ স্থলেই ইস্কুলের ছেলের মতোই ঘুচলনা আমাদের সাহি-ত্যে। ইস্কুলের শাসন আমাদের বিচার বুদ্ধিতে নেই সাহস, আছে নাজির মিলিয়ে অতি সাবধানে শিয়ালদহের রেলওয়ে যাত্রী-দের জন্য মুদ্রিত একটি "বাণী" সম্প্রতি আমাদের হস্তগত হয়েছে। এতকাল জনসাধারণ বুদ্ধ, শঙ্কর, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, নেতাজী প্রভৃতির বাণী শুনেতেই অভ্যস্ত ছিলেন। এঁদের অবর্তমানে বাণী বর্ষ-ণের দায়িত্ব নিয়েছেন শিয়াল-দহ রেলপুলিশ সুপার শ্রীযুক্ত ই. টি. এন. বন্দ্যোপাধ্যায়। পুলিশ সুপার মহোদয়ের উপদেশ মহৎ। 'অজ্ঞ, সরল ও অসাব-ধান" রেলযাত্রিগণ যাতে দুষ্টে-জনের খপ্পরে না পড়েন—সেই জন্যেই তিনি অনেক দুর্ভোগ সহ্য করে তাঁর উপদেশমূত জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করছেন।

সুপার মহোদয় সোজাসুজি নিন্দেশদাঁর যাত্রীদের টেনে না ঘুমোবার উপদেশ দিয়েছেন। কারণ চোর সহযাত্রী আপনার অজান্তেই সুযোগের অপেক্ষায় আছে। এই উপদেশে কর্ণপাত না করে যদি রাত্রে আপনি টেনে চোখের পাতা বোজেন তাহলে চোরে আপনাকে বলতে হতে পারে—,

"সে যে পাশে এসে বসেছিল তবু জাগিনি

পা ফেলে চলা। শিক্ষার সঙ্গে দেশের মনের সহজ মিলন ঘটা-বার আয়োজন আজ পর্যন্ত হোলো না। কেন কেন, রইল বাপের বাড়ির অন্তঃপুরে, শ্বশুরবাড়ি নদীর ওপারে বালির চর পেরিয়ে। খেয়া নৌকাটি গেল কোথায়?"

এই শিক্ষার সঙ্গে দেশের মনের মিল ঘটানোই বড় কথা এবং তার চেষ্টাই একক্ষণার শান্তিনিকেতনের ইতিহাস। মনুষ্যত্বের বিকাশকেই রবীন্দ্র-নাথ শিক্ষার লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ ব্যক্তির সামগ্রিক বিকাশ—নিজের দিক থেকে এবং সমাজের দিক থেকে। স্বাদেশিকতা এই শিক্ষার ভিত্তি এবং মাতৃভাষা হলো বাহন। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাতত্ত্বের সর্বত্র এই নীতির প্রভাব দেখতে পাওয়া যাবে। শিক্ষার সঙ্গে আনন্দবিতরণ এটাও হলো রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাতত্ত্বের বড় কথা। তাঁর মতে আহার্য, তপোবন, নক্ষত্র, আকাশ, সঙ্গীত এবং প্রতিবেশী —এই সামগ্রিক পরিবেশের সাহায্যে আমাদের অন্তরে আনন্দের আবির্ভাব হয়।

রবীন্দ্রনাথের এই শিক্ষাতত্ত্ব পাশ্চাত্যের বহু মনীষীর সমস্ত দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাতত্ত্বের অধ্যাপক জে. ডে. ফিল্ডলে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-প্রণালীকে বিখ্যাত আমেরিকান শিক্ষাবিদ ডিউই-এর সঙ্গে তুলনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ আমেরিকার "আমার বিদ্যালয়" সম্পর্কে যে বক্তৃতা করেন তাহা বহু সুধী ব্যক্তির প্রশংসা লাভ করে।

১৯১৭ সালে ভারত সর-কার কর্তৃক নিযুক্ত বিশ্ববিদ্যা-লয় কমিশনের সভাপতি সার মাইকেল স্যাডলার শান্তিনিকে-তনের আশ্রম বিদ্যালয় পরি-দর্শন করে কমিশনের রিপোর্টে এই মন্তব্য করেন—

"বাঙ্গলা দেশে বিদ্যালয়কে অবাধ সঙ্কীর্ণ অর্থে শিক্ষা-দানের ক্ষেত্র হিসাবে দেখা হয়। এর সামাজিক দিকটা অবহেলা করা হয়। শিশু যেমন বিদ্যালয় থেকে পাঠগ্রহণের দ্বারা শিক্ষা-লাভ করে, তেমনি সে শিক্ষা-লাভ করে বিদ্যালয়-সমাজের একজন সভ্য হয়ে। বিদ্যালয়ে

রেল পুলিশ কথামৃত

(বিশেষ প্রতিনিধি)

কি ঘুম তোরে পেয়েছিল হত-ভাগিনী!"

এবং এখন আর যাকেই হোক রেল পুলিশকে কোন দোষ দেওয়া চলবে না।

অন্যান্য সতর্ক বাণীগুলো যাতে সহজেই কণ্ঠস্থ করা যায় সেই জন্য সুপার মহোদয় নিম্ন-লিখিত স্বরচিত কবিতার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন:

চলন্ত ট্রেনে ওঠানামা করে যারা অধিকাংশই চোর তারা।
পাদানীতে চড়ে চোর, নজর রাখে বড় জোর,
জানলার পাশে মহিলার ছিনিয়ে নেয় গলার হার
অনেক সময় ট্রেনে চোরে আলো নিবিয়ে চুরি করে,
এমন যদি দেখতে পান তখন সবে হোন সাবধান।
ভাগ্যিস কবিগুরু সতের বছর আগে দেহরক্ষা করেছেন। তাঁর জীবিতকালে, পুলিশ সুপার চাইলেও কোন কম্পোজিটর এই কবিতা কম্পোজ করতে রাজী হতেন না।

এসে শিশুর অনুভব করা উচিত যে, সে শুধু শিক্ষকের নিকট থেকে একটি নির্দিষ্ট সময়ে পাঠগ্রহণ করেই শিক্ষা-লাভ করবে তা নয়, অধিকন্তু বিদ্যালয় সমাজের একজন সভ্য হয়ে, তার প্রতি দায়িত্বশীল হয়ে, তার নানা কর্মে অংশ গ্রহণ করে এবং তার সঙ্গে নানাভাবে আপনার সংযোগ স্থাপন করে, দায়িত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বল্প-মনে শিক্ষালাভ করবে। এই ব্যবস্থা যে বর্তমান অবস্থায় ভারতবর্ষে অসম্ভব—একথা বলা চলে না। কারণ এইরূপ একটি সুন্দর ব্যবস্থা বেলু-পুরের বিদ্যালয়ে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।"

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শ আমরা মনেপ্রাণে গ্রহণ করিনি। শান্তি-নিকেতনকে আমরা বাঁচিয়ে রেখেছি বটে কিন্তু সেখানে প্রতিনিয়ত তাঁর আদর্শ বাহত হচ্ছে। মনুষ্যত্ব বিকাশের জন্য রবীন্দ্রনাথের শিক্ষানীতি যে প্রকৃষ্ট নীতি তা সর্বদিক থেকেই প্রমাণিত হয়েছে।

আমাদের দেশে বর্তমানে যে শিক্ষা-সংস্কারের প্রচেষ্টা চলেছে তাতে এই নীতি প্রচারের বিশেষ প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়। শিক্ষা সংস্কারের একটি মূলনীতি প্রায় সমস্ত সভা দেশই গ্রহণ করেছে, তা হচ্ছে দেশের জাতীয় আদর্শকে ভিত্তিরূপে গ্রহণ করে শিক্ষা সংস্কারের ব্যবস্থা করা। রবীন্দ্রনালয়ের পর দশ বছর ধরে শিক্ষার ব্যাপার নিয়ে বহু প্রকার কমিটি কমিশন বসেছে কিন্তু এখনও লক্ষ্যে পৌঁছতে আমরা বহু দূরে রয়েছি।

অধ্যাপক ভূজঙ্গভূষণ ভট্টা-চার্য মহাশয় আমাদের শিক্ষার এই দিকটির প্রতি শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-দর্শন সম্পর্কে গবেষণার জন্য তিনি যে কি পরিমাণ পরিশ্রম করেছেন তা তাঁর বইয়ের পাতা ওল্টালেই যে কোন লোক বুঝতে পারবেন। রবীন্দ্র শিক্ষা-দর্শন সম্পর্কে তাঁর এই গ্রন্থ আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে এক অমূল্য দলিলরূপে গৃহীত হবে।

ডেলি প্যাসেঞ্জার

(শেষের সর্বাক্ষর)

...ছাড়ে ভোরের ভাঁটা ধরে। ...নিয়ম অনুযায়ী, ...ঘণ্টা অতিক্রান্ত হলে...হয়, কিন্তু ...বাণিজ্যিক পর পুনরায় ভাঁটার টানে নেমে যাওয়া মহী প্রবাহের, এটাই দৈনন্দিন ইতিহাস।

কলকাতা জনপ্রবাহেও তেমনি জোয়ার-ভাঁটা আছে। প্রতিদিন বেলা নটা থেকে জনস্রোতের জোয়ার সুরু হয় এবং বেলা এগারোটার মধ্যে তুঙ্গ সীমা স্পর্শ করে। তারপর বেলা পাঁচটা পর্যন্ত এর জবাবদিহি। পাঁচটা থেকে সন্ধ্যা সাড়ে সাত-টার মধ্যে এই জনপ্রবাহ ভাঁটার টানে নেমে যায়।

এঁরাই ডেলী প্যাসেঞ্জার। এঁদের দৌলতে প্রতিদিন নগরীর জনসংখ্যা অনুমান তিনলক্ষ বেড়ে যায়। কিন্তু ক্যাল বইয়ের বাঁধিকে নির্দিষ্ট একটি সংখ্যা জমা দিয়ে ডানদিকে সেই সংখ্যা খরচ লিখলে বেমন তহবিলের বাড়তি-বাটতি হয় না, তেমনি এই বিপুল জনপ্রবাহ মহানগরীর সওদাগরী অফিস, ব্যাঙ্ক, কল-কারখানা, সরকারী দপ্তর প্রভৃতিতে তাদের কর্মপ্রতিভার দৈনন্দিন স্বাক্ষর রেখে সন্ধ্যা সমাগমে কূলার প্রত্যাশায় ক্লান্ত-পক্ষ বিহঙ্গের মত নিজের নিজের নীড়ে ফিরে যায়। তাই মহা-নগরীর জনসংখ্যাও বাড়েনা কমেনা। তবে এর কারণ প্রাকৃত-তিক নয়, মানুষের সৃষ্টি। তাই এর প্রতিক্রিয়াও অনেক বেশী।

মফস্বলে মফিসের দূরত্বের দিকের সুযোগ সুবিধা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে আত্মসম্মানী দরুণ প্রমা-ণুলকে একান্তভাবে উপলব্ধি করে বড় বড় কল-কারখানা অফিস-আদালতসমূহ অধিকার সহরগুলি গড়ে উঠেছে মানু-ষের দৈনিক রোজগারের একমাত্র স্থান সহর। তাই সহর বেশীর ভাগ জনদের সমৃদ্ধির শ্মশান-ভূমির উপর দাঁড়িয়ে নিজের মেদ-স্ফীতির বাহুল্য নিয়ে রাশ্ত ও সমাজের চিকিৎসকদের চিন্তার কারণ হয়ে পড়েছে। এই অসুস্থ-স্ফীতি অস্ত্রোপাচারের দ্বারা চুপসিয়ে দেওয়া দরকার।

ডেলী প্যাসেঞ্জারদের কথা বলছিলাম। এঁরা আধুনিক বৈশ্যপ্রধান সভ্যতার বলি। জানিনা এঁদের কেউ কেউ তাঁদের দৈনন্দিন দিনপঞ্জী রাখেন কিনা। তবে অনায়াসেই অনুমান করা যেতে পারে যে, এই দিনপঞ্জী শুধু বৈচিত্র্যহীন একঘেয়ে নীরস "জীবনযাত্রার পুনরি বার্তা" বহন করবে, অন্য কিছু নয়।

ডেলী প্যাসেঞ্জারদের কাছে দিন নেই, রাত্রিও নেই। সূর্যো-দয়-সূর্যাস্ত কিছুই এঁদের ছন্দ তন্তীতে সুর জাগাতে পারে না। অনেকে সূর্য উঠবার আগেই ঘর থেকে বেরোন আর সূর্যা-স্তের পরে প্রান্ত ক্লান্ত দেহ-টাকে টেনে টুনে রাত নটা দশ-টার সময় কোনোরকমে সহর থেকে অদূরে কোন এক মফস্বল সহর বা গ্রামে স্বল্পস্থেরে দোর-গোড়ায় হাজির করান। দরজার কড়াটা পর্যন্ত নাড়তে হাত ওঠে না। এরকমই হচ্ছে ডেলী প্যাসেঞ্জারদের দিনলিপি।

অথচ এঁদেরও ঘর সংসার ছেলেপুলে আছে। ঐশ্বর্যহীন প্রতিবেশের ঘানি টানবার পর আর সেদিকে নজর দেবার উৎ-সাহ থাকে না, সময়ও নেই। ভোরে নিজেকে শমনার সাপ্তর প্রতিনিধির হাতে ছিনিয়ে নেবার জন্যে এঁদের চার ঘণ্টা হো ঘুমানো চাই। সংসার ছেলেপুলের দিকে নজর দেবার অবসর এঁরা পেতেও নেই, এঁরা জড়ভরত। এঁদের অর্থাৎ আছে, ব্যক্তির নেই। এঁদের সঙ্গে আত্মজদের এক সূত্রে অলক্ষ্য ব্যবধান বরাবরই বজায় থাকে সেব নিঃশ্বাস না ছাড়া পর্যন্ত। ডেলী প্যাসে-ঞ্জারদের জীবনের এই ট্র্যাজেডির খবর কেই বা রাখে?

হাওড়া বা শিয়ালদা স্টেশনে নেমে ডেলী প্যাসেঞ্জারেরা যে-ভাবে 'পড়ি-মরি' করে দিক্-বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ট্রাম-বাসের দিকে ছুটতে থাকেন তাতে এঁদের মানুষ বলে মনে হয় না, নিষ্প্রাণ যন্ত্রচালিত অটিকার রোলারের মত মনে হয়। রোলার যেমন সামনে যা পড়ে তাকেই পিষ্ট করে গুড়িয়ে দিয়ে এগিয়ে যায় তেমনি অফিস নামক নিষ্প্রাণ নির্মম্ব যন্ত্রের চালক এই মানুষ-গুলি সম্মুখের সবকিছু বাধা বিঘ্নকে মথিত করে অফিস পানে ছুটতে থাকে। তখন এঁদের কোন ভদ্রতা নেই, মনু-ষ্যত্ব নেই। শিশু, মহিলা জ্ঞান নেই, রোগী রাস্তায় পড়ে রইল, থাকুক "আমার আগে অফিসে যাওয়া চাই।" হাওড়া পুলের উপর দিয়ে ডালহৌসী স্কোয়ারে অভিমুখী উর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান জনস্রোত লক্ষ্য করেছি। দেখেছি মরি-বাঁচি করে একান্ত বিপদের ঝুঁকি নিয়ে ট্রাম-বাসে দোদুল্য-মান প্রফিসযাত্রীদের। তখন এঁদের মানুষ বলে মনে হয় না। প্রফিস নামক বিরাট দানবের সহবর্তীসমূহী অনিচ্ছুক বলি বলে মনে হয়েছে।

ডেলী প্যাসেঞ্জারদের চাকরিজীবন যেমন কোনো আনন্দের বার্তা বহন করে না, এঁদের ঘরোয়া জীবনযাত্রাও তেমনি কোন শিক্ষদীপ্তার পরি-চয় নেই। আপনের বাবু যেদিন

(ক্রমশ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

শ্রীসিদ্ধার্থ রায়ের পদত্যাগ সম্পর্কে সংবাদপত্রের মতামত

শ্রীসিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়ের পদত্যাগের উপর বিবৃতি নিয়ে কলকাতার সব দৈনিক পত্রিকায় সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। শ্রীঅতুলা ঘোষ-সম্পাদিত জনসেবক যে বিবৃতির গুরুত্বে লাঘব করবার চেষ্টা করবে তাতে বিচিত্র কিছু নেই। কিন্তু আনন্দবাজার পত্রিকাও ঐ চেষ্টা কম করে নি, দীর্ঘ বিবৃতির গুরুত্বে অস্বীকার করা হয় নি।

স্বাধীনতা বিবৃতির সুরোগে আর একবার মন্ত্রিসভার পদত্যাগ দাবী করেছেন। যুগান্তর, অমৃতবাজার পত্রিকা এবং হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড এমন কি স্টেট্‌সম্যান ও গণবার্তাতেই হোক বিবৃতিতে যে ইঙ্গিত শ্রী রায়ের বিবৃতিতে যে ইঙ্গিত রয়েছে তার উল্লেখ করা হয়েছে তার অস্বীকার না করতে পারার অভিযোগগুলো সম্বন্ধে সম্পাদকীয় প্রবন্ধের উপর জোর দিয়েছে।

শ্রী রায় বিবৃতি দেন ২৪শে মার্চ। আনন্দবাজার পত্রিকা ও যুগান্তর সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখেছেন ঐ তারিখেই প্রকাশিত হয়েছে। অন্যান্য পত্রিকাগুলোতে প্রকাশিত হয়েছে ২৬শে মার্চ।

অমৃতবাজার পত্রিকা

অমৃতবাজার পত্রিকা শ্লেষের সঙ্গে বিবৃতিটি পূর্বে-বিবৃতি বাইরে বিলি করা হয়েছে বলে মন্তব্য করে বলেছেন, শ্রী রায়ের পদত্যাগ নিয়ে বেরোচ্ছে রকমারি গুজব। এই একেবারে অভিনব বলা হয়েছে : "শ্রী রায় পদত্যাগ করেছেন, কংগ্রেস নীতি ও কর্মনীতির কোনরূপ পরিবর্তন করা হবে না, এই ঘোষণা করিয়াছেন। ইহার পরেও পশ্চিম বঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিবার কি আছে তাহা বলিবার কি আছে ইহা আমরা বুঝিতে চাহি; তবে ইহা বুঝিতে পারিতেছি যে শ্রী রায়ের প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায় রহিলাম।"

হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড

আনন্দবাজার পত্রিকায় ইংরেজী সংস্করণ হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড লিখেছে : "কারণ ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা হয়েছে কোনো সন্দেহ না রেখে। কিন্তু যে সব অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে তার সবগুলো এত নির্দিষ্ট হয়ত নয়। তবুও এটা খুবই সম্ভব যে পদত্যাগী মন্ত্রী মহাশয় একাধিকবার প্রাক্ আসল স্থানে আঘাত করেছেন। অন্যান্য ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট অভাবের অভাবের কারণ হয়ত অফিসিয়াল সিক্রেট্‌স্ আইন।"

যুগান্তরও স্বাধীনতার প্রবন্ধের শিরোনামা প্রায় এক : "আসামীর কাঠগড়ায় মন্ত্রিসভা" (যুগান্তর); এবং "আসামীর কাঠগড়ায় কংগ্রেস মন্ত্রিসভা" (স্বাধীনতা)।

যুগান্তর

যুগান্তর বলেছে : "দুর্নীতি ও অপশাসনের জন্যনা চিত্র এই বিবৃতির দ্বারা উদ্ঘাটিত করা হইয়াছে। খাদ্যনীতির চূড়ান্ত ব্যর্থতা, চক্ষু-দিঁকে দুর্নীতির ব্যাপকতর অনুপ্রবেশ, বাঙ্গলাদেশে অর্থপ্রাপ্তী ধনিকদের নাগপাশ সৃষ্টি, গ্রামাঞ্চলের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অধঃপতন, সরকারী কর্মচারীদের উদাসহীনতা, প্রশাসনিক বাকশক্তির চরম দুর্বলতা, আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রতার অভিশাপ ইত্যাদি লইয়া আমরা (এবং অন্যান্য সংবাদ-পত্র) কম আন্দোলন করি নাই। কিন্তু এগুলির বিরুদ্ধে কোন প্রতীকার হয় নাই। বরং কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আমরা আক্রোশ বশেই এই ক্ষমতা লিখিতেছি—এই ছুতা ধরিয়া সমস্ত কিছু চাপা দেওয়া হইয়াছে।"

চিয়াং কাই-শেক চীনের পতন ও কমিউনিষ্ট চীনের অভ্যুত্থানের কারণ উল্লেখ করে যুগান্তর লিখেছে : "চীনের দৃষ্টান্ত হইতে আমরা ভারতবর্ষে এবং পশ্চিমবঙ্গে সাবধান হইতে চাহিয়াছিলাম—মন্ত্রীদের বার বার সতর্ক ও সাবধান করিয়া দিয়াছিলাম। তদুপরি বন্ধুবর শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় সেই চিত্ত সত্য আর একবার চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিলেন। কিন্তু কংগ্রেস নেতৃত্ব কি ইহার সবকাইতে কর্মচঞ্চল কেন্দ্র, ৮ এসপ্ল্যানেড ইস্ট কেন্দ্রীয় সরকারের এক অফিসে।

অবশ্য এ, চুরি ধরা পড়েছে; তবে অনেক বিলম্বে। কেবল নতুন কাগজ সরিয়েই 'ভড়লোক' সন্তুষ্ট হন নি। এক বছরের জমা পুরোনো সংবাদপত্র এবং অন্যান্য পত্র-পত্রিকাও (কয়েক টন বলে প্রকাশ) ফাঁক করে দিয়েছেন।

এ সম্পর্কে ঐ অফিসের 'সেকশন্ অফিসার'-কে ঐ কাগজ বিক্রির টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগে সাসপেন্ড করা হয়।

জনসেবক

"কংগ্রেস কর্মিগণের মুখপত্র" এবং শ্রীঅতুল ঘোষ সম্পাদিত জনসেবক লিখেছে : "তাহার (শ্রীসিদ্ধার্থ রায়ের) অভিযোগ প্রকৃত কংগ্রেসসেবীর সম্পূর্ণ বিপরীত; প্রকৃত কংগ্রেসী হইলে বিধান সভায় প্রকাশ্যে কংগ্রেস সরকারের অপদার্থতা (?) প্রমাণের চেষ্টা না করিয়া তিনি ভিতর হইতে উহার সংশোধনের চেষ্টা করিতেন এবং প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা ও প্রদেশ কংগ্রেসের নিকট হইতে প্রতিকার লাভে ব্যর্থ হইলে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির নিকট প্রতিকার দাবী করিতেন, কিন্তু তাহা না করিয়া কংগ্রেস বিরোধীদের ন্যায় কংগ্রেস সরকার ও প্রদেশ সরকারের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করিয়াছেন। ইহা রাজনৈতিক একটি চাল মাত্র। তিনি কংগ্রেসের বিরুদ্ধে চমক লাগাইয়া উপহাসিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, ইহা বলিলে নিশ্চয়ই অসম্পত হয় না। ইহার সহিত নীতি প্রতিষ্ঠা ও সংশাসন প্রবর্তনের কোনও সম্পর্ক নাই।"

স্বাধীনতা

কমিউনিষ্টদের মুখপত্র স্বাধীনতা লিখেছে : "শ্রী সিদ্ধার্থ রায়ের বক্তব্য হইতে ক্যাবিনেট ঠৈকের আলোচনা ও করেকজন মন্ত্রীর কার্যকলাপ সম্পর্কে যে সব গুরুতর অভিযোগ জানা গেল তাহার পর মন্ত্রিসভার গদীতে আসীন থাকার আর কোন অধিকারই থাকিল না।

"ভারতের সংবিধান ও কেন্দ্রীয় সরকারের আইন লঙ্ঘন ও চরম দুর্নীতির দৃষ্টান্তগুলি পশ্চিম বাংলার মানুষকে চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিল কি ভাবে এই কংগ্রেস মন্ত্রিসভা পশ্চিম বাংলার জনজীবনকে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইতেছেন। পশ্চিম বাংলার কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করিতে হইবে—ইহাই জনমতের আদালতের রায়।"

অমৃতবাজার পত্রিকা

অমৃতবাজার পত্রিকা লিখেছে : "বিবৃতিটির পর প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্বের আত্ম-বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। আমলাতন্ত্র ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর সুচিন্তিত পন্থা গ্রহণ করা উচিত। যে সব দৃষ্টান্তের উপর শ্রী রায় আলোকপাত করেছেন তাতে অলীক কল্পনা বলে উড়িয়ে দেয়া যায় না।

"দশ মাস পূর্বে একজন যুবক দেশপ্রেমিকের মহান মর্যাদার হিসেবে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেছিলেন। আশ্চর্যজনক মনে হতে পারে যে আজ সে সিদ্ধান্ত করেছে যে এই দল ও এই সরকার প্রত্যেকের মুক্তি প্রয়োজন।"

"শ্রীসিদ্ধার্থ রায়ের বিবৃতির ফলে যাঁর সরকার ও দলকে বিশেষভাবে নাড়া দেয় তবে দুর্দশাগ্রস্ত সাধারণ মানুষের তিনি যথার্থ উপকার করেছেন বলতে হবে।"

স্টেট্‌স্ম্যান

স্টেটসম্যান "কুশ্চেভ যুগ" শিরোনামায় লিখেছে : "একজন কুশ্চেভ যুবা তাঁর বন্ধুবা পেশ করেছেন। তিনি অনেক কথা বলেছেন, এবং তাঁর বক্তব্যে অনেক গলদ আছে প্রমাণ করা সম্ভব। কিন্তু তাঁর বক্তব্যে যেটুকু সত্য আছে তাতেই গুরুত্বে আরোপ করতে হবে। অতি শীঘ্রই এসব বিষয়ের উপর দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। অন্যথায় পশ্চিম বাঙ্গালায় আগামী নির্বাচনের ফলাফল সম্বন্ধে শ্রীনাম্বুদিরিপাদের ভবিষ্যদ্বাণী অসত্য প্রমাণিত নাও হতে পারে।"

(কিছুদিন পূর্বে নিউইয়র্ক টাইম্‌স্ পত্রিকার সংবাদদাতার সঙ্গে সাক্ষাৎকারে শ্রী নাম্বুদিরিপাদ বলেছেন যে আসামী নির্বাচনের ফলে কেরালা ছাড়াও অন্ত ও পশ্চিম বঙ্গে কমিউনিষ্টদের ক্ষমতায় আসা সম্ভব।)

চিচিং ফাঁক

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

চিচিং ফাঁক! এক নয়, দুই নয়, একশোও নয়, দুশোও নয়—ঠাস্ শত রিম ছাপ্পিকেটিং পেপার এবং ২৪ রিম টাইপ রাইটিং পেপার উধাও! এ ব্যাপার আবার ঘটেছে বেখানে-সেখানে নয়, কলকাতার সবচাইতে কর্মচঞ্চল কেন্দ্রে, ৮ এসপ্ল্যানেড ইস্টে কেন্দ্রীয় সরকারের এক অফিসে।

অবশ্য এ, চুরি ধরা পড়েছে; তবে অনেক বিলম্বে। কেবল নতুন কাগজ সরিয়েই 'ভড়লোক' সন্তুষ্ট হন নি। এক বছরের জমা পুরোনো সংবাদপত্র এবং অন্যান্য পত্র-পত্রিকাও (কয়েক টন বলে প্রকাশ) ফাঁক করে দিয়েছেন।

এ সম্পর্কে ঐ অফিসের 'সেকশন্ অফিসার'-কে ঐ কাগজ বিক্রির টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগে সাসপেন্ড করা হয়।

ভেলি প্যাসেঞ্জার

(তৃতীয় পৃষ্ঠার পর)

ছুটি পেলেন, সেদিন তার ঘুম ভালোভেই বেলা দশটা। দুপুরে খাওয়া দাওয়া সেরে আবার নিদ্রা। নিদ্রা অন্তে কারুর বৈঠকখানায় তাস-পাসা খেলে রাত দশটা পর্যন্ত যাপন। তারপরই আবার ভোর চারটায় স্টেশন বা বাসষ্ট্যান্ডে ছুটতে হবে। কাজেই সাংস্কৃতিক জীবন যাপনের অবকাশ কৈ? এঁদের মধ্যে অনেকেই বি এ এম্‌এ পাশ আছেন। "কিন্তু কোন কালে কলেজে পড়েছি, কি কি বই পড়েছি, তা আজ আর মনেও আনতে পারি না" একজন ডেলী প্যাসেঞ্জারের উক্তি। ইচ্ছা থাকলেও এঁরা বাড়ীর ছেলে-পুলেদের দেখাশুনা করতে পারেন না, ছেলে মেয়েদের উপর শিক্ষার জন্য টিউটরের উপর বরাত দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছেন। ছুটির দিনের বৈচিত্র্য হচ্ছে স্থানীয় বাজারে এটা সেটা বাজার করা। সপ্তাহে ছ-দিন নাকে মুখে গুঁজে ছুটতে হয়। তাই ছুটির দিনে একটু মুখ বদলানোর বিলাস।

এই একঘেয়ে জীবনযাত্রার মধ্যেও শনিবার একটু রঙের ছোঁয়াচ লাগে। আজ আর বাড়ী ফেরবার তাড়া নেই, চল সিনেমায় বা ফুটবল মাঠে বা অন্য কোথাও। সেদিন স্টেশনে নের দিকে লক্ষ্য রাখুন দেখবেন এঁরা পোশ্তার বাজার করে অফিস বাবুরা গুটি গুটি শিয়ালদা বা হাওড়া স্টেশনে চলেছেন। একহাতে তরীতরকারী বোঝাই থলি, অন্যহাতে ইলিশ বা অন্য মাছ, পকেটে স্বল্পের বাড়ী চলেছেন — এঁদের হাতে শাড়ী, প্রসাধন দ্রব্য; একান্ত আধুনিক কালের উপন্যাস ইত্যাদি।

নববধূ পতির আগমন প্রতীক্ষায় দখিনা বাতাসে নিবু-নিবু দীপশিখার মতো ভাঁরু কম্পিত বক্ষে 'প্রতীক্ষা করছে। একগাদা নারস গদ্যের 'মধ্যে এইটুকুই যা একটু পদ্য, যা একটু রোমান্স। কিন্তু এই রোমান্সও কঠোর বাস্তবের প্রখর দিবালোকে ক্ষণিকের মধ্যেই দেখতে দেখতে শুকিয়ে ওঠে, শুধু মনের মাঁঝকোঠায় অবশেষ স্মৃতি গুঞ্জরিত হতে থাকে।

এঁরাই ডেলী প্যাসেঞ্জার।

(ষষ্ঠ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

কথা থেকে শুরু করে সর্বশেষ অসমাপ্ত 'মাটি-ঘেঁষা' মানুষ পর্যন্ত যে আত্ম-নিরীক্ষা চলে এসেছে, তার সামনে প্রত্যেক সমালোচককে একবার অন্তত দাঁড়াতেই হবে। এবং এই কারণেই, আমি বলব আলোচ্য নিবন্ধে মানিক-বাবুর প্রসঙ্গ না থাকাটাই সবচাইতে মারাত্মক ত্রুটি।

শুভারম্ভ শুক্রবার ২৮শে মার্চ! জনপ্রিয় কাহিনীর ভক্তি চিত্র

ইন্দ্রজিৎ-মহৎ প্রযোজিত

পারিজাত থিয়েটার্সের

মা শীতলা

ভূমিকায়

শিখারাণী · অপর্ণাদেবী · গীতা সিংহ

অনুপকুমার · অজিত · মিলি · মিনু · সুখেন

পরিচালনা দিবানারায়ণ গুপ্ত

সুরকার রাজেন সরকার

নিউএম্পায়ার * দর্পণা * উজ্জলা * রূপম আলেয়া * সন্তোষ ও অন্যত্র

জাতিস্মর গণিত বিজ্ঞানী শ্রীনিবাস রামানুজম

[মনোজ রায়]

অধ্যাপক হার্ডির মতে, যে কোন গণিতবিজ্ঞানী উত্তর-তিরিশে অপেক্ষাকৃত প্রবীন হয়ে পড়েন। তাই রামানুজনের মতো গণিতবিদের অকালমৃত্যু গণিতবিজ্ঞানের সমৃদ্ধির দিক থেকে ট্র্যাজেডি হয়তো নয়। তাঁর তেত্রিশ বছরের স্বল্পদীর্ঘ জীবনে পাঁচটি বছর নিঃসন্দেহে বৃহত্তর অংশ। তারুণ্য-দীপ্ত এ পাঁচ বছরের ব্যর্থতা, সহজাত প্রতিভার পথচ্যুতি ও অবজ্ঞা, তাঁর জীবনের করুণতম কাহিনী।

দক্ষিণভারতের তাঞ্জোর জেলার এক সাধারণ রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ-পরিবারের ছেলে শ্রীনিবাস রামানুজন। তাঁর পিতা সামান্য চাকুরী করতেন কুম্ভকোনমে। পার্শ্ববর্তী [illegible] সোমানকার নাম-[illegible] দেবীর আশীর্বাদে রামানুজনের জন্ম [illegible] খৃষ্টাব্দের [illegible] কুম্ভকোনম [illegible] রামানুজন পড়া-[illegible] তাঁর সব [illegible] নীচের [illegible] প্রতিভার [illegible]

[illegible] তাঁর অসাধারণ [illegible] চোখে পড়বার [illegible] কথায় অঙ্কের [illegible] সহপাঠী-[illegible] বছর [illegible] হাতে এলো [illegible] শিক্ষার [illegible] সরকারী [illegible] সংগ্রহ [illegible] বিচিত্র [illegible] গেলো [illegible] সামনে। উচ্চতর [illegible] সম্পর্কিত বই এর সঙ্গে [illegible] পরিচয়। এক [illegible] যেন রামানুজনের সুপ্ত [illegible] জেগে উঠলো। কারের [illegible] ছিলো বীজগণিত, ত্রিকোণমিতি, ক্যালকুলাস ও বিশ্লেষণী জ্যামিতি বিষয়ে প্রায় ছহাজার উপ-[illegible]।

[illegible] খৃষ্টাব্দের পরবর্তী [illegible] গাণিতিক চিন্তাধারার [illegible] ছিলো না তাতে। [illegible] উপপাদ্যগুলির বিশদ [illegible] হলেন। সে দুরূহ [illegible] তত্ত্ব অনুশীলনের জন্য যে প্রারম্ভিক প্রস্তুতি প্রয়োজন রামানুজনের তা কিছুই ছিল না। হাতের কাছে এমন কোনো বইও নেই যা থেকে পথনির্দেশ মিলতে পারে। সুতরাং প্রতিটি সমাধান তাঁর পক্ষে মৌলিক গবেষনার নামান্তর।

পরীক্ষায় ব্যর্থতা

ষোলো বছর বয়সে ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষায় পাশ করে রামানুজন কুম্ভকোনম সরকারী কলেজে ভর্তি হলেন। তাঁর সব কিছু অভিনিবেশ গণিতকে নিয়ে। অন্যান্য বিষয়ে অমনোযোগের অবশ্যম্ভাবী ফল—কলেজের পরীক্ষায় শোচনীয় ব্যর্থতা। এতোদিন তিনি যে জুনিয়ার সুব্রহ্মনিয়ম্ স্কলারশিপ্ পেয়ে আসছিলেন তা থেকে বঞ্চিত হলেন।

অনন্যোপায় হয়ে কুম্ভকোনম ছেড়ে তিনি প্রথমে এলেন বিশাখাপত্তনে ও পরে মাদ্রাজে। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে তিনি এখানকার প্যাচেইয়াপ্পা কলেজে ভর্তি হলেন। কিন্তু অসুস্থ হয়ে তাঁকে ফিরে আসতে হল কুম্ভকোনমে। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তিনি প্রাইভেট ছাত্র হিসাবে ফার্স্ট আর্টস্ পরীক্ষা দিয়ে অকৃতকার্য্য হলেন। এখানেই তাঁর কলেজীয়-শিক্ষাজীবনের শোচনীয় সমাপ্তি।

এরপর কয়েক বছর তিনি গণিতে মৌলিক অনুশীলন করেন। কিন্তু এবারে চাই জীবিকার সন্ধান। পরিচয়পত্র নিয়ে রামানুজ এলেন নেলোরে, মাদ্রাজ থেকে আশী মাইল উত্তরে ছোট শহর। এখানে থাকেন গণিত-অনুরাগী দেওয়ান বাহাদুর রামচন্দ্র রাও। তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন রামানুজন; খাটো শ্রীহীন চেহারা আর বেশভূষায় দারিদ্র্যের স্পষ্ট ইঙ্গিত কিন্তু সব কিছু ছাপিয়ে উঠেছে দুটি উজ্জ্বল চোখের অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি।

প্রার্থনা তাঁর সামান্য—কোনও রকমে জীবনধারণের সংগতি আর প্রচুর অবসর, একান্ত নির্জনে গণিতের স্বপ্ন দেখার অবকাশ। দেওয়ান বাহাদুর রাজী হলেন সে ভার নিতে। এদিকে কোনো বৃত্তির ব্যবস্থা হয়ে উঠলো না যার সাহায্যে রামানুজন স্বাধীনভাবে গণিতচর্চা করতে পারেন।

কতোদিন আর দেওয়ান বাহাদুরের অর্থ সাহায্য নিয়ে চলবে। রামানুজন অগত্যা মাদ্রাজ পোর্ট ট্রাস্টের অফিসে একটা সামান্য চাকুরীতে যোগ দিলেন। গণিতের চর্চা চলেছে স্নেহহীন ভাবে। রামানুজনের প্রথম গবেষণার ফলাফল প্রকাশিত হয় ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ইণ্ডিয়ান ম্যাথমেটিক্যাল সোসাইটির জার্নালে। তখন তাঁর বয়স তেইশ। সে বছরই প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম সুদীর্ঘ প্রবন্ধ "সাম্ প্রপার্টিজ্ অব্ বারনৌলিজ্ নাম্বারস্"। ...

প্রতিভার স্বীকৃতি

রামচন্দ্র রাও এর কাছ থেকে এ অখ্যাত তরুণ গণিত বিদের কথা শুনতে পেলেন মাদ্রাজ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের মিঃ গ্রিফিথ্ ও মাদ্রাজ পোর্ট ট্রাস্টের চেয়ারম্যান ফ্রান্সিস্ স্প্রিং। এখন থেকে রামানুজনের পক্ষে তাঁর প্রতিভার স্বীকৃতি পাওয়া সহজ হল। শেষু আয়ারের পরামর্শে রামানুজন কেম্ব্রিজ ট্রিনিটি কলেজের ফেলো প্রখ্যাত গণিতবিদ হার্ডির সঙ্গে পত্রালাপ সুরু করলেন। বন্ধুদের সাহায্যে চিঠির ইংরেজী তর্জমা করা হল। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জানুয়ারীর চিঠি, রামানুজন লিখছেন হার্ডিকে—

"বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা আমার বিশেষ কিছু নেই। সাধারণ স্কুলের পাঠ নিয়েছি মাত্র। স্কুল ছাড়বার পর অবসর সময়ে গণিতের চর্চা করছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের গতানুগতিক পথে আমি যাইনি, চেষ্টা করেছি স্বতন্ত্র পথ খুঁজে বের করবার। যদি আপনি মনে করেন আমার কাজের কোনও মূল্য আছে, তবে আমি সেগুলি প্রকাশ করবো। আমার অর্থের খুব প্রয়োজন। আপনাকে যে অসুবিধায় ফেলছি তার জন্য ক্ষমা করবেন।"

মানুষের চিন্তাধারার বিবর্তনের ইতিহাসে এ চিঠি অক্ষয় হয়ে থাকবে। এক অখ্যাত ভারতীয় তরুণ—নিজের প্রতিভা সম্বন্ধে মনে সংশয়, তার নিরসন খুঁজছেন পাশ্চাত্যের এক পণ্ডিতের সম্ভাব্য অপমৃত্যু থেকে বাঁচাতে চায়, পূর্ণতর বিকাশের কাছে। পথ খোঁজে এক প্রতিভা, তারই আর্তি ফুটে উঠেছে চিঠিতে।

হার্ডিকে রামানুজন যে শতাধিক উপপাদ্য পাঠিয়েছিলেন তার কিছু কিছু পূর্বের জানা ছিল এবং সেগুলির সঙ্গে ল্যাপ্লাসে, জ্যাকবি, বয়ার, লিয়েন্ডার প্রমুখ গণিত বিজ্ঞানীদের নাম যুক্ত। কিন্তু এমন অনেক ফরমুলাও ছিল যা হার্ডির মতো গণিতবিদের কাছে সম্পূর্ণ নতুন ও দুরূহ মনে হল। কারের সিনপ্সিস্ যাঁর গণিত চর্চার একমাত্র ভিত্তি তাঁর মনে এমন সব সম্পাদ্যের ধারণা—যার সমাধান করতে ইয়োরোপীয় ধীমান গাণিতিকদের একশো বছর লেগেছে আর কোনো কোনো সম্পাদ্যের সমাধান অসম্পূর্ণ রয়েছে।

হার্ডির বিস্ময়

হার্ডি বিস্মিত হলেন। এ অখ্যাত ভারতীয় তরুণকে কেম্ব্রিজে আনতে হবে। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের মে মাসে রামানুজন মাদ্রাজ পোর্ট ট্রাস্টের চাকুরী থেকে ছাড়া পেলেন। একটা বিশেষ বৃত্তির ব্যবস্থা হল। ট্রিনিটি কলেজ থেকেও তাঁকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হল। স্যার ফ্রান্সিস্ স্প্রিং, স্যার গিলবার্ট ওয়াকার, অধ্যাপক নেভিলে, হার্ডি ও কতিপয় শুভানুধ্যায়ী ভারতীয়ের চেষ্টায় রামানুজন এলেন কেম্ব্রিজে।

কোনও কোনও বিষয়ে রামানুজনের কৃতিত্ব সমকালীন গণিত বিজ্ঞানীদের ছাড়িয়ে গেছে, অথচ অনেক দিকে তাঁর জ্ঞান অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ তাঁর পাণ্ডিত্য ও অজ্ঞতা দুইই সমান বিস্ময়কর। এ হেন রামানুজনকে গোড়া থেকে ধারাবাহিক অনুশীলনের মধ্য দিয়ে পরিচালিত করা, আধুনিক গণিতের সঙ্গে পরিচিত করা একটা কঠিন সমস্যা। এ রকম প্রচেষ্টার মধ্যে রামানুজনের আত্মবিশ্বাস ও অনুপ্রেরণা ক্ষুণ্ণ হবার এবং আশাভঙ্গের সম্ভাবনা রয়েছে।

হার্ডি সব দিকে লক্ষ্য রেখে সন্তর্পণে এগিয়ে চললেন—রামানুজন শিষ্য, তিনি গুরু। হার্ডি লিখছেন "আমার প্রচেষ্টা অল্পকালেই সার্থক হয়েছে।" তাঁর নির্দ্বিধ স্বীকারোক্তি, "রামানুজন আমার কাছে যা শিখেছেন তার চেয়ে অনেক বেশী আমি শিখেছি রামানুজনের কাছে।"

১৯১৭ খৃষ্টাব্দে রামানুজন অসুস্থ হয়ে পড়েন। এক নার্সিং হোমে পাঠিয়ে দেওয়া হয় তাঁকে। ওয়েলস, ম্যাটলক, লণ্ডনে অনেক স্যানাটোরিয়ামে বছর খানেক থকবার পর স্বাস্থ্যের সামান্য উন্নতি দেখা গেল। এ সময় তিনি রয়াল সোসাইটি ও ট্রিনিটির ফেলো নির্বাচিত হন। এ দুটো ঘটনা রামানুজনের মনে নতুন উৎসাহের সঞ্চার করে। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে তিনি স্বদেশে ফিরে আসেন পরের বছর ২৬শে এপ্রিল ক্ষয়রোগে তাঁর জীবনান্ত হয়।

স্বকীয় মৌলিকতা

রামানুজনের কাজের মূল্য, কোন মানদণ্ডে সে মূল্যবিচার করা হবে, ভবিষ্যতের গণিত বিজ্ঞানের উপর তা কতোখানি প্রভাব বিস্তার করবে, সে সম্পর্কে মতবৈষম্য থাকতে পারে। কিন্তু রামানুজন তাঁর চিন্তাধারার স্বকীয় মৌলিকতায়, বিশেষ করে বীজগণিতীয় ফরমুলায় তাঁর অন্তর্দৃষ্টির জন্য অবিস্মরণীয় থাকবেন। হার্ডির মতে, গণিতের এ শাখায় রামানুজন অদ্বিতীয়, শুধুমাত্র অয়লার বা জ্যাকবি সঙ্গে তাঁর তুলনা সম্ভব।

বাইরের জগতের সঙ্গে যাঁর বিন্দুমাত্র সংযোগ ছিল না, পরিচয় ছিল না পূর্বসূরী বা সমকালীন গণিত বিজ্ঞানীদের ত্যাগের সংগে তিনি ইয়োরোপীয় গণিত শাস্ত্রের এক সমৃদ্ধ অর্ধশতাব্দী নিজের হাতে নতুন করে সৃষ্টি করেছিলেন। মানুষের চিন্তাধারার ইতিহাসে এ এক অভাবনীয় কীর্তি। রামানুজন নাকি অনেক গাণিতিক সমাধান খুঁজে পেতেন স্বপ্নের মধ্যে। সে দুর্জ্ঞেয় রহস্যের একমাত্র উত্তর মেলে, যদি স্বীকার করি রামানুজন ছিলেন জাতিস্মর।

কি করে দু'পয়সা আসে !

[ডেলী পাসেঞ্জার]

বাজারে একটা গল্প আছে —অবশ্যি হাল আমলের নয়— পুরোনো।

আগড়পাড়া স্টেশনে যেই গাড়ীটা থাম্‌লো, অমনি হৈ হৈ করে একদল লোক কামরায় ঢুকে পড়্‌লো— সব মুলুক যাবে।

চেকার বাবুর আজ দিনটা বড়ই খারাপ, এখন পর্যন্ত একটা বাড়তি আনি দুআনিও পকেটে আসেনি। ওৎ পেতে দাঁড়িয়ে ছিলেন, যেই গাড়ী ছাড়লো অম্‌নি এক লাফে উঠে পড়লেন মুলুক-যাওয়া আদমীদের কামরায়।

তখনো সবাই গুছিয়ে বসেনি। কিন্তু চেকার বাবুর কাজে কোথাও ফাঁকি নেই। তিনি হাঁকলেন ঃ টিকিট নিকালো।

দলের সরদারের কাছে সব টিকেট। চেকার বাবুর হাতে সব জমা পড়্‌লো।

ঃ আরে, এ কেয়া টিকেট হ্যায় ? কোন দিয়া তোম্‌কো ?

কাচুমাচু হয়ে সরদার বললে ঃ হুজুর, টেশন বাবু দিয়া।

ঃ টেশন বাবু দিয়া ? কভি নেহি। এত্তো জেনানা টিকিট হ্যায়, আর তোমলোক তো সব মর্দানা হ্যায়।

মুলুক-যাওয়া দল তো অবাক। টেশনবাবু তাদের মর্দানা টিকেটের বদলে জেনানা টিকেট দিয়েছে। এখন উপায় ?

ঃ পয়সা নিকালো। এক এক মর্দানা কা চার চার আনা।

দলের সরদার গুনে গুনে নতুন করে মর্দানা টিকিট কেটে নিলো। অবশ্যি 'পুরোনো টিকিটগুলিই একটা পেন্সিলের দাগকাটা অবস্থায় তারা আবার ফেরত পেলো।

শিয়ালদা স্টেশনে নেমে চেকার বাবু আর অপেক্ষা করলেন না। ডিউটীর হিসাব-নিকাশ সত্বর দিয়েই বৈঠকখানা বাজারে গিয়ে ঢুক্‌লেন — ইলিশ মাছের সন্ধানে।

আপনারা হয়ত বলবেন ঃ মশাই এ নিতান্তই বাজে গল্প। আমিও স্বীকার করি। কিন্তু এটা আপনারাও অস্বীকার করবেননা, যে বাজে কাগজের মধ্যেও অনেকসময় আপনার দরকারী অনেক পুঁথিপত্রের ছেঁড়া পাতা ওজন করে দোকানে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। এমনি দু'চারখানা ছেঁড়া পাতাই না হয় আপনার সামনে দাখিল করছি।

হাট বাজারের একটা প্রণামী আছে — একথা জানেন তো ? বাজারের যিনি মালিক এবং তার যে কর্মচারী — তাদের পয়সা দিয়ে কোন জিনিষ কিনতে হয়না। সকাল বেলা সরকার মশাই চাকরের কাঁধে একটা ধামা নিয়ে বাজারে নামেন আর বেছে বেছে দোকানীদের প্রসন্ন থেকে খুসীমত শাক সবজী থেকে সুরু করে আলু পটল পেঁপে মাছ সব ধামায় ভর্তি করেন। ঠিক এম্‌নি ধারা প্রণামী কিছু কিছু রেল বাবুরাও পেয়ে থাকেন, একথা অস্বীকার করার উপায় নাই।

মালদা থেকে আম আস্‌ছে— ঝুড়ি ঝুড়ি রেলের কামরায় চেপে। ধরুণ, পঞ্চাশ ঝুড়ি। শিয়ালদহ গুডসে যখন আপনি খালাস করতে গেলেন — দেখ্‌বেন দীর্ঘ রেল ভ্রমণে ঝুড়িগুলো ক্লান্ত, তাদের দেহের নানা জায়গা ক্ষত বিক্ষত। দু'একটা ঝুড়ি হয়ত শিয়ালদহ গাড়ীতে চাপ্‌তে গিয়ে সাহেবগঞ্জের কামরায় ভুল করে উঠে পড়েছে। মাল নিয়ে আপনি গুদামে তুল্‌লেন—ঝুড়ি গুলোর দেহের বাঁধন খুলে দিলেন, কিন্তু একি ! একশটা আমের জায়গায় নবুইটা কি করে হলো ? দীর্ঘ দিনের কারবারী হলে আপনার বুঝতে অসুবিধে হবেনা যে এটা হ'লো রেলের প্রণামী।

এমনিধারা প্রণামী আরো অনেক জমা হতে থাকে — সোপারপুরের লাউডগা থেকে সুরু করে বারুইপুরের বেগুন, পটল, কলা — মায় খেজুরগুড়—রেল কোম্পানীর বিরাট ধামায় স্তপীকৃত হ'তে থাকে। তারপর ঘরে ঘরে প্রসাদ বিতরণ।

তবে বিপদে পড়েছিলেন এক সারমেয়-ভক্ত গার্ডবাবু। দার্জিলিং থেকে এক বিলেতী মেম এক কুকুর বাচ্চা নিয়ে আস্‌ছে কল্‌কাতায়। কুকুর ছানাটী উঠেছে গার্ড বাবুর পাশের কামরায়, তারই হেফাজতে। সারমেয় শিশুটীকে দেখে গার্ডবাবুর বড় লোভ হলো। তার ম্যাষ্টিকপাশ গিন্নী অনেকদিন ধরে বায়না ধরেছে — একটা পাহাড়ী কুকুর পুষবে। গার্ডবাবু ভাবলেন—এইতো সুযোগ!

শিলিগুড়ি ছাড়্‌বার আগেই তার হেফাজতের মাল পাচার হয়ে গেলো, আর লোম-ওঠা এক নেড়ী স্টেশনের এক কিনারে ঘুমুচ্ছিল, সেটাকে নিয়ে তোলা হলো রেলের কামরায়। গার্ডবাবু মনেমনে ভাব্‌লেন; নেড়ীটার বরাত ভালো। বেটীর কপালে নিশ্চয়ই দেশভ্রমণ যোগ আছে।

তারপর মশাই, গাড়ীতো এসে পৌঁছুলো শিয়ালদায়। মেমসাহেব হাঁকলেন ঃ আমার কুকুর কোথায় ? মাই ডগ ?

রেলের এক কুলীর সঙ্গে নেড়ী এসে হাজির। মেম সাহেবের তো চক্ষু চড়কগাছ—মূর্চ্ছা যাবার উপক্রম।

গার্ডবাবু ছুটে এলেন। মেমসাহেবকে বোঝাতে লাগলেন, নং জার্নি ম্যাডাম, হিলডগ্, বলেন ইল, সো হেল্‌থ ব্রোকেন। অর্থাৎ কিনা —এতো দূরের পথ, আসতে আসতে পাহাড়ী কুকুরটার অসুখ হয়ে পড়েছে, স্বাস্থ্য ভেঙ্গে গেছে — তাই ওর এই হাল হয়েছে।

মেম সাহেবের রেল-প্রণামীর কথা বোধ হয় জানাছিলোনা, তাই প্রথমত্রঃ খাস ইংরেজী ভাষায় রেল কোম্পানীকে কিছু গালমন্দ করলেন, তারপর শাসিয়ে গেলেন দিল্লীতে রেলমন্ত্রীর কাছে অভিযোগ করবেন।

গার্ডবাবু এতে ঘাবড়াবার ছেলে নয় কারণ আইনতঃ তার কোন গাফিলতি হয়নি। মেমসাহেবের বুক করা ছিলো ঃ একটি ডগ্ এবং একটি ডগইতো তাকে দেওয়া হয়েছে। এখন সে নেড়ীই হোক্ আর পাহাড়ীই হোক্।

রামবাবু আজ সকালে লাইনে বেরুলেন — পকেটে তার চার ছ' আনার খুচরো। সন্ধ্যায় যখন ফিরে এসে বাড়ীর দিকে হাটতে সুরু করলেন — তখন আপনার মনে হবে, কেউ বুঝি মল বাজিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু পরক্ষণেই আপনার ভুল ভেঙ্গে যাবে যদি রামবাবুর পকেটের দিকে তাকান। যদি সাহস থাকে তবে উকি ঝুকি মারুন একটু পকেটের ভিতর। দেখ্‌বেন ঃ আনি,

(৯ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

রেল চলাচলে সুপরিকল্পিত বিঘ্ন সৃষ্টি

স্বার্থান্বেষীদের গুন্ডামি : পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

সাম্প্রতিক রেলের অব্যবস্থার প্রতিবাদে যে সব অপ্রীতিকর অবস্থার উদ্ভব হয়েছে, তার প্রতিবিধান চিন্তা করতে গিয়ে কর্তৃপক্ষ এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছেন। তাঁরা মনে করেন, আর তাঁদের এই মনে করার পেছনে যথেষ্ট কারণ নিশ্চয়ই আছে যে, এই সব ঘটনা আকস্মিক বা খাপছাড়াভাবে ঘটে নি, একই লক্ষ্য করলেই এগুলির প্রকৃতিগত ঐক্য ধরা পড়বে।

কিছুদিন আগে সোনাপুরের কাছে যে ঘটনাটি ঘটে তাতে রেলের যাত্রী ও জনসাধারণের সাথে পুলিশদের জনতা একজোট হয়ে লাইনের ওপর বসে পড়ে। তাতে ডাউন দুটো লাইনের রেল চলাচল বন্ধ করে দেয় বেশ কয়েক ঘন্টার জন্য। বরাবরদের কাছে সেদিন এই ঘটনা একটি অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতা বলে মনে হলেও আমরা লক্ষ্য করেছি। এই ঘটনার পেছনে আর একটি তাৎপর্য আছে, অন্য আরও কারণ আছে যা রেলের বৈধ দেহে জন্ম নিয়েছে। তা হচ্ছে জন-সাধারণ ও কর্মচারীদের মধ্যে যারা জানিয়েছে রেলের কাছে, কোনও উদ্বৃত্তও সন্তোষজনক জবাব পায় নি, তবে তারা গাড়ী চলা বন্ধ করতে সাহায্য করেছে। পুলিশের ব্যবহারে যে তারা খুশী হয়েছে তা নয়। কিন্তু এ কথাও ভুললে চলবে না যে এ অবস্থার সুযোগ নিয়ে চলেছে একদল স্বার্থান্বেষী লোক।

অবশ্যই গুরুত্ব ধরা পড়ে আরও বেশী করে যখন আমরা মনে রাখি ১৯৫৩ সালের অনুরূপ অবস্থার উদ্ভব হয়েছিল। সেটাও ছিল একটা সাধারণ নির্বাচনের পরবর্তীকালীন।

একটু তলিয়ে দেখলেই আরও কয়েকটা জিনিষ নজরে পড়ে। হাওড়ার ঘটনাগুলোতেই ফিরে আসা যাক। জোড়া খুনের জের টানতে পুলিশ কর্তৃপক্ষও প্রাক্-নির্বাচনী একটা বিশেষ ঘটনায় গিয়ে পৌঁছান। সেটি ছিল এক কারখানার কর্মচারীর হাত থেকে রাস্তার ক্যাশের থলিটী ছিনিয়ে নেয়া। সে ব্যাপারে পুলিশ যাকে গ্রেপ্তার করেছিল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাকে হাওড়ারই জনৈক বিশিষ্ট নাগরিক, শোনা গিয়েছিল, জামিনে মুক্ত করে আনেন। এরকম ঘটনা খোঁজ করলে আরও অনেক বেরিয়ে পড়বে আর দেখা যাবে যে যারা দল পাকাতে পারে বা যাদের উপস্থিতিই যথেষ্ট ভয়াবহ সাধারণের বেশে তারা অনেকখানি যত্নন্তে আচরণের সুযোগ গ্রহণ করে আসছে। আর অনেকেই অবশ্যই চাপে পড়ে সে সুযোগ দিতে বাধ্য হয়ে আসছে।

কয়েকদিন পরে, অর্থাৎ নির্বাচনের পরেও যদি তারা তাদের সুবিধা দাবী করে, ও আদায় করার চেষ্টা করে তাহলে আশ্চর্য কিছু নয়। তারা যদি এই ভেবে উৎসাহ পায় যে তাদের সমধর্মী লোকেরাই এখন আইন-সভার সদস্য তাহলেও তাদের বিরুদ্ধে বলার কিছু থাকে না, আর এটেই অনেকক্ষেত্রে পুলিশী উদাসীনতারও মানে খুঁজে পাওয়া যায়।

এই একই অবস্থা যখন দুটো সাধারণ নির্বাচনের — ছোটখাট নির্বাচনের কথা ত' ছেড়েই দিলাম — পরই দেখা গেছে তখন অনেকে মনে করছেন যে ব্যাপারটা একটু বিশেষ তলিয়ে দেখা দরকার। হয়ত পুলিশ ঠিকমত ব্যবস্থা নিলে অবস্থাটা আর ঘোরালো হবে না, কিন্তু আগামী নির্বাচনের পরেও যে অবস্থার অবনতি হবে না তার কি গ্যারান্টি আছে? কে বলতে পারে অবস্থা উত্তরোত্তর খারাপের দিকে যাবে না? আশঙ্কা যখন রয়েই যাচ্ছে তখন শান্তিকামী জনসাধারণ কি রাজনৈতিক দল-গুলোর কাছে এই দাবী জানাতে পারে না যে তাঁরা যেন ভবিষ্যতে নির্বাচন স্বন্দের এই দিকটার দিকে বিশেষ নজর দেন। তাছাড়া এতে করে ডেমোক্রেসির কবরই আমরা খুঁড়তে থাকবো না কি?

কর্মচারীদের দুর্দশা

(৭ম পৃষ্ঠার পর)

হয়। এই হিসাবে একজন বেয়ারা-পিওন প্রভৃতির মাসিক সর্বনিম্ন মহার্ঘভাতা এখন হওয়া উচিত ৪৫ টাকা, এবং কেরানী প্রভৃতির ক্ষেত্রে ৯৫ টাকা। সুতরাং কর্মচারীদের ২৫ টাকা অতিরিক্ত মহার্ঘভাতার দাবীকে কোনক্রমেই অসঙ্গত বলা যেতে পারে না।

এই সব প্রধান দাবী ছাড়া আরও বহু দাবী আছে—যেমন চিকিৎসার সুবিধা, 'সার্ভিস কন্ডিশান' প্রভৃতির পরিবর্তন ইত্যাদি। কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীরা চিকিৎসার ব্যাপারে যে সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকেন সেগুলি হতেও রাজ্য সরকারের কর্মচারীরা বঞ্চিত। একই স্থানে সরকারী কাজে নিযুক্ত কর্মচারী-দের মধ্যে এই রকম বৈষম্যমূলক ব্যবহার কিছুতেই সমর্থনযোগ্য নয়। 'সার্ভিস রুলস' পরিবর্তনের দাবী সম্বন্ধে কোন কিছু বলার দরকার পড়ে না। সাম্রাজ্যবাদী শাসক এই দেশকে শৃঙ্খলে বেঁধে রাখার দৃষ্টি নিয়ে যে নিয়মকানুন রচনা করেছিল তাকে আজও চালু রাখার অর্থ শৃঙ্খলাকেই অপমান করা। অবশ্য বর্তমান শাসক-গোষ্ঠীর এ ব্যাপারে কোন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশ করা বাতুলতা; কারণ যে দৃষ্টি নিয়ে বিদেশী শাসক রাজ্য শাসন করত সে দৃষ্টির মূলগত কোন পরিবর্তন আজও হয় নি। আগের শাসক সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য ছিল জন-সাধারণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার ঘাড়ের উপর বিদেশী শোষণ ও শাসন চাপিয়ে রাখা; আর কংগ্রেসী শাসকবর্গেরই উদ্দেশ্য হল পুঁজি-পতি শ্রেণীর শোষণ ও শাসন জোর করে দেশবাসীর উপর চালু রাখা। এই কারণে ইংরাজের হাতের তৈরী 'সার্ভিস রুলস' কংগ্রেসী কর্তাদের কাছে মহা অস্ত্র। তাই তাকে ছিইয়ে রাখার এত চেষ্টা। আন্দো-লনের আঘাতে সরকারকে পরাস্ত করতে পারলে তবেই এই অবস্থার উন্নতি হবে, তার আগে নয়।

(৫ম কলমের পর)

সাহিত্যিকদেরও ঘটেছিল। কিন্তু সে আজমালোচনা সম্পূর্ণ ছিলনা। এ ব্যাপারে মাণিকবাবু এঁদের কক্সাজের বাইরে থেকে এক দুঃসাহসী আক্রমণের নিয়ে। নারা-য়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতে, তাঁর গল্প-উপন্যাস পড়তে পড়তে মনে হয় একজন ইংরাজীবিদ যেন অজ্ঞতাবর্জিত ধূলির আলোকে আমাদের সমাজ-জীবনকে বিশ্লে-ষণ করছে—আর সেই বিশ্লেষণের মধ্যে সব সময়েই একটা বক্রতা সঞ্চার হয়ে আছে। তাই মাণিক-বাবুর সেই 'পুতুল নাচের ইতি-

(৪র্থ পৃষ্ঠায়)

যুদ্ধোত্তর বাংলা উপন্যাস প্রসঙ্গে

[শ্রীসমীর ঘোষ]

'দর্পণে'র গত ২৮শে ফেব্রু-য়ারীর সংখ্যায় শ্রীমতী শান্তি বসুর লেখা 'যুদ্ধোত্তর বাংলা উপন্যাস' পড়া গেল। সংবাদ-সাময়িকীর পাতায় এমনি একটি গুরুত্বপূর্ণ রচনা উপহার দেবার জন্যে লেখি-কাকে প্রথমেই আন্তরিক অভি-নন্দন জানাই।

একটি সুবিস্তৃত বিষয়কে এত সংক্ষিপ্ত আকারে সুন্দরভাবে প্রকাশ করবার দুঃসাহসিক প্রচে-ষ্টার জন্যে নিবন্ধকার আমাদের ধন্যবাদার্হ।

তাছাড়া পাঠক হিসাবে কিছুটা অনুসন্ধিৎসা এবং খানিকটা কৌতূ-হল নিয়ে রচনাটি পড়েছি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে, মনে হয়, লেখকের বক্তব্য অসম্পষ্ট তথা অসম্পূর্ণ; এবং, নিবন্ধের সীমিত আয়তনের কথা স্মরণ রেখেও, তাঁর কয়েকটি সিদ্ধান্ত আমার কাছে যথার্থ বলে মনে হয়নি।

রচনার সুরুতে লেখক মোটা-মুটি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, বাংলা সাহিত্যে মহাযুদ্ধের প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েনি। এ প্রসঙ্গে তিনি কোল-কাতার হাতীবাগানে জাপানী বোমা পড়ার উল্লেখ করে-ছেন। এখানে 'প্রত্যক্ষ' কথাটির মর্মার্থ তিনি কিভাবে বুঝেছেন, বুঝতে পারি না। একথা অনস্বীকার্য যে, জার্মানী ও রাশিয়ার মত যুদ্ধ আমাদের ঘরে ঘরে এসে হানা দেয়নি এবং বাংলা দেশে রোমাঞ্চ বা এরেনবুর্গের মতন সাহিত্যি-কেরও জন্ম হয়নি। কিন্তু একথা কি আজ অস্বীকার করা যায় যে, স্থিতীয় মহাযুদ্ধের আগের আর পরের বাংলা সাহিত্য আদিকে ও বিষয়বস্তুতে আলাদা? লেখক বলেছেন : "ক্রয়েড ও মার্কস অবশ্য যুদ্ধের সঙ্গে আসেন নি বা যুদ্ধের ফল হিসেবেও নয়।" তর্কাতীত সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে নেই। কিন্তু স্থিতীয় মহাযুদ্ধ থেকে সমস্ত পৃথিবীর এবং বাংলারও সচেতন সাহিত্যিক কি এই পাঠ গ্রহণ করেন নি যে, যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদীর ঘৃণিত লালসা? তাছাড়া মার্ক্স হিসেবে ফ্রয়েড ও মার্কস-এর প্রভাব সাহিত্যে বেঁচে থাকা অস্বীকার এবং আমাদের দেশে তা নেইও। উচ্চশ্রেণীর দুই মনীষীর সমাজ বিজ্ঞানের ক্ষমাপ্রার্থনা বরঞ্চ আমা-দের সাহিত্যে দেখা যায়। সাহিত্যে মার্কস এবং ফ্রয়েডের সুলেঢ়ুলির অনুশীলন-চর্চনা বাংলা দেশে যুদ্ধোত্তর দিনের না হলেও গল্প-উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীর চরিত্র বিশ্লেষণে উল্লিখিত দুই মনীষার অধিকতর রূপায়োগ যুদ্ধোত্তর দিনেরই অবদান।

লেখকের মতানুসারে, পরাধীন উপনিবেশে স্বাভাবিক কারণেই জীবনের গতি রুদ্ধ হয়েছে সত্যি, কিন্তু যুদ্ধ দেখিয়েছে কেউ খেয়ে মরে, আর কেউ না খেয়ে মরে। যুদ্ধজাত মুদ্রাস্ফীতি এবং আনু-ষঙ্গিক অর্থনীতিক অভিসম্প্রদা বাংলাদী সাহিত্যকে অনেক বেশী নিরীহা-পরাঙ্মুখ করেছে। বাংলা সাহিত্যে এই গতিশীলতা, আমি বলব, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবশ্য-ম্ভাবী এবং প্রত্যক্ষ ফল।

কল্লোল যুগের সমালোচনা প্রসঙ্গে নিবন্ধকার সে যুগের লেখকদের শহর-প্রীতিকে অপ্রসন্ন করেছেন। কিন্তু শহরকে ভাল-বাসলেই যে ভাল উপন্যাস লেখা যাবে না—এর কিছু মানে নেই। প্রসঙ্গক্রমে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস-গুলির দৃষ্টান্ত তোলা যেতে পারে। সেগুলি অধিকাংশই শহরকেন্দ্রিক। কল্লোলযুগে সম্বন্ধে লেখক আরো বলেছেন : "নিজেদের শূন্যতার মধ্যে ফ্রয়েড ও মার্কস যেন মুস-কিল আসানের মতো এসেছে।" না। তা নয়। কল্লোলযুগের সমাজ-সচেতনতাকে এত সহজে অস্বীকার করা যায় না। কল্লোলের উপলশ্বির কাছে যুদ্ধোত্তর বাংলা সাহিত্য আজ অনেক ছিন্ন ধারে। সেই মানসিকতা কানাগলির অন্ধকার আর অন্তরাত হারিয়ে যায়নি। কল্লোলের তৈরী সড়কে আজ অনেক গাড়ী-ঘোড়ার আমদানী।

যুদ্ধোত্তর বাংলা উপন্যাস সম্পর্কে লিখতে বসে বিমল মিত্র, রমাপদ চৌধুরী বা শ্রীঅবধূতের প্রসঙ্গ টেনে আনার কোনো প্রয়ো-জন খুঁজে পাইনে। অথচ যুদ্ধোত্তর বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যে তিন দিক্‌পাল তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্বন্ধে লেখক এক-প্রকার মৌন। অন্নদাশঙ্করের লেখক-দের টেনে এনে তাঁদের রচনাকে নন্যাৎ করে তাঁদের এনে কোনো বীরত্ব বা সার্থকতা নেই। মনে রাখা উচিত যে; সমালোচনারও একটা নিজস্ব 'ফর্ম' আছে। সেই সূত্রে লেখকের দায়িত্ব অপেক্ষা সমালোচকের দায়িত্ব কিছু কম নয়।

এক কথা আসতো না, যদি না শ্রীমতী বসু নিবন্ধের বক্তব্য বিষয় থেকে আকস্মিক ভাবে দূরে সরে না যেতেন। যুদ্ধোত্তর বাংলা উপ-ন্যাসের আলোচনায় তিনি এমন সব লেখকদের কথা তুলে গিয়েছেন যাঁরা অনেকটুকি ভাবে সর্বতোভাবেই উল্লেখযোগ্য। রচনা পাঠে একথা ভেবে নেওয়াও অস্বাভাবিক নয় যে, তিনি মাঝের উল্লেখ করেন নি তাঁরাই প্রকৃত লেখক!

আমার মনে হয় এই প্রসঙ্গে যে কোনো সুধী সমালোচকের পক্ষে 'একদা' ও 'অন্যদিনের' জন্যে গোপাল হালদার, "তিলাঞ্জলি" ও "তিমামার" জন্যে সুবোধ ঘোষ, "মধু-বৃন্দের" জন্যে বরেণ বসু, "কিন্নুগোয়ালার গলি" ও "মোমের পুতুলের" জন্যে সতীনাথ ভাদুড়ী, "নেইমন" ও "চোনামহলের" জন্যে নরেন্দ্রনাথ মিত্র, "বারোঘর একটি উঠানের" জন্যে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী এবং "তিতাস একটি নদীর নামের" জন্যে অদ্বৈতমল্ল বর্মণের নাম উল্লেখ না করে উপায় নেই।

সনরেন বসু প্রসঙ্গে নিবন্ধ-কারের উক্তি সম্বন্ধে বলা যায় যে তাঁর মেজাজ ঔপন্যাসিকের না হলেও 'গণ্যা' তাঁর নিজের এবং সমালোচকের মেজাজ ফিরিয়েছে।

লেখক বলেছেন : "আসলে খুঁজছি স্বীকরণের কথা রোজকার মানুষের চেহারাজ।" কিন্তু সবচেয়ে আকর্ষণের কথা এই যে, এই খোঁজা-খুঁজির পরেও তিনি মাণিক বন্দ্যো-পাধ্যায়ের উল্লেখমাত্র করেন নি। এর কারণটা ঠিক বোঝা গেল না। অথচ একথা স্বীকৃত যে, বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যের রোজনামচার মাণিকবাবুর স্বাক্ষর প্রখর এবং স্পষ্ট। কল্লোলযুগীয় রচনা সম্বন্ধে নিবন্ধকারের হতাশা অনে-কটা ধরে ছোড যদি তিনি মাণিক-বাবুর প্রসঙ্গ তুলতেন। সেণ্টিমেণ্ট সম্পর্কে মোহমুক্তি কল্লোলযুগের

(৩য় কলমে দ্রষ্টব্য)

রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের দুর্দশা

[সুবোধ ব্যানার্জী]

পশ্চিম বাংলায় কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার যে সর্ববৃহৎ নিয়োগ-কর্তা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। আমাদের এখানে রাজ্য সরকারের অধীনস্থ সকল রকম কর্মচারীর মোট সংখ্যা হল ১,৫৭,৭৩২ জন, যার মধ্যে ৫১১৯ জন হলেন সেক্রেটেড ও বাকি ১,৫৩,৫৬৮ জন নন-সেক্রেটেড। সেখানে কর্মচারীদের মধ্যে আবার ২১,৬৪৮ জন কেরানী, ৪৪, ২৭২ জন বেয়ারা, চাপরাসী প্রভৃতি তথাকথিত 'ইনফিরিয়র স্টাফ' এবং বাকি ৭১,৬৪৮ জন প্রধানতঃ প্রায়োগিক কর্মচারী অর্থাৎ 'টেকনিক্যাল হ্যাণ্ড'। নিয়োগকর্তা হিসাবে, শুধু সংখ্যার দিক হতে নয় অন্যান্য দিক বিবেচনায়, সরকারের ভূমিকা ও দায়িত্ব গুরুত্বপূর্ণ। একজন ব্যক্তিগত মালিক তার প্রমিক কর্মচারীদের সঙ্গে যে ব্যবহার করে সরকারের পক্ষে তার কর্মচারীদের প্রতি সে ধরনের শোষণ ও অসদ্ব্যবহারমূলক ব্যবহার করা কোনমতেই জনসাধারণ নয়, অন্যায়ও বটে। কারণ দেশের মধ্যে আদর্শ নিয়োগ-কর্তার মানদণ্ড উন্নীতকরণ স্থাপন করা এবং জনকল্যাণকর নিয়োগ নীতি (এমপ্লয়মেণ্ট পলিসি) গঠন করা ও কঠোরভাবে তাকে চালু রাখা সরকারের অবশ্য কর্তব্যগুলির মধ্যে একটি।

নিজে আদর্শ নিয়োগকর্তা না হলে এই আবশ্যিক কর্তব্যচ্যুতি তো বটেই; উপরন্তু ব্যক্তিগত মালিক শ্রেণীকে সুষ্ঠু নিয়োগ-নীতি পালন করতে বাধ্য করান শুধু অসম্ভবই হয় না, সরকারের নিজ কর্মচারীদের প্রতি অন্যায় ব্যবহার সম্পর্কেও অন্যান্য শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক কর্মচারীদের অভাবও যুক্তিসঙ্গত দাবী আদায়ে ব্যাহতকরে। মালিককে পরোক্ষে উৎসাহ দেয়। এর ফলে দেশের প্রগতিশীল জনসাধারণের উপর সামাজিকভাবে মালিকী জুলুম-বাজীর নেমে আসে। পশ্চিম বাংলার বর্তমানে শ্রমিক কর্মচারী স্বার্থ-বিরোধী যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তার জন্য রাজ্য সরকারের নিজস্ব নিয়োগনীতি বহুলাংশে দায়ী।

রাজ্য সরকারের কর্মচারীরা নানা দিক হতে দুর্দশাগ্রস্ত— বিভিন্ন সংগঠনের অফিসের কর্মচারীরা চাকুরীর ক্ষেত্রে যে সমস্ত সুখ-সুবিধা ভোগ করে থাকেন, সরকারী কর্মচারীরা এমন কি সেগুলি হতেও বঞ্চিত। চাকুরী জীবনে কাজের স্থায়ির হল এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়; অথচ এই ব্যাপারে সরকারী কর্মচারীদের যে দুর্ভোগ ভুগতে হচ্ছে তা অবর্ণনীয়। বছরের পর বছর, এমন কি সারা জীবন চাকুরী করার পরও, সরকারী কর্মচারীদের অধিকাংশকে স্থায়ী করা হয় না; ফলে স্থায়ী কর্মচারীরা ছুটি, পেন্সন প্রভৃতি যে সব সুবিধা পাবার আইনতঃ অধিকারী সেগুলি তাঁরা ভোগ করতে পারেন না। উদাহরণ দিলে অবস্থার মর্মান্তিকতা বোঝার সুবিধা হবে। উপরে উল্লিখিত কেরাণী-দের মধ্যে শতকরা ৩৫ জন স্থায়ী বাকি ৬৫ জন অস্থায়ী। বেয়ারা, চাপরাসী প্রভৃতি তথাকথিত 'ইনফিরিয়র স্টাফ' এর অবস্থা আরও শোচনীয়—এঁদের মধ্যে শতকরা ৮০ জন অস্থায়ী। সরকারী স্থায়ী বিভাগে এই রকম অস্থায়ী কর্মচারীর ভিড় একমাত্র পশ্চিম বাংলা রাজ্যেই লক্ষ্য করা যায়। নন-গেজেটেড কর্মচারীদের বেলায় পশ্চিম বাংলা সরকারের ব্যবস্থা যতই নিম্নস্তরীয় হক না উদ্যমশীল কর্মচারীদের ক্ষেত্রে কিন্তু সরকার বাহাদুরের অভাব নেই। এই গেজেটেড শ্রেণীর সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে শতকরা ৭৫ ভাগ অস্থায়ী। সরকারের নিয়ন্ত্রে ইঞ্জিনিয়ারিংসে ছয় মাস চাকুরী করলেই শ্রমিক কর্মচারীরা স্থায়ী হিসাবে গণ্য হয়ে থাকে। কিন্তু কোন কর্মচারীরা স্থায়ী হলে সরকারের দুর্নীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে। অস্থায়ী ও কৃপাপ্রার্থী অসদপ্রাপ্ত অফিসার ও কর্মচারী-দের নিকট থেকে সে বাধা পাবার সম্ভাবনা নেই বরং মন্ত্রিমণ্ডলী খোশামোদারদের উপর যাদের চাকুরী নির্ভর করে তারা স্বভাবতই চাকুরী বজায় রাখার জন্য সরকারের সকল রকম দুর্নীতির সমর্থক হতে বাধ্য হয়। এই কারণেই অস্থায়ী ও অসদপ্রাপ্ত কর্মচারীর ভিড় বেড়ে চলেছে।

চাকুরীর স্থায়িত্বের পর কর্ম-জীবনে স্থিতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল কর্মচারীদের মোট আয়। এই ব্যাপারে সরকারের ব্যবহারের তুলনা মেলা ভার—সরকার কর্তৃক নিযুক্ত ট্রাইব্যুনাল ও কমিশনের রায় এবং সরকার কর্তৃক বিঘোষিত নীতির মাঝার পদাঘাত করে চলেছে পশ্চিম বাংলা রাজ্য সরকার। ১৯৪১ সালে 'কমিটি অন ফেয়ার ওয়েজেস' এই সিদ্ধান্তে ঘোষণা করে যে, যে শিল্প শ্রমিককে সর্বনিম্ন বেতন দিতে পারে না, যে শিল্পের টিকে থাকার কোন অধিকার নেই। গত বছর ১২ই জুলাই তারিখে যে 'লেবার কনফারেন্স' সরকারের আহ্বানে অনুষ্ঠিত হয় এবং যার মধ্যে সরকারও একটি পার্টি, সেখানে সর্বসম্মতিক্রমে স্থির করা হয় যে, 'ফেয়ার ওয়েজেস কমিটি' সুপারিশগুলি সরকারী কর্মচারীর উপরও প্রযুক্ত হবে। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হল এই যে, এই সর্বনিম্ন বেতন দেবার সময় আর্থিক সঙ্গতি ও সামর্থ্যের কথা ওঠে না; Justice Higgins এর কথায়—"It must be an amount adequate to cover the normal needs of the average employees regarded as a human being living in a civilized community. It is a thing sacroscant and beyond the reach of bargaining"

যে শিল্প এই সর্বনিম্ন বেতন দিতে পারে না তার যদি বেঁচে থাকার অধিকার না থাকে তাহলে যে সরকার তার কর্মচারীর এই সর্বনিম্ন প্রয়োজন মেটাতে অক্ষম অথবা অনিচ্ছুক তার ক্ষমতার প্রতিষ্ঠিত থাকার আরও কম অধিকার আছে। বর্তমান অবস্থার সর্বনিম্ন বেতন কত হওয়া পারে সে সম্পর্কেও নজিরের অভাব নেই। ১৯৪০ সালে রাও অনুসন্ধান কমিটি রায় দেয় যে, সেই সময় বোম্বাই-এর মত সহর, ছোট ছোট সহর এবং পাহাঁড়ায়ে একটি শ্রমিক পরিবারের কোন রকমে জীবন ধারণের (সার্বাসিস্টেন্স লেভেল) জন্য ন্যূনপক্ষে যথাক্রমে ৩৫, ৩০, ও ২৫ টাকার প্রয়োজন হত। এই হিসাবকে ভিত্তি ধরে প্রতি ২০ পয়েন্ট মূল্য বৃদ্ধির জন্য ৫, আর বৃদ্ধি করার যে সুপারিশ গত 'পে কমিশন' করে তাকে বিবেচনায় আনলে বর্তমানে একজন শ্রমিক পরিবারের মাসিক সর্বনিম্ন প্রয়োজন বড় সহর, ছোট সহর ও পাহাঁড়ায়ে দাঁড়ায় যথাক্রমে ১৫০, ১০৮/ ও ৯৫, টাকা। ১৯৪৬ সালে বিচারপতি রাজাধ্যক্ষ পেণ্ডসে অফিসের কর্মচারীদের বিষয় বিবেচনা করে যে রায় দেন সেই হিসাব অনুযায়ীও বর্তমানে একজন শ্রমিকের সর্বনিম্ন মাসিক মজুরির দাঁড়ায় প্রায় ৯৫, টাকা। মধ্যবিত্ত পরিবারের সর্বনিম্ন প্রয়োজন শ্রমিক পরিবারের সর্বনিম্ন প্রয়োজনকে ১.৪০ দিয়ে গুণে করে পাওয়া যায়। সেই নিক হতে একজন কেরাণীর মাসিক সর্বনিম্ন বেতন কেন্দ্রসমেত ১৭৫, টাকার কম হতে পারে না। কেননা, বোম্বাই প্রভৃতির মত মাঝারি সহরে এই বায় কমপক্ষে মাসিক্ ২০০/ টাকার মত। গত 'পে কমিশন'এর হিসাব অনুযায়ীও এই বেতন সর্বনিম্ন বেতন। সুতরাং সরকারকে তার নিজস্ব কমিশন, কোর্ট ও বিঘোষিত নীতি মানতে হলে 'ননাস্কিলড্ স্টাফে' সর্বনিম্ন মাসিক ৯০, টাকা এবং কেরাণী প্রভৃতি 'সুপারভিসরি নন-গেজেটেড' কর্মচারীদের ২০০, টাকা দিতেই হয় এবং পূর্বেই বলা হয়েছে যে, অর্থাভাবের অজুহাত তুলে এই সর্বনিম্ন বেতনের দাবী প্রতিরোধ করার কোন নৈতিক অধিকার সরকারের নেই। এই ন্যূনতম বেতন যে সরকার দিতে অপারগ অথবা অক্ষম সে সরকারের বিষয় গ্রহণ করা উচিত—এই হল সরকারী 'ফেয়ার ওয়েজেস কমিটির' রায়। অথচ পশ্চিম বাংলা কংগ্রেস সরকার কর্মচারীদের এই একাগত যুক্তি-সঙ্গত দাবী যে শুধু উপেক্ষা করছে তাই নয়, যারা এই দাবী করছে তাদের শাস্তির ভিতেও দিয়া করছে না।

এ ছাড়াও এই সম্পর্কে পশ্চিম বাংলা সরকারের নীতি আর এক দিক হতে জঘন্যতর। কোন রাজ্যেই কংগ্রেসী শাসন জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশার প্রতি সহানুভূতি-শীল নয়; পশ্চিম বাংলার এই সহানুভূতিহীনতা সর্বাপেক্ষা নগ্ন। অন্য রাজ্যের চেয়ে এখানে কম বেতনের কর্মচারীদের মোট আয় অনেক কম। বেমন বোম্বাই প্রদেশে সরকারের অধীনে একজন বেয়ারা, চাপরাসী প্রভৃতি 'ইনফিরিয়র স্টাফ' পায় কমপক্ষে ৮৮৷৷-টাকা; পশ্চিম বাংলায় মেলে ৫৭৷৷- টাকা। প্রথমোক্ত প্রদেশে একজন কেরাণীর সর্বনিম্ন মাসিক আয় ২৩১, টাকা; এখানে সে ক্ষেত্রে হল ১০৫, টাকা। নিম্নপদস্থ কর্মচারীদের ক্ষেত্রে পশ্চিম বাংলা সরকার বোম্বাই সরকারের চেয়ে কম বেতন ও ভাতা দিলেও উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের বেলায় বেশী বেতন দেয়। বোম্বাই প্রদেশে 'প্রভিন্সিয়াল সার্ভিস-এর লোয়ার গ্রেড'এর বেতন ৩৫০, থেকে ৬৫০, টাকা; পশ্চিম বাংলার ৫০০, হতে ৬৫০, টাকা। আর 'হায়ার গ্রেড প্রভিন্সিয়াল সার্ভিস-এ' বোম্বাই দেয় মাসিক ৭৫০, টাকা, পশ্চিম বাংলা দেয় ৯১৫, টাকা। সুতরাং বুঝতে এতটুকুও কষ্ট হয় না যে, পশ্চিম বাংলার রাজ-রাজাদের রাজত্বে অবিচার হবার উপায় নেই! তৈলসিক্ত স্থানে তৈল প্রদান করেই।

এখন প্রশ্ন হল—এই সর্বনিম্ন মোট আয়ের মধ্যে কতটা মূল বেতন এবং কতটা মহার্ঘভাতা হবে? মূল বেতন স্থির করার সময় নিকট ভবিষ্যতে মূল্যমান (গ্রাইস লেভেল) কত-তত স্থির থাকবে তা বিবেচনা করতে হবে। গত 'পে কমিশন' ধারণা করেছিল যে, যুদ্ধপরবর্তী অবস্থার মূল্য-মানকে ১০০ ধরলে মূল্য ১৮৫— ২০০ সূচকের মধ্যে স্থির (স্টেবিলাইজড্) হবে। কমিশনির এ ধারণা বাস্তব ঘটনার ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে। শ্রীগ্যাডগিলের নেতৃত্বে মহার্ঘভাতার প্রশ্নটি বিবেচনা করার জন্য যে কমিশন বসান হয় তার মতে মূল্যমান ২৬৫—২৮৫ স্তরের নীচে আর নামবে না। মহার্ঘভাতা কমিশনের পক্ষে স্থিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরি-কল্পনায় জন্য বিরাট 'ডেফিসাইট ফিনান্সিংএ' গ্রাহারে মধ্যে আনা সম্ভব হয় নি। সাম্প্রতিককালে গজেন্দ্র সরকার কমিশন এই মত প্রকাশ করে যে, বেশ কিছু সময়ের মধ্যে মূল্যমান কমপক্ষে ৩২৫— ৩২৬ এর কম হবে না। আর বাস্তব ঘটনা হল—১৯৪৮ সাল হতে আজ পর্যন্ত কোন সময়ই মূল্যমান ৩৪২ এর নীচে নামে নি। সুতরাং নিঃসন্দেহে স্থিমান করা যায় যে, মূল বেতনকে ২৬৮—২৮৩ মূল্যমান স্তরে স্থির করা অন্যায় হবে না কিম্বা তাতে অসঙ্গত দাবীও করা হবে না। এই হিসাবে বেয়ারা, চাপরাসী প্রভৃতির মাসিক সর্বনিম্ন মূল বেতন ৫০, টাকা হওয়া দরকার, বাকি ৪৫, মহার্ঘভাতা। কেরাণীদের ক্ষেত্রে এই বেতন নানেপক্ষে ৮০, টাকা বাকি মহার্ঘভাতা। বলা নিষ্প্রয়োজন, এই হিসাব সর্বনিম্ন মজুরী, যুক্তি ও তথ্য 'রিজিড্ বুলি' অনুসরণ করলে এর চেয়ে বহু বেশী মূল বেতন সরকারী কর্ম-চারীদের দেয়া হবে।

এই প্রসঙ্গে বেসরকারী অফিসের কর্মচারীদের মূল বেতনের উল্লেখ সম্ভবতঃ অপ্রাসঙ্গিক হবে না। জয়েন্ট স্টক ব্যাঙ্কগুলিতে একজন পিওনের মাসিক মূল বেতন ৪০ টাকা হতে ৮০, টাকা; রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ৪০, টাকা হতে ৮০, টাকা। কেরাণীদের বেলায় জয়েন্ট স্টক ব্যাঙ্কগুলিতে ৮৫, টাকা হতে ২৪০, টাকা এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ১০০, হতে ৩০০, টাকা। পশ্চিম বাংলার সরকারের অধীনে এগুলে একজন বেয়ারা, পিওন প্রভৃতির বেতন মাসিক ২০, হতে ২৫, টাকা এবং কেরাণীদের বেলায় ৪৫, টাকা হতে ১৬০, টাকা। এই যে বিরাট পার্থক্য এর কি কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে?

মহার্ঘভাতার ক্ষেত্রেও এই অবস্থা লক্ষ্য করা যায়। পশ্চিম বাংলা সরকার তার কর্মচারীদের যে হারে মহার্ঘভাতা দিয়ে থাকে তা যে সওয়াগরী অফিসের কর্মচারীদের দেয় মহার্ঘভাতার চেয়ে যথেষ্ট কম তাই নয়; পশ্চিম বাংলার যে সব কেন্দ্রীয় সরকারে কর্মচারী আছেন তাঁরা যে হারে মহার্ঘভাতা পেয়ে থাকেন বিশ্বা বোম্বাই সরকার তার কর্মচারীদের যে হারে এই ভাতা দেয় এই উভয়বিধ হারের চেয়ে পশ্চিম বাংলা সরকারের দেওয়া হার অনেক কম। তাছাড়া পশ্চিম বাংলার অল্প বেতনের কর্মচারীদের বেলায় কম মহার্ঘভাতা দিলেও সরকার উচ্চ বেতনের অফিসারদের বেলাই হারে এই ভাতা দেয়। নীচের তালিকা এই সত্য প্রমাণকরবে।

বেতনের স্কেল	...কেন্দ্রীয়
২—৫০	০৪,
৫১—১০০	৫০
১০১—১৫০	৫৫
১৫১—২০০	৬০
২০১—২৫০	৬৫
২৫১—৩০০	৭০
৩০১—৪০০	৭৫

বোম্বাই	পশ্চিম বাংলা
৪০	২৫
৫০	৩৫
৫৫	৪০
৬০	৪৫
৬৫	৫০
৭০	৬০
৭৫	৭০

অল্প আয়ের কর্মচারীদের জন্য এই ভাতা বে বর্তমানে বহু গুণে বাড়ান দরকার সে সত্য অস্বীকার করা যায় না। মহার্ঘ-ভাতা সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা মতানৈক্য বে বিষয়ে ঘটে তা হচ্ছে "extent of neutralisation of the rise in the cost of living." Fair Wages Com-mittee

সর্বনিম্ন কর্মচারীদের ক্ষেত্রে শতকরা ১০০ হারে 'নিউট্রালাইজ' করার সুপারিশ করেছে: গত 'পে কমিশন্ও' এই মত ঘোষণা করেছে। এখন এই শতকরা ১০০ ভাগ 'নিউট্রালাইজেশন' টাকার অঙ্কে কি দাঁড়ায়? মহার্ঘভাতা কমিশন সিদ্ধান্ত করে যে, প্রতি ২০ পয়েন্ট 'মূল্য বৃদ্ধির জন্য ৫, টাকা হারে ভাতা বাড়ালে মোটামুটি পুরো 'নিউট্রালাইজেশন'

(ষষ্ঠ পৃষ্ঠায়)

কর্পোরেশনের ঋণের বিপুল টাকা কোথায় যায় ?

সাংবাদিক সম্মেলনে গোপন তথ্য ফাঁস

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

শ্রীকিশোরীলাল চনচনিয়া স্বনামধন্য ব্যক্তি। ভারত (মারওয়াড়ী) চেম্বার অফ কমার্সের প্রেসিডেন্ট তিনি। গত ছ-সাত বছর আবার ফিনান্স কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে কলকাতা কর্পোরেশনের উপর মোড়লী করছেন। উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া কাপড়ের বড় ব্যবসা করেন। অন্যান্য দশজনের মত শেয়ার মার্কেটের উপরও তাঁর সোনাদৃষ্টি। সরকারী ও আধা-সরকারী ঋণপত্র ক্রয়-বিক্রয়েও তাঁর সমান রুচি।

কর্পোরেশনের ৮ কোটী টাকার বাজেট তৈরী করেছেন তিনি। তাঁকেই তা পেশ করতে হবে কাউন্সিলরদের সামনে। এই সুযোগে তিনি সংবাদপত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ করবার চেষ্টা করলেন, [illegible] কি? নিজে চিঠি পাঠিয়েছেন, সব সংবাদপত্রের সংবাদ সম্পাদকদের কাছে, যেন তাঁরা নিজেরাই আসেন এবং তা সম্ভব না হলে রিপোর্টারদের পাঠান। কর্পোরেশনের জন-সংযোগ বিভাগ থেকে সব সংবাদপত্র অফিসে ঘন ঘন তাগিদ যায়, শ্রীচনচনিয়ার [illegible], আসবেন কিন্তু।

[illegible] ও তাঁর ডেপুটি মেয়রের [illegible] আর ধরে না। সাংবা- [illegible] তো এসেছেনই, তার উপর [illegible] কর্পোরেশন কর্ম- [illegible] পরিবৃত ছিল [illegible] শ্রীচনচনিয়ার। [illegible] চেয়ারে তিনি [illegible] বাঁ দিকে আছেন ফিন্যান্স [illegible] চীফ একাউন্টেন্ট শ্রী [illegible] শ্রীচনচনিয়ার মতই [illegible] তিনি সঙ্গে এনেছেন [illegible] ডেপুটি, কোট-প্যান্ট- [illegible] এক বান্ডিল [illegible] শ্রীচনচনিয়ার ডান দিকে [illegible] কর্পো- [illegible] সংস্থার নাম- [illegible] ভিন্ন স্বতন্ত্র। [illegible] কংগ্রেসী [illegible] নেতা শ্রীউপাধ্যায় [illegible] তাঁর পাশে ছিলেন।

[illegible] অভাব নেই। কেউ [illegible] খাবার সাজাচ্ছে, কেউ [illegible] চা ঢালছে, আর কেউ [illegible] কাগজের বান্ডিল [illegible] সামনে রাখছে। [illegible] কাজ তখনও আরম্ভ [illegible] নানা জনের নানা কথার [illegible] গোলমালে ঘরটি [illegible]।

কাগজের বান্ডিল

[illegible] ছাপান কাগজের বান্ডিল [illegible], কে যেন জানতে চাইলেন, [illegible] কি? অমায়িক লোক শ্রীচনচনিয়া। তাঁর উত্তর বাংলা করলে এই দাঁড়ায়: বাজেট সংক্রান্ত সব কাগজপত্র। এই ফিকে হলদে মলাটের যে বইটি দেখছেন, এটা হল কমিশনর সাহেব প্রথমে যে বাজেট তৈরী করেছিলেন তাই। আর অবাধান কাগজের এই যে মোটা ফাইল, ওটা হল ফিন্যান্স কমিটিতে আমরা যা আলোচনা করেছি তার পুরো রেকর্ড। ফুলস্কেপের ৫১৭ পৃষ্ঠা, ঠাসা ছাপা। ৩১ দিন আমরা মিটিং করেছি, প্রায় ২০০ ঘণ্টা। পরিশ্রম আমরা কি পরিমাণ করেছি তার প্রমাণ এতে মিলবে। আমি আনন্দের সঙ্গে বলছি যে ফিনান্স কমিটিতে কোন মতবিরোধ হয় নি। এই কমিটিতে কংগ্রেস এবং বিরোধী উভয় পক্ষের প্রতিনিধি আছেন। আপনারা পড়ে দেখবেন।"

শ্রীঅনিল মৈত্র কোনো কথা বলেন নি, কিন্তু তিনি ঈষৎ গ্রীবা সঞ্চালন করে শ্রীচনচনিয়ার কথায় সায় দিচ্ছিলেন।

জনৈক সাংবাদিক প্রশ্ন করলেন, "প্রেস কনফারেন্সে আপনার বক্তব্য কি?"

শ্রীচনচনিয়া: "এই এক সুযোগ হোচ্ছে একটু চা পান করবে আর কি? বক্তব্য কুছ্ নেই।"

পূর্বাহ্নেই তিনি তাঁর বাজেট বক্তৃতার প্রুফ কপি সব কাগজের অফিসে পাঠিয়েছিলেন। এখন সুন্দর নীল মলাটে বাঁধানো মসৃণ কাগজে ঝকঝকে ছাপা বক্তৃতার আর একটি কপি প্রত্যেককে দিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে এক নাতিদীর্ঘ টাইপ করা কাগজ পড়লেন। উদ্দেশ্য, রিপোর্টারদের বোঝান, তিনি কর্পোরেশনের বাজেটে কি কি বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। এখন কর্পোরেশনের বাৎসরিক আয় দাঁড়িয়েছে ৮ কোটি টাকার উপর। আর কিছুদিনের মধ্যেই আয় ১০ কোটি টাকায় পৌঁছবে।

কথায় কথায় কাপড়ের উপর আবগারী শুল্কের কথা উঠল। সেদিনই সকালে এই শুল্ক হ্রাস করে পার্লামেন্টে এক ঘোষণা করা হয়েছে। শ্রীচনচনিয়া বললেন, "দেখুন না, শুল্ক হ্রাস কোরায় হোলো, হোলো বাজারে কাপড়ের মিলগুলোর শেয়ারের দাম কত তেজী হোইয়ে উঠল। হামিই প্রথম জানতে পারলাম কি শুল্ক হ্রাস হোইয়েছে।"

—"তবে তো আপনি আজ শেয়ারের বাজারে বেশ দু'পয়সা করেছেন?"

শ্রীচনচনিয়া কোনো উত্তর করেন নি। কেবল একটু মুচকি হাসলেন। ভাবখানা এই, ওসব আমি হামেশাই করে থাকি। কিন্তু সে নিয়ে সর্বসমক্ষে কথা বলা পছন্দ করি না।

ঋণের টাকায় কি হয়

ক্রমে ক্রমে কর্পোরেশন তার ঋণের বিপুল পরিমাণ টাকা নিয়ে কি করে সে কথা উঠল। শ্রীচনচনিয়া ১৯৫২ সাল থেকে কর্পোরেশনের ফিন্যান্সের মাতব্বর হয়েছেন। এবং সেই থেকেই ঋণ তোলা হচ্ছে বছর বছর, কিন্তু ঋণের টাকা খরচ হচ্ছে না। এই কয়বছরে মোট প্রায় ৬ কোটি টাকা ঋণ করা হয়েছে। ৩ কোটিও খরচ হয় নি। বাজেট বক্তৃতায়ই তিনি জানিয়েছেন, এখন কর্পোরেশনের হাতে ঋণের টাকা পড়ে আছে ৩ কোটি ৩০ লক্ষ। এটা আনুমানিক হিসাব। অনেকে মনে করেন, আসলে হয়ত ৪ কোটি টাকাই হাতে পড়ে আছে।

যাদের থেকে ঋণ তোলা হয় তাদেরকে শতকরা ৪ টাকা কি তারও বেশী বছর বছর সুদ দিতে হয়। আনুমানিক যে টাকা হাতে পড়ে আছে, অর্থাৎ যা কর্পোরেশন বা কন্ট্রাক্টরদের কোনো কাজে আসে নি, তার উপর বছর বছর ১৩।১৪ লাখ টাকা সুদের জন্যই যায় হচ্ছে।

—"চনচনিয়া সাহেব, ঋণের অব্যবহৃত টাকাগুলো দিয়ে আপনারা করেন কি?"

প্রশ্নটিতে কর্পোরেশনের এই যাদুকর যেন আকাশ হতে পড়লেন। এ সম্বন্ধে তিনি কোনো খবর না-কি রাখেন না। কর্পোরেশন থেকে প্রস্তাব করে এর ভার সম্পূর্ণরূপে কমিশনার বি কে সেন এবং ফিনান্স অফিসার শ্রী পি. মিটারের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে।

শ্রী সেন উপস্থিত ছিলেন না। যতদূর আমাদের জানা আছে, এ ব্যাপারে তিনি বড় একটা মাথা ঘামান না। প্রকৃতপক্ষে ভার শ্রীমিটারকেই বহন করতে হয়। আর এ কথা কে না জানে যে শ্রীচনচনিয়ার ইঙ্গিত ছাড়া শ্রীমিটার ভাত অবধি খেতে যান না?

প্রশ্নগুলো কোনদিকে যাচ্ছে শ্রীচনচনিয়া চট করে বুঝে নিয়ে বললেন, আমার পাশেই শ্রী মিটার আছেন, ও'কেই জিজ্ঞেস করুন।

শ্রীমিটার প্রথমে আমতা-আমতা করে বললেন, আমরা টাকাগুলো ব্যাঙ্কে স্থায়ী আমানত হিসেবে রাখি।

নতুন ব্যাঙ্কের সঙ্গে যোগাযোগ

—"শ্রীচনচনিয়া কর্পোরেশনে আসবার পর কি কয়েকটি নতুন ব্যাঙ্কের সঙ্গে আপনারা লেন-দেন সুরু করেছেন?"

—"হ্যাঁ। দু-একটি।"

এর মধ্যে একটি হচ্ছে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক যার সঙ্গে শ্রীচনচনিয়ার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে শোনা যায়। কেন নতুন ব্যাঙ্কের সঙ্গে লেন-দেন সুরু করা হল, আজ অবধি তার কোনো সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ কর্পোরেশনের তরফে কেউ দেয় নি।

—"শ্রীমিটার; স্থায়ী আমানত ছাড়াও আপনারা অন্য উপায়ে ঋণের টাকা লগ্নি করে থাকেন এ কথা সত্য কি না?"

শ্রীমিটার বললেন যে কিছু টাকা দিয়ে গভর্ণমেন্টের প্রমিসরি নোট কেনা হয়েছে।

—"আমরা শুনেছি, আপনারা সরকারী ও আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানের পত্রও ক্রয় করে থাকেন।"

শ্রী মিটার স্বীকার করলেন যে, সরকার, পোর্ট ট্রাস্ট ও ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের পত্রও ক্রয় করা হয়।

এর পর শ্রীচনচনিয়াকে প্রশ্ন করা হয়: "প্রায় সর্বদাই বাজার দরের চাইতে বেশী দামে এসব পত্র ক্রয় করা হয়, একথা সত্য কিনা?"

বিনয়ের অবতার হয়ে ফিন্যান্স কমিটির চেয়ারম্যান বললেন, "এ ছোবের কোনো খোঁজ হামি রাখে না। শ্রী মিটার বলতে পারবেন।।"

চাপে পড়ে শ্রীমিটার স্বীকার করলেন যে এসব পত্র চলতি দামে কেনা হয় না, পূর্বের দিনের, দরে কেনা হয় "কারণ খবরের কাগজে ঐ দামই প্রকাশিত হয়।"

গত কয়েক বছরে নতুন কয়েকজন দালাল কর্পোরেশনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছে। কিন্তু ফিন্যান্স অফিসার ফিন্যান্স কমিটির সভ্যদেরও জানতে দেন নি কোন কোন দালালের মারফৎ কর্পোরেশন ঋণের টাকা লগ্নী করে থাকে। অন্য কোনো উপায় ছিল না তাই, শ্রীমিটার এসব দালালদের কয়েকজনের নাম প্রেস কনফারেন্সে প্রকাশ করেন।

জীবন-বীমার উদাহরণ

—"শ্রীচনচনিয়া, আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন, বিশেষত জীবন বীমা কর্পোরেশন কর্তৃক মুন্দ্রার শেয়ার ক্রয়ের ব্যাপারে যে কেলেঙ্কারী প্রকাশ পেয়েছে তার পর, যে আগের দিনের দরে পত্র ক্রয় করার চাইতে গর্হিত কাজ আর কিছু হতে পারে না।"

—শ্রীচনচনিয়া বললেন, "হামি হলে শেয়ার ইত্যাদি ক্রয় করবার ছোময় যে দাম থাকে সেই দামই দিতাম। বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া।"

—"হ্যাঁ, বিশেষ ক্ষেত্র, যেমন যদি আপনি জেসপ কম্পানীর উপর দখল বিস্তার করতে চান, আপনি বাজার দর অপেক্ষা বেশী দামে কিনবেন হয়ত।"

—"না, না, হামি জেসপ কম্পানী দখল করতে চাই না। তবে, কোনো অবস্থায়ই হামি অসলারের শেয়ার কিনতো না।"

এবার দেখা যাক্ শ্রীচনচনিয়ার আমলে ঋণ কি ভাবে তোলা হয়েছে। ১৯৫২ থেকে ১৯৫৭ অবধি চার বারে মোট প্রায় ৬ কোটি টাকা ঋণ করা হয়। এর মধ্যে তিনবার একই ইনসিওরেন্স কোম্পানী হতে এবং একই দালাল মারফৎ সম্পূর্ণ ঋণপত্রগুলো ক্রয় করা হয়। ঋণ তুলবার জন্য কোনো বিজ্ঞপ্তি অবধি দেয়া হয় নি। এমন কি, যে মুহূর্তে ঋণ তোলার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, সেই মুহূর্তেই দালালটি এবং ইনসিওরেন্স কোম্পানী একেবারে টাকা সমেত হাজির হয় এবং তাদের প্রস্তাব কোনো বাক্যব্যয় না করে গ্রহণ করা হয়।

(চতুর্থ পৃষ্ঠায়)

কলিকাতা বেতার কেন্দ্রে তরুণ শিল্পীদের প্রতি উপেক্ষা

দর্পণের প্রকাশিত বিবরণ সম্পর্কে লোকসভায় প্রশ্নোত্তর

দর্পণের ৭ই ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় আমরা তরুণ শিল্পীর প্রতিভা বিকাশে কলিকাতা বেতার কেন্দ্রের দ্বার কিভাবে রুদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে তার বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছিলাম। এই বিবরণ প্রকাশিত হওয়ার পর বিভিন্ন শিল্পী সংঘের কয়েকজন প্রতিনিধি এবং ব্যক্তিগতভাবে কয়েকজন শিল্পী আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন এবং উপেক্ষিত তরুণ শিল্পীদের কথা জনসমক্ষে প্রকাশ করায় তাঁরা যে আনন্দিত হয়েছেন একথাও আমাদের জানিয়ে গিয়েছেন। এ সম্পর্কে তাঁরা আমাদের আরও কিছু নূতন তথ্যও সরবরাহ করেছেন। এই তথ্যগুলি আমাদের বিশেষ প্রতিনিধি পরীক্ষা করছেন।

ইতিমধ্যে গত ৭ই মার্চ তারিখের দৈনিক স্বাধীনতা আমাদের বিবরণীটি উদ্ধৃত করেন এবং এই সম্পর্কে ১১শে মার্চ লোকসভায় শ্রী এম ইলিয়াস ও শ্রীমতী রেণু চক্রবর্তী তথ্য ও বেতার মন্ত্রী ডাঃ বি, ভি, কেশকারকে কতকগুলো প্রশ্ন করেন। তাঁদের প্রশ্নের জবাবে ডাঃ কেশকার বলেন যে, ঠিকা শিল্পীরা আকাশবাণীর কর্মচারী নহেন। আহূত হইয়া তাহারা আকাশবাণীর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগ দেন। তাঁহাদের অধিকাংশেই অন্য কোথাও নিযুক্ত আছেন এবং এই সকল কারণে আকাশবাণী হইতে তাঁহাদের কর্মচ্যুতির কোন প্রশ্নই উঠে না।

ডাঃ কেশকার আরও জানান যে, আকাশবাণীর প্রত্যেক কেন্দ্রেই ঠিকা শিল্পীদের এরূপ তালিকা আছে। যাঁহারা বেতার অনুষ্ঠানাদিতে যোগ দিতে চাহেন, শ্রোতা কমিটির দ্বারা পরীক্ষিত হওয়ার পর তাঁহাদের তালিকা প্রণয়ন করা হয়। গুণাগুণ অনুযায়ী শিল্পীদের পৃথক পৃথক তালিকা প্রণীত হয়। তবে ঐ সকল তালিকাভুক্ত শিল্পীদের অনুষ্ঠানাদিতে ডাকই হইবে—এইরূপ কোনও বাধ্যবাধকতা নাই। অপর দিকে, শিল্পীরাও স্বেচ্ছায় যে কোনও আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন।

শিল্পীদের গুণানুসারে এ, বি, ও সি তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রয়োজন মত শিল্পীদের উচ্চতর তালিকার অন্তর্ভুক্ত করার জন্য পুনরায় পরীক্ষা করা হইয়া থাকে। অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যাইতেছে যে, নিম্নতম শ্রেণীর অর্থাৎ সি তালিকাভুক্ত শিল্পীদের মান ক্রমেই অবনমিত হইতেছে। এ সম্পর্কে শ্রোতাদের নিকট হইতেও প্রচুর অভিযোগ পাওয়া যাইতেছে। ঐ সকল অভিযোগ অনুধাবনের পর কর্তৃপক্ষ সি তালিকাভুক্ত শিল্পীদের দীর্ঘস্থায়ী অনুষ্ঠান না দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

অপর দিকে, উক্ত শ্রেণীর শিল্পিগণ যাহাতে নিজেদের গুণাবলী বৃদ্ধি করিতে উৎসাহ বোধ করেন সেজন্য তাঁহাদিগকে নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠান ও ঐকতানাদিতে যোগদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং ঐ সময়ে যাঁহারা পারদর্শিতা দেখাইবেন তাঁহাদেরই উচ্চতর তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হইতেছে।

এই সকল কারণে ইহা পরিষ্কারভাবে দেখা যাইতেছে যে, ঐরূপ শিল্পীদের কর্মচ্যুতি করা বা সরাইয়া দিবার কোনও প্রশ্নই উঠিতে পারে না। এখন সমস্যা হইতেছে তাঁহাদের মানোন্নয়ন এবং তাঁহাদের পরিবেশিত সঙ্গীতাদি যাহাতে শ্রোতাদের বিরক্তির কারণ না হয়। সি তালিকাভুক্ত শিল্পীরা সাধারণত প্রতি তিন মাসে একটি অনুষ্ঠানে যোগদানের সুযোগ পান।

কাহারও কাহারও ক্ষেত্রে ঐরূপ সুযোগ লাভ করিতে ছয় হইতে এক বৎসর পর্যন্ত সময় লাগে। কারণ তাঁহাদের সংখ্যা খুবই বেশী। জীবিকারূপে তাঁহারা ইহা গ্রহণ করেন না এবং করাও সম্ভব নয়। সেজন্য এই ব্যবস্থার ফলে তাঁহাদের খুব অসুবিধা হয় তাহা বলা চলে না। বেতার প্রচার প্রতিষ্ঠানরূপে জনগণের প্রতি আকাশবাণীর যে কর্তব্য রহিয়াছে তাহা অনুযায়ী সঙ্গীত অনুষ্ঠানাদির একটি নিম্নতম মান বজায় রাখিতে হয়। যখনই নিম্নস্তরের সঙ্গীত সম্পর্কে বহু অভিযোগ ও প্রতিবাদ আসিতে থাকে, তখন উক্ত মান উন্নয়নের জন্য কর্তৃপক্ষকে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হয়। সি তালিকাভুক্ত শিল্পীদের দীর্ঘ অনুষ্ঠান না দেওয়ার ব্যবস্থা আকাশবাণীর সকল কেন্দ্রেই গৃহীত হইয়াছে; একমাত্র কলিকাতা কেন্দ্রেই নয়। ঐ শ্রেণীর যে সকল শিল্পী ক্রমেই নৈপুণ্য প্রদর্শন করিবেন তাঁহাদের উন্নততর তালিকাভুক্তি সম্পর্কে নিশ্চয়তা দিতেছি।

সি তালিকার কোন পরিবর্তনকে কর্মচ্যুতি বলা সঠিক হইবে না। অপর দিকে, আকাশবাণী তাঁহাদের সমবেত ঐকতানে যোগদানের সুযোগ দিতে আগ্রহশীল। অথচ বেতার শ্রোতাদের অভিমত গ্রহণ করিলে তাঁহাদের একেবারে বাদ দিতে হয়।

সিদ্ধার্থ রায়ের বিবৃতির সারাংশ

শ্রীরায় বলেন যে, বিগত দশ বৎসরে সরকার রাজ্যের নানাবিধ সমস্যাবলীর সমাধান করিতে পারে নাই বলিয়াই যে তিনি সরকার ও দল ত্যাগ করিতেছেন, তাহা নহে।

কিন্তু মন্ত্রী হিসাবে তাঁহার যে অভিজ্ঞতা হইয়াছে তাহাতে তিনি দেখিয়াছেন যে, সরকার এমন কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই, যাহাতে সমস্যাবলী দূর করার প্রকৃষ্টা বলিয়া আখ্যা করা যাইতে পারে। কার্যতঃ, তাঁহার মস্তিষ্ক-কালে তিনি বরং ইহাই লক্ষ্য করিয়াছেন যে, তাঁহারা একটি দুর্নীতিগ্রস্ত ও সাম্প্রদায়িক দিক হইতে দুর্বল জাতি গঠনেই সাহায্য করিয়াছেন এবং তিনি এই ট্রেন্ড সহযোগেই উপনীত হইয়াছেন। যে, সরকার ও কংগ্রেস দল বাঙ্গালা-দেশ ও বাঙ্গালীকে দ্রুত ধ্বংসের দিকে লইয়া যাইতেছে।

তিনি পরিষ্কারভাবে বলেন যে, সরকারী দলের কাহারও সহিত তাঁহার ব্যক্তিগত কলহ নাই এবং তিনি কংগ্রেস, দলের কোন উপ-দলের সহিত যুক্ত ছিলেন না। এই সরকার এবং এই দল রাজ্যের কোন কল্যাণ করিতে পারিবে না বলিয়াই তিনি সরিয়া দাঁড়াইতেছেন।

অতঃপর শ্রীরায় বলেন যে, ১৯৫৭ সালের মে মাসে [illegible] তিনি [illegible] যে, সর-[illegible] কতিপয় বিষয় [illegible] করেন। [illegible] ঐকমত্য [illegible] হইল, মন্ত্রীত্ব [illegible] বিধানসভার [illegible] ঐ সকল [illegible] তাহার [illegible] নেতাদের মধ্যে কয়েকজন মন্ত্রিত্বের [illegible] করিবেন। এই ঘটনা হইতেই ঐ মাত্র ব্যক্তিতে পরিষ্কারভাবেই বুঝা যাইতেছিল যে, দুর্নীতি-প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইতে যাইতেছে।

কংগ্রেস মুখ্যমন্ত্রীরা কখন [illegible] বলেন যে, ইহার পর হইতে সাব-কমিটি সম্বন্ধে তাঁহার কিছুমাত্র মোহ ছিল না। অতঃপর দেখা যায়, পরপর তিনটি বৈঠকে তিনি দুর্নীতি দমনের জন্য তিনি একটি পরিকল্পনাও করেন। তিনি বলিতে পারিয়াছিলেন যে, এই সাব-কমিটির কাজ আশ্চর্যভাবে কম সন্তোষ নহে, কারণ কোন কিছু করিতে হইলে কয়েকটি স্তরের উপরে আবার তাঁহাকে যাইতে হয় নাই। বাংলা কংগ্রেসের উপর তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে কর্তৃত্ব করিতেছেন, সেই বিবেকহীন কুচী, শিল্পপতি, ব্যবসায়ীদের এক অংশ আজিকার ভারতে [illegible] বিশেষত্বকে অনুসৃতি শ্রেণী। এই শ্রেণীই আজ তাহাদের দালালদের দিয়া কংগ্রেস চালাও এবং তাহাদের কথাই আইন। এই শ্রেণীর প্রভুত্বের ফলে বাংলা কংগ্রেসের নেতৃত্ব যাঁহাদের হাতে গিয়াছে, তাঁহাদের না আছে কোন পরিকল্পনা, না আছে কোন বিশ্বাসবুদ্ধি।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদ্য-মন্ত্রী কর্তৃক অনুসৃত 'দায়িত্ব-জ্ঞানহীন', 'বিপজ্জনক ও ধ্বংসা-ত্মক' খাদ্যনীতির কথা উল্লেখ করিয়া শ্রীরায় বলেন যে, তাঁহার অনেক সময় মনে হইয়াছে যে, খাদ্য দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী নিজে কি করিতেছেন, তাহাই তিনি জানেন না; কিন্তু পরে শ্রীরায় নিশ্চিতভাবে বুঝিতে পারিতেছেন যে, খাদ্যমন্ত্রীর বিবেক কারেমী স্বার্থবাদীদের স্বার্থ পরিচালিত হইতেছে। এই প্রসঙ্গে তিনি গত সেপ্টেম্বর মাসে নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যাদি আইন অনুযায়ী এক আদেশ জারী করিয়া ধান-চাউল সম্পর্কে জেলাসমূহকে কর্ডন করার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, রাজ্য সরকারের অনুমোদে পারমিট সংগ্রহ করিতে না পারিলে এক জেলা হইতে অন্য জেলায় পাঁচ সেরের বেশী ধান-চাউল লওয়া সম্ভব নহে। এই আদেশের পর, বিধিব পারমিট এবং সব লোককে দেওয়া হইয়াছে, বহিরাদের নাম আমরা জনসাধারণ জানিনে না।

এই সব পারমিট বেআইনি বিলি করা হইয়াছে তাহা আরও ভয়াবহ। তিনি বলেন যে, ব্যক্তিগতভাবে কাহারও বিরুদ্ধে অভিযোগ না করিয়াও তিনি বলিতে চাহেন যে, খাদ্য সংগ্রহ, সরবরাহ ও বণ্টনের ক্ষেত্রে সরকারের এমনভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত নয়, যাহাতে দেখা যায় যে, অনুরোধে উপরোধে প্রকাশ্যে ও সংগোপনে [illegible] করা হইয়াছে। লোকের মুখেই ব্যক্তিত হইতেছে। ইহার ফলে সুদূরপ্রসারী পারমিট কর্তনের ক্ষেত্রে সন্দেহের সৃষ্টি হয়। এই পারমিট প্রকাশ্যে ও সংগোপনে বিলিত হয় নাই এবং অন্যান্য মন্ত্রীদের বিশ্বাস করা হয় নাই। তাহার কতগুলি নির্দিষ্ট-ভাবে কতক লোকের নিকট নামে বা তাহাদের বেনামদারদের নামে দেওয়া হইয়াছে। এই সব লোকদের হয় খাদ্যমন্ত্রীর বাড়ীতে বা আফিসে, না হয় কংগ্রেস ভবনে গিয়া সমস্ত হইতে দেখা গিয়াছে।

এই পারমিট বিতরণের ক্ষেত্রে তিনি বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গে যে-ভাবে কর্ডন পদ্ধতি চালু হইয়াছে তাহাতে কেন্দ্রীয় সরকার অসন্তোষ প্রকাশ করেন। কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী রাজা সরকারের খাদ্য দপ্তরকে স্পষ্ট করিয়া বলেন যে, কর্ডন পদ্ধতি প্রত্যাহৃত হওয়া আবশ্যক এবং তাহার পরিবর্তে রাজ্য সরকার কর্তৃক পশ্চিমবঙ্গের চাউল কলের উপর 'লেভি' ধার্য হওয়া আবশ্যক। এই ব্যবস্থায় কলের মালিকগণ উৎপাদিত চাউলের একাংশ রাজ্য সরকারের নিকট বিক্রয় করিতে বাধ্য থাকিবে। এই জন্য কেন্দ্রীয় সরকার চাউল কলের উপর লেভি ধার্যের একটি আদেশ-নামার খসড়া পাঠান, যাহা রাজ্য সরকার কর্তৃক ১৯৫৫ সালের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আইনের বলে চালু করা হইবে। কিন্তু খসড়া অসেশনামা চূড়ান্তভাবে বলিয়া মনে হয়। তিনি "সেইদিনই ট্রেডের গার্ডের ব্যাপারে দেশরক্ষা মন্ত্রীর সহিত আলোচনার জন্য দিল্লী যাইতেছিলেন। তিনি এই চূড়ান্তভাবে আদেশের খসড়া পরিবর্তন করিয়া নূতন খসড়া আদেশ রচনার যাহাতে কেন্দ্রীয় খাদ্যদপ্তরকে রাজী করান যায় তাহার দায়িত্ব লইয়া যান।

সেই অনুযায়ী তিনি কেন্দ্রীয় খাদ্য দপ্তরের প্রধান সেক্রেটারী শ্রী বি বি ঘোষের সহিত ঐ বিষয়ে আলোচনা করেন। তিনি যখন দিল্লী সিয়াছিলেন তখন এই রাজ্যে খাদ্য-চাউলের মূল্য নিয়ন্ত্রণের এক আদেশ বলবৎ ছিল। ১৯৫৮ সালের ৩০শে জানুয়ারী তারিখে প্রদত্ত ঐ অর্ডার অনুযায়ী ধান-চাউল প্রভৃতি অত্যাবশ্যক দ্রব্য নির্দিষ্ট দরে ক্রয়-বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এই নিয়ন্ত্রণ আদেশে বিভিন্ন ধরণের আমন ধান-চাউল সর্বোচ্চ কত মূল্যে বিক্রয় করা যাইবে তাহা নির্দেশ করা ছিল। এই নির্দিষ্ট দর বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, পশ্চিম দিনাজপুর জেলার চালু ছিল। ঐ নির্ধারিত দর অপেক্ষা বেশী দরে ধান-চাউল বিক্রয় বেআইনী ও অত্যাবশ্যক আইন অনুযায়ী দণ্ডনীয় অপরাধ। তিনি যখন দিল্লী ছাড়েন তখন তিনি জানিতেন না যে, পশ্চিমবঙ্গে ঐ অর্ডার বলবৎ আছে। তিনি নিশ্চিত করিয়া বলিতে পারেন যে, প্রকৃত অবস্থা খাদ্যমন্ত্রী, পুলিশমন্ত্রী ও মুখ্য-মন্ত্রী ব্যতীত কোন মন্ত্রী জানিতেন না। কেন্দ্রীয় খাদ্য দপ্তরের প্রধান সেক্রেটারী শ্রী বি বি ঘোষ যখন তাঁহাকে জানান যে লেভি অর্ডার পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলার চালু করার পক্ষে যেমন অসুবিধা হইতে পারে তেমনি নিয়ন্ত্রিত দর অপেক্ষা বেশী হারে চাউলের কলের মালিকদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া আর্থিক দিক হইতেও সুবিধার নয়, তখন তিনি বিস্মিত হন।

তিনি তখন শ্রীঘোষকে জানান যে, মূল্য নিয়ন্ত্রণের আদেশ সমস্ত জেলাতেই প্রযোজ্য বলিয়া তিনি জানেন। তখন শ্রীঘোষ বলেন যে, ইহা হইলে কেন্দ্রীয় সরকার সম্ভবতঃ সারা রাজ্যে ঐরূপ লেভি অর্ডার প্রবর্তন করা সমর্থন করিবেন না। তিনি শ্রীঘোষের কথার যৌক্তিকতা উপলব্ধি করেন। তখনই তিনি কেন্দ্রীয় দপ্তর হইতে রাজ্য খাদ্যমন্ত্রীর সহিত টেলিফোনে কথা বলেন। তখন খাদ্যমন্ত্রী তাঁহাকে (শ্রীরায়কে) বলেন যে, ঐ অবস্থায় তিনি কেন খসড়া অর্ডারটি এমন-ভাবে করাইয়া আনেন যাহাতে তখন বেআনে প্রয়োজন মনে করিবেন রাজ্য সরকার তখন সেখানে সেই আদেশ প্রয়োগ করিতে পারেন। তখন তিনি খাদ্যমন্ত্রীকে কেন্দ্রীয় খাদ্য সেক্রেটারী শ্রীঘোষের সহিত আলাপ করিতে বলিয়া-ছিলেন। খাদ্যমন্ত্রী তখন শ্রীঘোষের সহিত কথা বলেন। ইহার ফলে তখন লেভি অর্ডার চূড়ান্তভাবে রচিত হয় এবং ইহাতে স্থির থাকে, রাজ্য সরকার সেক্রেটে নির্দিষ্ট এলাকা ও তারিখ ঘোষণার দ্বারা ঐ অর্ডার প্রবৃত্ত করিবেন।

বিভিন্ন এলাকার জন্য বিভিন্ন তারিখ নির্দিষ্ট হইতে পারে। অতঃপর তিনি উপলব্ধি করেন যে, কোথাও এমন কোন গলদ আছে যাহা ঠিক করিতে না পারিলে পশ্চিমবঙ্গের মাত্র পাঁচটি জেলার লেভি অর্ডার চালু করার কোন অর্থ হয় না। পরের দিন তিনি দিল্লী হইতে ফিরিয়া আসিয়া সাক্ষাৎ মুখ্যমন্ত্রীর সহিত তাঁহার কথা বলেন। তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে সরাসরি বলেন যে, কর্ডন পদ্ধতি চালু করার সময় বেআবে পার্লামেন্ট বর্তন করা হইয়াছে তাহার বিষয়ে বিবিধ কথা তিনি শুনিয়াছেন। তিনি আরও বলেন যে, তিনি দিল্লী হইতে জানিতে পারিয়াছেন যে, পশ্চিম-বঙ্গের সব জেলায় চাউলকলসহ লেভি অর্ডার চালু করা রাজ্য সর-কারের পক্ষে সম্ভব হইবে না এবং পশ্চিমবঙ্গের মাত্র পাঁচটি জেলার দর নিয়ন্ত্রণ করা হইয়াছে। তাঁহার কথার মুখ্যমন্ত্রী বিস্ময় প্রকাশ করেন। তখন আমি জানিতে পারি যে, খাদ্যমন্ত্রী কর্তৃক অনুসৃত সন্দেহজনক খাদ্যনীতি সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রীও সব কিছু জানেন না।

মুখ্যমন্ত্রী প্রথমে তাঁহার সহিত একমত হইতেছিলেন না এবং

২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

পরিচ্ছন্ন ভ্রমণ

বড় বড় ষ্টেশনে বিনা খরচে কামরা পরিষ্কার করান যায়। পরিষ্কারকারীর সহায়তা নিলে যাত্রীরা নিজেরাই পরিষ্কার পরিবেশে যেতে পারেন। পরিচ্ছন্নতার কাজে সাহায্য করুন।

দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে

কি করে দুপয়সা আসে

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

দু'আনি, সিকি, আধুলীর এক বিরাট সমাবেশ। বনগাঁ থেকে সুরু করে, হাবড়া, গোবরডাঙ্গা, বারাসত গোরাবাজার—সব জায়গার প্রতি-নিধিরাই ঐ পকেটের ভিতর স্থান পেয়েছে। টাকা-পয়সাদের কোন ইউনিয়ন এখন পর্যন্ত হয়নি — তবে ভরসা আছে একদিন হবে এবং সেদিন ওরা স্টেশনে ষ্টেশনে আওয়াজ তুলবে চল্‌বেনা, চল্‌বেনা — পকেট ভরা চল্‌বেনা।

মুসলীম লীগের সহিত জাতীয় আওয়ামী দলের অদ্ভুত মতৈক্য

সামঞ্জস্যহীন সিদ্ধান্তের ফলে দলের সম্মুখে দ্রুত বিপর্য্যয়

(দর্পণের ঢাকাস্থ প্রতিনিধি)

জাতীয় আওয়ামি পার্টি দ্রুত একটা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে চলেছে বলে মনে হচ্ছে। পার্টির একটা সুষ্ঠু কর্মপদ্ধতি নির্ধারণে অক্ষমতাই এর কারণ। ধাপে ধাপে এগিয়ে যাওয়ার মত কোন পরিকল্পনার অভাবের ফলেই জনাব সুরাবর্দীর সঙ্গে মৌলানা ভাসানির বিচ্ছেদ ঘটে এবং গত বছর জুলাই মাসে জাতীয় আওয়ামি পার্টির জন্ম হয়।

গত সপ্তাহে ঐ পার্টি অন্যান্য পার্টির সঙ্গে কোয়ালিশনের সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা সুরু করেছে। মৌলানা ভাসানি এবং পূর্ব ফ্রন্টে ঐ দলের আরও কয়েকজন নেতা এতে সামিল হয়েছেন। আরও শোনা যাচ্ছে কোয়ালিশন সম্পর্কে আলাপ আলোচনার আওতা থেকে মুসলিম লীগ ও নিজামে ইসলামকেও বাদ দেওয়া হয় নি। [illegible] এসব আলাপ-আলোচনার উদ্দেশ্য হচ্ছে—আওয়ামী লীগ [illegible] আতাউর সরকারের কি করে পতন ঘটানো যায়। [illegible] জাতীয় আওয়ামি পার্টি [illegible] [illegible] দিক থেকে [illegible]

[illegible]

জাতীয় আওয়ামি পার্টি ও কৃষক-শ্রমিক পার্টির একীকরণ [illegible] করে [illegible] হয়। কৃষক-শ্রমিক পার্টির কয়েকজন নেতা আরও এককাঠি [illegible]। তাঁরা এ দুটো পার্টির মিলন চেয়েছেন এবং এর জন্যে তাঁরা মৌলানা ভাসানির পররাষ্ট্র ব্যাপারে নিরপেক্ষতা এবং যুক্ত নির্বাচনের নীতিও মেনে নিতে রাজী হয়েছেন।

পক্ষে জাতীয় আওয়ামি পার্টিতে যোগদানের পথে বাধা অপসারণ করাই এর উদ্দেশ্য। অবশ্য এরকম কোন পন্থায় কৃষক-শ্রমিক সদস্যগণ কোন আস্থার ভাব দেখায় নি। পূর্ব পাকিস্থান এসেমব্লীতে তারা যথাপূর্ব পৃথক দুটি উপদল হিসাবেই বসছে।

ঢাকায় যখন জাতীয় আওয়ামি পার্টি এবং কৃষক-শ্রমিক পার্টির মধ্যে কোয়ালিশনের আলাপ-আলোচনা সুরু হয় তখন করাচীর মুসলিম লীগ সমর্থকদের মধ্যে যেন উল্লাসের বান ডাকে। করাচীর প্রায় সমস্ত সংবাদপত্রই (মুসলিম লীগ সমর্থক) জাতীয় আওয়ামি পার্টি ও কৃষক-শ্রমিক পার্টির মিলন এবং আতাউর সরকারের পতন অবশ্যম্ভাবী বলে জোর প্রচার চালাতে থাকে।

কিন্তু বর্তমান সরকারকে দুর্বল করতে পারে এমন কোন কিছু সম্ভাবনার আভাস শেষ পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে না। আসলে জাতীয় আওয়ামি পার্টির নীরব সমর্থনই আতাউর সরকারের শক্তির উৎস; কারণ ঐ পার্টির তরুণ সদস্যরা মনে করে যে, আওয়ামি লীগের নীতি ও চিন্তাধারার সঙ্গে, তাদের পার্টির নীতি ও চিন্তাধারার সাদৃশ্য অনেকখানি।

অদ্ভুত সিদ্ধান্ত

পশ্চিম পাকিস্থানে জাতীয় আওয়ামি পার্টি এবং মুসলিম লীগের মধ্যে একটা মতৈক্য সাধিত হওয়ার আভাব পাওয়া যাচ্ছে। একে অবশ্য রিপাবলিকানদের বিরুদ্ধে জোট পাকানোর চেষ্টা বলেই অভিহিত করা হচ্ছে। আর এ ব্যাপারে যেটা সবচাইতে লক্ষণীয় সেটা হচ্ছে—মন্ত্রিসভার সদস্য-সংখ্যা, সামঞ্জস্যতার ব্যাপারে উভয়ে একমত হয়েছে বটে, কিন্তু 'এক ইউনিট' এবং নির্বাচন সংক্রান্ত প্রশ্নে তারা স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলবে বলে স্থির হয়েছে।

ব্যাপারটা অবশ্য খুবই অদ্ভুত ঠেকছে। কারণ ঐ এক ইউনিটের প্রশ্নেই প্রধানতঃ রিপাবলিকান পার্টির সঙ্গে জাতীয় আওয়ামি পার্টির বিরোধ বাধে। এক ইউনিটের প্রস্তাব বানচাল করার ব্যাপারে জাতীয় আওয়ামি পার্টিকে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল রিপাবলিকানরা তা পালন করে নি। সুতরাং এখন আবার ঐ প্রশ্ন ছেড়ে দিয়েও রিপাবলিকানদের সংগে আঁতাত করা—এটাকে অনেকেই পার্টির সুস্থ মনোভাব বলে মেনে নিতে পারছে না। অভিজ্ঞ মহলের ধারণা যে, জাতীয় আওয়ামি পার্টির এ-ধরণের কার্যকলাপে 'সুবিধাবাদ'কে যেভাবে প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে তাতে শুধু পশ্চিম নয় পূর্ব পাকিস্থানেও ঐ পার্টির মধ্যে ভাংগন দৃষ্টি অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে।

পূর্ব পাকিস্থানে আতাউর সরকারের ভিত্তি এখন পর্যন্ত বেশ পাকাপোক্তই রয়ে গেছে। প্রাদেশিক এসেমব্লীতে এ সরকারের সংখ্যাগরিষ্ঠতা এখন পর্যন্ত অটুটই [illegible] অধিবেশন চালাবার [illegible] বর্তমান সরকারকে কোন [illegible] হবে [illegible] কারণ

কৃষক শ্রমিক দলের প্রতি সন্দেহ

কিন্তু জাতীয় আওয়ামি পার্টির সাধারণ সদস্যগণ ব্যাপারটাকে অত সহজ বলে ভাবতে পারছেন না। বরং তাঁরা কৃষক-শ্রমিক পার্টির আন্তরিকতায় সন্দেহ প্রকাশ করছেন। সুতরাং জাতীয় আওয়ামি পার্টির নেতা জনাব জি এম সৈদ এবং জনাব এম এইচ ওসমানির চেষ্টা এ বিষয়ে বেশীদূর এগুতে পারে নি।

এরকম একটা গুজবও ছড়িয়ে পড়ে যে, পশ্চিম পাকিস্থানের এ সমস্ত নেতার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে যেন-তেন-প্রকারেণ আতাউর সরকারের পতন ঘটানো। জাতীয় আওয়ামি পার্টির সাধারণ সদস্যগণ তাদের সংকল্পে পূর্ববৎ দৃঢ় থাকে এবং এমনও শোনা যাচ্ছে এ ব্যাপার নিয়ে জাতীয় আওয়ামি পার্টির একাংশের মধ্যে অসন্তোষ এত তীব্র হয়ে উঠেছে যে, কেউ কেউ দল ত্যাগ করার কথাও বলছেন।

এর পর সমাধানের একটা পথ অবশ্য খুঁজে বার করা হয়। পার্টিতে সদস্য গ্রহণ সম্পর্কে এরকম একটা প্রস্তাব [illegible] মত দেন যে, পার্টির কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে একমত হলেই [illegible] যে কেউ সদস্য হতে [illegible]। কৃষক-শ্রমিক পার্টির

মুজিবর—আতাউর বিরোধ

কিন্তু পূর্ব পাকিস্থানে আওয়ামি লীগ সম্পূর্ণরূপে অন্তর্দ্বন্দ্বমুক্ত একথা অবশ্য বলা চলে না। বস্তুতঃ লীগের সেক্রেটারী শেখ মুজিবর রহমান এবং মুখ্যমন্ত্রী জনাব আতাউর রহমানের মধ্যে বিরোধ ক্রমশঃই যেন বেড়ে চলেছে। শেখ মুজিবর রহমান শাসন সংক্রান্ত কতগুলি ব্যাপারে যেসব সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপর গুরুত্ব আরোপ করছেন, মুখ্যমন্ত্রী মনে করছেন, সেসব সিদ্ধান্ত কোয়ালিশনের অপরাপর দলের সদস্যদের মনঃপূত না-ও হতে পারে। তবে মুখ্যমন্ত্রীও বর্তমান পরিস্থিতিতে সন্তুষ্ট না এবং তিনিও বার বার মুখ্যমন্ত্রিত্ব ত্যাগ করার হুমকি দিচ্ছেন। কোয়ালিশনের, অন্যান্য দলীয় সদস্যদের মতামত গ্রহণ না করে জনাব রহমান যেসব হতাশাব্যঞ্জক বিবৃতি দিয়েছেন সেজন্যেও ঐসব সদস্যদের পক্ষ থেকে, তাঁকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে।

শেখ মুজিবর রহমানও তাঁর শক্তিবৃদ্ধির উদ্যম শিথিল করেন নি। সম্প্রতি তিনি মৌলানা ভাসানিকে দলে টানবার জন্যে নতুনভাবে চেষ্টা সুরু করেছেন। এবং এ প্রতিশ্রুতিও তিনি মৌলানা সাহেবকে দিয়েছেন বলে শোনা যাচ্ছে যে, তিনি যদি আওয়ামি লীগে ফিরে আসেন তাহলে পররাষ্ট্র ব্যাপারে লীগ ১৯৫৬ সালের নীতিতে ফিরে যেতেও প্রস্তুত। কিন্তু মৌলানা সাহেব এতে কোন সাড়া দেন নি।

সুরাবর্দির প্রতি মৌলানার বিতৃষ্ণা

অন্ততঃ এটা বেশ পরিষ্কার যে, জনাব সুরাবর্দী যতদিন আওয়ামি লীগে আছেন, ততদিন মৌলানা সাহেব সেখানে ফিরে যাওয়ার কোন চিন্তাকে মনে স্থানই দেবেন না। কারণ জনাব সুরাবর্দীর প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণা অত্যন্ত গভীর। শেখ মুজিবরের প্রতি কম হলেও, বিতৃষ্ণা তার ক্ষেত্রেও যে মৌলানা সাহেবের অন্তরে অনেকখানি দানা বেঁধে উঠেছে তা বেশ বোঝা যায়। এ সত্বেও মুজিবরের জন্যে তাঁর অন্তরে যে কোমলতা তা এখনও নিঃশেষে মিলিয়ে যায় নি। তাই, তার কথা উঠলে এখনও মৌলানা সাহেবের আঁখি ছলছল। মৌলানা সাহেবকে গভীর গলায় একথা প্রায়ই বলতে শোনা যায়—'রাজনীতির জগতে এই এতটুকু থেকে আমিই ওকে হাতে করে এতবড় করেছি।'

আভা মাইতির হিল্লে!

(দর্পণের সংবাদদাতা)

যার যত দোষই থাকুক না কেন, অতুল্যবাবুর কিন্তু একটী মহৎ গুণ আছে—তিনি তাঁর প্রীতিভাজন ও আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য অনেক কিছুই করে থাকেন।

সম্প্রতি তিনি শ্রীমতী আভা মাইতির (বিধানসভার প্রাক্তন সদস্যা) একটা হিল্লে করে দিয়েছেন। বর্তমানে তিনি কলকাতায় হ্যারিসন রোডে একটী অফিসের সর্বেসর্বা হয়ে বিরাজ করছেন। তাঁর সঙ্গে আছেন গত নির্বাচনে পরাজিত জনৈক প্রফেসার ভদ্রলোক।

তাঁরা দুজনে মিলে নাকি বাঙ্গলাদেশের গ্রামে গ্রামে খাদির ব্যবহার বৃদ্ধি ক'রবার জন্য বদ্ধপরিকর হ'য়েছেন।

তাঁদের এ বিশেষ কার্যের শলাপরামর্শের জন্য একটী কমিটিও নাকি প্রদেশ কংগ্রেস থেকে গঠিত হয়েছে। এ কথা বলাই বাহুল্য যে এই কমিটি অতুল্যবাবুরই মোটামুটি কুক্ষিগত। তাঁরই বশংবদ জন তিনেক বিশেষ ভাগ্যবান ব্যক্তিই এই কমিটির সভ্য।

এই খাদি সম্প্রসারিণী সভার মারফৎ বেশ কয়েক লক্ষ টাকা নাকি খরচা হ'বে। এ সভা টাকা তিনটি জায়গা গান্ধীস্মারক স্মৃতি-সভা, (২) অল ইন্ডিয়া খাদি এবং ভিলেজ ইন্ডাস্ট্রি বোর্ড, (৩) পশ্চিম বঙ্গ সরকার।

সমিতির কার্য অবশ্য সুরু হয়ে গিয়েছে। সমিতি কিছু কিছু অম্বর চরকা বিতরণ করতে আরম্ভ করেছে।

কিন্তু ইতিমধ্যেই নাকি যাদের কার্যে নিয়োগ করা হয়েছে, তাঁদের নির্ধারিত দৈনিক পাওনা মজুরি থেকে বঞ্চিত করে, কর্তৃপক্ষের নিজেদের লোকেরাই বেশ কিছু গুছিয়ে নিতে তৎপর হয়ে উঠেছেন।—শোনা যাচ্ছে যে অতুল্য বাবুর একজন বিশেষ পেটোয়া লোক,—মুর্শিদাবাদের জনৈক কংগ্রেস এম. এল, এ, অল্প সময়ের মধ্যেই কিছুটা গুছিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছেন।

কার্যসূচী থেকে ধরে নিতে আমাদের বিশেষ অসুবিধা হবে না যে খাদির বার্তা বাঙ্গলা দেশের গ্রামে গ্রামে পৌঁছবার আগেই দেখা যাবে যে নির্ধারিত টাকার মোটা অংশটাই উঠে যাবে কর্তৃপক্ষের নিয়োজিত কর্তাব্যক্তিদের হাতে।

কংগ্রেস দলে বিরোধী গোষ্ঠি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

করা ডাঃ রায়ের পক্ষে সম্ভব না হয়, তাহলে, ২৮শে মার্চ পার্টির বৈঠকে খাদ্যমন্ত্রীর ভবিষ্যত বিপন্ন হবে। একথা ঠিক যে, ডাঃ রায় বিধানসভায় তাঁর বক্তব্য চূড়ান্তভাবেই বলবেন এবং বিধানসভায় বক্তৃতার দ্বারা যদি তিনি দলের লোকদের সংশয় খণ্ডন করতে না পারেন, তাহলে পার্টির বৈঠকে তাঁর বক্তৃতায় সেকার্য আর সম্পন্ন হবেনা।

অর্থাৎ ২৮শে মার্চ ডাঃ রায় প্রথম সুস্পষ্টভাবে খতিয়ান করতে পারবেন যে, পার্টি কতখানি কেন্দ্র-বিচ্যুত হয়েছে। এই খতিয়ান নিয়ে পরের দিন তিনি মন্ত্রিসভার বৈঠকে বিরোধীদের সম্মুখীন হবেন।

পার্টির বর্তমান মনোভাব সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যায় না, এইজন্য যে, ডাঃ রায় কি জবাব দেবেন এখনও তা অজ্ঞাত। প্রকৃতপক্ষে, ২৪শে মার্চ সিদ্ধার্থ রায়ের বক্তৃতার পর ২৫শে তারিখে ডাঃ রায় তাঁর জবাব দেননি প্রধানত এই কারণেই। তাঁর বক্তৃতা এবং অনাস্থা প্রস্তাবে ভোট দেওয়ার সময় — এই দুই-এর মধ্যে তিনি কোনো বড় ব্যবধান রাখতে চাননি। ডাঃ রায় ও নিজেও নিশ্চিত নন যে, তাঁর বক্তৃতা পার্টির সদস্যদের সকলকে সংশয়হীন করতে পারবে কিনা। কাজেই তাঁর বক্তৃতা এবং ভোটের সময় একবারে পাশাপাশি রাখা হয়েছে, যাতে অসন্তুষ্ট সদস্যেরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শের কোনো সুযোগ না পান।

ইতিমধ্যে একথা সুস্পষ্ট যে, মুর্শিদাবাদ এবং মেদিনীপুরের প্রায় ১৫।১৬ জন সদস্য এবং তাঁদের সঙ্গে বিভিন্ন জিলার কয়েকজন বিক্ষিপ্ত সদস্য মিলে কংগ্রেসের আভ্যন্তরীন বিরোধী গোষ্ঠীর মোট সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় ২০।২২ জন। পূর্ণ সম্ভাবনা আছে যে, একজন মন্ত্রীর নেতৃত্বে প্রায় ৭।৮ জন মুসলমান সদস্য পার্টির কেন্দ্র থেকে বিচ্যুত হয়ে এই গোষ্ঠীর সঙ্গে হাত মেলাতে পারবে। এঁদের মন্ত্রিসভা সম্পর্কে কিংবা খাদ্যমন্ত্রী ও পুলিশমন্ত্রী সম্পর্কে নূতন করে মনোভাব তৈরী করার কোনো প্রশ্ন নেই— বিরোধিতার দিকে এঁরা নিশ্চিত পদক্ষেপ ইতিমধ্যেই করেছেন। তথাপি, ডাঃ রায়ের জবাব শোনার উপর কেন গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে, এই প্রশ্ন উঠতে পারে। আসলে ডাঃ রায়ের বক্তৃতা শোনার পর এঁরা নিজেদের মনোভাব ততখানি নয়, যতখানি কর্মপন্থা নির্ধারণ করবেন। বিরোধিতার মাত্রা কোন্ উচ্চগ্রামে তোলা হবে, তাঁরা সরাসরি দুইজন মন্ত্রীর পদত্যাগ দাবী করবেন, অথবা পার্লামেন্টারী পার্টি কর্তৃক কোনো কমিটি নিয়োগের প্রস্তাব করা হবে —এই সিদ্ধান্ত গুলি ডাঃ রায়ের বক্তৃতার ফলাফলের উপর নির্ভর করছে।

বুধবার এই বিরোধী গোষ্ঠীর কিছুসংখ্যক সদস্য ডাঃ রায়ের সংগে বিধানসভা ভবনে সাক্ষাৎ করেছিলেন। সেই সাক্ষাৎকারের সময় ডাঃ রায়কে তাঁরা নিজেদের মনোভাব ও দৃঢ়তার কতকটা আভাষমাত্র দিয়েছেন। খোলাখুলি কথাবার্তা যেটুকু হয়েছে, তার মধ্যে অবশ্য সাংঘাতিক কিছু ছিলনা —তাঁরা পার্টির বৈঠক ২৮শে তারিখ এবং ২৯শে তারিখ — উপর্যুপরি দুইদিন চেয়েছেন। কিন্তু ডাঃ রায়ের পক্ষে অনুমান করা কঠিন ছিলনা যে, কতখানি সাহস সঞ্চয় করলে এবং পার্টির মধ্যে কি ধরনের মনোভাব সৃষ্টি হলে পর কংগ্রেসের এতাবৎ ম্রিয়মান সদস্যেরা এই সাক্ষাৎকারের জন্য এগিয়ে আসতে পারেন।

সম্পাদকীয় :

শ্রীরায়ের বক্তৃতায় নাকি খালি কতকগুলো ভাসা ভাসা অভিযোগ করা হয়েছে। কালী মুখার্জির বিরুদ্ধে শ্রীরায় খুবই ক্রুদ্ধ কিন্তু তিনি নাকি তাঁর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ উত্থাপন করতে সক্ষম হননি। অথচ আমরা দেখছি চপলাকান্ত বাবুর সম্পাদকীয় যেদিন প্রকাশিত হয়েছে ঠিক সেদিনই [illegible] কাগজের চীফ রিপোর্টার লিখছেন, "প্রসঙ্গক্রমে শ্রীরায় সরাষ্ট্র (পুলিশ) দপ্তরের মন্ত্রী কালীপদ মুখার্জির নাম খাদ্য ও সরবরাহ মন্ত্রী শ্রীসেনের সহিত উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, তিনি দেখিয়াছেন, রাজ্যসরকারের সমস্ত অনুগ্রহ বিতরণের ক্ষমতা এই দুই জনের হাতেই একচেটিয়া হইয়াছে।"

সম্পাদকীয়র উপসংহারে চপলাকান্ত বাবু শ্রীরায়ের বিবৃতির যোগ্য জবাবের জন্য সাগ্রহে ডাঃ রায়ের দিকে তাকিয়েছেন।

সম্পাদক—শ্রীব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য

সম্পাদক কর্তৃক মডার্ণ ইন্ডিয়া প্রেস, ৭নং ওয়েলিংটন স্কোয়ার, কলিকাতা—১৩ হইতে মুদ্রিত এবং ৭নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা—১৩, দর্পণ কার্যালয় হইতে প্রকাশিত।

Regd.: No.C 4079

১বর্ষ, ১০ম সংখ্যা

দর্পণ

সাপ্তাহিক সংবাদ সাময়িকী : কলিকাতা-৪ঠা এপ্রিল, শুক্রবার ১৯৫৮ : মূল্য ২৫ নঃ পঃ

সিদ্ধার্থ রায় প্রসঙ্গে

অতুল্য বাবু নীরব কেন ?

(দর্পণের পর্যবেক্ষক)

ডাঃ রায় আর শ্রীঅতুল্য ঘোষের দাপটে এতদিন কংগ্রেস পার্লামেন্টারী দলের সভায় কোন কংগ্রেস সভ্যেরই টুঁ করবার জো ছিল না। "কর্তার ইচ্ছায় কের্ত্তন" এই ছিল সেখানকার রীতি। এই জো-হুকুম কংগ্রেসী সদস্যদের অন্ততঃ কয়েকজন যে আজ বুকের পাটা দেখিয়ে ডাঃ রায়কে প্রশ্নের পর প্রশ্নে বিব্রত করতে পারেন, এটা সত্যিই এক অভিনব পরিণতি।

সেদিন বিধান সভায় শ্রী-বিজয় সিং নাহার মহাশয় বল্লেন, "সিদ্ধার্থ তুমি বিভীষণের কাজ করেছ। তোমার অভিযোগগুলি কংগ্রেস পার্লামেন্টারী দলের সভায় বল্লে না কেন?" বাঘের বাচ্চা সিদ্ধার্থ বল্লেন, 'সিংহ মহাশয় আপনি পদত্যাগ করেছিলেন কেন?'—সিংহ মহাশয়ের আর গর্জ্জন শুনা গেল না। হট্টগোলের মধ্যে জনৈক কংগ্রেসী সদস্য চাপা গলায় বল্লেন, "সিদ্ধার্থ সত্যি কথা বলেছে। পার্লামেন্টারী দলের সভায় আমাদের কিছু বলবার উপায় নাই।"

ডাক্তার-ব্যারিষ্টার বাগ-বিতণ্ডার আর একাই পরিণতি কংগ্রেসী দলের মর্যাদাহানি।

অতুল্য-কালিপদ-নাহার-প্রফুল্ল-চক্র এর খানিকটা আঁচ পাবেন যদি এ'রা সিদ্ধার্থ রায়ের বিবৃতির কত কপি, লোক সাগ্রহে গলাধঃকরণ করেছে তার একটা হিসেব করেন। কংগ্রেস দল গত সাধারণ নির্বাচনে বিজয়ী হয়েছে। কিন্তু এই বিজয়ের পিছনে নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সমর্থন বিশেষ ছিল না। যে টুকু ছিল এবার সিদ্ধার্থের সমালোচনায় তারও ডরাডুবি হতে চলেছে। ডাঃ রায় কংগ্রেসের সমর্থনে যা বলেছেন তা বিত্তশালী শ্রেণীর মনোরঞ্জন করতে পারে। কিন্তু তিনি যে দুর্দশাগ্রস্ত নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নিকট আমল পান নি, তা স্পষ্ট।

সরকারের মর্যাদাহানি

মর্যাদাহানি সরকারেরও ঘটেছে। শুধু জনসাধারণের চোখেই নয়, সরকারী কর্মচারীদের চোখেও সরকার আজ হেয় প্রতিপন্ন হয়েছে। আমলা ও কেরাণীকুল পূর্ব থেকেই সরকারের উপর নানা কারণে ক্ষিপ্ত ছিলেন। সরকার যে ভবিষ্যতে তাদের সহানুভূতি ও সহযোগিতা হতে আরও অনেকটা বঞ্চিত হবেন তা বলা নিষ্প্রয়োজন।

এই রাজনৈতিক তাণ্ডবের আর একটি দিকও পর্যালোচনা করা দরকার। ব্যক্তিগতভাবে দেখলে ডাঃ রায়ের ও শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন মহাশয়ের মর্যাদা বেড়েছে কি?

ডাঃ রায় সিদ্ধার্থ রায়ের অভিযোগগুলি সম্পর্কে যে জবাব দিয়েছেন তাতে অন্ততঃ সংবাদপত্র পড়ুয়াদের অধিকাংশই সন্তুষ্ট হতে পারেনি। আইন সভার জবাব না দিতে পেরে সাংবাদিকদের ডেকে জবাব দেবার যে উপায় তিনি নিলেন, তাও তাঁর পক্ষে শোভনীয় [illegible] হয়নি। কংগ্রেস পার্লামেন্টারী দলের সভ্যদের নিকট এখন কৈফিয়ৎ দিতে হচ্ছে, [illegible] মর্যাদাহানিকর [illegible] হয়ে দাঁড়িয়েছে। [illegible] এই জন্য [illegible] কেটেছে [illegible] করা

(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আলোচনায়

নূতন তথ্যের অভাব : ভাষণ উদ্দীপনাহীন

পশ্চিম বঙ্গ বিধান সভায়

বিরোধী নেতাদের চিন্তাদৈন্যের পরিচয়

(দর্পণের রাজনৈতিক ভাষ্যকার)

সুশৃংখলভাবে কাজ চালাতে অপারগ হয়ে স্পীকার পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার বাজেট অধিবেশন অনির্দিষ্ট কালের জন্য মুলতুবী রেখেছেন। সরকারী বাস্তি বিল এবার পাশ করান গেল না।

বিশৃংখলা শুরু হয় মন্ত্রিসভার উপর অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে আলোচনাকালে। বস্তুত ঐ দিন সভায় এক বিরাট ঝড় বয়ে যায়। গত ১১ বছরে ঠিক এমনটি আর হয় নি।

কংগ্রেস সরকারের উপর অনাস্থা প্রস্তাবও এই প্রথম তোলা হয়। এর পটভূমি তৈরী করেছিল মন্ত্রিসভা থেকে শ্রীসিদ্ধার্থ রায়ের পদত্যাগ এবং পদত্যাগ ব্যাখ্যা করে দীর্ঘ বিবৃতি। কংগ্রেস সরকারের উপর এক হাত নিতে এর চাইতে বড় সুযোগ বিরোধীরা কল্পনাও করতে পারেন না।

কিন্তু আলোচনা যে ভাবে চলেছিল তাতে অন্তত বিরোধী পক্ষের উৎফুল্ল হবার কারণ নেই। বস্তুতঃ ঐ দিন বড় বড় বিরোধীদলগুলোর নেতারা যে ব্যর্থতা ও চিন্তা-দৈন্যের নিদর্শন রেখেছেন তার তুলনা বিরল।

গত ১০ বছরে ডাঃ রায়ের মন্ত্রিসভা তাঁর দায়িত্ব পালনে ব্যর্থকাম হয়েছেন কিনা বা বিকল্প সরকার গঠিত হলে অবস্থার উন্নতি কি অবনতি ঘটবে—এ সব প্রশ্ন এখানে অবান্তর। আসল কথা হচ্ছে, বিতর্কের ফলে বিরোধীরা তাদের কোনো উদ্দেশ্যই পালন করতে সক্ষম হন নি বরং কংগ্রেসকে শক্তিশালী করেছেন।

যেটুকু আঘাত কংগ্রেসকে সেদিন সহ্য করতে হয়েছে তা দিয়েছেন শ্রীসিদ্ধার্থ রায় নিজে। কিন্তু যে ভাবে ডাঃ রায়কে তাঁর বক্তব্য বলতে বাধা দেয়া হয় তাতে সিদ্ধার্থ বাবু কোনো সমর্থন জানাতে পারেন নি। তিনি মনে করেন যে ডাঃ রায় তাঁর অভিযোগের কোনো সদুত্তর দিতে পারবেন না। সুতরাং মুখ্যমন্ত্রীকে বলবার সুযোগ দিলে বিরোধী দলকে মন্ত্রিসভাকেই বেকায়দায় পড়তে হত।

অনাস্থা প্রস্তাব তুলবার সময় বিরোধীদলগুলো [illegible] করেন নি যে ভোটাভুটির ফলে মন্ত্রিসভার পতন ঘটবে। [illegible] উদ্দেশ্য ছিল সীমাবদ্ধ। [illegible] নিয়ে এবং কংগ্রেস পার্লামেন্টারী পার্টিতে [illegible] নষ্ট [illegible]। শ্রীসিদ্ধার্থ [illegible] পদত্যাগে এই [illegible] [illegible] মাধ্যমে [illegible] ফল হয়েছে উল্টো। প্রথমতঃ

বিরোধীদলের নেতাদের বক্তৃতা অত্যন্ত নীচুস্তরের হয়েছিল এবং তাঁরা পুরানো কাসুন্দি ঘাটা ছাড়া আর কিছুই করতে সক্ষম হন নি। যে সব কথা তাঁরা তুলেছেন তা হাজারবার হাজার রকমে গত কয়েক বছরের মধ্যে বলা হয়েছে। বক্তৃতাগুলো শুনে মনে হচ্ছিল, এর জন্য আর অনাস্থা প্রস্তাবের প্রয়োজন কোথায়, বাজেটের উপর কাট মোশনই তো যথেষ্ট।

কংগ্রেস সভ্যরা সেদিন সভায় এসেছিলেন অত্যন্ত বিমর্ষ ভাব নিয়ে। অনেকের মধ্যে ভয় ছিল, কি হয়, কি হয়। অচিরেই তাদের বিমর্ষ ভাব কেটে গেল। বিরোধী পক্ষের নেতা শ্রীজ্যোতি বসু দুঘণ্টা বক্তৃতা করেন। এক ঘণ্টার মধ্যেই কংগ্রেসী সভ্যদের মনমরা ভাব কেটে যায়। এমন কি, শ্রীপ্রফুল্ল সেনও মুচকি হাসতে শুরু করেন। কোনো সন্দেহ নেই, তার মধ্যেও আত্মপ্রত্যয় ফিরে আসে।

কংগ্রেস পক্ষে যত মতবিরোধই থাক না কেন এবং ডাঃ রায় সম্বন্ধে কোনো মহলে অসন্তোষের ভাব [illegible] থাকলেও, কেউ কল্পনা [illegible] [illegible] মন্ত্রিসভা থেকে তিনি সরে দাঁড়ান। প্রায় সব কংগ্রেস সদস্য [illegible] [illegible] করেন।

[illegible] যখন বিরোধীরা বলবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করলেন [illegible] কংগ্রেস সভ্যরা

অন্ততঃ একটি ইস্যু পেলেন যাতে তাঁদের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি করা যায়। যাঁরা শ্রী অতুল্য ঘোষ এবং শ্রীপ্রফুল্ল সেনের চাঁই যেমন শ্রী বিজয় সিংহ নাহার, শ্রীদুর্গাপদ সিং প্রভৃতি তাঁরাই অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে দেখা দিলেন আসরে—ডাঃ রায়কে অসম্মান করা হয়েছে, এর জবাব চাই। এই ধ্বনি তুলেই কংগ্রেসীরা পরের দুদিনও বিরোধীপক্ষের নেতাকে বলবার সুযোগ দিতে অস্বীকার করেন।

তবু যা হোক, শ্রীসিদ্ধার্থ রায়ের উপস্থিতির ফলে বিরোধী পক্ষের চূড়ান্ত ব্যর্থতা কিছুটা ঢাকা পড়েছিল শেষের দিকে। তাঁর বক্তৃতা তো মন্ত্রিসভার উপর, বিশেষ করে খাদ্যমন্ত্রীর উপর, তীব্র আঘাত করেছিলই—যা সেদিন আর কেউ পারেন নি।

তিনি কংগ্রেসকে সর্বাধিক বেকায়দায় ফেলেছিলেন ডাঃ রায় মন্ত্রিসভার দুর্নীতি-বিরোধী সাব-কমিটির রিপোর্ট বলে দেখাতে চেয়েছিলেন তার অস্তিত্ব চ্যালেঞ্জ করে। মুখ্যমন্ত্রীকে শেষ পর্যন্ত স্বীকার করতে হয় যে তাঁর কাছে আসল দলিলটি নেই. তিনি পড়ছেন "সেই দলিলের ভিত্তিতে রচিত ক্যাবিনেট সেক্রেটারীর রিপোর্ট থেকে।"

এর পূর্বেই সভায় অভিযোগ প্রকাশ করা হয়েছিল যে সিদ্ধার্থ বাবুর বক্তব্য অপ্রমাণ করবার জন্য জাল দলিল তৈরী করা হচ্ছে। এ সত্ত্বেও কেন যে ডাঃ রায় আসল দলিল সমেত সভায় আসেন নি তা দুর্বোধ্য।

ডাঃ রায়ের স্বীকারোক্তির পর বিরোধীরা জয়োল্লাস করে উঠল। অন্যদিকে কংগ্রেসী সভ্যরা একেবারে হতভম্ব হয়ে পড়ল। কংগ্রেসী সভ্য শ্রী[illegible] ধর [illegible] প্রেস রিপোর্টারদের [illegible] চেষ্টা করলেন [illegible] দলিল সব নষ্ট করে ফেলা হয়।

[illegible] প্রস্তাবের আলোচনায় [illegible] সুস্পষ্ট [illegible] যথাসম্ভব শক্তি সমাবেশ করেছিলেন। [illegible] এর পূর্বে আর কোনোদিন উপস্থিত হয় নি। দর্শকের [illegible] লোকে লোকারণ্য। [illegible]

(শেষাংশ [illegible] পৃষ্ঠায়)

সম্পাদকীয়

[illegible]চন্দ্র কোন পথে ?

বাংলাদেশের গভর্ণমেন্টকে [illegible] সেই অন্ধকার গলির [illegible] ঢোকানো হয়েছিল — [illegible] সেই গলির মধ্যে, [illegible] তোষা মতলব, ভীতি-[illegible] এবং অনুগ্রহ বিতরণের [illegible] পার্টির শক্তি রক্ষা করা [illegible]। কিন্তু যেটুকু বাকি ছিল, [illegible] রায়ের পদত্যাগের পর [illegible] সম্পূর্ণ হয়েছে — অপরাধবৃত্তির এই জঘন্য চক্রান্তের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং [illegible] করেছেন। একথা এখনও কেউ বিশ্বাস করতে পারেনা যে, ডাঃ রায়ের মতো লোক আত্মরক্ষার চেষ্টায় কুৎসিততম জালিয়াতির প্রশ্রয়দাতা হবেন। একথা বিশ্বাস করা যায়না যে, তাঁরই কক্ষে বসে মিনিষ্টার অব ষ্টেট, ডেপুটি মিনিষ্টার এবং পার্লামেন্টারী সেক্রেটারীরা জাল রিপোর্ট তৈরীর সিদ্ধান্ত করবেন। হয়ত একথাও বিশ্বাস করা যায়না যে, ১০ বৎসরের মধ্যে ডাঃ রায়ের জন-চরিত্র এতখানি অধঃপাতগ্রস্ত হয়েছে। তথাপি, আমাদের দুর্ভাগ্য যে, বাস্তব ঘটনা ঐ বিশ্বাসের দিকেই অংগুলি নির্দেশ করছে।

দুর্ভাগ্য আরও চরম এই জন্য যে, কোনো কমিশন ডাকবার সৎসাহস তাঁর হয়নি। অথচ পৃথিবীর ইতিহাসে একথা কেউ শোনেনি যে, প্রেস কনফারেন্সে বিবৃতির দ্বারা ফৌজদারী অপরাধের অভিযোগ অপ্রমাণ করা যায়। কয়েকজন সংবাদপত্রের প্রতিনিধির কাছে কতকগুলি সই করা কাগজ দেখালেই যদি জালিয়াতির জটিল অভিযোগ খণ্ডন করা যেত তাহলে বহুদেশ [illegible] বিচারালয়গুলির কি দরকার ছিল?

একটা [illegible] থানে কিংবা [illegible] প্রেস কনফারেন্সের [illegible] খণ্ডনের সুযোগ [illegible] কিন্তু [illegible] মুখ্যমন্ত্রী [illegible] ও অশোক [illegible] কাগজের রিপোর্টারদের [illegible] [illegible] দিয়েই তাঁর সব অপরাধ

(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

বিরোধী নেতা হিসাবে জ্যোতিবাবুর অসার ভূমিকা

(১ম পৃষ্ঠার ৪র্থ কলমের পর)

কমিউনিস্ট সমর্থক দর্শকের গ্যালারীতে স্থান না পেয়ে কমিউনিস্ট পার্টির ঘরে ভীড় জমিয়েছে—বিরোধী পক্ষের নেতার সুবিধার জন্য যে লাউড-স্পীকার বসান হয়েছে তার চতুর্দিকে। এই লাউডস্পীকারে সভার কার্য শোনা হয়।

বেলা ২॥টায় অধিবেশন বসে। প্রথমেই মঞ্চ দখল করেন কমিউনিস্ট নেতা শ্রীজ্যোতি বসু। বিরোধী দলের নেতা হিসেবে তিনি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। বক্তৃতা দিয়েছিলেন দু'-ঘণ্টা। প্রথমে কিছুটা উত্তেজনা সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিলেন, শ্রীসিদ্ধার্থ রায়ের উক্তি উল্লেখ করে শ্রী প্রফুল্ল সেন ও শ্রী-কালীপদ মুখার্জির বিরুদ্ধে কতগুলো গরম গরম বিশেষণ প্রয়োগ করে।

উত্তেজনার আরেকটি কারণও ছিল। তিন খোলাখুলি "সৎ" কংগ্রেস সভ্যদের নিকট আবেদন করেন যেন তাঁরা তাঁদের নেতা-দের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। "আপনারা কেন কাপুরুষের মত ব্যবহার করেন? আপনাদের কি আফিং খাইয়ে রাখা হয়েছে না কি আপনাদের উপরে চাবুক প্রয়োগ করা হয় [illegible] শ্রীনেপাল রায় [illegible] যিনি পূর্বে [illegible] ছিলেন, [illegible] থাকতে পারলেন না। তিনি বাঁধা 'সিলিং বিলের' মধ্যেই সভার দিতেই একটা হট্টগোল হওয়ার উপক্রম হয়। ডাঃ রায় তাঁর অনুগামীদের শান্ত থাকতে উপদেশ দিলেন। কিন্তু নেপাল বাবু সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। "আমাদের কেন এ ভাষায় আক্রমণ করবে?"

ডাঃ রায় নেপাল বাবুর দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন: "বলতে দাও না যা খুশী ও'র। তোমাকে কেউ চোর বললেই কি তুমি চোর হয়ে গেলে।" শ্রীনেপাল রায় আশ্বস্ত হয়ে বসে পড়লেন। কিন্তু আরেক দিক থেকে অন্য একজন কংগ্রেস সদস্য বলে উঠলেন: "জ্যোতি বাবু ভাষা আর সহ্য করা যায় না।"

এর পর গোলমাল থেমে গেল। জ্যোতিবাবুর দীর্ঘ বক্তৃতাকালে আর কেউ টু শব্দটি করেন নি। করার প্রয়োজনও হয় নি। একটা মোটা ফাইলে পয়েন্ট টুকে নিয়ে এসেছিলেন তিনি। রিপোর্টারদের সুবিধার্থে তাঁর বক্তব্যের নোটও তৈরী ছিল। এত করেও জ্যোতিবাবুর বক্তৃতা একেবারে ব্যর্থ হয়ে গেল।

তাঁর বক্তৃতা শুনে মনে হচ্ছিল যে তাঁর বক্তব্য সম্বন্ধে নিজেরই [illegible] একেবারে প্রত্যয় নেই। অন্যে যা [illegible] দিয়েছে তিনি তাই যন্ত্র-[illegible] মত উদ্গারণ করছেন।

উত্তেজনা প্রশমিত হয়ে গেল, কংগ্রেস বেঞ্চেও হাসি ফুটে উঠল। নেতা হিসেবে জ্যোতি বাবু সম্পূর্ণ ব্যর্থতার নিদর্শন রাখলেন।

মোট কথা, জ্যোতি বাবু অসন্তুষ্ট কতিপয় কংগ্রেস সদস্যের নিকট আবেদন করছিলেন যাতে তাঁরা তাঁদের দলত্যাগ করে বিরোধীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বিকল্প সরকার গঠনে সহায়তা করে। এর কোনো ফল হয় নি। ইতিমধ্যে একদিকে যেমন বিরোধীরা হতাশ হয়ে পড়েছেন, অন্যদিকে কংগ্রেসীরা আত্মস্থ হয়ে উঠেছেন। জ্যোতিবাবুর শেষ উক্তি শুধু কিছুমাত্র বিদ্রূপের ধ্বনি আকর্ষন করেছিল — কংগ্রেস বেঞ্চগুলো থেকে।

এর পরে ওঠেন ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ, প্রজা সমাজতন্ত্রী নেতা। তাঁর বক্তৃতা আরও নিম্ন স্তরের হয়েছিল। আলোচনা আরও নিম্নধাপে পৌঁছে যায়।

ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা শ্রীহেমন্ত বসু কোনোদিনই বক্তা হিসেবে উল্লেখযোগ্য নন। তাঁর বক্তৃতা শুনবার জন্য যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন সদস্য মাত্র উপস্থিত থাকবেন তাতে আশ্চর্য কিছু নেই। লোক সেবক সংঘের শ্রীযুক্ত লাবন্যপ্রভা ঘোষ তাঁর বক্তৃতা লিখে এনেছিলেন। কি যে বললেন প্রেস গ্যালারী থেকে কিছুই শোনা গেল না।

যা হোক, ক্ষুদে দলদুটোর নেতা শ্রীযতীন চক্রবর্তী (আর, এস, পি) ও শ্রীসুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় (এস, ইউ, সি) কিছুটা উন্নত ধরনের ভাষণ দিয়েছিলেন কিন্তু ততক্ষণে আলোচনা যে অসারতার রূপ নিয়েছে তা থেকে তাকে উদ্ধার করা এই ক্ষুদে পার্টি দুটির নেতাদের ক্ষমতার বাইরে ছিল।

সেদিন বক্তৃতা শুনে মনে হচ্ছিল নেতাদের চিন্তায় যেন ঘুণ ধরেছে। অথবা বক্তব্য তাঁদের খুবই কম, এবং মুস্কিলে পড়েছিলেন লম্বা লম্বা বক্তৃতা করবার দায়িত্ব নিয়ে। কমিউনিস্ট পার্টির শ্রী বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়ও পুরানো অভিযোগের অবতারণা ছাড়া আর কিছুই করতে সক্ষম হন নি—সেই ওয়াসিল খাঁর মামলা এবং নতুন শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হওয়ার পূর্বে চা ও পাট বিদেশে বিক্রয়ের উপরে বিক্রয় কর স্থাপনে অস্বীকার।

আলোচনার গতি ফিরাতে সাহায্য করলেন প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শ্রী বিজয় সিং নাহার। তখন রাত প্রায় ৮টা। বিরোধী দলগুলো, বিশেষ করে কমিউনিস্টদের সম্বন্ধে, বহু কড়া কথা ছিল এবং এ নিয়ে সামান্য কিছু গোলমালও সৃষ্টি হয়। এসব ছিল গৌণ, তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল শ্রী-সিদ্ধার্থ রায়কে আক্রমণ করা। সিদ্ধার্থ বাবু যে জবাব দিয়েছিলেন তাতে শ্রীনাহারের মুখ ভোতা হয়ে গিয়েছিল এবং সমগ্র কংগ্রেস সদস্যদের বিচলিত করেছিল।

ডাঃ রায় কয়েকবার বলবার ব্যর্থ চেষ্টা করে হতাশ হয়ে বসে পড়লেন। এদিকে বিরোধী-পক্ষের বেঞ্চগুলোতে তুমুল হট্টগোল চলছে। কয়েকমিনিটের মধ্যেই সম্বিৎ ফিরে পেয়ে কংগ্রেসী সদস্যরাও সমবেত চীৎকারে মত্ত হলেন।

শ্রীজ্যোতি বসু উঠলেন বিতর্কের উত্তর দেবার জন্য। তাঁকে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল। কংগ্রেসীদের হট্টগোল এবার আরেক ধাপ এগিয়ে গেল।

কমিউনিস্ট সদস্য শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙার একটা মাইকের মধ্যে প্রথমে স্লোগান দিয়ে একটা গান গাইতে শুরু করলেন। অচিরেই একটি কোরাস গানের সুরে হলটি গম গম করে উঠল।

এর মধ্যে কমিউনিস্ট বেঞ্চের একজন, সম্ভবত শ্রীচোবে, স্পীকারের ন্যায়দণ্ডটি নিয়ে ছুটে। এদিকে শ্রী নেপাল রায় ও শ্রী দুর্গাপদ সিং ছুটলেন ন্যায়দণ্ডটি উদ্ধার করতে। কমিউনিস্ট ব্লকের সামনে ধস্তাধস্তি চলছে এমন সময় শ্রী হরেকৃষ্ণ কোঙার বিরাট লাফ দিয়ে দর্শকের একটি গ্যালারী পার হয়ে ন্যায়দণ্ডটি সমেত হলের বাইরে ছুট দিলেন।

সম্পাদকীয়ের শেষাংশ

খণ্ডন হয়ে যাবে? ' সে অপরাধ যতই কলংকজনক, যতই ক্রিমিন্যাল, গভর্ণমেন্টের পক্ষে যতই মারাত্মক হোক না কেন, তাঁকে কোনো আদালতের সম্মুখীন হতে হবেনা? প্রেস কনফারেন্সে কফির পেয়ালা কাজু বাদামের পিরিচের উপরে বাঙ্গালাদেশের ইতিহাসের জঘণ্যতম অপরাধের নিস্পত্তি হয়ে যাবে?

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় একথা ভুলে গেছেন যে, আড়াই কোটি লোকের বিবেক এবং সভ্যতা বোধের তিনি প্রতীক (মুখ্যমন্ত্রী শুধু এ্যাডমিনস্ট্রেশনের কর্ণধার নন) এবং তাঁর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উত্থাপিত হবে, যদি সে জালিয়াতির অভিযোগও হয়, তাহলে তার গুরুত্ব সাধারণ জালিয়াতির চেয়ে আড়াই কোটি গুন বেশী। সেইজন্যই সাধারণ আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলতে গেলে অভিযোগকারীকে কর্মাধিকরণের কাছে মামলা দায়ের করতে হয়, কিন্তু মন্ত্রী কিংবা মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠলে তাঁরা স্বয়ং আদালত কিংবা কমিশনের সম্মুখে নিজেদের সোপার্দ করেন। পৃথিবীর প্রত্যেকটি গণতান্ত্রিক দেশে এই নজীর স্থাপন করা হয়েছে। এবং এর কতাংশ অভিযোগ উঠলে মন্ত্রীরা তদন্ত কমিশনের সম্মুখে নিজেদের উপস্থিত করেছেন — কোমরে দড়ি বেঁধে তাঁদেরকে আদালতের সম্মুখে হাজির করতে হয়নি।

মুখ্যমন্ত্রী কি একথা একবারও চিংতা করেছেন যে, এই একটি কার্যের দ্বারা রাইটার্স বিল্ডিংসের নীতিবোধের উপরে কি প্রচণ্ড আঘাত করা হয়েছে? রাইটার্স বিল্ডিংসে প্রত্যেকটি সেক্রেটারী বিরোধীপক্ষের এই অভিযোগ বিশ্বাস করেছেন, অথবা তাঁদের মধ্যে সংশয় দেখা দিয়েছে। কেননা এটা সাধারণ বুদ্ধির কথা যে, তাঁদের কাছ থেকে ফাইল না নিয়ে, অথবা তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ না করে মন্ত্রীরা দুর্নীতির ব্যাপারে অথবা অন্য যেকোনো ব্যাপারেই হোক, কোনো রিপোর্ট তৈরী করতে পারেন না। তাঁদের অধিকাংশের অভিজ্ঞতা একথা বলছে যে, গত আট-দশমাসের মধ্যে এইরূপ কোনো ফাইল উপমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রমন্ত্রীদের কাছে যায়নি। অথচ আজ ডাঃ রায় সাংবাদিকদের দেখাচ্ছেন যে, কয়েকমাস পূর্বেই এই তথাকথিত দুর্নীতির রিপোর্টগুলি তৈরী হয়েছিল। এর পর যে সন্দেহ স্বাভাবিক, যে ঘৃণা অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত, তার থেকে মন্ত্রিমণ্ডলীকে কে বাঁচাবে? যে সমস্ত সেক্রেটারী এখনও সৎ এবং উচ্চমনা, তাঁদের, সম্মুখে মন্ত্রীদের মাথা চিরকালের জন্য হেঁট হয়ে রইল। যে সমস্ত কর্মচারী অসদুপায় এবং অন্যায়ের মধ্যে ইতিপূর্বেই নিমজ্জিত হয়েছে, মন্ত্রীরা তাঁদের চক্ষে সহকর্মীর মর্যাদা (!) লাভ করলেন। প্রফুল্ল সেন এবং কালীপদ মুখার্জির জন্য কোনো চিন্তা ছিলনা, কিন্তু বাঙ্গালাদেশের মুখ্যমন্ত্রীর মাথা যদি সেক্রেটারী-দের পায়ের তলায় এইভাবে লুণ্ঠিত হয় তাহলে কোন্ অধঃপাতের মধ্যে গভর্ণমেন্টকে নামানো হবে? পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিসভা প্রফুল্ল সেন কিংবা কালীপদ মুখার্জির নামে চলেনি, তার একটিই সাইন বোর্ড ছিল। বিধানচন্দ্র রায়ের নামাঙ্কিত সেই সাইনবোর্ড, ক্লেদ এবং কলঙ্কের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েছে।

(১০ম পৃষ্ঠার শেষাংশ)

জবাব ডাঃ রায় দিয়েছেন। কিন্তু তাতেও অনেক কুহেলিকা আছে। সিদ্ধার্থ রায় তাঁর সাংবাদিক সম্মেলনে দেখিয়েছেন যে, ওটা আসল জবাব নয়। ডাঃ রায় বিধানসভায় বলেছিলেন যে, সিদ্ধার্থ রায়ের স্বাক্ষরিত সাব কমিটির রিপোর্ট মন্ত্রিসভায় পেশ করা হয়েছিল। ডাঃ রায় এই উক্তি প্রমাণ করার জন্য ২টি ফাইলের পৃষ্ঠা দেখিয়েছেন। এবং সেগুলির ফটোস্টাট প্রতিলিপি কাগজে প্রকাশিত হয়েছে। সিদ্ধার্থ রায় বলছেন যে, ঐ ২টি কাগজের সঙ্গে সাবকমিটির রিপোর্টের কোনো সম্পর্ক নেই। যে কাগজের ছবি ছাপা হয়েছে, সেগুলি ফাইলের রেফারেন্স শিট।

সাবকমিটির রিপোর্টের নীচে সিদ্ধার্থ রায়ের সই দেখাতে পারলে প্রমাণ করা হত যে, রিপোর্ট তৈরী হয়েছিল এবং শ্রীযুক্ত রায় তাতে স্বাক্ষর করেছিলেন। ডাঃ রায় সে জিনিষ দেখাননি — নাকের বদলে নরুন দেখিয়ে দিয়েছেন।

অতুল্য ঘোষ নীরব কেন?

(১ম পৃষ্ঠার ৫ম কলমের পর)

সম্ভব নয়। তবে যাঁরা যে পেয়ে বসেছে, এই অনুভূতিটুকু তাদের এনেই যথেষ্ট।

কংগ্রেসের কুবের

তারপর শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন মহাশয়। সিদ্ধার্থ রায় তাঁকে যেভাবে মেরেছেন, এমন মার বোধ হয়, তিনি মন্ত্রীজীবনে আর কোনও দিন পাননি। যাঁরা ভেতরের খবর রাখেন, তাঁরা জানেন সেন মহাশয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের কুবের। যে নীতিতে তিনি কংগ্রেসকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য অর্থ সংগ্রহ করেন, তা কংগ্রেসীদের অনেকেরই মনঃপুত নয়। কিন্তু তাদের কিছু বলবার জো ছিল না। খাদ্যনীতি কার্যকরী করার ক্ষেত্রেও সেন মহাশয়ের সেই অর্থ সংগ্রহনীতিই প্রাধান্য পেত, এই সংশয় অনেক কংগ্রেসকর্মীর মনেই ছিল। এই নীতির ফলে খাদ্যমন্ত্রী, সরকার ও কংগ্রেস সকলেরই একদিন ভরাডুবি হতে পারে তাও কংগ্রেসসেবীদের অজানা ছিল না। এবার অর্থ সঞ্চয়নীতির নগ্নরূপ খানিকটা উন্মুক্ত করেছেন সিদ্ধার্থ রায়। তাই সেন মহাশয় বিচলিত এবং তিনি জনসাধারণ ও কংগ্রেসসেবীদের নিকট খানিকটা হেয় হয়ে পড়েছেন।

ঘোষ-নেতৃত্ব ধিক্কৃত

শ্রীঅতুল্য ঘোষ মহাশয়ও সিদ্ধার্থ রায়ের হাতে কম নাজেহাল হননি। ঘোষ মহাশয়ের বিদ্যাবুদ্ধি ও রাজনৈতিক জ্ঞানের উপর কটাক্ষপাত করা হয়েছে। তাঁর নেতৃত্ব ধিক্কৃত হয়েছে। ঘোষ মহাশয়ের দুর্নীতি নিবারণে আন্তরিকতা নেই—এই অভিযোগও করা হয়েছে। কিন্তু তিনি নীরব, বোধ-হয় অতুল্যবাবু সিদ্ধার্থ রায়ের জবাব দেওয়া পদমর্যাদাহানিকর মনে করেন। তিনি হয়ত ভেবেছেন কংগ্রেসের মর্যাদাহানিতে তাঁর কিছু আসে যায় না; সরকারের মর্যাদাহানিতেও তাঁর কিছু করার নেই; ডঃ রায় সরকার পক্ষ সমর্থনে কোমর বেঁধেছেন। কিন্তু কংগ্রেসী নেতৃত্বের পক্ষে সমর্থনে দাঁড়াবার কেউ নেই। তবে কি জনসাধারণ সিদ্ধার্থ রায় কংগ্রেসী নেতৃত্বকে যে অপবাদ দিলেন, তা সত্য বলে ধরে নেবেন?

তুরীয় অবস্থায় অতুল্য ঘোষ

শ্রীঘোষ তুরীয় অবস্থায় থাকলেও সব কংগ্রেসকর্মী তাঁর দশাপ্রাপ্ত হননি। অন্ততঃ মুষ্টি-মেয়ের ভাবনা কংগ্রেসী নেতৃত্বকে শোধরাবার দিকে এগিয়েছে। তাঁরা চান প্রদেশ কংগ্রেসের পরিচালনায় তাঁদের মতামত প্রতিধ্বনিত হ'ক। উপায়? শ্রীঘোষ স্বেচ্ছায় গদী ছাড়বেন না, এ তাঁরা জানেন। ভোটের জোরেও তাঁকে সরান যাবে না—এ কথাও তাঁদের অবিদিত নয়। কংগ্রেসের সর্বভারতীয় নেতৃত্ব কয়েক মাস পূর্বে এই মর্মে এক প্রস্তাব গ্রহণ করেন যে, একই ব্যক্তি এক সঙ্গে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ও পার্লামেন্টের সদস্য থাকতে পারবে না। প্রস্তাব পাশের পর শ্রীঘোষও সংবাদপত্র মারফৎ ঘোষণা করেন, তিনি পার্লামেন্টের সদস্যপদ ত্যাগ করবেন। ঘোষণা আর কার্যে পরিণত হল না। ঘোষ মহাশয় যদি সভাপতির পদ ছাড়েন তবে ভাল কথা। না হয় পার্লামেন্টের সদস্যগিরি ছাড়ুন। এই দুয়ের একটি করলেও তাঁর ক্ষমতা-লোলুপতার মোহ যে খানিকটা কেটেছে তার পরিচয় পাওয়া যাবে। কয়েকজন কংগ্রেস কর্মী এই বিষয়ে দিল্লীতে দরবার করতে পারেন বলে জানা গেল।

এদিকে কংগ্রেস পার্লামেন্টারী দলের সভ্যদেরও অনেকে মনে করেন, শ্রীসেন মহাশয়ের হাতে আর [illegible] থাকা উচিত নয়। তাঁদের দাবী আপাততঃ হয়ত গ্রাহ্য [illegible] পারে। কিন্তু সেন [illegible] রাজনীতিতে যে আর বেশী [illegible] স্বেচ্ছাচারিতা চালিয়ে যেতে পারে তা মনে হয় না।

অতি সস্তায় ও সব রকম দায়ে

মোটর, অগ্নি ও শ্রমিক

বীমার জন্য

বা

গাড়ী ট্রাক প্রভৃতি সুবিধামত

কিস্তিবন্দীতে কেনার জন্য

অনুসন্ধান করুন:

মেসার্স এস এন বোস

এণ্ড

কোম্পানী

প্রাইভেট লিমিটেড

১০১-সি, বালিগঞ্জ প্লেস,

কলিকাতা-১৯।

(টেলিঃ ৪৬-১৮৮৫)

এজেন্ট

ন্যাশনাল এমপ্লয়াস

মিউচুয়াল

জেনারেল ইনসিওরেন্স

এ্যাসোসিয়েশন লিমিটেড

ইংলণ্ডে সমিতিবদ্ধ

চা শিল্পে

বিদেশী একচেটিয়া অধিকার

[সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার এম. এল. এ]

ভারতের জাতীয় অর্থনীতিতে তরুণের পরামর্শদাতা। বিভিন্ন চা-শিল্পের স্থান অত্যন্ত গুরুত্ব-পূর্ণ। বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনের দিক দিয়ে এর স্থান সর্বপ্রথমে। তাছাড়াও এর গুরুত্ব কতখানি সে কথা নিম্নলিখিত তথ্যগুলি থেকে বোঝা যাবে। ১৯৫৬-৫৫ সালে এই শিল্প থেকে রপ্তানী ও আমদানী শুল্কে বাবদ কেন্দ্রীয় সরকারের আয় হয়েছে প্রায় ২৩ কোটি টাকা। ভারতীয় প্লাইউড শিল্প এরাই উপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে এবং ১৯৫৪ সালে চা-বাগানগুলিকে প্রায় আড়াই কোটি টাকা ঋণদেয় চা-বাগ মরবরাহ করেছে। এ একই বছরে চা-বাগান-গুলি প্রায় ২.৫৪ কোটি টাকা মূল্যের ভারতে তৈরী সার ক্রয় করেছে, রেলওয়ে, বিমান ও স্টীমার ভাড়া বাবদ ব্যয় করেছে ৩.৬৬ কোটি টাকা। এই শিল্পের উপর নির্ভরশীল শ্রমিকদের সংখ্যা দশলক্ষের উপর।

কিন্তু এই স্বনামধন্য আজ বিদেশী একচেটিয়া পুঁজিপতিদের কবলে পড়ে ক্রমশঃ ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলেছে। আমাদের জাতীয় অর্থনীতির উপর এদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি কতখানি তা নিম্নের তথ্যগুলি থেকে বোঝা যাবে।

ভারতের উৎপন্ন চায়ের বার আনাই হয় উত্তরভারতে। সেই উত্তরভারতে উৎপাদনের ৭৫% নিয়ন্ত্রণ করে কলিকাতার ১০টি প্রধান এজেন্সী হাউস। তাদের মধ্যে ৭টি কোম্পানী মোট উৎপাদনের ৫০% এবং ৫টি ৩৬% ভাগ নিয়ন্ত্রণ করে। ১৯৫৪ সালে এইসব ৮টি উৎপাদনকারী এজেন্সী হাউস তাদের সংশ্লিষ্ট ফার্মগুলির সাথে মিলে কলিকাতার নীলামে ৫০% ভাগ চা কেনে। নীলামের ১৬% ভাগ হল ৪টি বিদেশী ব্রোকার্স ফার্মের হাতে। এই ৪টি ফার্ম-আবার অনেকগুলি চা-উৎপাদন-কারী কোম্পানীর ডিরেক্টর। সুতরাং তারা নিজেদের দ্বারা উৎপন্ন চায়ের খুসীমত দাম ধার্য করতে পারে। তারা অন্যান্য কোম্পানীকে টাকা ধার দেয়। ফলে অনন্যোপায় কোম্পানীগুলির পক্ষে উক্তমূল্যে তাদের কাছে বিক্রী করা ছাড়া উপায় থাকে না। উক্ত ব্রোকার্স ফার্মগুলির কাছে ভারতীয় কোম্পানীগুলি নানাভাবে বাঁধা, যথা ব্যাঙ্কের কাছে ঋণ নেওয়ার ব্যাপারে মধ্যস্থতা করা, ঋণের জামীন হওয়া, চা বিক্রী হওয়ার আগে দলীলের উপর আগাম টাকা দেওয়া, রেল বা স্টীমার ভাড়া দেওয়া ইত্যাদি। কলিকাতা টি ব্রোকার্স এসোসিয়েশন নামে যে প্রতিষ্ঠানটি নীলামের সমস্ত ব্যবস্থা করে তার ৮ জন সভ্যের মধ্যে ৪ জন হল ব্রোকার্স ফার্মের প্রতিনিধি। এবং অপর ৮ জনের মধ্যে ৪ জন ক্রেতাদের এবং ৪ জন বিক্রেতাদের প্রতিনিধি।

ব্রোকারদের আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত। তারা ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয় ব্যাপারের চাহিদার দাম স্থির করার ক্ষেত্রেই তাদের প্রভাব বিস্তার করে। তাদের মূল্য নির্ধারণের উপর সব কিছু নির্ভর করে। চায়ের গুদাম একটি মাত্র বিদেশী কোম্পানীর সম্পত্তি, সেই কোম্পানীটি আবার একাধারে উৎপাদক এবং রপ্তানীকারক। প্যাকেট করা চা মিশানো ও বিতরণের ১৫·৬% ভাগ এবং ভারতের ভিতরে চা খুচরা বিতরণের ৮৫% দুটি বিদেশী কোম্পানীর কবলিত।

ভারতে উৎপন্ন চায়ের ৪০% রপ্তানী হয়। রপ্তানীর কাজ করে উক্ত মাানেজিং এজেন্সীগুলি, তারা যে সব বিদেশী এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তাদের মারফৎ বিলাতে পাঠায়। ফলে বৈদেশিক মুদ্রা ও বৈদেশিক বাণিজ্যের লেনদেনের আর ওপরেই পরোক্ষেপ হয়। মাানেজিং এজেন্সীগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বা বাবের দালাল হিসাবে কাজ করে তাদের জাহাজে মাল পাঠায় এবং বিভিন্ন ধরণের ব্যবসায় ব্যবসা করে। এই ভাবে জাহাজ ভাড়া ও বীমা বাবদ আয় তারাই ভোগ করে।

বিলাতের পাইকারী বাজারও করেকটি মাত্র ব্রোকার প্রতিষ্ঠানের হাতের মুঠোর মধ্যে। কলিকাতার ম্যানেজিং এজেন্সীগুলির লন্ডন অফিস রপ্তানী করা চায়ের বেশীর ভাগের মালিক হওয়াতে সেখানকার নীলামকে খুসীমত চালাতে পারে। এই দুটি করক ম্যানেজিং এজেন্সী প্রতিষ্ঠান কৃত্রিম ভাবে বাজারে সরবরাহ বেশী বা কম করে কলিকাতা ও লন্ডনের নীলামে চায়ের দাম ইচ্ছামত ওঠা-নামা করাতে পারে। এরা এই রকম কারসাজির দ্বারা কি পরিমাণ মুনাফা লুটে করে সে সম্বন্ধে তরুণের জন্য সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান্যান্যানাল কনফেডারেশান অফ ফ্রী ট্রেড ইউনিয়নকেও (জোর দাবী তুলতে হয়েছিল।

চা-শিল্প ও ব্যবসায়ের উপর মুষ্টিমেয় করেকটি বিদেশী কোম্পানী একচেটিয়া কর্তৃত্ব এবং উৎপাদন ও ব্যবসায়ের বিভিন্ন দিক একই চক্রের কবলিত হওয়ার ফল কি হয়েছে? আমাদের চায়ের বৈদেশিক বাজার প্রধানতঃ ইংলণ্ডে সীমাবদ্ধ হয়ে আছে। বাজার বিস্তারের সম্ভাবনাকে উক্ত চক্র প্রতিরোধ করছে। লন্ডন ও কলিকাতার বাজার নিয়ন্ত্রণ দ্বারা এরা নিজেদের সুবিধামত চায়ের বাজারে কৃত্রিমভাবে কোন অবস্থা সৃষ্টি করতে পারে। অথচ আমাদের দেশের ভিতরে চায়ের বাজার সম্প্রসারিত হওয়ার যে অবকাশ রয়েছে তাকেও বাধা দেওয়া হচ্ছে। দেখা যায় যে লন্ডনে যখন চায়ের দাম কমে গেছে তখনও সেই একই মালের চা ভারতে চড়া দামে বিক্রী হচ্ছে।

ভারতীয় চা-কোম্পানীগুলি উৎপাদনের ক্ষেত্রে কিছুটা স্থান ছেড়ে দিলেও অন্য সমস্ত ব্যাপারে তারা বিদেশী চক্রের মুখাপেক্ষী হয়ে আছে। এর ফলে নিম্ন মূল্যে চা বিক্রয় করতে বাধ্য হয়। তার উপর বিদেশী কোম্পানীগুলির স্টক চালা। ফলে চা-শিল্পের উন্নতির পথে কি ভাবে বাধা সৃষ্টি হচ্ছে সে কথা নীচের আলোচনা থেকে পরিস্ফুট হবে।

চা-শিল্প ও ব্যবসায়ের বিপুল মুনাফা নানাভাবে বিদেশে চলে যাচ্ছে। ট্যাক্স তদন্ত কমিশনের বিবরণ থেকে জানা যায় যে ১৯৫৬-৫৭ সালের মধ্যে বিভিন্ন শিল্পের চিতরে একমাত্র দেখলাই শিল্প বহদে চা-শিল্পে সর্বোচ্চ মুনাফা হয়েছে। বাগিচা তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট অনুসারে চা-শিল্পে নিয়োজিত মোট মূলধনের সাধারণ ১৫% ভাগ বা ১১·৩৮ লক্ষ টাকা মুনাফা করেছে। কমিশনের মতে এই আয়কারীকৃত মূলধনের অর্ধেকও কার্যতঃ আদায় হয় নাই। উক্ত চক্র কিভাবে মুনাফা অর্জন ও লভ্যাংশ বিতরণ করে তার একটি দৃষ্টান্তই যথেষ্ট হবে। তামিলনাদের আমামালাই অঞ্চলের ষ্টানমোর লিমিটেড হল লন্ডনের মেসার্স ব্রুকবণ্ড কোম্পানীর অধীন প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানটি ১৯৫১ সালে লভ্যাংশ বিতরণ করেছে ৪২½% ১৯৫২ সালে ১৬১½% এবং ১৯৫৩ সালে ৭২½% ভাগ। কমিশনের প্রশ্নের উত্তরে তারা জানায় যে লভ্যাংশ বিতরণ করা হয়েছে মূল কোম্পানীর প্রোগ্রাম অনুযায়ী।

ম্যানেজিং এজেন্সীর প্রথা চা-শিল্পের উপর দারুণ বোঝা হয়ে চেপে বসেছে এবং তার দরুণ উৎপাদন খরচের হার অন্যায়ভাবে বেড়ে চড়া হয়ে আছে। ট্যাক্স সেওয়ার পরে অবশিষ্ট মুনাফার যেকে ম্যানেজিং এজেন্সী কমিশন হিসাবে বেরিয়ে যায় ১৯৫০ সালে ১১·৪%, ১৯৫৩ সালে ১৪·৫% এবং ১৯৫৪ সালে ১১·৫% ভাগ। ১৯৫০ ও ১৯৫৪ সালে মুনাফার হার খুব বেশী হওয়াতে কমিশনের হারকে ভাগ করা দেখা গেলেও পরিমাণ বেশী ছিল। ১৯৫২ সালে যখন বেশীর ভাগ কোম্পানী লোকসান ঘোষণা করেছে তখনও ম্যানেজিং এজেন্সীর কমিশন বাবদ দেওয়া হয়েছে ১১ লক্ষ টাকা। এছাড়া ম্যানেজিং এজেন্সীগুলি আরো নানাভাবে বাঁধা হয়ে কমিশন আদায় করে। ম্যানেজিং এজেন্সী কমিশনের (তার মধ্যে সেক্রেটারী ও এক্সেন্টের প্রাপ্যও ধরা হয়েছে) নিম্নতম হার হল মুনাফার ১০% পর্যন্ত অথবা প্রোস বিক্রীর ৪% অথবা দুইই। অফিস ভাতা হিসাবে তারা মাসে আড়াই হাজার টাকা পর্যন্ত পায়। মানেজার জন্য স্টোর কেনার কমিশন হল ৫% পর্যন্ত; শ্রমিক সংগ্রহের কমিশন শ্রমিক পিছু দুটাকা; জাহাজে চা পাঠানর জন্য বাক্স প্রতি পাঁচ টাকা। মানেজিং এজেন্টরা কোম্পানী-গুলিকে টাকা ধার দেয় এবং সুদে নেয় ব্যাঙ্কের হারের উপরে ১% ধার্যের কাছে থেকে নেওয়া ঋণের জামীন হওয়ার কমিশন হিসাবে আদায় করে ঋণের পরিমাণের ½% থেকে ১% পর্যন্ত। বিদেশী কোম্পানীগুলিতে মানেজার ও উচ্চপদের কর্মচারীদের বেতন ভাতা ছাড়াও মোটা হারে কমিশন দেওয়া হয়। স্টোর কেনার নামে মণ্ডের অপব্যয় হয়ে থাকে। ১৯৫২ সালকে কোম্পানীগুলি সমকটের বছর বলে থাকে অথচ ঠিক সেই বছরে চড়া দামে অনেক অপ্রয়োজনীয় জিনিষ কেনা হয়েছে। উৎপাদনের ব্যয়ের হার ভারতীয় কোম্পানীগুলি অপেক্ষা অ-ভারতীয় কোম্পানীতে অনেক বেশী। এই সব অবস্থা বিশ্লেষণের পর বাগিচা তদন্ত কমিশন মন্তব্য করতে, ব্যয় হয়েছে যে 'সাধারণ ব্যয়' (General Charges) খাতে মানেজিং এজেন্ট ও সেক্রেটারীদের কমিশন ক্রমিক এবং মানেজারদের কমিশন প্রথা তুলে দিয়ে, ম্যানেজার ও অন্যান্য পদযুক্ত কর্মচারীদের বেতনের কাঠামো যুক্তিসঙ্গত ভাবে নির্ধারণ করে উৎপাদন ব্যয় হ্রাসের যথেষ্ট অবকাশ আছে।

অত্যন্ত চড়া হারে মুনাফা উপার্জন করা সত্ত্বেও এই একচেটিয়া চক্র চা-শিল্পের আভ্যন্তরীণ সম্বল, বন্ধ—সংরক্ষিত তহবিল (Reserve Fund) ইত্যাদি গড়ে তোলার কাজকে দারুণ ভাবে উপেক্ষা করেছে। ১৯৩১ থেকে ১৯৫৩ সালের মধ্যে বিভিন্ন বছরের কোম্পানীগুলিতে অবারী-কৃত মূলধনের পরিমাণ যেটুকু বৃদ্ধি পেয়েছে তা অকিঞ্চিৎকর! ডা: বু তী র কোম্পানীগুলির তুলনায় বিদেশী কোম্পানীগুলি অনেক বেশী হারে লভ্যাংশ বিতরণ করে। এমন কি সাধারণ সংরক্ষিত তহবিল ছাড়াও দালাল বা বন্ধ-পাতির জন্য বিশেষ ভাবে সংরক্ষিত তহবিল থেকে বাড়তি হারে লভ্যাংশ হিসাবে বিতরণ করা হয়েছে। বাগিচা তদন্ত কমিশন তত প্রকাশ করেছেন যে লভ্যাংশ বিতরণের পরিমাণ অর্ধেকটা কম করলেই কোম্পানীগুলির আভ্যন্তরীণ সম্বল ২৫% ভাগ বৃদ্ধি পেত। উক্ত কমিশনের

(শেষ পৃষ্ঠায়)

জল জ্বাল জেলে

(৮ম পৃষ্ঠার পর)

গভীরতর। দুঃখের বিষয় তিনি পরলোকগত। এমন কাহিনী আর আমরা পাব না।

সমরেশ বসুর কাহিনী গড়ে উঠেছে মৎস্যজীবীদের মাছ ধরার একটি বিশেষ মরশুমী যাওয়া-আসাকে কেন্দ্র করে। ভূমিকায় তিনি তাই বলেছেন। তার দর্শন সেইজন্য খণ্ডিত।

যাদের কথা তিনি লিখছেন তারা যেন শুধু গঙ্গার ওপরেই মাছ ধরে। তাদের পিছন দিকে কিছু নেই। গঙ্গার যাহিরে যেন তাদের সমাজ বলে কিছু নেই। সমস্যা বলে কিছু নেই। জীবিকার প্রয়োজনে যে জীবন শুধু সেইটুকুই এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু তাই এই উপন্যাসের চরিত্রগুলি নিজের অধিকারে বাঁচতে পারে না। লেখকের দয়ার উপর নির্ভর করতে হয়।

গঙ্গার যারা বহুদূরে থেকে মাছ ধরতে আসে তারা শুধু বর্তমান নিয়েই ব্যস্ত। শুধু পাঁচকে ফেলে-আসা গ্রাম আর পরিবার পরিজন নিয়ে ভাবতে দেখা যায়। আর সবাই নীরব নির্বাক। পাঁচু নায়ক নয়। এ গ্রন্থের আসল নায়িকা গঙ্গা। হয়ত গঙ্গাও নয়। কেননা গঙ্গা ঠিক এর পটভূমি নয় — গঙ্গার সঙ্গে এদের জীবন জড়িয়ে আছে দেখতে হবে। তাই বলে তাদের সমাজ জীবনটা উবে যাবে কেন? তাদের সামাজিক সত্তাটা অবজ্ঞাত থাকবে কেন? উবে না যাক সমরেশবাবুর কাহিনীতে তা খুব স্পষ্ট নয়।

পাঁচুর দাদা নিবারণ ছিল সাইদার বা সর্দার। অনেক ছেলে। তাদের দুর্বার জীবন প্রত্যহ প্রাণকে করেছেন। আর আশ্চিক ভাবে হলেও তার নিবারণ। আর ফিরল না। তার ছেলে বিলাসকে নিয়ে পাঁচু অন্ধকার মাছ ধরতে বেরোয়। এক সরজমে বিলাসের দেখা হল হিমির সঙ্গে। মাছের মহাজন স্টালোক। দামিনী তার নাম। তারই নাতনী হিমি। বিলাসের সঙ্গে খুব ভাব হল। এমন সময় পাঁচুর মৃত্যু। তা যেমন আকস্মিক তেমনি অবিশ্বাস্য। পাঁচু চরিত্র সুন্দর। হিমি, বিলাস, দামিনী আর জীবন। তাই বিলাস আর হিমির টান-ভালবাসার কাহিনী সব কিছু ছাপিয়ে উঠেছে। তার কাছে মহাজনী হুলনার কাহিনীও নিষ্প্রভ। মনে হয় উপশিপ্ত উপাদান রসায়িত করতে না পেরে লেখক বিলাস-হিমির কাহিনী সম্ভব—অত্যন্ত সম্ভব। কাহিনী সম্ভব অতান্ত সম্ভব। কিন্তু মাঝে মাঝে মনে হয়েছে এই কাহিনীটাই যেন আসল। জেলে-পরিবেশটা এই কাহিনীর খাতিরেই প্রয়োজন।

সমরেশবাবু জেলেদের সঙ্গে অনেক ঘুরেছেন। তাদের সব ছেরে বড় কৃতিত্ব এই ধরণের একটি ধারাবাহিকতা তিনি বজায় রেখেছেন। এই গ্রন্থের মধ্যে তিনি এক ধরণের জীবনচেতনার অধিকারী হয়ে রয়েছেন। তা ঠিক দার্শনিকতা নয়। জল, জেলে, মাছ, সংকীর্ণতা, আলো, বণ্ডনা, বেদনা সব মিলিয়ে জীবনের সঙ্গে যে সংগ্রাম জেলেরা গঙ্গার ওপর চালিয়ে যায় তার অন্তর্নিহিত মূল সত্যটা যেন তিনি ধরে ফেলে-ছেন। তাদের জীবন প্রত্যক্ষ ভাবে করেছেন। আর

রূপায়ণে সবেত শিল্পসোধের পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু এই সে দুঃখে জীবন প্রত্যয় এ কেমন করে ধারাবাহিকভাবে সঞ্চারিত হচ্ছে সে সম্পর্কে তিনি নীরব। তিনি আবার বিস্ময়ে শুধু দেখেছেন। জানতে চাননি বা পারেননি।

সমরেশ বসু খ্যাতিমান আধুনিক সাহিত্যিক। তাঁর ভাষা উজ্জ্বল পরিচ্ছন্ন এবং প্রাণগ্রাহী। এ ভাষা কিছুটা সংলাপ-ভঙ্গী মজলিশী ঢঙের। দুর্বল অংশ প্রারম্ভই চোখে পড়ে। অনেক পুনরাবৃত্তি দেখা যায়, প্রয়োজনাতিরিক্ত কা হি নী বিলম্বিত হয় কখনো —ভূমিকার কৈফিয়তে যার গুরুত্ব হ্রাস হয় না।

মন্নবর্মণ সমগ্র জেলে সমাজকে দেখেছেন, দেখিয়েছেন। সমরেশ বসু গঙ্গার ওপরে মাঝারিছিন্ন একদল জেলের গণ্ডিত জীবনের কথা বলেছেন। উভয়েরই কৃতিত্ব অনস্বীকার্য।

যা নেই তা নিয়ে আলোচনা নীতিবিরুদ্ধ। গ্রন্থভুক্ত বিষয়েই আলোচনা সীমিত হওয়া বিধেয়। কিন্তু সমরেশ বসু, শক্তিমান লেখক। সবেষণা-প্রবণ তাঁর মন। তাই তাঁর কাছে এদের জীবনের সমাজের খুটিনাটি খবর আশা করেছিলুম। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর আরও একজন বাস্তব-বাদী লেখকের চোখ দিয়ে এদের নিখুতে চেষ্টা করতাম।

পরিশেষে বলা যেতে পারে 'জলযা জেলে অর্থে 'মাছ-মারা' শব্দটি প্রচুর ব্যবহৃত হয়েছে ন বিশেষ ভাল লাগেনি। কথাটি নিরপেক্ষে নির্দোষি—কিন্তু তার যথেচ্ছ ব্যবহারে যেন একটা অবজ্ঞের অস্ত্র ব্যার ভাব মনে আসে। —ন

সিনেমা আলোচনা

রাষ্ট্রীয় পুরস্কারের জন্য নির্বাচন

[শৌভিক]

এই সংখ্যা যখন হাতে পড়বে ততক্ষণে চলচ্চিত্রে এ বছরের রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্তের নাম ঘোষিত হয়ে যাবারই সম্ভাবনা। কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজের আঞ্চলিক নির্বাচকমণ্ডলী তাঁদের যাঁর যা নির্বাচন কেন্দ্রীয় নির্বাচক মণ্ডলীর কাছে পাঠিয়েছেন গত মাসের মাঝামাঝি, গত সপ্তাহে সেই ছবিগুলি কেন্দ্রীয় নির্বাচক মণ্ডলীর দেখবার কথা ছিল এবং তা বোধ হয় সম্পন্নও হয়েছে, কারণ তা না হলে আগামী ১৬ই এপ্রিল নিউ দিল্লীতে পারিতোষিক বিতরণ উৎসব অনুষ্ঠিত হবে বলে যে কথা হয়েছে তা রক্ষা করা যায় না। প্রতিযোগিতা যা হবার, তা শুধু বোম্বাই ও কলকাতার ছবির মধ্যেই। মাদ্রাজ অবশ্য তাদের নির্বাচন যথারীতি পাঠায়, কিন্তু তামিল ও তেলেগু ভাষায় ছবি এমন একটা ধারা বেছে নিয়ে রয়েছে, যা আর যাই হোক, শিল্প-সৌষ্ঠব বা বাঞ্ছিত সারসম্পন্ন সৃষ্টি হওয়া থেকে দূরেই থাকে। প্রতিযোগিতার জন্যে এবার দিল্লী পৌঁচেছে কলকাতা থেকে, গুণানুসারে, ১। "আঁধারে আলো", ২। "লৌহ কপাট" এবং ৩। "হারানো সুর" এবং ছোটদের ছবির বিভাগে "জন্মতিথি"। বোম্বাই থেকে গিয়েছে, গুণানুসারে, ১। "মাদার ইণ্ডিয়া" ২। "মুসাফির" এবং ৩। "দো আঁখে বারহ হাত"। ছোটদের ছবি বলে বিজ্ঞাপিত মাদ্রাজে তোলা হিন্দী ছবি "দম পর্নাহ এক ভাল কে"-ও পাঠানো হয়েছে। এ ছাড়া আরো দুখানি ছোটদের ছবির বিভাগে পৌঁচেছে। এবার রাষ্ট্রপতি পুরস্কার নিয়ে আগে থেকেই বাজারে বেশ কৌতূহল ছড়িয়ে রয়েছে, তার কারণ, এবার শুধু সোনার আর রূপোর মেডেলই নয়, বা সার্টিফিকেট অব মেরিটই নয়, সেই সঙ্গে নগদ টাকাও রয়েছে পারিতোষিকের মধ্যে— রাষ্ট্রপতি স্বর্ণপদক ও প্রধানমন্ত্রী স্বর্ণপদক (ছোটদের শ্রেষ্ঠ ছবি) প্রাপ্তকে পঁচিশ হাজার টাকা আর সর্বভারতীয় সার্টিফিকেট প্রাপ্তকে সাড়ে বারো হাজার টাকা, এবং ডকুমেন্টারি বিভাগে স্বর্ণপদক প্রাপ্তকে পাঁচ ও সার্টিফিকেট প্রাপ্তকে আড়াই হাজার টাকা করে দেওয়া বরাদ্দ হয়েছে। তাছাড়া, এ বছর কৌতূহল বৃদ্ধি লাভ করার আরো কারণ হচ্ছে, পর পর গত দু বছর ধরে বাঙলা ভাষার ছবি ('৫৬তে "পথের পাঁচালী" এবং '৫৭তে "কাবুলিওয়ালা") রাষ্ট্রপতির স্বর্ণ পদক পেয়ে এসেছে—এবারও তারই পুনরাবৃত্তিই ঘটবে নাকি?

আপাতদৃষ্টিতে দেখা যায় পুনরাবৃত্তি ঘটার সম্ভাবনা কম এবং সম্ভাবনা কমিয়ে দিয়েছে—কলকাতার আঞ্চলিক নির্বাচক মণ্ডলী। তাঁরা যে তিনখানি ছবি নির্বাচন করেছেন তার মধ্যে "লৌহ কপাট" ছাড়া কোন প্রতিনিধিমূলক প্রতিযোগিতায় পাঠাবার মতো বিশেষ গুণ আর দুখানি ছবিতে নেই, তাও "লৌহ কপাট"কে এখন থেকেই দ্বিতীয় স্থানে রেখে দেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ আঞ্চলিক শ্রেষ্ঠ ছবি বলে "আঁধারে আলো"র রৌপ্যপদক প্রাপ্তি নির্ধারিতই হয়ে গিয়েছে। ওদিকে বোম্বাই থেকে রয়েছে "মাদার ইণ্ডিয়া" আঞ্চলিক শ্রেষ্ঠ ছবি বলে নির্বাচিত হয়ে। এ দুখানি ছবির মধ্যে থেকে রাষ্ট্রপতি পদকের জন্য নির্বাচন করতে নির্বাচকমণ্ডলীকে, মনে হচ্ছে, একটু সমস্যায় পড়তে হবে। অবশ্য এমন কোন কথা নেই যে, রাষ্ট্রপতি পদকের জন্যে কেবল ঐ দুখানি ছবিই বিচার করা হবে, কম্তুত বিভিন্ন ভাষার যতো ছবিই পাঠানো হয় কেন্দ্রীয় নির্বাচক-মণ্ডলীর কাছে, তার প্রত্যেকখানিই ধরা হয় এবং দেখাও হয়। কাজেই শুধু আঞ্চলিক শ্রেষ্ঠ ছবিখানিই ধরা হয় না। একবার নির্বাচনে এমন একটা গোলমাল ঘটেওছিল—আঞ্চলিক শ্রেষ্ঠ ছবি হলো একখানি ছবি, অথচ সেই অঞ্চলেরই আরেকখানি ছবি পেয়েছিল রাষ্ট্রপতি পদক। এমন যে আবার ঘটতে পারে না, তাও নয়। শোনা গেল "পরশ পাথর" ২৯শে ডিসেম্বর সেন্সরকে দেখানো হয়েছিল কাজেই ছবিখানি এ বছরের তারিখে সার্টিফিকেট পেলেও, গত বছরের ছবি বলে ধার্য করে এবারকার প্রতিযোগিতায় অন্তর্ভুক্ত করে নেবার জন্য আবেদন নাকি করা হয়েছে। সে আবেদন গ্রাহ্য হলে শ্রেষ্ঠ ছবি নির্বাচনের সমস্যা আরো একটু হয়তো জটিল হবে। ("পরশ পাথর" এবার কানস চলচ্চিত্র মেলার জন্য নির্বাচিত হয়েছে)। "মাদার ইণ্ডিয়া"র ওপর বড়ো আশা বোম্বাইয়ের; হলিউডে অস্কার ফসকে যাওয়ায় এখন রাষ্ট্রপতি পদকের দিকে চেয়ে থাকতে হচ্ছে। হিন্দী ছবির পৃষ্ঠপোষক মহলেরও দৃঢ় বিশ্বাস "মাদার ইণ্ডিয়া" রাষ্ট্রপতি পদক পাবেই। (ক্যানসের জন্য ছবি নির্বাচনকালে "পরশ পাথর"কে বেছে নেওয়া হয় "মাদার ইণ্ডিয়া", "নয়া দৌর" ও "দো আঁখে বারহ হাত"এর মধ্যে থেকে। "পরশ পাথর" রাষ্ট্রপতি প্রতিযোগিতায় যোগদান করতে পারলে ফল কি দাঁড়ায় দেখবার মতো।) শেষ পর্যন্ত কি হবে তা অবশ্য আগে থেকে কেউ বলতে পারে না, এমন কি কেন্দ্রীয় নির্বাচকমণ্ডলারও জানা নেই ফল কি দাঁড়াবে, তবে গত বছরের চেয়ে এবার ভাবনায় পড়তে হবে বেশী।

শ্রেষ্ঠত্ব বিচার করা হয় কোন্ কোন্ গুণ ধরে? গত ক বছর যে-সব ছবি পুরস্কার পেয়েছে সে-গুলি দেখে মনে হয় সারবস্তু বিষয়বস্তু ও তার কাহিনীর আবেগময়তার ওপরেই বেশী জোর দেওয়া হয়। কলাকৌশলের গুণাগুণের খাতির খুবই কম; তেমন গল্প যদি কলাকৌশলের কাজও ভাল থাকে তো সেটা ফাউ। তা যদি না হতো তাহলে গত বছর হয়তো "কাবুলিওয়ালা" শ্রেষ্ঠ হতো না। গল্পের আবেদনটাই যদি প্রধান বিচার্য হয়, তাহলে নির্বাচক-মণ্ডলীতে চলচ্চিত্র নির্মাণে সংশ্লিষ্ট কলাকুশলীদের সদস্য করে রাখার সার্থকতা কি? এবার কলকাতার আঞ্চলিক নির্বাচক-মণ্ডলীতে সদস্য ছিলেন অধ্যাপক নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত, লেডী রাণু মুখোপাধ্যায়, ডাঃ সতী ঘোষ, বি কে বড়ুয়া, অমল হোম, সুধীর মুখোপাধ্যায়, সুশীল মজুমদার ও সুবোধ মিত্র—শেষোক্ত তিনজনই হচ্ছেন চিত্রপরিচালক। যদি কলাকৌশলের দিকে বা পরিচালনা ও চলচ্চিত্রানুগ বিন্যাসবৈশিষ্ট্যের কোন কদর না দেওয়াই হয়, তাহলে চলচ্চিত্রশিল্প থেকে কোন একজনকে সদস্য করলেই তো যথেষ্ট হতো। কারণ, "অন্তরীক্ষ" বা "পঞ্চতপা"র নির্মাতারা যদি উপেক্ষিত হন, তাহলে শিল্প-মহিমায় কৃতিত্বপূর্ণ চিত্রসৃষ্টিতে কারাই বা উদ্দীপনা জাগবে! "লৌহ কপাট" যাদের বিচারে "আঁধারে আলো"র নিচে পড়ে, তাহলে কলাকুশলী রাখার দরকারই বা কি?

—

পুরস্কারটা প্রযোজককে দেওয়া হয় বলে তা নিয়ে একটা গোলমাল ছিল। পাশ্চাত্যে প্রযোজকই হচ্ছে ছবির পরিকল্পয়িতা তাই সেক্ষেত্রে ছবির শ্রেষ্ঠত্বের জন্য প্রযোজক পুরস্কৃত হয়। আমাদের দেশে প্রযোজক মানে যে টাকা যোগায়, ছবি সৃষ্টি করে পরিচালক। যাই হোক, এ গোলমালটা মেটাবার জন্য গত বছর ঘোষণা করা হয় যে, ছবির পরিচালককেও পুরস্কৃত করা হবে—এবং ঘোষণাটা এমনভাবে হয় যাতে মনে করবার কারণ আছে যে পরিচালকের পুরস্কারটা অনেকটা 'কনসোলেশন প্রাইজ' গোছের একটা কিছু হবে। এবার আবার নগদ টাকা—সেটা কার প্রাপ্য—প্রযোজকের না পরিচালকের, তা নিয়েও মনে হচ্ছে কথা উঠবে। বম্বের প্রযোজক সংঘ তো ইতিমধ্যেই টাকাটা তাদের প্রাপ্য বলে দাবী জানিয়ে রেখেছেন, কারণ ছবি তৈরীর খরচও তারা জোগাড় করে দেন আর টাকার ঝুঁকিও তারাই বহন করেন। ছবির সৃজনকারী হিসেবে আবার পরিচালকরাও দাবী করতে পারেন যে, ছবি থেকে লাভ হলে তার কোন অংশ তাঁরা পান না; ছবির ভাল মন্দ হওয়ার সব দায়িত্ব নিতে হয় তাদের ঘাড়ে—ছবি সম্মানিত হলে সেইটুকুই তাদের সান্ত্বনা, কাজেই সেই সম্মানেরই একটা অংশ ঐ নগদ পুরস্কারটা তাদেরই প্রাপ্য হওয়া উচিত। বলা যাচ্ছে না, রাষ্ট্রীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার নির্বাচকমণ্ডলীর মনে কি আছে?

এখন চলতি ছবির তালিকায় রয়েছে, বাঙলা "যমালয়ে জীবন্ত মানুষ", "রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্ত", "বন্ধু" "মেঘমল্লার" ও "মানময়ী গার্লস স্কুল"; এবং হিন্দী "তুমসা নহী দেখা", "লাইটহাউস" "গ্রেট শো অফ ইণ্ডিয়া", "মাদার ইণ্ডিয়া", "ভাবী" ও "সাক্ষীগোপাল"। এ সপ্তাহে বাঙলা কোন নতুন ছবির মুক্তি নেই, হিন্দীতে আছে "নাইট ক্লাব" ও "তিসরী গলি।"

চা শিল্পে সঙ্কট

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

[illegible] সদস্য শ্রী শিবস্বামীর [illegible] বিদেশী কোম্পানীগুলি [illegible] ভাবে উৎপাদন বাড়ের [illegible] হ্রাস করায় রেখেছে। তিনি [illegible] সুযোগ বুঝিয়ে দেখিয়েছেন [illegible] আন্তর্জাতিক চা-[illegible] অজুহাতে কৃত্রিমভাবে চায়ের [illegible] সীমাবদ্ধ ক'রে দীর্ঘকাল [illegible] মুনাফার হার বজায় [illegible]। সুতরাং উৎপাদন ব্যয় [illegible] শিল্পের আভ্যন্তরীণ [illegible] বাড়ান এবং তার ফলে [illegible] বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বেশী [illegible] মূলধন নিয়োগের প্রশ্ন [illegible] মোটেই অনুপস্থিত। [illegible] উৎপাদককে সীমিত গণ্ডীর [illegible] রাখাই যেখানে উদ্দেশ্য সেখানে মুনাফা শিল্পে নিয়োজিত [illegible] বদলে নানাভাবে বিতরণ [illegible] অভীষ্ট সিদ্ধির প্রকৃষ্ট উপায়।

তদন্ত কমিশনের রিপোর্টে [illegible] চাইতে গুরুতর যে তথ্য উদ্ঘাটিত হয়েছে, তা হ'ল নতুন চা-গাছ লাগানোর ব্যাপারে এদের অমার্জনীয় গাফিলতি। একটি চা-গাছের অর্থনৈতিক জীবন অর্থাৎ যতদিন তা থেকে আয় হতে পারে প্রায় ৬০ বছর। একটি নতুন গাছ থেকে আয় হতে লাগে অঞ্চল ভেদে ৫ থেকে ১০ বছর। শিল্পের অস্তিত্বের জন্য সময় থাকতে নতুন চারা লাগানো নিতান্ত আবশ্যক। অথচ তদন্ত কমিশনের রিপোর্টে দেখা যায় যে বিদেশী কোম্পানীগুলির অধীন ৫ লক্ষ ১২ হাজার একর জমির মধ্যে ২ লক্ষ ২৮ হাজার একর জমিতে ১৯১০ সালের পরে এবং অনেক ক্ষেত্রে ১৯০০ সালের পরে নতুন গাছ লাগানো হয় নাই। এমন কি নতুন গাছ লাগানোর জন্য কোন তহবিল সংরক্ষিত হয় নাই। ফলে অদূর ভবিষ্যতে মোট চা-আবাদী জমির ৪৪% ভাগ ক্ষেত্রে এই শিল্পের অস্তিত্ব লুপ্ত হয়ে যাওয়ার গুরুতর আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। আর সামগ্রিক ভাবে নতুন গাছ লাগাবার ব্যবস্থা না করলে আগামী দশ বছরের মধ্যে চা-শিল্পের বনিয়াদ ধ্বসে পড়বে। নতুন গাছ লাগানোর কাজে অবহেলাতেই এই বিপদটি সীমাবদ্ধ নয়। নতুন গাছ লাগাবার কাজ যখন ফেলে রাখা চলতে পারে না ঠিক সেই রকম মুহূর্তে বিদেশী মালিকেরা অনেক বাগান বিক্রী করে দিচ্ছে। উক্ত শ্রী শিবস্বামী এই ধরণের কারসাজিকে "অন্যায্য ভাবে মূলধন দেশে ফিরিয়ে নেওয়া" ('unfair repatriation of Capital'). আখ্যা দিয়েছেন। যে সব ভারতীয় এই সমস্ত বাগান কিনে নিচ্ছেন তাঁরা অনেক ক্ষেত্রে নতুন গাছ লাগানোর মত আর্থিক সঙ্গতির ব্যবস্থা না করে কিনে নেন। ফলে দুই এক বছর যেতে না যেতেই বাগান বন্ধ হয়ে যায়। উপরন্তু বাগান হাতে নেওয়ার পর তাঁরা শ্রমিক ও কর্মচারীদের সুবিধা এবং আয়ের উপর আক্রমণ সুরু করেন।

বিদেশী একচেটিয়া চক্রের আধিপত্যকে কিছুটা হ্রাস করার উদ্দেশ্যে বাণিজ্য তদন্ত কমিশন কতকগুলি নিম্নতম ব্যবস্থা অবলম্বনের সুপারিশ করেন। যথা (১) ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথা তুলে দিতে হবে। (২) ম্যানেজিং এজেন্সী ও সেক্রেটারীদের কমিশনের হার কমাতে হবে। ম্যানেজারদের কমিশনের বদলে সুনির্দিষ্ট বেতনের কাঠামো প্রবর্তন করতে হবে। (৩) লভ্যাংশ সমীকরণ তহবিল ছাড়া অন্য কোন সংরক্ষিত তহবিল থেকে টাকা তুলে লভ্যাংশ বিতরণ চলবে না। (৪) ব্রোকার্সদের কমিশন কমাতে হবে। (৫) সমস্ত চা-কোম্পানীর হিসাবপত্র ভারতে অডিটের ব্যবস্থা করতে হবে। (৬) কলিকাতা ও কোচিনে চায়ের নীলামের ব্যবস্থার দায়িত্ব টি বোর্ডের হাতে নিতে হবে। ১৯৫৩ সালের আইন অনুযায়ী এই বোর্ডটি পুনর্গঠিত হয়েছে। বোর্ডের সভাপতিকে কেন্দ্রীয় সরকার মনোনীত করেন এবং এতে কেন্দ্রীয় ও চা-উৎপাদনকারী রাজ্য সরকারগুলির, দেশী ও বিদেশী মালিক, শ্রমিক, ক্রেতা, পার্লামেন্ট ইত্যাদির প্রতিনিধি আছেন।

(৭) দেশের বাজারে বিক্রীর শতকরা ৫০% বিতরণের ব্যবস্থা টি বোর্ড করবে,

(৮) একশ একরের উপর কোন বাগান বিক্রীর আগে টি বোর্ডের অনুমতি নিতে হবে। বোর্ড একজন বিশেষজ্ঞ পাঠিয়ে যাচাই করে দেখবেন যে বাগানের মূল্য কত হওয়া উচিত, নতুন গাছ লাগানোর জন্য টাকা রাখা হয়েছে কিনা ও যারা কিনবেন তারা সে টাকা খাটাতে পারবেন কিনা। শ্রমিক ও কর্মচারীদের সুবিধা এবং প্রাপ্য সম্বন্ধে দায়িত্ব নিতে ক্রেতা বাধ্য থাকবেন।

(৯) প্রত্যেক কোম্পানীকে নতুন গাছ লাগানো বাবদ একর প্রতি ৫০, মূল্যক ভাবে টি বোর্ডের কাছে ঐ উদ্দেশ্যে গঠিত একটি তহবিলে জমা দিতে হবে। একটি পরিকল্পনা অনুযায়ী নতুন গাছ লাগানো ছাড়া অন্য কোন অজুহাতে ঐ টাকা তোলা চলবে না। নতুন গাছ লাগান, পুরনো যন্ত্রপাতি ইত্যাদির বদলে নতুন বসানো ইত্যাদির জন্য সংরক্ষিত তহবিলে টাকা জমা দেওয়ার আগে কোন কোম্পানী লভ্যাংশ বিতরণ বা মুনাফা বিদেশে পাঠাতে পারবে না। কমিশন মনে করেন যে কেন্দ্রীয় সরকারের এইজন্য একটি আইন প্রণয়ন করা উচিত।

তদন্ত কমিশনের সুপারিশগুলির মধ্যে কয়েকটি মাত্র এখানে উল্লেখ করা হ'ল। সমস্ত সুপারিশগুলি পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় চা-শিল্পের অস্তিত্বরক্ষা এবং উন্নতির ন্যূনতম সর্তগুলি মাত্র তাঁরা নির্দেশ করেছেন। সরকার তাঁদের যে নির্দেশনামা (terms of reference) দিয়েছিলেন তাতে জাতীয়করণের কোন উল্লেখ ছিল না। তাই কমিশন সে প্রশ্ন আলোচনা করেন নাই। কিন্তু সংগৃহীত তথ্য থেকে সে প্রশ্ন অর্থাৎ বিদেশী মালিকানাধীন বাগানগুলি জাতীয়করণের প্রয়োজনীয়তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শ্রী শিবস্বামী তাঁর পৃথক মন্তব্যে কথাটি তুলেছেন। তিনি হিসাব করে দেখান যে নতুন গাছ লাগানো বাবদ তহবিলে মোট প্রায় ১০৩ কোটি টাকা জমা দিতে হবে। এ টাকা জমা দেওয়ার আগে কোম্পানীগুলি লভ্যাংশ বিতরণ বা মুনাফা রপ্তানী করতে পারবে না। বাগান বিক্রীর আগে টি বোর্ডের অনুমতি নিতে হবে। নতুন গাছ লাগানো সম্বন্ধে বিক্রেতা ও ক্রেতা উভয়ে কতটুকু কি করেছেন তা দেখার দায়িত্ব টি-বোর্ডের মাধ্যমে সরকারের উপর এসে পড়েছে। সুতরাং ঐ কাজগুলি দীর্ঘ সময়-সাপেক্ষে টুকরো টুকরোভাবে করার চাইতে জাতীয়করণের মারফতে একেবারে সুপরিকল্পিত-ভাবে করাই সংগত।

অতীব দুঃখের বিষয় যে, ভারত সরকার জাতীয়করণের কথা ভাবা দূরে থাকুক, নানা অজুহাতে কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশগুলির বেশীর ভাগ নাকচ করেছেন। আর অন্য কতকগুলি সম্বন্ধে দেড় বছর অতীত হওয়া সত্ত্বেও কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হন নাই। ফলে আমাদের জাতীয় অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে প্রচণ্ডতর বিপর্যয়কে ডেকে আনা হচ্ছে।

স্টাফ রিপোর্টারের ডায়েরী

নবিশ সাংবাদিক

স্টাফ রিপোর্টার সবই কি তার রিপোর্টে লিখতে পারে, না, লিখবার তার অধিকার আছে। কাগজের নীতি আছে, রীতি আছে। ব্যবসায়ের মারপ্যাঁচ আছে। সরকারের ভ্রূকুটি, আইনের রক্তচক্ষু আর আছে বিজ্ঞাপনদাতাদের বিরাগভাজন হবার সম্ভাবনা। এসব বাঁচিয়ে যা অবশিষ্ট থাকে তার মধ্যে দুধের চেয়ে জল বেশী, অর্থাৎ তাকে দুধমেশানো জল ব'ললেই ভাল হয়। 'ধরি মাছ, না ছুঁই পানি, করে বেরিয়ে যাওয়া—সেটাই হ'চ্ছে রিপোর্টারদের বড় গুণ। কুশলী রিপোর্টার সে-ই যে কতগুলো 'প্রকাশ, নাকি, জানা গিয়ে, আশা করা যায়, সরকারী অথবা নির্ভরযোগ্যসূত্রে সমর্থন পাওয়া যায় নাই' —এমন কতগুলো অনিশ্চয়তাবোধক শব্দ রিপোর্টের এখানে-ওখানে ছড়িয়ে দিয়ে তার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে, অর্থাৎ শব্দের বিন্যাসকুশলতায় রিপোর্টের কলেবরকে ছলনাময়ী রূপ দিয়ে ধরাছোঁয়ার বাইরে নিতে পারে। তাই ব'লে রিপোর্ট লেখার মধ্যে রিপোর্টারের কৃতিত্ব নেই, বা লেখার আনন্দ নেই, একথা আমি অন্তর্জগৎকে নিজে রিপোর্টার হ'য়ে ব'লতে পারি না। তবে সে কৃতিত্ব, সে আনন্দ অবশ্য অনেকটা যে, দুধমেশানো জল বিক্রয়কারী গোয়ালার মত একথা অস্বীকার ক'রেও লাভ নেই। আমরা লিখি, রোজ লিখি, গাদাগাদা লিখি, তবু আমাদের লেখক বলা হয় না বোধকরি সেইজন্যে।

*

'আসলে লেখার আনন্দ যেটা, সেটাতো সৃষ্টির আনন্দ। সেটা সাহিত্য, কাব্য, গল্প, নাটক রচনায় থাকতে পারে; কিন্তু রিপোর্টারের সংবাদ সঞ্চয়নে ও পরিবেশনে যে সে আনন্দের একান্ত অভাব তা আজ দিনের আলোর মত আমার চো খে স্ব চ্ছ হ' য়ে উঠেছে। অবশ্য সৃষ্টির' আনন্দ-ভোগের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হ'লেও অনাসৃষ্টির আত্মপ্রসাদলাভের সুযোগ তার মাঝে মাঝেই ঘটে থাকে। দক্ষযজ্ঞে ঘৃতাহুতি দিয়ে পরম আত্মপ্রসাদ ও মালিকের আশীর্বাদ লাভ করে ধন্য হয় সে। কারণ কাঠের হেডলাইনসহ কাগজের সার্কুলেশন বেড়ে হয় দেড় দুগুণ। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা অথবা প্রাদেশিক হাঙ্গামাকালে অনাসৃষ্টির অফুরন্ত সুযোগ পায় রিপোর্টার তার জীবনে। তাই যুগপৎ আত্মপ্রসাদ ও আশীর্বাদ লাভের লোভে সুযোগ্য রিপোর্টারের মত আমিও বহুবার সে সুযোগ সদ্ব্যবহার ক'রে ধন্য হ'য়েছি।

* *

তাই বলছিলাম খবর আমরা সৃষ্টি করি না, খবর আমরা সংগ্রহ করি। যা ঘটেছে, ঘটছে অথবা ঘটবে তাই সংবাদ। ঘটনাই সংবাদ। কিন্তু সব ঘটনাই সংবাদ নয়। যেমন কুকুর মানুষকে কামড়ালে তা একটা ঘটনা হ'ল বটে, কিন্তু সেটাকে সংবাদের পর্যায়ে ওঠানো যায় না; তবে কোন মানুষ যদি কুকুরকে কামড়ায় তখন তা সংবাদের মর্যাদা পায় রিপোর্টারের কাছে। কুকুর মানুষকে কামড়ালে সেটা মোটেই তার মনে দাগ কাটতে পারে না। কারণ সেটা নিত্য ঘটছে। অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। সুতরাং তা দিয়ে খবর তৈরী করা চলে না। কিন্তু সে যদি জানতে পারে অমুক জায়গায় একটা মানুষ ক্ষেপে গিয়ে একটা স্প্যানিয়েলের গায়ে দাঁত বসিয়ে দিয়েছে তখন সে অতিমাত্রায় ব্যস্ত হ'য়ে ওঠে খবর সংগ্রহের জন্যে। খবরটার সমর্থন পেলে তা ফলাও করে লিখে পরম পরিতৃপ্তি লাভ করে। অবশ্য এটা ব'লতে পারেন কুকুরের উপমাটা অনেক পুরোনো হয়ে গেল। তাই যদি মনে করেন তবে একটা নতুন উপমাই দেওয়া যাক্। ঘটনাটা ঘটেছিল কিছুকাল আগে করাচীতে। করাচীর পশুশালায় একবার বাঘের খাঁচায় একটা ছাগল ছেড়ে দেওয়া হ'য়েছিল। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার! কোথায় ব্যাঘ্রপুঙ্গব ছাগলের ঘাড় মটকাবে, না একেবারে ভয়ে গুটি-সুটি। ছাগল থাকে শিং উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আর ব্যাঘ্রপুঙ্গব ল্যাজ গুটিয়ে মাথা নীচু করে একেবারে খাঁচার বাঘ দেখে ভয় পেত তবে কি আর খবর হ'ত। ছাগল দেখে বাঘ ভয় পেল অবেইনা খবর হ'ল। আর এ খবরটা ছাপা হ'য়েছিল বেশ বড় বড় হরপে গোটা কয়েক দৈনিকে।

তাই বলছিলাম, ঘটনা থেকে দুর্ঘটনা, স্বাভাবিক থেকে অস্বাভাবিক, সাধারণ থেকে অনন্যসাধারণ, প্রাকৃতিক থেকে অপ্রাকৃতিক, নীতি থেকে দুর্নীতি, নির্ভেজাল থেকে ভেজাল, কারবার থেকে চোরাকারবার, চালান থেকে চোরাই-চালান, বাজার থেকে চোরাবাজার, আর বোধকরি শান্ত পরিবেশ থেকে অশান্ত আবহাওয়ার কদর রিপোর্টারদের কাছে অনেক বেশী। এর যে-কোন একটার সন্ধান পেলেই রিপোর্টারের চোখকান সজাগ হ'য়ে ওঠে। অনুসন্ধানের ফল খবরটার সমর্থন পেলে আনন্দ আর তার ধরে না। তার উপর রঙ্ চড়িয়ে চমৎকার এক খবর তৈরী হয়। সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় স্থান পাবার লোভে অনেক সময় রিপোর্টারের হাতে শৃগালের হুক্কাহুয়া সিংহগর্জনে পরিণত হ'য়ে পরদিন প্রত্যূষে পাঠকবর্গকে চমকৃত করে। ভাষার বাঁধুনি, শব্দের চটক আর ঘটনার বিন্যাস-বৈচিত্র্যে সংবাদ হৃদয়গ্রাহী হয়: পিঁয়াজ, রসুন, আদা, ঘী, গরম-মশল্লার সংযোগে যেমন মাংস হ'য়ে ওঠে সুস্বাদু। মনোহারী দোকানে নানা বর্ণের নানা জিনিষের নিপুণ সমাবেশে যেমন ক্রেতার মন আকৃষ্ট না হ'য়ে পারে না; তেমনি শব্দ-বিন্যাস ও ঘটনার নিপুণ সমাবেশে গ্রাহকের মনও আকৃষ্ট হয়।

এ বিশ্বসংসারে ঘটনার স্রোত ব'য়ে চ'লেছে। তবে খবর জোগাড় করা এমন আর কঠিন কাজ কি? অনেকে হয়তো ব'লবেন তাই। কিন্তু ব্যাপারটা অত সহজ নয়। সব ঘটনাই যে খবর নয় তা আগেই ব'লেছি। তা যদি হ'ত তবে আমিও স্বীকার ক'রতাম ব্যাপারটা অতি সহজ। ঘটনার স্রোত থেকে আপনাকে বেছে নিতে হবে কোনটা খবর। লোকে যা জানে তা খবর নয়। লোকে যা জানতে আগ্রহশীল, যে ব্যাপারের সঙ্গে পাবলিকের স্বার্থ জড়িয়ে আছে তা আমাকে খুঁজে বার করতে হবে। কারণ, সংবাদপত্রের কারবার পাবলিকের সঙ্গে; আর আগে থেকেই বলে রাখছি আপনাদের অবগতির জন্যে যে, সে কারবারে চোরাকারবারের স্থান আদৌ নেই। ক্রেতা যেমন ব্যবসায়ীর দেবতা, মক্কেল উকিলের, ভোটদাতা নির্বাচনপ্রার্থীর, স্বামী স্ত্রীর, তেমনি গ্রাহক অর্থাৎ পাবলিক হ'চ্ছেন সংবাদপত্রসেবীর অর্থাৎ আমাদের দেবতা। এই দেবতার কৃপাদৃষ্টি যতদিন থাকবে ততদিন আপনি নির্ভাবনায় নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমুতে পারবেন। কিন্তু কোপদৃষ্টিতে প'ড়লে আর রক্ষা নেই; একেবারে ছারেখারে যাবেন,—কাগজ কলকারায় হবে, মালিক চট্‌বেন, আর দেখবেন রিপোর্টারের চাকুরী (অর্থাৎ জান-প্রাণ-মান) নিয়ে রীতিমত টানাটানি সুরু হ'য়ে গেছে। এদিকে দেবতার তুষ্টিসাধনের জন্যে যদি সরকারের দোষত্রুটি খুঁচিয়ে বার ক'রে তা ফলাও ক'রে ছাপেন কাগজে, তাহ'লে পাবলিক দেবতা তুষ্ট হবেন বটে, কিন্তু সরকার মহাশয় রুষ্ট হবেন। হয়তো বিজ্ঞাপন বন্ধ ক'রে দেওয়ার হুমকি ছাড়বেন। একেবারে এ্যাটম বোমা!—এখন যাই কোন্‌দিকে বলুন তো? একদিকে পাবলিকের কোপ, অন্যদিকে সরকারী রোষ। দুইয়ে মাঝখানে একেবারে স্যানড্‌ইচ্‌ট্। আবার এই উভয়সঙ্কট বাঁচিয়ে রিপোর্ট লিখতে হবে মালিককে সন্তুষ্ট রাখতে হ'লে। তা-না হ'লে কিসের রিপোর্টার আমি? সাংবাদিকতার মোহ কাটিয়ে পথে নামতে হবে আমাকে অন্য চাকরীর চেষ্টায়। কিন্তু সত্যি কথা খুলে ব'লব আজ একটা—এ মোহ কাটাতে পারিনি জীবন-ভোর। কাগজ উঠে গেছে বারবার কিন্তু আমাকে ওঠাতে পারে নি। তাই পাবলিক, সরকার, এবং সর্বোপরি মালিকের যুগপৎ সন্তুষ্টিবিধানের কঠোর সাধনায় আমি এখনও নিমগ্ন র'য়েছি।

(চলবে)

গোরী সেনের টাকা

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

কিছুদিন আগে ঠিক হয়েছিল যে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের ইন্‌ডাস্ট্রিজ ডিপার্টমেন্টের জন্য ১৬।১৭ জন অফিসার নেওয়া হবে। সে অবশ্য দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনার গোড়ার কথা।

তারপর অনেক জল গড়িয়েছে—বাংলার পরিকল্পনায় কাটছাঁট করেছে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্ট। পশ্চিম বঙ্গ সরকারের ইকনমিক এড্‌ভাইসর ও নাকি এতগুলো অফিসারের নিয়োগের ব্যাপারে নূতন পরিপ্রেক্ষিতে যৌক্তিকতার প্রশ্ন তুলেছেন। কিন্তু তাতে কী?

এই ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারী হটবার পাত্র নন। তিনি নাকি পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এ সব কয়েকজনকেই নিয়োগ করার জন্য বদ্ধপরিকর এবং ইনটারভিউও চলেছে সেজন্য।

আর যা হক গোরী সেনের টাকা ত? যার যাবে গোরী সেনের ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারী তার জন্য মাথা ঘামাবেন কেন?

পরিষদীয় নাটক

(নবীমহলের সংবাদদাতা)

শ্রীসিদ্ধার্থশংকর রায়ের পশ্চিম বাংলার মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ কংগ্রেস শাসনের ইতিহাসে খুবই বড়রকমের নাটকীয় ঘটনা। ঐ নাটকের প্রধান মঞ্চ পরিষদ কক্ষ, কিন্তু এর বাইরেও দুএকটি দৃশ্য নাটকের মূলবস্তু অবলম্বন করে না হোক, তারই প্রশাখা হিসেবে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বলিষ্ঠ দেহ, তেজোদৃপ্ত চেহারা, বাগ্মিতা এবং সর্বোপরি দেশবন্ধুর বংশ-গৌরব—এ সবের জন্যে সিদ্ধার্থ রায় ছিলেন, আর পাঁচজন কংগ্রেস সভ্যের চেয়ে আলাদা এবং বিশেষ করে আকর্ষণীয়। স্বভাবতঃই মহিলা সভ্যদের প্রশংসমান দৃষ্টি ছিল তাঁর উপরে। তাঁকে নিয়ে তাঁদের মধ্যে পরস্পরকে জড়িয়ে নির্দোষ ঠাট্টা-ইয়ারকিও হতো অনেক।

পদত্যাগের পর, নতুন অবস্থার সৃষ্টি হল এবং সিদ্ধার্থ সব মহলেই একমাত্র আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়ালেন। মেয়েদের মহল তাঁকে নিয়ে নানা কথা বলতে লাগল। প্রগল্‌ভতা অনেক মেয়ের স্বভাবজাত গুণ। কংগ্রেসী মহিলা সভ্যদের মধ্যে দু'একজন এরকম মেয়েও আছেন, থাকাই স্বাভাবিক। পদত্যাগের পর এক সন্ধ্যায় কংগ্রেস আফিসে এক সভ্যা আরেক সভ্যাকে বলছেন, কি দিদি সিদ্ধার্থ বাবু কংগ্রেস ছেড়ে যে যায়। চোখের জলের বান বয়ে যাচ্ছে, রুমাল সরবরাহ করে পারা যাচ্ছে না।

দিদি কিন্তু রাজনীতিতে নতুন, এখনও অতটা স্ত্রী হতে পারেন নি। তার উপর পরপুরুষ সম্বন্ধে দুর্বলতার সামান্য ইঙ্গিতেও ভয় পাওয়ার যথেষ্ট কারণ ছিল। নানা বয়সী বেটাছেলে ঘর ভর্তি। লজ্জায় আধমরা হয়ে তিনি কোনক্রমে ঘর ছেড়ে চলে এলেন। কংগ্রেস আফিসের ঘটনার জের বাড়ীতে পর্যন্ত গিয়ে পৌছল। পরদিন পরিষদ কক্ষে এসেই বর্ষীয়সী সহ-সভ্যাদের একজন আগের দিনের "ইতর" রসিকতার কথা জানালেন। এ নিয়ে অন্যান্য মেয়েদের মধ্যে বেশ উত্তেজনামূলক আলোচনা হচ্ছে দেখে, বর্ষীয়সী মহিলা ব্যাপারটা হালকা করবার উদ্দেশ্যে বললেন, আচ্ছা পাগল দেখ্‌ছি তোমরা। সিদ্ধার্থ রায়কে আমাদের ভাল লাগবে না ত ভাল লাগবে কি ঐ টাকমাথা ভুঁড়িওয়ালা বুড়োকে। এই বলে তিনি সভ্যদের একজনের দিকে ইঙ্গিত করলেন, সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য মেয়েরা হেসে উঠল। অবশ্য রুমাল চাপা দিয়ে।

মেঘটা অনেকটা কেটে গিয়েছিল। এ অবস্থা বেশীক্ষণ স্থায়ী হল না। এবার শুধু মেঘই এল না; এল বিদ্যুৎ আসন্ন ঝড়ের সম্ভাবনা নিয়ে। বর্ষীয়সী মহিলার হালকা মন্তব্যের একটু পরে একজন সভ্য উঠে বাইরে গিয়েছিলেন; কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আবার ফিরে এলেন, চোখ দিয়ে যেন আগুন বেরুচ্ছে। এসে বললেন, দেখুন ত কি অসভ্য বলে কিনা, ও ত গেল, এবার কি হবে। কে বলল, এসব তোমাকে, জিজ্ঞেস করলেন, বর্ষীয়সী মহিলা। আবার কে, এরকম অসভ্য ইয়ার্কি করবার সভ্য কজন আছে হাউসে। উত্তর দিলেন প্রথমোক্ত সভ্যা। আমি এক্ষুণি হাউস থেকে রিজাইন দেব। বলেই তিনি কাগজ-কলম নিলেন।

অন্য একজন সভ্য দেখলেন, ব্যাপারটা খুবই গুরুতর। তিনি উঠে গিয়ে চীফ হুইপকে বললেন। সিদ্ধার্থের পদত্যাগের জের সামলানই কষ্ট হচ্ছে, তার উপর আবার একজন মেম্বরের। তিনি প্রমাদ গণলেন? দৌড়ে গিয়ে ডাঃ রায়কে তাঁর কামরায় খবরটা দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ডাক এল, সব মহিলা সভ্যাদের তাঁর ঘরে। কম্পিতবক্ষে মহিলারা গিয়ে হাজির। ডাঃ রায় জিজ্ঞেস করলেন ব্যাপারটা কি। আনতমুখে একজন তাঁকে কংগ্রেস আফিসের ঘটনা থেকে এপর্যন্ত যা হয়েছে জানালেন। ডাঃ রায় তাদের আশ্বাস দিলেন, আর যাতে এরকম না হয় তার ব্যবস্থা করবেন এবং অশিষ্ট আচরণের জন্য মেম্বর দুজনকে ক্ষমা চাইতে বলবেন। ভবিষ্যতে যাতে এরকম ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হতে পারে সে জন্যে তিনি আদেশ করলেন মহিলা সভ্যাদের জন্য একটি আলাদা ঘর দেওয়া হবে, সেখানে চা ও খাবার দেওয়ার ব্যবস্থা হবে, আসা-যাওয়ার জন্যে বিশেষ ট্রান্সপোর্ট দেওয়া হবে এবং একটি পরিচারিকার ব্যবস্থা করা হবে। তাদের তিনি লবিতে যেতে বারণ করে দিলেন, দুষ্ট লোকের সঙ্গ এড়াবার জন্যে।

স্বাধীনচেতা ও স্বাধিকার রক্ষায় উদ্যোগী একজন মহিলা সভ্যা দেখালেন বিপদ; ডাঃ রায়ের ব্যবস্থায় তাঁদের গতিবিধি পর্যন্ত বেঁধে দেওয়ার চেষ্টা রয়েছে। কবে হয়ত বলবেন তোমরা বোরখা পরে হাউসে আসবে এবং হাউস থেকে যাবে। তিনি প্রতিবাদ করলেন। বললেন, এ কিরকম ধারা আপনার ব্যবস্থা? প্রথমতঃ মেয়েলী ব্যাপারে পুরুষদের মাথাগলানো অন্যায়। তার উপর আমরা কোথায় যাব না যাব, তাও আপনি ঠিক করে দেবেন এবং আমাদের তা মেনে চলতে হবে। আপনি কেন এই ব্যবস্থা করছেন না বললে, এবং সে সম্বন্ধে আমাদের আপত্তি না থাকলে, আমাদের পক্ষে তা মেনে নেওয়া অসম্ভব হবে।

ডাঃ রায় একটু বুঝিয়ে বললেন, মেয়েদের কে কোথায় কি বেফাঁস কথা বলে ফেলবে, তার চেয়ে তাদের একটু রিজার্ভড থাকাই ভাল।

মহিলারা এতে সন্তুষ্ট হলেন না। ভাবলেন, তাঁদের প্রতি সন্দেহ করা হচ্ছে এবং পুরুষদের তুলনায় তাঁরা বিবেচক বা বিশ্বাসী নয় ঘুরিয়ে তাই বলা হচ্ছে। তাঁরা ডাঃ রায়ের ব্যবস্থা মানতে রাজী হলেন না। ডাঃ রায়ও দেখলেন, এ নিয়ে বেশী জোর করা সমীচীন হবে না।

মহিলারা যথারীতি আগের মতই স্বাধীনভাবে চলাফেরা করছেন।

কাঁচা ফিল্মের আমদানী ও বণ্টনে কায়েমী স্বার্থের খেলা

(বিশেষ প্রতিনিধি)

১৯৫৭ সালের ৭ই জুন ইণ্ডিয়া গেজেটে এক অতিরিক্ত সংখ্যায় কাঁচা ফিল্মের ওপর থেকে ও-জি-এল অপসারিত করার কথা ঘোষিত হয় এবং সংগে সংগেই আরম্ভ হয়ে যায় কাঁচা ফিল্মের আমদানীর ওপর. কোটা লাইসেন্স প্রথা প্রয়োগ। এই ব্যবস্থার প্রয়োজন হলো বিদেশী মুদ্রা সঞ্চয় করার জন্যেই। তবে গভর্ণমেন্ট আমদানী নিয়ন্ত্রণ করলেও, কাঁচা ফিল্ম বণ্টনটা ঠিক নিজের হাতে রাখতে চাইলেন না।

[illegible] চলচ্চিত্র শিল্পের একটা মস্ত [illegible] থাকে যে, গভর্ণমেন্ট [illegible] সব ব্যাপারে একতরফা [illegible] করে যান,. চলচ্চিত্রশিল্পের [illegible] বা পরামর্শ না নিয়েই [illegible] চলচ্চিত্র শিল্পকে [illegible] মধ্যে পড়তে হয়। এবার [illegible] অভিযোগ না ওঠে, [illegible] গভর্ণমেন্ট গোড়া থেকেই [illegible] ব্যাপারে যতটা [illegible] শিল্পের পরামর্শ [illegible]। ফিল্ম বন্টন [illegible] কোটা [illegible] চলচ্চিত্র শিল্পের [illegible] করে নিয়েছেন। [illegible] পরিচালনায় [illegible] একটি কেন্দ্রীয় [illegible] চেয়ারম্যান [illegible] থেকে [illegible] এবং চলচ্চিত্র [illegible] যথা [illegible] প্রতিনিধি [illegible] জেলারাম [illegible] ও রামাইয়া [illegible] অজিত বসু [illegible] এ ছাড়া হয়েছে [illegible] কলকাতা ও মাদ্রাজে [illegible] আঞ্চলিক উপদেষ্টামণ্ডলী, [illegible] চেয়ারম্যান, প্রতি স্থানেরই [illegible] বন্দর-প্রধান আমদানী [illegible] তাছাড়া সদস্য হচ্ছেন [illegible] শিল্পের দুজন করে, [illegible] বোম্বাইয়ে বিমল রায় ও আর [illegible] কলকাতায় মুরলীধর চট্টো- [illegible] ও সুরেন্দ্ররঞ্জন সরকার; [illegible] মাদ্রাজে পি এস রামকৃষ্ণ রাও [illegible] জি রামানুজন। কাঁচা ফিল্মের জন্য আবেদন করতে হলে সেটা পাঠাতে অবশ্য হবে বোম্বাই, কলকাতা, বা মাদ্রাজের স্থানীয় বন্দর-প্রধান আমদানী নিয়ন্ত্রকের কাছে। তবে ফিল্ম পাওয়া না পাওয়াটা নির্ভর করছে আঞ্চলিক উপদেষ্টা মণ্ডলীর অনুমোদনের ওপর।

কাঁচা ফিল্ম আমদানী হ্রাসের পরিমাণ হচ্ছে, যে বছরে সর্বোচ্চ পরিমাণ আমদানী হয়েছে তার শতকরা চল্লিশ ভাগ। সরকারি হিসেবে সর্বোচ্চ পরিমাণ কাঁচা ফিল্ম আমদানী হয়েছে ১৯৫৫—৫৬ সালে—মোট ৩০ কোটি সাড়ে ৯ লক্ষ ফিট। অর্থাৎ বর্তমান কোটা ব্যবস্থায় বছরে আমদানীর পরিমাণ দাঁড়াবে ১৮ কোটি ৫ লক্ষ ৭০ হাজার ফিট। ফিল্মের ব্যবহার বিষয়ে একটা লক্ষ্য করার বিষয়ও আছে। ১৯৫৫—৫৬তে যা কাঁচা ফিল্ম আমদানী হয়েছে, তার মোট পরিমাণ থেকে চলচ্চিত্র শিল্প ব্যবহার করেছে দেখা যায় ১৮ থেকে ২০ কোটি ফিট (ভারতের তিনটি কেন্দ্র মিলিয়ে চলচ্চিত্র শিল্পের মাসিক ফিল্ম খরচ হচ্ছে ১·৮০ কোটি ফিট)। অর্থাৎ মোট পরিমাণের মধ্যে থেকে ১০।১২ কোটি ফিট বা প্রায় ⅓ ভাগ অন্য কাজে নিয়োজিত হয়, যার একটি প্রধান অংশের ফিল্মস ডিভিসন। বর্তমানে আমদানী কমে যাওয়াতে ফিল্ম ডিভিসন আদির জন্য আগেকার সেই ১০।১২ কোটি ফিট ফিল্মই বরাদ্দ থাকবে, না এখনকার যা আমদানী তার ⅓ ভাগ বরাদ্দ হবে, সে বিষয়ে কোন স্পষ্ট বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যায় নি। ধরাই যাক, চলচ্চিত্র শিল্প হিসেব মতো তার ভাগে পাবে মোট আমদানীর ⅔ অংশ বা ১২ কোটি ৩ লক্ষ ৮০ হাজার ফিট। এই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনার গণ্ডী সংক্ষেপ করে শুধু কলকাতার অবস্থার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা যাক।

১৯৫৭র সেন্সর তালিকায় দেখা যায় কলকাতায় তোলা মোট ছবির সংখ্যা ৫৪; তার আগের ক বছর ধরেও প্রায় একই সংখ্যাই চলে আসছে। সুতরাং হিসেবটা বার্ষিক ঐ ৫৪ খানি ছবির উৎপাদনের ভিত্তিতেই ধরা যেতে পারে। গত ক'বছর ধরেই দেখা যাচ্ছে কলকাতায় তোলা ছবির গড়পড়তা দৈর্ঘ্য প্রায় ১৩ হাজার ফিট; এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ তৈরী সেন্সর করা ছবির গড়পড়তা দৈর্ঘ্য। ছবি তোলার সময়, বলাবাহুল্য, ফিল্ম আরও বেশী খরচ হয় এবং মোটামুটিভাবে বিভিন্ন খাতে তা এই দাঁড়ায়—দৃশ্য তুলতে সেন্সর করা দৈর্ঘ্যের গড়পড়তা চার গুণ ফিল্ম লাগে; শব্দ তোলার জন্যে প্রায় পাঁচ গুণ; আর সম্পাদনার জন্যে জোড়ার প্রিন্ট বা রাশ প্রিন্ট ও সেন্সর প্রিন্ট বাবদ দুগুণ ফিল্ম খরচ হয়। এর পর সম্পাদিত সম্পূর্ণ ছবির গড়পড়তা রিলিজ প্রিন্ট (প্রথম মুক্তিকালীন প্রিন্ট) সংখ্যা হচ্ছে ছবিপিছু ১১ বা একুনে রিলিজ প্রিন্ট মোট ৫৪। খানি ছবির জন্য দাঁড়ায় ৫৯৪। অর্থাৎ এই হিসেবের ভিত্তিতে কলকাতার ছবি তোলা নিয়ে মুক্তিকালীন প্রিন্ট সমেত বার্ষিক কাঁচা ফিল্ম খরচ দাঁড়ায় মোট ১ কোটি ১২ লক্ষ ৭২ হাজার ফিট (দৃশ্য তোলায় ২৮ লক্ষ ৮ হাজার; শব্দ তোলায় ৩৫ লক্ষ ৩০ হাজার; সম্পাদনা প্রিন্ট ও সেন্সর প্রিন্ট বাবদ ৪২ লক্ষ ১২ হাজার এবং মুক্তিকালীন প্রিন্ট ৮৭ লক্ষ ২২ হাজার)। সুতরাং সারা ভারতে নিয়ন্ত্রণ আইন প্রবর্তিত হবার আগে মোট যে পরিমাণ কাঁচা ফিল্ম আসছিল কলকাতা তা থেকে নিচ্ছিল শতকরা মাত্র ৬⅓ ভাগেরও কম। এখনকার বণ্টন ব্যবস্থায় কলকাতার ভাগে যদি এই শতকরা হারটিই বজায় রাখা হয়, তাহলে মোট ফিল্ম পাওয়া যাবে ১,১৭,৩৭,০৫০ ফিট। অর্থাৎ আগে যে দরকার হচ্ছিল ১ কোটি ১২ লক্ষ ৭২ হাজার ফিট, আর নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থায় যা বরাদ্দ বলে ধরা যায় তার মধ্যে তফাৎ হচ্ছে সাড়ে পাঁচখানি ছবির, অর্থাৎ বছরের উৎপাদন সংখ্যা কমে ৪৯-৫০ খানির মতো দাঁড়ায়। এটা এমন মারাত্মক কিছু অবস্থা নয়, সামান্য একটু এদিক-ওদিক করে নিলে আগেকার ৫৪-৫৫ খানি বার্ষিক উৎপাদন অব্যাহত রাখা অসম্ভব নয়। ব্যাপার কিন্তু একেবারেই অন্য রকম দাঁড়াতে যাচ্ছে, ফিল্ম বণ্টন ব্যবস্থাটা ঠিক মতো হয়নি বলে। এবং নিয়ম-কানুন এমন সব করা হয়েছে যার ফলে ছবির সংখ্যা কমবার, ছবির উৎকর্ষ হানি হবার এবং ষ্টুডিওর কর্মী ও কুশলীদের বেকার অবস্থায় পড়বার আশংকা দেখা দিয়েছে।

নিয়ম হয়েছে ১৯৫৭র ৭ই জুনের আগে যার কোন ছবি সেন্সর করা ছিল না তাকে নিয়মিত বা 'রেগুলার' প্রযোজক বলে গণ্য করা হবে না। অর্থাৎ এস বি ইণ্টার ন্যাশনালের ('পরশ পাথর', 'লৌহকপাট', 'অযান্ত্রিক') মতো প্রযোজক, যেহেতু ঐ তারিখের মধ্যে কোন ছবি সেন্সর করাতে পারে নি, সুতরাং তারা এবার কোন ছবি তুলতে পারবে না, পারলেও তাদের কথা বিবেচনা করা হবে সবারের শেষে। লাখ কতক টাকা এই শিল্পে নিয়োজিত করে সটান তাদের পাততাড়ি গুটোতে হবে। এদের মতো চুটিয়ে ছবির ব্যবসা করবার উদ্দেশ্য নিয়ে কেউ যে এসে এক সংগে কয়েকখানি ছবি তোলার হাত দেবে এখন আর চলবে না, কারণ নিয়ম করা হয়েছে যে, একজনকে একবারে একখানির বেশী ছবি তোলার ফিল্ম দেওয়া হবে না। ব্যবসার ওপর এই ধরণের নিয়ন্ত্রণ সংবিধানসিদ্ধ কিনা, এ কথাটা ভেবে দেখবার। চিত্র প্রযোজকদের অনেকেরই মতে কলকাতায় কোটা বসিয়ে ফিল্মের ব্যবহার কড়াভাবে নিয়ন্ত্রণের কোন দরকারই করে না। তাঁরা বলেন, কলকাতায় গত দশ বছর ধরেই গড়পড়তা বছরে পঞ্চাশখানি ছবি হয়ে আসছে, সে সংখ্যা যে বাড়বে, অর্থাৎ এখন বছরে যতো লোক ছবি তুলতে আসে হঠাৎ তাদের সংখ্যা বৃদ্ধিলাভ করবে এমন কোন সম্ভাবনা আদৌই নেই। আর, আমদানী কমিয়ে কলকাতার ভাগে যে পরিমাণ ফিল্ম বরাদ্দ থাকছে তা ছবির দৈর্ঘ্য কমিয়ে এবার হাজার ফিট করে নিলে আর সেই সংগে মুক্তিকালীন প্রিন্টের সংখ্যা এগারো করে নিলেই প্রায় কুলিয়ে নেওয়া যাবে।

ফিল্ম যেভাবে বণ্টন করা হয়েছে তা নিয়ে প্রযোজকদের নানা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। ফিল্ম সবটাই এক সংগে দেওয়া হয় না, কিছু কিছু করে দেওয়া হচ্ছে। ফিল্ম যা দেওয়া হয় সেটা যথার্থই ছবি তোলায় খরচ হয়েছে কিনা তার প্রমাণ শুধুমাত্র লেবরেটারীর সার্টিফিকেট দাখিল করলে হবে না। যা তোলা হয়েছে তা আঞ্চলিক উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্যদের দেখাতেও হবে। এ নিয়ে প্রযোজকরা আপত্তি তুলছেন। তাঁদের প্রথম আপত্তি, উপদেষ্টা-মণ্ডলীর সদস্য যাঁরা তাঁরাও চিত্র-প্রযোজক, কাজেই কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রযোজককে কেন তাঁরা তাঁদের ছবি দেখাবেন? উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্যদের এক জন একখানি নির্মীয়মাণ ছবির কিয়দংশ দেখে, যা তোলা হয়েছে তা ঠিক মতো সাজিয়ে সম্পাদিত করে তাঁকে না দেখালে তিনি আরো ফিল্ম পাওয়া সম্পর্কে কোন কথাই বলবেন না বলে জানিয়ে দেন। কারণ তিনি যা দেখেছেন তা তিনি বুঝতে পারেন নি। প্রযোজক বলেন, যতোটা তিনি তুলেছেন সেই পরিমাণটি ঠিক আছে কিনা, তার চেয়ে বেশী কিছু তিনি বোঝাতেই বা যাবেন কেন। বদলি বা 'অল্টারনেট শট' নিয়ে নাকি আপত্তি তোলা হয়েছে। প্রযোজকদের বক্তব্য হচ্ছে, ছবির উৎকর্ষের জন্যে অনেক দৃশ্য তোলার সময় 'অল্টারনেট শট' নিতেই হয়, পরে ভেবে-চিন্তে তার মধ্যে যে শটটি মানায় সেটি রেখে দেন, তা নিয় উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য কেন মাথা ঘামাবেন? উপদেষ্টা মণ্ডলীর দুজন সদস্য নিজেরা প্রযোজক হয়েও প্রযোজকদের অসুবিধার দিকটা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে যাচ্ছেন বলেও অনুযোগ শোনা যায়। প্রযোজকরা বলছেন, ফিল্ম হাতে না পাওয়া পর্যন্ত তাঁরা শুটিং তারিখ ঠিক করতে পারছেন না, আর ফিল্ম পাওয়ার যোগ্যতা লাভ করলেও উপদেষ্টা-মণ্ডলীকে সন্তুষ্ট করে পারমিট বের করা সহজ নয়। যা তোলা হয়েছে তা দেখানো আছে, দেখার পর উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য যদি বোঝেন তবেই আবার এক দফা ফিল্ম পাওয়া যাবে। ষ্টুডিও কবে কবে পাওয়া যাবে, শিল্পীদের কবে কবে পাওয়া যাবে ইত্যাদি সব ঠিক করতে না পারলে আর্থিক লোকসান তো বটেই, কাজও সব ওলট-পালট হয়ে যায়। আবার ষ্টুডিওর, শিল্পীর খালি তারিখ মিলিয়ে শুটিং ঠিক করা বড়ো সোজা নয়। নানা সূত্রের সংগে চুক্তির খেলাপ হয়ে যায়। সময় মতো ছবি তৈরী করে না উঠতে পারলে মুক্তির জন্য চিত্রগৃহ পাওয়ারও অসুবিধে ঘটে যায়। একই ছবির জন্যে একই রকমের ফিল্ম না পাওয়ার কথাও শোনা যাচ্ছে। এখানে বেশী চলে কোডাক আর গেভার্ট—প্রযোজকরা বলেন তাঁরা পাচ্ছেন কখনো এ-ফিল্ম, কখনো ও-ফিল্ম: এতে ফটোগ্রাফীর তারতম্য ঘটছে।

(৮ম পৃষ্ঠার দ্রষ্টব্য)

শিলঙের চিঠি

বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

কথায় বলে 'বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা'। আসাম বিধানসভা ভবন থেকে বেরিয়ে দু'পা হাটলেই পুলিশবাজারে 'বিজু' সিনেমা—বেশ কিছুদিন থেকে ইট কাঠ সিমেণ্টের পলেস্তারা লাগিয়ে নিয়ন লাইট বসিয়ে যতটা মালিকের সাধ্য ও বিবেচনায় কুলোয়, আধুনিক করার চেষ্টা চলছে। বিধানসভার জয়ন্তিয়া সদস্য লারসিং খারসিমের দেখে মনে খট্‌কা লাগলো, সিনেমাগৃহ সংস্কারের ঢেউ ত বোধ হয় উদ্বেল হয়ে নিজের জমি ছেড়ে রাস্তার ওপর উঠেছে। তিনি এক প্রশ্ন করে বসলেন বিধানসভায়। প্রশ্নটি যথারীতি সরকারের কাছে পাঠানো হোল কিন্তু তারপরে অনেকদিন গেল, জবাব আর আসে না। খোঁজ করে দেখা গেল তিনটি বিভিন্ন সরকারী দপ্তরে প্রশ্নটি পাঠানো হয়েছিলো সেক্রেটেরিয়েট থেকে তথ্য অনুসন্ধানের জন্য এবং তিন জায়গায়ই ফাইলগুলো খোয়া গেছে!

সোজা কথায় ফাইলগুলো চুরি হয়েছে। কে বা কারা করেছে এখনো জানা যায় নি, কোন দিন জানা যাবে কি না বলা যায় না। একটু নিন্দুকের সুরে কথা বলছি কিন্তু তার কি সংগত কারণ নেই? কিছুদিন আগে একই মালিকের আরেকটি সিনেমাগৃহ নিয়ে মিলিটারী কর্তৃপক্ষের সংগে একটা বিরোধ চলছিল। সেই সংক্রান্ত একটি ফাইল ক্যাণ্টনমেণ্ট আফিস থেকে উধাও হয়ে গেল। পুলিশে খবর দেন ক্যাণ্টনমেণ্ট কর্তৃপক্ষ কিন্তু কোন ফল হোল না—ফাইলটি এখনো খুঁজে পাওয়া যায় নি। ভারত সরকারের জাঁদরেল ডিফেন্স ডিপার্টমেণ্টের ওপরেই যদি হাত সাফাইয়ের জোরে ভুড়ুগ মারা চলে তাহলে আসাম সরকারের ওপর চলবে না কেন?

বিধানসভার সদস্যের প্রশ্ন। তাই একটা জবাব অবশ্য সরকারকে দিতেই হোল কোন রকমে। এবং জানা গেল যে খাসি জয়ন্তিয়া পাহাড়ের ডেপুটি কমিশনার সরজমিনে তদন্ত করে রায় দিয়েছেন যে সংস্কারের ফলে সিনেমাগৃহের আয়তন স্ফীতি লাভ করে সদর রাস্তার সীমা লঙ্ঘন করেছে। শিলং মিউনিসিপ্যালিটির মত অবশ্য উল্টো। সুতরাং আরো অনুসন্ধান প্রয়োজন।

একজন সদস্য অতিরিক্ত প্রশ্ন করলেন, এই সিনেমাগৃহের মালিকদের কেউ কি মিউনিসিপ্যালিটিতে সরকারের মনোনীত সদস্য নন? মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিমলাপ্রসাদ চালিহা জবাবে জানালেন তিনি ঠিক জানেন না, খোঁজ নিয়ে বলতে হবে। শিলং শুদ্ধ লোক কিন্তু জানেন যে "বিজু" সিনেমার মালিক-গোষ্ঠীর শ্রীমহাবীর গোয়েঙ্কা সরকারের মনোনীত সদস্য।

ফাইল চুরির সংগে সংশ্লিষ্ট এই সন্দেহে ডেপুটি কমিশনারের আফিসের একজন কেরাণীকে সাসপেণ্ড করা হয়েছে। আর কারো কিছু হয় কি না দেখতে হবে। শ্রী চালিহা একাধিকবার ঘোষণা করেছেন দুর্নীতি তিনি দমন করবেন, এই ঘটনার পরিণতি কি হয় তার থেকে বোঝা যাবে। বাঘের জোর বেশী, না ঘোগের, না কি এও সম্ভব যে দুজনের মধ্যে একটা পারস্পরিক সাহায্য চুক্তি বলবৎ আছে?

প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে কংগ্রেস অধিবেশনের পরে এই প্রথম বিধানসভার অধিবেশন হচ্ছে। সুতরাং বিরোধী-দলের সদস্যেরা নানা প্রশ্ন করে প্রমান করবার চেষ্টা করছেন যে দলীয় স্বার্থে আসাম সরকার বিপুল অর্থ ব্যয় করেছেন। এক প্রশ্নের জবাবে জানা গেল প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য ২,৫৭,৯৪৮ টাকা ব্যয় হয়ে গেছে এবং আরো হয়ত কিছু দাবী দেওয়া বাকী আছে। ভি-আই-পিদের যথাবিহিত সম্মান দিতে লেগেছে কত? ২৪,৭৮৮ টাকা ৮৪ নয়াপয়সা।

বুঝতেই পারছেন ৮৪ নয়া-পয়সার হিসেবও যখন বাদ যায় নি আসামের কংগ্রেস সরকার অনেক যত্ন নিয়ে বিধানসভার সদস্যদের প্রশ্নের উত্তর রচনা করেন। তাছাড়া উত্তরদানে কোথাও কোনরকম ত্রুটি রইলো কি না তাও ভাল করে দেখা হয়। ওরকম আর পাবেন না যে কেউ পরলোকগত হয়েছেন কয়েক মাস হোল অথচ তাঁর নাম এখনো নানাকমিটির তালিকায় রয়েছে। একজন সদস্য প্রশ্ন করলেন লোকপ্রিয় গোপীনাথ বরদলৈ মেমোরিয়াল টি-বি হাসপাতালের ম্যানেজিং কমিটিতে কে কে আছেন? জবাবে যে তালিকা পাওয়া গেল তিন নম্বর নাম—"Late Dr. Hem Chandra Barooah (Recently dead)"!

বাঙ্গলার অপরাধ ও রাজনীতি(২)

নিখিল মৈত্র

অপরাধ ও রাজনীতির সংযোগ বাঙলার সামাজিক জীবনে যে নতুন অভিশাপের সৃষ্টি করেছে তা ভাল করে বুঝতে গেলে প্রয়োজন অপরাধী গোষ্ঠীদের সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা। সাধারণ সমাজবিরোধীদের সঙ্গে এদের প্রভেদ প্রচুর। সমাজ জীবনে আজ এরা ঘৃণ্যার পাত্র নয়। নানা কারণে এদের পরিচিতি সম্পর্কে সচেতন হয়েও, সাধারণ মানুষ এই গোষ্ঠী বা তাদের কাজকর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করাই উচিত বলে মনে করে। এই সমস্ত দল-উপদলের রেকর্ড চরিত্র বর্ণনা করছি। তাদের পরিচয় দিতে গুণাগুণ বর্ণনা বতটা সম্ভব সঠিকভাবে করার চেষ্টা করেছি, তবে কিছুটা মিলিয়ে মিশিয়ে দিতে হয়েছে। নাম সবই কাল্পনিক।

সুবেদার ঘোষের কাহিনী

সুবেদার ঘোষ স্থিতীয় মহাযুদ্ধের শেষের দিকে ইউরোপে গিয়েছিল। সেখানে অপরাধী দুনিয়ার সঙ্গে পরিচয় ঘটে; কিন্তু নিজে কোনও সমাজবিরোধী কাজে অংশ নেয়নি। সামরিক জীবন শেষ হয় '৪৬ এর গোড়ার দিকে। কলকাতার ধূমায়িত অসন্তোষ তখন মাঝে মাঝে ছোট ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে লেলিহান পার্থার জন্মলে উঠছিল। সুবেদার ঘোষ বেকার জীবনের একঘেয়েমি, ফাটাবার জন্যে ছোট-খাটো সংঘ ও সংঘর্ষে ছেলেদের নেতৃত্ব দিল। স্বল্পভাষী, কর্মঠ মানুষটা কিছুদিনের মধ্যেই সুবেদার দা নামে পরিচিত হলো। তারপর এলো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। হাতৃহত্যার সর্বনাশা আগুনে নিয়ে খেলার মাতলো পাড়ার ছেলেরা। সুবেদারদা এবার হাতে নিল সর্বময় নেতৃত্ব। অব্যর্থ তার হাতের টিপ। বোমা, রাইফেল হাতে নিয়ে সে হয়ে উঠলো মরিয়া। নরহত্যা, লুটে, গৃহদাহ, ডাকাতি সবই একে একে আরম্ভ হলো। এরকম সাংঘাতিক দলপতিকে হাতে রাখতে রাজনৈতিক নেতাদেরও আগ্রহ কম নয়। স্বাধীনতার পর সুবেদার দা-কে কোনও এক বাহিনীর উপদলপতি করা হয়। উপরতলার নেতারা এখন রাষ্ট্রক্ষমতা হাতে পেয়েছেন। তাঁরা উপদলপতির কদর কেরামতি বোঝেন। স্বাধীন দেশে, স্বাধীন নাগরিকএর দায়িত্ব কর্তব্য সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে বললেন : "অবাধ্য ছেলে দেশদ্রোহীকে শায়েস্তা করে, দেশের কৃতীসন্তান ভূমি, দেশের প্রতি কর্তব্য প্রতিপালন করো।" কথা ভাল কাজ, খুব নিরাপদে করা হলো। কিন্তু, সঙ্গে সঙ্গে কিঞ্চিৎ অর্থাগমের জন্যে ডাকাতি। দুই একবার নেতারা ডেকে একটু ধমকালেন। তারপর আবার পুলিশ লাগলো। এইভাবে সুবেদার ঘোষ আজ অপরাধী দুনিয়ার এক জ্যেষ্ঠের স্থান পেয়েছে। রাজনীতি বড় বাজে জিনিষ বলে সুবেদার আক্ষেপ করে। কিন্তু, নির্বাচনে, মিটিং, মিছিলে সুবেদারকে দেখা যায়।,

নেতাদের দেহরক্ষী রাধাশ্যাম রায়

রাধাশ্যাম রায় নামটা আমার দেওয়া। কিন্তু, কোনও না কোনও নামে ছেলের বাইরে বা ভেতরে এই স্থানীয়বাবু, বিনয়ী ব্যক্তিটি রয়েছে। রাধাশ্যাম কলকাতার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কথা ভাসাভাসা পূর্ববঙ্গের শহরে বসে শুনেছিল। দেশবিভাগের পর আসে কলকাতার শহরতলীতে। কলেজ জীবনে পরিচয় ঘটে উদ্যমক্ষ কলোনীর অপরাধী দলের সঙ্গে। কলোনীর ঝগড়া-ঝন্দতে মাতব্বরের উঠে রাধাশ্যাম। রাজনীতিতেও যোগ দিল। প্রগতিবাদীরা তার বিশেষ বন্ধু। তারপর, অর্থের প্রয়োজনে ডাকাতি, মারপিট। বিগত নির্বাচনে রাধাশ্যাম ও তার দলের ছেলেরা সুপরিচিত নেতাদের দেহরক্ষীর কাজ করেছে। সমস্ত অবস্থায় নেতাদের নাকি ছায়ার মতন তারা অনুসরণ করতো। সন্দিগ্ধওএ হাসি হেসে জিজ্ঞাসা করে-ছিলাম; "বে-আইনী রিভলবার, পিস্তল নিয়ে দেহরক্ষী ধরা পড়লে নেতাদের মুখে যে চুনকালি পড়বে — এতর তাঁদের নেই।" "গণতান্ত্রিক দেশে নির্বাচনের সময়ে কি ধরপাকড় করা চলে। আর কালই হয়তো তাঁরা মন্ত্রীর মসনদে বসবেন। সুতরাং পুলিশই বা এত নির্বোধ হবে কেন?" "গণতন্ত্রী" অপরাধীর কথা প্রগলভ বাচালের অর্থহীন প্রলাপ নয়।

রাজপুত অযোধ্যা সিং

অযোধ্যা সিং সরযূপারী রাজপুত, বর্ণিও তার পিতৃদত্ত নাম অন্যকিছু। কলকাতার লিলুয়াঞ্চলে ৫০ বছরের উপরে তাদের পরিবারের বসবাস। পরিষ্কার বাঙলা বলে। অপরাধীদের সঙ্গে তার পরিচয় কিশোর জীবন থেকে। রাজনৈতিক মর্যাদা পেয়েছে অনেকদিন পরে, ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের কল্যাণে। বিপক্ষ ইউনিয়নের লোককে মারপিট, মিটিং ভাঙ্গা, জোর করে মজুরদের কাছে চাঁদা আদায় এবং সকলের উপরে শোষণ-শাসন মুক্তির প্রতীক ঝান্ডার জয়গান — এমনি করে অযোধ্যা অপরাধী রাজনৈতিক পাণ্ডা হয়ে উঠেছে। হরতালের ভয় দেখিয়ে মালিকের কাছ থেকে পকেটভারি করেছে বলেও অনেকে অযোধ্যার সম্বন্ধে অপবাদ দেয়। নির্বাচনের সময় এত মজুর ভোটের তাগিদে সব কাজে আসতে হয়। মাঝে মাঝে এদল বদল করেও। অযোধ্যা রাজনীতির সঙ্গে যোগ রেখেছে।

পুলিশের হাতে ধরা পড়লে, অনেক অপরাধীই অভিযোগ করে যে তাদের তাঁবিদারকারীদের অবস্থা বিবেচনা করে, তাদের সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। বিরাট কোনও ঘটনার পর ধরা পড়লে নাকি "থার্ড ডিগ্রী" পুতাতাহরও বন্দোবস্ত করা হয়। তবুও যুবক বলছিল যে এরকম অবস্থায় পড়লে আমাদের উপরে নির্দেশ : এমন লোক ও ঘটনার উল্লেখ করো, যা পুলিশ জানে। যারা পুলিশ হাজতে আছে, তাদের সম্বন্ধে ঘুণাক্ষরেও কিছু বলো না। জিজ্ঞাসাবাদের সময় একেবারে না, না বলে যাও।।

কথা শুনে শিউরে উঠে-ছিলাম। বহুদিন আগে, কিশোর জীবনে যেন এ সব কথা কোথাও শুনেছিলাম। বিশ্বাস, শ্রদ্ধা সব ধুয়ে মুছে যাচ্ছে? একটু চেপে ধরতেই নবীন, কিন্তু বিপজ্জনক অপরাধী স্বীকার করলো যে অভিযুক্তের কোনও দাদার কাছ থেকে সে নাকি এই-সব শিখেছে। তাদের পথ-প্রদর্শক, বুদ্ধিদাতাদের মধ্যে কত লোকই না আছে।

আপেয়ারান্স কোথা থেকে আসে?

অপরাধী গোষ্ঠীর প্রধান বল — আপেয়ারান্স। বাইরে থেকে নাবিকদের মারফৎ অস্ত্র আমদানি অনেক বেড়েছে। পাকিস্তান সীমান্ত পার হয়েও মারণাস্ত্র আসে। এদেশেও গোপনে অস্ত্র তৈরি হয়। অপিসমূলের ইতিহাসে পড়েছি যে বোমা তৈরির ফরমুলা তাও সাধনায়, কত পরিশ্রমে সংগ্রহ করা হতো। এখন কিন্তু এই প্রস্তুত প্রণালী বহু লোকের নখদর্পণে। কিছু-দিন আগে, এক বিশেষ 'বোরের' (ছিদ্রবৃত্ত) রিভলবার অপরাধী-দের অস্ত্রাগারে আছে মনে করে, পুলিশ সেই বো রে র রিভলবার লাইসেন্স প্রত্যাহার করে ভিন্ন বোরের আগ্নেয়াস্ত্র লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্য ক্তি দে র দেয়। অপরাধীরাও সঙ্গে সঙ্গে নতুন বোরের মারণাস্ত্র সংগ্রহ করে। পুলিশের কাছে নিজেদের মত ও পথ পরিবর্তনের চূড়ান্ত প্রমাণ হিসেবে অস্ত্র সমর্পণের রেওয়াজ আরম্ভ হয়েছে। কেউ অবশ্য বিশ্বাস করে না যে সব কিছু তারা উজাড় করে দিচ্ছে। রেখে ঢেকে কাজ করছে বলেই মনে হয়। অপরাধীরা বলে যে নেতারাই আমাদের একেবারে নিঃসম্বল হতে দেন না। তাতে তাঁদেরও মুস্কিল। দুটো স্টেনগান, তিনটে পিস্তল সরকারী মালখানায় জমা দেবার পর যে আবার নতুন করে ঐ সব সংগ্রহ করা যাবে না, এমন নয়। নিজেদের মধ্যে কেনা ও ভাড়া দুইই পাওয়া যায়। পরস্পরের মধ্যে চিঠিপত্র দেওয়ার জন্যে বিভিন্ন রকমের সাঙ্কেতিক ভাষার ব্যবহারও এদের মধ্যে প্রচলিত। টাকাকড়ি গচ্ছিত রাখার তল্পী-দারও আছে।

রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশী বলেই বোধ-হয় অপরাধীদের কিছু কিছু দানধ্যান আছে। পাড়ার দুঃস্থ পরিবারকে কিছু অর্থ সাহায্য দিল। কারুর জন্যে সপ্তাতিপত্র গৃহস্থের কাছে তাঁবির পৌঁছে দেয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে অন্যরাতির পেছনে মতলবও থাকে — দলে লোক নিয়ে আসা, নতুন ছেলেকে অপরপাধী করে তোলা।

কলকাতার কোনও সুপরিচিত

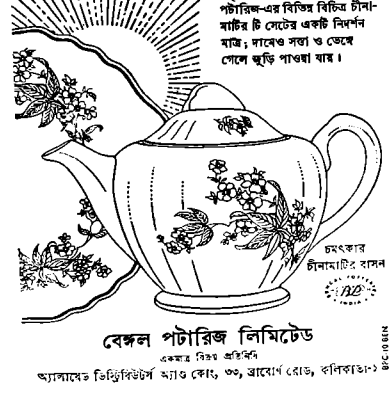

অভিজাত 'সানশাইন' গঠনের সাবলীল টানা টানা রেখাগুলি 'করগেট-মি-নট' এর অপরূপ সৌন্দর্যকে নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলেছে। মনোরম সোনালী ধারগুলো আরও পরিপাটি ক'রে তুলেছে তার অঙ্গসজ্জাকে। সুদৃশ্য 'করগেট-মি-নট' বেঙ্গল পটারিজ-এর বিভিন্ন বিচিত্র চীনা-মাটির টি সেটের একটি নিদর্শন মাত্র; দামেও সস্তা ও তেজে গেলে ভুড়ি পাওয়া যায়।
চমৎকার চীনামাটির বাসন
বেঙ্গল পটারিজ লিমিটেড
একমাত্র বিক্রয় প্রতিনিধি
অ্যালায়েন্স ডিস্ট্রিবিউটর্স অ্যাণ্ড কোং, ৩৩, ব্রাবোর্ণ রোড, কলিকাতা-১
BPL 0181N

দর্পণ

(একমাত্র বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিকী)

চাঁদার হার

ষৈমাসিক——তিন টাকা
ষাণ্মাসিক——ছয় টাকা
বার্ষিক——বারো টাকা

দর্পণ প্রতি শুক্রবার নিয়মিত প্রকাশিত হয়,
যে কোন সংখ্যা থেকে গ্রাহক হওয়া যায়।

টাকা কড়ি পাঠাবার ঠিকানা—
ম্যানেজার, দর্পণ
৭নং চিত্তরঞ্জন এভেনিউ
কলিকাতা—১৩

গ্রন্থ পরিচয়

জল জাল জেলে

[তিতাস একটি নদীর নাম— অদ্বৈত মল্ল বর্মণ। পুঁথিঘর। ছয় টাকা।

গঙ্গা—সমরেশ বসু। বেঙ্গল পাবলিশার্স। সাড়ে পাঁচ টাকা]

অজানা অচেনা সমাজ নিয়ে বাঙলা সাহিত্যে কিছু কাজ হয়েছে এবং হচ্ছে। আঞ্চলিক সাহিত্যও কিছু আছে। কিন্তু আমাদের জানা একটা বিশেষ সমাজ বা সম্প্রদায় নিয়ে সাহিত্য রচনার দৃষ্টান্ত বিরল। কতকগুলি সমাজ রয়েছে ব্যক্তি বা জীবিকা দিয়েই যাদের পরিচয়। এই অর্থেই এরা বিশেষ। এই সব সমাজের কিছু কিছু মানুষ আমাদের চেনা। কিন্তু তাদের সমাজ আমরা চিনিনে। হাসি কান্না আশা-স্বপ্ন গড়া তাদের জীবনের খবরও বিশেষ রাখিনে। এদের কাজ আমাদের দৈনন্দিন প্রয়োজন কিছুটা মেটান। তারপরই তারা হারিয়ে যায়। তাদের কথা আর ভাবিনে।

এমনি এক সমাজ জেলে-মালোদের। নদীমাতৃক পূর্ব বাঙলার অস্তিত্ব আজ শুধু মানচিত্রে ও মানসচিত্রে। জলের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা বাঙলার জীবন ছাড়ের কথা আজ স্মৃতি-নাম। একুল জল চোখে পড়ে না। জলের কথা, জেলের কথাও আর আসে না।

ভারতের স্বাধীনতায় পূর্ব বাঙলার বৃহত্তর জীবন লণ্ডভণ্ড হয়েছে। জেলে মালোরাও কী ব্যাপার হয়েছে? পদ্মা নদীর মাঝি-সমাজে এর প্রতিক্রিয়া কী কিছু? জেলে মালোরা হয়ত নিঃস্ব বিপর্যস্ত। সহায় সম্বলহীন তারা। হয়ত অন্য জীবিকা সন্ধানে ব্যস্ত। জীবন-সংগ্রামে সকলে হয়ত নিজ নিজ শক্তিতে টিকতে পারেনি।

পশ্চিম বাঙলায় নদী নেই। অন্ততঃ জাল-সম্বল জীবিকার মত জল নেই। আছে গঙ্গা। অতি শান্ত সাধাসিদা গৃহপালিতা নদী। সে দুর্জয় সাহসে নিয়ে এরা পদ্মা যেমনা পাড়ি দিত আছে, সন্ধানে এখানে তা নিষ্প্রয়োজন। সেই অসামান্য জীবনপ্রত্যয় কী নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার কাজে লাগবে? পূর্ব বাঙলা ছেড়ে-আসা মধ্যবিত্ত বা নিঃস্বশ্রেণীর এখানকার জীবন-ধারায় নিজেদের হয়ত সহজেই মিশে গেছেন। কিন্তু ব্যক্তি দিয়ে বর্গের পরিচয় — তারা?

এ নিয়ে অনুসন্ধান করার প্রয়োজন আছে। বিপর্যস্ত-জীবন এদের সমাজ নিয়ে নতুন সাহিত্য সৃষ্টি হচ্ছে। নতুন জীবনের সমস্যার খবর পাওয়া যাবে তাতে। জল-ছাড়া জেলের জীবন নিয়ে সার্থক শিল্পসৃষ্টি করবেন কেউ।

জেলেদের জীবন নিয়ে সম্প্রতি প্রকাশিত দু খানি উপন্যাস * হাতে পড়তে এই কথা-গুলিই মনে আসে। মেঘ-জল-মাটি ঘেরা আশা-বঞ্চনা আনন্দ-বেদনার যে ছবি এ দুটি গ্রন্থে আঁকা হয়েছে তা থেকেই তাদের বর্তমান জীবনযাত্রা সম্বন্ধে আগ্রহ প্রবল হয়ে ওঠে।

বিষয়বস্তুর এক হওয়া সত্ত্বেও দুটি গ্রন্থের তুলনা মূলক আলোচনা সম্ভব নয়। দুটি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এই সমাজ দেখা হয়েছে।

মল্লবর্মণ এই সমাজেরই একজন। সংবেদনশীল তার মন। তিনি তাদের মধ্যেই জন্মেছেন, বড় হয়েছেন, তাদের সুখ-দুঃখের অংশভাগী হয়েছেন। আর হৃদয়ের রক্ত দিয়ে ছবি এঁকেছেন সেই সমাজের। অতি করুণ ও বিষণ্ণ সেই ছবি। কিন্তু অতি সুলিখিত। দুর্লভ অন্তর্দৃষ্টি এবং প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা অনবদ্য কাহিনীর জন্য বাঙলা সাহিত্যের দরবারে এ গ্রন্থের আসন কায়েম হবে।

মেঘনার ধারে কাছে তিতাস। তারই ধারে এক গ্রামের তিন দুরন্ত মেয়ে নিয়ে কাহিনী শুরু করেছেন মল্লবর্মণ। একই সময়ে কিশোরের বাবা, কিশোর, ও কিশোরের ছেলে অনন্তকে নিয়ে এই কাহিনী। কিশোর বন্ধু সুবলকে নিয়ে মাছ ধরতে গিয়েছিল বড় নদী পেরিয়ে মেঘনায়। সেখানে এক কিশোরীর সঙ্গে তার ভাব হয় ও বিয়ে হয়। দেশে ফেরার পথে নৌকা থেকে বৌ লুটে হারিয়ে যায়। বৌ কিন্তু মান বাঁচাতে ডাকাতের নৌকা থেকে জলে ঝাঁপ দেয়। দু জন জেলে তাকে উদ্ধার করে। বৌ ছিল সম্ভানসম্ভবা। সেই ছেলেই অনন্ত। অনেক খোঁজ করে বৌ ছেলে নিয়ে আসে কিশোরদের গ্রামে। কিশোর তখন বৃদ্ধ উন্মাদ বৌয়ের শোকে। সুবল মারা গেছে। বৌ কিশোরের নাম জানে না। সামান্য পরিচয়ের কিশোরকে খুঁজে পায় না এই উন্মাদের মল্লবর্মণ ভেবেছেন তা সঠিক নাও হতে পারে। তিনি ভাল জানেন। কিন্তু ভাওনের একটা পরিণতির দিকে এগিয়ে দেওয়া হয়েছে নিঃসন্দেহে। আর অন্তেই গোটা মালো সমাজের সামগ্রিক জীবনের এক সুন্দর ছবি ফুটে উঠেছে।

এই মর্মান্তিক কাহিনীর ফাঁকে লেখক দেখিয়েছেন বাহির-রের সংস্পর্শে এসে এই সমাজের ভিতে কেমন আলগা হয়ে যাচ্ছে। ছেঁড়া কাপড়, ময়লা গামছা, নৌকা, জাল, গাবের আঠা, খেয়ালখুশীর গানের মাঝে আসে যাত্রাগান। সেই গান বৌকদের মোহ জাগায়। চির-কালের কীর্তন ভজন তাদের ভাল লাগে না। শহুরে মোহে গ্রামের সমাজে ভাঙন ধরে।

কারণটা বিশেষ জোরালো নয়। এবিষয়ে মতানৈক্য হতে পারে। কেন না যাত্রাগান পল্লী-জীবনের উৎসব। অন্য আর সব গ্রামীণ সংস্কৃতির সঙ্গে তাকেও আমরা বাদ্‌ঘরে রাখবার ব্যবস্থা করছি। যা ছিল পল্লীজীবনের স্বতঃস্ফূর্ত উৎসব তা আসের আস্তে লোপ পাচ্ছে — কারণ পল্লীসমাজ শহুরে প্রভাবে এসে আস্তে আস্তে রূপান্তরিত হচ্ছে। তাদের উৎসবকে ধরে রাখব কি করে? জল থেকে মাছকে উঠিয়ে বাদ্‌ঘরে রাখার মত?

এ প্রসঙ্গ এখানে হয়ত অবান্তর। কিন্তু মালো সমাজে ভাঙন ধরার কারণ অনুসন্ধান প্রয়োজন। তার কাজ নিশ্চয়ই সাহিত্যের নয়। কিন্তু তা সাহিত্য ছাড়াও নয়। যে কারণ মল্লবর্মণ ভেবেছেন তা সঠিক নাও হতে পারে। তিনি ভাল জানেন। কিন্তু ভাওনের একটা অর্থনৈতিক কারণও কোথাও আছে। সহজতর জীবিকার সন্ধান।

মল্লবর্মণ আশ্চর্য সফলতার সঙ্গে বেশী রোমান্টিক। এ দুটি তিতাসের পরের মানুষগুলির উল্লেখযোগ্য হলেও মারাত্মক নয়। যে উপলব্ধি জীবনবোধ ও নিরাসক্তির সঙ্গে তিনি এ যুগে যা প্রায় দুঃসাহস। আর কাহিনী বলেছেন তার আবেদন ভাষা তার কাব্যগুণমণ্ডিত। বস্তু

(৯ এর পৃষ্ঠায়)

কাঁচা ফিল্মে সংকট

(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর)

এমন প্রযোজকের নির্মাণের ছবির জন্য দরখাস্ত আসে ৩০ খানি:

অনেক প্রযোজকেরই অভিমত আগে কখনো ছবি তোলেনি এমন হচ্ছে যে, ফিল্মের আমদানী কম প্রযোজকের নির্মাণের ছবির জন্য হবার দরুণ কলকাতার অবশ্য দরখাস্ত আসে ৩১ খানি: আগে বিশেষ খারাপ হবার কথা নয়, ছবি ছবি তুলেছে এমন প্রযোজকের যা তোলা হচ্ছিল তাও কমবার নয়, নতুন ছবির জন্য দরখাস্ত ১৩ কিন্তু ফিল্ম বণ্টন ব্যবস্থাটা এমন- খানি: আর আগে কখনো তোলে ভাবে চলছে যার ফলে একটা নি এমন প্রযোজকের নতুন ছবির সংকটের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। জন্য দরখাস্ত ১১৪ খানি। এ প্রযোজকদের কাছে এ ব্যাপারে যে থেকে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে, বছর বিবৃতি দেওয়া হয়েছে তাতে যেখানে ৫০ খানি ছবি শেষ হয়, দেখা যায় গত ৯ই ডিসেম্বর আর প্রায় অনুরূপ সংখ্যক ছবি কলকাতার যুদ্ধ-প্রবান আমদানী বছর শেষে নির্মাণাধীন অবস্থায় নিরুদ্যমের ফিল্মর জন্য দরখাস্ত থাকে, সেক্ষেত্রে মোট দরখাস্ত এসে আহ্বান করার পর অর্ধেক ছবি রুটেছে ৩০১ খানি। ঐ বিবৃতিতেই তোলা হয়েছে এমন ৪০ জন দেখা যাচ্ছে যে, অক্টোবর ১৯৫৭ নিরুদ্যমক ফিল্মের জন্য দরখাস্ত থেকে মার্চ ১৯৫৮ পর্যন্ত এসে পৌঁছয়; নিরাসিত প্রযোজক, কলকাতার বরাদ্দ করা হয়েছে অর্থাৎ ১৯৫৭র জুন মাস পর্যন্ত ১০ লক্ষ ফিট, এবং এপ্রিল থেকে আগের পাঁচ বছরে কোন স্টুডিও- ডিসেম্বর পর্যন্ত আরো পাওয়া মালিক বলি অন্ততঃ একখানি বাবে ৯০ লক্ষ ফিট, অবশ্য যদি ছবিও সেন্সর করিয়ে থাকেন গভর্ণমেণ্ট আমদানী আরো কমিয়ে প্রযোজকরূপে; অথবা গত তিন না দেন। অর্থাৎ ডিসেম্বর পর্যন্ত বছর ধরে রীতিমতোভাবে প্রতি-এ বছরে মোট ১ কোটি ৮০ লক্ষ স্টান চালিয়ে যাচ্ছেন এবং ঐ ফিট ফিল্ম পাওয়া যাবে। দৈর্ঘ্য সময়ের মধ্যে অন্ততঃ একখানি বেঁচে, প্রিন্ট সংখ্যা কমিয়ে নিলে ছবিও সেন্সর করিয়েছেন; অথবা এই পরিমাণ ফিল্ম থেকে কোন গত তিন বছরে তিনখানি ছবি বণ্টন ঘটবার কারণ নেই, তবুও প্রযোজনা করেছেন এমন প্রযোজক- ফিল্ম বণ্টন ব্যাপারে কেন যে সেন্স করা থেকে দরখাস্ত আসে গোলমাল ঘটছে প্রযোজকদের কাছে ২০ খানি; আগে ছবি তুলেছে সেইটেই বিস্ময়কর লাগছে।

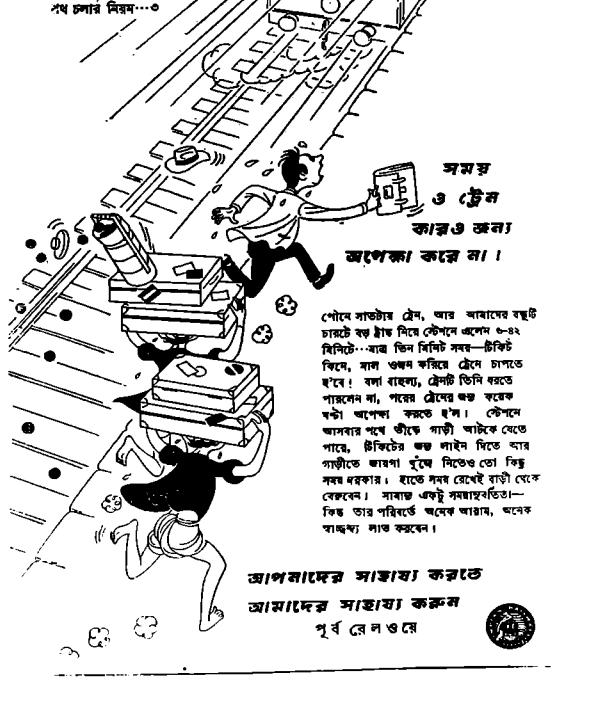

আন্তর্জাতিক সংবাদ

রাশিয়ায় আবার নূতন ধরণের ব্যক্তিপূজার আবির্ভাব

মিঃ ক্রুশ্চেভই 'নূতনদেবতা'?

(নিজস্ব পর্যবেক্ষক)

নিকিতা খ্রুশ্চেভ সোভিয়েট কমিউনিষ্ট পার্টির প্রধান সম্পাদক নির্বাচিত হন ১৯৫৩র মার্চে। পাঁচ বছরের মধ্যেই তিনি আবার রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রীও হলেন। ষ্ট্যালিনও ১৪ বছর দুটি পদই অলঙ্কৃত করেছিলেন। পার্টির সম্পাদক হন তিনি ১৯২২এ। কিন্তু তারপর বিশ বছর কেটে যায় তাঁর প্রধান মন্ত্রিত্বের গদিতে বসতে।

এই বিশ বছরের ইতিহাস একদিকে যেমন চমকপ্রদ অন্যদিকে তেমনি বেদনাদায়ক। একটা পশ্চাদপদ দেশ দ্রুত উন্নতির লাভ করে বিশ্বের অন্যতম প্রধান দেশে পরিণত হয়, কিন্তু ষ্ট্যালিনের নীতির সমালোচকদের অনেকেরই মৃত্যু বরণ করতে হয়।

আর মাত্র একজন নেতা বাকি এককালে অলঙ্কৃত ছেড়ে খ্রুশ্চেভ রাজীনামা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি হলেন করলেন। সবাইকে সোভিয়েটে ম্যালেনকভ। কিন্তু তা ছিল খুব সমর্থনসূচক হাততালি ক্ষণস্থায়ী, ষ্ট্যালিনের মৃত্যুর বেজেছিল। কিন্তু কিসের জন্য পর মাত্র ৯ দিন। এর পরই এ হাততালি? নীতির পরি- এ হাততালি? নীতির পরি- পার্টির প্রধান সম্পাদকের পদ বর্তন হওয়ার লক্ষণ বলে? খ্রুশ্চেভকে ছেড়ে দিতে হয়। মোটেই না।

১৯১১এর রুশিয়া আর ১৯৫০র রুশিয়ার আকাশ পাতাল পার্থক্য। কিন্তু খ্রুশ্চেভের জয়যাত্রার সঙ্গে সঙ্গেও করেকজন নেতা পার্টি নেতৃত্ব থেকে বহিষ্কৃত হয়েছেন এবং মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞায় দীক্ষিত হয়েছেন। অবশ্য খ্রুশ্চেভের আমলের রেকর্ডের সঙ্গে ষ্ট্যালিনের তুলনা হয় না।

সোভিয়েট রাষ্ট্র স্থাপনার পর থেকেই আসল ক্ষমতার অধিকারী হয়েছে কমিউনিষ্ট পার্টি। ১৯৩৬এ নতুন গঠনতন্ত্র প্রবর্তিত হয়। সোপেল এবং বয়স্কাধিকারের ভেটে সর্বোচ্চ সোভিয়েট নির্বাচিত হওয়ার কথা। নীতি কার্যকরী করা হয়। তারপর থেকে সাধারণ নির্বাচন খুব ঘুমধামের সহিত হয়ে আসছে।

বিরোধী দল নেই

কিন্তু ধনতান্ত্রিক দেশগুলোর নির্বাচনের সঙ্গে রুশিয়ার নির্বাচনের কোনো তুলনা হয় না। রুশিয়ার বিরুদ্ধ দলের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না। প্রত্যেক নির্বাচন এলাকা হতে একজন প্রার্থী মাত্র দাঁড়াতে পারেন। সবোচ্চ সোভিয়েটের এলাকার আলোচনা একদেশে হতে বাধ্য। বক্তৃতা, কোন আলোচনাই হয় না। নেতৃবৃন্দ বিশেষ বিশেষ ব্যাপারে একটি রিপোর্ট পাঠ করেন বা নীতি ঘোষণা করেন এবং মহাসমারোহে তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

কিন্তু এ থেকে ধারণা করা ভুল হবে যে নীতি নির্ধারণে রুশিয়ায় কোনো আলোচনাই হয় না —অন্ততপক্ষে ষ্ট্যালিনের মৃত্যুর পর। আলোচনা হয়, কিন্তু সবোচ্চ সোভিয়েটে নয়, কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এবং সভাপতি-মণ্ডলীতে।

পার্টি পর্যায়ে কোনো নীতি ঠিক হলে, সবাইকে তাতে সায় দিতে হবে— সর্বত্র। সবোচ্চ সোভিয়েটের অধিকাংশ সদস্যই কমিউনিষ্ট পার্টির সভ্য। তাঁরা পার্টি থেকেই জানেন সোভিয়েটে কি বিষয় উত্থাপিত হবে। তাঁদের দায়িত্ব হল এ সব নীতি সর্বসম্মতিক্রমে সমর্থন করা। এর পর এই নীতিই রাষ্ট্রের নীতি হয়ে দেখা দেয়।

যেদিন বুলগানিনের হাত থেকে খ্রুশ্চেভ রাষ্ট্রভার গ্রহণ

খ্রুশ্চেভের হাত

প্রধানমন্ত্রী হি সে বে বুলগানিন গত কয়েক বছরে অন্যান্য রাষ্ট্রপ্রধানদের নিকট বহু চিঠি লিখেছেন। এই চিঠিগুলোর পশ্চাতে আসল হাত কাজ করেছে যাঁর তিনি খ্রুশ্চেভ। এখন রাষ্ট্রপ্রধানদের সম্মেলনের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। এখানে তো খ্রুশ্চেভ আর প্রধানমন্ত্রীকে পাহারায় রাখতে পারেন না। কিন্তু আলোচনার সময়ে অনেক বিষয় উঠতে পারে যার উত্তর তখনই দিতে হবে।

সম্ভবত বুলগানিনের পক্ষে এরূপ উত্তর দেয়া সম্ভব নয়। ১৯৫৭এর জুলাইতে রুশিয়া পার্টির মধ্যে বে ঝগড়া লেগে- ছিল তাতে বুলগানিন প্রথম- দিকে মতি স্থির করতে পারেন নি। শেষ পর্যন্ত জয় হয়েছিল খ্রুশ্চেভের। মলোটভ, ম্যালেন্- কভ, ক্যাগানোভিচ ইত্যাদি করেকজনকে পার্টির উচ্চতম সংস্থা এবং মন্ত্রিসভা থেকে বহিষ্কৃত হতে হয়েছে। তাঁরা নাকি "পার্টি বিরোধী উপদল সৃষ্টির ষড়যন্ত্র" করেছিলেন। বুলগানিন শেষ অবধি টিকে গিয়েছিলেন, কিন্তু তখন থেকেই তিনি আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেন। মনে হয়, আজ রুশিয়ার নেতাদের মধ্যে এক খ্রুশ্চেভেরই আত্মবিশ্বাস আছে, যেমন এর পূর্বে ছিল ষ্ট্যালিনের। এমন খ্রুশ্চেভ আহ্বান পেয়েছিলেন নেতা ছাড়া শীর্ষ সম্মেলনে রুশিয়া অন্য কাউকেই পাঠাতে সবচেয়ে দুর্বোধ্য বিষয়। কেউ কেউ বলেন, বুলগানিন আর এতবড় ভার বহন করতে পারছিলেন না। নিঃসন্দেহ যে খ্রুশ্চেভ অনেক চটপটে লোক। কিন্তু শুধু এই জন্যই কি বুলগানিনের পতন?

১৯৫৩র ১৪ই মার্চ খ্রুশ্চেভ ম্যালেনকভের স্থলে প্রধান মন্ত্রিত্বের ভার গ্রহণ করেন। সেই থেকে রুশিয়া রাষ্ট্র ব্যবস্থায় তাঁর মতই প্রাধান্য পেয়ে আসছে, প্রধানমন্ত্রী ম্যালেনকভই থাকুন বা তাদের রেকর্ডের সঙ্গে ষ্ট্যালিনের আমলের কার্যকারখানার কোন তুলনাই হয় না।

খ্রুশ্চেভ প্রধানমন্ত্রী হওয়ার কোনো মহলই মনে করে না যে রুশিয়ার নীতিতে কোনো পরিবর্তন আসছে। একথা সত্যি যে তার প্রধান মন্ত্রিত্বের আসন লাভের কয়েকদিনের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করা হয়েছে। অন্যান্য দেশ অর্থাৎ আমেরিকা ও বৃটেন — যাই করুক, রুশিয়া আর আণবিক বোমার পরীক্ষা চালাবে না।

কিন্তু রুশিয়া যে এ নীতি অবলম্বন করতে পারে তা কিছুদিন থেকেই শোনা যাচ্ছিল। এই ঘোষণা সবোচ্চ সোভিয়েটে করা হয়, কিন্তু কোনো আলোচনা না করেই সর্বসম্মতিক্রমে তা গৃহীত হয়। কোনো সন্দেহ নেই যে গভীর এবং বহুদিন যাবৎ পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা না করে রুশিয়ার নেতৃবৃন্দ এ ঘোষণা করেন নি। এই আলোচনা হয়েছিল পার্টির উচ্চতম কমিটিগুলোতে।

আমেরিকার অনুরিষ্ঠা

ঘোষণাটি আমেরিকাকে তদানক বেকায়দায় ফেলবে। এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের মানুষের ও সরকারগুলোর উপর এর প্রভাব প্রচন্ড হওয়ার সম্ভাবনা। ইতিমধ্যে অনেকেই মনে করে নিয়েছেন যে রুশিয়া সত্যি সত্যি শান্তি চায়। সে ধারণা এখন আরও জোরাল হবে।

অন্যদিকে, ডা লে স ইতিমধ্যেই যা বলেছেন, আমেরিকা আণবিক বোমা পরীক্ষা বন্ধ করবে না — তাতে আমেরিকা আদৌ শান্তি চায় কিনা সে সম্বন্ধে সন্দেহ বাড়বে। আমেরিকার নিত্র দেশগুলোর মধ্যেও ক্রমেই তার বিরুদ্ধে বিদ্বেষ বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনা।

রুশিয়া এই ঘোষণাদ্বারা আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে যে সুবিধা অর্জন করল তার জন্য বুলগানিনকে প্রধান মন্ত্রিত্ব ছাড়তে হলো কেন? এইটেই ভরসা পাচ্ছে না।

খ্রুশ্চেভ বলেছে প্রমাণ দিয়েছেন যে তিনি রুশিয়ার জনসাধারণ এবং বিশেষ করে পার্টির অধিকাংশকে তাঁর মত অনুযায়ী পরিচালনা করতে সক্ষম। বহু কঠিন সমস্যা তাঁর সামনে এসেছে। তিনি সাহসের সঙ্গে তার মোকাবেলা করছেন। ষ্ট্যালিনের মৃত্যুর তিন বছরের মধ্যেই তিনি এই রুশিয়ার নেতাকে তাঁর স্বস্থানে পৌঁছে দিয়েছেন — খোলাখুলি পার্টি সভাদের সভার এক প্রচন্ড আক্রমণ চালিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ব্যক্তিপূজার বিরুদ্ধে অর্থাৎ ষ্ট্যালিন পন্জার বিরুদ্ধে খড়গহস্ত হয়েছিলেন।

ষ্ট্যালিন-সমর্থক বিতাড়ন...

যাঁরা ষ্ট্যালিনের চিন্তাধারা পরিত্যাগ করতে অপারগ হয়েছেন তাঁদেরকে পর্যায় পর্যায় তিনি অপসারণ করেছেন বেরিয়া, ম্যালেনকভ, মলোটভ, ক্যাগানোভিচ এবং আরও অনেকে।

খ্রুশ্চেভ এখন রুশিয়ার অবিসম্বাদিত নেতা। সেদিন সর্বোচ্চ সোভিয়েটের দুটি পরিষদের নির্বাচন হয়ে গেল। নির্বাচনের ফলাফল সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু নির্বাচনের পূর্বে কোন নেতার জনপ্রিয়তা কেমন।

বিভিন্ন নির্বাচনী এলাকা থেকে ঠিক করা হয় কাকে প্রার্থী দাঁড় করানো হবে। বেশী প্রার্থী দাঁড়ানো জনপ্রিয়তা. যত বেশী তিনি তত বেশী এলাকা হতে আহ্বান পান। এবারকার নির্বাচনের জন্য খ্রুশ্চেভ আহ্বান পেয়েছিলেন ২২৩টি এলাকা হতে। তার পরই ভোরোশিলভ — ৭৯টিনির্দলীয় বাস্তবে থাকত।

এলাকা হতে; মিকোয়ান পান ৫৯টি এবং বুলগানিন মাত্র ১৫টি।

খ্রুশ্চেভ বেছে নিয়েছিলেন রুশিয়ার প্রাণকেন্দ্র মস্কো। বুলগানিন পূর্বে মস্কো এলাকা থেকেই নির্বাচন প্রার্থী হতেন, এবার তাঁকে দাঁড়াতে হয়েছে এক জিলা কেন্দ্র থেকে। বুলগানিনের সূর্য যে অস্তগামী তাতে কোনো সন্দেহ ছিল না।

নূতন ব্যক্তিপূজো?

১৯৫৬তে খ্রুশ্চেভ ব্যক্তিপূজার উপর তাঁর আক্রমণ করেছিলেন। কিন্তু নতুন ধরণে ব্যক্তিপূজার দৃশ্য রুশিয়ায় আবার প্রকট হচ্ছে। এই নতুন ব্যক্তিপূজার দেবতা হলেন খ্রুশ্চেভ স্বয়ং। মস্কো রেডিওতে খ্রুশ্চেভ সম্বন্ধে যে বিশেষণ ব্যবহার করা হয় তা প্রায় ষ্ট্যালিন সম্বন্ধে বিশেষণের সমতুল্য। আজই যদি এই অবস্থা হয়ে থাকে, ১০ বছর পরে কি হতে পারে?

১৯৫৬তে খ্রুশ্চেভ ঘোষণা নেতৃত্বের কথাও তুলেছিলেন। বলেছিলেন : "লেনিনের যৌথ নেতৃত্বের নীতি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এটা আমাদের অন্যতম বৃহৎ দায়িত্ব।" মনে হয়েছিল, যৌথ নেতৃত্বের ভিত্তিতেই কাজ চলছে। কিন্তু এখন কি মনে করার কারণ ঘটে নি যে এই "যৌথ" নেতৃত্ব সম্পূর্ণভাবে খ্রুশ্চেভের করায়ত্ত হয়েছে?

যৌথ নেতৃত্বের অস্তিত্ব যদি থাকত তার প্রকাশ অন্তত এই হতো যে পার্টির কাজ দেখবেন করেকজনে এবং গবর্ণমেন্টের কাজ দেখবেন অন্য করেকজন। দায়িত্বের ভাগাভাগির কিছুটা আভাস পাওয়া যেত।

দেশীয় সংবাদ-পর্য্যালোচনা

কাশ্মীর প্রসঙ্গে

কাশ্মীরের ব্যাপার নিয়েনরা কি?

পাকিস্তানের আব্দারের সীমা পরিসীমা নেই। পাকিস্থান কাশ্মীরকে ভারত-বিরোধী প্রচার-কার্যের অস্তরূপে ব্যবহার করে আসছে। কাশ্মীর সম্বন্ধে ভারত যখনই কোন বিধি ব্যবস্থা করছে তখনই তারা হৈ-হৈ করে উঠছে। নানা কান্না কাঁদতে জেরেই পাকিস্থান কাশ্মীর কাঁদতে ভারতের বিরুদ্ধে নালিশ রাষ্ট্রপুঞ্জের দরবারে উপনিয়ে একেবারে হাজির হচ্ছে গিয়ে স্বিত করেছে। এই জোরেই সে রাষ্ট্রসংঘের দপ্তরে।

সম্প্রতি রাষ্ট্রসংঘের পাকি স্থানি স্থায়ী প্রতিনিধি ফিরোজ আলী খান রাষ্ট্রসংঘের সভাপতির কাছে লিখিত এক পত্রে এই বলে ভারতের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়েছেন যে, দুটি সাম্প্রতিক ঘোষণায় কাশ্মীরকে ভারতের অপরাভুক্ত করার দিকে ভারত আর এক ধাপ এগিয়ে গেছে।

সে দুটো অভিযোগ হচ্ছে— (১) অবিলম্বে ভারতের সঙ্গে একীকরণ এবং (২) কাশ্মীর রাজ্যের প্রশাসনিক বিভাগকে ভারতের কম্পট্রোলার ও অডিটার জেনারেলের এক্তিয়ারে আনা।

কাশ্মীর ভারতের অপ্র বহন ও যোগাযোগ সম্পর্কে হিসাবে ভারত ডাক ও তার বিভাগের অন্ত হিসাবের কাশ্মীরের হিতার্থে সরকার যে-কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করলে বিশেষ করে তা জনকরতে পারেন। তা নিয়ে পাকি- সাধারণের পক্ষে বেশ উদ্বেগের স্থানের এত মাথা ব্যথা কেন? কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই কাশ্মীরের রাপারে পাকিস্থানের বিভাগটিকে তিনি ব্যবসায়ের নাক গলানো, ভারতের আভাস্ত- ভিত্তিতে লাভজনক সম্পর্কটুকে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপের সামিল

কাশ্মীর ও পাকিস্থান

পাকিস্থানের আব্দারের সীমা পরিসীমা নেই। পাকিস্থান কাশ্মীরকে ভারত-বিরোধী প্রচার-কার্যের অস্তরূপে ব্যবহার করে আসছে। কাশ্মীর সম্বন্ধে ভারত যখনই কোন বিধি ব্যবস্থা গ্রহণ করছে তখনই তারা হৈ-হৈ করে উঠছে। নানা কান্না কাঁদতে জেরেই পাকিস্থান কাশ্মীর নিয়ে একেবারে হাজির হচ্ছে গিয়ে স্বিত করেছে। এই জোরেই সে রাষ্ট্রসংঘের দপ্তরে।

সম্প্রতি রাষ্ট্রসংঘের পাকি স্থানি স্থায়ী প্রতিনিধি ফিরোজ আলী খান রাষ্ট্রসংঘের সভাপতির কাছে লিখিত এক পত্রে এই বলে অভিযোগ জানিয়েছেন যে, দুটি সাম্প্রতিক ঘোষণায় কাশ্মীরকে ভারতের অপরাভুক্ত করার দিকে ভারত আর এক ধাপ এগিয়ে গেছে।

সে দুটো অভিযোগ হচ্ছে— (১) অবিলম্বে ভারতের সঙ্গে একীকরণ এবং (২) কাশ্মীর রাজ্যের প্রশাসনিক বিভাগকে ভারতের কম্পট্রোলার ও অডিটার জেনারেলের এক্তিয়ারে আনা।

কাশ্মীর ভারতের অপ্র বহন ও যোগাযোগ সম্পর্কে হিসাবে ভারত ডাক ও তার বিভাগের অন্ত হিসাবের কাশ্মীরের হিতার্থে সরকার যে-কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করলে বিশেষ করে তা জনকরতে পারেন। তা নিয়ে পাকি- সাধারণের পক্ষে বেশ উদ্বেগের স্থানের এত মাথা ব্যথা কেন? কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই কাশ্মীরের রাপারে পাকিস্থানের বিভাগটিকে তিনি ব্যবসায়ের নাক গলানো, ভারতের আভাস্ত- ভিত্তিতে লাভজনক সম্পর্কটুকে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপের সামিল

লালবাহাদুরের বাহাদুরি

শ্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী পরিবহন ও যোগাযোগ দপ্তরের ভার নেবার পর থেকে তিনি বেশ উদ্যমের সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছেন। তাঁর বিভাগের অন্তর্গত রেলওয়ে বোর্ডের সভাপতি শ্রী এ এন ঝা-র সঙ্গে তিনি বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর সঙ্গে আলোচনার পর ঝা সাহেব ঘোষণা করেছেন যে, রেলওয়ে বোর্ড ভারতের সমস্ত রেলওয়ে কর্মচারীদের জন্য ১৯৫৮ সালের মধ্যে ৪৪ ঘণ্টা সপ্তাহ চালু করবেন। এই ঘোষণা শুনে রেলওয়ে কর্মচারীরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েছেন। তাঁরা মনে করছেন যে, লালবাহাদুর তাঁদের জন্য যা করলেন তা আর কোন মন্ত্রী করতে পারেন নি।

ভারতমর তো মুনাফাশিকারীদের রাজত্ব চলেছে। সরকারই যা বাকি থকেন কেন?

নয়াপয়সা প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে থাম স্পেকুলেটর্স-এর দাম বাড়ানো হয়েছে। টেলিগ্রাম, মণিঅর্ডার, রেজিস্ট্রেশন ফী প্রভৃতিও ক্রমে ক্রমে বাড়তে বাড়ানো হয়েছে। এই বৃদ্ধির ফলে অভাবগ্রস্ত জনসাধারণ একেই হিমসিম খাচ্ছেন তার উপর আবার গোদের উপর বিষফোঁড়ার মত শান্তী-জীর মালুল হার বৃদ্ধি করে লোকসান পূরণের প্রস্তাব তাদের মধ্যে বে উদ্বেগের সৃষ্টি করবে এতে আর আশ্চর্য কি?

কল্যাণ রাষ্ট্রে জনসাধারণের স্বার্থের দিকে নজর রেখে সরকার নীতি নির্ধারণ করবেন—দেশবাসী এ আশাই করে। আর আর বাড়ানোই যদি সরকারের লক্ষ্য হয় তাহলে দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির ফলে ইতিমধ্যেই সাধারণ মানুষের অন্তত দুঃখ পারিবারিক অর্থনীতির উপর চাপ আরও না বাড়িয়ে অন্য উপায়ে কি করে আর বাড়ানো যায় সরকারের সে চিন্তা করা উচিত।

শ্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের ভার গ্রহণের পূর্বে অন্তর্ঘাতবিরোধী একক এই একটা প্রস্তাবের আভাস দিয়ে কি বাহাদুরি দেখিয়েছেন বা কোন্ শ্রেণী করেছেন তা বোঝা দুষ্কর।

মন্ত্রিমণ্ডলীর নিকৃষ্টতম দলীয় চক্রান্তের বিরল নজীর

রাইটার্স বিল্ডিংসে দুই দিন ধরিয়া টাইপিষ্ট ও ষ্টেনোগ্রাফারদের কর্ম্মব্যস্ততা

বিগতদিনের তারিখ দিয়া মিথ্যা রিপোর্ট তৈয়ারী

সিদ্ধার্থ রায়ের চ্যালেঞ্জ অপ্রমাণের জন্য ডাঃ রায়ের কুহেলিকাপূর্ণ বিবৃতি

(দর্পণের রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক)

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে ১০ই মার্চের পর যে আলোড়ন আরম্ভ হয়েছিল, ৩১শে মার্চ তার একটা অধ্যায় শেষ হয়ে গেছে। কংগ্রেস পার্লামেন্টারী পার্টিকে ডাঃ রায় স্তোক-বাক্যের দ্বারা আপাতত প্রশমিত করেছেন।

এবং সিদ্ধার্থ রায় গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যেসমস্ত অভিযোগ উত্থাপন করেছিলেন, সেগুলিকে বহুলাংশে পাশ কাটিয়ে এসে সবাইকে স্বাপন করা হয়েছিল জালিয়াতির অভিযোগ। সেই জালিয়াতির অভিযোগও, ডাঃ রায় যেখাবার চেষ্টা করেছেন যে, শুধু দুর্নীতি দমন সাবকমিটির রিপোর্টে সিদ্ধার্থ রায়ের স্বাক্ষর সম্বন্ধেই উঠোছল।

কিন্তু আসলে তার চেয়েও গুরুতর আর একটি জালিয়াতির অভিযোগ উঠেছিল, সেই অভিযোগের মধ্যে সমস্ত মন্ত্রিসভাই জড়িত। তার রায় এখনও তার জবাব দিতে পারেননি এবং সেই অভিযোগ অগ্রমাণ করা হয়নি। দর্পণের রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক একথা জোরের সঙ্গে বলতে পারেন যে, ডাঃ রায় ঐ দ্বিতীয় অভিযোগটি সম্বন্ধে যেটুকু বলেছেন, তা অসত্য এবং কুহেলিকাপূর্ণ।

যদি বিচারবিভাগীয় কোনো বাক্যালাপেরকে দেবেন কি? তদন্তের সম্মুখীন করা যায়, তাহলে মন্ত্রিসভাগুলির বিরুদ্ধে বিল্ডিংসে সাংবাদিকদের কাছে এই জালিয়াতির অভিযোগটি তিনি সিদ্ধার্থ রায়ের স্বাক্ষর অত্যন্ত সহজে প্রমাণিত হবে। সমাপ্তিত ২টি ফাইলের পৃষ্ঠা ডাঃ রায় সেই প্রমাণের সুযোগ দেখিয়ে দিয়েছেন। ভাবখানা এই রকম যেন গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অভিযোগ ঐটুকুতেই সীমাবদ্ধ ছিল।

প্রকৃতপক্ষে গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে দুই প্রস্থ জালিয়াতির অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছিল: (১) সিদ্ধার্থ রায় বলেছিলেন, সাব কমিটির রিপোর্টে তাঁর স্বাক্ষর থাকতে পারেনা; যদি দেখানো হয় তবে সেই স্বাক্ষর জাল। (২) বিরোধী পক্ষের শ্রীজ্যোতি বসু এবং শ্রীবঙ্কিম মুখার্জী আরও জোরালোভাবে বলেছিলেন যে, ডেপুটি মন্ত্রী, পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী এবং রাষ্ট্রমন্ত্রীদের দ্বারা আর এক-প্রস্থ দলিলপত্র তৈরী করানো হয়েছে, যেগুলি এণ্টি ডেটেড। অর্থাৎ ব্যাক্ ডেট্ দিয়ে এইসব রাষ্ট্রমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীরা কতক-গুলি রিপোর্ট তৈরী করেছেন এবং ঐসব রিপোর্টের দ্বারা দেখানোর চেষ্টা হচ্ছে যে, দুর্নীতি দমনের কাজ সম্পূর্ণ অবহেলিত ছিলনা।

যার প্রতিবাদের ডামাডোলের মধ্যে স্থিতীয় অভিযোগটি আড়ালে পড়ে গেছে। অবশ্য এই স্থিতীয় অভিযোগটি আরও গুরুত্বপূর্ণ। ২৪শে মার্চ সিদ্ধার্থ রায় বিধানসভায় তাঁর পদত্যাগ বিবৃতি দেওয়ার পরই সন্ধ্যা পৌনে ৭টা নাগাদ সভা-ভবনে ডাঃ রায়ের কক্ষে মন্ত্রি-মণ্ডলীর একটি বৈঠক বসে। মাত্র ২ জন মন্ত্রী ছাড়া আর প্রত্যেকে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সেখানে স্থির হয় যে, উপমন্ত্রী, রাষ্ট্রমন্ত্রী এবং পার্লা-মেণ্টারী সেক্রেটারীদের মধ্যে যাদের উপরে বিভিন্ন বিভাগে দুর্নীতির অনুসন্ধান করার ভার ছিল এবং যাদের উপরে এই অনুসন্ধানের রিপোর্ট তৈরীর দায়িত্ব পড়ে, সেইসব উপমন্ত্রী, রাষ্ট্রমন্ত্রী এবং পার্লা-মেণ্টারী সেক্রেটারীরা এখন ব্যাক্ ডেট্ দিয়ে কতকগুলি রিপোর্ট তৈরী করবেন। এই রিপোর্টগুলি স্ব স্ব মন্ত্রীদের হাতে দেওয়া হবে এবং ডাঃ রায় বক্তৃতার সময় ঐ রিপোর্টগুলি হাতে তুলে ধরে দেখাবেন যে, সিদ্ধার্থ রায়ের অভিযোগ সত্য নয়, এঁরা অকর্মণ্য থাকেননি, কাজ করা হয়েছে।

২৫শে মার্চ এই সমস্ত কাগজপত্র তৈরী করা হয়। দর্পণের নিজস্ব পর্যবেক্ষক একথা প্রায় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারেন যে, এর মধ্যে অনেকটি রিপোর্ট রাই-টার্স বিল্ডিংসে একজন প্রবীণ মন্ত্রীর ঘরে তৈরী হয়। সেগুলির ব্যাক্ ডেটেড ছিল এবং সেগুলি ২৫শে মার্চ ও ২৬শে মার্চ দুইদিন রাইটার্স বিল্ডিংসে কোনো কোনো টাইপিষ্টদের দিয়ে টাইপ করানো হয়েছে। ২৫শে মার্চ কতকগুলি রিপোর্ট স্বাক্ষরিত হয়। এঁদেরই একটি রিপোর্ট স্বাক্ষরিত হয়ে হাঁড়িয়া বিধানসভার কংগ্রেস বেঞ্চে। শ্রীঅর্দ্ধেন্দু নস্করের কাছে একটি হলদে রঙের কাগজ দেওয়া হচ্ছে দেখা যায়। তিনি স্বাক্ষর করার পূর্বেই সিদ্ধার্থ রায় তাঁকে ডেকে পাঠান। শ্রীঅর্দ্ধেন্দু নস্করকে যখন চ্যালেঞ্জ করা হয়, তখন তিনি আমতা আমতা করতে থাকেন। ২৭শে মার্চ এই সংবাদ সংক্ষিপ্তভাবে "স্বাধীনতার" প্রকাশিতও হয়ে যায়। কিন্তু আমরা জানি, ২৭শে মার্চও এইরূপ স্বাক্ষরিত আরও কিছু সংখ্যক কাগজ ডাঃ রায়কে দেওয়া হয়েছে এবং তিনি বক্তৃতার ফাইল তৈরী করেছেন।

বাঙ্গালাদেশে স্বাধীনতার পূর্বে নিকৃষ্টতম দলীয় চক্রান্ত, মুসলিম লীগ এবং প্রজা পার্টির মধ্যে ঘুষ দিয়ে ভোট কেনা-কিনি — অনেক কাণ্ড ঘটেছে। কিন্তু সমগ্র মন্ত্রিসভা কোনো জালি-য়াতির আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, এই রাজ্যের অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগেও তার দৃষ্টান্ত নেই। কোনো ভদ্র পার্লামেন্টারী রাজ্যে তো থাকবার কথাই নয়।

ডাঃ রায়কে শুক্রবার রাইটার্স বিল্ডিংসে (পদত্যাগ বিবৃতির পরের দিন) সাংবাদিকেরা এই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করেছিলেন। ডাঃ রায় ফাইল খুলে যে কাগজ-গুলি দেখান, তাতে ব্যাক্ ডেট্ দেওয়া কোনো চিঠি ছিলনা। বিভিন্ন রাষ্ট্রমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী-দের কতকগুলি চিঠি ছিল, সেগুলিতে তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীকে জানাচ্ছেন যে, এই এই কাজ বিগত কতকোমাসের মধ্যে তাঁরা করেছেন এবং ঐগুলির রিপোর্ট যথাসময়ে অমুক-অমুক তারিখে তারপ্রাপ্ত সম্পাদকের কাছে প্রেরণ করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর উপরোক্ত লিখিত এই পত্রগুলির (অনেকেই ফরওয়ার্ডিং লেটারের নামে) কিংবদন্তি কোনো কোনো ফাইলে মন্ত্রীদের নিকট পৌঁছেই প্রোগ্রেস তথাকথিত রিপোর্টের প্রতিলিপিও ছিল। যেমন, মায়া বানার্জী এবং কানেন আলি মাজি ২০শে আগষ্ট '৫৭ সালে মন্ত্রীকে যে তথাকথিত রিপোর্ট পাঠিয়েছেন, তার প্রতিলিপি ছিল। কিন্তু এই রিপোর্টের আসল লিপিগুলি ডাঃ রায় সাংবাদিকদের দে খা ন নি। ফরওয়ার্ডিং লেটারগুলিতে তারিখ ছিল ২৫শে, ২৬শে মার্চ। ডাঃ রায় বলছিলেন, কাজেই এতে আপত্তির কিছু নেই, কোনো ব্যাক্ ডেটের কারবার হয়নি। তাঁরা আগেও রিপোর্ট যথাসময়ে দিয়েছেন, এখন মুখ্যমন্ত্রীকে সেইসবের এক একটি সংক্ষিপ্ত-সার ইদানীতন তারিখ দিয়ে পাঠিয়েছেন। এতে জালিয়াতির অভিযোগ কি আছে?

আপাতদৃষ্টিতে এই উত্তর সন্তোষজনক। কিন্তু আসল রহস্যটি অন্য জায়গায়। মন্ত্রী-দের কাছে আগেই রিপোর্ট দেওয়া হয়েছিল কি? ডাঃ রায়কে সেই প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। এখন ফরওয়ার্ডিং লেটার দিয়ে ঐসব রিপোর্টের প্রতিলিপি পাঠানো মোটেই জালিয়াতি নয়, যদি এ রিপোর্ট-গুলি প্রকৃতই যথাসময়ে এবং উল্লিখিত তারিখগুলিতেই রচিত হয়ে থাকে।

অভিযোগ উঠেছে যে, ঐ সব রিপোর্ট উল্লিখিত তারিখে রচিত হয়নি। আর একটি স্তর ছাড়া বাদবাকি সমস্ত স্তরের ঐসব রিপোর্ট ২৫শে মার্চ, ২৬শে মার্চ এবং ২৭শে মার্চ রচনা করা হয়েছে। ঐগুলি ব্যাক্ ডেট্ দিয়ে ফাইলে ঢোকানো হয়েছে। এই অভি-যোগের প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য আছে, পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্যও আছে। এই সব অভিযোগ প্রমাণ করা যায়, টাইপিষ্ট ও ষ্টেনোগ্রাফার-দের দিয়ে। তাঁদের সাওয়াল জবাবের সামনে যদি উপমন্ত্রী পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী ও রাষ্ট্রমন্ত্রীদের হাজির করা হয় তাহলেও সত্য ফাঁস হবেই। কেননা, যথেষ্ট সতর্কতা এবং জালিয়াতির তাঁদের কোনদের দ্বারা এইসব রিপোর্ট রচিত হয়নি। হয়েছে কাঁচা হাতে অল্প সময়ে এবং উত্তেজিত মুহূর্তে।

ডাঃ রায় ক ত ক গু লি নিষ্পাপ ফরওয়ার্ডিং লেটার দেখিয়ে ঐ অভিযোগ অগ্রমাণ করতে পারেন না। সন্দেহ যদি দূর করতে হয় এবং অভিযোগ যদি অগ্রমাণ করতে হয় তাহলে ডাঃ রায়কে একটি বিচার-বিভাগীয় তদন্ত বসাতে হবে। কোন্ টাইপ রাইটারে রিপোর্ট-গুলি টাইপ করা হয়েছে, সেকথা বিশেষজ্ঞের দ্বারা অতি সহজে প্রমাণ করে দেওয়া যাবে। যদি একথা দেখানো যায়, একজন মন্ত্রীর ঘরের টাইপ রাইটারে এমন রিপোর্ট টাইপ করা হয়েছে, যেটি সেই ঘরে টাইপ হওয়ার কোনো কথা নয়? যদি দেখানো যায় যে, সেই টাইপ করা কাগজের উপরে যে তারিখ উল্লিখিত আছে, সেই তারিখে টাইপ হয়নি— হয়েছে ৩ মাস পরেকার কোনো তারিখে এবং সিদ্ধার্থ রায়ের পদত্যাগ বিবৃতির পরে? তাহলে ডাঃ রায় কি জবাব দেবেন?

সিদ্ধার্থ রায়ের চ্যালেঞ্জ সংক্রান্ত প্রথম অংশটিরই

(২য় কলমের চতুর্থে)

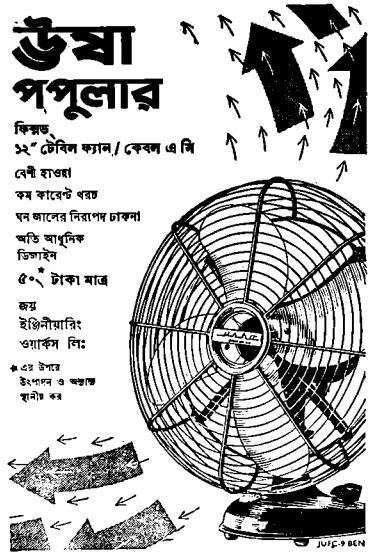

সম্পাদক—শ্রীরজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য

সম্পাদক কর্তৃক মুদ্রণ বাঁওড়া প্রেস, ৭নং ওসোরিংটন স্কোয়ার, কলিকাতা ১৩ হইতে মুদ্রিত এবং ৭নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-- দর্পণ কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

Regd.: No.C 4079

১বর্ষ, ১১শ সংখ্যা

সাপ্তাহিক সংবাদ সাময়িকী ঃকলিকাতা-১১ই এপ্রিল শুক্রবার ১৯৫৮ ঃ মূল্য ২৫ নঃ পঃ

সম্পাদকীয়

পৌরসভার পরীক্ষা

এ কথা সুস্পষ্ট যে, ডাঃ রায় যদি ইচ্ছা করেন তাহলে ডাঃ ত্রিগুণা সেনের পক্ষে দ্বিতীয়বার মেয়র নির্বাচিত হওয়া বিশেষ মাত্রও কঠিন নয়। সেক্ষেত্রে ডাঃ সেন ইউ সি সি এবং কংগ্রেস পার্টির সম্মিলিত সমর্থন লাভ করবেন, যে ঘটনা কর্পোরেশনের ইতিহাসে অভূতপূর্ব। প্রকৃতপক্ষে ডাঃ সেনকে যদি সুযোগ দেওয়া যায় তাহলে সদিচ্ছা ও সহযোগিতার দ্বারা তিনি কর্পোরেশনের কুখ্যাত রাজনীতিকে পার্টির সংকীর্ণ গন্ডী থেকে উদ্ধার করে আনতে পারেন এবং ভারতবর্ষের বৃহত্তম নগরীতে শোর শাসনের একটা নতুন যুগ পত্তন করা যায়। আমরা একথা বিশ্বাস করি যে, সমস্ত দলের সদিচ্ছাসম্পন্ন লোকগুলিকে এক দিকে নিয়ে এবং মতবাদের মালমশলাগুলিকে বিরোধিতার ভূমিকায় কোণঠাসা করে দিয়ে কর্পোরেশনে রাজনীতিতে একটা নতুন প্যাটার্ণ তৈরী করা যায়। সেই প্যাটার্ণে জনস্বার্থ একদিকে ত্রিগুণা সেনকে এই জনস্বার্থের থাকবে, যার নেতৃত্ব করবেন ডাঃ নেতৃত্ব করার সুযোগ ডাঃ রায় ত্রিগুণা সেন। অন্যদিকে থাকবে দেবেন কিনা, এই হচ্ছে আজকের কংগ্রেসী স্বার্থ, যাকে কলকাতার দিনের প্রশ্ন।

মানুষ চিহ্নিত করে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে পারবে।

শ্রীযুক্ত অতুল্য ঘোষের কাছে

(২য় পৃষ্ঠায়)

দিল্লীর চিঠি

হায় শ্রীঅশোক সেন!

(দর্পণের বিশেষ প্রতিনিধি)

কলকাতায় বসে বাংলা দেশকে যতটা বড় এবং তার সমস্যাকে যতটা জটিল বলে মনে হয় দিল্লীতে বসে তার সিকিও সিকিও মনে হয় না। তাই সিদ্ধার্থ রায়ের পদত্যাগ এখানে তেমন কোন আলোড়ন তোলেনি। সিদ্ধার্থ রায়ের বিবৃতি পড়ার পর কিছু সরলমতি লোক ভেবেছিলেন পশ্চিম বঙ্গের খাদ্যমন্ত্রীর প্রকাশ্য দুর্নীতি আর যেই সমর্থন করুক না কেন, শ্রী নেহরু নিশ্চয়ই করবেন না। তাঁরা কিন্তিৎ হতাশ হয়েছেন নেহরুর মন্তব্য পড়ে। যিনি এক সময় দুর্নীতিপরায়ণকে প্রকাশ্যে ফাঁসি দিতে ইচ্ছুক ছিলেন, তিনি এখন তাঁর দলের লোকের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য দুর্নীতির অভিযোগ আনবেন 'অশোভন' বলে মনে করেন!

গত দশ বছরে যমুনা দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে, এবং বহু মনের বহু পরিবর্তন ঘটেছে। জননায়কের মন রূপান্তরিত হয়েছে ক্ষমতায় আসীন দলনায়কের মনে।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে দলের মধ্যে ডিসিপ্লিন বজায় রাখার প্রশ্ন এবারও উঠেছিল। শুনলাম কর্তাদের দুশ্চিন্তা ক্রমশঃই বাড়ছে এবং এ সমস্যার কি ভাবে সমাধান করবেন তার কোন হদিশ পাচ্ছেন না। নানা স্বার্থকে কেন্দ্র করে দলের মধ্যে নানা উপদলের সৃষ্টি হয়েছে—এদের কাকে রাখবেন কাকে ঠেলবেন? এঁরা যাকে কোল দিচ্ছেন, দু-

(২য় পৃষ্ঠায়)

কর্পোরেশনের রাজনীতিতে জটিল পরিস্থিতি

এবারে মেয়র কে হবেন?

ডাঃ ত্রিগুণা সেনের মনোনয়নে অতুল্য ঘোষের ঘোর আপত্তি ঃ ডাঃ রায়ের তেমন আপত্তি নেই

কাউন্সিলারদের পাল্লা ডাঃ সেনের দিকেই ভারী

(দর্পণের পৌরসভা পর্যবেক্ষক)

১৮ই এপ্রিল পর্যন্ত কলকাতা কর্পোরেশনের রাজনীতিতে অনেকগুলি বিচিত্র স্রোত বইতে থাকবে। এবং আগামী মেয়র কে হবেন, সেই প্রশ্নের জবাব নিশ্চিতরূপে পেতে হলে আরও তিন-চারদিন অপেক্ষা করতেই হবে।

কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল পার্টির কর্তাদের দিক থেকে যদি দেখা যায়, তাহলে ডাঃ ত্রিগুণা সেনের পুনর্নির্বাচনের সম্ভাবনা আপাততঃ দূরপরাহত বলে মনে হবে। কারণ, অতুল্যবাবুর মনোনয়ন থেকে ডাঃ ত্রিগুণা সেন বঞ্চিত হয়েছেন।

কিন্তু অপরদিকে ডাঃ ত্রিগুণা সেনের কাছে ইউ সি সি এবং কংগ্রেসের কিছু সংখ্যক দলাবচ্যুত সদস্য মিলিয়ে মোট প্রায় ৪৮জনের সমর্থন পৌঁছেছে, একথা নিশ্চিত। অর্থাৎ ডাঃ সেন যদি কংগ্রেস কর্তাদের ইচ্ছা লঙ্ঘন করতে চান, তাহলে পুনরায় মেয়র নির্বাচিত হওয়ার পথে তাঁকে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা অতুল্যবাবুর হাতে নেই।

বি কে সেনকে অপসারণের প্রস্তাবের সময় কংগ্রেসের ৫জন সদস্য পার্টির হুইপ লঙ্ঘন করেই ইউ সি সির সপ্তে ভোট দিয়েছিলেন। এই ৫জন সদস্য ডাঃ সেনের সপ্তে আছেন, একথা কারও অজ্ঞাত নয়। কিন্তু ১৮ই এপ্রিল হয়ত আরও আশ্চর্য কিছুদিন উদ্ঘাটিত হতে পারে, হয়ত দেখা যাবে যে, এই ৫জন ছাড়াও কংগ্রেস পার্টির আরও কয়েকজন মুরব্বীস্থানীয় সদস্য ডাঃ সেনের পক্ষাচ্ছে সমবেত হয়েছেন। মোটকথা, কংগ্রেস দলের ১০।১১ জন সদস্য ডাঃ সেনের নির্বাচিত করার প্রস্তাবের সপক্ষে করেছেন বলে প্রকাশ পাচ্ছে। সমর্থকদের সংখ্যা ৭৮এ গরিষ্ঠতা সত্ত্বেও ডাঃ সেন মেয়র নির্বাচনে অবতীর্ণ হবেন কিনা, সেইখানেই সংশয় রয়েছে। প্রথম কথা, ডাঃ সেন যদি মুখ্যমন্ত্রীর আশীর্বাদ না পান, তাহলে সংখ্যাগরিষ্ঠতা সত্ত্বেও কিছুতেই তাঁর পক্ষে মেয়র নির্বাচনে অবতীর্ণ হওয়া সম্ভব নয়।

ডাঃ সেনের পক্ষে একথা কল্পনা করাও সম্ভব নয় যে, কংগ্রেস পার্টির তরফ থেকে যাঁকে মেয়ররূপে মনোনীত করা হবে, তিনি সেই প্রার্থীর প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে ইউ-সি-সির মনোনয়ন নিয়ে দাঁড়াবেন। কাজেই সংখ্যাগরিষ্ঠতার দ্বারা তাঁকে ভোটে জয়যুক্ত করা যেতে পারে বটে, কিন্তু ভোটযুদ্ধের জন্য সেই শক্তি সমাবেশ নিরর্থক। দর্পণের পর্যবেক্ষক এবিষয়ে প্রায় নিশ্চিত যে, ডাঃ সেন ভোটযুদ্ধে অবতীর্ণ হবেন না।

তথাপি, ৪৮ জনের যে স্বাক্ষর সংগৃহীত হয়েছে, তার স্বতন্ত্র মূল্য এবং তাৎপর্য আছে। এই স্বাক্ষরগুলির দ্বারা ডাঃ সেন কংগ্রেস দলপতি শ্রীযুক্ত অতুল্য ঘোষের উপরে রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছেন। এবং ডাঃ রায়কে তিনি দেখাতে পারছেন যে, তাঁর পিছনে নির্ভরযোগ্য সমর্থন রয়েছে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও মুখ্যমন্ত্রীর অনুমতি ছাড়া

(২য় পৃষ্ঠায়)

চীফ সেক্রেটারি কি তামাসা দেখছিলেন?

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

পশ্চিম বঙ্গ বিধান পরিষদে বিরোধীদলের অনাস্থা প্রস্তাবের উপর বিতর্কের জবাব দিতে গিয়ে শ্রীসিদ্ধার্থ রায়ের প্রশ্নবাণে প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় কোণঠাসা হয়েছিলেন, তাঁর দলের লোকও স্বস্তিবোধ করেন। এবং এই স্বস্তিবোধের মধ্যে যথেষ্ট ক্ষোভ ও দুঃখের সুর মিশানো।

এঁদের মধ্যে এমন কয়েকজন আছেন, যারা মনে করেন, ডাঃ রায়ের ঐরূপ বেদনাদায়ক অবস্থার জন্য পশ্চিম বঙ্গ সরকারের চীফ সেক্রেটারী শ্রীসতোন্দ্র নাথ রায় দায়ী। শ্রীরায়ের বিরুদ্ধে তাঁদের অভিযোগ এত গুরুতর যে, তারা বিষয়টি গত সপ্তাহে মন্ত্রীদের এক বিশেষ সভায় উত্থাপন করেন এবং তাঁর কাছে তার কাজে গাফিলতির জন্য কৈফিয়ৎ চাওয়া হয় বলে প্রকাশ।

কোন কোন সভ্য মনে করেন যে, পরিষদের অফিসার গ্যালারিতে বসে শ্রীরায় শুধু তামাসাই দেখেন। তাই যদি না হত, তাহলে শ্রীসিদ্ধার্থ রায়ের সই করা দুর্নীতি সংক্রান্ত কাগজপত্র সময়মত ডাঃ রায়ের হাতে পৌঁছে দেবার বন্দোবস্ত করা হল না কেন?

শ্রীসিদ্ধার্থ রায় অভিযোগ করেছিলেন, চীফ সেক্রেটারী ক্রসওয়ার্ড পাজল্-এর সমাধানের জন্য মত্ত হয়ে পড়েন, এমন কি অফিসের কাজে গাফিলতি হলেও। অন্ততঃ সেদিন যদি তিনি সজাগ থাকতেন তবে ডাঃ রায়কে এমন নাকাল হতে হত না। পরের দিন সিদ্ধার্থ বাবুর সহিসম্বলিত ফটোস্ট্যাট কপি সংবাদপত্রে দেয়া হল। পরিষদে এইগুলো ডাঃ রায়ের হাতে থাকলে শ্রীসিদ্ধার্থ রায় এবং বিরোধীদলের সকলের মুখে চুনকালি পড়ত।

মন্ত্রিসভায় চীফ সেক্রেটারীকে সরাসরি এরকম আক্রমণ এই প্রথম। প্রথমটা তিনি নাকি হকচকিয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু পরমুহূর্তেই অন্যান্য মন্ত্রীদের দিকে একবার চোখ ঘুরিয়ে মানলেন: ভাবটা এই আমার হয়ে কি বলবার কেউ নেই।

ডাঃ রায় কোন কথা বলেন না। বোধ হয় ভাবলেন, সভ্যিই তো ফটোস্ট্যাট কপিগুলি সমস্যাটা খেলে, পরিষদে ব্যাপারটা সম্পূর্ণরূপে অসামরিক দাঁড়াতো। অন্যান্য মন্ত্রীদের মধ্যে কেউ কেউ চীফ সেক্রেটারীর কোন অনুরোধে ক্রসওয়ার্ড পাজলের সমাধানে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন সেটা স্বীকার করা কিনা, এবার

পরের পৃষ্ঠায়

বার্মাশেলের শেল!!

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

বার্মাশেলে ছাঁটাই শুরু হয়েছে। ইঞ্জিনীয়ার কয়েকজন ইতিমধ্যে চাকুরী হারিয়েছেন এবং ছাঁটাইয়ের খড়্গহস্ত ঝুলছে আরও অনেকের উপর।

অভিনব পন্থা নিয়েছে বিদেশী কোম্পানী এই ব্যাপারে। তারা তাদের বেশীরভাগ কাজই ঠিকাদারের উপর চাপাচ্ছেন। ধরুন অন্ধ্রে আছে ভারত গভর্ণমেণ্টের প্রচেষ্টা নারিকেলডাঙ্গা ডিপোতে আছে অন্যান্য বিদেশী প্রতিষ্ঠানের তাদের চারশত কর্মচারী। এখন- মারফৎ তেলের কারবার করার। কার কিছু কাজ ঠিকাদারদের দিয়ে এ সমস্তই যে কমাটি বিদেশী কোম্পানী হয়ত ৭৫ জনকে অতি- অয়েল কোম্পানী এতদিন একরিক্ত ঘোষণা করে ছাঁটাই করে দিল। চেটিয়া সুবোগ সুবিধা ভোগ আইনের দিক থেকে আপনার হয়ত করছিল তার ওপর হস্তক্ষেপ।

বিদেশী অয়েল কোম্পানীর কণ্ঠের হস্তে যদি আমাদের ভিতর এরাই অগ্রণী হয়েছে এ সরকার এ ব্যাপারে ব্যবস্থা করতে ব্যাপারে। উদ্দেশ্য যদি সফলকাম না পারেন তাহলে কর্মচারীদের হয় তাহলে শুরু হবে অন্যান্য ভবিষ্যৎ সত্যই অন্ধকার: শুধু অয়েল কোম্পানীগুলির ছাঁটাইয়ের আসবে কেন আমাদের দেশের মতিধান। অর্থনৈতিক বুনিয়াদও খানিকটা।

এই সংখ্যার পৃষ্ঠা-

মেয়র নির্বাচনে কর্পোরেশনে দলাদলি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

তিনি মেয়র হতে চান না। স্বিতীয়তঃ আরও একটি জিনিষ ডাঃ রায়ের কাছে সুস্পষ্ট হবে যে, হিন্দুপার্থাবকে বাদ দিয়ে কংগ্রেস পার্টি যদি অন্য কোনো মাজিকে মনোনয়ন দেয় (শ্রী বিজয় ব্যানার্জী অথবা শ্রী কেশব বসু) তাহলে সেই মাজি কংগ্রেস পার্টির সমস্ত সদস্যের সমর্থন পাবেনা। ইতিমধ্যেই গ্রুপ দলবিচ্যুত হয়েছেন- তাদের ভবিষ্যৎ কি এখনও নিশ্চিতভাবে বলা যায়না। তবুপরি, বিজয় ব্যানার্জী মনোরঞ্জন লাভ করলে কেশব বসুর গোষ্ঠীটি ভেঙ্গে যাবে। অথবা বিকল্পে, [illegible] মনোরঞ্জন লাভ করলে বিজয় বাবুর দলের অন্য লোক দলবিচ্যুত হয়ে [illegible] পারেন। মোট কথা, বিজয়-[illegible] কেশববাবু, দুই-[illegible] থেকে কর্পোরেশন-[illegible] বিজয় এবং নির্ভর-[illegible] বজায় [illegible] হবে না। ...

[illegible] একদিকে, [illegible] পরিস্থিতি ব্যবস্থা [illegible] বাদিকে, মাতৃস্থানে ডাঃ [illegible] সমস্যে করেছেন যে, (১) তিনি [illegible] এ্যাডমিনিস্ট্রেশনের [illegible] করেন, (২) তাঁর [illegible] এবং ইউ সি [illegible] তাঁর থাকবে এবং [illegible] কথা, সমস্ত [illegible] সমস্যে সমাধান করেন, যেন, যি কে [illegible] সম্পর্কে না থেকে পারে। [illegible] (প্রথম পৃষ্ঠার পর) [illegible] ১৯(১) ধারা অনুসারে সরকারের [illegible] হাতে [illegible]

এই কয়টি বিষয়ে যখন ডাঃ রায় একমতে চিন্তা করেন, তখন আমার অন্তরেও ধারণা তাঁর সিদ্ধান্ত হিন্দুপা সেনের অনুকূলেই যাবে।

কিন্তু ডাঃ সেনকে রাখতে হলে বি কে সেনকে বিদায় দিতে হবে। ডাঃ রায়ের নিজের তাতে কোনো আপত্তি নেই। আমাদের নির্ভরযোগ্য সূত্রের সংবাদ এই যে কর্পোরেশন আইনের ১৯(১) ধারা অনুসারে গভর্ণমেণ্ট বি কে সেনকে অপসারিত করবেন কিনা, সেবিষয়ে এখনও ডাঃ রায় মনঃস্থির করেন নি। ডাঃ সেনের কাছ থেকে মুখ্যমন্ত্রী একটি লিখিত অভিযোগনামা চেয়ে পাঠিয়েছিলেন এবং দিল্লীর যাওয়ার পূর্বে ডাঃ সেনকে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ে গেছেন যে, ঐ বিষয়ে এখনও তিনি কোনো সিদ্ধান্ত করেন নি। দিল্লী থেকে ফিরেই তিনি সেই সিদ্ধান্ত করবেন। তবে এটা ঐ অভিযোগনামার দেখিয়েছেন যে, ৩৪টি ভোট বি কে সেনের বিরুদ্ধে আনীত হয়ে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অনুসন্ধানের জানানো হয়েছে, ৩৮ জন সদস্য বিপক্ষে ভোট দিয়েছেন, এক্ষেত্রেও বি কে সেনের স্বপক্ষে ভোট দেননি। এবং যারা ভোটদানে বিরত ছিলেন, তাঁরাও কেউই মুখ্যতঃ এবার একটি [illegible] সমর্থন করেননি, যেটা, যি কে সেনের স্বপক্ষে না থেকে পারে। [illegible] ১৯(১) ধারা অনুসারে সরকারের [illegible] হাতে [illegible]

প্রয়োজনীয় এবং সবচেয়ে বাঞ্ছনীয়।

ডাঃ রায় দিল্লী থেকে প্রত্যাবর্তনের পর যদি এই যুক্তিতে সমস্ত দিক বিবেচনা করেন, তখন আমার অন্তরেও ধারণা, তাঁর সিদ্ধান্ত হিন্দুপা সেনের অনুকূলেই যাবে।

কিন্তু ডাঃ সেনকে রাখতে হলে বি কে সেনকে বিদায় দিতে হবে। ডাঃ রায়ের নিজের তাতে কোনো আপত্তি নেই। আমাদের নির্ভরযোগ্য সূত্রের সংবাদ এই যে কর্পোরেশন আইনের ১৯(১) ধারা অনুসারে গভর্ণমেণ্ট বি কে সেনকে অপসারিত করবেন কিনা, সেবিষয়ে এখনও ডাঃ রায় মনঃস্থির করেন নি। ডাঃ সেনের কাছ থেকে মুখ্যমন্ত্রী একটি লিখিত অভিযোগনামা চেয়ে পাঠিয়েছিলেন এবং দিল্লীর যাওয়ার পূর্বে ডাঃ সেনকে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ে গেছেন যে, ঐ বিষয়ে এখনও তিনি কোনো সিদ্ধান্ত করেন নি। দিল্লী থেকে ফিরেই তিনি সেই সিদ্ধান্ত করবেন। তবে এটা ঐ অভিযোগনামার দেখিয়েছেন যে, ৩৪টি ভোট বি কে সেনের বিরুদ্ধে আনীত হয়ে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অনুসন্ধানের জানানো হয়েছে, ৩৮ জন সদস্য বিপক্ষে ভোট দিয়েছেন, এক্ষেত্রেও বি কে সেনের স্বপক্ষে ভোট দেননি। এবং যারা ভোটদানে বিরত ছিলেন, তাঁরাও কেউই মুখ্যতঃ এবার একটি [illegible] সমর্থন করেননি, যেটা, যি কে সেনের স্বপক্ষে না থেকে পারে। [illegible] ১৯(১) ধারা অনুসারে সরকারের [illegible] হাতে [illegible]

প্রয়োজনীয় এবং সবচেয়ে বাঞ্ছনীয়।

দিল্লীর চিঠি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

[illegible] রেখা রয়েছে প্রদেশ [illegible] যে, কাউকে পাচ্ছে না, [illegible] ঐক্যবদ্ধ বিদ্রোহীদল [illegible] রাজ্যে প্রদেশে সেই [illegible] রয়েছে বলে [illegible] বর্তমান বেড়ে-[illegible] ঐক্য বজায় [illegible] দিয়ে, তাঁর মৃত্যুর পর [illegible] প্রদেশের আট [illegible] অনেকে ভাল [illegible] অনেকটা নজরুল প্রকাশ [illegible] হয়েছে ইতিমধ্যেই।

প্রথম স্তরের কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে পন্থজী কি [illegible] মোরারজী ভাইয়ের আর যে [illegible] থাকুন দলকে চালাবার [illegible] নেই। কি ভাবে এবং কোন অবস্থায় তাঁরা প্রদেশ ছেড়ে কেন্দ্রে এসেছেন সে কথা সবাই জানে। ডেবর জী, [illegible] সিংয়ের মতো প্রকৃতির লোক—এঁকে চালিয়ে না নিলে উনি চলতে পারেন না। স্বিতীয় স্তর একেবারে ফাঁকা—সেখানে বুদ্ধি বা ব্যক্তিত্ব কিছুরই তেমন সন্ধান মেলে না।

সংকটের বেলাতে সমাধান নেই সেখানে প্রথম চেষ্টা হয় তাকে স্বীকার না করা এবং পরে ধামা চাপা দেওয়া। কিন্তু দিল্লী, পূর্বপাঞ্জাব, উড়িষ্যা, মহীশূর, অন্ধ্র, রাজস্থান পশ্চিম বাংলা প্রভৃতি স্থানে কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ সংকট যে ভাবে দুত গতিতে নানা বাঁধছে তাতে তাদের অস্বীকার করা বা ধামা চাপা দেওয়া আর সম্ভব বলে মনে হয় না।

তবে কংগ্রেসের পক্ষে শেষ ভরসা নেহেরুজী। একেবারে সংকটের মুহূর্তে নেহেরু এসে হাল ধরবেন এবং ভরা ডুবির হাত থেকে কংগ্রেসকে রক্ষা করবেন—কংগ্রেসের ওপরওয়ালা এমন আশা প্রত্যেকেই পোষণ করছেন।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার রদ-বদলে আইনমন্ত্রী শ্রী এ, কে, সেনের বরাত ঝুলেনা, তিনি মিশরীয় যে ধাপ্পা দিয়েছিলেন সেখানেই রয়ে গেলেন।

এখানে সিমিং জেলো ওপরে উঠতে গেলে প্রতি ধাপে হাত ধরতে হয়। শ্রীনেহরু, অতুল্যদার হাত ছেড়ে দিয়ে ভজলোক অন্য হাতের আর নাগাল পাচ্ছেন না।

শুনেছি যারা অতুল্যদার হাত ধরে কিছুটা এগিয়ে তাঁর হাত ছেড়ে দিয়ে অন্য হাতের দিকে হাত বাড়ায় অতুল্যদা নাকি তাদের সহজে ভোলেন না।

কিন্তু সে কথা থাক। অশোকবাবুর কাল হয়—মুন্দ্রার সংগে তাঁর সম্পর্ক। দিল্লীতে মুন্দ্রা ব্যাপার নিয়ে যখন খুব হৈ চৈ তখন কে বা করা রটায় যে পশ্চিম বংগের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের বাড়ীতে যখন মুন্দ্রা—কৃষ্ণমাচারী সাক্ষাৎ ঘটে—তখন শ্রী অশোক সেনও নাকি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ঐ টুকুতেই অনেক কান্ড হয়।

ওপরে ওঠার পথ যখন বন্ধ হয়েছে তখন কোনমতে চাকুরী বজায় রেখে কেন্দ্রে টিকে থাকা ছাড়া শ্রী অশোক সেনের পক্ষে অন্য পথ খোলা নেই, অতুলদার রাজ্যে ফিরে যাবার পথ তো তাঁর আগেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

দেশীয় সংবাদ

কংগ্রেসের ক্রমবর্ধমান অন্তর্বিরোধ রোধ করতে গিয়ে দলীয় শৃংখলার নামে ওয়ার্কিং কমিটি সম্প্রতি যে ফতোয়া জারী করেছেন, তাতে শুধুমাত্র সৎ ও স্বাধীনচেতা কংগ্রেস-কর্মীই নয়, গণতন্ত্রকামী প্রতিটি ভারতবাসীরই উদ্বিগ্ন হবার যুক্তির যথেষ্ট কারণ রয়েছে। সাধারণতঃ দেশের একটি রাজনৈতিক দলের আভ্যন্তরীন ব্যাপারে সাধারণ মানুষের বেশী মাথা ঘামাবার কথা নয়। কিন্তু বিপুল সংখ্যা-গরিষ্ঠতার জোরে দেশের কেন্দ্র ও রাজ্যে শাসনক্ষমতায় যে দল দেশবাসীকে গণতান্ত্রিক আচার-পদ্ধতিতে শিক্ষিত করে তুলবার দায়িত্ব নিয়েছে, সেই দলের উর্ধতন নেতৃত্ব যদি আভ্যন্তরীন ব্যাপারে হিটলারের পদাঙ্ক অনুসরণ করার নীতি গ্রহণ করেন, তবে দেশবাসীকে তা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে উপায় কি?

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি তার সাম্প্রতিক বৈঠকে এই ফতোয়া জারী করেছে যে, নেতা-দের বা মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে স্বাক্ষর সংগ্রহ করা কংগ্রেস-কর্মী বা কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী পার্টির সদস্যদের পক্ষে অমার্জনীয় অপরাধ বলে গণ্য করা হবে এবং তার জন্যে কঠোর শাস্তিবিধানেরও ব্যবস্থা হবে। অবশ্য সংগে সংগে এও বলা হয়েছে যে, বিধিসম্মত সমালোচনার কণ্ঠরোধের কোনও অভিসন্ধি ওয়ার্কিং কমিটির নেই। আইন সভার কংগ্রেস সদস্যরা, দরকার হলে, তাঁদের সমস্যা আলোচনা করতে পারবেন এবং স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করতে পারবেন।

দলের সভায় নেতা বা মন্ত্রি-সভার সমালোচনার অধিকার সদস্যদের আগেও ছিল এবং সম্ভবতঃ ভবিষ্যতেও কাগজে-কলমে তা থাকবেও। ডিক্টেটর্স নেতৃত্বে পরিচালিত দলগুলির গঠনতন্ত্রেও এই সব অধিকারের কথা লেখা আছে দেখা যাবে। কিন্তু কংগ্রেস সদস্যরা ভাল-ভাবেই জানেন যে, সেই অধিকার তাঁরা কতটুকু প্রয়োগ করতে পারেন। এবং তা প্রয়োগ করতে পারেন না, বা আলোচনা করবার সুযোগ পেলেও সে আলোচনায় কোন কাজ হয় না বলেই তো তাঁরা স্বাক্ষর সংগ্রহ বা অন্যান্য পন্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হন। পশ্চিম বাংলার কংগ্রেস সদস্যরা অন্ততঃ এ বিষয়ে ভাল বুঝবেন। বিশেষ করে, শ্রীসিদ্ধার্থ রায়ের পদ-ত্যাগ ও তাঁর অভিযোগ সম্পর্কে সম্প্রতি তাঁরা হাড়ে হাড়ে তাঁদের অধিকারের সীমা বুঝতে পেরেছেন। শ্রী রায় মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ করেছেন, তার কোন তদন্তের ব্যবস্থা কি করতে পেরেছেন কংগ্রেস সদস্যরা?

গ্রাহ্যমন রিপোর্ট

কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের জন্যে অধিকাংশই ভারতের পক্ষে গ্রহণযোগ্য নয় বলে প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরু তাঁর মতামত প্রকাশ করেছেন। সাংবাদিকদের কাছে তিনি বলেছেন যে, যে সমস্যা বিফেচনায় কয়েকটি মূল বিষয়কে উপেক্ষা করা হয় এবং যা ভারতকে পাকিস্থানের সমপর্যায়ভুক্ত করবার চেষ্টা করে, তা ভারত মেনে নিতে পারে না। শ্রী নেহরু বলেছেন যে, পাক কাশ্মীরের কাশ্মীর ত্যাগ ও কাশ্মীরের ভারত-ভুক্তির স্বীকৃতি ভিন্ন এই সমস্যার মীমাংসা হতে পারে না। ভারতবাসীর পক্ষে খুবই সৌভাগ্যের বিষয় যে, প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরু এই সব সাফ জবাব দিতে পেরেছেন।

•

তদন্ত হওয়া উচিত

প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরু এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, পশ্চিম বাংলার মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে শ্রী সিদ্ধার্থ রায় যে সব অভিযোগ করেছেন, তার তদন্ত হওয়া উচিত। কিন্তু এই উচিত-টুকি কে করবে? তিনি যদি শুধু 'উচিত' বলেই দায়িত্ব শেষ করেন, তা হলে সে 'উচিত' আর কাজে হবে না।

সম্পাদকীয়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পার্টির স্বার্থই বড় কথা এবং তিনি হিন্দুপা সেনের উপরাই সমর্থক হবেন না, একথা বে কোনো নির্বোধও বুঝতে পারে। বি কে সেন এবং তাঁর সমর্থকেরা হিন্দুপা সেনের, বিরুদ্ধে যাবেন, কেননা হিন্দুপা সেনের হাতে বি কে সেনের চাকরী বিপন্ন হয়েছে। কংগ্রেস পার্টির মধ্যে কিছু সংখ্যক কাউন্সিলর, যাঁরা কাজেরী স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করেন, অথবা যে সমস্ত কাউন্সিলরের একথাত্র রোজগার হচ্ছে কর্পোরেশনের দালালী, তাঁদের পক্ষেও মেয়র হিন্দুপা সেনকে সমর্থন করা সম্ভব নয়। কাজেই কংগ্রেস মিউনিসিপাল পার্টির একটি বৃহৎ অংশ এই দলপতি অভূল্য ঘোষ সহ এই ঘুলা তুলতে আরম্ভ করেছেন যে, হিন্দুপা সেনকে নিয়ে সিদ্ধার্থ রায়ের মতো বিপদের সম্ভাবনা আছে, তিনি পুরোপুরি কংগ্রেসের লোক নন। অর্থাৎ, দলীয় স্বার্থ ও চক্রান্তের দ্বারা মানুষের স্বার্থকে হত্যা করার চেষ্টা হচ্ছে।

অথচ এই কাউন্সিলরদের চক্রান্ত পৌরসভাকে যে আবর্জনার স্তূপে পরিণত করেছে, একথা ডাঃ রায়ের অজ্ঞাত নয়। বাস্তবিক-বার গৃহে মাইক্রোবের আক্রার মতো এক ভেদ্রীর শুকীতোদর এই নগরীর পৌরসভাকে ঘিরেছে। ব্যবসাদারী মনোবৃত্তি এবং দালালীর চেষ্টা প্রত্যেকটি উপ্রতির সাংঘাতিক করেছে। জনস্বার্থকে এতদিন এইসব সমাজ বিরোধীদের কাছেই মাথা হেঁট করে থাকতে হয়েছে। আজ এই মুহূর্তে ডাঃ হিন্দুপা সেন যদি জনস্বার্থকে শক্তিশালী করতে পারেন এবং দলীয়তার বিরুদ্ধে যদি একটা সংগ্রামীর আঘাত তাঁর ভূমিকা হয় তাহলে ডাঃ রায় হিন্দুপা সেনকে কেন বাধা দেবেন? বস্তু বিধানচন্দ্র রায়কে একথা স্থির করে নিতে হবে যে, তিনি কিছু সংখ্যক সমাজবিরোধীর এবং সমস্তীর পার্টি স্বার্থের ক্রীড়নক হবেন, অথবা পৌরসভার সুনীতি ও সততার বক্ষের সংগে তিনি নিজেকে যুক্ত করবেন?

গ্রন্থ পরিচয়

অবধূতি সাহিত্য

(উদ্ধারণপুরের ঘাট, লেখক অবধূত, প্রকাশক মিত্র ও ঘোষ, দাম চার টাকা)

শ্রীমৎ চৈতন্য স্বামী মহারাজ

সভ্যতার সঙ্কট কথাটা প্রথম মহাযুদ্ধ থেকেই এত বহুল ব্যবহৃত যে, অনেকের কানেই এখন বোধ হয় ফাঁকা বুলির মতই শোনায়। কিন্তু কি করে অস্বীকার করি, দৈনন্দিন জীবনের বহুবিধ অভিজ্ঞতায়ই সঙ্কট নিত্য প্রত্যক্ষ, তার ব্যাপকতাও অত্যন্ত স্পষ্ট। এই যুগের শতখণ্ডিত ভারসাম্যহীন সমাজে ব্যক্তির স্থান অনিশ্চিত। যে সমস্ত বিভিন্ন সম্পর্কে ব্যক্তি তার সমাজের সঙ্গে জড়িত তাতে দুঃখ টান পড়েছে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই নিদারুণ বিপর্যয় লক্ষণীয়: মানবিক মূল্য বোধের ঐতিহ্যে মানুষ আজ আস্থাহীন, জীবনের নিষ্ঠুর শূন্যতায় সে দিশেহারা, আত্মঘাতী বিকারের উত্তেজনায় মধ্যেই তার অসুস্থ মন মুক্তির পথ খোঁজে।

স্বভাবতই এই সঙ্কটে সৎ সাহিত্যের অস্তিত্ব বিপন্ন। আমাদের সভ্যতার আদর্শ ইংল্যান্ডেও আজ 'তার নাভিশ্বাস উঠেছে। টেলিভিশন-পকেটবুক-বাণিজ্য এর ব্যবসায়িক স্বার্থের আক্রমণে। গ্রাহকদের কদর্য আকর্ষণের জন্য মুষ্টিমেয় সাহিত্য-গুলো ঠিক সময়ে চাঁদা না দিলে সৎসাহিত্যের অস্তিত্ব বিলোপের আশঙ্কা জানায়, বি বি সি'র থার্ড প্রোগ্রাম যোর মাধ্যমে অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই বিভিন্ন বিষয়ে উপাদেয় আলোচনা পরিবেশন (করেছেন) তুলে দেবার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে এলিয়টকে বিদেশে ইংল্যান্ডের মর্যাদা হানির কথা উল্লেখ করতে হয়।

কিন্তু সত্যকারের বিপদ দেখা দিয়েছে লেখকদের চৈতন্যেই। অস্তিত্বের বিরোধ যন্ত্রণা অধিকাংশ লেখকদেরই চেতনায় কোনও জিজ্ঞাসার আলোড়ন তোলে না, মূল্যবোধের প্রশ্নটা তাঁদের কাছে অবান্তর। কিন্তু শিল্পের স্বেচ্ছাবিহারে বিশ্বাসীদেরও ত অস্তিত্ব-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি নেই, তাঁদেরও শেষ পর্যন্ত সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে মুগ্ধ মানুষের ইচ্ছা পূরণের, আত্মপ্রবঞ্চনার খোরাক যোগাতে হয়।

আমরা উপন্যাসই বেশী পড়ি, তার দ্বারা প্রভাবিত হই, সেই জন্যই উপন্যাস সম্পর্কে এত প্রশ্ন। চিন্তাশীল পাঠকদের অভিযোগ, সত্যকারের মহৎ উপন্যাস আধুনিক সাহিত্যিকদের কাছ থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। লিখন নৈপুণ্য যতই থাকুক এঁরা কেউ জীবনের রূপকার নন। তাঁদের উপন্যাসে স্বল্প বিক্ষোভের চিত্র আংশিক, অনেক ক্ষেত্রেই তাৎপর্যহীন নিছক ব্যক্তিগত ভাবনা চিন্তার প্রতিফলন মাত্র, জীবন সমুদ্র মন্থনের মহিমা তাতে নেই। মহৎ ঔপন্যাসিক ব্যক্তিগত মতবাদে আদর্শবাদী হলেও পক্ষাক্রান্ত হন না, শিল্প সৃষ্টির প্রেরণায়ই জীবনের সামগ্রিক রূপ দেবার তাগিদেই নির্মোহ বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিতেই জীবনকে দেখেন, জীবনের বিপর্যয়ের দ্বন্দ্ব-বিক্ষোভের মূল অন্বেষণ করেন ব্যক্তি চৈতন্যের গভীর উৎসে, সমাজ এবং ব্যক্তির চলিষ্ণু দ্বান্দ্বিক সম্পর্কে। সেই কারণেই তাঁদের রচনায় জীবনের সার্বিক তাৎপর্য-পূর্ণ রূপ ফোটে, পাত্রপাত্রীরা নিজস্ব স্বকীয়তায়ই প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

আমাদের এই যুগ উপন্যাস রচনার পক্ষে অনুকূল কিনা প্রশ্ন উঠতে পারে। সে আলোচনার সুযোগ এখানে নেই, কিন্তু শিল্পীদের করণীয় কিছু নেই শিল্প সৃষ্টির এমন যান্ত্রিক ব্যাখ্যায় আমি বিশ্বাসী নই। আমাদের জীবনের সংগ্রাম, নৈরাশ্য, তিক্ততা, দ্বন্দ্ব বিক্ষোভের কোনও তাৎপর্য নেই, কার্য কারণ সম্পর্কের সূত্রে তাদের ধরা যায় না: এ মত সত্য নয়। তাছাড়া, বিচারহীন হতাশার অন্ধ আক্রোশে কিম্বা আত্মসর্বস্ব চিন্তার অহঙ্কারে জীবন দেখার চোখ যদি না হারাই তাহলে অবশ্যই স্বীকার করব, আঘাতের পর আঘাতে বৃথাই আমাদের রক্ত-ক্ষরণ হয় নি, অনেক রকম প্ররোচনা সত্ত্বেও বিকারের পাঁকে একেবারে তলিয়ে যাই নি, চরম বিশৃঙ্খলার মাঝখানেও জীবনের অর্থ খুঁজেছি। সেই খোঁজার চেষ্টা এবং ভাঙনের টানাপোড়েনে ক্ষীণ হলেও আমাদের চৈতন্যের এমন পরিবর্তন ঘটে বা ঘটছে যা দীর্ঘ দিনের সুস্থ মানবিক ঐতিহ্যের অনুকূল।

কার্য কারণের সঠিক সূত্রে জীবনকে আয়ত্তে আনার দুরূহ প্রয়াসই আমাদের কাছে সব থেকে মূল্যবান। শিল্পের প্রশ্ন পরে।

এ বিষয়ে বাংলাদেশের অধিকাংশ লেখকই একেবারে নিরঙ্কুশ। জীবন সম্পর্কে খুব কম লেখকেরই কোনও প্রশ্ন, চিন্তা আছে। জীবনের অর্থ অন্বেষণের দুরূহতা স্বীকারে, ঔপন্যাসিকের কঠোর দায়িত্ব পালনে তাঁরা খোলাখুলিভাবেই অনিচ্ছুক। সমগ্রতায় জীবনকে ধরার চেষ্টা থেকে বাঁধা-ধরা ছকে চটকদার গল্প ফেঁদে পাঠকদের ভোলান কি অসুস্থ যৌনবিকারের ইন্ধন যোগান অনেক সহজ, ব্যবসায়িক সাফল্যও তাতে সুনিশ্চিত।

জীবনের বহুবিধ সমস্যা যখন তীব্র হয়ে উঠছে, এবং রাষ্ট্রনেতারাও আশ্বাস দিয়েছেন, সমস্যার সমাধান কবে হবে কেউ বলতে পারে না, তখন নেশাগ্রস্ত হওয়া ছাড়া আর উপায় কি! ড্রইংরুমে, ব্যালকনি কিম্বা লনে ওপরের মহলের কৃশাঙ্গ কৃশাঙ্গীদের প্রেম এখন নিতান্তই জোলো লাগে। পাঠককে কড়া নেশা যোগানই বুদ্ধিমানের কাজ, তাই বাংলা উপন্যাসে এত বিস্ময়, রোমাঞ্চ। ভ্রমণ কাহিনীর বেনামিতে যে রম্য উপন্যাস এঁরা রচনা করেন তাতে দেখি, হিমালয়ের দুর্গম অঞ্চল, তরাইয়ের অরণ্য, যেখানেই তাঁরা যান না কেন, একজন সুন্দরী রহস্যময়ী নারীর সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎ এবং রহস্য মধুর বিচিত্র সম্পর্ক স্থাপিত হবেই, সে সাধারণত শিক্ষিত অভিজাত বংশের কখনও বা গ্রাম্য বধূ কিম্বা কুমারী। পুরনো রোমান্সেরই পরিবেশ বৈচিত্র্যের জন্য এখন প্রয়োজন হয় প্রবালদ্বীপ, মরুভূমি, খনি অঞ্চল, রহস্যময় অরণ্যের। পাত্রপাত্রীরূপে দেখা দেয় সাঁওতাল বা অন্যান্য আদিবাসী, অতীতের নটী, দক্ষিণ ভারতের কলাবতী দেহ-বিলাসিনী, বেদে, উলঙ্গ নাগা।

বিস্ময় এবং রোমাঞ্চের এই প্রতিযোগিতায় সকলের ওপরেই টেক্কা দেন 'বাংলা সাহিত্যের সব থেকে বিস্ময়কর লেখক' অবধূত। কারণ অন্য লেখকরা কেউ তান্ত্রিক নন, বীভৎসতায় তাঁদের অধিকার সহজাত নয়। তাঁরা বড় জোর প্রকাশ্য দিবালোকে টাক্সি ড্রাইভারের সামনেই গল্পের নায়িকাকে দিয়ে গায়ের জামা খোলাতে পারেন, যাতে নাগা বলে চিনতে ভুল না হয়, হয়ত সেই জন্যই প্রত্যেকটি নারী চরিত্র প্রসঙ্গেই উলঙ্গ শরীরের খুঁটি-নাটি বর্ণনা দেন কিম্বা বামপন্থী লেখক হলে বোধ হয় আধুনিক বিপর্যস্ত জীবনের ক্লান্তির অভিনব, মর্মান্তিক চিত্র দেবার জন্যেই নায়িকার 'ঘামে ভেজা বগল'এর বিস্তৃত বিবরণ পরিবেশন করেন। অবধূত নিঃসন্দেহে অনেক দূর এগিয়ে গেছেন। জীবন সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত পাঠকদের অবসন্ন স্নায়ু আদি রস এবং বীভৎসতার মদে চাঙ্গা করে তোলার ক্ষমতায় তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

সজনীকান্ত দাসের ভূমিকা সংবলিত অবধূতের 'উদ্ধারণপুরের ঘাট', 'মরুতীর্থ হিংলাজের' পরই বহু প্রশংসিত, শুধু এটিকে পরীক্ষা করে দেখলেই এই বিস্ময়কর লেখককে জানার আর কিছু বাকি থাকে না।

এই কাহিনীতে অবধূত ছা-পোষা বাঙ্গালী পাঠককে শ্মশানে টেনে নিয়ে গেছেন। তাঁর এই শ্মশান বীভৎসতা, মাতলামি, খুনজখম, জীবন্ত এবং মৃতদেহ নিয়ে ব্যভিচারে জমজমাট। বিস্ময় এবং রোমাঞ্চের নেশার কোনও উপকরণেরই অভাব নেই। গোয়েন্দা কাহিনীর সাসপেন্সের ছকে লেখক কাহিনী সাজিয়েছেন। অকল্পনীয় দ্রুততায় চমকপ্রদ নাটকীয় ঘটনাগুলোর মধ্য দিয়ে কাহিনী এগোয়, আর উপসংহারে ত দু দুটি ভীষণ মৃত্যু। অবধূতের 'পাকাপোক্ত হাতের' ভেল্কি খেলায় অবশ্যই চমৎকৃত হতে হয়। শ্মশানের মত এই শ্মশান-সাহিত্যেও সঙ্গতি, কার্যকারণ সম্পর্কের জটিলতা, মানবিকতার সমস্ত প্রশ্নই তুচ্ছ, অবান্তর!

শ্মশানবাসী এক গোঁসাইবাবা উদ্ধারণপুরের রোমহর্ষক কাহিনীর সূত্রধর। নিতাই বোষ্টমী তার সঙ্গী চরণদাস বাবাজীকে নিয়ে বার বার তার কাছে আসে। শুধু শ্মশান বর্ণনার বীভৎসতায় খেলা জমে না, নারী দেহও চাই, তার বর্ণনায়ও অবধূত সিদ্ধহস্ত। কাহিনীতে যতবার নিতাইয়ের আবির্ভাব ততবারই তার যৌবন-পুষ্ট, মাংসল শরীরের খুঁটিনাটি লোভনীয় বর্ণনা। সকলেই, এমন কি মুকুন্দপুরের কুমার বাহাদুরও তার অনুগ্রহের জন্য লালায়িত। কিন্তু তার ভেতরে অন্তর্দাহের জ্বালা, যেখানেই যায় সেখানেই লালসার নির্লজ্জ দৃষ্টি। গোঁসাই-এর কাছেই নিতাই নিজেকে বিলিয়ে দিতে চায়, কারণ 'কাঁচা রক্ত-মাংসে' তার লোভ নেই। চরণদাসকে দিয়ে তার তৃষ্ণা মিটবে না। কিন্তু গোঁসাই (বলাবাহুল্য, কাহিনীর উপসংহার না ঘটা পর্যন্ত) তার ডাকে সাড়া দিতে চায় না। এই ধরনের ঘরছাড়া সংসারের নীচতায় বিরক্ত রহস্যময়ী বৈষ্ণবী চরিত্র বাঙ্গালী লেখকদের বড়ো প্রিয়। চরিত্রদের ঝামেলা কত কম, রহস্যময়তা এবং আদি-রসের ভিয়ানেই তারা পরম উপভোগ্য হয়ে ওঠে।

গোঁসাইয়ের আশপাশে আরও অনেক লোকের ভিড়: রামহরি ডোম এবং তার বউ, যার 'পাতলা শাড়ীতে শরীর ঢাকে না, মাংসে শুধু মাংস, জ্যান্ত টাটকা মাংসে সে অনেকটা খেয়ে বেড়াচ্ছে', রামহরির শালা পঞ্চেশ্বর, ভবঘুরে এবং চোরাকারবারী দুর্দান্ত ষণ্ডা ঘোষ, গাজনতলার বেশ্যা মেয়েরা, রুদ্রবিদ্যা আগমবাগীশ, শ্মশানে যে নিত্য নতুন সাধনসঙ্গিনী নিয়ে আসে, কৈচরের বামুনদিদি, যে বিধবা মেয়েদের নিয়ে আসে গোঁসাই-এর কাছে কলঙ্ক মোচনের দাওয়াই নিতে, নিতাইলোভী সাধুরাম দারোগা। এতগুলো চরিত্রের আয়োজন শুধু রহস্য রোমাঞ্চ সৃষ্টির খাতিরেই। লেখকের কোন জীবন জিজ্ঞাসার সূত্রে এরা ধরা পড়েছে, এদের মধ্য দিয়ে জীবন সমস্যার কোন দিক রূপায়িত হয়েছে, উপন্যাস সম্পর্কিত এই প্রশ্নগুলো অবধূতের ক্ষেত্রে বাতিল করে দিতে হবে, কারণ তিনি 'বাংলা সাহিত্যের সব থেকে বিস্ময়কর লেখক।'

রোমহর্ষক ঘটনার দুটি দৃষ্টান্ত দিই। বলরামপুরের সিঙ্গি মশাইয়ের কৃপায় তার বিধবা গুরু-কন্যা গর্ভবতী হয়, যে তাকে চোর-কুঠুরিতে গলায় বাঁশ দিয়ে চেপে খুন করে। রটিয়ে দেয়, কলেরায় মৃত্যু ঘটেছে। শ্মশানে মৃতদেহ আনতেই বিপদ বাধে। জ্ঞাতিশত্রুর প্ররোচনায় পুলিশ এসে হাজির, পরীক্ষার জন্যে তারা লাশ চালান দেবে। সিঙ্গি মশাই অনেক টাকা ঘুষ দিয়ে উদ্ধার পায়। গোলমালে গুরুকন্যাকে সৎকারের কথা কারুর মনে হল না। এই তান্ত্রিক 'নিরাসক্ত' লেখক অতঃপর বর্ণনা দেন: শকুনিগুলো গুরুকন্যার 'নরম মাংস' ছিঁড়ে খেতে লাগল, এমন কি 'পেটটা ঠোঁট দিয়ে কেড়ে ভেতরের পাঁচ মাসের দুধটাকেও তারা রেহাই দিলে না।' সিঙ্গি-মশাই দু বছর ধরে বিষাক্ত ঘায়ে পচতে থাকেন, সিঙ্গি-গিন্নি নির্বিকার ভাবেই স্বামীর ঘায়ের পোকা বাছে। স্বামীকে চিতায় উঠিয়ে দেবার পরও সে শান্তভাবেই শ্মশানধারী গোঁসাইবাবার কাছে আসে। তার মুখে দুঃখ-শোক উত্তেজনার চিহ্নমাত্র নেই, অথচ 'বয়স তার বেশী নয়, শরীরের বাঁধুনি নষ্ট হয় নি।' বড় ঘরের মেয়ে বড় ঘরের বউ, যে পাল্কি ছাড়া বাইরে বেরুত না, সে হঠাৎ গোঁসাই-এর কাছ থেকে বোতল-প্রসাদ চেয়ে নিয়ে সকলের চোখের সামনে অনায়াসেই গলায় ঢেলে দেয়। সেই রাত্রিতেই আগমবাগীশ তার সদ্য জোটানো শক্তিকে নিয়ে চক্রে বসে। কিন্তু মেয়েটি ভয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, মুগ্ন স্বামী ছেলে-মেয়ের কাছে ফিরে যেতে চায়। তখন লাবণ্যময়ী সিঙ্গি-গিন্নি তার সাধনসহচরীর সমস্যা মেটায়। কিছু দিন পর আবার আগমবাগীশ একলাই শ্মশানে আসে, এবারে তার বৈষ্ণবের সাজ, আচরণ। হঠাৎ কালো কাপড়ে ঢাকা একটি নারীমূর্তি তাকে তাড়া করে। তার দু হাতের দশটা আঙ্গুল নেই। দগদগে লাল বোঁচা হাত দুখানা, নাক ঠোঁটও নেই, বীভৎস লাল একটা গর্ত আর দাঁতগুলো—রামহরির বউ গোঁসাই বাবাকে জানায়, 'এই সেই সিঙ্গি-গিন্নি!' আগমবাগীশ গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়ে ডুবে মরে।—পাঠকের মনে শিহরণ জাগানো ছাড়া গুরুকন্যার বিশেষত সিঙ্গি গিন্নির শোচনীয় পরিণাম চিত্রণের আর কোনও উদ্দেশ্যই নেই। এই বীভৎসতায় পাঠকের মন অসাড় হয়ে যায়, এদের প্রতি কোনও সহানুভূতিই জাগে না এবং সেটা বোধ হয় লেখকের অভিপ্রায়ও নয়। বিকারের উত্তেজনা, বীভৎসতায়ই এই তান্ত্রিক

(নবম পৃষ্ঠায়)

উচ্ছৃঙ্খল ছাত্র

(১০ম পৃষ্ঠার পর)

বৎসরের মাধ্যমিক শিক্ষা কোর্স মেনে নিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে এও জানিয়েছেন যে, যে সব 'বুদ্ধিমন্ত' বিশ্ববিদ্যালয় ঐ প্রস্তাব মেনে নেবেন না, তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয় অর্থ মঞ্জুরী কমিশনের দাক্ষিণ্য থেকে বঞ্চিত হবেন। ব্রহ্মা চক্রের শাসানীর মধ্যে আর যাই হোক, শিক্ষা হয় না। সব রাজ্যেই এক ছাঁচের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে, এখন দানখতও দেওয়া যায় না। এর ফল হবে, শিক্ষা ব্যবস্থায় "রেজিমেন্টেশন", যার চেয়ে মারাত্মক বস্তু আর নেই। এদিকে এই টানা পোড়েনের ঠেলায় শিক্ষক, অধ্যাপকেরা হালে পানি পাচ্ছেন না। ছাত্র-ছাত্রীদের প্রাণও ওষ্ঠাগত হয়ে উঠেছে।

অসুস্থ সমাজ জীবন

তারপর সমাজ জীবনের কথা। এখানেও শান্তি নেই, স্থৈর্য নেই, শুধু আক্ষেপের ঢেউ উঠছে পড়ছে। এই আক্ষেপ কখনও নিস্তরঙ্গ, কখনও অশান্ত গর্জনে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। দেশ বিভাগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, যুদ্ধোত্তর সামাজিক পটভূমিকা সমস্তই এর মূলে আছে! ভেবে দেখুন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় নয়-দশ বৎসরের ছেলেকেও দাঙ্গায় প্রবৃত্ত হতে দেখা গেছে। তারাই তো আজ তরুণ, তারাই তো যৌবনে পা দিয়েছে। দাঙ্গাকোন্দলীন আকস্মিক দুর্বিপাকের ফলে গড়ে ওঠা মনের কালিমা মুক্ত করার জন্য এ পর্যন্ত কি করা হয়েছে, কিছুই না। বরং জানোয়ারকে প্রশ্রয় দিয়ে বাড়িয়ে তোলা হয়েছে। এখন যদি সে জানোয়ার শিকারের উপর লাফিয়ে পড়ার জন্য তুলে ক্রুদ্ধ গর্জনে মোটা লেজ আস্ফালন করতে থাকে, তবে দোষ দেব কাকে? প্রশ্রয় লালিত জানোয়ারটাকে না তার আশ্রয় যুব-মানসকে? এ প্রশ্ন বিজ্ঞদের জন্য তোলা রইল।

মনে রাখতে হবে যে, অপরাধের দ্বারা অপরাধমূলক মনোবৃত্তিকেই আহ্বান করে তোলা হয়। এর প্রতিকার জ্ঞান-বুদ্ধি-দীপ্ত স্জনশীলতায়; অপরিণত বয়স্ক তরুণ যুবকদের কারণে অকারণে দোষারোপ ও সাজা দেওয়ার রিক্ত চেষ্টার মধ্যে পাওয়া যাবে না।

চিত্রালোচনা

শৌভিকের মতে "ডাক হরকরা"

মাটি আর মানুষের একখানি হৃদয়স্পর্শী ছবি

সত্যির মাটি আর সত্যির মানুষের দিকে চেয়ে সত্যিকারের জীবন ক্যামেরাকে শিল্পকুশলীর কৃতিত্বে পরিবেশন করার যে ডাক "পথের পাঁচালী" ছড়িয়ে দিয়েছে পৃথিবীময়, তারই একটি সাড়া পাওয়া গেল অগ্রগামীর নতুন প্রচেষ্টা "ডাক হরকরাতে।" অগ্রগামীর এ এক বিস্ময়কর পরিবর্তন —ছবিখানি দেখা শেষে অবাক হতে হলো ভেবে যে, "সাগরিকা", "শিল্পী" প্রভৃতি ধরণের ছবি তোলা নিয়ে যাঁরা মাতা সুরু করেছিলেন তাঁরা সে পথ ছেড়ে ন তু নে র প থে এ গি য়ে আসতে পেরেছেন দেখে—এগিয়ে এসেছেন আলতো পায়ে নয়, বেশ বলিষ্ঠ পদক্ষেপেই। দীর্ঘ প্রায় বারো হাজার ফিট ছবিখানির সব চেয়ে বড়ো গুণ হচ্ছে, এর প্রতিটি ইঞ্চিতে ছড়িয়ে রয়েছে শিল্পসম্মত নাটকীয় রূপ গড়ে তোলার স্পষ্ট ছাপ। নানা দিকে নানা রকমের গুণে ছবিখানি ইদানীংকালের একটি বিশিষ্ট চিত্রসৃষ্টিও হয়ে উঠতে পেরেছে। সরল জীবনের সহজ মানসিক বৃত্তির প্রকৃতিকে মানসিক আবেষ্টনের দিকটাকেই সোজাভাবে সামনে তুলে ধরার অগ্রগামীর কৃতিত্ব অভিনন্দনযোগ্য।

* * *

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা অবলম্বনে চিত্রনাট্যটি গঠিত হয়েছে; মূলের সুরে মিলও আছে, অমিলও আছে, কিন্তু ভাব ও বক্তব্যটা ঠিকমতোই পরিবেশিত কিনা তা হয়েছে ছবির রচনা ধারার অনুসরণে। এখানে গল্প হচ্ছে কর্তব্যনিষ্ঠা কনাম মমতা ও স্নেহ নিয়ে।

* * *

সুধীন দাশগুপ্তের গড়া ভারী মনোরম টাইটেল সঙ্গীত ধর্তাতেই একখানি অসাধারণ ছবির জন্যে মনকে তৈরী করে তোলে। অনেক দিন পর বেল একটা বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং মনমাতানো টাইটেল সঙ্গীত শোনা গেল। গল্প আরম্ভ হয় গ্রাম ব্যাকে—ডাকের অন্ধকার ভেদ করে দীনু ছুটে চলেছে ডাক বয়ে, হঠাৎ এক আততায়ীর আক্রমণ, ডাক্তারের মোটর এসে পড়ায় আততায়ী পালালো, তাকে চেনা গেল না (আততায়ী বে নিতাই সেটা পরে দীনুর কাহিনী ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত হবার সময় যথাস্থানে জানিয়ে দেওয়া হয়)। দীনুকে হাসপাতালে নেবার পর তারই অজ্ঞান অবস্থার মধ্যে গল্পের আরম্ভ। কিন্তু সেই থেকেই নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে দিয়ে মনকে টেনে ধরে রেখে শেষক্ষণটি পর্যন্ত। চমৎকার ফুটে উঠেছে আশাদোড়া পরিবেশটা। প্রায় সবটুকুই তোলা পরিদর্শিলা, বাঁরভূমের স্থানে স্থানে; শোভনের প্রকৃতির রূপটা বড়ো মনোমত করে লাগানো হয়েছে প্রতিটি দৃশ্যের রচনায়। আর এ কাজে অনন্যসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন আলোকশিল্পী রামানন্দ সেনগুপ্ত। ছবির চরিত্রচিত্রণে সত্যিকারের প্রকৃতির রূপটা বড়ো মনোমত করে চিত্রায়িত করেছেন তিনি। ভারী মনোরম লাগবে ঋতুর পরিবর্তনের সঙ্গে প্রাকৃতিক শোভার পরিবর্তনের রূপ যার সাহায্যে সময়ের অতিক্রমণ দেখানো হয়েছে। পরিবেশ সমগ্র ছবি বলতে যা বোঝায় "ডাক হরকরা" অক্ষরে অক্ষরে তাই। রাতের আঁধার ভেদো দীনুর ডাক বয়ে ছুটে বেড়ানো—কোনদিন চাঁদ, কোনদিন আঁধারে মুখে ওর লণ্ঠনের আলোটুকু, কোনদিন বৃষ্টি পটভূমির মধ্যে দৃষ্টিকে সজাগ করে রাখার মতো বৈচিত্র্য এনে দিয়েছে দীনুর দৈনন্দিন পথ চলার মধ্যে। তেমনি চাষের দৃশ্য,—প্রথম লাগল থেকে ধান তোলা পর্যন্ত থাপে থাপে যথাযথ দৃশ্যায়ন, গ্রামের বাউলের গান বা ভাষো ঊসবের ইত্যাদি গল্পের আবহাওয়াটকে এমন সুন্দরভাবে পরিস্ফুট করে রেখেছে যে, ছবিখানি দেখতে দেখতে অন্তরঙ্গ না হয়ে উঠে পারা যায় না। মাঝে মাঝে প্রাকৃতিক শোভা যেন স্পর্শ দিয়ে যায়, হাওয়ার ঘ্রাণ পর্যন্ত যেন অনুভব করা যায়। দৃশ্য রচনা ব্যাপারে কেবল চরিত্র যেখানে কাছাকাছি দাঁড়িয়েছে সেখানেই কল্পোজিসনের মাহাত্মের দিকে আর নজর রাখা হয় নি। স্থানে স্থানে কথা বেশী এবং কোন কোন অংশ একটু বেশী বেশী করে দেখানো। মাত্রা ছাড়িয়ে যাবার একটা উদাহরণ দেওয়া যায় দীনু যখন ছেলে নিতাইকে "শূয়ার কি বাচ্চা" বলে গাল দিতে থাকে, এতোবার ধরে কথাটা "বলে যে রসটাই ফিকে হয়ে যায়। সংলাপে বীরভূমি টান রাখতে গিয়ে মাঝে মাঝে কেমন কেন শুকিয়েছে। শেষেরদিকে একইভাবে পুনরাবৃত্তি কিরদংশে যেন খসড়ে খসড়ে নিয়ে যায়। মাঝে খানিকটা একঘেয়েমি লাগে।

অখ্যাত, কিন্তু অজ্ঞাত নয় দীনু বা নিতাই বা বাসিনীরা কেউই। কাছাকাছির লোক বলে ওদের কাছে টেনে নিতে চেষ্টার দরকার হয় না, আর শিল্পীরাও অভিনয় কৃতিত্বে চরিত্রগুলিকে মনে বসিয়ে দিতেও সক্ষম হয়েছেন। বিশেষ করে উল্লেখ করতে হয় দীনুর চরিত্রে কালী বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয়। প্রতিভাই বৈচিত্র্যের এক অবিসম্বাদীয় দৃষ্টান্তে তার এই চরিত্র-চিত্রণ। সরল এক সৎ ও সহজ মানুষকে বড়ো মনোময় করে পাওয়া যায়। ভোলবার নয় নিতাই চলে যাবার পর ওর অকুলতা, ওর নামে পার্সেল আসায় নিতাইয়ের খবর আছে বলে আনন্দ আর নিতাই আর ফিরবে না শুনে ওর ভেঙ্গে পড়া দেখে চোখের জল রোধ করে রাখা সম্ভব হয়নি। নিতাইয়ের অন্তর্ধানের পর থেকে শেষের অংশ নাটকীয় হয়ে থাকে। নিতাইয়ের সমগ্র চরিত্র কোন্তা সেদিক ভাল অভিনয় করেছেন—নিতাইকে চঞ্চল করে তোলার সময় নির্দেশ দেবার কাজে যে সেই কাজ অভিনয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। বাসিনীর চরিত্র ছোট কিন্তু সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় চরিত্রটিকে স্মরণীয় করে রেখে ছেন। মনে পড়বে দীনুর পিসির চরিত্রটি; ভালো মানুষ বৃদ্ধ ওদের সংসারে সান্ত্বনা দেবার জন্য রয়েছে! কমলা অধিকারী অভিনয়ে সেটা সুন্দর ফুটিয়েছেন। নিতাইয়ের চরিত্রে অজিত গাঙ্গুলীর অভিনয়ও চরিত্রানুগ। জহর গাঙ্গুলি ডাকঘরে এসে ফুকোটে কাজে পড়ে যাবার এক ব্যাতিক্রান্ত একটা টাইপ ফুটিয়েছেন। চমৎকার লাগবে শান্তিদেব ঘোষকে বাউলরূপে; নাচে, গানে, কথায়, ভঙ্গীতে নিখুঁত বাউল। অন্যান্য চরিত্রে আছেন গণ্ণাপদ বসু, মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীল রায়, যামিনী বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, গৌর শী, সলিল দত্ত, মণি শ্রীমানি প্রভৃতি। ছোট ছোট চরিত্র, কিন্তু টাইপগুলি ফুটিয়েছেন ভাল সকলেই।

* * *

ছবিখানির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সম্পাদিনা। ঠিক পরিবেশের মতো বাস্তবের চমৎকারিত্ব নিয়েছে। গানগুলি বাউল সুরের, ছবির বিশেষ আকর্ষণ। ষাড়া মিষ্টি গাওয়া, আর রচনায় গানগুলি রচনা করেছেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। ভালো উৎসবের গানখানিও বেশ জমাটি। গানগুলি গেয়েছেন মান্না দে ও শ্যামল মিত্র।

এ সপ্তাহের আকর্ষণ

চলতি ছবির মধ্যে এ সপ্তাহে রয়েছে "মানময়ী গার্লস স্কুল" "রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্ত", "বন্দিনী" "মেঘমল্লার", "ভাবী", 'মাদার ইণ্ডিয়া", "নাইট ক্লাব", "তিসরি গলি।" নতুন ছবি মুক্তি লাভ করছে "ডাক হরকরা", "বৃন্দাবনলীলা", "রাজতিলক" "সিম সিম মর্জিনা।"

বাংলার অপরাধী

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

কিছু কিছু লোক অপরাধের পথ ছেড়েও নিয়েছে, আবার কেউ কেউ পাকা অপরাধীও বনেছে। অপরাধীর পুনর্বাসন তখনই সম্ভব, যখন রাজনৈতিক রণমঞ্চ থেকে এরা সদলে বিতাড়িত হবে। আর এ সৎ কাজ রাজনৈতিক নেতারা সদিচ্ছায় কখনও করবেন না। এই সব কাজের লোক, সোনার টুকরো ছেলেরা হাতছাড়া হয়ে যাবে বা আরও ভয়ঙ্কর কথা—বেদলের হাতে চলে যাবে—তাই পা তাঁরা বরদাস্ত করবেন কেমন করে। নিজের মৃত্যু পরোয়ানায় কি নিজে কেউ সই করে? সুতরাং, একমাত্র উপায় নেতাদের বাধ্য করা। বাঙলার সাধারণ মানুষকে সব কিছু পরিষ্কার করে বলা দরকার আর ক্রুদ্ধ জনমত ভ্রষ্টাচারী নেতাদের সংযত করতে পারে। তখনই সময় আসবে এই অপরাধী গোষ্ঠীর পুনর্বাসন পরিকল্পনাকে কার্যকরী করার।

১১ই এপ্রিল থেকে

মনুষ্যত্বের ধর্ম্মে মহান

"বিরল সেই জাতের ছবি যা চলচ্চিত্রকে কৌশলের স্তর থেকে কলার স্তরে উত্তীর্ণ করে"

অগ্রগামী প্রোডাকসন্স বিরচিত

উত্তরা * পূরবী * উজ্জ্বলায়

আলোছায়া অভিনেতা, শ্যামশ্রী, মায়াপুরী, নেতৃ, নিউ তরুণ, কল্যাণী, শ্রীকৃষ্ণ, উদয়ন...

কংগ্রেসীদের ঘরোয়া বৈঠকে সিদ্ধার্থ রায়ের ব্যাঙ্গোক্তিতে শ্রীঅতুল্য ঘোষের ক্ষোভ

(দর্পণের প্রতিনিধি)

এত দিনে সিদ্ধার্থ রায়ের মস্তিষ্ক ত্যাগের আসল কারণের একটা হদিস পাওয়া গেল।

কারণটাই তাঁর কাল, মনে হয় অতুল্য ঘোষেরও কাল হতে চলেছে।

ফেব্রুয়ারী মাসের শেষের দিকে কংগ্রেসকর্মীদের এক ঘরোয়া বৈঠক। সিদ্ধার্থ রায়ও সেখানে আছেন। অন্যান্য দলনেতাদেরও কেউ কেউ উপস্থিত।

বৈঠকের আলোচ্য বিষয়—কাকদ্বীপ কিষাণ সম্মেলনে কংগ্রেস সভাপতি শ্রী ডেবর ও কেন্দ্রীয় সরকারের কয়েকজন মন্ত্রী সম্মেলনে যোগ দেবেন। কাজেই আয়োজনের কোন ত্রুটি হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। সম্মেলনে কে কোন্ কাজের ভার নেবেন তাও বৈঠকে স্থির হবে। সরকারী-সাহায্য ছাড়া এই এলাহী কারবার সম্ভব নয়।

কিন্তু সব চেয়ে বড় কথা খরচের টাকা কোথা থেকে আসবে। খরচ আনুমানিক লাখ তিনেক টাকা হবে বলে কংগ্রেস প্রধান শ্রীঅতুল্য ঘোষ সকলকে জানালেন। চমকে উঠে সিদ্ধার্থ রায় বল্লেন, "বলেন কি, তিন লাখ টাকা! এত টাকার কি হবে। অন্ততঃ কয়েকজনের পকেটে যাবে।"

ঘোষ মহাশয় একটু অপ্রতিভ হলেন। সেদিন সেখানে বৈঠকে অনেকেরই মুখে একটু আরজিম হল।

একটু মনঃবিশ্লেষণের ভাব দেখিয়ে তিনি সিদ্ধার্থ রায়ের কথার খোঁচাটুকুর অমল দিলেন না। বল্লেন, "বড় সম্মেলনত কখনও করিনি, কেন এত টাকার প্রয়োজন হয় তা তোমরা বুঝবে না। বাক এ সব বিষয়ে তোমাদের মধ্যে ঘামাবার দরকার নেই। টাকার ব্যবস্থা আমি করব।"

ব্যাপারটা এখানেই ধামাচাপা পড়ল।

তারপর বৈঠকে আসন্ন সম্মেলনে কে কোন কাজের ভার নেবেন ইত্যাদি ঠিক হল।

কিন্তু ঘোষ মহাশয় স্থির থাকতে পারলেন না। ডাঃ রায়কে তিনি পরে সব কথা বল্লেন।

মুখের উপর এত বড় অপমান কি সহ্য হয়। সিদ্ধার্থের এত বড় দুঃসাহস! এই 'ছোকরা' যেন ভড়ংয়ে কথা বলতে শেখে — ডাঃ রায় যেন তাঁকে একথা জানিয়ে দেন। এই ছিল শ্রী ঘোষের মানসিক অবস্থা।

পরদিন কংগ্রেস সভাপতির অনুরোধ, ডাঃ রায় তা উপেক্ষা করতে পারেন না।

দুই এক দিন পরে ডাঃ রায় সিদ্ধার্থ রায়কে ডেকে বল্লেন, "কি হে সিদ্ধার্থ তুমি নাকি অতুল্যকে অপমান করেছ। কংগ্রেস কর্মীরা কিষাণ সম্মেলনের টাকা দেবে, এমন কথা বলেছ কি? একটু ভদ্রভাবে কথা বলতে শেখ।"

জবাবে সিদ্ধার্থ রায় বল্লেন, "ডাঃ রায়, সত্যি কথা বল্লে যদি কারও অপমান হয়, তবে আমি নাচার। তবে জেনে রাখুন ঐ লোকের কাছে আমার ভদ্রতা শিখতে হবে না।

সিদ্ধার্থ রায়ের পতনের সূত্রপাত এই ঘটনাতেই।

কাকদ্বীপ সত্যিই কাল হবে।

বাঙ্গলায় অপরাধ ও রাজনীতি (৩)

নিখিল দৈত্য

স্বাধীনতার পর দেশের গণতান্ত্রিক অগ্রগতির ধারা দ্রুতর হয়েছে। সার্বজনীন ভোটএর ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক সাধারণ নির্বাচন আমাদের জাতীয় জীবনে নতুন এক গণচেতনা জাগিয়েছে। সামাজিক জীবনে নারিদ্র্য, বেকারী, অসম ধন বন্টন প্রভৃতি বৃহত্তর সমস্যা সম্পর্কে সাধারণ মানুষ সচেতন হয়ে উঠেছে এবং বিভিন্ন ভাবে তারা নিজেদের দাবী দাওয়া পেশ করছে। গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের সংগঠন ও আন্দোলনের গুরুত্ব তাই আরও বেশি করে বেড়েছে। গণমানষের নব চেতনার উন্মেষ এর প্রধান দায়িত্ব রাজনৈতিক দলগুলির উপর। অনাগত দিনের উজ্জ্বলতর সম্ভাবনার দাঁপবর্তিকা নিয়ে বিভিন্ন দল সাধারণ মানুষকে বলবে, বোঝাবে এবং তারই মধ্যে দিয়ে দেশ এগোবে। মত ও পথের স্বন্দ্ব কোনও অবস্থাতেই যেন রক্তাক্ত সংঘাত-সংঘর্ষ-এর পথ না নেয়। সব গণতন্ত্রের পূজারীর এই একান্ত কামা। অথচ, স্বাধীনতার পর বাঙলাদেশে রাজনীতির ধারা এখন বিষাক্ত পথে গেল কেন? বিচার, বিতর্ক, আলোচনার ক্ষেত্রে অপরাধী মানুষের আনাগোনা; নিজের মতকে প্রতিষ্ঠার জন্যে প্রতিপক্ষকে সাহিসে পিসঁড়ন। এই বা শুরু হলো কেন?

রাজনৈতিক দলের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী

বাঙলার প্রতিটি রাজনৈতিক দল, উদলল বহুদিন ধরে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী সংগঠিত করেছে। দলের ভেতরের মানুষকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। নেতা, কর্মী এবং ভলান্টিয়ার (ইচ্ছা করেই ইংরাজী শব্দটা রাখলাম। কারণ, স্বেচ্ছাসেবক বললে পরিচয় অসম্পূর্ণ থেকে যায়)। কর্মীদের মধ্যে কেউ কেউ ভলান্টিয়ার যে না হতো তা নয়, তবে অধিকাংশে কর্মীই নিজেদের একটু উচ্চ পর্যায়ের বলে মনে-করতো এবং করে। রাজনৈতিক দলের ছুটকো কাজের জন্যে ভলান্টিয়ার দরকার। বিশেষ কোনও কাজ পড়লে, ভলান্টিয়াররা দিনরাত পরিশ্রম করে। আবার সম্মেলন, মিটিং, মিছিল লেগে হয়ে গেলে, ভলান্টিয়ারদেরও কাজ থাকে না। আগেকার যুগেও ভলান্টিয়ারয়রা একটু আথর্চু উচ্ছৃঙ্খলতা যে না করতো তা নয়। তবে, তার সঙ্গে আজ যা ঘটছে তার কোনও তুলনাই হয় না।

অপরাধীদের নিয়ে ভলান্টিয়ার বাহিনী

স্বাধীনতার পরই বাঙলাদেশে সরকারপক্ষের নেতারা বিভিন্ন ভাবে অপরাধী গোষ্ঠীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। সবাই যে অপরাধীদের রাজনৈতিক আসরে নামাতে চেয়েছিলেন তাও বলা চলে না। দাঙ্গার সময় এই সব ছোট ছোট সংগঠনের কথা তাঁরা জানতে পারেন এবং নেতাদের কেউ কেউ সত্যিই আশা করেছিলেন যে পরিবর্তিত পরিবেশে পাড়ার এসব ডাকসাইটে ছেলেদের শুভমতি হবে এবং এরা ভাল কাজ করবে। শান্ত, সুস্থ আবহাওয়ায় হয়তো এ উদ্দেশ্য সফল হতো। কিন্তু, দলের মধ্যে ও বাইরে তাঁর কলহ, বিবাদ, অস্বাভাবিক উত্তেজনা এবং সকলের উপরে বাঙলার মধ্যবিত্ত সমাজ যাঁবনে তাগন — সমস্ত বাতাবরণকে অস্বাভাবিক ও বিষাক্ত করে তোলে। প্রতিপক্ষের যুক্তির বিরুদ্ধে যুক্তি না দিয়ে ডাণ্ডার সাহায্যে ঠাণ্ডা করার ব্যবস্থা আরম্ভ হয়। একটা পোষে। তাদের প্রধান কাজ ঘটনার উল্লেখ করি। স্বাধীনতার বিরোধী দলের সভাদের মারপিট করা, মিটিং ভাঙ্গা জোর করে মজুরদের কাছ থেকে চাঁদা আদায় করা ইত্যাদি। অনেক সময় হরতাল করিয়ে বা হরতালের ভয় দেখিয়ে মালিকদের কাছ থেকে অর্থসংগ্রহও এরা করে। ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন প্রায়ই কোনও না কোনও রাজনৈতিক দল নিয়ন্ত্রিত। তাই, এইসব সমাজবিরোধী কাজে রাজনৈতিক

উদ্বাস্তু কলোনিতে রাজনৈতিক আন্দোলন ও সংগঠন

রাজনৈতিক আন্দোলনে যে সব অপরাধী গোষ্ঠী অংশ নেয়, তাদের কেউ কেউ উদ্বাস্তু কলোনী বা ক্যাম্পের লোক। সাধারণ ভাবে এই বিরাট ছিন্নমূল মানবতা নতুন করে ঘর সংসার পেতে বা ক্যাম্প জীবনের অসহ্য দুঃখ কষ্টের মধ্যে যেখানেই বসবাস করুকনা কেন, তাদের উপর সমাজ জীবনের শৃঙ্খলার বন্ধন শিথিল হয়ে এসেছে। ছেলে বাবাকে মানে না, মায়ের কোনও শাসন মেয়ে শোনে না, পল্লী মাতব্বর বা বয়স্ক সম্মান কাউকেই যেন প্রতিবেশীরা দিতে রাজি নয়। তার উপরে চলছে অবিরাম উৎকট রকমের রাজনৈতিক প্রচার। মানুষের দুঃখ, কষ্ট ভালোয়ের এরকম বিভৎস খেলা ভারতবর্ষে আজ অন্য কোথাও হচ্ছে না। এই অসহ্য পরিস্থিতিতে তরুণ যুবকদের কেউ কেউ অপরাধী গোষ্ঠীর খপ্পরে গিয়ে পড়ছে পাড়ার পাড়ায় অতি তুচ্ছ ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে মারাত্মক লেগেই রয়েছে। জমি, জায়গা, পরমা-কড়ি নিয়েও বিরোধের অন্ত নেই। দুই পক্ষের মুরুব্বি স্থানীয় দুই রাজনৈতিক দলের নেতা হলে, তখনই সামশামামনি লড়াই আরম্ভ হলো। গত কয়েক বছরের মধ্যে এই সব পল্লীতে কতকটা খুন, জখম হয়ে গিয়েছে এবং প্রায় প্রত্যেকটার সঙ্গে কিছু রাজনৈতিক সম্পর্ক থেকে গিয়েছে এবং অধিকাংশক্ষেত্রেই অপরাধীর সাজা হয়নি।

অপরাধীর দণ্ড

রাজনীতির সঙ্গে সংস্রব অপরাধীদের অভিযুক্ত করলেও, প্রায়ই সাজা হয় না। এখন অবশ্য 'কালা কানুনে' এদের কয়েকজনকে বিনাবিচারে জেলে আটক করে রাখা হয়েছে। সমাজের সাধারণ নিয়মে এই সব সমাজবিরোধীদের দণ্ড কেন দেওয়া যায় না এই প্রশ্নের আলোচনা বিভিন্ন লোকের সঙ্গে করেছি। শাসনযন্ত্র নাকি এদের বিরুদ্ধে স্বাভাবিক ভাবে কাজ করতে পারে না। রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যোগ থাকায় অপরাধের গুরুত্ব যদি হ্রাস পায় বা সেইরকম নির্দেশ যদি আকারে, ইঙ্গিতে আসে তবে আইন-কানুন তার কঠোরতা হারিয়ে ফেলে। অপরাধী গোষ্ঠীর আসল উৎস ধারা বা তাদের সবোচ্চ পৃষ্ঠপোষকদের নাম সব কিছু জানা থাকলেও, তা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। অপরাধ ধারা করে এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সেই কাজে যারা সহযোগিতা করে—

(৮ম পৃষ্ঠায়)

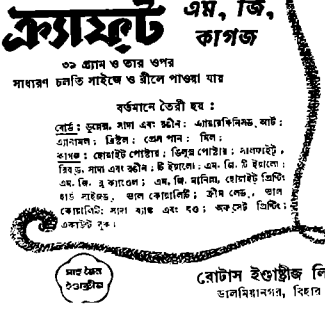

পাকিস্থানের রাষ্ট্র সঙ্কট

শ্রীচারুচন্দ্র চৌধুরী

রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের করেন। পরে, ভারত বিভাগের তখন সেই বিরোধের মীমাংসার নিতে দেখা যায় না। রাজা এবং ইতিহাসে নূতন নয়। কিন্তু সে রক্তের বিপ্লবে, অথবা জনা যখন দুই পক্ষের বিরোধ হয়, জনা কাহাকেও আদালতের আশ্রয় প্রজা বা প্রজা সংসদের মধ্যে বিরোধ বিরোধের মীমাংসা হয় বলপ্রয়োগে, আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সর্ব-নির্বাচনের মাধ্যমে। কিন্তু ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে রাষ্ট্রতন্ত্র গঠন সভা dissolution বা নির্মূলন করায় ফলে পাকিস্থানে যে রাষ্ট্র সঙ্কটের সৃষ্টি হয়েছিল সেই সম্বন্ধে কিছু উদ্ধারের জন্য রাজ সরকার এবং জনসংসদ উভয় পক্ষই আদালতের আশ্রয় নিয়েছিলেন। রাষ্ট্রতন্ত্রের ইতিহাসে এটা বোধ হয় অভূত-পূর্ব। বিপ্লব বা নির্মূলনের ভার আদালতের উপর ন্যস্ত করে আদালতকে মধ্যস্থ মানা দেওয়া হয়েছিল সম্প্রতি নাই। কিন্তু রাজ-নৈতিক বিরোধে আদালতের হস্তক্ষেপ কতটা বাঞ্ছনীয় তাতে সংশয় আছে।

রাষ্ট্রতন্ত্রের ' কাঠামোর মধ্যেই বিচার বিভাগের স্থান; ক্ষমতা পরিচালনের জন্য বিচার বিভাগকে সম্বন্ধেই শাসন বিভাগের উপর নির্ভর ' করতে হয়। একথা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট আব্রাহম মার্কিন সুপ্রীমকোর্টের রায় মানতে অস্বীকৃত হন; তিনি বলেছিলেন ক্ষন মার্শেল রায় দিয়েছেন তিনিই সেটা ' আমলে আনুন।" রাষ্ট্রতন্ত্রের কাঠামো বদল ভেঙ্গে বার তখন তাকে জুড়ে দেবার ক্ষমতা আদালতের নাই। কার্যত যে ক্ষমতা অধিকার করে বসে আইনের তর্কে তর্কে তাকে সরিয়ে দেবার শক্তিও আদালতের নাই। এই কারণেই ' রাজনৈতিক বিরোধে আদালত হস্তক্ষেপ করেন না, কথা উচিত ও নয়।

পাকিস্থানের বাস্তবিকই প্রকরাসঙ্কটের এটাই স্বীকৃত হয়েছে। পাকিস্থানের প্রধান বিচারপতি মহম্মদ মুনিরের মতে সেটা ছিল মূলে প্রশ্ন—বিতাড়িত সরকারকে পুনঃস্থাপনের জন্য কার্যসিদ্ধির সরকারের উপর হুকুম জারী করা যায় কিনা—পাকিস্থানের ফেডা-রেল কোর্ট প্রথমে সে প্রশ্নের জবাব দেন নি; কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই প্রশ্নের মীমাংসা করতে হয়েছে। কার্য স্বীকৃত সরকারকে আইন স্বীকার করার জন্য নানা যুক্তিতর্কের অবতারণা করতে হয়েছে। সেই প্রসঙ্গে পাকিস্থানের ফেডারেল কোর্ট যে চারিটি রায় দিয়েছেন স্বনাম-খ্যাত রাষ্ট্রতন্ত্র বিশারদ সার আই-ভার জেনিংস সেগুলি পুস্তকা-কারে প্রকাশ করেছেন। Constitutional Problems in Pakistan. By Sir Ivor Jennings. Cambridge. 42s. সেই রায়গুলি ভারতবর্ষে ও আমাদের অনুধাবন করবার প্রয়োজন আছে। কারণ, যে Indian Independence Act বা ভারত স্বাধীনতা সঙ্কোত আইনের এবং অন্যতু Continuent Assembl গঠন সভার অধিকারের বিশ্লেষণ এই রায়গুলিতে আছে, সে আইন ভারতবর্ষেও প্রযোজ্য এবং ভারতের রাষ্ট্রতন্ত্র গঠনসভার অধিকার ও সে আইনেই নিবদ্ধ আছে।

সকলেই জানেন যে, অখণ্ড ভারতের গভর্ণর জেনারেল লর্ড মাউণ্টব্যাটেন বৃটিশ মন্ত্রিসভার পরিকল্পনা অনুযায়ী ভারতে এক রাষ্ট্রতন্ত্র গঠন সভা আহ্বান না দিয়া, ঐ অধিবেশন সরকার বন্ধ রাখেন। এর প্রতিকারের জন্য সভাপতি মৌলবী তমিজুদ্দিন খাঁ সিন্ধুপ্রদেশের চীফ কোর্টে এক দরখাস্ত পেশ করেন। তাঁর আরজী ছিল—২৪শে অক্টোবরের ঘোষণাকে বাতিল সাব্যস্ত করে ঐ ঘোষণা-মূলে কোন কাজ না করার জন্য গভর্ণর জেনারেলের উপর Mandamus নামক এক হুকুমজারী করা আর নবীনযন্ত্র মন্ত্রিসভার কয়েকজন মন্ত্রী কোন্ অধিকারে মন্ত্রিত্ব করছেন তার কারণ দর্শাবার জন্য তাঁদের উপর Quo Warranto নামক হুকুম জারী করা। সিন্ধুপ্রদেশের চীফ কোর্ট এই দুই আরজীই মঞ্জুর করেন। আপীলে ফেডারেল কোর্ট চীফ কোর্টের রায় নাকচ করে দিলেন; বলালেন এই হুকুম জারী করবার অধিকার চীফ কোর্টের নাই। ফেডারেল কোর্ট যদিও সমতো বে, বিতাড়িত সর-কারকে পুনঃস্থাপনের জন্য কার্য-স্বীকৃত সরকারের উপর হুকুম জারী করা আদালতের উচিত নয়, তবে কোন কাজ ছিল না। সে কথা তাঁরা বলতে পারতেন, কারণ, Mandamus or Quo War-ranto জারী করা বা না করা সম্পূর্ণ আদালতের অভিরুচি বা discretion -এর উপর নির্ভর করে; দরখাস্তকারীর এই সব হুকুম দাবী করার বিশিষ্ট কোন অধিকার নাই। কিন্তু ফেডারেল কোর্ট অন্য কারণ দিলেন।

সাধারণ আইনের যে ধারার বলে চীফ কোর্ট Mandamus প্রভৃতি হুকুম জারী করবার অধি-কারী সেই ধারাটি ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে রাষ্ট্রতন্ত্র গঠন সভা ঐ আইনে সংযোজিত করেন। যে সংশোধন আইনে তা করা হয় সেটা রাষ্ট্রতন্ত্রাত্মক আইন, সুতরাং ঐ আইনে গভর্ণর জেনারেলের সহ-মত নেওয়া হয়নি। ফেডারেল কোর্টের মতে ঐ আইনেও গভর্ণর জেনারেলের সহমত নেওয়া হয়নি। ফেডারেল কোর্টের মতে ঐ আইনেও গভর্ণর জেনারেলের সহ-মত নেওয়া আবশ্যক ছিল। সহমত না থাকায় ঐ আইন বাতিল—

(সপ্তম পৃষ্ঠায়)

বিজ্ঞান আলোচনা

সৌর মণ্ডল • • •

শ্রীজ্ঞান

আমার এক বন্ধু (সহকর্মীও বটে) সম্প্রতি বিবাহ করিয়াছেন, তাঁর স্ত্রীর সম্বন্ধে। স্বামী-স্ত্রীর আলাপ আলোচনা অপরের না শোনাই ভাল। কাজেই তিনি যে সম্প্রতি বলেছিলেন তাঁর স্ত্রীর সম্বন্ধে সেটা প্রকাশ না করাই হয়ত উচিত ছিল। কিন্তু প্রসঙ্গক্রমে তিনি (বন্ধুপত্নী) নাকি আমার বৈজ্ঞানিক নাকি সংবাদ পরিবেশন সম্বন্ধে কিছু কৌতূহলের প্রকাশ করেছিলেন। সেই কথায় এ-কথাটা উঠে গেল।

আমার বন্ধুটি তাঁর স্ত্রী সম্বন্ধে কখেণ্ট গর্ব অনুভব করেন। কাজেই তিনি যখন বল্লেন যে তাঁর স্ত্রী সূর্যপ্রলয় সম্বন্ধে কৌতূহল প্রকাশ করেছিলেন, তখন আমিও স্বভাবতই একটু কৌতূহলী হয়ে উঠি। বন্ধুপত্নী নাকি প্রশ্ন করেছিলেন সূর্য-প্রলয় কেন হয়? সে-প্রশ্নের উত্তরে, আমার বন্ধুটি বৈজ্ঞানের আশেপাশে কখনও ঘোরাঘুরি করেছেন কিনা জানিনা) নাকি তাঁর স্ত্রী-কে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন ব্যাপারটা কি!

স্বীকার করছি, একটু ত্রুটি থেকে গেছে, আমার তরফ থেকে। প্রথম প্রশ্নের আ-ভূ-ব সম্বন্ধে বলতে গিয়ে সূর্য প্রলয়ের কথা উল্লেখ করেছি; অথচ বিশদভাবে তার কোন আলোচনা করিনি। ইচ্ছে করেই করিনি। তার আগে আলোচনার ভূমিকা সামনে রাখা প্রয়োজন। এ পর্যন্ত সে চেষ্টাই করেছি। দেখাবার চেষ্টা করেছি, সূর্য প্রলয়ের প্রতি বৈজ্ঞানিকদের জিজ্ঞাসার পাটভূমিকাটা প্রত্যক্ষভাবে কোথায়। সূর্য প্রলয় কেন ঘটে এটা বৈজ্ঞানিক জিজ্ঞাসা। কাজেই বন্ধুপত্নী (এবং আমার বন্ধুও) গর্ব বোধ করতে পারেন বৈ, বৈজ্ঞানিক প্রশ্নই তাঁর মনে এসে-ছিল। (অবশ্যি আমার বন্ধুটি প্রশ্নের উত্তরে কি বলেছেন আমি সঠিক জানিনা। কাজেই ওটা আমার মতব্যের বাইরে রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ।)

ঠিক কি কারণে এবং ঠিক কোন প্রক্রিয়ার ফলে সূর্য প্রলয় ঘটে, আমার অতত সঠিক জানা নেই। তবে সূর্য প্রলয়ের সময় যে, বিপর্যয় ঘটে তার কিছুটা আভাস মোটামুটিভাবে আমি দেবার চেষ্টা করেছি। এবার সে-দাই আরও একটু, পরিষ্কারভাবে আলোচনা করা যেতে পারে।

সূর্যমণ্ডল 'ভবকেসুম্ম ইত্যাদি' বহু প্রাচীন মন্ত্র। এর শিলনে কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নিশ্চয়ই নাই; কিন্তু বোঝা যায় তা এই যে, বহু প্রাচীনকাল থেকেই সূর্যকে সমস্ত বিশ্বের প্রাণকেন্দ্র বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। সহজ ও সরল কথায় বলতে গেলে, সূর্যকে বিশ্বকেন্দ্র হিসেবে ধরে নেওয়া যেতে পারে। তার প্রধান কারণ, মহানুলোর গ্রহ উপগ্রহ সূর্যের আকর্ষণেই ঘুরপাক খাচ্ছে। কেন এ-ভাবে ঘোরে, সে-প্রশ্নের উত্তর নানাকালে নানাভাবে দেবার চেষ্টা করা হয়েছে।

তবে নিউটনের যুগকে যদি বিজ্ঞানের প্রথম যুগারম্ভ ধরে নেওয়া যায়, তাহলে 'গ্যাভিটেশন' বা আকর্ষণ বলে যে কথাটা প্রচলিত আছে সেটাই উত্তর হিসেবে নির্ভরযোগ্য।

এখানে একটা কথা বলে রাখা ভাল যে, 'গ্যাভিটেশন' আর 'গ্র্যাভিটি' এক জিনিষ নয়। অনেকেই (যাঁরা বিজ্ঞানের ধার ধারেন না) দেখেছি তফাৎ-টা সম্বন্ধে খুব সচেতন নন। 'গ্র্যাভি-টেশন' বা আকর্ষণ কথাটা সহজে বোঝা যায় যদি দুটো ছোট মেয়েকে হাত ধরে ঘুরপাক খেতে দেখা যায়। অর্থাৎ, একটি মেয়ে আর একটি মেয়ের হাত ধরে নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে ঘুরছে আর অন্য মেয়েটি অনেকটা জায়গা জুড়ে ঘরকণাক খাচ্ছে। এ-অবশ্যই মেয়ে দুটির হাতের কাজ হল পরস্পরকে আকর্ষণ করা বা ধরে রাখা যাতে কেউ না ছিটকে পড়ে। এই হাতের আকর্ষণটাই 'গ্র্যাভি-টেশন'। এর মধ্যে যে মেয়েটি মাঝখানে দাঁড়িয়ে একই জায়গায় ঘুরে যাচ্ছে সে হল সূর্য; আর অন্য যে মেয়েটি অনেকটা জায়গা জুড়ে গোল হয়ে ঘুরছে সে হল গ্রহ। তফাৎ যেটুকু আছে সেটা ঘুরপাকের অঙ্কপথে। কিন্তু সেটা এখানে আলোচ্য বিষয় নয়।

আর উপর থেকে কোন জিনিষ ছেড়ে দিলে মাটিতে যে আকর্ষণে এসে লুটিয়ে পড়ে; সে 'গ্র্যাভিটি' বা মাধ্যাকর্ষণ। এই মাধ্যাকর্ষণের উপরেই দেহের বা বস্তুর ওজন নির্ভরশীল। কাজেই সূর্য-প্রলয়ে 'আকর্ষণ'-কে মনে রাখলেই কাজ চলে যাবে। কিন্তু এই 'আকর্ষণ'-শক্তী ব্যাখ্যাটা নিউটনের পরবর্তী যুগ; বা আইনস্টাইনের যুগে ওলট পালট হ'য়ে গিয়েছে।

নিউটনের যুগের ধারণা মোটা-মুটিভাবে এইরকম: নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে সূর্য চব্বিশ ঘিনের (সৌরদিন) একটি বেশী সময়ে সম্পূর্ণভাবে একবার প্রদক্ষিণ করে। এই প্রদক্ষিণের গতি ভাড়াও নানারকম শক্তির সং-ঘর্ষ প্রতিনিয়ত সূর্যের গায়ে তোলপাড় করে যার ফলে এর বাইরের প্রকৃতিটা অত্যন্ত অশান্ত। সূর্যের অন্তর্লোক থেকে বিচ্ছুরণ ঘটে। এবং এই শক্তি বিচ্ছুরণের ফলে সূর্যের ওজন প্রতি সেকেণ্ডে চল্লিশ লক্ষ টন কমে যাচ্ছে।

*

এই বিচ্ছুরণের মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যায় উদযান কণিকা। কাজেই বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, সৌরমণ্ডলে যখন অস্বাভাবিক অবস্থা দেখা দেয় তখন কি বিরাট পরিমানে নানারকম বিচ্ছুরণ ঘটতে থাকে। সূর্য প্রলয়ের সময়, সৌরমণ্ডলের লক্ষ লক্ষ মাইল জুড়ে বিদ্যুৎ কণিকা ফোয়ারার মত প্রহানুসের উর্ধ্বগত হয়। এই উর্ধ্বক্ষিপ্ত কণিকা লক্ষ কোটি যোজন পর্যন্ত নিমিষে ছুটে চলে। এই সৌরবিকরোগের ঢেউ এসে যখন পৃথিবীর বহির্-মণ্ডলে এসে আঘাত করে তখনই সৃষ্টি হয় 'বৈদ্যুতিক আজ্ঞানন' বরনমণ্ডলের নাঁচে।

* *

এ যা হ'ল সূর্য-বি ছুরণের প্রকৃতি একটু আলোনা করা প্রয়োজন। আজকাল উদযান বোমার কথাটা সকলের কাছেই সুপরি-চিত। মোটামুটিভাবে, এবং সহজ-ভাবে বলতে গেলে, উদযান পর-মাণু কেন্দ্র সংশ্লিষ্ট হলে যে অবস্থাটা হয়, সেটাই পাওয়া যায় উদযান বোমার বিস্ফোরণে।

এই প্রক্রিয়ার মূলে কথা হল, চারটে উদযান পরমাণু কেন্দ্র (অর্থাৎ চারটে প্রোটোন) মিশিয়ে একটা হিলিয়াম পরমাণু কেন্দ্র সৃষ্টি করা। এর ওজন চারটে উদযান পরমাণুর চাইতে কিছু কম। এই প্রক্রিয়ার ফলেই তাপ ও আলো বিকীর্ণ হয় সূর্য থেকে প্রতি-নিয়ত। এই বিরাময়ীন বিস্ফোরণের ফলেই পৃথিবীর বুকে জীবনের স্রোত বইছে।

আরও দেখা গিয়েছে যে, সূর্যমণ্ডলে প্রতি সেকেণ্ডে ষাট কোটি টন উদযানের সংশ্লিষ্টনের ফলে উদযাট কোটি লক্ষ টন হিলিয়াম তৈরী হচ্ছে। কিন্তু সূর্যমণ্ডলে এই রকম একটা প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হতে লক্ষ লক্ষ বৎসর সময় লাগি!

*

নির্বাণ জন্মার গ্রন্থ। পরমাণুর যুগে তেজস্ক্রিয় বিচ্ছুরণের অনেক কথাই আজকাল শোনা যায়। এই তেজস্ক্রিয় বিচ্ছুরণকে নানা কাজে লাগাবার চেষ্টা চলেছে। তার মধ্যে একটা প্রচেষ্টা নির্বাণ করা। ভয় নেই, মানুষ নয়, পোকামাকড়! কোন কোন পোকামাকড়ের পুরুষ চিতাটাকে তেজস্ক্রিয় বিচ্ছুরণের সামনে রেখে তাদের স্ত্রী-পোকাদের সংসর্গে রেখে দেওয়া হয়েছিল। দেখা গেছে, এর ফলে স্ত্রী-পোকাগুলি লক্ষ লক্ষ ডিম পেড়েছে; কিন্তু একটাও বাচ্চা হয়ে ফোটেনি!

একটি সাময়িক পত্রিকার নির্যাতন কাহিনী : (পো প্রোস্ত)

১৯৫৭ সালের ৩০শে জুন পোলোন্ডের সাপ্তাহিক পত্রিকা পো প্রোস্তু লিঃ : দু মাসের জন্য পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ থাকবে। সম্পাদকরা লিখলেন যে, তাঁদের কাগজের নিয়মই এই যে, বছরে দু মাস তাঁরা ছুটি উপভোগ করান জন্য পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ রাখবেন, কিন্তু গত দু বছর ধরে ঘটনার চাপে এই নিয়ম পালন করা যায়নি, এবার করবেন। অনেকের মনে প্রশ্ন জাগল যে, ঘটনার চাপ কি এ বছর কমে গেল? বিশেষজ্ঞ পোলান্ড ও হাঙ্গেরীর তাৎপর্যপূর্ণ বিদ্রোহের রেশ যখন কাটেনি?

পো প্রোস্তুর ১৫০,০০০ জন গ্রাহক দু মাস ধরে অর্থাৎ আগস্টে প্রতীক্ষা করল। ১লা সেপ্টেম্বর পত্রিকা প্রকাশ হবার কথা। কিন্তু হল না। ১০ তারিখে একটি খবর চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল যে, সেন্সর বিভাগ পো প্রোস্তুর ১লা সেপ্টেম্বরের ও ৮ই সেপ্টেম্বরের সংখ্যা দুটি বের হবার সঙ্গে সঙ্গে বাজেয়াপ্ত করেছে, জনসাধারণের হাতে পৌঁছতে পারেনি।

তার আগে দুর মাস ধরে, সেন্সর বিভাগ পত্রিকাটির উপর খরদৃষ্টি রেখে ছিলেন; তাঁদের না দেখিয়ে ছেপে কোন লেখা প্রকাশ করা হত না। আট পৃষ্ঠার কাগজ পো প্রোস্তু; কিন্তু সেন্সর বিভাগকে সম্পাদকরা ছাপা দিতেন চব্বিশ পৃষ্ঠার উপযোগী লেখা, তার মধ্যে বাছাই করে সেন্সর বিভাগ যে লেখা কাটতে ছাপার অক্ষরগুলি দিতেন সেগুলিই ছাপা হত। কিছু এতেও কুলোল না। সেন্সর বিভাগ আক্রিকরা দাবলেন পো প্রোস্তুর সুরেই সর্বনাশকর; কাগজটিই বিদ্রোহের কাগজ। অতএব এ কাগজের প্রকাশ বন্ধ করে দেওয়াই নিরাপদ।

১৫ই সেপ্টেম্বর সোকোরোস্কি সাংবাদিকদের ডেকে একটি বিশেষ ঘোষণা করলেন। কে এই ব্যক্তি? স্তালিন যুগে ইনি ছিলেন সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী। এবং বর্তমানে পোলিশ রেডিওর প্রধান কর্তা। সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বললেন : পো প্রোস্তুর প্রকাশ সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। কেন? কারণ, এই কাগজে এমন সব লেখা বেরিয়েছে এবং বেরুবে বলে গচ্ছিত রাখা হয়েছে যে সব লেখা "সমাজতন্ত্রে পৌঁছবার পোলিশ পন্থতির" বিরোধী, অর্থাৎ সরকারী মত ও কার্যের সমালোচনার পূর্ণে।

গোমুলকা বাবকে বেলগ্রেডে বাবার আগে এক বিবৃতিতে বললেন তাঁর সরকারের সকল নীতির প্রতি সাংবাদিকদের যে পূর্ণে সমর্থন তাহে তা প্রমাণ করে দেখানো উচিত; অর্থাৎ, তাঁর সরকারের বিরুদ্ধে কেউ কিছু বলতে পারবেন না, তাঁর জয়গানে সবার মুখরিত হওয়াই সবার কর্তব্য।

বেলগ্রেড ঘুরে এলেন গোমুলকা। বেলগ্রেডেও মিলোভান জিলাসের বিচার হয়ে গেছে। হতভাগ্য জিলাস কারাগারেই দিন যাপন করছেন। কাজেই মামলা টিটোর কছ থেকে সুপ্রমামর্শ ও বিশেষ উৎসাহ পেয়েই ফিরলেন গোমুলকা।

২৯শে সেপ্টেম্বর ভোটের শ্রমিকদের সভায় বক্তৃতা করলেন গোমুলকা। বক্তৃতায় পূর্বোলিখিত অভ্যন্ত করলেন মিলোভান জিলাসকে। জিলাস যে ক্ষতি করেছেন সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার এতটা ক্ষতি আর কেউ করেনি। তাঁর লেখার আঘাতে কমিউনিস্ট দেশগুলি কাঁপছে, নতুন শ্রেণীর বিরুদ্ধে তাঁর এ অপরাধ সহ্য করতে অক্ষম।

কিন্তু এই পর্যন্তই না। গোমুলকা পো প্রোস্তুর বিরুদ্ধেও বলতে লাগলেন। বললেন : সমাজতন্ত্রের সত্য এই কাগজ। সমাজতন্ত্রের গায়ে কালো কালি ঢেলে দিয়েছে এঁরা। হয় এ কাগজ সুর পাল্টাক, কমিউনিস্ট পার্টির নির্দেশ না মানলে মেনে চলুক। আর নতুবা আলোকের মুখ দেখার আর এর দরকার নেই।

এ সব সেন্টেম্বরের ঘটনা। কাগজের সম্পাদকরা সরকার ও পার্টির সঙ্গে কথাবার্তা চালালেন। কথাবার্তার খানিকটা যেন সুফল ফলল। আপোষ রফার পথ ধরলে কাগজ বের করা অসম্ভব নাও হতে পারে বলে মনে হল। সেই অনুযায়ী যোষণা করা হল যে, ১লা অক্টোবর পো প্রোস্তু আবার ১লা অক্টোবর সংখ্যা দুটি বের হবার সঙ্গে সঙ্গে বাজেয়াপ্ত করেছে, জনসাধারণের হাতে পৌঁছতে পারেনি। তার আগে দুর মাস ধরে, সেন্সর বিভাগ পত্রিকাটির উপর খরদৃষ্টি রেখে ছিলেন; তাঁদের না দেখিয়ে ছেপে কোন লেখা প্রকাশ করা হত না। আট পৃষ্ঠার কাগজ পো প্রোস্তু; কিন্তু সেন্সর বিভাগকে সম্পাদকরা দিতেন চব্বিশ পৃষ্ঠার উপযোগী লেখা, তার মধ্যে বাছাই করে সেন্সর বিভাগ যে লেখা কাটতে ছাপার অক্ষরগুলি দিতেন সেগুলিই ছাপা হত। কিন্তু এতেও কুলোল না। সেন্সর বিভাগ আক্রিকরা দাবলেন পো প্রোস্তুর সুরেই সর্বনাশকর; কাগজটিই বিদ্রোহের কাগজ। অতএব এ কাগজের প্রকাশ বন্ধ করে দেওয়াই নিরাপদ।

১৫ই সেপ্টেম্বর সোকোরোস্কি সাংবাদিকদের ডেকে একটি বিশেষ ঘোষণা করলেন। কে এই ব্যক্তি? স্তালিন যুগে ইনি ছিলেন সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী। এবং বর্তমানে পোলিশ রেডিওর প্রধান কর্তা। সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বললেন : পো প্রোস্তুর প্রকাশ সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। কেন? কারণ, এই কাগজে এমন সব লেখা বেরিয়েছে এবং বেরুবে বলে গচ্ছিত রাখা হয়েছে যে সব লেখা "সমাজতন্ত্রে পৌঁছবার পোলিশ পন্থতির" বিরোধী, অর্থাৎ সরকারী মত ও কার্যের সমালোচনার পূর্ণে।

গোমুলকা বাবকে বেলগ্রেডে যাবার আগে এক বিবৃতিতে বললেন তাঁর সরকারের সকল নীতির প্রতি সাংবাদিকদের যে পূর্ণে সমর্থন তাহে তা প্রমাণ করে দেখানো উচিত; অর্থাৎ, তাঁর সরকারের বিরুদ্ধে কেউ কিছু বলতে পারবেন না, তাঁর জয়গানে সবার মুখরিত হওয়াই সবার কর্তব্য।

বেলগ্রেড ঘুরে এলেন গোমুলকা। বেলগ্রেডেও মিলোভান জিলাসের বিচার হয়ে গেছে। হতভাগ্য জিলাস কারাগারেই দিন যাপন করছেন। কাজেই মামলা টিটোর কছ থেকে সুপ্রমামর্শ ও বিশেষ উৎসাহ পেয়েই ফিরলেন গোমুলকা।

২৯শে সেপ্টেম্বর ভোটের শ্রমিকদের সভায় বক্তৃতা করলেন গোমুলকা। বক্তৃতায় পূর্বোলিখিত অভ্যন্ত করলেন মিলোভান জিলাসকে। জিলাস যে ক্ষতি করেছেন সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার এতটা ক্ষতি আর কেউ করেনি।

কিন্তু দেশের আকাশে তখন আর এক বাতাস বইতে সুরু করেছে। স্তালিন আর নেই, তার মূর্তিকে ধূলিতে ফেলে দিয়ে কে কত জোরে পদাঘাত করতে পারে চলছে তার প্রতিযোগিতা। বহু দিনের গুপ্ত অবদমিত ক্ষোভ ফেটে পড়েছে বিপুল আকারে।

সেই উন্মাদ সপ্তাহে সুরু মেলাবার জন্য এগিয়ে এল পো প্রোস্তু। পোলান্ডের তরুণ-তরুণীরা দেখল তাদের মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে উজ্জ্বল, উদ্দীপ্ত ভাষায় লিখছে পো প্রোস্তু : এই তাদের পারিপার্শ্বিক জগৎ যেখানে ব্যস্তরা শুধু হতাশার, ব্যর্থতার দীর্ঘ, আদশ দেখানে উপহাসিত, জীবন বিশ্বস্ত— সেই জগতের প্রতিচ্ছবি পো প্রোস্তুর পাতায় ফুটে উঠছে। পো প্রোস্তু এখন জনগণের কাগজ। আর তাই তার প্রচার-সংখ্যাও লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে গেল।

বন্ধুক, প্রবীণ চিন্তাশীলরা তখনও তাঁদের প্রাক-মুক্তিকালের ধারণা নিয়ে বসে আছেন। "ধনতান্ত্রিক সমাজ" সম্পর্কে তাঁদের বিতর্কের অন্ত নেই, জিদ ও ব্রুকলের অর্থনীতি পড়ানো নিয়ে তখনও আলোচনা চলছে, ক্যাথলিকরা সমর্থন করছেন মারিতাকে, নিরীশ্বরবাদীরা সমর্থন করছে গিরোভেকের। পো প্রোস্তু কিন্তু অনেক ধাপ এগিয়ে গেল। পো প্রোস্তুর এল কালের দূত হয়ে, সুর্ত করে ধরল কালের বাসনা-বেদনা, তার আবেদন ছাড়িয়ে গেল দেশের সীমা। আন্তর্জাতিক সুরে তার কণ্ঠে ; সকল দেশের তারুণ্যের সঙ্গে তার যেন নিবিড় যোগ।

জগতের বিভিন্ন দেশের পত্র-পত্রিকা ও পুথি-পুস্তক থেকে পো প্রোস্তু মাল-মসলা নিত। হাসি-কৌতুক থেকে সুরু করে গভীর দার্শনিক প্রবন্ধ পর্যন্ত এই কাগজে প্রকাশিত হত। অবশ্য সম্পাদক ছিলেন মাত্র দুজন। অবশ্যই, লেখার মধ্যে নানা ফাঁক থেকে যেত, কিন্তু নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার অভাব ছিল না।

কিন্তু কমিউনিস্ট সরকার কেপে গিয়েছেন কেন? পো প্রোস্তুকে তারা ঘর করত কেন?

কেন না পো প্রোস্তু অন্যায়কে ক্ষমা করতে ভুলে গিয়েছিল। যখন স্তালিন যুগের সমালোচনায় আকাশ-বাতাস মুখর তখন কমিউনিস্টরা বলত, স্তালিন খুব খারাপ লোক, তাঁর ব্যক্তিগত গুরুতর ত্রুটির জন্যই কমুনিস্ট শাসনে এত অন্যায় ঢুকেছে। কমিউনিজম ও কমিউনিস্ট শাসন-ব্যবস্থার কোন দোষ নেই। পো প্রোস্তু এ ব্যাখ্যা নিয়ে সন্তুষ্ট রইল না। মিলোভান জিলাসের আগেই "নতুন শ্রেণী"র কথা লিখেছিল পো প্রোস্তু। অনেকটা এতাই মতো চিন্তাধারা ছিল এই পত্রিকার। পত্রিকার লেখা হয়েছিল ১৯৩৬ সালের ১লা জুন :

আমাদের পার্টির ও রাষ্ট্রের কিছু অংশ লোক এক নতুন শ্রেণী গড়ে তুলছে। হাঁ, ঠিক তাই : নতুন একটি শ্রেণী! যদি এই নতুন শ্রেণী নিজেদের গড়ে তুলতে ও স্থায়ী করতে পারে, তবে এরা বুর্জোয়া শ্রেণীর মতো হবে না। এরা জানে কি করে আমাদের কলকারখানা ও জমি এরা ব্যক্তিগত মালিকানার হাতে ফিরিয়ে দেবে না।

সমাজ-ব্যবস্থার লক্ষণগুলি বজায় রেখে এর মূলবস্তু নষ্ট করে দিতে হয়। উৎপাদনের উপাদানের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা না বসিয়েই শ্রমিক শ্রেণীকে কি করে শোষণ করতে হয় তাও এরা জানে। কি ভাবে নিজেদের জন্য সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করে নিতে হয়, কি করে জনসাধারণের কাছ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন রাখতে হয়..... তা তারা জানে। গণতন্ত্রকে তারা অস্বীকার করে। যে সব লোক যে সামাজিক গোষ্ঠী এ সব করে তাদের ইতিহাসে খুঁজে দেওয়া সোজা নয়। তারা মুখে বিপ্লবী শ্লোগান খুব বলে এবং প্রকৃত বিপ্লবীদের মতো বুর্জোয়ারাও তাদের ঘৃণা করে....আমাদের অনেক উপেক্ষা, আদর্শ তারাও নিজেদের বলে চালায়।...

'এই নতুন শ্রেণীর বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ ছিল পো প্রোস্তুর। তবে মিলোভান জিলাস যেমন মার্ক্সবাদের উপরই প্রায় বিশ্বাস হারিয়েছেন, তাঁরা তা হারাননি। পো প্রোস্তুর সম্পাদক ও লেখকরা কলেছিলেন সমাজ-তন্ত্রের নামে, মার্ক্সবাদের নামে আসলে নতুন শোষক কায়েম হয়ে বসতে চাচ্ছি, কিন্তু এ অবস্থা পাল্টে প্রকৃত সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হওয়া দরকার। স্তালিনের মার্ক্সবাদ—লেনিনবাদের ভাষা তাঁরা মানেনি। স্তালিন সম্পর্কে তাঁরা লিখলেন : স্তালিন মার্ক্সবাদী ছিলেন না, এবং মার্ক্সবাদের প্রতি-নিধিত্ব করার অধিকার তাঁর নেই। মার্ক্সবাদের উপর পরিপূর্ণে বিশ্বাস জানিয়েই পো প্রোস্তু লিখল :

পো প্রোস্তুর বলার কথা ছিল ছিল এই যে, কার্ল মার্ক্সের সব চেয়ে বড় অপরাধ হল তিনি একশো বছর আগে তাঁর মতবাদ লিখে গেছেন! এই একশো বছরের দুনিয়ার এমন অনেক পরিবর্তন হয়েছে যা তিনি দেখে যেতে পারেননি। কল্পনাও করতে পারেননি! সে সব পরিবর্তনের ফলে জগতের চেহারাটা গেছে বদলে, সমস্যা দেখা দিয়েছে নতুন নতুন। ধনতন্ত্রই কত রূপ পাল্টেছে। তারপর ধনতন্ত্র যে দেশে সর্বে অবস্থায় পৌঁছেছে, কার্ল মার্ক্সের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সমাজতন্ত্র যেখা সেখান দে ঘৈদে... বিশ্বাস করেছে বহু অনুন্নত দেশেই। ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে শ্রমিকশ্রেণী দিনে দিনে নিজের নিশ্চয়তর হয়নি, বরং বেড়েছে

(কের পৃষ্ঠার পর)

পাকিস্থানের রাষ্ট্র-সংকট

অতএব সেই ধারায় বলে ডাঁফ কোর্ট কোন অধিকার পাননি। কার্য-স্বীকৃতি সরকারকে পর অধিষ্ঠিত রাখা হল বটে, কিন্তু ফলে এক রাষ্ট্রসংকটের উদ্ভব হল।

সেই সংকট আলোচনা করার আগে সহযোদ্ধে ব্যাপারটা বিশ্লেষণ করা যাক। পাকিস্থান ফেডারেল কোর্টের সিদ্ধান্তে নির্ভুল হলে ভারতের ও বহু রাষ্ট্রতান্ত্রিক আইন বাতিল গণ্য হবার সম্ভাবনা আছে— কারণ, ঐ সমস্ত আইনের গভর্ণর জেনারেলের সহমত নেওয়া হয়নি। প্রথমেই বলা দরকার যে, কেবল রাষ্ট্রতান্ত্রিক আইন প্রসঙ্গে ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ভারত শাসন আইনে সংক্রান্ত আইন প্রযোজ্য ছিল না। সুতরাং সহমত দরকার কিনা তার বিধান ভারত স্বাধীনতা সংক্রান্ত আইনে কিংবা অন্যত্র খুঁজতে হবে। উপরাষ্ট্রের বিধিবদ্ধ বা অধিকার লুপ্ত হয়ে যায়নি; রাজার প্রতিনিধিত্বে গভর্ণর জেনারেল সহমত নেওয়ার রাজার নিজস্ব অধিকার; যেহেতু পাকিস্থানের গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত করবার ক্ষমতা রাজা নিজের হাতে রেখে-ছিলেন, সেইহেতু রাজার নিজস্ব Legislature প্রণীত কোন আইনে গভর্ণর জেনারেলের সহমত নেওয়ার দরকার হয়েছিল। ইংলণ্ডের রাজা বৃটিশ পার্লামেণ্টের এক অংগ, সুতরাং সেখানে সহমত অত্যাবশ্যক। রাজা বা রাষ্ট্রপ্রধানকে বিধিসংসদের এক অংগ হতে হবে এমন কোন মৌলিক নীতি নাই। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে অথবা ফরাসী প্রজাতন্ত্রে প্রেসিডেণ্ট বিধিসংসদের অপাঙ্‌ক্তেয় নন। বৃটিশ রাষ্ট্রসংঘের প্রত্যেক উপরাষ্ট্রের রাষ্ট্রতন্ত্রে পার্লামেণ্টের মতোই গভর্ণর জেনারেলকে বিধিসংসদের অংগ করা হয়েছে। ভারত বা পাকিস্থানের বেলায় তা করা হয়নি। তর্কের খাতিরে যদি মেনে নেওয়া যায় যে, গভর্ণর জেনারেল

(শেষাংশ অষ্টম পৃষ্ঠায়)

তাদের জীবনযাত্রার মান বস্তুত সম্পর্ক থেকে আরও সংকটের আবর্তে পড়ে চুর্ণে হয়ে যাবে বলে মার্ক্স ভেবেছিলেন, বাস্তবে তা ঘটেনি..... কমিউনিস্ট পার্টি যে বিপ্লবের পরে শ্রমিক-শ্রেণীর নামে নিজ ডিক্টেটরশিপ প্রতিষ্ঠা করবে, ক্ষমতা পেলে কমিউনিস্ট পার্টিরও যে বিবর্তন হবে : মার্ক্স তো এসব কথাও ভেবে যাননি.....

পো প্রোস্তু প্রতিবাদ জানাল মানুষকে যন্ত্রের মতো ব্যবহারের বিরুদ্ধে। কমিউনিস্টরা উৎপাদনের একটি উপাদানের বেশি কোন মর্যাদা দানিবেক মানুষকে দিতে চাইনি। পো প্রোস্তু লিখল : মানুষের সুখ-দুঃখ, ব্যক্তির বিকাশই হবে সমাজ-প্রগতির মাপ-কাঠি, man is the measure of all things.

শুধু তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকেনি পো প্রোস্তু। বাস্তব ঘটনা ও নীতির সমালোচনা করতে সুরু করল। কমিউনিস্ট সরকারের প্রতোকটি পোলান্ড বিচার করে তাদের মিথ্যা প্রকৃতি উদ্ঘাটিত করে দিল। পরিকল্পনা, গৃহ-সমস্যা, কৃষি-সমস্যা, বৈদেশিক বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয় নিয়ে এমন তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনা বের হল বে, কমিউনিস্ট পার্টি ও সরকার মরমে মরে যেতে থাকল। এবং সরকার অনেক ক্ষেত্রে বাধ্য হল পো প্রোস্তুর আলোচনার সত্যতা প্রকাশ্যে স্বীকার করে নিতে।

এই সবই ছিল কারণ। পো প্রোস্তুর প্রকাশ বন্ধ করে দেওয়া দরকার হয়ে পড়েছিল কমিউনিস্ট সরকারের পক্ষে। তাদের সম্মান বাঁচাতে লুটিয়ে দিয়েছিল এই পত্রিকা।

তারা বন্ধ করে দিয়েছেও। কিন্তু বে আগুনে পো প্রোস্তু জ্বালিয়েছিল তা কি নিভবে?

[দি নিউ লীডার থেকে পরিব-কুমার ঘোষ কর্তৃক সংকলিত]

বেতার মন্ত্রী শ্রীকেশকার, তবে শুনুন !

(দর্পণের প্রতিনিধি)

তথামন্ত্রী শ্রী কেশকার বলেছেন যে সাধারণ অর্থে যাদের সরকারী কর্মচারী বলা হয় ঠিক সেই অর্থে "সি" ক্লাস আর্টিস্টরা সরকারী কর্মচারী নয়।

কিন্তু তিনি হয়ত জানেন না যে এ-বি-সি ইত্যাদি শ্রেণীবিভাগ যাঁরা স্থির করেন বা জোরা কমিটির যে দোহাই দিয়েছেন তারা কোন নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলেন না, অন্ততপক্ষে কলিকাতা রেডিওতে।

এখানকার কর্তৃপক্ষ যে শিল্পীদের মতামতের পরোয়া করেন না—তার প্রমাণ হাতে-হাতেই পাওয়া যায়। প্রীতারাসুন্দরী, মুকুতাজ আলি খাঁ বা ঘোষ দস্তিদারের মতন শিল্পীকে শ্রোতারা চান না এ-কথা নিশ্চয়ই বলা চলে না—কিন্তু তাদের কি আমরা রেডিওতে শুনতে পাই? শুনেমি আবার যে কেন শুনতে পাই জনকয়েক আর্টিস্টদের নিয়মিত ভাবে—বাঁধও তারা বিরক্তি উৎপাদন করে তাও বোঝা মুস্কিল। শিল্পীদের তালিকা রচনার ব্যাপার লক্ষ্য করলে দেখা যাবে দশ পনের বছর কি তারো বেশীদিন ধরে বেতারে নিয়মিত ভাবে অংশ নিচ্ছিলেন যে সব শিল্পী তাঁরাও (বোধ হয় কর্তৃপক্ষের) তোয়াজ করতে পারেন বলে রাতারাতি নূতন শিল্পীদের পর্যায়ে নেমে এসেছেন।

পারিশ্রমিক বৃদ্ধির দাবী তাঁরা জানান নি এমন নয়—কিন্তু কর্তৃপক্ষের মৌখিক আশ্বাসের ভুলে যাঁরা ঐ প্রাথমিক ২০্ বা ২৫্ ফিতে অংশগ্রহণ করে এসেছেন তাঁরাই আবার "সি" তালিকার শিল্পীরূপে পরিগণিত হয়েছেন।

একথা মোটেই বলা হচ্ছে না যে এদের ভিতর সকলেই শ্রেষ্ঠ শিল্পী। কিন্তু এদের প্রতি যা ব্যবহার করা হচ্ছে তা সত্যিই লজ্জাজনক।—যেমন ধরুন নবাগতের জন্য টিনফোয়া বা ছটাকা জমা দিয়ে অডিশন ফর্ম পাঠানর যে নূতন নিয়ম সৃষ্টি করেছেন তা থেকেও এই শিল্পীদের রেহাই দেওয়া হয় নি। বরং কর্তৃপক্ষীয় লোকেরা জোর করে ২০্ বা ২৫্ ফি থেকে এদের পারিশ্রমিক ১০্ টাকার নামিয়ে এক আধটা তথাকথিত ঐকতানাদিতে যোগদান করতে বাধ্য করেছেন। কিন্তু এই ধরণের সুযোগও নিয়মিত দেওয়া হচ্ছে বলে বললে কী হবে কার্যক্ষেত্রে মোটেই তা নয়।

এবং বিকৃত চিন্তাপ্রসূত উপকরণ, আমাদের দেশের জীবনধারাতে যা নেই, যা খাপও খায়না তেমনি সব উপকরণের সমাবেশে তৈরী "লাইট-হাউস" জাতীয় ছবি যার ইংরাজী নামকরণ থেকেই নির্মাতার চিন্তা-প্রকৃতি ধরা যায়; এমন সব ছবি যাতে দেশীয় মেয়েরাও কাশরি স্যার্ড আর টাইট স্লেজী পরে 'রক এন্ড রোল' নাচে ডুবে থাকে; কিংবা গান শুনিয়ে মাৎ করে দেবার কথা ভেবে যাতা একটা গল্প জুড়ে ফেলতেন ভাবে তোলা "মেঘমল্লার" এর মতো ছবি; বা এককালে লোককে আমোদ জুগিয়েছিল বলে তার আবেদন এখন চলে গেলেও সেই উপাদানই আবার পরিবেশন করতে "মানময়ী গার্লস স্কুল"কে এনে হাজির করা, আর তাও এমনভাবে বিনাশ্রমে যে ত্রুটি ও অকৃতকার্যতা দেখে বিরক্ত হতে হয়—এইসব ছবিরই ভীড় দেখে বলতে ইচ্ছে হয়, কাঁচা ফিল্ম নিরক্ষণের চেয়ে ছবি তৈরীর গুণে দেখে লোক বেশ দেওয়ার ওপরই বেশী জোর দেওয়া দরকার।

সম্প্রতি বিজ্ঞাপিত ও ঘোষিত হচ্ছে যে বেতারে অভিনয় করে প্রবেশ করতে হলে রাগ বা রাগ্রাগিত সংগীতের ক্ষেত্রে ৩্ ও লঘু সংগীতের ক্ষেত্রে ২্ ফি দিতে হবে। এ-করেই তারা ক্ষান্ত হননি। "নেবেনা লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিল্পক বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সার্টিফিকেটও অবশ্য প্রেরিতব্য)" বলে বলেছেন। এই শেষোক্ত ধারাটি যে কোন এক রেডিওর "অডিশন বোর্ড"র স্কুলকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে—একথা বলতে কিন্তু দুষ্টু লোক ছাড়ছেন।

তারপর শিল্পীদের অডিশন ও রি-অডিশনের বেড়াজালে জড়িয়ে তাঁদের ভবিষ্যৎ চিরদিনের জন্য বেতারের জনকয়েক ভাগ্যবিধাতার দয়ার উপর ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে বলে আমাদের কাছে অনেকে অভিযোগ করেছেন।

সরকারের যে কোনো প্রতিষ্ঠানেই কেউ যদি বিভাগীয় পরীক্ষার অকৃতকার্য হয় তা হলে সে পূর্বে কর্মেই নিয়োজিত থাকে তার চাকুরী খোয়া যায় না কিন্তু বেতারের ব্যবস্থা নাকি অন্যরূপ। কোনো কোনো ওয়াকিবহাল লোক আমাদের বলেছেন যে সহসা পরীক্ষা দিতে বাধা করে অনেক শিল্পীর পারিশ্রমিকের হার নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। যার ফলে পারিশ্রমিক বৃদ্ধি করার প্রশ্ন অনা কেউ তুলতে সাহসই করছে না।

তারপর সম্প্রতি বিভাগের বা লাইট মিউজিক ইউনিটের 'পিচফু প্রডিউসার'কে বাইরে কাজ কর্ম করতে দেওয়া হচ্ছে কিন্তু নাট্য বিভাগের "পিচফু প্রডিউসার"কে বাইরে চিত্র পরিচালনার অনুমতি চাওয়ার দরুণ চাকুরী খোয়াতে হয়েছে। একই ব্যাপারে দুরকম নীতি প্রয়োগের অর্থ কি—তা সাধারণ বুদ্ধিতে বোঝা দুষ্কর। এ সমস্ত দেখে বোঝা যায় যে সত্যিকারের কোন নিয়ম কানুনের ধার ধারে না আমাদের এখানকার কর্তৃপক্ষেরা।

আমরা জনসাধারণের স্বার্থে তাঁর কেশকারকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করি তিনি অনতিবিলম্বে কলিকাতার রেডিওর ব্যাপারে একটা একটা নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি বসান। তাহলে কলিকাতা বেতার কেন্দ্রের অনেক কিছুই পঙ্কিলতা বেরুবে।

পাক রাষ্ট্র সংকট

(গতকল্য পৃষ্ঠার পর)

তন্ত্র, না আছে রাষ্ট্রতন্ত্র গঠনসভা না আছে কোন বিধিসংঘ। উপরন্তু স্বাধীনতা লাভের পর যত আইন রচিত হয়েছিল সবই বাতিল সাব্যস্ত হয়েছে। এই রাষ্ট্রীয় মহাসংকটে জেনিংস যাকে বলেছেন legal chaos রাষ্ট্র শাসন বজায় রাখবার জন্য পাকিস্থানের গভর্ণর জেনারেল করেকটি উপায় অবলম্বন করলেন। পাকিস্থানের রাষ্ট্রতন্ত্র করবার জন্য তিনি এক রাষ্ট্রতন্ত্র গঠন সমিতি আহ্বান করলেন; তার নাম Contituent Assembly না দিয়ে নাম দিলেন Contituent Convertion নূতন করে আর এক Contituent Assembly আহ্বান করা যায় কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল বলেই এটা করা হল। এক ঘোষণা করে রাষ্ট্র শাসন বজায় রাখবার জন্য আইন প্রণয়ন বা আইনসিদ্ধ করবার সমস্ত ক্ষমতা নিজ হাতে নিলেন। ঐ ক্ষমতার বলে যে পাকিস্তানী আইন আগে সিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন, সেই পাকিস্তানী আইনকে পুনরায় সিদ্ধ ঘোষণা করলেন। তবে এবার বললেন—এই যে আইন সিদ্ধ করা হল তা ফেডারেল কোর্টের অনুমত এবং রাষ্ট্রতন্ত্র গঠন সমিতির অনুমোদন সাপেক্ষ। ফেডারেল কোর্টের অভিমতের জন্য তিনি চারটি প্রশ্ন পেশ করলেন। সে চারটি এই ঃ—

১। রাষ্ট্রতন্ত্র গঠন সভার [Assembly] বিগতন আইনসিদ্ধ কিনা।

২। ভারত স্বাধীনতা সংক্রান্ত আইনমলে রাষ্ট্রতন্ত্র গঠন সভার যে সমস্ত ক্ষমতা দিল নব আহূত রাষ্ট্রতন্ত্র গঠন সমিতি সেগুলি পরিচালনা করতে পারবেন কিনা।

৩। যাবৎ রাষ্ট্রতন্ত্র গঠিত না হয় তাবৎ রাষ্ট্রশাসন সম্পর্কে গভর্ণর জেনারেলের কি ক্ষমতা আছে।

৪। রাষ্ট্রতন্ত্র গঠন সমিতির মন্ত্রীসভা সম্পর্কে যেসব আইনগুলি সিদ্ধ ঘোষণা করবার ক্ষমতা গভর্ণর জেনারেলের আছে কিনা।

এই প্রশ্নগুলির একমাত্র উত্তর হতে পারে এবং ফেডারেল কোর্ট সেই উত্তরই দিয়েছেন। রাষ্ট্রের অস্তিত্ব যেখানে লিপ্তল, যেখানে রাষ্ট্র শাসন বাহত—সেখানে ক্ষমতার কার্য দক্ষিতে অধিকারীকে স্বীকার না করে উপায় নাই এবং রাষ্ট্রের প্রয়োজনে যে সমস্ত ক্ষমতা তার থাকা দরকার সেগুলির তার আছে একথা মেনে নিতে হবে। সে ক্ষমতার পরিচালনা সাধারণ আইন অনুসারে আইনী কি বেআইনী তার বিচার চলে না। ফেডারেল কোর্ট অবশ্য তাঁদের সিদ্ধান্তের সমর্থনে আইনের নজীরও দেখিয়েছেন। হাগানা বা বিপ্লবেরও সময় যেমন সামরিক আইন বা কোন আইনই নয়, তাকে স্বীকার করতে হয়, যুদ্ধে বিজেতার অধিকার বা right of conquest কে যেমন স্বীকার করতে হয়, রাষ্ট্রের প্রভু শক্তি বা Lovereignty হলে বে কার্য করা হয়—ইংরেজীতে যাকে বলে Act of State তাকে যেমন স্বীকার করতে হয় এও তেমনি—রাষ্ট্রের প্রয়োজনের উপরে কোন আইন নাই। Sahes poperli Suprem a Lex. নের এই সূত্র প্রয়োগ করে ফেডারেল কোর্ট বলেছেন, পাকিস্থানে যে রাষ্ট্র সংকটের সৃষ্টি হয়েছিল সেই রাষ্ট্রসংকটে গভর্ণর জেনারেলের সমস্ত ক্ষমতা নিজের হাতে নিয়ে সমস্ত আইন সিদ্ধ ঘোষণা করতে পারেন। তবে কেন প্রথম অর্ডিন্যান্সে বেআইনী সাব্যস্ত করেছিলেন তার উত্তরে ফেডারেল কোর্ট বলেন যে, সে অর্ডিন্যান্সে সমস্ত আইনকে সরাসরি সর্বকালের জন্য সিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল; কিন্তু সেযোগ ঘোষণার রাষ্ট্রতন্ত্র গঠন সমিতির মন্ত্রীর সাপেক্ষ রেখে সাময়িকভাবে তা করা হয়েছে।

প্রথম দুই প্রশ্নেরও সম্মতি-সূচক উত্তরই ফেডারেল কোর্ট দিয়েছেন। রাষ্ট্রতন্ত্র গঠন সভা বিগতন করবার কোন বিধান ভারত স্বাধীনতা সংক্রান্ত আইনে ছিল না। ভারত ইনসন সংক্রান্ত আইনেও বিগতন করবার যে বিধান ছিল সেই বিধান তুলে দেওয়া হয়েছিল। পরিষ্কার বোঝা যায় উদ্দেশ্য এই ছিল যে, রাষ্ট্রতন্ত্র গঠন করে সভা আত্মবিগতন করলেন। ফেডারেল কোর্ট বলছেন যে, বিধিবহির্ভূত বিগতন করবার যে নিজস্ব অধিকার বজায় আছে সেই অধিকার রাজা পরিত্যাগ করে থাকলেও, যখন রাষ্ট্রতন্ত্র গঠন সভা সাত বৎসরের মধ্যে রাষ্ট্রতন্ত্র গঠন করতে সমর্থ হলেন না, পরন্তু সভা এক চিরস্থায়ী বিধিবহির্ভূত হয়ে ওঠবার প্রচেষ্টা করলেন, তখন রাজার সেই নিজস্ব অধিকারের পুনরুদ্ধার হল এবং গভর্ণর জেনারেল রাজার সেই নিজস্ব অধিকারবলে রাষ্ট্রতন্ত্র গঠনসভাকে বিগতন করবার অধিকার দেখালেন। রাষ্ট্রতন্ত্র গঠনসভা বিগতন করবার ক্ষমতা রাজার নিজস্ব অধিকারের ওপর নির্ভর করবার প্রয়োজন ছিল না। কার্যঘটিত নির্দেশেই রাষ্ট্রতন্ত্র গঠনসভা গঠিত হল—গভর্ণর জেনারেল অন্তর্বর্তী নির্দেশেই সভা নির্দিষ্ঠিত করতে পারবেন। তাসল সমস্যা হল যে, নব-আহূত রাষ্ট্রতন্ত্র গঠন সমিতি বা সভা ভারত স্বাধীনতা সংক্রান্ত আইনের বলে রাষ্ট্রতন্ত্র গঠন করতে পারবেন কিনা? কেন না, ভারত স্বাধীনতা সংক্রান্ত আইন ১১৪৭ খৃষ্টাব্দে গঠিত সভাকেই ঐ অধিকার দেওয়া হয়েছে অন্য কোন সভাকে নয়। ইংলণ্ডের পার্লামেন্টে আর এক আইন পাশ করে নব-আহূত সভাকে সে অধিকার দেওয়া যেত কিন্তু রাজনৈতিক কারণে অবশ্য সেটা সম্ভবপর ছিল না। রাষ্ট্রের প্রয়োজনে রাষ্ট্রতন্ত্র গঠন করতে হবে সুতরাং নব-আহূত সমিতি বা সভায় সে অধিকার স্বীকার করতে হয়েছে। ফেডারেল কোর্ট বলেছেন রাষ্ট্রতন্ত্র গঠনসভা প্রতিনিধিমূলক হতে হবে। গভর্ণর জেনারেলের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত মনোনয়ন হবে না। কিন্তু সভা প্রতিনিধিমূলক হল কিনা, কে তার বিচার করবে? কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রাষ্ট্রতন্ত্র প্রণয়ন রাষ্ট্রতন্ত্র গঠনসভার কর্তব্য ছিল কিনা, রাষ্ট্রতন্ত্র গঠনসভা চিরস্থায়ী বিধিবহির্ভূত সংসদে পরিণত হবার প্রচেষ্টা করেছিলেন কিনা এই সমস্ত রাজনীতিগত প্রশ্নের মীমাংসার সমাধান করবার অধিকার বা পাত্রতা আদালতের নাই। প্রসঙ্গক্রমে প্রধান বিচারপতি মুনির জিজ্ঞাসা করেছেন—এখন আমরা রাষ্ট্রের সৃষ্টি, রক্ষা বা বিনাশ সম্পর্কে অধিকার বা কর্তব্যের কথা বলি তখন কি আমরা আইনের রাজ্যে আছি, না সেখানে আইন বা উকিলের প্রবেশ নিষেধ। আমাদের মনে হয় সেখানে আইন বা উকিলের প্রবেশ নিষেধ এই উত্তরই হওয়া উচিত।

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

বাংলার অপরাধ

তারা সবাই আইনের চোখে দোষী। অথচ, যবনিকার অন্তরালে সেই চক্রীদের হাত ছাড়ে দেবে এ সাহস কার? এই মহাপুরুষদের দলে অবশ্য ক্ষমতাসীন এবং ক্ষমতাগ্রাহী দুই শ্রেণীর লোকই আছেন। একই কারণে, এই সব মামলার সাধারণ নাগারিক সাক্ষী দেয় না। রাজনৈতিক দলের সঙ্গে অপরাধীদের যোগ, সমাজ-জীবনে তাদের প্রতিষ্ঠা-এই সব যখন সাধারণ মানুষ চোখের সামনে দেখে, তখন স্বভাবতঃই সে এদের বিরুদ্ধে কোনও কিছু বলতে ভয় পায়। আর যদি সত্যিই সাজা হয়, তাতেই বা কি বার আসে। সমাজ তো তাকে মনে অপরাধী বলে অপাংক্তেয় করতে পারবে না। রাজনৈতিক ক্ষমতা সবিশেষ তৎপরতার সঙ্গে অপরাধীর স্থান করে দেবেন। হরতো একটু কৈফিয়তের সুরে বলবেন ঃ—বড় ভাল ছেলে। মাঝে একটু মতিভ্রম হয়েছিল। তা ডাকাতি কি ও নিজের জন্যে করতে গিয়েছিল? ছেলেটার দিল দরাজ। গরীবের জন্যে ওর প্রাণটা বড় কাঁদে। এখন সব ঠিক হয়ে গিয়েছে। আমাদের দলের জন্যে কি অসম্ভব পরিশ্রমই না করছে।

অপরাধীদের ভবিষ্যৎ

আগেও বলেছি যে তরুণ এই অপরাধী গোষ্ঠীর অনেকে একটু সাধারণ নাগরিকের শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করতে পারে।

(চতুর্থ পৃষ্ঠার দ্রষ্টব্য)

অবনতি সাহিত্য

(৩য় পৃষ্ঠার পর

লেখকের মন অভ্রান্ত, সার্বজনীন শিল্প সৃষ্টির পক্ষে অপরিহার্য সুস্থ অশ্রান্ত দৃষ্টিতে জীবনকে দেখার, জানার কোনও ক্ষমতা তার নেই। তাই সংবাদ পত্রের খুনজখম, রাহাজানি, পাশবিক অত্যাচারের সুলিখিত বিবরণের মতই তিনি এদের জীবনের বীভৎস পরিণামের নিছক ঘটনাগত বিবরণই লক্ষ্য বর্ণনা দেন।

কাহিনীর মূলে অবশ্যই থাকে বিস্ময়ের চমক। সোসাই হঠাৎ এক দিন জানতে পারে, নিতাই কুমার বাহাদুরের অবৈধ সন্তান আশ্রয় নিয়েছে। কুমারের কৃখ্যাতি কম নয়, তার জন্যে বহু-কিরা সম্ভ্রান্ত, স্ত্রীও তাকে ত্যাগ করে গেছে। নিতাইয়ের বিরুদ্ধে সোসাই-এর মন বিষিয়ে ওঠে। কিন্তু সান্ধ্যরাগ দরোয়ার চলতে থেকে মনের মানুষে সোসাইকে উদ্ধার করার জন্যেই সে কুমার বাহাদুরের পরাশ্রয় হয়। নিতাই অবিলম্বে তার 'মাতাজী'তে পরিণত হয় নিতাই-এর মুখে সোসাই-এর কথা শুনে, অমন স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে কি করে সে স্বচ্ছন্দে বাস করে এ সব কথা ভাবতে ভাবতে কুমারের চিত্তবিপ্লব ঘটে, নিতাই-এর মধ্যস্থতায় স্ত্রীর সঙ্গেও মিলন ঘটে। স্বামীস্ত্রী তাদের নবলব্ধ মাতাজীর কাছে দীক্ষা নেয়। সোসাই-এর কাছে কুমার যাহা-দুত্বের স্ত্রীর নাস্তিকতা বস্তুতায় আকস্মিকভাবেই এই অভিজন পরিবর্তনের বিবরণ পেশ করা হয়, বিস্ময় রস তাতে আরও বেশি জমে। তারপরে খন্তা ঘোষ এবং চরণদাস বাবাজীর মৃত্যু। খন্তা ঘোষ তার প্রণয়িনী সুবর্ণকে ওর মামারা টাকার লোভে বাটনদহের বুড়োর সঙ্গে বিয়ে দেবে জানতে পেরে বাবাজীকে নিয়ে উপায় করতে যায়। খন্তা ওখানে বন্দী হয়, বিনা জলে তাকে শুকিয়ে মারার মতলব করা হয়। কিন্তু সে ছাদের ওপর পালিয়ে আসে, সেখানেও পাচ্ছেতাই তাড়া করে। খন্তা ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে শান-বাঁধানো উঠোনে। প্রথমেই লেখক খন্তার রক্তমাখা মুতদেহ নিয়ে আসেন, ঘটনার আকস্মিকতায় পাঠক চমকে ওঠে। তারপর এক বস্তার জবানিতে ঐ বিবরণ পেশ করেন। বিস্ময়কর রচনার এই সাধারণ নিয়ম। খুকেতে খুকেতে চরণদাস বাবাজীও আসে, রক্তবমি করে, অতঃপর মৃত্যু। গঙ্গার জলে বাবাজীর শরীর ধুয়ে গিয়ে গোসাই দেখে, সৃষ্টিকর্তার ভুলে সে পুরুষে নয়, নারীও নয়!

অবধূত চতুর লেখক, বাংলা-সাহিত্যের বাজারের হালচাল তিনি ভালই জানেন। এই বাজারে বিস্ময় এবং রোমাঞ্চই সব থেকে বড়ো মূলধন। এখানে যাঁদের নাম ডাক আছে, তাঁরাই যখন এই রোমাঞ্চের মহিমা প্রচারের ভার নিয়েছেন তখন আর ভাবনা কি। 'উপাসনাপত্রিকে দাঁড়ে এর ভূমিকায় সজনীকান্ত দাস প্রবন্ধাদের রচনা-পাঠে তাঁর 'অপরিসীম অনন্দ-লাভের কথা জানিয়েছেন। যেমন করেছেন: "যে ডিটেক্‌টিভ সাহিত্যে উচ্চতম শিল্প—এশিয়ে ও জ্বালা সৃষ্টির সহায়ক, অনুভব করিলাম লেখকের তাহা আছে।" দীর্ঘদিন সাহিত্যজগতে মুরুব্বি থাকার পরও সাহিত্যসৃষ্টিতে নিরাসক্তির অর্থ সম্পর্কে যাঁর কিন্দুমাত্র ধারণা নেই অবশ্যই তিনি বিস্ময়কর লেখকের প্রচারের ভূমিকা লেখার একমাত্র যোগ্য অধিকারী।

সাহিত্য ব্যবসায়ী সজনীকান্তের দাসের মতামতের জন্য খুব চিন্তিত না হলেও চলে। কিন্তু সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ও যখন অবধূতের প্রশংসায় গদগদ হন তখন আশংকা হয়, চিন্তা বিচারের পাট চুকিয়ে দিতে আমাদের আর বেশি দেরি নেই, বাংলাসাহিত্যে শ্মশান-যুগ বোধ হয় আসন্ন। সেই কারণেই এই আলোচনা, না হলে উদ্ধারণপুরের ঘাটের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে এতকথা বলার কোনও প্রয়োজন ছিল না।

ডাকার চিঠি

নেতৃত্ব ও দল উপদলের অন্তর্বিরোধের পরিণতিঃ হক সাহেবের রাজনৈতিক জীবনের অবসান?

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

ঢাকা, ৮ই এপ্রিল—এই এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহের ঘটনাবলী সম্বন্ধে চিন্তা করিলে, পূর্ববঙ্গ আইনসভার সম্মিলিত বিরোধী দলের কৃষক শ্রমিক দল যে ভাবে মুখ্যমন্ত্রী মিঃ আতাউর রহমানকে পদচ্যুত করিয়া তাঁহার স্থলে মিঃ আবু হোসেন সরকারকে নিয়োগ করিবার জন্য গভর্ণর মিঃ ফজলুল হককে বাধ্য করিয়াছিলেন তাহাতে অধীর তাহাদের নির্বুদ্ধিতার যে কোন ব্যক্তি বিস্মিত হইবেন।

গত ৩১ শে মার্চ তারিখে গভর্ণর মিঃ ফজলুল হককে এই পরামর্শ দেওয়ার পূর্বে, মিঃ আতাউর রহমান আগের দিন গভর্ণরকে আইনসভার অধিবেশন বন্ধ রাখিবার জন্য যে অনুরোধ জানাইয়াছিলেন তাহা জাতীয় আওয়ামী দলের প্রতিবাদের দরুণ ইতিমধ্যে বাতিল করিবার জন্য পরামর্শ দেন।

কৃষক শ্রমিক দল যদি অধৈর্য হইয়া না উঠিত এবং মিঃ আতাউর রহমানের ইজানুযায়ী আইনসভার পুনরাধিবেশন আহ্বানে সম্মত না হইত, তাহা হইলে শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত আওয়ামী দলে যে এক বিরাট ভাঙ্গন দেখা দিত তাহা কল্পনা করা কঠিন নহে, কারণ মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান অধিবেশন বন্ধ রাখার জন্য গভর্ণরের নিকট অনুরোধ জ্ঞাপনকালে স্বয়ং একথা স্বীকার করিয়াছেন। আওয়ামী দলের প্রতি জাতীয় আওয়ামী পার্টির সমর্থন সত্ত্বেও, বহু সদস্যই আওয়ামী দল ত্যাগ করিত এবং সম্মিলিত বিরোধী দলের সাফল্য নিশ্চিত হইয়া দাঁড়াইত এরূপ লক্ষণ দেখা গিয়াছিল। সারা পাকিস্থান কৃষক শ্রমিকদলের সভাপতি মিঃ হামিদুল হক চৌধুরী গভর্ণরকে পরামর্শ দিয়াছিলেন। মিঃ হামিদুল হককে কোনক্রমেই অল্প বলা চলেনা এবং তাহার এবম্বিধ কার্যের কারণও স্পষ্টই সুস্পষ্টরূপে বোঝা যায়। অধিকাংশে পর্যবেক্ষকদের মতে মিঃ হামিদুল হক চৌধুরী গভর্ণর মিঃ ফজলুল হককে পরামর্শ দিয়াছিলেন দুইটি কারণে।

কৃষক শ্রমিকদল গত বৎসর যখন মিঃ হকের ভাগিনের মিঃ আজিজুল হকের নেতৃত্বে দুই-ভাগে বিভক্ত হইয়া যায় তখন অসীতিপর বৃদ্ধ রাজনীতিবিদ তাঁহার ভাগিনেয়কে সমর্থন করিয়াছিলেন প্রথমতঃ ইহার প্রতিশোধ গ্রহণ এবং স্থিতীয়তঃ নির্বাচনকালে প্রাক্তন গভর্ণর-দ্বারা কৃষক শ্রমিকদলের অনুকূলে প্রচারকার্য চালান। শাসন ক্ষমতা লাভের জন্য দলে যোগদান করিয়া দলের অথবা সম্মিলিত বিরোধী শক্তির পরিচালনার জন্য কৃষক শ্রমিক পার্টির পক্ষ হইতে যে আবেদন করা হইয়াছিল তাহা মিঃ ফজলুল হক দৃঢ়ভাবে প্রতিরোধ করিতেছিলেন।

মর্মস্পর্শী দৃশ্য

বাংলার রাজনীতির সহিত যাঁহার পঞ্চাশ বৎসর কাল ধরিয়া সক্রিয় যোগাযোগ সেই প্রবীণতম রাজনীতিবিদ যখন উপলব্ধি করিতে পারিলেন যে শেষ পর্যন্ত তিনি পরাজিত হইয়াছেন, তাহা বস্তুতপক্ষে এক মর্মস্পর্শী দৃশ্য। তাঁহার মিলিটারী সেক্রেটারী আসিয়া জনব তাঁহাকে সংবাদ দিলেন যে, করাচী হইতে তাঁহার অপসারনের নির্দেশ আসিয়াছে, তখন সংবাদের পূর্ণ অর্থ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া তিনি হতবাক্ হইয়া বসিয়া পড়েন। আস্তে আস্তে তাঁহার সম্বিৎ ফিরিয়া আসিলে তিনি অপ্রত্যাশিত বলিতে থাকেন—এতব্যথা কি সবকিছু শেষ হইয়াছে বুঝাইতেছে; আমার কি বিদায় গ্রহণ করিতে হইবে; আমি কি এখানে আর থাকিতে পারিবনা, এখনই কি আমার চলিয়া যাইতে হইবে?" আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে মিঃ ফজলুল হক বিরোধী দলের নেতৃত্ব করিবেন কিনা তাহা এখনও অনিশ্চিত। তিনি সহজে ভূমিত্যাগ লোক নহেন, বিশেষতঃ রাজনীতি-ক্ষেত্রে তিনি অধিকতর পারদর্শী। কৃষক শ্রমিক দলের বিরোধকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া তাহার ভাগিনেয়ের উপরে তিনি নেতৃত্ব করিবেন অথবা রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে যোগদানে বিরত থাকিবেন এই প্রশ্নের উত্তর একমাত্র ভবিষ্যতেই পাওয়া যাইবে। তবে একথা উল্লেখ করা যথেষ্ট হইবে যে, আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপনের জন্য কৃষক শ্রমিক দলের উদ্যোগে আহূত ঢাকার জনসভায় যোগদানের আমন্ত্রণ তিনি গ্রহণ করেন নাই কিন্তু কি কারণে? সভার প্রধান বক্তা ছিলেন মিঃ হামিদুল হক চৌধুরী ইহাই কি কারণ অথবা পাক স্বাধীনতা যুগের উপ-মহাদেশের অন্যতম বিশিষ্ট রাজনীতিবিদের দীর্ঘ ও ঘটনা-বহুল রাজনৈতিক জীবনের ইহা অবসান?

ষ্টীম বাস ভাড়া বৃদ্ধির প্রস্তাবে
সরকার ও ট্রাম কোম্পানীর
স্বার্থের গাঁটছাড়া বাঁধা

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

অতি সন্তর্পণে সুপরিক-বহুবার যে সব ব্যক্তির অবপিত পন্থায়, একের পর আর, তারণা করেছেন, ভাড়াবৃদ্ধির শোষণের শিকারকে তিলে অনুকূলে সে-কমিশনের তিলে আয়ত্তে আনার তরকে এ রকম অনেক বক্তানীতিই অনুসৃত হয়ে চলেছেন। পচা যুক্তি দেখান হয়েছে। সরকার বুঝতে দিতে চান না ভারতের অন্যান্য সহরে কলঅথবা বোঝাতে চান, এতো বৎ-কাতার চেয়ে ভাড়া অনেক বেশী সামান্য এতে এমন কি আসে—এরকম যুক্তি শুনে মনে হয়, যায়; কিন্তু সাধারণ মানুষে ভার রায়ের কাছ থেকে তাদের শুনেপ্রার পকেটে হাত dictation নেওয়া হয়েছে। পড়ছেই চমকে ওঠে। দ্রব্যমূল্য কমিশন অন্যান্য সহরের সঙ্গে বৃদ্ধির ও ক্রয়ক্ষমতা হ্রাসের কলকাতার সহরের বিচার করা-ফলে তাদের পারিবারিক অর্থ- বার সময় একটোখে বিচার নীতির ভগ্নপ্রায় দশা। এই করেছেন। কলকাতার মানুষ যখন অবস্থা তখন ষ্টীম-বাস কি ভাবে (বাদুড় ঝোলা হয়ে, ভাড়া বৃদ্ধির সুপারিশকে তারা অনেক সময় নিজেদের জীবন কোন চোখে দেখবে এটা সহ- বিপন্ন করে) ষ্টামে বাসে যাতাজেই অনুমান করা যায়।

কিছুদিন আগে যোগা- রাত করে সে কথাও তাঁদের যোগ মন্ত্রী হিসেবে শ্রী লাল- ভেবে দেখা উচিত ছিল। গমনা-বাহাদুর শাস্ত্রী ডাক টিকেট ও গমনের সুবিধার জন্য কমি-মাশুলে বৃদ্ধির আভাষ জানিয়ে শনের পক্ষ থেকে কয়েকটি ছিলেন যে Parting Kick-টা দিয়ে নতুন পরিকল্পনা দেওয়া গেলেন সেটাও এই প্রসঙ্গে হয়েছে। এগুলো গৃহীত হলে উল্লেখযোগ্য।

কিন্তু সরকারের বোঝা সাঁতাই জনাকীর্ণ নগরীর পথে উচিত ছিল, তিলে তিলে শোষণ চলাচলের অনেক সুবিধা হবে। অথবা সমস্যার্থান্বেষীদের এবং এই উন্নততর সুযোগ-সুবিধা লাভের পরিবর্তে রোগ কবি জনসাধারণের বর্ধিত হারে একটা সময় ও সীমা আছে। ভাড়া দিতে খুব একটা আপত্তি বেকারী ও মূল্য বৃদ্ধিজনিত থাকবে না। কিন্তু সে সব পরিস্থিতিতে নাগরিক জীবন সুযোগ সুবিধা প্রবর্তিত না নির্বাহে সামান্যতম ব্যয় বৃদ্ধির হতেই ভাড়া বৃদ্ধির প্রস্তাব পক্ষেও বর্তমান সময় মোটেই তারা মানবে কি?

অনুকূল নয়। এবং এই অব-স্থায় এই ধরণের ভাড়া বৃদ্ধির প্রস্তাবে নাগরিক জীবনে প্রতি-কূল পরিবেশ গঠনে প্ররোচনা জোগান হচ্ছে এতে সন্দেহ নেই।

১৯৫৪ সালে জনসাধারণের প্রবল প্রতিরোধের মুখে ষ্টামের ভাড়া বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রত্যাহৃত হবার পর সরকার ও কোম্পানি বুঝেছিল যে সরাসরি ভাড়া বৃদ্ধির যে কোন চেষ্টা কার্য-করি করা সম্ভব হবে না। এ কথা আজ প্রকাশ্য নেই যে বার-সায়িক স্বার্থের ব্যাপারে ষ্টাম কোম্পানীর সঙ্গে সরকারী পরিবহন বিভাগের গাঁটছড়া বাঁধা রয়েছে। তাঁরা বাঁকা পথ ধরলেন। তাই সরকার কমিশন বসালেন এবং ভাড়াবৃদ্ধির আনা ও Understanding নিয়েই ঐ কমিশন বসেছিল। ১৭ই বিধান সভায় ডাঃ রায় মহাশয়ে

শুভমুক্তি ঃ ১১ই এপ্রিল
মুধীরবন্ধু প্রযোজিত
বৃন্দাবন লীলা
এক বিরাট সঙ্গীত বহুল
ধর্ম্মমূলক চিত্র
বসুশ্রী ০ বীণা ০ অঞ্জন ০ সুরশ্রী ও অন্যত্র

ছাত্র শাসনতন্ত্র

"প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রদের সহিত কোন কোন ইউরোপীয় অধ্যাপকের যে বিরোধ ঘটিয়াছে, তাহা লইয়া কোন কথা বলিতে সংকোচ বোধ করি। তার একটা কারণ ব্যাপারটা দেখিতেও ভালো হয় নাই, শুনিতেও ভালো নয়।

...."বিকৃতি ভিতরে জমিতে থাকিলে এক দিন সে আর আপনাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না। লাল হইয়া সেবকদের ফাটিয়া পড়ে। তখনকার মতো সেটা সুদৃশ্য নয়।

....."ইতিমধ্যেই ছাত্রদের সম্বন্ধে শাসন কড়া করিবার জন্য কোনো মিশনারী কলেজের কর্তা কর্তৃপক্ষের নিকট আবদার প্রকাশ করিয়াছেন। কথাটা শুনিতেও হঠাৎ সঙ্গত বোধ হয়। কারণ, ছাত্রেরা অন্যায়করের অসম্মান করিলে সেটা যে কেবল অপরাধ হয় তাহা নহে, সেটা অস্বাভাবিক হইয়া উঠে। যেখান হইতে আমরা জ্ঞান পাই সেখানে আমাদের শ্রদ্ধা থাকে, এটা মানব প্রকৃতির ধর্ম। তাহার উল্টা দেখিলে বাহিরের শাসনে এই বিকৃতির প্রতিকার করিতে হইবে, সেকথা সকলেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু প্রতিকারের প্রণালী স্থির করিবার পূর্বে ভাবিয়া দেখা চাই, অভ্যাস ওল্টায় কিসে।

"কাজল দেখিতে পাই, অনেকে এই বলিয়া আক্ষেপ করিতেছেন যে, যে ভারতবর্ষে গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ ধর্ম-সম্বন্ধ সেখানে এজনকারে ঘটনা বিশেষভাবে লক্ষিত। সুতরাং লক্ষিত একথা বলিয়া পার পাইব না, চিরকালীন এই সংস্কার অশ্রদ্ধেয়তার জন্যে থাকা সত্ত্বেও ব্যবহারে তাহার সহিত ঘটিতেছে কেন এর একটা সত্য উত্তর বাহির করিতে হইবে।

"অংগ্রেসদের ছাত্রদের মনস্তত্ত্ব যে বিধাতার একটি আশ্চর্য্য খেয়াল একথা মানি না। ছেলেরা যে বয়সে কলেজে পড়ে সেটা জীবনের কাল।.....এই বয়সসন্ধির কালে মাঝে মাঝে এক একটা হাংগামা বাধাইয়া বসে।..... ছেলেধরার কর্মোদ্ধ নিয়মের নড়চড় করিলে তাকে কড়া শাসন করিবার কারণ যদি না, কেননা তাকে অপরাধী বলিয়াই দেখা হয়, মানুষ বলিয়া নয়।.....কিন্তু ছাত্রকে ছেলের করেদি বা কোজের সিপাই বলিয়া আমরা তো দলে ভর্তি করিতে পারি না। আমরা জানি তাহাদিগকে মানুষ করিয়া তুলিতে হইবে। মানুষের প্রকৃতি সূক্ষ্ম এবং সজীব তন্তুজালে বড়ো বিচিত্র করিয়া গড়া। এইজন্যই মানুষের আত্মা বাহিরে আঘাত মাত্রের দাগিয়া সেটা সারানো যায় না। অন্তরবাহিক বাঁধাইয়া প্রকৃতির সাহায্য সাধনা করিয়া তার চিকিৎসা করিতে হয়।.....ওষাটির মতো ব্যাধির ভূতকে আরিয়া ঝাড়িয়া, গরম লোহার ছাকা দিয়া, চীৎকার করিয়া তাড়াইতে চায়। তাহাতে ব্যাধি যায়। এবং প্রাণ পদার্থের প্রায় পনেরো আনা তার অনুসরণ করে। এ এইরূপ আনা-ড়ির চিকিৎসা। যারা বিচক্ষণ তারা ব্যাধিটাকেই স্বতন্ত্র করিয়া দেখে না, চিকিৎসার সময় তারা মানুষের সমস্ত হাতটাকে অগ্রাহ্য করিয়া দেখে। মানব প্রকৃতির জটিলতাকেও সম্পূর্ণভাবে তারা মানিয়া লয় এবং বিশেষ কোনো ব্যাধিকে শাসন করিতে গিয়া সমস্ত মানুষকে নিকাশ করিয়া বসে না।"

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ছাত্রদের উচ্ছৃঙ্খলতা ঃ

এই বেদনাদায়ক ব্যাধির প্রতিকার কোন পথে সমাজ ও রাষ্ট্র কর্ত্তাগণ সে কথা চিন্তা করেন কি?

(দর্পণের পর্যালোচক)

স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা নিয়ে কলকাতায় যে কেলেঙ্কারী ঘটে গেল, সেটা যে আমাদের সমাজ জীবনে দুঃখ কতেরই অন্যতম বহিঃপ্রকাশ তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। এ ধরণের ঘটনা "বাঙ্গলদেশ চাপলা" নয়। আকস্মিক অথবা বিচ্ছিন্নও নয়।

যুদ্ধোত্তর এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা পরবর্তী সমাজ জীবনে উত্তরোত্তর অর্থনৈতিক দুরবস্থার পটভূমিকায় যে অনিয়ম, যে বিশৃঙ্খলা, যে অসাহিষ্ণুতা এবং সাংবেদনাহীন মনোবৃত্তি প্রসন্ন স্পেসে সহজে লালিত হচ্ছে, এ হচ্ছে সেই ধুমায়িত অসন্তোষের স্ফুলিঙ্গ প্রক্ষেপ মাত্র।

"দর্বতো বহ্যিমান ধুমাৎ" এই বাক্যটি স্মরণে রেখে তবে এই ব্যাপারে পর্যালোচনা করা দরকার। আমি বলি, আজ যাঁরা ছাত্রদের এই উশৃঙ্খল চেহারা দেখে আঁতকে উঠছেন, তাঁরা যেন দর্পণে নিজেদের অবয়বটি মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করেন। দেখবেন সমাজ জীবনের বিকৃতির একটি সম্পূর্ণ ছায়াই তাতে প্রতিফলিত হচ্ছে। ছাত্রদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে দুশ্চিন্তা সূত্রে করার আগে আমি তাঁদের বলব, "নিজের নিজের ঘর সামলান।"

"ছাত্রা একেবারেই উচ্ছন্ন গেছে" প্রভৃতি যে ধরণের আক্ষেপোক্তি আজকাল বিত্ত মহলে হামেশাই শোনা যায়, একে আমি নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় বলে গণ্য করি। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, যৌবন বেগবান নদী প্রবাহের মত। এতে অনেক কিছু জঞ্জাল, আবর্জনা ভেসে আসে বটে; কিন্তু স্রোত-বেগে সে আবর্জনা কূটার মত ভেসে যায়, স্থায়িত্ব লাভ করতে পারে না। যৌবনের যদি এই বিশেষ গুণটি না থাকত, তাহলে এতদিনে পৃথিবী আবশ্য জলা-ভূমিতে পরিণত হত এবং মানব সভ্যতার জয়যাত্রার সমাপ্তি ঘটত। এই জন্যই কবিগুরু তাঁর অনেক কবিতা এবং নাটকে যৌবনের জয়গান গেয়েছেন। একে "পদ্ম-পত্রের জল" বলে অভিহিত করে যুব সমাজকে "লক্ষ্মী ছাড়ার দল" নাম দিয়ে পরম স্নেহে সিঞ্চিত করেছেন।

দায়ী কে?

একথা মেনে নিতেই হবে যে, প্রধানতঃ ভাবাবেগপ্রবণ যুবে সমাজকে কলঙ্কের রাহু গ্রাস করার চেষ্টা করলেও অবিলম্বে সে গ্রাস থেকে বেরিয়ে আসার উপায়ও তাদেরই হাতে আছে। সুতরাং শুধু দন্ড দানের বস্তা-পচা রক্ষণশীল যুক্তির অবতারণা না করে আজ-কালকার যুবে সমাজ কি করে কলঙ্ক লেপন থেকে মুক্তি পেতে পারে সে কথা আলোচনা করা প্রয়োজন। দোষটা শুধু ছাত্র সমাজেরই নয়, অভিভাবকদেরও অনেকটা এবং বহুতর পটভূমিকার বিচার করলে আধুনিক সমাজ জীবনও এ জন্য দায়ী।

একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের জীবন যাত্রার নমুনা নেওয়া যাক। স্কুল-কলেজে যারা পড়ে তাদের বেশীরভাগই এই "না ঘরকা না ঘাটকা" মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ভুক্ত। এ সম্প্রদায়ের চাহিদা অনেক। কিন্তু এই চাহিদা পূরণের সামর্থ শূন্যে ভিত্তিতে এসে ঠেকেছে। তাই অদৃষ্ট নিয়ে এরা কেবলই জুয়া খেলে চলেছে। হারবে জানে, তাতেও বিরাম নেই। কারণ বিরাম মানেই একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া, এ জন্য একটুখানি বুদ্ধি-বনের আস্ফেপও লক্ষিত হবে না।

পড়াবার সামর্থ না থাকলেও নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙ্গালী পরিবারের ঘরে অধিকাংশ ছেলে-মেয়েই স্কুল-কলেজে পড়ে। অবশ্য বিদ্যাবত্তার যে খ্যাতি বাংগালীকে একটা স্বাতন্ত্র্যের মহিমায় উজ্জ্বল করেছে তারই জের টেনে নিয়ে লেখা-পড়ার চর্চা। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, এই চর্চার মূলে প্রাণটারই একান্ত অভাব, শুধু কঙ্কালটা নিয়েই টানা-হাঁচড়া চলেছে। ছেলে লেখাপড়া শিখে বিদ্বান হবে, দশজনের মধ্যে একজন হবে— বিদ্যেটা যেন ভোল পাল্টে পড়ে, এ স্বপ্ন প্রত্যেক অভিভাবকই দেখে থাকেন। স্বপ্ন দেখতে অবশ্য দোষ নেই, কিন্তু স্বপ্ন যে এইরকম আস্পৃশ্য পরিবেশে মানুষ হয় তবে এদের নিয়ে যে সুখের সমৃদ্ধ দেশ গড়ে তোলার স্বপ্ন ধুলোয় লুণ্ঠিত হবে না কি?

ছাত্রসমাজের ব্যাধির কারণ নির্ণয়ের জন্যে বিস্তারিত তদন্ত-সন্ধান ও ব্যাধির চিকিৎসার কর্তা যাঁরা এখনও কি তাঁরা ঘুমোবার ওষুধ খেয়েছেন?

মধ্যবিত্ত পরিবারে অনুকূল পরিবেশের একান্ত অভাব।

জানি অনেক অভিভাবক প্রতিবাদ করে বলবেন, এ আপনার নিতান্ত গায়ের জোরের কথা। "কেন, বাড়ীতে ৫০ টাকা খরচ করে টিউটর দেখে নিয়েছি, ধার-দেনা করে বইপত্তর কিনে দিয়েছি, না খেয়ে নিয়মিত স্কুলের মাইনে যোগাচ্ছি, পরীক্ষার ফীস দিচ্ছি— আর কি চাই? এতেও যদি না হয় তাহলে তো আর পারা যায় না বাপু।" আমি উত্তরে বলব—"এই যাহা আগে কহ আর।" এ হল গোড়া কেটে আগায় জল ঢালা। এতে আন্তসন্তুষ্টি হতে পারে, কিন্তু ঘাস শুকিয়ে যাওয়া কেউ আটকাতে পারবে না।

অনুকূল পরিবেশের কথা তুলেছি। আজকাল বেশীরভাগ মধ্যবিত্ত পরিবারে অভিভাবকদের মধ্যে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা এবং এর পরিচালক শিক্ষকদের সম্পর্কে যে একান্ত অশ্রদ্ধা ও ঘৃণার ভাব লক্ষ্য করা যায় তাতে এই পরি-বেশের গোড়ায় কোপ দেওয়া হয়। অভিভাবকরা কি চিন্তা করেন, কি বলেন, কি আচরণ করেন, তা অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেমেয়েরা সতর্ক-ভাবে লক্ষ্য করে এবং অধ্যবসায়ে অনুকরণ করে। বিদ্যালয় ও শিক্ষক সম্পর্কে অভিভাবকদের শ্রদ্ধাহীন উক্তি কিশোর মনের গভীরে দাগ কেটে বসে যায়। এর পর তারা যদি স্কুল এবং পরীক্ষা গৃহে যে কোন কারণে হোক একটা কান্ড করে বসে, তবে দোষের ভাগ একমাত্র তাদেরই প্রাপ্য নয়, অভি-ভাবকদেরও।

কাণ্ডজ্ঞানহীন অভিভাবক

ছেলেমেয়ে যদি স্কুল-কলেজের পরীক্ষায় ফেল করল, তবে অভিভাবকরা তাদের সামনেই কোন আত্মু না রেখেই শিক্ষক ও অধ্যা-পকদের চতুর্দশ পুরুষকে নরকস্থ করবেন। অনেক অভি-ভাবক আবার প্রধান শিক্ষক অথবা অধ্যক্ষের কাছে ছুটবেন অনুনয়-বিনয় করে ছেলে কিম্বা মেয়েকে "প্রমোশন" দেওয়ার জন্য। অবেদন নিবেদনে কাজ না হলে চুক্ষু হুমকি— এমন অনেক স্কুল কলেজ ঢের দেখেছি মশায়! ছেলেকে অন্য স্কুলে পড়াব, এখনে আর না" আমি বলি, ভদ্রমহোদয় অধধান করুন। জল অনেক দূরে গড়িয়েছে। ভাল চান তো এখনও নিবৃত্ত হোন।"

শিক্ষা ব্যবস্থায় রেজিমেন্টেশন!

তারপর প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা। এ সম্বন্ধে যত কম বলা যায় ততই ভাল। এক কথায় বলা যায় যে শিক্ষা ক্ষেত্রে এক চরম অরাজকতা চলেছে। ইংরাজদের তৈরী করা কাঠামো বড়মান প্রয়োজন মিটাতে পারে না। এর স্থলে কি পদ্ধতি আসবে তা নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার আর অন্ত নেই। পর পর করেকটি কমিশন বসেছে। "এত হয় ও-ও, হয় জগাখিচুড়ী করেক ধরণের সুপা-রিশ নিয়ে শিক্ষা জগতে তোল-পাড় চলেছে। কেন্দ্রীয় সরকার তিন বছরের- ডিগ্রী কোর্স আর ১১ (তৃতীয় পৃষ্ঠার দ্রষ্টব্য)

উচ্ছৃঙ্খল ছাত্র

(দর্পণের ভাষ্যকার)

এক ধরণের উচ্ছৃঙ্খলতা (যাকে পক্ষে বঙ্গেন্ট। নেয়ে পরীক্ষার্থী-গুন্ডামি বলা যেতে পারে) সংক্রা- রাও তাদের আক্রমণ থেকে রক্ষা মক ব্যাধির মত ছাত্র ও তরুণদের পাচ্ছ নি। পরীক্ষার্থীদের খাতা মধ্যে সন্ত্রাসিত হয়ে সমাজজীবনের ছিনিয়ে তা বলপূর্বক- ছিঁড়ে যে অনিষ্ট সাধন করছে তা রীতি- ফেলা হয়। বেঞ্চি, চেয়ার, মত আসবপত্র ও ভদ্রের কারণ হয়ে আসবাবপত্র, দরজা ও কাঁচের দাঁড়িয়েছে। জানালা ভেঙ্গে চুরে তছনছ করা

মাত্র একদিনের তকাতে কলি- হয়। এমন কি একটি পরীক্ষা-কাতায় ও দক্ষিনভারতের চিনা- কেন্দ্রে বোমাও ফাটান হয়।

স্বরমে আয়ামালাই বিশ্ববিদ্যালয়ের পুলিশে খবর দেওয়া হয় ছাত্রদের সম্বন্ধেও গুন্ডামি এই অনেক কেন্দ্র থেকেই ঘটনা সূত্রে উচ্ছৃঙ্খলতারই অ ভি ব্য ক্তি। হবার সংগে সংগেই; কিন্তু সমস্ত গুন্ডামির কারণ দুই স্থানে পৃথক মত কোন জায়গাতেই পুলিশ হলেও ধরণ দুরাছ। একরকম। হাজির হতে পারে নি। সুতরাং

কলিকাতায় ভিত্তরি দিনে গুন্ডামির প্রবাহ দারুণ বেগে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার ইতি- অব্যাহততাবে একের পর আর হাসের প্রশ্নপত্র কঠিন হয়েছে এই একটি কেন্দ্রে ছড়িয়ে পড়ে। অজুহাতে কিছু সংখ্যক দুস্কর্ম আয়ামালাই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃতির ছাত্র একদল দুষ্কর্তের ঘটনাবলীও কম বিচিত্র নয়। ঐ সিন্ডিকেটের অন্তত্তপক্ষে ২৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের এক পরীক্ষাকেন্দ্রে ঢুকে যে জঘন্য অনুষ্ঠানে ছাত্রদের ঢুকতে না দিলে কাণ্ডকারখানা চালায়, তা যে-কেন তারা লজ্জা ভেঙ্গে ভেংরে ফেলে নিশ্চিন্ত ও নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে সভ্যদেশের মাথা নত করে দেওয়ার এবং এমন হাংগামার সৃষ্টি করে থাকেন?

যে অনুষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায় এবং ছাত্রীদের মানসম্ভ্রম বাঁচানো দায় হয়ে পড়ে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃ-পক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্যে বিশ্ব-বিদ্যালয় বন্ধ করে দেন। পরদিন প্রায় ৩০৫ ছাত্র ভাইসচান্সেলারের বাসভবন ঘেরাও করে এবং ইন্ট পাথর ছুড়তে থাকে। অবশেষে পুলিশ লাঠি চালিয়ে তাদের ছত্র-ভংগ করে।

এভাবে উচ্ছৃঙ্খলতা যদি চলতে থাকে তবে তা দেশ ও জাতির পক্ষে অত্যন্ত আশংকার কথা। জাতির ভবিষ্যৎ যারা নিয়ন্ত্রণ করবে তারা যদি আজ এইরকম আস্পৃশ্য পরিবেশে মানুষ হয় তবে এদের নিয়ে সুখের সমৃদ্ধ দেশ গড়ে তোলার স্বপ্ন

সম্পাদক—শ্রীব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য

সম্পাদক কর্তৃক মডার্ণ ইন্ডিয়া প্রেস, ৭নং ওয়েলিংটন স্কোয়ার, কলিকাতা—১৩ হইতে মুদ্রিত এবং ৭নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা—১৩, দর্পণ কার্যালয় হইতে প্রকাশিত।

Regd : No.C 4079

১বর্ষ, ১২শ সংখ্যা

সাপ্তাহিক সংবাদে সামরিকী ঃকলিকাতা-১৮ই এপ্রিল শুক্রবার ১৯৫৮ ঃ মূল্য ২৫ নঃ পঃ

কংগ্রেস কাদের টাকায় চলে ?

কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান বড় বড় শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের কৃষ্ণিগত, অন্ততঃ তাঁদেরই অভিমত কংগ্রেসী দরবারে প্রাধান্য লাভ করে, এই অভিযোগ সম্প্রতি পথে-ঘাটে হামেসাই শোনা যায়। তথাকথিত বামপন্থীরা ত প্রায়ই আইন-সভায় কংগ্রেসী সরকারকে এ বলে নিন্দা করে থাকেন।...

বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি যখন কোম্পানী আইনবলে হাইকোর্টের অনুমতি নিয়ে কংগ্রেসের নির্বাচনী তহবিলে মোটা টাকা দান করেন, তখন এই অভিযোগ একেবারে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। প্রাক-স্বাধীনতা যুগেও কংগ্রেসের প্রয়োজনীয় অর্থ যোগাতেন বড় বড় শিল্পপতিরা।

কিরূপে কংগ্রেস ধনিক ও হয়েছে এজন্য যে, বাংলার বণিক সম্প্রদায়ের হাতের মুঠোয় কংগ্রেসের এই গুরুত্বের বিষয়টি মধ্যে এসে পড়ে, তার একটু ধীরভাবে বিবেচনা করবার সময় আলোচনা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এসেছে।

সম্পাদকীয়

একচক্ষু বিভীষিকা

নিউ স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকার বিখ্যাত সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিংসলি মার্টিন ভারতবর্ষে পণ্ডিত নেহরুর নেতৃত্ব সম্বন্ধে যে প্রশ্নগুলি উত্থাপন করেছেন, যদিও সেগুলি সম্পূর্ণ এক প্রকৃতির নয়, তবু মূলতঃ একই সমস্যা বাংলাদেশে বিধানচন্দ্র রায় সম্পর্কেও রয়েছে। বামপন্থী হওয়া সত্ত্বেও নেহরু স্বাধীনতার পর কংগ্রেস পরিত্যাগ করতে পারেন নি। সে কি অকৈশোর রোমান্স মিশ্রিত দীর্ঘ স্মৃতি, সৌন্দর্যসেন্টাল মমতা, পথখা নব আন্দোলিত ক্ষমতার মোহে? কিংসলী মার্টিন প্রথম দুইটি কারণ উল্লেখ করেছেন, তৃতীয়টি করেন নি। ভারতবর্ষের সমাজতন্ত্রবাদীরা একথা স্বীকার করবেন যে, তৃতীয় দুর্বলতার দরুনই আমীর ও উমেদারদের কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী নেহরুকে করায়ত্ত রাখতে পেরেছিল।

ডাঃ রায় স্বয়ং আমীর ও উমেদারদের লোক। তিনি বহুৎ পুঁজিপতি শ্রেণীর অংশীদার এবং কোনো দিন সমাজতন্ত্রের স্বপ্ন তিনি দেখেন নি। তথাপি ডাঃ রায় সম্বন্ধেও এই ধরণের প্রশ্নের অবকাশ আছে এইজন্য যে, বাংলাদেশে অতিদক্ষিণপন্থী কংগ্রেসের মধ্যে মধ্যদক্ষিণপন্থী বিধানচন্দ্র রায়কেও লিবারেল বা উদারপন্থী নেতা বলে গণ্য করা যায়। বাংলা কংগ্রেসের দলপতি অতুলা ঘোষ যে রক্ষণশীলতার প্রতীক, যে শ্রেণীর ছিঃকে ব্যবসায়ী এবং ফ্যাসিস্ট —মনোবৃত্তিসম্পন্ন যে-গোষ্ঠীর তিনি নেতা; সেই গোষ্ঠী কংগ্রেসের মধ্যেই অতিদক্ষিণপন্থী। বিধানচন্দ্র রায় ক্ষমতার মোহে এই অতিদক্ষিণপন্থীদেরই ক্রীড়নক হয়েছেন। নতুবা তাঁর মস্তিষ্কতা থেকে সিদ্ধার্থ রায়ের পদত্যাগ প্রয়োজন হত না, ক্রমে ক্রমে কংগ্রেস পার্লামেন্টারী পার্টির ভিতরে অশিক্ষিত, দালাল ও গোঁড়া রক্ষণশীল ব্যক্তির সংখ্যাধিক্য অর্জন করত না।

নেহরু যেদিন অবসর গ্রহণ করবেন, ভারতবর্ষে দুইটি মাত্র বিকল্প শক্তি থাকবে—দক্ষিণপন্থী কংগ্রেস এবং চূড়ান্ত বামপন্থী কম্যুনিস্ট। (কেননা, নেহরুর যে সবচেয়ে বড় শক্তির ভিত্তি, ভারতবর্ষে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রী একটি শক্তি গঠন করা,

অন্যতর মোহে
বিলোপের] এদিকে, [illegible]
[illegible]
বিধানের চেয়েও তীব্র বিলাস আরও

বাংলাদেশের চাকুরী ক্ষেত্রে বাঙ্গালীরই কোন ঠাঁই নাই ঃ অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানে এম্‌প্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের সাহায্য উপেক্ষা

(নিজস্ব অর্থনৈতিক ভাষ্যকার)

পশ্চিমবঙ্গের নানা স্থানে এম্‌প্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ থাকা সত্ত্বেও সাম্প্রতিক কতিপয় প্রতিষ্ঠানই এর সাহায্য গ্রহণ করে থাকে। অনাতম প্রধান কর্মদাতা রেলওয়ে বোর্ড সরকারী সংস্থা হয়েও এম্‌প্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে থাকে।

আবার কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান এক্সচেঞ্জের সুবিধা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে অবাঙ্গালী শ্রমিক এবং শ্রমিক নেতৃত্বের তরফ থেকে তীব্র প্রতিবাদ তোলা হয় এবং দৃষ্টান্ত আছে যে, এই প্রতিবাদের ফলে প্রতিষ্ঠান তার সিদ্ধান্ত কার্যকরী করতে অসমর্থ হয়েছেন।

কিছুদিন আগে বাংলার বেকার সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। সেখানে দেখানো হয়েছিল বাংলাদেশে বাঙ্গালীর চাকরী নেই অথচ বাইরে থেকে লোক এসে নিয়তই নতুন নতুন চাকরীতে যোগ দিচ্ছে। প্রতিষ্ঠানগুলো বেশীরভাগই অবাঙ্গালীদের হাতে কিনা।

নিশ্চিত এবং নিকটতর) তখনও দুটি মাত্র বিকল্প শক্তি থাকবে—অতিদক্ষিণপন্থী (প্রায় ফ্যাসিস্ট পর্যায়ের) কংগ্রেস এবং চূড়ান্ত বামপন্থী কম্যুনিস্ট। নেহরু যে-কংগ্রেসকে ভারতের অনন্য উত্তরাধিকার দিয়ে যাবেন, সেই কংগ্রেস দক্ষিণপন্থী হলেও অতিদক্ষিণপন্থী নয়—পার্লামেন্টারী ঐতিহ্যকে তারা হয়ত বিপর্যস্ত করবে না। কিন্তু বিধানচন্দ্র রায় বাংলাদেশের গভর্নমেণ্ট যে-কংগ্রেসকে উপহার দিয়ে যাবেন, তারা পার্লামেন্টারী ঐতিহ্যেও বিশ্বাস করে না, তারা গণতন্ত্রেও নয় এবং ফ্যাসিস্টদের সঙ্গে তাদের পার্থক্যও সামান্য। প্রকৃতপক্ষে, বাংলাদেশের অতি-সচেতন রাজনীতিক জনমণ্ডলীকে জার্মানীর ১৯২৮—৩০ সালের অবস্থায় এনে দাঁড় করানো হয়েছে এবং অস্ত্রচিকিৎসকে ডাঃ রায় এই সর্বনাশের দরজা উন্মুক্ত করে দিয়ে যাচ্ছেন। এবং তাঁর বিদায়ের পর অশিক্ষিত, উগ্রদক্ষিণ ফ্যাসিস্ট মূর্তি যদি দেখা দেয়, সেই এক

বিভীষিকা কাহার
ঘোর অন্ধকার ও রক্ত-
সন্ধ্যা নিয়ে আসবে। হয়ত
দুর্ভাগ্যেরই দিন

এর একটা সুরাহা হতে পারে যদি এম্‌প্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের মারফৎ চাকুরীর বন্দোবস্ত করা যায়। কিন্তু তা সম্ভব হচ্ছে না। এর

(দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়)

জন্য প্রধান দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের। উদাহরণ স্বরূপে এখানে দুটি ঘটনার উল্লেখ করছি ঃ

(১) স্থান বলপুর। ঘটনা তিন মাস আগের। খলপুর রেল কারখানায় এক হাজার খালাসী নিয়োগ করা হবে। নোটিশ পাওয়া মাত্র 'রবি গেল সেই বার্তা দেশ দেশান্তরে'। টেলিগ্রাম, চিঠি ও লোক মারফৎ খবর পেয়ে দক্ষিণ, পশ্চিম ও মধ্য ভারত হতে দলে দলে লোক চলে এল।

আবেদনপত্র গ্রহণের যে বাক্স নির্দিষ্ট ছিল, প্রথম দিনে সে বাক্সের চারি ধারে অবাঙ্গালীদের বাহু ভেদ করে বাঙ্গালীরা একটি আবেদনপত্রও দিতে পারল না। ফলে সোলমাল ও শান্তি ভঙ্গের

(দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়)

দৃষ্টান্তের সাহায্যে আলোচনা করলে বিষয়টি সহজে বোঝা যাবে। তাই সূচনাতেই কয়েকটি দৃষ্টান্তের অবতারণা করা হল।

জন্মতিথির উপহার

প্রতি বৎসর জুলাই মাসে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের জন্মতিথি উৎসবে পশ্চিম বাংলার কংগ্রেস ঘটা করে থাকেন। চাঁদের কলা যেমন দিনে দিনে বেড়ে যায়, সেরূপে প্রতি বৎসরই শ্রীঅতুল্য ঘোষ ঐ উপলক্ষ্যে ডাঃ রায়কে যে টাকার তোড়া উপহার দেন তা এক হাজার তঙ্কা করে বেড়ে যাচ্ছে। গত বৎসর ৭০ হাজার কি ৭১ হাজার টাকা উপহার দেওয়া হয়েছিল তা এখন ঠিক মনে পড়ছে না। এই টাকা প্রতি বৎসরই ডাঃ রায় শ্রীঘোষকে ফেরৎ দেন কংগ্রেসের কাজে লাগানোর জন্যে।

কিভাবে এই টাকা বায় হয়, তার একটা হিসাব জনসাধারণের নিকট উপস্থিত করার দায়িত্ব শ্রীঘোষের আছে কিনা সে প্রশ্ন আজ তুলব না। কিভাবে ক্রমবর্ধমান টাকাটা শ্রীঘোষ সংগ্রহ করেন তাই বিবেচ্য। সাত-আট বৎসর হয়ে গেল পশ্চিম বাংলার কংগ্রেসী নেতৃত্বের এই পরস্পরের পিঠ চাপড়ান ব্যাপার। কাজেই এ কথা এখন কারো অজানা নেই কোথা হতে টাকাটা আসে ও কি সর্তাদিতে তা সংগ্রহ হয়ে থাকে। শ্রীঘোষ মহাশয় কলিকাতার প্রত্যেক বণিক সভার (চেম্বার অফ কমার্স) জন্মতিথির জন্য টাকার

(দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়)

খেলার জগতে অখেলোয়াড়ি ছাত্রদের নোংরামি ঃ এবারের কলেজীয় হকিখেলায় ছাত্রদের উচ্ছৃঙ্খলতা পাকা গুণ্ডাদেরও হার মানিয়েছে

(দর্পণের সংবাদদাতা)

কলকাতার কলেজীয় স্পোর্টস সাধারণতঃ অসদাচরণ গুণ্ডামী ও রাজনীতির ঝুংসব আবহাওয়া থেকে মুক্ত। কলেজীয় স্পোর্টসের এই বৈশিষ্ট্যের জন্যেই কলকাতার ক্রীড়ামোদের অন্যান্য পরিবেশে দীর্ঘকাল খেলাধুলোর রিপোর্ট করে যাঁদের হৃদয় কঠোর হয়ে গেছে এমন কি তাঁরাও কলেজীয় স্পোর্টসের রিপোর্ট করতে গিয়ে এখনও কিছুটা আশ্বাদ পান।

এই বছর কলেজীয় হকি খেলায় যে ব্যাপারটা হয়ে গেল তাতে কলেজীয় স্পোর্টসের পরাবর্তন বৈশিষ্ট্যের যে সমাধি রচিত হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। সম্প্রতি কলেজীয় ক্রীড়ামোদের শালীনতাবোধ বিষাক্তিত হয়েছে।

খেলায় জয়লাভই যেখানে মুখ্য এবং উপায়টা যেখানে গৌণ সেখানে সদাচরণের স্থান কোথায় ? সদুপায় অথবা অসদুপায় — যে উপায়েই হোক — খেলায় জয়লাভ করাটাকেই যখন কলেজ টিমগুলো মোক্ষ লাভ বলে ধরে নিয়েছে এবং সে মোক্ষ লাভের পথে যখন ভালমন্দের বিচারকে স্থান দেওয়া হচ্ছে না তখন কলেজীয় স্পোর্টসের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিরাশ না হয়ে উপায় কি ?

(দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়)

বাঙ্গালীরই ঠাঁই নাই

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

আশঙ্কা দেখা দিল।

কর্তৃপক্ষ সময় বাঁচিয়ে করে নিবেদন এবং স্থিতীর আর একটি বাক্যের ব্যবস্থা করতে বাধ্য হলেন। নিবেদন পড়লো পত্রটাস্লির মতন। সেন্সরো পরীক্ষা করে দেখবার জন্যে একটি বোর্ড নিযুক্ত হল। বিভাগীয় কর্মচারী ও প্রতিদিন দশ টাকা করে বাইরে থেকে দু'জন নিয়ে করা হল এবং সাহায্য করবার জন্যে নরনারীও নিযুক্ত করা হল। হলে বিষয় হল ঠিক কিনা, এক জোড়া স্ত্রী আছে কিনা এবং

[illegible] আবিষ্কার করে আবেদন, তাদের সাক্ষ্যে মহিলার অধি- [illegible] তাদের [illegible] পত্রের [illegible] হলে [illegible] বিশেষ [illegible] বিশেষ [illegible] সরকারের [illegible] সরকারের [illegible] নিয়োগ [illegible] বিভাগে [illegible] হলেও [illegible] কমিশন [illegible] কেন্দ্রীয় [illegible] নিয়োগে [illegible] করেন। [illegible] কমিশন [illegible] এক্সচেঞ্জের [illegible] ব্যয় হয় না।

(২) শিল্প তাঁত ব্যাপার টাসানসোল অঞ্চল সম্পর্কে। বার্ণপুরের আয়রন ও স্টীল কোং স্থানীয় এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের সঙ্গে একটি জেণ্টেলম্যানস্ এগ্রিমেন্ট এ রাজী হয় যে, তাদের কর্মখালিগুলোর শতকরা ৫০টি এক্সচেঞ্জের মারফতে পূর্ণ করা হবে, বাকী ৫০টি কোম্পানীর কর্মীদের আত্মীয়স্বজনের দ্বারা পূর্ণ করা হবে।

এই ব্যবস্থার পেছনে স্টীল কোম্পানীর সুবিবেচনার পরিচয় আছে, কিন্তু এই সাবধানতা চালু করার প্রাথমিক ধাপেই প্রচণ্ড বিরোধিতা এসেছে ষ্টেট ইউনিয়নের নেতাদের তরফ থেকে। বিশেষ করে 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল ষ্টেট ইউনিয়ন কংগ্রেস'ই শ্রমিকদের নিয়ে বিশেষ বাধা সৃষ্টি করতে অগ্রসর হয়েছেন।

শোনা যাচ্ছে যে, একদিন শ্রমিকগণ কয়েক ঘণ্টার জন্যে ধর্মঘটও করেছিল এবং উৎপাদনের হ্রাস আশঙ্কা করে স্টীল কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করছেন যে, তাদের নতুন নিয়োগ নীতি কিছু দিনের জন্যে স্থগিত রাখবেন কিনা। ইণ্ডিয়ান ষ্টেট ইউনিয়ন কংগ্রেসের সেক্রেটারী শ্রীগোপেশ্বর লাল দাস এবং প্রেসিডেন্ট শ্রীমাইকেল জন এম-পি দু'জনই বাংলার বাইরের লোক। তাদের এই বিরোধী নীতি যে বাংলার বার লাখ বেকারের প্রতি ঠিক সহানুভূতিসম্পন্ন নয় তা নিঃসন্দেহ।

অথচ মাত্র দু' সপ্তাহ আগেই পশ্চিম বাংলার প্রমমন্ত্রী শ্রীআবদুস সাত্তার শ্রম বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারিগণ ও জেলা শালক আলোচনায় শিল্প মালিক ও শ্রমিকদের একটি সভায় বাঙ্গালীদের কর্ম নিয়োগের জন্যে বিশেষ অনুরোধ জানিয়েছিলেন। সেই বক্তব্যকেতে অনেক শিল্প মালিক ও ব্যবসায়ীদের পক্ষ হতে বিশেষ সহানুভূতিসূচক আশ্বাসও পাওয়া গিয়েছিল। তার দু' একদিনের মধ্যেই ষ্টেট ইউনিয়নের [illegible] এই ঘটনার মাধ্যমে আমরা বাংলাদেশের বেকার সমস্যার যথার্থ রূপটি খুব ভাল করেই বুঝতে পাচ্ছি। ভূপর্যটক বিচারসচিব শ্রীসিস্বার্থ রায় তাঁর সদস্যপদ সম্পর্কে যে বিবৃতি দিয়েছিলেন তাতে আমাদের তথা ও মতামত বিশেষ করে সমর্থিত হয়েছে। বিনি যথার্থভাবেই বেকার সমস্যার ভয়াবহতা ও উহার সমাধানের জরুরী প্রয়োজনের উপর জোর দিয়েছেন। তিনি করেকটি প্রস্তাবও করেছেন?

প্রস্তাবগুলো মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বিশেষভাবে বিবেচনা করে দেখবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন। এ আশ্বাসের ফলাফল কি হয় তার জন্যে আমাদের অপেক্ষা করতে হবে জানি। তবে এ বিষয়ে চিন্তা আরম্ভ হয়েছে এবং প্রচেষ্টার সুরে অনুসন্ধান করা হচ্ছে এটাও একটু আশার কথা।

কমিশন আগে খবরের কাগজে দেখলাম যে, ভারত সরকারের অনুমোদন ক্রমে পশ্চিম বাংলার সরকার একটি আইন প্রণয়ন করতে যাচ্ছেন একার সাহায্যে প্রত্যেকটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের মারফতে লোক নিয়োগ করতে বাধ্য হবেন।

আমরা জানি যে, ঠিক এই ধরণের একটি আইনের খসড়া ভারত সরকারের দপ্তরে প্রায় বছরখানি হল পড়ে আছে। বিভিন্ন রাজ্য হতে অনুমোদন লাভ করে কেন যে সে আইনটি চালু হচ্ছে না তার সঙ্গত কারণ ভেবে দেখবার বিষয়।

যদি পশ্চিম বাংলার এমনি একটি আইন চালু হয় তবে অন্যান্য রাজ্যেও যে হুমখা হবে তাতে সন্দেহ নেই। তা যদি হয় তবে দেশের কর্ম সংযোগ ও নিয়োগ নীতি একটি সুষ্ঠু প্রণালী ও পদ্ধতির কাঠামোর মধ্যে নিয়মিত হবে। বর্তমানে আমাদের বেকার সমস্যা সম্বন্ধে খুব নির্ভরযোগ্য ও পর্যাপ্ত তথ্য নেই।

কত কর্ম সুযোগ আছে, কোন্‌গুলির জন্যে কি কি ধরণের শিক্ষার প্রয়োজন, দেশের শিল্প ও বাণিজ্য প্রসার নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আগামী বছরগুলির জন্যে কত লোক চাই বা কি কি ধরণের শিল্প নিকেতন গঠন করা দরকার সে সম্বন্ধে আমাদের হিসাব ও পরিকল্পনা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। যদি দেশের অধিকাংশে কর্ম-সুযোগ ও নিয়োগ সম্বন্ধে বিস্তৃত তথ্য একটি সুসংহত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে লাভ করি তবে তা যে দেশের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ক্ষেত্রে একটি বড় রকমের লাভই হবে তা নিশ্চিত।

বেকার সমস্যা সমাধানে এই সব প্রচেষ্টা স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, পর্যাপ্তও নয়। দেশের শিল্প-বাণিজ্যের সুনিয়ন্ত্রিত উন্নয়ন একটি বিরাট, অন্য দিকটি হল দেশের বেকার সমস্যার জন্যে সুচিন্তিত আঞ্চলিক ব্যবস্থার পরিকল্পনা। বাংলাদেশে এই পরিকল্পনার প্রয়োজন স্বীকৃত হচ্ছে না। পরিকল্পনা ক্ষেত্রে সাহস ও দূরদৃষ্টির জরুরী প্রয়োজনের যথার্থ স্বরূপ এখনো উন্মোচিত ও আবিষ্কৃত হয় নি।

কংগ্রেস কাদের ?

(১ম পৃষ্ঠার পর)

লিখিত আবেদন পাঠান। দু'ই-একবার তিনি ব্যক্তিক সভাপতিদের এজন্য ডেকেও পাঠিয়েছেন। টাকা এসে যায়। গতবার একটি ব্যতিক্রম ঘটেছিল। আবেদনের ফলে সমগ্র টাকা ওঠে নাই। তারপর একজন ধনাঢ্য ব্যক্তির কাছ থেকে বাকি নিজে শ্রীঘোষ নিজের ইজ্জত বাঁচান বলে শোনা যায়।

কাদের টাকার কংগ্রেস চলে?

সম্প্রতি কাকদ্বীপে পশ্চিম বাংলা কংগ্রেসের উদ্যোগে একটি কিষাণ সম্মেলন হয়। কংগ্রেসী মহলে শোনা যায় কম পক্ষে দুই লক্ষ টাকা এজন্য খরচ হয়েছে। সুশ্মেলনে যোগদানকারী নেতৃবৃন্দ ও কিষাণকুলের (অনেকে বলেন, কিষাণ বেশী যোগ দেন নাই) আহারের জন্যে কলিকাতার কোন কানোড়িয়া, কোন সোয়াইকা এবং কোন ডালওয়ালকা কংগ্রেসকে চাল, তেল ও মরদা ইত্যাদি সরবরাহ করেন। এই সব ব্যবসায়ীরা একেবারে নিষ্কাম দান করেছেন, না কিছু পাওয়ার আশায়, জানবার উপায় নেই।

আইনসভার পরপ্রার্থী হতে কংগ্রেসের মনোনয়ন বা ছাপ নেওয়ার জন্যে ধনীর দুলালকে মোটা দক্ষিণা দিতে হয়। এ কথা আজ কারও অজানা নেই। চৌরঙ্গীর যে দ্বিতল বাড়ীটিতে আজ কংগ্রেসের সদর কার্যালয়, তাও কোন ধনী অবাঙ্গালী ব্যবসায়ীর বদান্যতায় প্রাপ্ত।

দেশে দুর্ভিক্ষ, বন্যা বা অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিলে সেবাকার্যে অর্থ সাহায্যের জন্য কংগ্রেসকে ধনীর দুয়ারেই হাত পাততে হয়।

খেলার মাঠে নোংরামি

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

কলেজীয় স্পোর্টসের নৈতিক মানের এই অবনতির দরুণ চারটি কলেজ টিম বিশ্ববিদ্যালয় হকি থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হয়।

কলেজীয় স্পোর্টসের এই ধরণের আকস্মিক রূপ পরিবর্তনের জন্যে দায়ী কে? অবশ্য এটা নিশ্চিত যে, খেলোয়াড়রা যে মনোবৃত্তি দেখিয়েছে তা অত্যন্ত দোষণীয়; তবু এটা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, কলেজীয় স্পোর্টসের তদারক করবার ভার যাদের উপর সেই সব অধ্যাপকই কলেজীয় স্পোর্টসের নৈতিক মানের অবনতির জন্যে বহুলাংশে দায়ী।

কলেজের খেলাধূলা তদারকের ব্যাপারে তাঁরা যে ভাবে অবহেলা দেখান তা একান্ত দোষের। তাঁরা ছাত্রদের মধ্যে খেলাধূলার ব্যাপারে শালীনতাবোধ ও ক্রীড়াসুলভ মনোভাব সঞ্চারের কোন চেষ্টা করেন না।

তাঁদের এই ঔদাসীন্য ও নিষ্ক্রিয় ভূমিকার ফলে ছাত্ররা যখন কোন প্রথম শ্রেণীর ক্রীড়া প্রতিযোগিতার অবতীর্ণ হয় তখন তারাও সমস্তরকম ক্রীড়াসুলভ বিরোধী অসদাচরণে প্রবৃত্ত হতে কোনরকম বিবেকের দংশন অনুভব করে না।

বেশীর ভাগ কলেজেই এই অবস্থা চলছে। অবশ্য করেকটি কলেজ আছে যেখানে অধ্যাপকগণ তাঁদের কলেজের খেলাধূলার ব্যাপারে যথেষ্ট আগ্রহ দেখিয়ে থাকেন। এবং এসব কলেজই নোংরামি থেকে নিজেদের মুক্ত রেখে চলতে পারে।

এবছর কলেজীয় হকি খেলায় কলেজ-বহির্ভূত খেলোয়াড় আমদানী করে একদিকে যেমন নিয়ম শৃঙ্খলা ক্ষুণ্ণ করা হয়, অন্যদিকে তেমন কিছু সংখ্যক খেলোয়াড়ের উচ্ছৃঙ্খল আচরণ ক্রীড়াসুলভ আবহাওয়াকে একেবারে পণ্ড করে দেয়। সিটি কলেজের সঙ্গে প্রতিযোগিতার এবারে ল' কলেজ পাচজন প্রথম শ্রেণীর খেলোয়াড়কে মাঠে নামায়।

তা'রা হয়েন — ধরমপালসিং (মোহনবাগান), গুরুবক্স সিং (কাস্টমস্), সেঠী (ইষ্ট-বেঙ্গল), সুরীন্দর সিং (ইষ্ট-বেঙ্গল) ও ইন্দ্রজিৎ সিং (ইষ্ট-বেঙ্গল)। বলাই বাহুল্য যে, এঁরা কেউই কলেজের ছাত্র নন। সিটি কলেজ দৃঢ়তার সঙ্গে এর প্রতিবাদ জানায়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্পোর্টস বোর্ড ঐ প্রতিবাদের যৌক্তিকতা স্বীকার করে নেয় এবং তারা পরাজিত (৩—১) হলেও খেলার পরেও তাদের দেওয়া হয়। ল' কলেজ এরপর বিশ্ববিদ্যালয় হকি থেকে বেরিয়ে আসে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে ল' কলেজের খেলাধূলা তদারকের জন্য ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপকগণ যদি মাঠে থাকতেন তাহলে কি তাঁদের সাক্ষাতেই ল' কলেজ খেলোয়ার ঐ পাঁচজন খেলোয়াড়কে মাঠে নামাতেন?

এর পর আসে আশ্চর্যতোষ কলেজের পালা। আশুতোষ কলেজও এমন একজন খেলোয়াড়কে মাঠে নামায় যার কোন বৈধ ভূমিকা খুঁজে পাওয়া যায় না। এর বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ জানান হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় স্পোর্টস বোর্ড কঠিন হাতে এর ফয়সালা করে। ফলে আশুতোষ কলেজকেও বিদায় নিতে হয়। কিন্তু যাওয়ার আগে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ যাতে প্রত্যাহৃত হয় সেজন্যে সাধ্যমত চেষ্টার ত্রুটি রাখে নি। কারণ এটা নাকি কলেজের 'সম্মানহানির' প্রশ্ন। এতটাই যখন সম্মানবোধ তখন গোড়াতেই সেটা ভাবা উচিত ছিল না কি? আসলে অধ্যাপকবর্গের লেলমাত্রও যে এ কলেজের নেই তা তাদের কার্যকলাপই প্রমাণ রেখে গেছে। শেষমুহূর্তে 'অধ্যাপকবৃন্দের' একটি ভুয়া সার্টিফিকেট জোগাড় করারও চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু সে চেষ্টাও ব্যর্থ হয় এবং তাকে শেষ পর্যন্ত বিদায় নিতে হয়।

এর পর খেলা চলতে থাকার সময় খেলার মাঠে যে কেলেঙ্কারী ঘটে তার নজির বড় একটা পাওয়া যায় না; কলেজীয় স্পোর্টসে তো নয়ই। সিটি কলেজ ও সিটি কমার্স কলেজের মধ্যে খেলা চলছিল। এমন সময় আম্পায়ারের ঘাড়ে আঘাত পড়ে হকি স্টিকের। আম্পায়ার আর কি করবেন। খেলা চালাতে হলে যে পরিবেশের দরকার তার জন্যে সংশ্লিষ্ট ক্যাপ্টেন দু'জনার-কাছে এ ধরণের ঘটনার আর পুনরাবৃত্তি হবেনা এরকম প্রতিশ্রুতি চাইলেন। একজন ক্যাপ্টেন কিন্তু তাকে এ ধরণের আশ্বাস দিতে রাজী হন না। ফলে তাঁকে সেখ পর্বত মাঠ ছেড়ে চলে যেতে হয়। সত্যিই অদ্ভুত ঠেকে অনেকের কাছে ঐ ক্যাপ্টেনের মতিগতি। তিনি সিটি কলেজের ছাত্র।

এই ঘটনার চারদিন বাদে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্পোর্টস বোর্ড এ সম্বন্ধে আলোচনা করতে থাকেন। এবং আলোচনান্তে তাঁরা এই ঘটনা সম্বন্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা স্থির করেন। বোর্ড সিটি কলেজের বি দফাদার ও বি চ্যাটার্জি নামে দু'জন খেলোয়াড়কে সাসপেণ্ড করেন এবং সিটি কমার্স কলেজের অনুকূলে প্রতিযোগিতার ফলাফল ঘোষণা করেন। এর অব্যবহিত পরে সিটি কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় হকি থেকে বিদায় নেয়।

কিন্তু প্রশ্ন হল—ঘটনা ও সে সম্বন্ধে আলোচনার মধ্যবর্তী চার দিন কলেজ কর্তৃপক্ষগণ কি করলেন? তাঁদের দিকে একটা অনুকূলে সিদ্ধান্ত হবে এ আশাতেই তাঁরা দিন গুণছিলেন। কিন্তু তা যখন হল না তখন বিদায় গ্রহণ ছাড়া আর উপায় কি? এই যদি অবস্থা হয় তবে খেলোয়াড়দেরই বা দোষ কিসের? আসলে কি হচ্ছে না হচ্ছে—তারা অনাচার ও উচ্ছৃঙ্খল আচরণে গা ভাসিয়ে দিচ্ছে, কি না দিচ্ছে তা নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় তাঁদের নেই। মাথা যদি তাঁরা ঘামাতেনই তাহলে এরকমটি হত না।

খেলাধূলো তদারকের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপকের ঔদাসীন্য ও নিষ্ক্রিয় ভূমিকাই কলেজীয় স্পোর্টসের নৈতিক ও ক্রীড়ামানের অধঃপতনের প্রধান কারণ বলে প্রতিভাত হইলেও প্রধান কারণ বলে মনে হয়।

এই লেন-দেনের মধ্যে দিয়েই কংগ্রেস বিত্তশালীদের নিকট বাধ্য বাধকতার জালে জড়িয়ে পড়েন।

প্রশ্ন এই, বিত্তশালী সম্প্রদায়ের সাহায্য ও আনুকূল্য ছাড়া কি কংগ্রেস পরিচালনা সম্ভব নয়?

শিলং-এর চিঠি

শিলং-এর বড়বাজার বার বার পোড়ে কেন?

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

কার অশিমান্য রাগে সারাতে রাজ্যের অন্তর্গত; রাজ্যের শিলংরের বড়বাজার বার বার পুড়ে অধিনায়কের পদবী সীম এবং ছাই হয়ে যায় জানা শক্ত। এখান- বর্তমান আইন অনুযায়ী সীমের কার পুলিশও যে কোন কিনারা ওপরে আছেন ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল করতে পারছে, মনে হয় না। আসাম এবং ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের ওপরে সরকারের সেপাই-সান্ত্রী অধ্যুষিত আসাম সরকার)। বাজারের শোভা কন্টোনমেন্ট বোর্ডের তৈরী সেক্রেটারিয়েট- পুনর্গঠন ত দূরে ভাল কথা, কারো ভবনে কয়েক মাসের মধ্যে তিন কোন আপত্তি থাকবার কথা নয়, তিনবার আগুনে লাগাবার চেষ্টা সুতরাং প্রস্তাব পাশ হয়ে যায়— করলো কারা তারই যখন হদিস হয় হবে। কিন্তু হয় আর না। না তখন বড়বাজারে অগ্নিকাণ্ডের কি তদন্ত হবে? আর পাইন কাঠের তৈরী ঠাসাঠাসি এফোঁড়া দোফোঁড়া ঘরের বাজার, ত আকস্মিকভাবে পড়ে কেতেও পারে।

তদন্ত না হয় হয় না বা তদন্ত হলেও তাতে কোন উল্লেখযোগ্য ফল হয় না—পুলিশের যোগ্যতার কথা ত জানাই আছে—কিন্তু আজ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষদিগের মধ্যে কেউই বড়বাজারটিকে পাকা এবং আধুনিক বাবসাকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারলেন না, এই এক আশ্চর্য।

শিলং সহরের রূপে-গুণে মুগ্ধ অনেকে আছেন। তাঁদের মধ্যে একজন গত চার বছরে পৃথিবীর প্রায় অর্ধেকটা (তাঁর নিজের কথায়) ঘুরে আবার এসেছেন আসামে সেনাপতির নিয়ে। তিনি জানালেন কথায় কথায় যে, শিলংরের সব ভাল কেবল বড়-বাজার ছাড়া এবং জঙ্গী বৃসিকতা করে একটু লেজুড় জুড়লেন— যদি কেউ বড়বাজারটিকে আগুনে লাগিয়ে পুড়িয়ে দিতে রাজী থাকে তাহলে তিনি পেট্রোল যথেষ্ট পরিমাণে সরবরাহ করতে প্রস্তুত।

তাহলেই বেশ বর্তমানের জীর্ণ অপরিচ্ছন্ন বড়বাজার সুঠাম নব-কলেবর লাভ করবে। তাঁকে জানানো হোল যে সওয়া তিন টাকা গ্যালন দামের পেট্রোলের দরকার হয় নি এমনিতেই বড়-বাজারের আট আনি কি দশ আনি করে দু-দুবার এক বছরের মধ্যে জ্বলে গেছে সেছে কিন্তু নবকলেবর কখনো হয় নি। যথা-রীতি পাইন কাঠ আর টিনের চালা উঠেছে। ভূতীয়বার আগুন লাগলো এই সেদিন।

একেবারে যে কখনো ধ্বংসোত্তর বড়বাজারের আধুনিক রুচিসম্মত পুনর্গঠনের কথা হয় না তা নয়। যখনই আগুন জ্বলে ওঠে ঠিক তার পর দিনই সরকার সভা ডাকেন কি করে এবার মন্ত্রী করে বাজারটিকে গড়ে তোলা যায়। সরকারের তরফে খাসি-জয়ন্তিয়া পাহাড়ের ডেপুটি কমিশনার ত থাকেনই মিটিংয়ে, আরো অনেক আমলারা আসেন আর আসেন শিলং মিউনিসিপ্যালিটি; খাসি-জয়ন্তিয়া পাহাড় জেলা কাউন্সিল ও কান্টুনমেন্টের প্রতিনিধিরা এবং মিক্সিম রাজ্যের সীম (বড়-বাজারসহ শিলং সহরের অনেক-খানি এলাকা খাসিয়াদের চিরা-চরিত আইন অনুযায়ী মিক্সিম রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত)।

এবার যখন কারখানা খোলা হল ১৯শে এপ্রিল তখন হয়ত অনেকেই লক্ষ্য করেছেন শ্রমিকদের আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত এক কংগ্রেস কাউন্সিলার। অনেকে হয়ত ভেবেছেন হঠাৎ ফরোয়ার্ড ব্লকের লোকের সঙ্গে কংগ্রেসের লোক কেন?

গূঢ় রহস্য হচ্ছে যে, ধর্মঘটি শ্রমিকরা নাকি এখানকার মণ্ডল কংগ্রেস কমিটির সাহায্য ও সহযোগিতা পাচ্ছে মালিকের বিরুদ্ধে। তাদের সংগ্রামে। শোনা যায় এরা নাকি ধর্মঘট চালিয়ে যাওয়ার জন্য চাল-ডাল দিয়েই সাহায্য করে না—খুব গরীব কর্মীদের নাকি অর্থ সাহায্যও দিয়ে থাকে।

এরা আবার পৃষ্ঠপোষকতা পায় সেই দুই ধনিকগোষ্ঠী লোকদের নিকট হতে যারা চাইছে এই কোম্পানীটিকে তাদের হাতের মুঠোর ভিতর নিতে।

আপনারা হয়ত ভাববেন কি করে তা সম্ভবপর। শুনেন তাহলে। যদি এমনি করে ধর্মঘট চলতে থাকে তাহলে শেয়ারের বাজারে দাম পড়তে থাকবে বেশলল কেমি-ক্যালের। এবং ঠিক এই সময়ে কিনে নেবে যারা অধিকার নিতে চায় এই কোম্পানীর ওপর যতটা সম্ভব-পর শেয়ারগুলো; যদি বেশীরভাগ শেয়ার এসে যায় তাদের হাতে তাহলে আর কোম্পানীর উপর মাতব্বরি করতে কাঁদিন যা ধর্মঘট তাদেরই বা কাঁদিন।

কিছুদিন আগে অতুলাবাবুর এক বশংবদ ব্যক্তি নাকি বেশলল কেমিকেলের কারখানার উপস্থিত হন ধর্মঘটী শ্রমিকদের সাহায্য ফার্মে চাকুরী করতে আগ্রহশীল। করবার জন্যে। এ সময়ে নাকি বাংলাদেশে কার স্বার্থ দেখে তা পক্ষে এটা কি গৌরবের কথা?

ঢাকার চিঠি

রাজনৈতিক বন্দীদের এখনও কিছুদিন জেলে পচ্‌তে হবে

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটি এবং সুরাবর্দী সাহেবের মধ্যস্থতার ফলে শেষ পর্যন্ত শেখ মুজিবর অবশ্য তাঁর পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করেন। কিন্তু লীগের জেনারেল সেক্রেটারী শেখ মুজিবর এবং সহ-সভাপতি ও মুখ্যমন্ত্রী মিঃ আতাউর রহমানের মধ্যে পূর্বেকার মনের একটা স্থায়ী প্রত্যাহার করেন। কিন্তু লীগের সমাধান হয়েছে — এ কথা অনে-কেই মনে করতে পারছেন না।

আসাম কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির অধিবেশন হয়ে গেল শিলংয়ে। দুটি বিষয়ের ওপর আলোচনা হোল—বদরপুর ও হাজোতে' উপনির্বাচনের ফলাফল এবং ভূমি সংস্কার। বদরপুরে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিমলাপ্রসাদ চালিহা এবং হাজোতে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীমহেন্দ্রমোহন চৌধুরী জয়লাভ করেছেন। এখানকার খবরের কাগজ পড়ে জানলাম এই দুই উপনির্বাচনের ফলাফল পর্যা-লোচনা করে কংগ্রেস কার্যকরী সমিতি সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। দল হিসেবে জয়লাভ করলে আর অসন্তোষের কি কারণ থাকতে পারে?

বিধানসভায় বিরোধী পক্ষীয় সদস্যেরা অভিযোগ তুলেছিলেন যে, বদরপুরে আসাম সরকারের অর্থ ব্যয় করা হয়েছে শ্রীচালিহার সাহায্যার্থে। কিন্তু এমন কতক-গুলি ঘটনার ওপর তাঁরা জোর দিলেন যে সরকার অতি সহজেই আত্মপক্ষ সমর্থন করে বেঁচে যেতে পারলেন। আরেকটু সজাগ দৃষ্টি রেখে তথ্যাদি সংগ্রহ করলে বিরোধী পক্ষ বলতে পারতেন আসাম সরকারের প্রচার বিভাগের গাড়ীর প্রায় এক মাসকাল বদরপুরে সফর এবং প্রচারপত্র বিলির কাহিনী। কিন্তু সেদিকে তাঁদের নজর পড়ে নি।

* * *

বিধানসভার এবারের ৩১৬ সংখ্যক সাধারণ প্রশ্নোত্তরে ত্রিপি-তে ছাপা হয়েছে দেখলাম উত্তর-দাতার নাম-শ্রীহরেন্দ্রনাথ দাস (রাজস্বমন্ত্রী)। মন্ত্রীমহাশয়ের বিএ্যাক্সন জানি না।

তবে জোড়াতালি দিয়ে হলেও আপাততঃ একটা মিটমাট যে হল এবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। মিঃ আতাউর রহমানও শেষ পর্যন্ত রাজী হয়েছেন তাঁর রাজ-নৈতিক সেক্রেটারী মিঃ জমিরুদ্দীন আমেদকে অপসরণ করার ব্যাপারে। এজন্যে যদ্দুর পূর্বে থেকেই যার বার দাবী উঠেছিল। কিন্তু মুখ্য-মন্ত্রী এযাবৎ তা প্রত্যাখ্যান করে আসছিলেন।

ক্যাবিনেটে যে দুইজন মন্ত্রীর অবস্থিতি সম্পর্কে শেখ মুজিবর এবং তাঁর অনুগামিগণ আপত্তি তুলেছেন তাঁদের আপাততঃ অপ-সারণ না করে আর একটা চান্স দেওয়া হবে স্থির হয়।

অবশ্য এই যে একটা আপোষ করা হল এতে স্থায়ী ফল হবে এরকম মনে হয় না। কারণ শেখ-আতাউর দ্বন্দ্ব সহজে গভীরে শিকড় গেড়েছে। মিঃ আতাউর রহমানের পার্টির মধ্যে স্থায়ী সমর্থন খুবে একটা বিশেষ আছে বলে মনে হয় না। তবে অবশ্য-গতিকে প্রয়োজনীয় সমর্থন তিনি পেয়ে যাবেন। কারণ মন্ত্রী মিঃ খয়রাত হোসেনের সঙ্গে শেখ মুজিবরের সংঘর্ষ এবং 'ইত্তেফাক' এর সম্পাদক ও সুরাবর্দী সাহেবের দক্ষিণহস্ত স্বরূপ মিঃ তফাজ্জল হোসেনের (মাণিক মিঞা) তাঁর প্রতি বিদ্রূপতা মিঃ আতাউর রহ-মানের অনুকূলে যে অনেকখানি সমর্থন জোগানের সহায়তা করবে এতে সন্দেহ নেই।

এই মুহূর্তে শেখ সাহেব অবশ্য তাঁর দলাদল ব্যাপী বৃটিশ বন্ধুরাজ্য ঋণকরলে বৃটেনের মহামান্য রাণীর প্রতি তাঁর 'অরাজকীয় ইংরেজ' ভাষার প্রয়োগ পরীক্ষা চালাচ্ছেন। এর পর সম্ভবতঃ তিনি প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের সঙ্গে মুখ-বিরোধী বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা চালাবেন—গত বছর শ্রীমধ্যকালে যেমন তিনি মিঃ খ্রুশ্চেভের সঙ্গে আমেরিকা-বিরোধী বিষয় নিয়ে আলোচনা চালিয়েছিলেন। কিন্তু অভিজ্ঞ-মহলে এই ধারণা একরকম বদ্ধমূল যে, ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই পুনরায় শেখ সাহেব তথা পার্টির মাথাব্যথা সুরু হয়ে যাবে।

রাজনৈতিক বন্দী মুক্তি প্রসঙ্গ আপাততঃ সম্ভাবনা নেই

বন্দী মুক্তির ব্যাপারে মুখ্য-মন্ত্রী মিঃ আতাউর রহমান খান নাকি সহানুভূতির মনোভাব প্রকাশ করেছেন। কিন্তু এ সত্ত্বেও পূর্ব-বঙ্গের রাজনৈতিক বন্দীদের যে আরও কিছুকাল জেলে পচতে হবে এটা প্রায় অবধারিত মতা। গত ৬ই এপ্রিল আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে ঐ প্রসঙ্গ নিয়ে সদস্যদের মধ্যে যে আলাপ-আলোচনা হয় তা থেকেই এটা বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এ প্রসঙ্গ ছাড়া ঐ বৈঠকে জাতীয় আওয়ামী পার্টির ১১ দফা কার্যসূচীও আলোচিত হয়। আওয়ামী লীগের প্রতি সমর্থন বিস্তারের প্রস্তাব নিয়েই জাতীয় আওয়ামী পার্টি ক্ষমতাসীনদের লীগ দরবারে ঐ কার্যসূচী পেশ করেছে।

রাজনৈতিক বন্দীমুক্তির দাবী সহ ঐ ১১ দফা কার্যসূচী নিয়ে আওয়ামী লীগ বেশ কিছুটা মুশকিলে পড়েছে। ঐ কার্যসূচী গ্রহণ করাও তাঁদের পক্ষে সম্ভব বলে মনে হচ্ছে না, সরাসরি বর্জন-নের সাহসও তাঁরা পাচ্ছেন না। সুতরাং আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে ঐ ১১-দফা কার্যসূচী না-গ্রহণ, না-বর্জনের নীতিই আপা-ততঃ অনুসরণ করা স্থির হয়েছে। ইতিমধ্যে ঐ কার্যসূচী রূপায়নের বাস্তব পন্থা বাতলিয়ে দেবার জন্যে লীগের পক্ষ থেকে আওয়ামী

(১০ম পৃষ্ঠায়)

বেঙ্গল কেমিক্যালে বার বার ধর্মঘট মানে বাঙ্গালী ব্যবসায়ের জীবন সন্ধ্যা ও অবাঙ্গালীর জীবন প্রভাত

বেঙ্গল কেমিক্যাল বাঙ্গালীর গৌরব। কিন্তু আজ ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে এমন অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে যে, এর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বেশ সন্দিহান হয়ে পড়তে হচ্ছে।

শোনা যায় নানাভাবে চেষ্টা চলছে কি করে এটা বাঙ্গালীর হাত থেকে নিয়ে অবাঙ্গালীর হাতে তুলে দেওয়া যায়। এ ব্যাপারে সাহায্য জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে করছি আমরাই— অর্থাৎ বাঙ্গালীরা।

জানিনা যাঁরা ধর্মঘট করেছেন দিনের পর দিন তাঁরা এর পিছনে যে দুরভিসন্ধি আছে তা জানেন কিনা।

বাংলাদেশের কোনও এক বিশেষ সম্প্রদায়ের দুই ধনিক-গোষ্ঠী ওত পেতে আছে এই কোম্পানীটিকে হাত করার জন্য। কারণ তাঁদের ঔষধের ব্যবসা নেই, তার উপর সরকার দ্বিতীয় প্ল্যানে বেশ কিছু টাকা খরচা করবে দেশীয় এই সব কারখানাগুলোর উন্নয়নের ব্যাপারে।

এরা আবার পৃষ্ঠপোষকতা পায় সেই দুই ধনিকগোষ্ঠী লোকদের নিকট হতে যারা চাইছে এই কোম্পানীটিকে তাদের হাতের মুঠোর ভিতর নিতে।

আপনারা হয়ত ভাববেন কি করে তা সম্ভবপর। শুনেন তাহলে। যদি এমনি করে ধর্মঘট চলতে থাকে তাহলে শেয়ারের বাজারে দাম পড়তে থাকবে বেশলল কেমি-ক্যালের। এবং ঠিক এই সময়ে কিনে নেবে যারা অধিকার নিতে চায় এই কোম্পানীর ওপর যতটা সম্ভব-পর শেয়ারগুলো; যদি বেশীরভাগ শেয়ার এসে যায় তাদের হাতে তাহলে আর কোম্পানীর উপর মাতব্বরি করতে কাঁদিন যা ধর্মঘট তাদেরই বা কাঁদিন।

কিছুদিন আগে অতুলাবাবুর এক বশংবদ ব্যক্তি নাকি বেশলল কেমিকেলের কারখানার উপস্থিত হন ধর্মঘটী শ্রমিকদের সাহায্য করবার জন্যে। এ সময়ে নাকি বাংলাদেশে কার স্বার্থ দেখে তা কি আবার বিশেষ করে বলে দিতে হবে?

শ্রমিকদের দাবী আছে এবং হয়ত সে দাবী ন্যায়সংগতও। কথা হল হয়ত এটা মিটে যেত অনেক দিন আগেই, যদি স্বার্থা-ন্বেষী অভিসন্ধিল্‌ লোক এর পিছনে না থাকত।

কিন্তু কে বোঝাবে শ্রমিকদের যে এইভাবে ধর্মঘট চলতে থাকলে কর্মচারীদের সুবিধে হবে না, হবে অন্য আর এক ধনিকগোষ্ঠীর।

ক র্তৃ প ক্ষ স ব্য ক্তি বলবার হল যে, এঁরা ইউরোপের মধ্যবর্তীয় মালিকদের মনোবৃত্তি কাটিয়ে উঠতে পারে নি, বা কিনা পারে নি আমাদের বেশীরভাগ ভারতীয় মালিকেরা। সেই দিক থেকে আমরা আছি এখনও ফিউ-ডালিজমের যুগে, ধনতান্ত্রিক যুগে এখনও এসে পৌঁছাই নি। এই ফিউডেল যুগের মনোবৃত্তি হল তত বেশী পার শ্রমিকদের খাটিয়ে "নিজের পকেট ভর্তি" কর, শ্রমিকরা জাহান্নামে যাক তাতে আমাদের কি?"

দুঃখের বিষয় এই মনোবৃত্তির জন্যই বোধ হয় আমাদের সওদা-গরী অফিসের চাকুরীয়াদের ভিতর বেশীর ভাগ লোকই বিদেশী কোম্পানীতে বিশেষ করে বৃটিশ

ক্যালকাটা ফটো সার্ভিস
৩৭, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩
ফোন—২৪-৩৭৭৭
ফটো তোলা ও ডেভেলপিং-এর জন্য
আমাদের সহিত যোগাযোগ করুন।

সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

জাপানীজানার সার কি সোধাকে?

আপনাদের "দর্পণে" আমি উৎসাহী পাঠিকা। সমাজকে সুন্দর করার কাজে এই পত্রিকা যে সহায় হতে পারে এ কথাও আমি বিশ্বাস করি। তাই আশা করি দু'একটি মনের বিষয়কথা জানার অধিকার আমার আছে।

'ইংরেজির কবর এবং সাহেবীয়ানার আদর' দিয়েই শুরু করা যাক। উত্তরপে কবর এবং আদরের বাচ্চারাটি যেমন লজ্জাকর তেমনি আবার আপনাদের 'পর্যবেক্ষকের' উক্তিগুলিও খানিকটা একদেশে। বাংলা ভাষায় জ্ঞানচর্চার বিষয়ে উনি যা বলেছেন তাতে আমিও একমত। কিন্তু 'বাঙ্গালীয়ানা' চর্চার যেবৈশিষ্ট্যরে ভাবার সেই "টেলমাখা স্নিগ্ধকন্ঠরে" গা-ঘিন-ঘিনে 'খাঁটি বাঙ্গালীয়ানা।'), আমার তেমন উৎসাহ নেই—অর্থাৎ নির্ভেজাল বাঙ্গালীয়ানা বস্তু অবিমিশ্র গুণে-এ আমার মনে হয় না। আর বিদ্যাসাগর যে খাঁটি বাঙ্গালী ছিলেন একথা বড় বড় বাঙ্গালী জাতকে বড় বাড়িয়ে তোলা হয়। রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল যে এই বাংলাদেশে বিদ্যাসাগরের জন্ম একটা অবিশ্বাস্য অভূতপূর্ব্ব ঘটনা—প্রায় 'কাকের বাসায় কোকিলের ডিম্ব পাড়ার' শামিল। বিদ্যাসাগর-চরিত্র বিশ্লেষণের একটি সাধক বিফাল। এই চরিত্রকে জীবিত আদর্শ বলে গ্রহণ করতে হলে অনেক ক্ষেত্রেই 'খাঁটি বাঙ্গালীয়ানার' বিষ্ঠাকাঠা করতে হয় বলে আমার বিশ্বাস। অবশ্য 'খাঁটি বাঙ্গালী' আর 'খাঁটি মানুষ' যদি সমার্থক হয়, তবে অন্য কথা—তবু সে ক্ষেত্রেও সম্পূর্ণভাবে শব্দটির ব্যবহার না করাই বাঞ্ছনীয়। আমাদেরও 'খাঁটি' মানুষে হতে চেষ্টা করাই ভাল। দুর্ভিক্ষপীড়িত বাঁহুরলা মাঠ—ভাতে এমন আর কি আসে যায়? (অবশ্য কোট-প্যান্টের অহেতুক 'ফ্রেসটিক্নটাও লজ্জাজনক—তবে কোট-প্যান্টের রেওয়াজ ছেড়ে দিয়ে সাধারণের চোখেও তার দাম কমে যাবে এই আশায় আছি)। আমাদের গরম দেশেও নেকটাই বাদ দিয়ে সুতী ট্রাউজার্স আর শার্ট পোষাক হিসেবে ধুতি-পাঞ্জাবীর চেয়ে কম সুবিধার নয়। কাজ-কর্মের সুবিধে, খেতেও এমন কিছু খারাপ লাগে না অধিকাংশ লোককেই, তবুও অনেককে বেশ চটপটে করে তোলে। টেকে বেশী—আখেরে খরচও বেশী পড়ে না। তাই এই আপত্তিটা একটু বাড়িয়েই গোঁড়ামি মনে হোল। এদিকে আবার স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি আমাইকলের কোট-পরণলে (তার বাঙ্গালীত্ব ক্ষুণ্ণ হয় নি) পর্যবেক্ষকমশাইর তেমন আপত্তি নেই। অথচ সমসাময়িক সুবীন দত্ত কি বুদ্ধদেব বসুরে শোষাকের বেলায় সেই সমস্যটির অভাব হবে কেন? পোষাকে আমার ব্যক্তিগত রুচির প্রকাশ পাক; জাতির চেহারের খবর তাতে পেতেই হবে এমন কি কথা আছে? লোকের দেখে কি নিঃসন্দেহে আমরা বলতে পারি লোকটা আইরিশ কি স্কেমিশ, নরউইজিয়ান না সুইস? শাড়ীপরা কেনো কন্যাকে দেখলেই তো তাকে বাঙ্গালীনী মনে করা যায় না, সে ওড়িয়া, কাশ্মীরী, মালয়ালী এমন কি ইটালীয়ান কি রাশিয়ানও হতে পারে। বিদেশীরা ধুতি-চাদর নেয় নি বটে (কেননটাও ভেবে দেখা উচিত) তবে শাড়ী সম্বন্ধে তো খুব উৎসাহ দেখা যায়।...

এদিকে গুরুবাহাদুরের কলমে রস আছে, ধার আছে। পড়তে ভাল লাগে। কিন্তু তবু অকর্মণ্য ভন্ডামির "ভাঁড়ামোর" (রাষ্ট্রভাষা) ভাল কাজ। তবে সমাজের ও প্রকৃতির দুরসহ অবিচারকে খানিকটা সুসহ করে নিতে অল্প একটু নিরীহ মিথ্যার আশ্রয় যদি কেউ নেয়ই তা হলে সে অপরাধ কি এতখানি বিদ্রূপের যোগ্য? গুরুবাহাদুর যদি মস্তিষ্ক মশাইকে আরো একটু প্রসন্ন চোখে দেখেন, তাঁর দু'আনার চা সিগারেটার বরুনা আর দুখে আরো একটু অন্তেষ নিজের বলে অনুভব করেন তাহলে তাঁর ঐ অভিযোগকর মিথ্যাকে এভাবে ছারখার করে দিতে মন আর চাইবে না। এই লঘুচাটুকুও যদি না বাঁচে তবে এতগুলি নানা দিক থেকে বঞ্চিত মানুষ কি নিয়ে বাঁচে বলুন? আরো বহু আত্মঘাতী সর্বনেশে ভন্ডামী আছে সংসারে; আপাতত্তও গুরুবাহাদুর যদি তাঁর বরুচুর সৌন্দর্যে সম্প্রলিত করেন তবে তা সার্থক হয়। আজন্ম আপার ভিভিসন ক্লার্কের আত্মপোষ্টাখাওয়া, ভাল বাড়ীর মুখ না দেখা ঘরনী—তাঁর শালিত নখর চন্টুর খোপা নয়। না হয় সেই গুরেবাজ বৌ বাস্তবতার নিরে "সাহেব পাড়ার খাওয়াদাওয়া নিজস্বীয়ই সারলেন। প্রসঙ্গত গল্পগুচ্ছের 'ঠাকুর্দা' গল্পের কথা মনে পড়ল। এটুকুর মিথ্যাচারণ সমাজ সইতে পারবে।

আপনাদের 'মহাপ্রভুর আবির্ভাবের বক্তব্য প্রসঙ্গেরই, বধিও ভাষা একটু রুঢ় আর অসংবত। 'খাঁটি কথার কাঁচ কম থাকলে কাজ দেয় বেশী। এরও প্রতিবাদ যখন হয়েছে তখন বুদ্ধিজীবী সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গীর সংগে এই 'মাতলামির' বিরোধটা কোথায় তা কি আপনারা আর একবার বুঝিয়ে বলা দরকার নয়? বোলাই ফিল্মের নোংরামি থেকে মানুষকে সরাতে যদি এমন সব বক্তুর প্রয়োজন হয় তবে একটু দুর্ভাবনার কথা বই কি?

শেষত্ত, আপনাদের এত ছাপার ভুল থাকে কেন?

নিবেদন ইতি

সৌরী আইচ্বে দত্ত, কলকাতা

'রবার্ট ব্রুস' অমল হোম

বলতে পারেন শ্রীঅমল হোমের কাজ কি? এতদিন মনে করতাম শ্রীহোম হচ্ছেন দমোমরভ্যালী কর্পোরেশনের প্রিন্সিপ্যাল ইনফরমেশন অফিসার।

আমার মনে হয় এ ধারণা সঠিক নয়। আসলে তিনি ভি ভি সির—অর্থাৎ আপনার, আমার—অর্থে এন্ডারসন হাউসে একটি আত্ম-প্রচারণার দপ্তর খুলেছেন মাত্র। মোটা মাইনে, কত সহকারী আর স্টেনোগ্রাফার ও পিওন।

সেদিন এক বন্ধুর বাড়ীতে একখানা কার্ড দেখে আমার চোখ খুলেছে। মোটা দামী কাগজের চার পৃষ্ঠা, সুন্দর ছাপা। প্রথম পৃষ্ঠার লেখা আছে "প্রিভিসেস ১৯৫৭-৫৮ : ফ্রম দি ইনফরমেশন ডিপার্টমেন্ট, দামোদরভ্যালী কর্পোরেশন।" স্বাক্ষর বহন করছে শ্রীঅমল হোমের।

প্রথম দেখে আশা জেগেছিল, নিশ্চয়ই ভি, ভি সি সম্বন্ধে কিছু তথ্য পাওয়া যাবে। যা বলেমান তাতে শ্রীহোমের কৃতিত্ব সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ আর রইল না।

শ্রীহোম ভিতরের পাতায় দুখানি আলোচিত্র এঁটে দিয়েছেন। যদি মনে করেন যাঁদের রক্ত জল করে পরিকল্পনাটি কার্যকরী করা হল তাঁদের কথাই বলা হয়েছে তবে ভুল করবেন।

ছবিতে দেখান হয়েছে দুটি ছিনিষ। (১) বেশাল ইঞ্জিনীয়ারিং কনট্রাকটরস এন্ড ম্যানুফ্যাকচারিং প্রদর্শনীতে ভি, ভি সির মন্ডপটির গেটের এক শেরওয়ানী পরিহিত শ্রীহোম কর্তৃক শ্রীনেহরুকে মন্ডপটি দেখানোর দৃশ্য। সত্যিই তো শ্রীহোমের চিন্তার এর থেকে বড় কি আছে ভি, ভি, সি'র যা দেশের লোকে দৃষ্টিতে আনা যায়।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পূর্বে পর্যন্ত শ্রীহোম কলকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেটের সম্পাদক হিসেবে এক অখকার কুঠুরীতে বসে বে চিন্তার বিভোর ছিলেন এবং পরে ডা রায়ের কৃপায় মোটা মাইনায় গভর্ণমেন্টের প্রচার অধিকর্তা হয়ে ব্রিটিশ বিল্ডিং-এর চারতলার এক প্রসস্ত কামরায় বসে বে উন্মেদা সাধনে হাত পাকিয়ে ছিলেন, আজ এন্ডারসন হাউসে বসে তা রীতিমত কাজে লাগাচ্ছেন।

কয়েক বছরের পুরনো কথা মনে পড়ছে। কলকাতার দুটি বিখ্যাত বৈনিকের কাঁড়ি। শ্রীহোম তখন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার অধিকর্তা। গণ্যমান্য অভ্যাগত এলেই তাঁকে ছুটতে হত ডা রায় এবং বড় বড় অফিসারদের সংগে দমদমে।

আর মুস্কিল হয় ফটোগ্রাফারদের। শ্রীহোম স্থান বেছে নিতে জানেন। তাকে দৃশ্যের মধ্যে না রেখে ছবি তোলাই অসম্ভব। সময় মত তিনি একেবারে সামনের সারিতে, কখনও ডা রায়কে ঠেলেও। আঁতড় ছবে পত্রিকা দুটি একবার বে ছবি ছাপালেন তা থেকে শ্রীহোমকে কালি দিয়ে পুছে অদৃশ্য করে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু শ্রীহোম এ ব্যাপারে সাক্ষাৎ বার্থার ব্রুস।

শ্রীহোমের দুর্বলতাটির কথা সরকারী ফটোগ্রাফারদের ভাল করে জানা ছিল। তাঁদের অবস্থাটা বুঝুন। চাকরীর উন্নতি নির্ভর করে শ্রীহোমের কৃপাদৃষ্টির উপর। তাঁকে সন্তুষ্ট না করে উপায় কি?

একটি উদাহরণ দিচ্ছি। ১৯৫৩ এর জানুয়ারী, কুচবিহার স্টেট পশ্চিম বাংলার সংগে যুক্ত হল বে অনুষ্ঠানের মারফৎ তাতে পৌরোহিত্য করে ডা রায় কলকাতায় ফিরছেন, সরকারের ছোট এরোপ্লেনটিতে। করেকজন অফিসারের স্থান হয়েছে তাতে, হয় নি শ্রীহোমের। অতি দুঃখে তিনি বিমান ক্ষেত্রের এক কোণে এক দৃঢ় করে বসেছিলেন।

ডা রায় এরোপ্লেনে উঠতে যাচ্ছেন। হঠাৎ প্রেস রিপোর্টাররা অনুরোধ করলেন : "ডাঃ রায়, একটি ছবি তুলতে চাই।" ডা রায় রাজী হলেন এবং অফিসারদের দূরে রেখে এরোপ্লেনটির সামনে দাঁড়ালেন।

কিন্তু, এদিকে এ কি? সরকারী ফটোগ্রাফারটি দৌড়ে চলে যাচ্ছে কেন? অল্পক্ষণেই রহস্য ভেদ হলো। তিনি চটপট ফিরে আসছেন এবং পেছনে হন্তদন্ত হয়ে ছুটছেন কে—শ্রীঅমল হোম। কিন্তু যখন তাঁরা যথাস্থানে এলেন, ডা রায় এবং অন্যান্যরা এরোপ্লেনে উঠে পড়েছেন।

বেচারা সরকারী ফটোগ্রাফার আর কোরাই অমল হোম।

ডি, ভি, সির নিকট আমাদের জানবার অধিকার আছে, আমাদের পয়সায় শ্রীহোম আত্ম-প্রচারণার সাহস পান কোত্থেকে? ইতি—শ্রীচক্ষুচরণ গংগোপাধ্যায়, কলিকাতা।

স্টাফ রিপোর্টারের ডায়েরী (২)

—সংবাদদর্বাণ

পাবলিক, সরকার ও মালিক—এই তিনপক্ষের যুগপৎ সন্তুষ্টি বিধানের জন্যে প্রয়োজন কঠোর সংযমের। আর এ সাধনার সিদ্ধি-লাভ কদাচিৎ ঘটে। এই দুর্লভ সৌভাগ্য অর্জনের জন্যে আমার কর্মস্থলে কোন চুটি নেই। এবং এ ব্রত উদ্‌যাপনে যদি আমাকে 'জীবনদান'ও করতে হয় তা হলেও আমি প্রস্তুত। কারণ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যিনি — ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়—তিনি মন্ত্রিত্ব গ্রহণে অব্যাহতির পর দেশবন্ধুদীর আদর্শের জন্যে 'জীবনদান'-এর আহ্বান জানিয়েছিলেন।

তাঁর এক শুভ জন্মদিনে প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে এক অনুষ্ঠানে বাঙ্গলার সংসদীয় নায়ক ডা রায় 'জীবনদান'-এর এই মহান আদর্শ সংসদবাসীর সম্মুখে তুলে ধরলেন তাঁর মাতৃভাষায়। বিশেষভাবে করে বোঝালেনও অনেকক্ষণ। আমার পাশের এক ভদ্রলোক ইংরেজী বললেন, ডাঃ রায় কিন্তু ইংরেজীটাই বলেন ভাল। আমি শুনেছি তাঁর বক্তৃতা বিধান সভায়। কি করুন অনর্থক বলে যেতে পারেন, একটুও বাধে না। আর বিদেশী ভাষা হলেও বেটা বলতে চান ইংরেজীতে সেটা বোঝাতে পারেন সুন্দর।

ভদ্রলোকের পাশেই একজন জবরদস্ত হিন্দুস্থানী কংগ্রেসী এম, এল, এ বসে ছিলেন। তিনি বোধ হয় আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। ভদ্রলোকের কথার জবাব দিয়ে বললেন — কেনো মোশাই বিধানচন্দ্রজী যে আদর্শের কথা বোলিয়েছেন ও তো একদম জোলের মতো পরিষ্কার করিয়ে দিয়েছেন। জীবনদান, আপ্ ভূদান নেহি শুনিয়েছেন? বিনোবাজীকে ভূদান আর বিধানচন্দ্রজীকে জীবনদান। জীবনদান—তো আরও মহত্তর বাত্ অছে। —টর্কলে নিজের 'জনগর্জ' উজ্জিতে নিজেই উল্লসিত হয়ে সমর্থনের আশায় আমার দিকে চাইলেন—কেমোন রেপুর্টার মোশাই?

—আমি তখনও জীবনদানের দার্শনিকতত্ত্বের খোর কাটিয়ে উঠতে পারিনি; হাবুডুবু খাচ্ছি ভোগ্যা বেশীদিন ডাঃ রায় এ আদর্শের পেছনে ছোটেনিন বা তাঁর দেশবাসীকেও ছুটতে বলেননি)— বললাম, হাঁ হাঁ — লালজী মুখ্যমন্ত্রী তো আমরণ ধরে বোঝালেন কিন্তু সংস্কেপে বলিতে গেলে—বাকিটা মুখে বেধে গেল। কিন্তু পাশের ভদ্রলোক আর আত্মসম্বরণ করতে পারলেন না; গদগদ্‌রে করে দিলেন। কদাচি বোধ হয় লালজী শোনেননি কখনও; কিন্তু শব্দটির ঝংকার এমনই যে শুনে লালজী পরম পরিতৃপ্তি লাভ করেন। চোখেমুখে আহ্লাদের দাঁপ্তি ছড়িয়ে বলেন, এখুন তো গগনবাবু সমঝ্ গিয়া। উদ্যত হাসি চেপে আমি বললাম, হাঁ পরিষ্কার। গগন বাবু বললেন, হিংরিজি ছট্, হাঁ একদম পরিষ্কার!

ব্যাপারটার এত সহজে একটা ফয়সালা করে দিয়ে পরম আত্মপ্রসাদ লাভ করেন লালজী। ভাগ্যিস লালজী আরো কবিতা পড়েন না, বা পড়ে রসসম্বাদন করবার মত বিদ্যে তাঁর পেটে নেই তাই রক্ষে। না হোলে তর্ক জুড়ে দিতেন আবার। তবে বাংলা কবিতা তিনি পড়তে পারেন না বা পড়েন না এমন কথা বললে মুখে দাঁড়ান লালজী।

এমনি একবার বিধানসভার লবীতে কোন এক 'রেপুর্টার-মোশাই'-এর কথার মুখে উঠেছিলেন তিনি—বাংলা কবিতা হামি সব পড়িয়েছি—রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্রদের কবিতা হামি ঢের পড়িয়েছি। বাংলার হামার দেশ আছে। বাংলাদের আদমীর ভেটে হামি বিধানসভায় আসিয়েছি। এ কোথা আপ্ ভুলিয়ে যাচ্ছেন কেন?

সরকারী সমর্থনে লালজীর জনালাময়ী বক্তৃতাও কয়েকবার শুনবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। কালো-হিন্দী ভাষার কাঁজালো সুরে নাসিকাও বক্তৃতা করেন তিনি। মাইকে বাওয়ার দরকার হয় না তাঁর কখনও। স্পীকার মহোদয়! হামার বাঙ্গাল দেশের মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্রজীনে,—বলে বক্তৃতা সুরু করে বলার তোড়ে কখন যে বিধানসভা দেশপ্রিয় পার্কের জনসভায় রূপান্তরিত হয় তা জানতেও পারেন না তিনি! বক্তৃতার মাঝখানে আবেগভরে হঠাৎ বলে বসেন,—বাপালাকে ভাই ঔর বোইন্!—অকস্মাৎ স্পীকারের হাতুড়ীর ঘারে চৈতন্য তাঁর ফিরে আসে—আপনি আমাকে সম্বোধন করে বলুন—স্পীকার চেঁচিয়ে ওঠেন। লালজীর থতমত ভাবটা কাটতে যে সময়টুকু, তারপর আবার সুরু করেন—স্পীকার মহোদয়! সদস্যদের হাসির রোলে লালজীর কণ্ঠস্বর ডুবে যায়।

[লালজী আজ আর ইহলোকে নেই। কথাটা যতই মনে হচ্ছে তাঁর অভাবটা—ততই কাঁটার মত খচ্ খচ্ করে বিঁধছে।]

শুদ্ধ লালজী কেন, বিধানসভায় আরও অনেক সদস্যই আছেন যাঁদের বিধানসভায় ঐ নিয়মভঙ্গের জন্যে মাঝে মাঝে হাতুড়ীর 'ঘা' খেতে হয়। স্পীকারের হাতুড়ী তাঁদের মাথায় পড়ে না বটে; কিন্তু হাতুড়ীর বাড়ি পড়ে বক্তার চেতনার ওপর। তাঁকে মনে করিয়ে দেয় এ মরবার মনুমেন্টের তলায় কিম্বা ওয়েলিংটন স্কোয়ারের জনসভা নয়। যেখানে তাঁরা বক্তৃতা করেন সেটা বিধানসভা। আর বিধানসভার সদস্যদের যা কিছু বলবার তা বলার নিয়ম স্পীকারের মাধ্যমে। 'বন্ধুগণ' কিম্বা 'ভাই ঔর বহিনো' বলে সম্বোধন করা বিধানসভার রীতিবিরুদ্ধ।

ঋণাত্মক ব্যয়

(দর্পণের অর্থনৈতিক ভাষ্যকার)

প্ল্যানিং কমিশনের হিসাব অনুযায়ী যথেষ্ট পরিমাণ ভোগ্য দ্রব্য উৎপন্ন হয় না। আমাদের কাঁচা মালের অভাব নেই, জনশক্তিও প্রচুর। কিন্তু এই সমস্ত কাঁচা মালকে ভোগ্য বস্তুতে রূপান্তরিত করার উপযুক্ত শিল্প ক্ষমতা এবং মূলধনের অভাব। এই শিল্প-ক্ষমতা এবং মূলধন বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন সামগ্রিক বিনিয়োগের বৃদ্ধি এর জন্য প্রয়োজন হয় বৈদেশিক সাহায্য বা ঋণ অথবা জাতীয় সঞ্চয়ের বৃদ্ধি। বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণ আমরা পাচ্ছি। কিন্তু আমাদের প্রয়োজনের তুলনায় তা যথেষ্ট নয়। কাজেই সঞ্চয়ের বৃদ্ধি দেশের উন্নয়নের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয়। সঞ্চয় বৃদ্ধি সম্ভব যদি দৈনন্দিন চাহিদার চেয়েও প্রবহমান উৎপাদন উদ্বৃত্ত হয়। বর্তমানে এই উদ্বৃত্ত যথেষ্ট নয়। এই উদ্বৃত্ত বৃদ্ধির জন্য হয় উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে, আর না হয় প্রবহমান ভোগ কমাতে হবে। কিন্তু নিরোজিত মূলধন বৃদ্ধি ব্যতিরেকে উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব নয়। অতএব প্রবাহমান ভোগ কমানো ছাড়া গত্যন্তর নেই।

কিন্তু ভোগ কমান সম্ভব কি উপায়ে? ভৌতিক প্রয়োজনের তুলনায় Physical necessity আমাদের দৈনন্দিন ভোগ বেশী ত নয়ই, বরং কম। এই অবস্থায় প্রবহমান ভোগ কমানো প্রচার কার্যের দ্বারা সম্ভব নয়। মূল্য বৃদ্ধিই একমাত্র উপায়। দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি হলেই ভোগের পরিমাণ কমে যাবে এবং সঞ্চয় বাড়বে। এই মূল্য বৃদ্ধি সম্ভব হবে ঋণাত্মক ব্যয়ের মাধ্যমে।

যখন সরকারী ব্যয় প্রাপ্তির অপেক্ষা বেশী হয়, তখনই ঋণাত্মক ব্যয়ের সৃষ্টি হয়। নোটের প্রচলন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। জনসাধারণের একাংশের ক্রয়-ক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ায়, দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি পায় এবং প্রবহমান ভোগের পরিমাণ কমে যায়। কথা উঠতে পারে যে, যখন ভৌতিক প্রয়োজনের তুলনায় আমাদের প্রবহমান ভোগ এমনিতেই কম, তখন মূল্য বৃদ্ধির মাধ্যমে আরও কমালে, জাতির বেঁচে থাকার পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু উপায় নেই। উন্নয়নের মূল্যে আমাদেরই দিতে হবে। শুধু বৈদেশিক সাহায্য আমাদের দ্রুত উন্নয়ন সম্ভব নয়।

তবে একটা কথা মনে রাখা দরকার। মূল্য বৃদ্ধি এবং মুদ্রা-স্ফীতি এক নয়। মুদ্রাস্ফীতির অবস্থায় মূল্য বৃদ্ধি আছে নিশ্চই, কিন্তু এই বৃদ্ধি ক্রমাগত উর্দ্ধ-মুখীন। অর্থাৎ যখন এক শ্রেণীর দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির ফলে অন্য শ্রেণীর দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি পায় এবং তার ফলে আর এক শ্রেণীর দ্রব্য মূল্যের বৃদ্ধি হয় এবং এইভাবে দ্রব্যমূল্য ক্রমাগত বেড়ে চলে, তখন হয় মুদ্রাস্ফীতির অবস্থা। এই অবস্থা আসতে পারে তখনই যখন প্রথম স্তরে মূল্য বৃদ্ধির ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায় না।

ঋণাত্মক ব্যয়ের মাধ্যমে যে দ্রব্য মূল্যের বৃদ্ধি, তার একমাত্র ফল উৎপাদন বৃদ্ধি। মূল্য বৃদ্ধির ফলে প্রবহমান ভোগ কমবে, ফলে ভোগ অপেক্ষা উৎপাদনের বৃদ্ধির হারে বর্ধিত উৎপত্তি মূলধন লগ্নীকৃত হয়ে উৎপাদনের বৃদ্ধি করবে।

যদি কোনও কারণে মূল্য বৃদ্ধিজনিত উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি না পায়, তাহলে মুদ্রাস্ফীতি অবশ্যম্ভাবী। কাজেই ঋণাত্মক ব্যয় সুনিয়ন্ত্রিত হওয়া প্রয়োজন। এইরূপ ব্যয়ের একমাত্র লক্ষ্য জাতীয় লগ্নীর বৃদ্ধি। ঋণাত্মক ব্যয় এইরূপ খাতে পরিচালিত করতে হবে যেন জাতীয় লগ্নীর বৃদ্ধি হয়।

বলা যেতে পারে যে, ঋণাত্মক ব্যয়জনিত মূল্য বৃদ্ধির ফলে হয়ত উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে, কিন্তু অন্ত-র্বর্তীকালে যথোপযুক্ত পুষ্টির অভাবে জাতি যদি মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহলে সুদূর ভবিষ্যতে সুদিনের মূল্য কি?

এইখানে ঋণাত্মক ব্যয়ের যথোপযুক্ত নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। উপযুক্ত চাহিদার অভাবে বহুল পরিমাণে উৎপাদন শক্তি অলস হয়ে পড়ে আছে। ন্যাশনাল সাম্পিল্স সার্ভের রিপোর্টে দেখা যায় যে, আ মা দে র দে শে র যে স ম স্ত স হ রে র লো ক-সংখ্যা ৫০ হাজারের উর্ধ্বে, সেই সমস্ত সহরে অর্থের উৎপাদন শক্তি চাহিদার অভাবে অলস হয়ে আছে। যদি ঋণাত্মক ব্যয়জনিত বর্ধিত ক্রয়-শক্তি এমন খাতে প্রবাহিত করা যায় যে, dormant চাহিদা জাগ্রত হয়ে উঠে অলস উৎপাদন শক্তি উৎপাদনে প্রবৃদ্ধ করে তোলে, তা হলে মূল্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা কম যাবে। বিশেষতঃ, যে সব ক্ষেত্রে অল্প সময়েই উৎপাদন বৃদ্ধি পায় সেই সব ক্ষেত্রে ঋণাত্মক ব্যয় সীমাবদ্ধ রাখলে মূল্য বৃদ্ধিজনিত কষ্ট অনেকটা কম হবে। কৃষির উন্নয়নের জন্য অর্থ ব্যয় করলে তার ফল অতি অল্প সময়েই পাওয়া যাবে। ছোট শিল্পেও অতি অল্প সময়ে উৎপাদন আরম্ভ হয়। তাছাড়া, ছোট শিল্প মূলতঃ শ্রমপ্রধান Labour intensive হওয়ায় অপেক্ষাকৃত অল্প মূলধনের প্রয়োজন হয়। ফলে, ছোট শিল্প-স্থাপনে ব্যয় করলে ঋণাত্মক ব্যয়ের ফুফল বহুলাংশে ঘরে হয়।

তারপর যথোপযুক্ত প্ল্যানিং এর প্রয়োজন। সুরুতেই বেশী ব্যয়ের প্রয়োজন নেই। প্রথম এমন খাতে ব্যয় করা প্রয়োজন, যেখানে অতি অল্প সময়েই ফল পাওয়া যাবে, অর্থাৎ অল্প সময়েই উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। সেই বর্ধিত উৎপাদন যেন ব্যয় না করে মূলধনে লগ্নী করা যেতে পারে। অর্থাৎ প্রথম উৎপাদন বৃদ্ধির ফল-স্বরূপ দ্রব্য মূল্য হ্রাস বন্ধ করে— প্রথম দিকে ঋণাত্মক ব্যয় ভোগ্য দ্রব্য উৎপাদনে সীমাবদ্ধ রেখে পরে ভোগ্য দ্রব্য উৎপাদন বৃদ্ধি সত্ত্বে হলে 'কাপিটেল গুড' উৎপাদনে নিয়োগ করা যেতে পারে। এইভাবে মূল্য বৃদ্ধির অনেকটা সীমাবদ্ধ রাখা সম্ভব।

কিন্তু গত কয়েক বৎসরে মূল্য বৃদ্ধি অব্যাহত গতিতে চলেছে। খাদ্য উৎপাদন কয়েক বৎসর মাত্র বৃদ্ধি পেয়েছিল, কিন্তু বর্তমানে আমরা দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন। ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠান ধ্বংসোন্মুখ। এই অবস্থায় ঋণাত্মক ব্যয় যথোপযুক্ত নির্দ্ধারিত হচ্ছে বলে মনে করা যেতে পারে কি?

ভারতের বাস্তুশিল্প

[শ্রীঅমৃতকুমার গঙ্গোপাধ্যায়]

আজ আমরা বোধ হয় ভুলিতে বসিয়াছি যে, ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ প্রকাশ ও পরিণতি হয়েছিল— ভারতের স্থাপত্য রূপে নানা অলৌকিক কীর্তিমন্দিরে,— যাহার আকর্ষণে আজও লক্ষ লক্ষ মানুষ পৃথিবীর নানা দেশ হইতে ভারতে আসিয়া ভারতের বাস্তুবিদ্যার অদ্ভুত নিদর্শন-গুলি নিরীক্ষণ করে—তাহার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ও জয়গান করে। ভারতের কীর্তিমন্দির-মালার উন্মেষে বিদেশী রূপ-রসিকদের অবিরত অভিযান আজও বিরত হয় নাই। ভারতের টুরিষ্ট রূপের পরিসংখ্যানে জানা যায় যে বিদেশী ভ্রমণ-কারীদের উৎসাহে প্রতি বৎসর ভারতের তহবিলে কয়েক কোটী টাকা সংগৃহীত হয়। স্বাধীন ভারতে আমরা কয়টি 'কোণারক' কয়টি 'কৈলাস-মন্দির', কয়টি 'তাজমহল', কয়টি 'গোল-গম্বুজ' রচনা করিতে পারিয়াছি— যাহার আকর্ষণে বিদেশী পর্য-টকরা তাঁহাদের প্রাপ্যাঞ্জলি অর্পণ করিতে ভাবীকালে ভারতে আসিবেন? ভারতের স্থাপত্য শিল্পের ইতিহাস অনু-শীলন করিলে দেখিতে পাই যে যুগে যুগে দেশে দেশে, নানা নূতন নূতন সৌধকীর্তি রচনা করে—ভারতের স্থাপত্য কলা-নিত্য নূতন পথে, নিত্য নূতন রূপে পরিণতি লাভ করেছে— যাহার তুলনা পৃথিবীর কলা-বিদ্যার ইতিহাসে মেলে না। ভারতের স্থাপত্য-কলা বহুতর ভারতে সমুদ্ভাষ্য করে— এমন সব মন্দির ও উদ্ভাসন সৌধমালা রচনা করেছে,—যবদ্বীপের বর-বুদরে, কাম্বুজ দেশের ও'কার বটের মন্দিরে,— ব্রহ্মদেশের শৈব ও বৌদ্ধ মন্দিরে, যাহাদের রূপ-সৌন্দর্য ও আলোকিক কল্পনা—পৃথিবীর "অষ্টম আশ্চর্যের" সংখ্যায় সৌরব লাভ করেছে।

ভারতের গৃহ নির্মাণ-বিদ্যা অবিচ্ছিন্ন ধারায় প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর জীবিত ছিল। আমরা প্রায়ই অভিযোগ করি যে, ইংরাজ রাজত্বের নির্মম নিষ্পেষণে ও শোষণে আমাদের শিল্পকলার ধারা সাঁর্ণ ও শুষ্ক হয়েছিল এবং আমাদের কলা-চর্চার ধারাবাহী সৌরব আমরা হারিয়েছিলাম। ইংরাজ আমলে নূতন দিল্লীর নূতন সহর নির্মাণের উপলক্ষে ভারতের জাতীয় কলাবিদ্যার অকৃত্রিম কণ্ঠ, ই, বি, হ্যাভেল সাহেব—এক তুমুল আন্দোলন করে তুলেছিলেন—এই কথা দাবী করে যে ভারতের স্থাপত্য-বিদ্যা ও অদ্ভুত কৌশল ও ঐতিহ্য কোন-কালেই নিঃশেষ হয় নাই—এবং বৃটিশ রাজত্বকালেও বৃটিশ ভারতের সীমায় বাহিরে দেশী জাতির এমন সামন্ত রাজাদের রাজ্যে—অনেক জীর্ণ কুলবী স্থপতি-বিশারদরা নানা রকম নূতন সৌধ কীর্তি রচনা করে— ভারতের স্থাপত্যের গৌরবের ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। বিলাতে নাম হইয়াছিল। ১৯১০ সালে হ্যাভেল সাহেব একাকী বহু আন্দোলন করে তুলে-ছিলেন—বিলাতের ভারতী শিল্প-কলা পরিষদ 'ইণ্ডিয়া সোসাইটির' মারফৎ—তাহার বহু বৃটিশ সহ-কার স্থপতি-বিশারদ মিঃ গর্ডন স্যাণ্ডারসেন মহাশয়কে ভারতের স্থাপত্যকলার অতীত নাম অবধার অনুসন্ধান করে সঠিক 'রিপোর্ট' দেবার নির্দেশ দেন। গর্ডন স্যাণ্ডারসেন সুষ্ঠুভাবে তাঁহার অনুসন্ধান সম্পূর্ণ করে একটি তথ্যবহুল সচিত্র রিপোর্ট প্রকাশ করিলেন ১৯১০ সালে; এই রিপোর্টে প্রমাণ হল যে, উত্তর ভারত ও রাজস্থানের নানা স্থানে ভারতের স্থাপত্য রীতির ধারা সবল শক্তি নিয়ে জীবিত ছিল এবং দেশী শিল্পীরা বিদেশী প্রভাব হইতে আত্মরক্ষা করিয়া তাহাদের পাঁচ হাজার বৎসরের স্থাপত্য বিদ্যার ধারা ও ঐতিহ্যের সম্মান রক্ষা করিয়া নানা মন্দির, রাজপ্রাসাদ, দরবার গৃহ, অতিথি-শালা, ধর্মশালা ইত্যাদি নানা জাতির গৃহ নির্মাণের কল্পনা নূতন নূতন রূপে প্রচলিত রেখে-ছিলেন এবং এই রিপোর্ট প্রকাশের ধারা কোন কালেই স্তব্ধ হয় নাই, নিরবিচ্ছিন্ন প্রবাহে আপনার গতি বহন করিয়াছে। তাহার চাক্ষুষ প্রমাণ স্বরূপ দেশী জীবিত সৌধ-মালার নানা নিদর্শনের প্রতিলিপি স্যাণ্ডারসেনের রিপোর্টে সংযোজিত হয়েছিল এবং তাহার সঙ্গে ছিল প্রত্যেক স্থাপত্যের নাম, ধাম ও হাতের কাজের নিদর্শন।

অনেকে বিশ্বাস করেন যে, ভারতের জাতীয় স্থাপত্যের ঐতিহ্যের ধারা ও প্রতিভা আজও জীবিত আছে। আচার্য অবনীন্দ্র-নাথ চিত্র রচনার ক্ষেত্রে প্রমাণ করিয়াছেন যে, ভারতের চিত্র রচনার প্রতিভা পুনরুজ্জীবিত করা যায় এবং তিনি সহস্রাব্দিক চিত্র রচনা করিয়া ভারতের চিত্র সৃষ্টির অমর প্রতিভার মৌলিকতা ও গৌরব হাতে-কলমে আমাদের চোখের সামনে উপস্থিত করিয়া দিয়া গিয়াছেন। কাব্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ প্রমাণ করিয়া-ছেন যে, ভারতের কাব্যাদর্শ ও কাব্য রচনার প্রতিভা নব যুগের উপ-যোগী রূপ নিয়ে নব নব আংগিকে জীবন্ত হইতে পারে। নাট্য-শিল্প-অনুরূপে প্রমাণ বর্তমান আছে। কিন্তু ভারতের দুর্ভাগ্য যে, স্বাধীন ভারতে—ভারতের স্থাপত্য-কলার বিরাট ঐতিহ্যকে যুগের উপযোগী নূতন রূপ গ্রহণ করে নব-জীবন লাভ করিবার কোনও ভারতের জাতীয় কলাবিদ্যার সুযোগ দেওয়া হয় নাই। ইতিমধ্যে কোটি কোটি টাকা খরচ করে অনেক নূতন সৌধাবলী ও কীর্তি-মন্দির, সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টার মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে কিন্তু এই সব সৌধ রচনায় ভারতীয় স্থাপত্যের ঐতিহ্য রক্ষার কোনও চেষ্টাই করা হয় নাই। জাতির এই নব জাগরণের যুগে ভারতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী স্থাপত্য-কুলবী স্থপতি-বিশারদরা নানা রকম নূতন পরিপ্রেক্ষিত দায়িত্ব গ্রহণ করিবার, রাজ্যপালক এবং স্বাধীন দেশের নগরবাসীর স্কন্ধে নাস্ত হইয়াছে। স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রপতি ও নাগরিক মহাশয়রা কত দিনে তাঁহাদের এই জাতীয় কর্তব্য পালন করিবেন তাহা প্রশ্ন করিবার অধিকার আমাদের সকলের নিশ্চয় আছে। কিন্তু এই

(সেষ্টম পৃষ্ঠায়)

বাঙ্গলা, বাঙ্গালী ঃ বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ

অরবিন্দ পোদ্দার

বাংলা দেশ। ভারতের সর্বাপেক্ষা সমস্যা-সঙ্কুল রাজ্য। বিগত কয়েক বৎসরে কত রূপান্তর, কত ঘটনাই ঘটে গেল; কত সমস্যার বিষ বাঙালী পান করল। কিন্তু বাঙালী নীলকণ্ঠ হতে পেরেছে কি?

এই জিজ্ঞাসার উত্তরে বাংলার ইতিহাস এবং সম্প্রতিকালের ঘটনাবলী মিছিলের মত মনের কোণে এসে ভীড় করে; এবং সঙ্গত সমস্যার স্তূপ সরিয়ে যে অনুভব মনে স্থির হয়ে প্রতিভাত হতে চায় তাহলো এক দুঃসহ সংকটের চেতনা; অনন্তহীন ভীরুতার বিচারে সে সংকেত সুলভ নয়। প্রতিটি বাঙালী, আর অন্যে তা-ই বা বলি কেন, সমগ্র দেশের সম্বন্ধেই যেন আজ একটিমাত্রই প্রত্যাশা—একটিখানি আজ্ঞা, একটি স্থিতিস্থাপক আকৃতি। ইতিহাসের অতীত কোন স্তরেই বোধ করি বাঙালীকে এতটা দীনতা হতে হয়নি, অথবা এতটা কাঙাল! অর্থে, সম্বল-হতে অতীতের জন্য এক দুঃসহ তিলমাত্র উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, বাঙালীর সম্পূর্ণ অন্য-এক পরিচয়।

আমি ঊনবিংশ শতাব্দীর কথাই বলছি। বাংলাদেশ সম্পর্কে অকারণ ভাবালুতা হতে চাই না, তথাপি এ কথা না বলে পারিও না, ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালী ঘর ছেড়ে ছুটে বেরিয়েছিল। অর্থাকর্ষণ করব না, জীবিকা-র্জনের প্রেরণা ছিল অত্যন্তিক; কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতের সামগ্রিক সাংস্কৃতিক পরিবেশের সঙ্গেই একত্রে বিচার করতে হলে চলবে না। প্রয়োজন ইউরোপীয় চিন্তাধারা-দীক্ষিত আজিতাধীন বাঙালীর মনের সেদিন যে স্পন্দন জাগি গেছিল, এবং বাংলাদেশের চিত্ত নবসৃষ্টির প্রেরণায় যেভাবে আলোড়িত হয়েছিল, ভারতবর্ষের আর কোন অঞ্চলেই সে ঘুমে সেই স্পন্দন জাগেনি। সেজন্য, সেকালে বাঙালীই নতুন আলো, নতুন আশা, নতুন প্রভাব, নতুন পথের সন্ধান দিয়েছিল; সমগ্র ভারত কৃতজ্ঞচিত্তে সে আলো গ্রহণ করেছিল। প্রশ্নায় বলেছিল, বাঙালী আজ যা চিন্তা করে, ভারত কাল তা চিন্তা করে। সেদিন সর্বত্র ছিল বাঙালীর সম্মানন। সেই দিক থেকে দেখলে বলা যায়, ঊনবিংশ শতাব্দী বাংলার বাঙালীর বিস্তৃতির যুগ, প্রসারের যুগ। যোগ্যতার স্বীকৃতিতেই হোক, অথবা জীবিকার্জনের আত্যন্তিক প্রয়োজনেই হোক, অথবা মহৎ আদর্শের আহ্বানেই হোক, বাঙালী সেদিন ছড়িয়ে পড়েছিল, তার কর্মের পরিধি আশ্চর্যজনক পরিধি অনেকটা বেশি প্রসারিত হয়েছিল। নিজের ঘর তাকে যে সুযোগ দিতে পারেনি, বাহির তাকে সে সুযোগ নিয়ে ডেকে নিয়েছে। শিক্ষায়, বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্যে, রুচির মার্জনায়, সংস্কৃত জীবনবোধের প্রকাশে আর সবকিছে প্রভাবিত ও চমকিত করার মত শক্তির অধিকার ছিল বাঙালীর।

তেমনি আবার যখন ঐ শতাব্দীরই শেষভাগে নতুনভাবে জেগে ওঠার আহ্বান এলো, চরম দুঃখবরণ ও অস্তত্যাগের ডাক এল, তখন বাঙালীই সর্বপ্রথম ছুটে গেছে, স্বপ্ন দেখল,—আদর্শের স্বপ্নের আকর্ষণে যে কত দূরের কত চিরহারী মৃত্যুর সঙ্গে প্রাণবিনিময় করে বাঙালীই তা সারা ভারতের নিকট প্রমাণ করল। এই দুঃখের ঐশ্বর্যের মধ্যেও সে সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল। রবীন্দ্রনাথ যে বলেছিলেন, "মানুষের কাছে চড়োন্ত শক্তির দাবী করলে তবেই সে আত্মপ্রকাশের ঐশ্বর্যকে উদ্‌ঘাটিত করতে পারে," এ কথার সত্য সেদিন বাঙালীই সপ্রমাণ করেছিল, নিজস্ব কর্মের ভেতর দিয়ে দেখিয়েছিল স্বপ্নের জোর কী দুর্বার! কিন্তু, এই আত্মত্যাগের পথে, স্বপ্নদেখার পথে, আদর্শের পানে ছুটে চলার পথে, কোন স্বার্থবুদ্ধি বা সংকীর্ণতা স্থান সে উন্মুখ হয়নি, কোন অকল্যাণবুদ্ধি তাকে পেছন থেকে আটকে ধরেনি। তার একটিমাত্রই প্রধান দেব; জাতীয় শিল্পের স্বপ্ন দেখল বাঙালী, কিন্তু কলকারখানার গড়ে ওঠল বোম্বাইতে। স্বপ্ন দেখার আর আত্মবিসর্জনের ব্যাকুল মুহূর্তেই বাঙালীর শিল্পায়নের বাস্তব কর্মপন্থা গ্রহণের অবকাশই হল না।

সে যাই হোক, এ পর্যায়টাকেও আমি বাঙালীর প্রসার যুগেই বলব। এ প্রসারটা অবশ্য বস্তুগত নয়, আত্মদৃষ্টির ঐশ্বর্যের প্রকাশ ও প্রসার। সৃষ্টির উন্মাদনায় বাঙালী ভিতরে রইল, রাজনৈতিক দিক থেকে ভারতের নব-অভ্যুদয়ের স্বপ্ন তার চোখে। এই স্বপ্ন তাকে তন্ময় করে রেখেছিল বলে, এবং এই তন্ময়তার মধ্যেই সে সৃষ্টির নতুন প্রেরণা পেয়েছিল বলে; তার জীবনসংকটের কোন প্রশ্ন তখনও তার চিত্তে এসে ঘা দিতে আরম্ভ করেনি, কোন সমস্যায় সে ব্যাকুল হয়ে ওঠেনি। তখনও তাকে জীবনের নতুন পরিক্রমার স্বাদ গ্রহণে আকণ্ঠ দেখি।

কিন্তু, এই অতীত ইতিহাসের পশ্চাদপটে যদি বাংলার বর্তমান জীবনকে দেখি, তাহ'লে প্রথমেই যে কথাটা মনে উদিত হয় তা হলো এই, বাঙালীর সম্মুখে সেই প্রসারের ক্ষেত্র আর নেই—বিষয়গত দিক থেকেও নেই, আঙ্গিক দিক থেকেও নেই। ঊনবিংশ শতাব্দীর যে সামাজিক আবর্ত বাঙালীকে সৃষ্টির তরঙ্গে নিক্ষেপ করেছিল, সেই আবর্ত নানা ঘূর্ণাবর্তের মধ্যদিয়ে চরম পরিণতি। এই বিভাগ যে শুধুমাত্র রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক দিক থেকে অখণ্ড বাঙালী জীবনকে খণ্ডিত-বিভক্ত করেছে, তা নয়; তার সর্বাপেক্ষা বড় আঘাত হয়েছে মনের ওপর। রাষ্ট্রীয় অনুশাসনে বাধা হয়ে দুপারের বাঙালী ভিন্ন ভিন্ন প্রায় বিপরীতমুখী, আদর্শের অনুগামী হয়েছে,—কিন্তু কোন পারেই বাঙালী জীবনে আনন্দ আসেনি। বরং নিরানন্দ ও অসহায় বোধে দুপারেরই বাঙালী জীবন তমসাচ্ছন্ন, বেদনায় আশ্বির, ঐশ্বর্যে পলাতক। রাষ্ট্রীয় দিক থেকে কেমন যেন একটা বঞ্চিত হওয়ার মনোবেদনা, যেন একটা নিকট অবাছিত সেই পূর্ববঙ্গাগত প্রত্যভাবিক হীনমন্যতা, যেন একটা উৎক্ষিপ্ত হওয়ার দুঃসহ বোধ বাঙালী জীবনকে অপরত করে রেখেছে। যে কোন তুচ্ছ ঘটনা বা কারণ অবলম্বন করেই যে আমরা অস্তিমাত্রায় স্পর্শকাতর হয়ে পড়ি, বিক্ষোভে কান্নায় ফেটে পড়ি, তার মূল বোধ করি এই চেতনায় নিহিত।

অর্থাৎ, আমাদের বিচরণভূমি অত্যন্ত সংকুচিত হলেই আমরা আত্মসচেতন হয়েছি বেশি; আর সীমা মানেই তো অহং বুদ্ধির স্বার্থবুদ্ধির বেড়াজাল। বাঙালীদের মধ্যেও এর লক্ষণের প্রকাশ দেখতে পেয়েছি, এবং সেটা এমন এক ঐতিহাসিক লগ্নে যখন তার অভিযাত্রি আমাদের জাতীয় সত্তাকে নানা দিক থেকে বিপন্ন ও দুর্বল না করে পারেনি। এখানে তার দু'একটি উদাহরণ দেব। পূর্ব বাংলার সাম্প্রদায়িক আবহাওয়ায় বিপন্ন বোধ করে যারা এপারে এসে আত্ম-ভোলা ভূস্বামীদের অবহেলা-রাখা জমিতে প্রাণসত্তার করেছিল, তখন তাদের সম্পর্কে বাংলা দেশেরই প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী একটি ইংরেজী মাসিকপত্রকে লিখতে দেখেছি: "পূর্ব বাংলার একদল প্রভাবশালী নেতৃত্বের পশ্চিমবাংলার আরও চল্লিশ পঞ্চাশ লক্ষ উদ্বাস্তুর পুনর্বাসনের প্রস্তাব করিয়াছেন, এবং সে অনুযায়ী পরিকল্পনাও প্রস্তুত করা হইতেছে। ইহা প্রতিরোধ করিতেই হইবে। ক্ষুন্নিরন্ন জনাকীর্ণ পশ্চিম বাংলার যদি পূর্ব বাংলার সম্ভ্রান্ত-আলী লক্ষ উদ্বাস্তুর বসবাসের ব্যবস্থা করা হয় তাহা হইলে এই প্রদেশের আদি বাসিন্দাদের রাজনৈতিক জীবন এবং সমগ্র প্রদেশের অর্থনৈতিক জীবন গুরুতররূপে বিপন্ন হইয়া পড়িবে। ইহাতে উভয় পক্ষে অসন্তোষ ধূমায়িত হইয়া উঠিবে, এবং চিত্ত অস্থির পরিণতি দেখা দিবে। আসামে আজ যে পরিস্থিতি দেখা দিয়াছে, এখানেও ইহার চেয়ে একশত গুণ ভয়াবহ পরিস্থিতি দেখা দিবে।" তৎপর বাংলা সরকারকে লক্ষ্য করে পচটি ঘোষণা করেছিলেন, "এই সরকারকে সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মুখ্যত পশ্চিম বাংলার আদি বাসিন্দাদের স্বার্থরক্ষার জন্যই ইহার অস্তিত্ব; মনে রাখিতে হইবে, তাহাদের প্রতিই ইহার প্রথম এবং প্রধান দায়িত্ব; মনে রাখিতে হইবে, উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধান কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তব্যাধীন।" (আগষ্ট ১৯৫০ সাল)।

বলা বাহুল্য, বাংলা দেশের চরম অসহায়তার দিনে বাংলা দেশ থেকেই যদি এমন আত্মঘাতী অবৈজ্ঞানিক বাণী উচ্চারিত হয়, তবে তার মত বেদনাদায়ক ও লজ্জাকর আর কিছুই হতে পারে না। সুখের কথা, এই সর্বনাশা লজ্জাকে আমরা জয় করতে পেরেছি। কারণ, বাঁরা ঐরূপ কথা ঘোষণা করতে পেরেছিলেন তাঁরা অচিরেই পরম বিস্ময়ে উপলব্ধি করেছেন যে, যে পূর্ববাংলা তাদের নিকট অবাঞ্ছিত সেই পূর্ববঙ্গাগত অনেক পতিত অনুর্বর জমিতে সবেশ সোনার হাসি ফুটে ওঠেছে, অর্থনীতিক কাঠামো বিপর্যস্ত হওয়ার পরিবর্তে নানাভাবেই পুষ্ট হয়েছে, সাংস্কৃতিক স্বার্থ সংরক্ষিত তো বটেই উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পেয়েছে।

আমার দ্বিতীয় উদাহরণ, বঙ্গের দুই অংগেকার বঙ্গ-বিহার সংবৃদ্ধির প্রচেষ্টা। অবশ্য, একথা স্বীকার্য যে, বাংলাকে বাঁরা বিহারের সঙ্গে একীকৃত করতে চেয়েছিলেন তাঁদের অন্তরে বাংলার অস্তিত্ব অবশ্যই, তার ঘনায়মান সংকটে, এবং বাঙালীর কর্মক্ষেত্রের অস্বাভাবিক সংকোচনের প্রশ্ন বর্তমান ছিল; তাঁদের মনেও সেই আকুতিই বিরাজমান ছিল,—একটা আস্তিত্ব, একটা স্থিতি, একটা বলিষ্ঠ আত্মপ্রতায় স্থিত হওয়া তাঁদের বিযুক্তাচরণে করে কার্যত বাঁরা ঐ প্রস্তাবকে বাতিল করে দিলেন তাঁদের অন্তরেও বাংলা দেশের প্রতি গভীর ভালবাসা এবং তার সমস্যার প্রতি গভীর অভিনিবেষই ছিল। তাঁদেরও এই আকুতি,—বাংলা যেন বর্তমান সমস্যার ঊর্ধ্বে ওঠে স্বমর্যে স্বকেন্দ্রে স্বপ্রতিষ্ঠায় স্থিত হয়। উভয় পক্ষের আকুতির ঐক্য থেকে সহজেই অনুমান করা যায়, সমস্যার মূলে কত গভীরে, অনুভব ও বোধের ক্ষেত্রে কত সুগভীরাশ্রয়ে!

প্রশ্ন উঠতে পারে, বর্তমান কালে আমরা যে ভৌগোলিক সীমানার প্রশ্নে অথবা ভাষার প্রশ্নে এতটা উদ্বিগ্নতা দেখে পড়েছি, সেটা বুদ্ধিবৃত্তির মানদণ্ডে কতটা সত্য বা গ্রাহ্য? আমার বক্তব্য রাষ্ট্রীয় পরিপ্রেক্ষিতে তার সার্থকতা কতদূর?

আমার মনে হয়, এ সমস্যার সীমানার আমাদের বাংলা দেশের রাষ্ট্রীয় সামাজিক এবং ব্যবহারিক জীবনচর্যার সমগ্র চিন্তাটি সম্বন্ধেই রাখতে হবে; এবং আধুনিক জীবনবিজ্ঞানে তা কিভাবে পুর্ণতা লাভ করতে পারে সে সম্পর্কেও সচেতন থাকতে হবে। পূর্বেই বলেছি, এ যুগটা আমাদের আত্মসংকোচের যুগ। আমাদের সম্মুখে প্রসারিত হওয়ার অবারিত প্রান্তর আর উন্মুক্ত নেই। সম্ভবত রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে আমরা কিছুটা পরাজিতও। এটা কোন অভিমানের কথা নয়, কোন বিদ্বেষের কথাও নয়। এটা আধুনিক জীবনের বাস্তব সত্য; সে সত্য অস্বীকার করার কেন্দ্র-উপ্তর নেই।—তাকে স্বীকার করে নিয়েই আমাদের বর্তমানকে নিয়ে আলোচনার অগ্রসর হতে হবে।

আমি জানি, বর্তমান দুর্দান্ত অগ্রহত হলেও রবীন্দ্রনাথ আমাদের দেশের মানুষের মধ্যে প্রাণশক্তির যে অভিপ্রকাশ দেখে ছিলেন, সে সত্য আমরা তার অধিকারী; এবং অধিকারী বলেই বলি, পরাজিত হওয়া মানেই নিঃশেষিত হওয়া নয়, কর্মক্ষেত্রের সংকোচন মানেই কর্মের জগৎ থেকে চিরকালের জন্য বিদায় নেওয়া নয়। মনে হয়, বাঙালী জীবনে এই লগ্নিরই, এই আঘাতের প্রয়োজন ছিল। আর, এই আঘাতটা যদি সত্য হয়ে থাকে তো আমাদের আত্মসংরক্ষণের প্রচেষ্টায় অত্যধিক সচেতন হওয়া, সীমার বোধ,

(৮ম পৃষ্ঠার দ্রষ্টব্য)

গ্রন্থ পরিচয়

মানুষের জন্য সমাজ, না সমাজের জন্য মানুষ ?

—সবকুমার নাগ

The Way to Co-operative Socialism — Amlan Datta. The Radical Humanist—Price Re. 1.

কেমন করে বাঁচব ?

যুগে যুগে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হয়েছে। যুগে যুগে এই প্রশ্নের উত্তরও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রশ্নটা একই থেকে গেছে। কিন্তু এক যুগের উত্তর অন্য যুগে বাতিল হয়েছে। নতুন উত্তর দেওয়া হয়েছে হচ্ছে এবং হবেও। কারণ সমাজের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবন যাত্রাও জটিল হয়ে উঠছে। তাই মাঝে মাঝে সমাজের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধটা বিচার করতে হচ্ছে। এইভাবে যুথবদ্ধ আদিম মানুষের যুগ থেকে আমরা পুঁজিপতির সমাজ ব্যবস্থার পৌঁছেছি। প্রস্তরযুগ থেকে আণবিক যুগ।

কিন্তু সমস্যা সেই থেকে যাচ্ছে? কেমন করে বাঁচব? পুঁজিপতির সমাজ ব্যবস্থারও আমাদের মন উঠছে না। যে জায়গায় এই ব্যবস্থা চালু হয়েছে সে সব জায়গা সম্বন্ধে নানা কথা শোন যাচ্ছে। প্রশ্ন মানুষের জন্য সমাজ? না সমাজের জন্য মানুষ? এর সমাধান অতি জটিল। তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে, প্রথমে মানুষ এবং সব কিছুই তার কল্যাণের জন্য। এ কথাও আপত্তি উঠতে পারে হয়ত। নাও উঠতে পারে। কিন্তু পুঁজিপতির সমাজে দেখা যাচ্ছে যে, মানুষের ভূমিকা গৌন হয়ে পড়েছে। হয়ত পথপ্রদর্শক প্রয়োগ নির্ভুল নয় বা যাঁরা দেখছেন তাঁদের দৃষ্টি মোহমুক্ত নয়। কিন্তু তাঁদের কথা ধরেও যদি নেওয়া যায় তা হলে প্রশ্ন ওঠে পুঁজিপতির সমাজ যদি ব্যক্তিগত মানুষের কল্যাণের যথেষ্ট উপযোগী না হয় তাহলে কি হবে ?

তত্ত্ব কিম ?

'কেমন করে বাঁচব ?' এ প্রশ্নের সঙ্গে 'কেমন সমাজে বাঁচব' এ প্রশ্ন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মানুষ যখন সামাজিক জীব তখন মানুষকে সমাজে রেখেই দেখতে হবে।

মানবেন্দ্রনাথ রায় এ নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করেন সম্ভবতঃ ১৯৫০ সালে দেরাদুন ক্যাম্পে। সেই আলোচনার ভিত্তিতে শ্রীঅমলান-দত্ত 'র‍্যাডিক্যাল হিউমানিস্ট সাপ্তাহিকে' কয়েকটি ধারাবাহিক নিবন্ধ প্রকাশ করেন। তাঁর রচনাগুলি সম্প্রতি পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হয়েছে। প্রত্যেক বুদ্ধিজীবী এবং সমাজ সেবীর কর্তব্য হচ্ছে সেগুলি মনোযোগ দিয়ে পাঠ করা এবং আলোচনা করা।

দেখা গেছে সব সমাজই কমবেশী সহযোগিতা বা সমবয়ের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে আছে। সে সমবায় অসম্পূর্ণ। কেন না, সমাজের মানুষরা একে অন্যের সঙ্গে যে সম্বন্ধসূত্রে বাঁধা পড়ছে তার কিছু সর্ত রয়েছে—যা কখনো ধরা যায়, কখনো ধরা যায় না। এই সর্তগুলি কখনোই সন্তোষজনক নয়। এতে যারা অসন্তুষ্ট হচ্ছে তারাই ভাবছে তাদের শোষণ করা হচ্ছে। অতএব—শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চলছে। উন্নততর সামাজিক সহযোগিতার জন্য সংগ্রাম চলছে। এই সংগ্রামের ফলে কিছু কিছু সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে বটে কিন্তু উন্নত সমাজ ব্যবস্থার আদর্শ থেকে তা বহু দূরে। অতএব কোন সমাজই শুধু শোষণের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে না। প্রতি সমাজ অতীতের সহযোগিতা এবং শোষণের উত্তরাধিকারে কিছু কিছু পায়। কেননা মানুষ যখন কোন এক সময়ে বর্তমান সুবিধা রক্ষা করার জন্য সাধারণভাবে বাধা তখন উচ্চতর সমাজ ব্যবস্থার ব্যাপারেও তারা ক্রমে অগ্রহশীল হতে পারে। এমন কি সুবিধাগ্রস্ত শ্রেণীর লোকেরাও এতে অংশ নিতে পারে। কিন্তু এই শ্রেণীর সহযোগিতা কি শ্রেণী সংগ্রামের বিরোধী নয় ? প্রীদত্ত বলেছেন, ঘুণা ও ধ্বংসাত্মক কার্যের মধ্যে দিয়ে যে বিপ্লব আসে তাকে কতকগুলো জিনিষের সঙ্গে মানিয়ে নিতে হয়। কিন্তু মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ পাততাবার ইচ্ছা চিরন্তন বাঁধও এ পথে ভয় আছে, লোভ আছে। কিন্তু কোন সামাজসেবাই সামাজিক ন্যায়ের জন্য সংগ্রামকে বিনা প্রয়োজনে তিক্ত করতে বা ধ্বংসের এমন শক্তিশালী অস্ত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে চাইবেন না।

সমবায়ের নীতির সঙ্গে কারোর বিরোধ নেই সম্ভবত এবং সমবায়ী সমাজের অনেক সমর্থকও আছেন। এর সম্বন্ধে সব চেয়ে প্রচণ্ড অভিযোগ যে—এ অতি সংক্ষিপ্ত। মাত্র ৩৫ পৃষ্ঠার মধ্যে সব কিছু আলোচনা করা হয়েছে। আশা এবং অনুরোধ করা যাচ্ছে অমলান দত্ত পরে এ নিয়ে আরও বিস্তারিতভাবে এবং অনুরূপ সর্বজনবোধ্য লেখা লিখবেন।

স্থলপরিসরে সমবায়ী সমাজের বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নয়। অমলান দত্ত চাষ আবাদ সম্বন্ধে যা বলেছেন তা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, আমাদের দেশে এ সম্ভব নয়। কারণ আমাদের দেশে জমির আয়তন অতি ক্ষুদ্র। একত্রিত করলে তার আয়তন বাড়তে পারে বটে। কিন্তু ক্ষুদ্রতর কারণ জমির ওপর জনসংখ্যার অত্যধিক চাপ। এদের অনন্য জীবিকা সম্পাদনের ব্যাপারটি কিন্তু অত সরল মনে হয় না।

গণতান্ত্রিক সমাজে জমিমত পোষণ করার অধিকার সব চেয়ে মূল্যবান। সে অধিকার কি সীমিত করা হবে? ধরা যাক একজন মানুষ কোন বিষয়ে একটা প্রস্তাব আনলেন। প্রস্তাবটা হয়ত সঠিক নয়। তার প্রস্তাব নাকচ হল। যে প্রস্তাব গৃহীত হল তাতে তার বিরুদ্ধে মতের কিছু কথা আছে হয়ত। এবং সমাজের পক্ষে তা ঠিক। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যার প্রস্তাব বাতিল হল সে কি গৃহীত প্রস্তাব কার্যকরী করতে পারবে? স্বিতীয়তঃ সব প্রস্তাবই সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হবে না। যারা বিরুদ্ধতা করবেন তাদের মনোভাব সমবায়ী সমাজ ব্যবস্থার পক্ষে ক্ষতিকর হবে কি? শ্রীঅমলান দত্ত এ দিক দিয়ে বিশেষ আলোচনা করেন নি। তার আলোচনা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ। তবে তাঁর লেখার তিনি মতবিরোধের কথা বলেছেন। তার ধ্বংসাত্মক দিকটারও ইঙ্গিত করেছেন। বিকেন্দ্রিত সমাজে মত বিরোধটা হয়ত স্থায়ীভাবে সীমিত থাকবে—তাঁর রচনা থেকে এর বেশী কিছু বোঝা যাচ্ছে না।

অথচ তিনি বিরোধী দলের কথা বলেছেন। সমবয়ের নীতি মেনে নিয়েও এই বিরোধের ভিত্তি কি হবে? রাজনীতি পার্টিহীন হবে কি করে?

কিন্তু একটা নতুন সমাজ ব্যবস্থার কথা বলতে গিয়ে অমবয় ছাড়াও যে সব সমস্যা রয়েছে সেগুলিরও আলোচনা প্রয়োজন। এ সম্বন্ধে কিছুই ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া হবে না—ভিন্ন মত প্রকাশ ও পোষণ সম্ভব হবে। কিন্তু দলগত সঙ্কীর্ণতা, গোঁড়ামী, রেষারেষি এগুলো কিভাবে আয়ত্তে আনা যাবে। কিছুটা যুক্তি দিয়ে বুদ্ধিবৃত্তি চর্চা করায় অনুপ্রেরণা দিয়ে কিন্তু মানুষের অন্তর্নিহিত চারিত্রিক প্রকৃতি? মানুষকে যখন একটা ইউনিট ধরা হবে তখন তার এ সমস্যাগুলি অবজ্ঞাত থাকা উচিত নয়।

অমলান দত্তের আবেদন মানবিক। তিনি সমবায়ী সমাজ ব্যবস্থা এই দৃষ্টিতে বিষয়কে প্রণয়নেছেন ভাবে সরল করে তিনি উপস্থিত করেছেন। বাংলাদেশের তথা ভারতের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় নিয়ে চিন্তা করেছেন প্রচুর। তাঁর ভাষা অতি স্বচ্ছ সর্বজনবোধ্য। কর্তব্য এ নিয়ে আলোচনা করা, চিন্তা করা এবং এ নিয়ে কাজ করা।

বাস্তুশিল্প

(পঞ্চম পৃষ্ঠার পর)

প্রশ্নের উত্তর মিলিবে কবে? এই সমস্যা আজ সমস্যা হইতে কম দারিয়পূর্ণ ও কম গুরুত্বপূর্ণ নহে। নবীন ভারতের সৌধ রচনা কি চিরকাল বিদেশী ভাষায় অন্ধ-রূপে চলিবে, না ভারতীয় ভাষার তাহার প্রকাশ হইবে—এই প্রশ্নের উত্তর আমরা প্রত্যেক ভারতবাসীর নিকট সত্বর দাবী করিতেছি। ভারতের রাষ্ট্রভাষার পক্ষে মুখুল বাদানুবাদ চলিতেছে—কিন্তু হ্যাভেল সাহেবের পর ভারতের স্থাপত্যের ভাষা সম্বন্ধে কোনও সাড়ই এখনও পর্যন্ত উত্থাপিত হয় নাই। ভারতের স্থাপত্যকে বাদ দিয়া কোনও "সর্বাঙ্গীন কল্পনা" সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না। এই কথা স্মরণ রাখিবার অত্যন্ত আবশ্যক আছে।

মোটর গাড়ী
ট্রাক, বাস
ট্যাক্সি
সহজ কিস্তিতে
ও
মূলভে
কেনার জন্য
অনুসন্ধান
করুন ঃ
ক্যালকাটা
ক্রেডিট কর্পোরেশন লিঃ
৩৬, চৌরঙ্গী রোড
কলিকাতা
টেলিফোন নং ঃ ২৩-৪৬৭১

বাংলার ফুটবলের স্বার্থ উপেক্ষায় নববিধান রচনা

আই এফ এর সৃষ্টিছাড়া আয়োজন

আলোক সুন্দর

কলকাতার ফুটবল মাঠের খবর রাখেন? আসন্ন মরসুমে সেখানে কোন্ দৃশ্যের অবতারণা ঘটতে চলেছে, তার? যদি না রাখেন তাহলে সেই অনাগত দৃশ্যের পূর্বাভাষ দিয়ে জানিয়ে রাখছি যে, বাংলার ফুটবল মেহগজ ক্ষেত্র হিসেবে কলকাতার ময়দানকে প্রস্তুত করে তোলার আয়োজন সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে।

সেখানে ফুটবল খেলা এবারও বথারীতি হবে কিন্তু সে আসরে থাকবে না বাংলার ফুটবলকে গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি। ভারতীয় ফুটবলের পথিকৃৎ বাংলা, সর্ব-ভারতীয় ক্রীড়াক্ষেত্রে নায়কের ভূমিকা যার করায়ত্ত ছিল একদা। কিন্তু সেকাল বিগত। ক্রীড়া জগতের কয়েকজন স্বার্থান্বেষী কর্মকর্তার হাত ধরেই বাংলার ফুটবলের প্রভাবাধ্যায় ব্যবস্থা আসন্ন হয়েছে, অতএব শ্মশান-যাত্রার পালা সুরু হলো।

বাংলাদেশে ফুটবলের ভাগ্য নিয়ন্ত্রক আই এফ এ স্থির করেছে যে, আগামী তিন বছরে লীগ প্রতিযোগিতার ওঠানামা বন্ধ থাকবে। লীগই স্থানীয় দলগুলির প্রধান খেলা। স্থানীয় খেলোয়াড়দের প্রধান-তম প্রতিযোগিতা, লীগ উপলক্ষ্যে সুদূর সম্প্রসারণ ঘটে কলকাতার ফুটবল খেলা আসরে, লীগ প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে বাংলার বিভিন্ন বহু খেলোয়াড়ের ক্রীড়ামানোন্নয়নের পথ প্রশস্ত হয়। কিন্তু সেই প্রধানতম অনুষ্ঠানের আকর্ষণ, গুরুত্ব ও কার্যকারিতা কমিয়ে ফেলতে স্থিরধী বথা করে দি ফুটবল নিয়ন্ত্রণ সংস্থা আই এফ এ। খেলাধুলোর খেলাকে বাদ দিয়ে ধুলো নিয়ে মাতামাতি করার অনেক নজীর আছে এই সংস্থার কর্মপদ্ধতিতে, ওঠানামা বন্ধের বিধানে সেই নজীরের সংখ্যাই বৃদ্ধি পেলো মাত্র।

লীগে ওঠানামা বন্ধ থাকার বাংলাদেশের ফুটবলের মান যে কেন নামবে তার কারণ অত্যন্ত স্পষ্ট। কোনো অঞ্চলের খেলার সামগ্রিক মানোন্নয়নের চিন্তা লীগ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের মূলে অন্তর্নিহিত থাকে। এই অনুষ্ঠান মূলতঃ স্থানীয় ক্রীড়াবিকাশের প্রতিযোগিতা, তাঁরা ব্যাপকভাবে যোগ দেন এই ক্রীড়ানুষ্ঠানে বিভিন্ন প্রতিযোগী দলের প্রতি-নিধিত্বের অধিকার নিয়ে। যোগ দিয়ে তাঁরা ভাল খেলার চেষ্টা করেন আশা ও আশঙ্কায়। আশা ওপরে ওঠার। আশঙ্কা নেমে যাবার। ভাল না খেলতে পারলে ওপরে ওঠার সম্ভাবনা হারিয়ে যায়; অবনমন হয় অবশ্যম্ভাবী।

ওপরে ওঠার প্রচারণা অথবা নীচে নেমে যাবার শঙ্কাকে কেন্দ্র করে দলগুলির মধ্যে সৃষ্টি হয় তীব্র প্রতিস্পর্ধিতা, যে প্রতি-স্পর্ধিতা ব্যাপকভাবে স্থানীয় খেলোয়াড়দের ক্রীড়া মানোন্নয়ন সহায়তা করে। সর্বদেশে সর্বকালে এই নীতিই অনুসৃত হয়েছে, দুর্বল ব্যক্তিকমের নজীর খাড়া করা হলো আমাদের এই বাংলাদেশে। ওঠানামা বন্ধ রেখে দুই প্রতিযোগিতাকে নিছকই এক জোলো অনুষ্ঠানে পর্যবসিত করা হয়েছে, আগামী তিন মরসুমে বাংলার নিজস্ব খেলোয়াড়েরা ভাল খেলার প্রেরণা পাবেন না, পাবেন না কোনো ভাগিদ অনুভব করতে, ফলে এখানকার ফুটবলের মান নেমে যাবে ধাপে ধাপে। পৃথিবীর কোনো দেশে কোনো কালে এমন ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছে বলে শোনা যায় নি। বাংলার পথ সর্বজন অনুসৃত পথ নয়, এই পথে বাংলাদেশকে চলতে বাধ্য করেছেন যাঁরা তাঁরাও সন্দিহাদ্রাসের গোষ্ঠীভুক্ত।

কলকাতার ফুটবল জগতের মালিক যে সংস্থা সেই সংস্থার কর্মধারদের মধ্যে অনেকেই অ-খেলোয়াড় আর বাকী কজন এককালে খেলোলা করলেও অধুনা ভোল্ পালটিয়েছেন ঠিক যেন একজাতের নির্বাচিত দেশ-কর্মীদের মন্ত্রীর মসনদে বসার মতোই। তাঁদের খামখেয়ালীতে বাংলার ফুটবলের অবস্থা দাঁন থেকে নাঁনতর হতে চলেছে। আজ-কের অবস্থা এমনই যে, আস্ত রাজা ফুটবল প্রতিযোগিতাকে ছেলে খাংলার মুখ রক্ষার জন্যে বাংলো-দেশকে অসংখ্য অব্যাপালী খেলোয়াড়দের দাক্ষিণ্য ভিক্ষা করতে হয়। এই সব অ-খেলোয়াড় কর্ম-কর্তাদের চক্রান্তে দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়েছে কলকাতার ফুটবল মাঠের সর্বস্তরে। এখানে লীগ প্রতি-যোগিতার পরেই ছাড়াছাড়ি করা হয়, খেলার ফলাফল গড়াপেটার গোপন বন্দোবস্ত চলে চুটিয়ে; খেলার নামে খেল্ দেখানো হয় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষে, ফলে ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে কলকাতার মাঠ আজকাল এক অসাধু ও বিবেকহীন শ্রেণী সৃষ্টির সহায়তা করছে। খেলোয়াড় তৈরী হবার অনুকূল পরিবেশ সেখানে নেই, দুর্নীতির চাপে এই খেলার মাঠ পরিণত হয়েছে বিরাট রাজের গোলাপায়। ওঠানামা বন্ধের সিদ্ধান্তে সেই আবর্জনা স্তূপের ভারই কিছু বাড়লো, পরিস্থিতি হয়ে গেল আরও প্রতিকূল, যার ফলে বাংলার নিজস্ব খেলোয়াড় তৈরী হওয়ার বেটুকু সম্ভাবনা এতোদিন অবশিষ্ট ছিল তাও হয়ে গেল জলতরঙ্গিত।

লীগে ওঠানামা বন্ধের ব্যবস্থার বাংলার ফুটবলের অগ্রগতির অনিবার্য পরিণতি এলেও এই ব্যবস্থার অনেক ক্লাবের কর্মধারদের দুশ্চিন্তার অবসান হয়েছে। তাঁদের অনেকেই বলে পা না দিয়েও ফুটবল অনুরাগীর মর্যাদা পেয়েছেন, তাঁদের একমাত্র উপেক্ষা হলো ঠাট্ বজায় রাখা। তাঁদের ক্লাব ভাল খেলুক, নীচের তলা থেকে ওপরে উঠে আসুক, বাংলা লী খেলোয়াড়দের ক্রীড়া-মানোন্নয়ন ঘটুক তা তাঁদের কাম্য নয়।

তাঁরা গোপনে পেশাদারী প্রথার প্রচলন দিয়ে আজ নিজেদের কৃতকর্মের পরিণতি থেকে মুক্তি চাইছেন। ওঠানামা বন্ধ থাকলে অনেক খেলোয়াড়ের আর্থিক দাবীকে তাঁরা উপেক্ষা করতে পারবেন, নিজেদের দলগুলিকে দক্ষিণাহীনরূপে গড়ার উৎসাহও খেলোয়াড়দের দোরে দোরে ধর্ণা দেবার জন্যে তাঁদের আর পরিশ্রম করতে হবে না। অথচ যে যেখানে ছিল সেখান থেকে স্থানচ্যুত হবে না। দল গড়তে পরিশ্রমের প্রয়োজন নেই, পয়সা খরচের বালাইও নেই, সুতরাং নানান কামেলার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে অনেক ক্লাব-কর্তা খুশীই হয়েছেন, তাতে খেলাটা লাভবান হলো কিনা, দেশের স্বার্থ জলাঞ্জলি দেওয়া হলো কিনা তা তাঁদের লক্ষ্য নয় কারণ বহুদের, বহুবর চিন্তার এ'রা উর্ধ্বে নন। এ'রা অনুরক্ত নন খেলার, নন খেলাধূলার মহান আদর্শেরও, আসলে এ'রা ভাল-বাসেন নিজেদের আর নিজেদের স্বার্থকে।

তিন বছরের জন্যে ওঠানামা বন্ধ রাখার এই যে পরিকল্পনা তা কোনো বিশিক্ষত প্রয়াস নয়। গত ক বছর ধরেই এই পরি-কল্পনা গ্রহণের প্রস্তুতি চলছিল। ১৯৫২ সালের পর থেকে নানান অজুহাত, ছল-ছুতোয় ওঠানামা বন্ধ রাখার বারে বারে তোড়জোড় হয়েছে। ১৯৫২ সালে কোনো দলকে নামতে হয় নি, ৫৩ সালে লীগ প্রতিযোগিতাই পরিত্যক্ত হয়ে যায়। আর গত বছরেও গৃহীত সিদ্ধান্তের জোরে অক্ষম দলগুলো অবনমনের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। দুষ্ট লোকে বলে যে, নিরপ্তন সংস্থার এক বেতনভুক্ত কর্মচারী যে ক্লাবের মাতব্বর এবং তাঁর সহোদর যে ক্লাবের কর্মধার, প্রথম ডিভিসনভুক্ত সেই দলের সহিষ্ণুতাই ওঠানামা বন্ধ রাখার অন্যতম প্রধান কারণ, এই দলটিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যই ঘুরে-ফিরে আসে এই আয়োজন—যেমন আয়োজন করা হয়েছিল ইংরেজ আমলে ইউরোপীয় ও এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান দলগুলির স্বার্থে।

দুষ্ট লোকের অভিমত ফেলে দেবার নয় আর এ কথাটা খাটি যে, দল হিসেবে যারা দুর্বল, অশক্ত, অক্ষম, যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে লীগ সবলের সঙ্গে একত্রে থাকার দাবী প্রতিষ্ঠিত করার সাহস যাদের নেই তারাই তৎপর হয় সহজ পথ ছেড়ে ওঠানামা বন্ধের প্রস্তাব পাশ করিয়ে খিড়কির পথ আবিষ্কার করে নিতে! এবং এই সুড়ঙ্গ পথ আবিষ্কারে তাদের সাহায্য করতে কলকাতার সমাই প্রস্তুত হয়ে থাকেন এক শ্রেণীর লোক বাঁধের সপোর্ট লীগ প্রতিযোগিতার প্রত্যক্ষ কোনো সংযোগ নেই, অথচ আই এফ এ'র অভিনব ব্যবস্থায় তাঁরা নিয়ন্ত্রণ সংস্থার কর্মপরিষদের সদস্য পদে আসীন—যথা, বিশ্ব-বিদ্যালয় স্পোর্টস কন্ট্রোলবোর্ড, অফিস স্পোর্টস ফেডারেশনের, বেফারীজ এসোসিয়েশনের ও জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রতিনিধিরা। বহু বড় দল যারা, যারা শেখলে নাম কিনেছেন, সাধারণকে সাক্ষী রেখে।

বাঙ্গলা ও বাঙ্গালা

(কণ্ঠ পৃষ্ঠার পর)

সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়াটাও তেমনি সত্য। কারণ, আঘাতের স্বরূপে নির্ণীত না হলে নিরাময়ের উপায় চিন্তা করা যায় না। এই সীমার দাঁড়িয়েই এ যুগের বাঙ্গা-লীকে ভাবতে হবে কোন্ পথে এই সাঁমাকে ছাড়িয়ে পুনরায় ছড়িয়ে পড়া যায় দূরদূরান্তে, কীভাবে তার সৃষ্টিশীল ভূমিকাকে পুনরুজ্জীবিত করা যায়।

এ কথা নিঃসন্দেহ যে, বাংলা দেশের ভৌগোলিক সীমায় রুদ্ধ আবদ্ধ থেকে এ-কালের বাঙালীর পক্ষে নতুন ভারতবর্ষের জীবনে অভিনায়কের করা সম্ভব নয়, উন-বিংশ শতাব্দীতেও সম্ভব ছিল না। তাছাড়া, ইংরেজ রাজত্বের প্রথম ও মধ্য অধ্যায়ে কলকাতার যে গুরুত্ব ছিল, সে গুরুত্ব আজ আর নেই, আগামী পঞ্চাশ বছরে সে গুরুত্ব অধিকতর ক্ষয় হবে। রূপো-স্তরের—রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক পরিবর্তনের এই ইঙ্গিতটুকু যদি আমরা গ্রহণ করতে অক্ষম হই, তাহলে ইতিহাসের প্রাঙ্গণে আমরা অনন্তকাল ধরের মত বিস্ময়পূর্ণই হোক না কেন তা অস্বীকার করার উপায় নেই। সুতরাং, বিস্তীর্ণ জীবনে—তার রাষ্ট্র-পরিধি, সমাজ-প্রাঙ্গণে, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে—যদি অধিপত্য অর্জন করা না যায়, সেখানে যদি আমরা অপরের প্রভাব মমতায় ভালবাসায় প্রতিষ্ঠিত হতে না পারি তাহলে আমাদের বাইরে ছড়িয়ে পড়ার পথ চিরকালের জন্যে অবরুদ্ধ হয়ে থাকবে। ইতিহাস সেই কঠিন পরীক্ষাই বাঙালীর সম্মুখে তুলে ধরেছে।

অর্থাৎ অন্তর্নিহিত যে দুর্বলতার জন্য বাঙালী ভারতবর্ষকে আপনার করতে পারে নি, এবং যে কারণে তার আত্মপ্রসারের ক্ষেত্র সংকুচিত হয়ে গিয়েছিল, সেই দুর্বলতাকে জয় করার পরীক্ষা আজ বাঙালীর সম্মুখে সদ্য-পস্থিত। বিচিত্র সুরে, বিচিত্র বর্ণ-সমারোহে, ভারতের বিভিন্ন জীবন উদ্ভাষিত হয়ে চলেছে। দিল্লীতে অথবা বম্বেতে বসে তার প্রাণ-স্পন্দনটুকু অনুভব করা যায়, হরত যা সবটুকু সেখানে থেকেও অনুভব করা যায় না। তার জন্য কর্মপরিধি এবং অনু-ভবের ক্ষেত্রকে আরও সুদূরে পরি-ব্যাপ্ত করা প্রয়োজন। বে করেই হোক, সেই বৃহত্তর জীবনকে প্রত্যক্ষভূতে জানা, তার প্রবাহ-ধারায় স্নাত হওয়া, তার অভিঘাতের সঙ্গে একাত্ম হওয়া, চিন্তায় কর্মে ধ্যানে রূপসৃষ্টিতে তার সার্বজনীন রূপ-রূপ—ইত্যাদি কর্মের মাধ্যমেই আমরা পুনরায় প্রসারিত হওয়ার ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে পারি, এবং অপরের শ্রদ্ধা-অনুরাগ আকর্ষণের পথও হয়তো। বাঙালী বে ব্যক্তি-ব্যক্তি, চিত্তবৃত্তি এবং সূক্ষ্ম মুক্তি-বোধের অধিকারী তাতে এই কাজে সাফল্যলাভ একমাত্র তার পক্ষেই সুলভ। জনা কারও পক্ষে নয়; এবং এ সত্যেই—সে-দুর্লভের পথিকৃতের মর্যাদা লাভ করিতে পারে।

সেজন্যই বলছিলাম, নিজ দেশের সীমায়, নিজ কর্মে, নিজ ঐতিহ্যে স্বরূপের বিলক্ষণ প্রয়োজনীয়তা এ মুহূর্তে রয়েছে সত্য, কিন্তু আমাদের আধুনিক সীমা-চেতনা, বাংলা ভাষার প্রতি মমতা এবং ঝরের বোধকে যদি কেন সৃষ্টিশীল কর্মকাণ্ডের পথে প্রবাহিত করতে না পারি, তাহলে এই চেতনা, মমতা ও বোধ আমা-দের কোনে কাজেই আসবে না, সমগ্র ভারতের কাজে লাগা তো দূরের কথা। সে ক্ষেত্রে এটা হবে পরাজিতের অভিলাষ, বাঙালী জীবনে এক দুরপনের কলঙ্ক। বাঙালী কি ক্ষেত্রের চিত্রক পরবে, না এগিয়ে যাবে?

নাটক ও শিল্পপ্রতিভার প্রতিবন্ধক

সৌভিক

কলকাতার পাকা থিয়েটার বলতে মাত্র চারটি (যদিও ভারতের আর কোন শহরে তাও নেই) কিন্তু তার মধ্যে আবার একটি পুরোনো ইমারত বলে (মিনার্ভা) বন্ধ হয়ে পড়ে আছে প্রায় বছরখানেক। বাকি তিনটি থিয়েটারই চলছে এবং এতো ভালভাবেই চলছে যা দেখে বলা যায় যে, আরো কয়েকটি পাকা থিয়েটার অনায়াসেই এই শহরে চলতে পারে—থিয়েটারে দর্শকের অভাব হবে না। থিয়েটার চলছে প্রচুর দর্শক আকর্ষণ করে, আবার অপর দিক দিয়ে বিচার করলে বলা যায় যে, থিয়েটার চলছে সেটা আগেই উৎসাহব্যঞ্জক নয়। কারণ এক একটা থিয়েটারে এক একখানি নাটক যদি এক নাগাড়ে বছর ঘুরে ধরে চলতে থাকে তো সেটা দেখতে দেখতে পুরোনো চমকদার হোক, দর্শকপ্রতিষ্ঠান নাহা প্রতিবন্ধক। আর থিয়েটার নতুনভাবে উদ্বোধনের হুযার পর গত পাঁচ বছরের মধ্যে মাত্র দুখানি নাটক পরিবেশন করেছে রঙমহল প্রায় ঐ সময়ের মধ্যে পরিবেশন করেছে চারখানি, আর বিশ্বরূপা মাত্র তিন বছরে খুলে দুখানি নাটক। এইভাবে নাটক বদলিয়ে বদলিয়ে চললে নাট্যালয়ের অধ্যক্ষ লাভি—একই শিল্পী ও কলা-কুশলী রাখতে পারায় তাদের পক্ষে শ্রমিক মাবদ নতুন করে হোল ফাল থাকে না (অবশ্য সপ্তাহে একদিন বেতনাদি থেকে বাদ দিয়ে) অথচ চলার সারাটি বছর। অবশ্য সন্ধ্যাদি ম্যানেজার একখানাই বা বছর ভাই চলতে থাকে অভিনিন না অভিনয় স্থগিত থাকে; তবে পরি নতুন নাটক মঞ্চস্থ করার ঝুঁকি ও ঝামেলা থেকেও যতোদিন পারা যায় রেহাই পেয়ে থাকা যায়। নাটক দীর্ঘদিন চলার জন্য স্বভাবিকভাবে তার লাভের অংশ কিছুটা অবশ্য শিল্পী ও কলাকুশলীদের সেন এক একটা 'শততম' রজনী উদযাপন উৎসবে তাদের বিবিধ উপঢৌকন দিয়ে। কিন্তু সমগ্রভাবে নাট্যালয় ও নাট্যাভিনয়ের উন্নতি এর দ্বারা কিভাবে যে সাধিত হচ্ছে সেইটেই ভাববার কথা। গত পাঁচ বছরে যদি এগার-বারোখানি মাত্র নাটক মঞ্চস্থ হয় (তার মধ্যে মৌলিক নাটক তিন-চারখানি, বাকি উপন্যাস, গল্প থেকে নেওয়া), তাহলে মৌলিক নাটক রচনায় গুণী লোকের প্রেরণা আসবে কোত্থেকে? নাটকের জন্য পাঠকের দরকার হয় 'না, দরকার হয় দর্শকের, আর দর্শকের যে অভাব এখন নেই, প্রতিটি থিয়েটারে গুণাগুণ নির্বিচারে প্রত্যেকখানি নাটকের একাদিক্রমে শত শত রজনী মঞ্চস্থ হয়ে চলাই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। দর্শক সমাগম অব্যাহত তবুও নতুন নাটক মঞ্চস্থ করায়, উত্তরোত্তর ও প্রগতিশীল জ্ঞান-বৃদ্ধির নিজাগে মঞ্চ স্বত্বাধিকারীদের নির্বিকারিত্ব পীড়াদায়ক। তাছাড়া, একই নাটক দীর্ঘদিন চালিয়ে যাওয়াটা শিল্পীদের প্রতিভা স্ফুরণেরও প্রতিবন্ধক। গত পাঁচ বছর ধরে দীর্ঘকাল ধরে এক একখানি নাটক চলার ফলে লাভ হয়েছে যে, মৌলিক প্রতিভা-সম্পন্ন বলে অভিহিত করা যায় এমন শিল্পী বলতে গেলে, এক-জনও পাওয়া যায় নি বা এমনও কোন একজনও পাওয়া যায় নি যিনি প্রতিভাবৈচিত্র্যে মঞ্চের রথী শিল্পীদের সঙ্গে পাল্লা আসন করে নেবার যোগ্যতা দেখাতে পেরেছেন? নাট্যালয়ের পৃষ্ঠ-পোষকের যখন কোন অভাবই নেই, বরং অনেকই রয়েছে সে অবশ্য-তেও যদি নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার ব্রতী না হওয়া গেল তো, হবে কবে?

* * *

গত শনিবার স্টার মঞ্চে "শ্রীকান্ত" নাটকখানির প্রিমতরঙ্গ অভিনয় উৎসব অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি অহীন্দ্র চৌধুরী নাটক দীর্ঘকাল চালানোর পক্ষে যুক্তির অবতারণা করে বলেন যে, আজ-কাল নাটক মঞ্চস্থ করা খরচ সাপেক্ষ ব্যাপার; খরচ তুলতে গেলে (এবং থিয়েটার চালাতে গেলে) নাটককে দীর্ঘকাল চলতে দেওয়া উচিত। কিন্তু কিছুদিন আগে, যতদূর মনে পড়ে রঙমহলে "উল্কা" নাটকখানির কোন শততম এক উৎসবে, অহীন্দ্র চৌধুরী ঠিক এর উল্টো কথাই শুনিয়ে বলেছিলেন যে, একখানি নাটক যদি অনেকদিন ধরে চলতে থাকে তাহলে শিল্পিরা তাঁদের প্রতিভার বিভিন্নমুখীতা প্রকাশ করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। পুরোনো দিনের কথা স্মরণ করে শুনতে ভাল লাগবে এই যা। কয়েক শতাব্দী আগে কলকাতার মতো শহরেও যেখানে লক্ষ্য মিহিল নেই, পরিচালক কলাকুশলীর নামেও বিজ্ঞাপনও দেওয়া হচ্ছে সেই-—নাম আছে সঙ্গীত পরিচালক রবীন্দ্রনাথ ঘোষের, আর গাইয়েদের, যার মধ্যে আছেন চিন্ময় লাহিড়ী, এ কানন, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, অখিলবন্ধু ঘোষ, মান্না বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখো-পাধ্যায়, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুচি করে রেখেছে। নতুন নাটক "মায়ামৃগ" পরিচালনা করছেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র এবং বিভিন্ন চরিত্রে আছেন নীতীশ মুখোপাধ্যায়, রবীন মজুমদার, হরিধন, সতী বন্দোপাধ্যায়, জহর রায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, নবকুমার, সরযূবালা, গীতা সিং, কেতকী, কবিতা রায় প্রভৃতি। সুর সৃষ্টিতে আছেন অনিল বাগচী।

চিত্রালোচনা

"ডাকহরকরা"র সঙ্গে গত সপ্তাহে মুক্তিলাভ করে "বৃন্দাবন লীলা।" সিনেমাকে সিনেমা না ভেবে অন্য নানাভাবে কাজে লাগাবার এ একটা নিদর্শন। ছবি নয়, ছবির প্রকৃতি ও গঠনগত বৈশিষ্ট্যও নেই কিছুই এতে, এবং বলা যায় 'নৌকাবিলাস' ও 'বাসন্তী রাস' পালা কীর্তন অবলম্বন করে "বৃন্দাবন লীলা" প্রযোজক সুধী-বন্ধু যখন পরিকল্পনা করেন তখন, আর বাই হোক, একখানা ছবি করবার কথা নিশ্চয়ই তিনি ভাবেন নি। ছবির কোন গুণ এতে নেই বা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। বতো কিই ধৈর্য তোতাই সহ্যের বাঁধ ভাঙে। তবে গানের মধ্যে খান-কয়েক শুনতে ভাল লাগবে এই যা। কীর্তনের নামে কলকাতার মতো শহরেও যেখানে লক্ষ্য মিহিল সেখানে লোকের অভাব হবে না। বিজ্ঞাপনও দেওয়া হচ্ছে সেই-—নাম আছে সঙ্গীত পরিচালক রবীন্দ্রনাথ ঘোষের, আর গাইয়েদের, যার মধ্যে আছেন চিন্ময় লাহিড়ী, এ কানন, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, দেবতা', মলরী "পদ্ম পরনকিলি" ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, অখিলবন্ধু ঘোষ, কানাড়ী "প্রেমদা পুরি"। শুভেমাত্র মান্না বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখো-সম্মানপত্র পেয়েছে "মানার ইণ্ডিয়া"। পাধ্যায়, উৎপলা সেন, ছবি বন্দ্যো- "মুসাফির", "লোহকপাট", "হারানো পাধ্যায়, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুর, তামিলে "মুখোখানি", "ক্যাডেজ" ও অসমীয়াতে "মাক-তেলেগুতে "ভাগ্যরেখা" ও "তোড়ি অরু মোরম।" রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রবর্তিত হওয়া থেকে এই প্রথম শিশুদের জন্য ছবির বিভাগে প্রধানমন্ত্রীর স্বর্ণপদক দেওয়া হচ্ছে; নির্বাচিত হয়েছে "হাম পাঁচি এক ডাল কে" এবং সর্ব-ভারতীয় সম্মানপত্রের জন্য বাংলা "জন্মতিথি।"

*

পুরস্কারের জন্য যা নির্বা-চিত হয়েছে সে সম্পর্কে এই মন্তব্যই মনে আসে যে, নির্বাচন ব্যাপারে যথেষ্ট গলদও আছে এবং হয়তো কিছুটা পলিটিক্স এবং কিছু কিছু ব্যক্তিগত অভিরুচিও নির্বাচনকে প্রভাবিত করে। তা নয় তো "মানার ইণ্ডিয়া" থাকতে "সো আঁখে" নির্বাচিত হয় কি-ভাবে? বা "আধারে আলোর" মতো গুণেই থাকে স্থিতীয় পুরস্কার প্রাপ্তির যোগ্য বলে বিবেচিত হওয়ায় আমাদের দেশের ছবির ষ্টাণ্ডার্ড অতি নিচু বলে প্রতীয়-মান করে দেয় না কি? প্রতি বছরই রাষ্ট্রপতি পুরস্কার ব্যাপারে ত্রুটি দেখা দিচ্ছে কিন্তু কোন প্রতি-কারই হচ্ছে না। কোন দিকের কি বিচার করে যে ছবি নির্বাচন করা হয় সেটাও যেমন দুর্বোধ্য, তেমনি যে সব ব্যক্তিদের নিয়ে নির্বাচক মণ্ডলী গঠিত হয় তারাই বা এই ব্যাপারে কোন যোগ্যতার বলে নমস্য মনোনীত হন তাও বোঝা ভার। পুরস্কার লাভের যোগ্য-তারও কি কোন মাপকাঠি নেই? যদি থাকে তাহলে "পথের পাঁচালী" যে মান পায়, "সো আঁখে"রও সে-মান প্রাপ্য হয় কি হিসেবে? যদি মাপকাঠি অনুযায়ী যোগ্যতা না পৌঁছলো তো, পুর-স্কার দেওয়া স্থগিত রাখতে আপত্তি কি? ছোটদের ছবির জন্য পুর-স্কার তো তিন বছর স্থগিত ছিল, বড়োদের ছবির ক্ষেত্রে সে রীতি কি প্রবর্তন হবার নয়। লোক হাসানোর চেয়ে সেই তো ভাল।

পুরস্কার নিতেই হবে, নিরীখে পৌঁছাক আর না পৌঁছাক, সে রীতি কিন্তু ইকরি।

এবারের রাষ্ট্রপতি পুরস্কার

গত ৩০শে মার্চ থেকে ৬ই এপ্রিল পর্যন্ত প্রতিদিন তিন দল করে বসে তেরোখানি পূর্ণ দৈর্ঘ্য, একখানি ছোট এবং শিশুদের ছবিগুলি বিভাগে তিনখানি পূর্ণ দৈর্ঘ্য ছবি দেখে দিল্লীর কেন্দ্রীয় বিচারক-মণ্ডলী তাঁদের বিচারের ফলাফল ঘোষণা করেছেন। শাস্ত্রারামের হিন্দী ছবি "যো আঁখে বার হাত" বাংলা ছবি "আধারে আলো" পেয়েছে নিখিল ভারত সম্মানপত্র এবং সেই সঙ্গে সাড়ে বার হাজার টাকা। রাষ্ট্রপতি-রৌপ্যপদক, আঞ্চলিক ভাষার শ্রেষ্ঠ ছবি হিসেবে পেয়েছে "সো আঁখে", 'আধারে আলো', মারাঠী "সুহ-য়ি কানন, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, দেবতা', মলরী "পদ্ম পরনকিলি" কি প্রবন্ধ হবার নয়। লোক হাসানোর চেয়ে সেই তো ভাল।

উচ্চতম আন্তর্জাতিক মানের
ছবি বলে অভিহিত

অগ্রগামী প্রোডাকসন্সের অভিনব নিবেদন

তারাশঙ্করের

ডাক হরকরা

পরিচালনা : সঙ্গীত : চিত্রগ্রহণ :
অগ্রগামী সুধীন দাশগুপ্ত রাধানন্দ সেনগুপ্ত

উত্তরা * পূরবী * উজ্জ্বলা

— ১১, ৫৩, ৯ — ৩ ৬ ৯

আলোছায়া, অঞ্জয়া, শ্যামশ্রী, মায়াপুরী, নিউ তরুণ,
নেত্র, কল্যাণ, শ্রীকৃষ্ণ, উদয়ন।

ডিলুক্স রিলিজ

জনমতের চাপে অতুল্য ঘোষ অবশেষে বিচলিত

শেষ মুহূর্তে মেয়র পদে ডাঃ ত্রিগুণা সেনকে নামোনয়ন দান

(দর্পণের পর্যবেক্ষক)

কলকাতা পৌর নির্বাচন সম্পর্কে শেষ পর্যন্ত জনমতের চাপ শ্রীঅতুল্য ঘোষের উপর বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। তাঁহার ইচ্ছা ও অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি তাঁর দীর্ঘদিনের অনুসৃত নীতি পরিবর্তন করিয়া ডাঃ ত্রিগুণা সেনকেই মেয়র পদে মনোনয়ন দিতে বাধ্য হইয়াছেন।

কংগ্রেস পার্টির অভ্যন্তরে ও বাহিরে বিভিন্ন মহলে এই সম্পর্কে তীব্র আলোচনা চলিতেছিল। কংগ্রেস পার্টির অভ্যন্তরে এই বিষয়ে তীব্র মতানৈক্য দেখা দেয়। কংগ্রেস পার্টির একটি অংশ ডাঃ সেনের মনোনয়নের বিরোধিতা করিতে থাকেন। তাঁহারা অভিযোগ করেন যে, ডাঃ সেনের মনোনয়ন দেওয়া হইলে কংগ্রেস পার্টির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হইবে। কংগ্রেস পার্টির অভ্যন্তরে এই বিষয়ে তীব্র মতানৈক্য দেখা দিলে শ্রীঅতুল্য ঘোষ ডাঃ সেনকে মনোনয়ন দিতে অস্বীকার করেন। কংগ্রেস পার্টির অভ্যন্তরে এই বিষয়ে তীব্র মতানৈক্য দেখা দিলে শ্রীঅতুল্য ঘোষ ডাঃ সেনকে মনোনয়ন দিতে অস্বীকার করেন।

কিন্তু বিচারপতি শ্রী জে পি মিত্রের এজলাসে শ্রী বি কে সেন কর্পোরেশন তদন্ত কমিটির শ্রীশৈবাল গুপ্ত, শ্রীসুশীল রায় ও শ্রীরাজেন মজুমদারের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার যে অভিযোগ দায়ের করেছেন, তারই ফলে বহস্পতিবার রাজনীতির চাকা অত্যন্ত দ্রুত আবর্তিত হয়। বিচারপতি শ্রীমিত্র ইতিমধ্যে তদন্ত কমিটির উপরে হাইকোর্টের হুল জারী করে দিয়েছেন। এই ঘটনার পর শ্রী বি কে সেনের আচরণ সম্পর্কে কংগ্রেস পার্টির অভ্যন্তরে আলোড়ন নূতন আকার ধারণ করে এবং মুখ্যমন্ত্রী তাঁর গৃহে শ্রীবি কে সেন সম্পর্কে অভ্যন্ত বিস্তৃত হন। সন্ধ্যার দিকে সমস্ত ঘটনা এমনভাবে পরিবর্তন হয় যে, শ্রীঅতুল্য ঘোষ তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তনে বাধ্য হন। রাত্রি আটটার সময় ডাঃ সেনকে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ডেকে পাঠানো হয়। সেই-খানে তাঁর রায় এবং টেলিফোনযোগে শ্রীঅতুল্য ঘোষ জানান যে, তাঁকেই মেয়ররূপে মনোনয়ন দেওয়া হবে।

দর্পণ একথাও নির্ভরযোগ্য-সূত্রে জানতে পেরেছে যে, শ্রী বি কে সেন সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর মনোভাব পরিবর্তন করেছেন এবং শ্রীমতী সেনের কর্পোরেশন থেকে বিদায় আসন্ন। অবশ্য বিদায়ের পূর্বে চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজি-স্ট্রেটের খোয়া একটি তদন্ত অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হবে এবং সম্ভবত সোমবারের মধ্যেই এই নিয়োগের ঘোষণা সরকার প্রকাশ করবেন। এই তদন্তের ফলে শ্রীমতী সেন সম্পর্কে কর্পোরেশন আইনের ১১ (১) ধারা প্রয়োগ করা (অর্থাৎ তাঁকে সরকারী সিদ্ধান্তক্রমে বরখাস্ত করা) ছাড়াও দিক থেকে আরও সহজ হবে।

কংগ্রেস পার্টির অভ্যন্তরে ডাঃ সেনের মনোনয়ন সম্পর্কে তীব্র মতানৈক্য দেখা দিলে শ্রীঅতুল্য ঘোষ ডাঃ সেনকে মনোনয়ন দিতে অস্বীকার করেন। কংগ্রেস পার্টির অভ্যন্তরে এই বিষয়ে তীব্র মতানৈক্য দেখা দিলে শ্রীঅতুল্য ঘোষ ডাঃ সেনকে মনোনয়ন দিতে অস্বীকার করেন।

ঢাকার চিঠি

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

পার্টিকে অনুরোধ জানানো হবে। রাজনৈতিক বন্দীমুক্তির ব্যাপারে যে আইনের প্রশ্ন দেখা দেবে তার প্রতিও আওয়ামী পার্টির দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে। লীগের পক্ষ থেকে আওয়ামী পার্টিকে যে উত্তর দেওয়া স্থির হয় তার খসড়ার অবশ্য দরা প্রদর্শনের আবেদন পত্র পেশের প্রসঙ্গে কিছু উল্লেখ করা হয় নি।

•

ক্ষমতাধিষ্ঠিত আওয়ামী লীগ এই মুহূর্তে আওয়ামী পার্টির সমর্থনের প্রয়োজনীয়তা আজ বলে আর মনে করছে না। এবং লীগের বিরুদ্ধে জনস্বার্থ-বিরোধী কার্যকলাপ এবং রাজনীতি ক্ষেত্রে বিরোধী দলসুলিকে দমনের নীতি অনুসৃত হচ্ছে বলে যে অভিযোগ করা হয়েছে তার যথেষ্ট জোড়ালো প্রত্যুত্তর দেওয়ার জন্য লীগ নিজেকে প্রস্তুত বলে মনে করছে। ইতিমধ্যেই তাঁরা সরকারী কর্ম-চারীদের ষ্ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার দেওয়া হোক, এই যে দাবী তা সরাসরি প্রত্যাখান করে-ছেন। এ ছাড়া অর্থনৈতিক উন্নয়নের যে সমস্ত প্রস্তাব করা হয়েছিল সেগুলোও এই বলে প্রত্যাখান করা হয় যে—সেগুলো আওয়ামী লীগের আদর্শ ও কর্ম-নীতির আওতার মধ্যেই পড়ে।

আন্তর্জাতিক সংবাদ

আনবিক অস্ত্র পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণের ব্যাপারে রাশিয়ার প্যাঁচে পশ্চিমী দুনিয়া ঘায়েল

(নিজস্ব পর্যবেক্ষক)

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে শ্রীখ্রুশ্চভ যে তুরুপ মেরেছেন তা সামলাতে পশ্চিমারা হিমসিম খাচ্ছে। ৩১শে মার্চ সর্বোচ্চ সোভি-য়েটে ঘোষণা করা হয় যে রুশিয়া আণবিক অস্ত্রের পরীক্ষা বন্ধ কর-বার সিদ্ধান্ত করেছে। সঙ্গে সঙ্গে সে আমেরিকা ও বৃটেনের নিকট অবেদন করে যাতে তারাও অনু-রূপ নীতি গ্রহণ করে।

এর ফলে সমস্ত পৃথিবীতে এক বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি হয়। জাপান রুশির সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে বৃটেন ও আমেরিকাকে তা অনুসরণ করবার জন্য আবেদন করে। শ্রীনেহরুও সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। বস্তুতঃ এই একটি নীতির ফলে রুশিয়া পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যে পরিমাণে জন-প্রিয়তা অর্জন করেছে, আমেরিকা ও বৃটেন ঠিক সেই পরিমাণে জন-প্রিয়তা হারিয়েছে।

খোদ আমেরিকা ও বৃটেনেও আণবিক অস্ত্র পরীক্ষা বন্ধের অনুকূলে প্রবল জনমত গড়ে উঠেছে। বৃটেনে তো কয়েক হাজার লোক আণবিক অস্ত্র পরিত্যাগের দাবীতে লণ্ডন থেকে বৃটিশ আণ-বিক গবেষণাগার অবধি মিছিল করেছেন। আমেরিকার পরীক্ষা বন্ধের জন্য আদালতে এক মামলা দায়ের করা হয়েছে।

এই দুটি দেশের সংবাদ-পত্রও বা বলা হচ্ছে তারমোদ্দা কথা হল, এই সাম্প্রতিক মারণাস্ত্র সম্বন্ধে আন্তর্জাতিক সমঝোতার জন্য রুশিয়া যে অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করেছে, বৃটেন ও আমেরিকার তার সুযোগ গ্রহণ করা উচিত।

আমেরিকা অবশ্য জানিয়েছে, সে পরীক্ষা বন্ধ করতে রাজি নয়। বৃটেনও শ্রীডালেসের পথ অনুসরণ করছে। তাদের তরফে অজুহাত হিসেবে বলা হচ্ছে, রুশিয়ার ঘোষণা মোটেই আন্তরিক নয়। সে গোপনে গোপনে পরীক্ষা চালিয়েই যাবে।

শ্রীখ্রুশ্চভ দূতদের সঙ্গে কথোপকথনে বলেছেন, রুশিয়া আমেরিকার প্ল্যান গ্রহণ করুক, তবেই তার আন্তরিকতার প্রমাণ পাওয়া যাবে, আমেরিকার প্ল্যান রুশিয়া গ্রহণ করবে বলে মনে হয় না। কারণ এই প্ল্যানের অন্যতম উদ্দেশ্য হল, যে সব স্থানে রুশিয়া আণবিক অস্ত্র তৈরীর কারখানা করেছে তার উপর খবরদারী করবার জন্য আন্তর্জাতিক কোনো সংস্থা স্থাপন করা এবং সঙ্গে সঙ্গে নিরস্ত্রীকরণ সমস্যার কথাও তোলা হয়েছে।

শীর্ষ সম্মেলন কবে হবে বা নিকটই তা চেহারীদের।

থেকে যে প্রচারকার্য চালান হচ্ছে তা নিছকই প্রচারকার্য। তার উদ্দেশ্য নিজ নিজ দেশের জনমতকে সামাল দেয়া এবং এশিয়ার মানুষকে আশ্বস্ত করা। এই প্রচার কার্যের অন্য পিঠ হিসেবে "পরিজ্ঞন" আণবিক বোমা তৈরীর কথা উঠান হয়েছে। অর্থাৎ পশ্চিমারা এখন নাকি এমন আণবিক বোমা তৈরী করতে সক্ষম হয়েছেন যার বিস্ফোরণের ফলে বিরাট এলাকার জনসাধারণ আর বিষদগ্রস্ত হবে না। সরাসরি ধরনে কার্য ছাড়া এর আর কোনো অনুপকারিতা থাকবে না।

আণবিক অস্ত্রের বীভৎসতা এ অর্থাৎ এশিয়াবাসীকেই ভোগ করতে হয়েছে। গত বছরের কয়র আমেরিকা জাপানের দুটি সহর সম্পূর্ণ ধ্বংস করেছে এই বোমার সাহায্যে। তারপর, আমেরিকা আণবিক অস্ত্রের বহু পরীক্ষা চালিয়েছে তা আমেরিকা বা ইউরোপ এমন কি অতলান্তিক মহাসাগরের নয়। পরীক্ষা কেন্দ্র হিসেবে বেছে নিয়েছে প্রশান্ত মহাসাগর। তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এশিয়া।

আণবিক অস্ত্র সম্বন্ধে তাই এশিয়ার জনমত অত্যন্ত প্রবল। আমেরিকা "পরিজ্ঞন" বোমা তৈরী করেছে বলে বা বলা হচ্ছে তাতে এশিয়াবাসী বাঁদি আশ্বস্ত হয় তবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পশ্চিমাদের সামনে থেকে এক বিরাট বাধা সরে যাবে। কিন্তু তা দুরাশা মাত্র। রুশির সিদ্ধান্তে ঘোষণা জাপানে এবং ভারতে (চীনকে ছেড়েই দিলাম) যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে, তা থেকেই এর প্রমাণ মিলবে।

শ্রীখ্রুশ্চভ আরও এক ধাপ এগিয়েছেন। হ্যাগেরীতে এক বক্তৃতায় তিনি বলেছেন যে, পশ্চিমারা যদি মনে করে গোপনে আণবিক অস্ত্র পরীক্ষা করা সম্ভব তবে তিনি আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতেও রাজী আছেন।

এর উত্তরে শ্রীআইজেনহাওয়ার বলেছেন, রুশিয়া আমেরিকার প্ল্যান গ্রহণ করুক, তবেই তার আন্তরিকতার প্রমাণ পাওয়া যাবে, আমেরিকার প্ল্যান রুশিয়া গ্রহণ করবে বলে মনে হয় না। কারণ এই প্ল্যানের অন্যতম উদ্দেশ্য হল, যে সব স্থানে রুশিয়া আণবিক অস্ত্র তৈরীর কারখানা করেছে তার উপর খবরদারী করবার জন্য আন্তর্জাতিক কোনো সংস্থা স্থাপন করা এবং সঙ্গে সঙ্গে নিরস্ত্রীকরণ সমস্যার কথাও তোলা হয়েছে।

শীর্ষ সম্মেলন কবে হবে বা নিকটই তা চেহারীদের।

কোনো সন্দেহ নেই যে, বৃটিশ ও আমেরিকান সরকারের তরফ আগে হবে কিনা তা এখনও নিশ্চয় করে বলা যায় না। আমেরিকা ও বৃটেন বহু দিন দাবী করে আস-ছিল, শীর্ষ সম্মেলনের প্রস্তুতি হিসেবে, বিশেষ করে কি কি বিষয় আলোচিত হওয়া উচিত তা নির্ধারণের জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের বৈঠক বসাতে হবে। হঠাৎ রুশিয়া তাতে সম্মতি দেয়।

সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমের মতিগতি পরিবর্তন ঘটে। তাঁরা বলতে সুরু করেন এই পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের বৈঠকেই স্থির করতে হবে কি কি বিষয়ে ঐকমত্য সম্ভব। যে যে বিষয়ে ঐকমত্যের সম্ভাবনা দেখা যাবে শুধুমাত্র সেই বিষয়গুলোই শীর্ষ সম্মেলনে রাষ্ট্রপ্রধানদের মধ্যে হবে। এ আবারো রুশিয়া সম্মতি দিতে পারে নি। তার বক্তব্য হল, শীর্ষ সম্মেলনে রাষ্ট্রপ্রধানদের মধ্যে মত বিনিময় হলে, পরস্পরের বোঝাবুঝি সহজ হবে এবং ঠাণ্ডা লড়াইয়ে ভাটা পড়বে। কূটনৈতিক ক্ষেত্রে তা এ অবধি সম্ভব হয় নি, এবং কূটনৈতিক আলাপ-আলোচনার মারফৎ তা সম্ভব হবেও না।

ইন্দোনেশিয়ার গৃহযুদ্ধের নূতন পরিস্থিতি

ইন্দোনেশিয়ার গৃহযুদ্ধে পশ্চিমী সমর্থক বিদ্রোহীরা এখন বিপর্যয়ের সম্মুখীন। বিদ্রোহের কেন্দ্রস্থল মধ্য সুমাত্রার তাঁরা কোণঠাসা হয়ে পড়েছেন, আত্ম-রক্ষার শেষ চেষ্টা হিসেবে তাঁরা এখন পশ্চিমাদের সাহায্য সরাসরি-ভাবে চাইতে সুরু করেছেন।

আমেরিকার অস্ত্র তাঁরা ইতি-মধ্যেই অনেক পেয়েছেন। এগুলো এসেছে প্রধানত ফরমোজা এবং ফিলিপাইন হতে। দক্ষিণ কোরিয়ার সীমান রীও আস্ফালন করছেন, তিনি বিদ্রোহীদের সাহায্যে সৈন্য পাঠাতে প্রস্তুত। আমিরিকা, বৃটেন, ফ্রান্স এবং হলাণ্ড কোনো সন্দেহ রাখে নি তাদের সহানুভূতি কোন দিকে। বাঁশপন্থীরা প্রেসিডেণ্ট সুকর্ণকে ভীতি প্রদর্শনের জন্য নৌবিহারের সমাবেশ করেছিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নি।

আজ বিদ্রোহীরা আবার কম্যু-নিস্ট যুদ্ধের ভয় দেখাতে সুরু করেছেন। পশ্চিমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বিদ্রোহী "সরকার" বলেছেন, ইন্দোনেশীয়া কম্যুনিস্ট দেশ থেকে অস্ত্রশস্ত্র ও ট্রেনিংপ্রাপ্ত পাচ্ছেন। তা বন্ধ করতে হবে।

ইন্দোনেশিয়া নিজে বিশেষ কিছু যুদ্ধাস্ত্র তৈরী করে না। বিদেশের উপরেই তাকে নির্ভর করতে হয়। সে প্রভয় পশ্চিমাদের

সম্পাদক—শ্রীব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য

সম্পাদক কর্তৃক মুদ্রণ ইণ্ডিয়া প্রেস, ৭নং ওয়েলিংটন স্কোয়ার, কলিকাতা—১৩ হইতে মুদ্রিত এবং ৭নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা—১৩, দর্পণ কার্যালয় হইতে প্রকাশিত

Regd : No.C 4079

১বর্ষ, ১৩শ সংখ্যা

সাপ্তাহিক সংবাদ সাময়িকী ঃকলিকাতা-২৫শে এপ্রিল শুক্রবার ১৯৫৮ ঃ মূল্য ২৫ নঃ পঃ

অতুল্য-প্রফুল্ল-কালীপদ প্রভাব অস্তমিতপ্রায়

ডাঃ রায়ের একাধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত

(দর্পণের প্রতিনিধি)

পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস সরকার প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি থেকে শ্রীনিশীথ রায়ের পদত্যাগ শ্রীঅতুল্য ঘোষের উত্তর।

কংগ্রেসে বিপ্লব আনে নাই বটে, কিন্তু প্রতিষ্ঠানকে জোর ধাক্কা দিয়েছে, এতে সন্দেহ নাই। এই ও বাস্তহারা সাহায্য এবং পুনর্বাসন বিভাগের কাজ প্রকৃতপক্ষে ডাঃ রায় নিজের হাতে নিয়েছেন। শ্রী সেন নামে এই দুই বিভাগের মন্ত্রী আছেন, কিন্তু কার্যতঃ নয়—এটা তিনি প্রতিপদেই বুঝতে পারছেন। পুলিস বিভাগ নিয়ে শ্রীঅতুল্যবাবুরও অনুরূপ অবস্থা।

প্রফুল্লচন্দ্র সেনের পদত্যাগ এবং শ্রীঅতুল্য ঘোষের প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচন সম্পর্কে যে সংবাদ আমরা গত সপ্তাহে পরিবেশন করিয়াছিলাম তাহা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এবং শ্রীঅতুল্য ঘোষের মধ্যে যে গোপন বোঝাপড়া হইয়াছিল তাহা অনুযায়ী শ্রীঅতুল্য ঘোষ কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। ডাঃ রায় ও শ্রীঘোষের মধ্যে এই বোঝাপড়া হইয়াছিল যে, শ্রীঘোষ নির্বাচিত হইলে শ্রীসেন পদত্যাগ করিবেন এবং শ্রীঘোষ তাঁহার স্থলে শ্রীসেনকে মন্ত্রিসভায় গ্রহণ করিবেন। শ্রীসেনের পদত্যাগ ও শ্রীঘোষের নির্বাচন এই দুইটি ঘটনা একই দিনে ঘটিয়াছে।

শ্রীসেনের অবস্থা ঠুঁটো জগন্নাথ। তাঁহার প্রধান দপ্তর দুটো—খাদ্য দিয়েছে, এতে সন্দেহ নাই। এই ও বাস্তহারা সাহায্য এবং পুনর্বাসন বিভাগের কাজ প্রকৃতপক্ষে ডাঃ রায় নিজের হাতে নিয়েছেন। শ্রী সেন নামে এই দুই বিভাগের মন্ত্রী আছেন, কিন্তু কার্যতঃ নয়—এটা তিনি প্রতিপদেই বুঝতে পারছেন। পুলিস বিভাগ নিয়ে শ্রীঅতুল্যবাবুরও অনুরূপ অবস্থা।

বাস্তহারাদের আন্দোলন সম্পর্কে বামপন্থী নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করা, প্রেসে বিবৃতি দেওয়া, কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রী মেহের চাঁদ খান্নার সঙ্গে মন্ত্রণা করা এবং অন্যান্য সব ব্যাপারে ডাঃ রায় শ্রীসেনকে প্রকৃতপক্ষে একেবারে উপেক্ষা করে চলেছেন। শ্রান্তি-সম্ভব শ্রীসেন সবই শ্রোতা। বিভাগের শিনিয়র কর্মচারী ডাঃ রায়ের কাছ থেকেই আদেশ পাচ্ছেন।

এ নিয়ে সহকর্মীদের মধ্যে আলোচনা হচ্ছে; কর্মচারী মহলেও চাপা গুঞ্জন শোনা যায়। যে সব সহকর্মীরা শ্রীরায়ের পদত্যাগের অব্যবহিত পরেও ভাবী প্রধানমন্ত্রী ভেবে শ্রীসেনের চারপাশে আনাগোনা করতেন, তাঁরা তাঁকে এড়িয়ে চলেছেন, সম্ভবতঃ ডাঃ রায়ের বিরাগভাজন হওয়ার ভয়ে।

ডাঃ রায়ের ইস্তফেপ সূত্রে যদি বাস্তহারা সাহায্য এবং পুনর্বাসন দপ্তর সম্পর্কেই হত, তাহলেও নব বোঝা যেত। খাদ্য বিভাগের ব্যাপারেও তিনি শ্রীসেনকে অব্যাহত করে চলছেন। সম্প্রতি রায়গঞ্জে চাল লুঠের ঘটনা উপলক্ষ করে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়, তাতে মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিম দিনাজপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে সরাসরি তার মারফৎ আদেশ করেন, রায়গঞ্জ এবং অন্যান্য দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য এলাকায় সস্তা চাল দেওয়ার ব্যবস্থা করবার জন্য। অবশ্য তিনি তারের একটি কারবন কপি শ্রীসেনের নিকট পাঠিয়ে দেন। কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী অবশ্য অনেক দিন থেকেই শ্রীসেনকে উপেক্ষা করে ডাঃ রায়ের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য সম্পর্কে পত্র বিনিময় এবং অলাপ-আলোচনা চালাচ্ছিলেন।

এই ও সে দিন পর্যন্ত (গত সাধারণ নির্বাচনের পরে) ডাঃ রায় সকল বিকাল দু বেলাই প্রায় শ্রীসেনের ঘরে একবার করে যেতেন। এতে অনেকের মনে ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিল, পার্টিতে ডাঃ রায়ের আসন আরো দৃঢ় হয়ে পড়েছে এবং তিনি লাঠাই করবার গ্রহণ করবেন। অস্তগামী সূর্যকে ছেড়ে উদীয়মান সূর্যের উপাসনা যুগ-ধর্ম। এই যুগ-ধর্মের উপাসক মন্ত্রিবর্গ, এমন কি কয়েকজন ঘুঘু কর্মচারীও শ্রীসেনকে ঘিরে আসর জমাতে লাগলেন। সেই শ্রীসেন আজ "আঘাত উপেক্ষিত (!)।"

(দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পঞ্চম কলমে)

সম্পাদকীয়

নরকের অভিশাপ

মৃত্যুর দিক থেকে বাঁচা হিসাব করা যায় কলেরাই পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে বড় অভিশাপ নয়। টাই-ফয়েড, উদরাময়, এখনও ম্যালেরিয়া এবং বক্ষ্যার মৃত্যুর সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গে এর চেয়ে সহস্রগুণে বেশী। সংক্রমণশীলতার দিক থেকে দেখলে বাঁকুড়ার বিস্তৃত অঞ্চলে এবং বীরভূমের বহুর অংশে কুষ্ঠরোগ এর চেয়ে অনেক বড় বিভীষিকা, এ-বিষয়েও সন্দেহ নেই। সর্বশেষ সরকারী স্ট্যাটিস্টিকসে দেখা যায়, বক্ষ্যা কলকাতা ও শিল্পাঞ্চলে প্রায় শতকরা ১ ভাগ লোককে আক্রমণ করেছে। তার মধ্যে পঞ্জিটিভ, অর্থাৎ সংক্রামক রোগীর সংখ্যা প্রায় অর্ধেক হবে, একথা গভর্নমেণ্ট স্বীকার করেন। উদ্যাময়ের মধ্যে আন্তত শতকরা ৪ জন লোক সংক্রামক কৃমির আক্রান্ত, একথা চিকিৎসা দপ্তরের ফাইলে লিখিত আছে।

কিন্তু কলেরার বিভীষিকা মৃত্যুসংখ্যার জন্যও নয়, সংক্রমণশীলতার জন্যও নয়। যে দেশে কোন সত্য গভর্নমেণ্ট কিংবা সভ্য সৌরসভার কোনো অস্তিত্ব আছে, যেখানে ন্যূনতম কর্মদক্ষতার কোনো চিহ্ন আছে সেখানে কলেরার মহামারী অসম্ভব। অর্থাৎ কলেরা যখন প্রতি বছরের কলকাতার মহামারীর আকারে দেখা দেয়, তখন সারণীরক ব্যাধির চেয়েও আমাদের অ্যাডমিনস্ট্রেশনের ব্যাধিটা নগ্নভাবে উদ্ঘাটিত হয়। একথা প্রমাণিত হয় যে, এই নগরটে আধুনিক বিজ্ঞানী ও সভ্যতার সমস্ত অহঙ্কার, গভর্নমেণ্টের শক্তি ও ক্ষমতার অজস্র দম্ভ সত্ত্বেও—আসলে একটা আদিম এবং বর্বর শাসন ব্যবস্থার মধ্যে আমাদের রাখা হয়েছে। জীবনধারা এবং সৌর সভ্যতার বিচারে এখনও উনবিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশতিতা অতিক্রম করিনি। কেননা, ভারতবর্ষের এই সর্বশ্রেষ্ঠ নগরীতে এখনও ৮ লক্ষ নরনারী গ্রাঁমের সময় কুকুরে কুকুরের ন্যায় পানীয় জল সংগ্রহ করে—রাস্তার পাশে হাঁড়ু গেড়ে হাইড্রান্টের নালা থেকে লোক অজলা ভরে জল তুলছে, এরূপ ১৯৫৮ সালেও প্রতিদিন দেখি। অথচ ভগ্নোর কতবড় পরিহাস, এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীই ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক এবং সভ্যতা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির গোলে বসা-হলেই ভারতবর্ষের পরোধা। কলেরা কলকাতায় এই অপ্রয়োসাধ্য সভ্যতার শৌরুৎস চিহ্ন উদ্ঘাটিত করে।

(বাকীটা শেষ পৃষ্ঠায়)

কলিকাতায় কলেরার রাজনীতি

দলীয় স্বার্থ ও চক্রান্তে মহামারী প্রতিরোধে পৌরসভার চরম ব্যর্থতা

নাগরিকদের জীবন লইয়া ছিনিমিনি

কলকাতায় কলেরার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ এবং প্রতিষেধ, দুই ব্যবস্থাই বার বার ব্যর্থ হয়েছে। ব্যর্থতার পিছনে একটি কারণ হচ্ছে পৌরসভার চিরাচরিত ঔদাসীন্য। কিন্তু আরও একটি কারণ আছে, যেটা সাধারণ মানুষের লক্ষ্য গোচর করা দরকার।

পৌরসভার প্রত্যেক ব্যাপারে যে দলীয় চক্রান্ত এবং স্বার্থের রাজনীতি রয়েছে, কলেরাও তার থেকে মুক্ত নয়। কলেরা প্রতিরোধের পরিকল্পনাগুলি কিভাবে ব্যর্থ হয় এবং কিভাবে ওর মধ্যেও ক্ষমতার দ্বন্দ্ব প্রবেশ করে, সে একটা বিচিত্র কাহিনী।

গভর্নমেণ্ট এবং কর্পোরেশনের মধ্যে এক প্রস্ত মর্মান্তিক লড়াই, দ্বিতীয় প্রস্ত লড়াই ক্ষমতার ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে কাউন্সিলরে এবং কর্পোরেশন অফিসারদের মধ্যে এবং তৃতীয়ত আছে, কোনো কোনো জায়গায় বিরোধী দলের দায়িত্বহীন উস্কানী। এই তিন প্রকারের অন্তর্দ্বন্দ্ব থাকে এক কথায় কলেরার রাজনীতি বলা যায়, কলকাতার বস্তীগুলিকে প্রতি বছর মারাত্মক মহামারীর সম্মুখীন করে।

আজ থেকে প্রায় ছয় বছর আগে সরকার একটি পরিকল্পনার দ্বারা বাস্তুহারা ক্যাম্পগুলি থেকে কলেরার উপদ্রব সম্পূর্ণ দূর করতে সমর্থ হয়েছিলেন। ঘুঘুড়ি, কাশী-পুর, রাণাঘাট ইত্যাদি ক্যাম্পে, যেখানে চরম অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে কয়েক হাজার লোককে ঠেসে রাখা হত, তার অনেকটা কলকাতার কলেরা বস্তীর চেয়ে উন্নততর ছিল না। কিন্তু ক্যাম্প-গুলিতে বন্ধ্যাত্মূলক কলেরার ইঞ্জেকশন প্রবর্তন করা হয়েছিল এবং গত ছয় বৎসর বড় মড়ক কোথাও দেখা দেয় নি।

কিভাবে পরিকল্পনাটি এল

১৯৫২ সলে ক্যাম্পগুলি নিয়ন্ত্রণে মড়কের স্থায়ী আক্রমণ হয়েছিল এবং সংবাদপত্রে এর প্রচার সমালোচনা আরম্ভ হয়। উদ্যোক্তা-দের মধ্যে ইঞ্জেকশন নিতে বলা হল, অধিকাংশই নিতে অমান্য নিজ বাসস্থানেই হয়। হিসেবে দেখা যায় প্রতি চার মিনিটে একজন কলেরার আক্রান্ত হয়।

এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, কেননা এই রোগের আসা-যাওয়া কলিকাতার কোন নতুন সংবাদ নয়। বসন্তকলেরার অভি পাটিতে অভিণি এই কলেরা। আর পরিচিত মধ্যেও বিস্ময়ের সমস্ত থাকথা, সুযোগ ও সুবিধা করেন অতিথি-পরায়ণ কর্পোরেশন।

প্রতি বছরই একটা ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে সারা এপ্রিল মাস কলেরার অবাধ বিচরণ। আন্দু-লেশের অভাব, চীকার ব্যবস্থা,

(২য় পৃষ্ঠায়)

কলেরার ব্যাপারে আমরা চেহেরিয়েশন একটি পূর্ণ তথ্য-তত্ত্বের রিপোর্ট পাঠকের কাছে পেশ করব। ৭ দিন পূর্বে এর পরিকল্পনা রচিত হয়েছিল।

মধ্যবিংশ শতাব্দীতে কলকাতার নায় নগরীতে কলেরা সম্ভব হয়?—এই প্রাথমিক প্রশ্নটি আমরা সম্মুখে রেখেছিলাম। পানীয় জলের সরবরাহে কোনো বহুর বিভাট ছাড়া কলেরার মহামারী সম্ভব নয়, একথা আমরা জানি। পানীয় জল সরবরাহের শিছনে কর্পোরেশনের কোন্ রাজনীতি আছে, যার দরুণ প্রতি বৎসর এই সমস্যা বার বার আমাদের আক্রমণ করছে? দর্পণের প্রতিনিধি এই প্রশ্ন-গুলির উত্তর সন্ধান করেছেন।

নলকূপের সংখ্যা বৃদ্ধি করা এবং পানীয় জলের মেইন পাইপের পরিবর্তন কেন সম্ভব হল না, কলেরার শিছনে গভর্নমেণ্ট এবং পৌর সভার ক্ষমতার দ্বন্দ্বের কি চিত্র আছে? —দর্পণের আর একজন প্রতি-নিধি সেই তথ্য গত তিনদিন যাবৎ অনুসন্ধান করেছেন।

হাসপাতালে অবর্ণনীয় অবস্থার মধ্যে রোগীদের রাখা হয়েছে, প্রতিষেধকের ব্যবস্থা সময়মত হয়নি এবং আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানীর উন্নত সাহায্য থেকে আমাদের বঞ্চিত করা হয়েছে। কোথায় এই বঞ্চনা এবং অসা-দার্থতার আসল কারণ?—এই তৃতীয় প্রশ্নটির ভিত্তিতে আর একটি রিপোর্ট তৈরী হয়েছে।

দর্পণের ৪ জন প্রতিনিধির সম্মিলিত চেষ্টার গত এক সপ্তাহ যাবৎ যে তথ্য আমরা সংগ্রহ করতে পেরেছি, এই সংখ্যায় সেই গভীর বেদনা ও আত্মধিক্কারের চিত্র আমরা পাঠকের সম্মুখে পেশ করছি। কেননা, আমাদের সম্পাদকীয় প্রবন্ধে একথা দেখানো হয়েছে যে, শারীরিক ব্যাধির চেয়েও এই মহামারী একটা ভয়ঙ্কর সামাজিক ব্যাধির উপসর্গ। এবং এই গভীর ব্রাডেডির বিরুদ্ধে নিছক প্রাথমিকের মাধ্যমে কলকাতার সাধারণ মানুষ যদি দাঁড়াতে চায়, যদি এর প্রতিবিধানের জন্য সংঘবদ্ধ সবল হাত ঊর্ধে উত্থিত হয়, দর্পণ সেই সাধারণ মানুষের প্রাণধারণের হাতিয়ার হবে।

—সম্পাদক, দর্পণ

কলেরা নিয়ে রাজনীতি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বন্তী, রাস্তাঘাট পরিষ্কার, পানীয় জল সরবরাহ প্রভৃতি বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সম্পূর্ণ ব্যর্থতা। অবশ্যই কোনই উন্নতি বিধান হয় না বরং ক্রমশঃ আরও অবনতির লক্ষণ প্রকাশ পায় বলিয়া রাষ্ট্র তার শৈশব অতিক্রম করে প্রায় তারুণ্যে প্রবেশ করেছে।

সরকার, কর্পোরেশন থেকে আরম্ভ করে ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল এসোসিয়েশন ও অন্যান্য বহু সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান আজ এগিয়ে এসেছেন ব্যাপকভাবে টীকা দেবার জন্য এবং এখানেই তাঁরা ক্ষান্ত হন নি। তাঁদের কাজের বিস্তারিত বিবরণ প্রতি সপ্তাহে সংবাদপত্র অফিসে তাঁরা পাঠাতে ভোলেন না। ফলে হয় যেন সংবাদপত্রের স্তম্ভে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের প্রচার কার্যই মুখ্য উদ্দেশ্য, আর সমাজসেবা গৌণ।

তা না হলে এই সমস্ত টীকা দেওয়ার কাজ, নর্দমা পরিষ্কার এইগুলো কেন গুরুত্ব পায় না জানুয়ারী মাসের শেষে। প্রতি বৎসরেই ত মার্চের শেষ থেকে মহামারী শুরু হয়। এই মহামারীর ব্যাপকতা কিছু পরিমাণে প্রলম্বিত হত, যে সমস্ত ব্যবস্থা আজ করা হচ্ছে সেগুলো যদি সাঁতের শেষ থেকে আরম্ভ করা হত

রোগ সম্পর্কে গবেষণার অভাব

স্বাধীন ভারতবর্ষে বিজ্ঞান চর্চার বহু ব্যবস্থা নাকি করা হচ্ছে। অন্ততঃ সেই রকম জনশ্রুতি। সরকারী প্রচার বিভাগের নথি থেকে টোকা সংবাদ মারফৎ সংবাদপত্রও একই কথা পাঠকদের বোঝাবার চেষ্টা করেন। দেখে-শুনে কিন্তু অভিজ্ঞতা অন্য রকম হয়। সেদিন আলোচনা হচ্ছিল মেডিক্যাল কলেজের এক নাম করা ডাক্তার গবেষণাকারীর সঙ্গে। তাঁর মতে, কলেরা সম্পর্কে রীতি অনুযায়ী বিশেষ কোন গবেষণা কলিকাতায় হয় না আর হলেও তা ফলপ্রসূ নয়। এত বড় একটি রোগ যার শ্যায় হাজার হাজার লোক আ কা স্ত হ য়ে যা ক, সে স ম্প র্কে কো ন মৌলিক গবেষণা নেই, আর আমরা বলে বেড়াই দুরপ্রাচ্যে ভারতবর্ষ সভ্যতার সবচেয়ে অগ্রসর। কলেরা সম্পর্কে উপরেই পরিসংখ্যান গ্রহণ, সহরের কোন অংশে এর প্রথম উপস্থিতি এবং পরে এর বিস্তৃতির পূর্ণ বিবরণ সম্বলিত রিপোর্ট এবং সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে পর বৎসরের জন্য প্রতিষেধক প্রয়োগ প্রভৃতি কোন কাজেই আজ পর্যন্ত রীতিসম্মতভাবে হয় নি। সরকারের পক্ষে টাকার প্রশ্নে এই অপরিহার্য কাজগুলি যদি করা সম্ভব না হয় তবে তা অবশ্যই অমার্জনীয় অপরাধ। কিন্তু দুঃখের কথা সব বিষয়েই যা আমরা সরকারের উপর নির্ভরশীল থাকব কেন। ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল এসোসিয়েশন, রোটারী ক্লাব যার নেতৃত্ব করবে বহু প্রখ্যাত ডাক্তার এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান যদি এই ব্যাপারে সম্মিলিত প্রচেষ্টা করেন তা হলে সফল অবশ্যম্ভাবী। চারু মিশ্র প্রদর্শনী, সিনেমা গানের কনফারেন্স প্রভৃতি বিষয়ে যদি টাকা পাওয়া সম্ভব হয় তবে এই কাজ টাকার অভাবে পেছিয়ে থাকতে পারে না। দরকার কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের সম্মিলিত প্রচেষ্টা আর উপযুক্ত নেতৃত্ব। কলিকাতার মত সহরে এর অভাব হওয়া উচিত নয়।

পরের দৃশ্য দুর্দশার সাড়া দিয়ে সম্পূর্ণ মানবিক আবেদনের তাগিদে নিঃস্বার্থ কাজের প্রতিযোগিতা কলিকাতাবাসীর আছে। এবং এ বৎসরেও তার ব্যতিক্রম হয় নি।

ডাক্তার ও নার্সের অভাব

প্রতিদিন তিনশো করে রোগী এসে পড়ছে হাসপাতালে চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। দ্রুত চিকিৎসার ফলে দু দিনে তাঁর রোগ কিছুটা প্রশমিত হল বটে কিন্তু দেহের অন্য যন্ত্রগুলি বিকল হয়ে গেল। কলেরার চিকিৎসার বাস্তব এবং অত্যধিক পরিশ্রমে ক্লান্ত ডাক্তারদের নজরে সেগুলি পড়ে নি—হয়ত বা পড়া সম্ভব ছিল না। রোগী মারা গেল, ২৩ বৎসরের অন্তঃসত্ত্বা বিধবা ও এক শিশু রেখে। বুধে ঘোষ ছিলেন কলিকাতার পুরোনো মিস্টে সিলভার ফিফাইনারির এক্সজন অফিসার

কলিকাতায় গত এপ্রিল বছরে কলেরায় আটার হাজারের অধিক লোকের মৃত্যু

কর্পোরেশনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী হিসাবে দেখা যায় যে, গত এপ্রিল বছরে মোট ১৮,০০২ জন কলেরা রোগে মারা যায়।

ঐ পরিসংখ্যান থেকে আরও দেখা যায় যে, ১৯৪৭ থেকে প্রতি বৎসরই কলিকাতায় কলেরা রোগে মহামারীর আকারে আত্মপ্রকাশ করে আসছে। বার্ষিক আক্রমণ ও মৃত্যু সংখ্যা যথাক্রমে নীচে দেওয়া হল :—

সাল	আক্রান্ত	মৃত্যু
১৯৪৭	৪,৯৭৩	১,৫০৫
১৯৪৮	৭,৯৪৭	২,৪৭৮
১৯৪৯	৫,৫৩২	১,৮৮২
১৯৫০	৯,৫৩১	৪,২১৬
১৯৫১	৫,৬৯৪	১,৬৫৪
১৯৫২	৩,৩৫৩	১,৫৫৬
১৯৫৩	৬,৩২২	২,১৫২
১৯৫৪	১,৫২৪	৬৫৪
১৯৫৫	২,৬৫১	১,০২৮
১৯৫৬	২,১১৮	৮৪৫
১৯৫৭	১,৪০৫	৬৩২

১৯৫৮ সালের ১২ই এপ্রিল যে সপ্তাহ শেষ হয়েছে সে সপ্তাহে পর্যন্ত ১০৫ এবং ৩২ই।

জনো। আরগ্যার অভাব আর ইঞ্জিনীয়ার। এইরূপ বহু ঘটনা রোগীর তুলনায় ডাক্তার কম। হাসপাতালের ডাক্তাররা সবাই এগিয়ে দোষ দিয়ে লাভ নেই। দোষ এলেন কলেরা রোগীদের পরিচর্যার। হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগ থেকে, ডাক্তারেরা, নার্সগণ এবং ওয়ার্ড বয় পর্যন্ত সবাই নিজ নিজ বিভাগে নিয়মিত কাজ করার পর স্বেচ্ছায় কাজ করতে এলেন কলেরা বিভাগে। কোন বাড়তি পয়সার লোভে নয়—কারণ এর জন্য বেশী পয়সা দেওয়া হয় না—আর্ত লোকের সেবার আদর্শে। আশ্চর্যের কথা হৃদয়ের হাওয়া অনুযায়ী কিন্তু এরা সংবাদপত্রে টেলিফোন করেন নি নিজেদের সেবা কার্যের একটা ছবি ও রিপোর্ট প্রকাশের চলন।

ডাক্তার নার্সের যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন এবং তার জন্য তাঁরা হাজার হাজার পরিবারের আন্তরিক অভিনন্দন পাচ্ছেন। এর মূল্য খবরের কাগজের স্তম্ভে প্রকাশিত বিবরণ অ পে ক্ষা ব শী। একথা অ স্বী কা র করার উপায় নেই—এবং ডাক্তারেরা কেউই অস্বীকার করেন নি—যে এত রোগীর চাপ সৃষ্টি হলে সম্পূর্ণ চিকিৎসা ব্যবস্থা করা অসম্ভব। সুচীভেদ্য অন্ধকার একটা ঘটনা ধরা যেতে পারে। ৩২।৩৩ বঙ্গাব্দ ইঞ্জিনীয়ার, বুধে ঘোষ কলেরা আক্রান্ত হন গত সংক্রান্তিবারে। তাঁর এণ্ডাও রোড কোয়ার্টার থেকে

ইঞ্জেকসন দেওয়ার প্রয়োজন

কলেরা প্রতিরোধের একমাত্র উপায় তাড়াতাড়ি সরকারে কলেরার ইনজেকসন দেওয়া। ইনজেকসন নেওয়া সম্বন্ধে লোকের অন্ধ সংস্কার আছে এবং ভয় ও আতঙ্কও রয়েছে। এই সংস্কার ভাঙ্গাবার, ভয় ও আতঙ্ক দূর করবার ব্যাপারে বামপন্থী নেতারা থাকেন না।

কয়েকবছর পূর্বে বাস্তুহারা কাম্পসমূহে কলেরার প্রকোপে বাধা হয়ে সরকার ঠিক করলেন কলেরার ইঞ্জেকসন নেওয়া হয়েছে বলে সার্টিফিকেট না দেখালে ডোল বা অন্যান্য রিলিফ দেওয়া হবে না। এখানে ক্যাম্পে ক্যাম্পে তাঁবু খাটিয়ে মেডিক্যাল স্কোয়াড্রন রাখা হল, দিন রাত ইঞ্জেকসন দেওয়ার ব্যবস্থা হল।

কোনো কোনো বামপন্থীদের উস্কানিতে সরকারের "ফেলমেস" প্রতিবাদ সুরু হল। কিন্তু যখন মৃত্যুর কালোছায়া ঘন থেকে ঘনতর হতে লাগল, দরদী নেতাদের সংখ্যা তখন বিরল হয়ে উঠল, ইঞ্জেকসন নেওয়ার বিরুদ্ধে আন্দোলন ক্ষুণ্ন হয়ে পড়ল।

দলে দলে লোক এসে মেডিক্যাল সেন্টারগুলিতে ভীড় করতে লাগল। এক মাসের মধ্যে সব ক্যাম্পে বাস্তুহারারা ইঞ্জেকসন নিল এর পর থেকে কলেরার ইঞ্জেকসন এবং বসন্তের টীকা নেওয়া তাদের মধ্যে ব্যাধ্যাত্মকের হয়ে দাঁড়াল : এই দুই মারাত্মক রোগের হাত থেকে এরা বহুলাংশে বেঁচে গেল।

এই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পরিকল্পনা তৈরী হল কলকাতার জন্য। হাজারখানেক বস্তীকে কেন্দ্র করেই সহরে কলেরা মহামারীর সূত্রপাত হয় প্রতি বছর। বস্তীর প্রত্যেক অধিবাসীকে যদি কলেরার প্রাদুর্ভাবের কিছু আগে ইঞ্জেকসন দেওয়া যায় তাহলে শুধু এদেরই বাঁচান যায় না, গোটা সহরটিকেই মহামারীর হাত থেকে রক্ষা করা যায়।

সরকারী পরিকল্পনা কর্পোরেশনের অফিসারদের নিকট এক বৈঠকে পেশ করা হল। তাঁরা সন্দেহ করলেন প্রস্তাবের ভিতর দিয়ে সরকার তাঁদের কাজে "হস্তক্ষেপ" করছেন। নানা রকম ওজর-আপত্তি তুলে ইঞ্জেকসন দিতে বাধা করলে, লোক ক্ষেপে যাবে, দাঙ্গা-হাঙ্গামা হবে, ইত্যাদি। শেষ পর্যন্ত খবরের কাগজগুলির চোখ-মোঁচকে তাঁরা রাজী হলেন। পরে দেখা গেল রাজী হলেও পরিকল্পনা কার্যকরী করার ইচ্ছা তাঁদের কম।

ইনজেকসন ব্যাথাত্মক বলে, দোড়াতে আপত্তি হবেই। বিশেষ চেষ্টার ফলে এই আপত্তিকে কাটিয়ে উঠতে হবে। কয়েক আড়াগার ইনঅকুলেটরদের ঘেরাও করা হয়েছিল। পুলিশের সাহায্য নিয়ে তাদের উদ্ধার করা হল। পুলিশ নিয়ে কয়েক বারগায় ইনজেকসন দেওয়া হল। এই ঘটনাগুলিকে কেন্দ্র করে কর্পোরেশনের কর্তৃপক্ষ প্রেসে বিবৃতি দিতে লাগলেন—পরিস্থিতির বিপদ উল্লেখ করে। কয়েক কর্পোরেশনের উপর খবরদারী করে। কিন্তু বামপন্থী দলগুলি কোন কিছু করার প্রয়োজনই বোধ করলো না।

পলিটিক্সের আন্দোলনী

পলিটিক্স আরকেশিক থেকে কলেরাবিরোধী আন্দোলনকে ব্যর্থ করে দিল এবং এখনও দিচ্ছে। সরকারের প্রস্তাব ছিল ইনঅকুলেটররা হেলথ অফিসারদের নির্দেশমত সরাসরি বস্তিগুলিতে গিয়ে ইনজেকসন দেবে। বারা ইনজেকসন না নেবে, তাদের নামধাম সেনিটারী ইন্সপেক্টরদের কাছে প্রথম পাঠাবে। সেনিটারী ইন্সপেক্টরের হস্তক্ষেপের পরও যদি তারা ইনজেকসন্ নিতে রাজী না হয়, তাদেরকে কোর্টে প্রসিকিউট করা হবে।

কাউন্সিলাররা ভয় পেলেন, এর ফলে তাদের কন্‌স্টিটিউয়েন্সি ঠিক রাখা মুস্কিল হতে পারে। তারা জেদ করলেন, ইনঅকুলেটরদের তাদের কাছে রেজ হাজির হবে। তারা তাদের যখন যেখানে যেতে বলবেন, যাবে। ফলে, ইনজেকসনে সাহায্যকারী কর্মী এবং আন্তরিক্ষজনদের মনোনীত ইনঅকুলেটরদের নিয়ন্ত্রে থাকতে হল। এদের সেবা করে সময় হলে, গরীব দুঃখীদের ইনজেকসন দেওয়া হয়। এখনও এই অবস্থাই রয়েছে।

তাই, একছর ছয় মাসে চারশ ইনঅকুলেটর দৈনিক গড়পড়তা আটজন করে ইনজেকসন নিয়েছে। অবশ্য গড়পড়তা মরু আটজন ইনজেকসন দেওয়ার পেছনে আরও রহস্য রয়েছে। চারশ ইনঅকুলেটর দের মধ্যে বেশ কয়েকজন "ডেটিক্স" কর্মচারী আছে যারা সংক্রমণ করা হচ্ছে এবং সন্দেহ করার কারণ পাওয়া গেছে।

কলেরা বা বসন্তের মহামারী হলে জরুরী অবস্থার উদ্ভব হয় এবং এই জরুরী অবস্থার নিজেদের ভেদবিভেদ, অহেতুক পরস্পরবিরোধী স্বার্থের কথা ভুলে গিয়ে এক সঙ্গে এর বিরুদ্ধে লড়াই করাই স্বাভাবিক ও বাঞ্ছনীয়। কিন্তু কলকাতায় এরকমটি আশা করা অধিকাংশে সময় যায় না।

তার আরেকটি প্রমাণ সরকারী এবং কর্পোরেশনের কর্মচারীর বৌথ বৈঠক নিয়ে মনকষাকষি। মহামারী দেখা দিলে সরকার কর্পোরেশন কর্মচারীদের মিটিং ডাকেন, পরস্পরের সামর্থ্য একত্রীভূত করে কাজে লাগাবার জন্য। কিন্তু কর্পোরেশনের কর্তৃপক্ষ এটা সুনজরে দেখেন না—হস্তক্ষেপ বলে আপত্তি তোলেন, কর্পোরেশনে অনুরূপ শাল্টা মিটিং ডাকা হল; সরকারী কর্মচারীদেরও আসতে বলা হল।

অন্যথায় করবার উপায় নেই, রাইটার্স বিল্ডিং-এ এখনও নিয়মশৃঙ্খলার আবরাণ আছে; কর্পোরেশনে অনেকদিন থেকেই তা নেই। অতএব, কর্পোরেশনের মিটিং-এ আলোচনা হল সন্দেহ নাই; কিন্তু সে আলোচনা এলোমেলো এবং তাতে কাজ এগোয় না।

প্রফুল্ল সেনের দুরবস্থা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

তাঁর এই অবস্থা কে করল? শ্রীসিংঘার্থ রায় কি?

অনুরূপ দলা হয়েছে শ্রীকালীপদ মুখার্জির। শ্রীসেনের ভাগ্যের চাকা ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে তিনিও ঘরে গেলেন রাইট এ্যাবাউট টার্ন করে ডাঃ রায়ের দিকে। নূতন করে আবার ডাঃ রায়কে কার্টিফেকেট করতে আরম্ভ করলেন। পুলিশ বিভাগের কাজকর্ম আবার ডাঃ রায়ের নির্দেশ মত হতে লাগল। মন্ত্রীর চাকুরি থাকলেই হল, মানঅপমানের বালাই তাঁর কোন কালেই ছিল না; এখনও নাই।

শ্রীসিংঘার্থ রায়ের পদত্যাগের পরবর্তী যুগে শ্রীঅতুল্য ঘোষের কি অবস্থা, তা কলিকাতার মেয়র নির্বাচনেই প্রকাশ হয়েছে। মিউনিসিপ্যাল এসোসিয়েশনের তিনি চেয়ারম্যান, তার উপরে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রিত্ব ৭ পদের ভাবী উত্তরাধিকারী (অবশ্য অল্প কিছু দিন শ্রীপ্রফুল্ল সেনের ফ্রন্ট-ম্যান হিসাবে কাজ করার পর)। সেই শ্রীঘোষ তাঁর মনোনীত প্রার্থী শ্রীবিজয়কুমার ব্যানার্জিকে কংগ্রেস কাউন্সিলারদের নিকট গ্রহণীয় করাতে পারলেন না। প্রকাশ্যে তারা বিদ্রোহ করলো এবং শ্রীঘোষকে ধরুরার মাথা থেকে ডাঃ রায়ের সেনকে কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবে মনোনয়নপত্র দিতে হল। শ্রীব্যানার্জিকে নিয়ে সাইকোথেরাপি করা হইল ওয়েস্ট সেণ্ডার বন্ধেটের স্থান লেল। শ্রীব্যানার্জিকে মনোনয়নপত্র দিতে তিনি কেন বন্ধ-পরিকর ছিলেন, সে আরেক কাহিনী।

সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

পশ্চিম বঙ্গের উদ্বাস্তু পুনর্বাসন দপ্তরের আনাচেকানাচে দুর্নীতি

সেদিবন্ধু সি আর দাশের দৌহিত্র শ্রীসিদ্ধার্থ রায় পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিয়া আজ বিশ্বাস হইয়াছেন। এই খ্যাতি লাভও কিন্তু আসলে মন্ত্রিত্ব ত্যাগে হয় নাই—লাভ হইয়াছে পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসী মন্ত্রি-দলগুলির অযোগ্যতা, দুর্নীতি-পরায়ণতা ও জনস্বার্থবিরোধী মনোবৃত্তি ও তথ্য উদ্ঘাটন করিয়া। [illegible] বঙ্গের সরকারী কার্য করিয়া [illegible] লাভ করিয়াছি তাহা [illegible] বলিতে পারি শ্রীসিদ্ধার্থ [illegible] বিধানসভার পদত্যাগের কারণ [illegible] ইহার এবং পরে যাহারে [illegible] যে সব বিবৃতি দিয়াছেন তাহার প্রতিটি অক্ষর সত্য ও অভ্রান্ত।

[illegible] সরকারের আহ্বানে [illegible] সালে রাজ্য সরকারের [illegible] দপ্তরে কর্মভার [illegible] দুর্নীতির দুর্নীতির [illegible] করি এবং [illegible] তদানীন্তন [illegible] শ্রীরতী রেকো [illegible] বিভাগীয় অফিসার-[illegible] করিয়া আমাকে প্রথমে [illegible] সরে সম্বাদ করেন। [illegible] করে হইয়াছিল এই [illegible] সরোষে আমি [illegible] এবং অফিসারদের [illegible] বাধিয়া এবং এক প্রকার [illegible] পারিবারিক সব সুখে-[illegible] দিয়া আমি একাকী [illegible] দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়িয়াছি।

যাহা হউক আমি বিভাগীয় দুর্নীতির বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিলাম তাহার এক-মাত্র উদ্দেশ্য ছিল যে, হতভাগ্য নরনারী সর্বস্ব হারাইয়া যুগ-যুগান্তের পূর্বেপ্রবেশে ছিন্নী পরিত্যাগ করিয়া আশ্রয় ও আহারের সন্ধানে পথের পশুর মত অজ্ঞাতের আলিঙ্গন করিতেছে, তাহাদের পুনর্বসন ও সাহায্যের অর্থ অপব্যয় ও অপহরণ ঘৃণ্যতম অন্যায় মনে করিয়া আমার নিকট উদ্বাস্তু পুনর্বসন সমস্যাটি রাজনীতির উর্ধ্বে, একটি সর্বভারতীয় জাতীয় সমস্যা মনে হইয়াছিল এবং মানবতার দৃষ্টিকোণ হইতে আমি উ প্রশ্নটির সমাধান চাহিতেছিলাম।

গত ২৮শে মার্চ ১৯৫৮ তারিখে নয়াদিল্লীতে মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রের চার্জ ওআর্ডি সার্ভিসের ডিরেক্টর ডাঃ মরিস উইলসন বলিয়াছেন যে, পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু সমস্যা বিশ্বের সর্বাপেক্ষা গুরুতর সমস্যা ("আনন্দবাজার পত্রিকা"—৩১শে মার্চ ১৯৫৮)। আর সকলের মত আমিও মিঃ উইলসনের অভিমত সমর্থন করি এবং সেই জন্যই বিভাগীয় মন্ত্রী ও পদস্থ অফিসারগণ কর্তৃক তাহাদের অনুসৃত্যকৃত (non-feasance) আচরণসমূহ, বাধ্যবাধকতার উদ্বাস্তুদের জন্য ন্যস্ত অর্থ ঋণ ও সাহায্য হিসাবে প্রদত্ত কন্ট্রাক্টর যে দুর্নীতি চলিতেছিল তাহার বিরুদ্ধে [illegible] সরকারী ফাইল হইতে বহু দৃষ্টান্ত দিয়া সরকারের নিকট এইরূপ অনুযোগসূত্রের যে ব্যবসায়ী ঋণ দেওয়া হইয়াছে উহা রিপোর্ট দিয়া জানাইয়া দেই।

আমার এই সব নোট সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তৎকালীন উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের ভ্রূনের অফিসার কোন এক উদ্বাস্তু ব্যবসায়ীর ঋণের আবেদনপত্রের উপর নোট দিয়াছিলেন—"ইন-ভেস্টিগেসারদের মন্তব্য, উপযুক্ত অথবা কোন উপরওয়ালা অফিসারের কোন কার্যের সমালোচনা করিবার অধিকার নাই। কোন কোন সময়ে গোপনীয়তার কারণে আমাদের অনুদ্বাস্তু সরকারী কর্মচারী অথবা তাহাদের পত্নীদের ব্যবসায়ী ঋণ মঞ্জুর করিতে এবং দিতে হয়, কিন্তু আমাদের কার্যবিধির বিচার করা তাঁহার কাজ নহে। তাঁহাকে সাবধান করিয়া দেওয়া হইল। ভবিষ্যতে এইরূপে কোন প্রশ্ন করিলে তাঁহাকে বরখাস্ত করিয়া দেওয়া হইবে।" আমি সরকারীভাবে ইহার যে জবাব দিয়াছিলাম তাহার একটিমাত্র লাইন তুলিয়া দিতে চাই—ইহা হইতেছে—

"I am not here to obey a dishonest order from a Minister".

শ্রীসিদ্ধার্থ রায় মন্ত্রিত্ব ত্যাগের কারণে বলিয়াছেন যে, একশ কোটি টাকা ব্যয় করিয়া পশ্চিমবঙ্গে এক হাজার উদ্বাস্তু পরিবারও পুনর্বাসন লাভ করে নাই। অতি সত্য কথা—কিন্তু কেন করে নাই উহার কারণ উপরেই সরকার নিজেই স্বীকার করিয়াছেন—"গোপনীয় কারণে" উদ্বাস্তুদের টাকা তাঁহারা অনুদ্বাস্তুকে দেন। কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু সমস্যা অনুধাবনের জন্য মাথরানেকে এখানে পাঠাইয়াছিলেন। কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকার মাথরাণী কমিটির রিপোর্ট প্রকাশ করিতে সাহস করেন নাই, করিলে দেখা যাইত উক্ত রিপোর্টে লেখা আছে যে, নামে পশ্চিমবঙ্গে কোন গ্রাম পর্যন্ত নাই সেই গ্রামে উদ্বাস্তুদের জন্য ক্যাম্পে পশ্চিমবঙ্গ সরকার লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করিয়া হাজার হাজার হতভাগা উদ্বাস্তুকে পুনর্বাসন করিয়াছেন—সাহায্য দিয়াছেন! এই টাকা চুরি করিয়াছে মন্ত্রীরা ও পদস্থ সরকারী কর্মচারীরা যোগাযোগ ও বড়বন্ত্র করিয়া।

উদ্বাস্তু পুনর্বাসন দপ্তরে পুরা গুয় বৎসর দায়িত্বপূর্ণ পদে কার্য করিয়া সরকারী নথিপত্র দেখিয়া পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সমস্যার কেন কোন সমাধান হয় নাই উহার কারণ মোটামুটি এই—

(১) অযোগ্য ও দুর্নীতি-পরায়ণ মন্ত্রিমণ্ডলী (২) দুর্নীতি-পরায়ণ ও স্খলিত নৈতিক চরিত্রের অফিসারগণ এই বিভাগ পরিচালনে (৩) কোন যোগ্যতা বা যুগ্যগুণ বিচার না করিয়া আত্মীয়স্বজন পোষণ করিবার উদ্দেশ্যে এই বিভাগে অফিসার নিয়োগ করা হয়। (৪) কেন্দ্রীয় সুস্থ ও বৈজ্ঞানিক যুক্তির ভিত্তিতে কোন স্থান করা হয় না—শুধু স্বজনপোষণ ও অর্থ অপহরণের উদ্দেশ্য লইয়া উদ্ভট স্থান করা হয় এবং এই জন্যই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শতকরা ৮০টি স্থানের পিছনে কোটি কোটি টাকা খরচ দেখানো সত্ত্বেও উহা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে। (৫) যাহারা উদ্বাস্তু বিভাগ হইতে সাহায্য ও পুনর্বসনের লাভ করিয়াছে উহাদের শতকরা ৭০ জন অনু-বাস্তু—মন্ত্রীদের ও পদস্থ অফিসারদের আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব অথবা অনুগ্রহভাজন। (৬) যে কাজ একশত টাকায় করা হয় উহার জন্য হাজার টাকা খরচ দেখানো হয়। (৭) স্বজন পোষণের জন্য দুর্নীতি-পরায়ণ ও চরিত্রহীন অফিসারদের পদোন্নতি হয়, ফলে কর্মঠ ও সৎ কর্মচারীদের উৎসাহ ও মনোবল নষ্ট হইয়া যায়।

যে কোন প্রকাশ্য তদন্ত কমিটির সম্মুখে আমার এই সাত দফা অভিযোগ আমি প্রমাণ করিতে রাজী আছি। বিভাগীয় মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল সেন আমার এই প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করিবেন কি?

পদত্যাগী মন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থ রায়ের মন্ত্রি-মণ্ডলীর বিরুদ্ধে অভিযোগের উত্তর দিতে গিয়া ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় জোর করিয়াছেন যে, মন্ত্রি-মণ্ডলীর দুর্নীতি দমন কমিটি নাকি হিমালয় পর্বত প্রমাণ কার্য করিয়াছেন। উত্তম—তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি উদ্বাস্তু পুনর্বাসন দপ্তরের মন্ত্রী ও পদস্থ অফিসার-দের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, স্বজন-পোষণ, সরকারী অর্থের অপচয় ও অপহরণের বহু বিষ অভিযোগ সরকারী নথি ও ফাইলের উল্লেখ করিয়া এবং প্রমাণ করিবার চ্যালেঞ্জ জানাইয়া আমার পদত্যাগ সত্তর বৎসরের বৃদ্ধা জননী গত ২৬শে আগষ্ট ১৯৫৭ তারিখে বিভাগীয় মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল সেনের নিকট মন্ত্রি-মণ্ডলীর দুর্নীতি-দমন কমিটির নিকট উথাপনের জন্য পাঠাইয়াছিলেন—তাহার ফলাফল কি হইয়াছে?

পরিশেষে আমি দেশের সমস্ত রাজনৈতিক দল কংগ্রেস, কম্যুনিষ্ট, পি-এস-পি, আর-এস-পি প্রভৃতি এবং সংবাদপত্র জগতের নিকট বিনীত আবেদন জানাইতে চাহি যে, আপনারা উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সমস্যাটি রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ হইতে নহে—রাষ্ট্রীয় জরুরী ও গুরুতের সমস্যা হিসাবে মানবতার দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বিচার করুন। সকলে একত্র হইয়া ধীর ও শান্ত পরিবেশে নৈতিক শক্তি ও তথ্য বিচার করিয়া এই বিরাট সমস্যার সমাধান করিয়া জাতিকে বাঁচান। উদ্বাস্তুদের লইয়া রাজনৈতিক খেলা খেলিলে এবং উহাদের যে অর্থ চুরি করিয়া বাড়ী, গাড়ী হাঁকাইলে সমগ্র জাতির অর্থনৈতিক কাঠামো ভাঙিয়া পড়িবে এবং নৈতিক-চরিত্র ধ্বংসিয়া যাইবে। সংবাদপত্রের সম্পাদক ও মালিকদের নিকট আমার আরও একটি বিশেষ নিবেদন আছে—দুর্নীতির বিরুদ্ধে আপনারা মুখিয়া দাঁড়ান নতুবা জাতির ধৈরদণ্ড ধূলায় লুণ্ঠিত হইবে—দুর্নীতি বিনিই অবলম্বন করুন—মন্ত্রী, উপমন্ত্রী, ছোট বড় সরকারী কর্মচারী, ব্যবসায়ী অথবা সমাজের গণামান্য তিনিই সমগ্র জাতির শত্রু। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি কলিকাতার অধিকাংশ সংবাদপত্রই হাগার জাতীয় গণামান্যদের দুর্নীতির জন্য প্রশংসা পাইলেও তাহা-দের বিরুদ্ধে কিছু লেখেন না—সরকারী দুর্নীতির খবর তো ছাপিতেই চাহেন না। ছায়া নট-নটীদের "পদ্মশ্রী" চোকস চোর-দের "পদ্মভূষণ" আর চরিত্রহীন দুর্নীতিপরায়ণ অফিসারদের পদো-ন্নতি করিয়া জাতি গঠন করা স্বপ্নের বিলাসমাত্র। বিনীত—

রাধীরঞ্জন দে।

বোম্বাই-এর চিঠি

(৮ম পৃষ্ঠার পর)

প্রান্ত মস্তকের অস্ত্রোপচারের দ্বারা অত্যন্ত সম্পর্পণে ও সংগোপনে বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে করা। ডিরেক্টর জেনারেল অব শিপিং ডাঃ নগেন্দ্র সিং আই, সি, এস্ এর তত্ত্বাবধানে, ডেপুটি ডিরেক্টর শ্রী পি, আর, সত্তমানিয়াম্ বিদেশ থাকছা করেন। এই আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে যে বিবৃতি লোকসভার সদস্যদের নিকট বিলি করা হয়, তার মধ্যে "ভারতীয় জাহাজের" এই নতুন সংজ্ঞার সম্পর্কে অনুল্লিখিত। সুতরাং জানাজানি হলে বহু স্বদেশপ্রেমিক সদস্য জাতির স্বার্থের খাতিরে এর বিরোধিতা করতে পারেন আশঙ্কা করেই তা করা হয়নি।

দুইটি উদ্দেশ্যে সংজ্ঞার্থের পরিবর্তন করা হয়েছে বলে মনে করা যেতে পারে। আপাততঃ তিনটি বাণিজ্য-নাবী এক সংকটময় অবস্থায় তিনটি বন্দরের বহু জাহাজ অকর্মণ্য অবস্থায় পড়ে থাকতে বাধ্য হয়েছে। তিনটি জাহাজ নির্মাণ শিল্পও, জাহাজ নির্মাণের কাজ খুঁজে বেড়াচ্ছে। তিনটি বাণিজ্য-নাবী, ভারতের অর্দ্ধেক পরিমাণ আমদানী ও রপ্তানীর মাল এখনও বহন করে। সে স্থলে ভারতীয় জাহাজ জাতীয় বাণিজ্যের মাত্র ৫% বহন করে। ভারতীয় জাহাজের নৈকল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলে তিনটি বাণিজ্য-নাবীই প্রধানতঃ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আমেরিকান আইনে, সরকারী মালের ৫০% আমেরিকান জাহাজই বহন করতে বাধ্য। পশ্চিম জার্মাণ সরকার যুদ্ধের পর থেকে, সেদেশের বাণিজ্য-নাবীকে প্রায় ৭০০ কোটি টাকা অর্থদান করেছে ও সর্বতো-ভাবে জাহাজ শিল্পকে সাহায্য করছে। পূর্বে ইয়োরোপ ও রাশি-গার সহিত ভারতের ৫০ : ৫০ বিনিময়ে জাহাজে মাল বহন করা হয়। সেইজন্য ভারতীয় শিপিং-নাবীর উপরোক্ত তিনটি ও নয়েম-জিয়ান জাহাজ শিল্পই প্রধানতঃ ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

ব্রিটিশ জাহাজ শিল্পের দুর্দিন এবং ভারতীয় জাহাজ-শিল্পের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্ভাবনায়, ব্রিটিশরা এদেশে তথাকথিত "ইণ্ডো-ব্রিটিশ" জাহাজ শিল্প প্রতি-ষ্ঠান গঠনে অগ্রণী হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণভাবে ব্রিটিশ স্বার্থরক্ষায় পরিচালিত হবে। ১৯৫০—৫১ সালে ইংলণ্ড ও ভারতের প্রধান দুইটি বাণিজ্য-নাবী প্রতিষ্ঠান এই ধরণের এক যুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান গঠনের অগ্রণী হয়। "ইণ্ডিয়ান মার্চেণ্ট চেম্বার" ও "ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রী"র ঘোর-তর বিরোধিতাই সে উদ্যম ব্যর্থ করে।

কিন্তু এখন লোকসভায় এই বিল আনার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় জাহাজ-শিল্পে সুপরিচিত শ্রী এস্ এন্ হাজী প্রমুখ কয়েকজন ভারতীয় নাগর বাণিজ্য-নাবী প্রতিষ্ঠান গঠন করেছেন। বর্তমান আইনকে পরিবর্তিত করে, নতুন আইন হবার পর, ভারতীয় জাহা-জের নতুন সংজ্ঞাকে সুযোগ নিয়ে এঁরা বিদেশী মূলধন দ্বারা তথাকথিত "ইণ্ডো-ব্রিটিশ" জাহাজ-নাবী সংস্থা গঠনে উদ্যোগী হয়েছেন। সৌরাষ্ট্রের ভূতপূর্ব কয়রাজা ওরান্ কানের-এর ভূতপূর্ব রাজ্য শ্রীরাজীর প্রধান সম্বল, সহায় ও সমর্থক। এই রাজার সাঁহত ভিরেক্টর জেনারেল অব শিপিং ডাঃ নগেন্দ্র সিং-এর আত্মীয়তা আছে আর তাছাড়া এই 'সিভিলিয়নের ইয়ার-প্রীতির কথাও বহুলপ্রচারিত।

এঁরা বলছেন যে ভারত এখন গুরুতর বিদেশী মুদ্রা সঙ্কটের মধ্যেদিয়ে যাচ্ছে। দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী ৯ লক্ষ টন জি-আর টিতে পৌঁছতে হলে বিদেশী মূলধন এদেশে আনতে হবে। এ ক মা হ তার স্বার্থেই জাহাজ চরের বিদেশী মুদ্রা সম্পদান হওয়া সম্ভব। বহু কারণে এই যুক্তি অমূলক। প্রথ-মতঃ স্থলবর্তী শিল্পের তুলনায় জাহ-জ-শিল্প দেশরক্ষা ও প্রতিরোধের ক্ষেত্রে অধিক গুরুত্ব-পূর্ণ এবং এখানে জাতীয় স্বার্থের জন্য বিদেশী প্রভাব সম্পূর্ণ বর্জনীয়। দ্বিতীয়তঃ, সাধারণতঃ জাহাজগুলি বিদেশী এলাকতেই ঘোরাফেরা করে এবং দূরে থেকে তা প্রয়োজনের সময় নিয়ন্ত্রণ করতে হলে, স্বদেশপ্রেমিক একান্ত অনুবর্তী ভারতীয় নাবিক ও অফিসার দ্বারা পরিচালিত হওয়া কর্তব্য। তাছাড়া বিদেশীরা লভ্যাংশের আর নিজের দেশে নিয়ে যাবার অধিকার পাবে না।

এখন দেখা যাক, লোকসভা কি ব্যবস্থা অবলম্বন করে।

আন্তর্জাতিক সংবাদ

শীর্ষসম্মেলন আমেরিকার আর্থিক সঙ্কট ফরাসী মন্ত্রীসভার পতন

(নিজস্ব পর্যবেক্ষক)

দুনিয়াটা আজও পুরোপুরি আমেরিকা ও রুশিয়ার মধ্যে ভাগাভাগী হয়ে যায় নি। কিন্তু দেশ দুটির প্রভাব এত যে, দুনিয়ার ভাগ্য এদের মর্জির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। কয়েক মাস ধরে শীর্ষ সম্মেলনের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে জোর আলোচনা চলছে, কিন্তু রুশিয়া ও আমেরিকার মধ্যে এই বিষয়ে মতপার্থক্য কমেই বাড়ছে বই কমছে না। আন্তর্জাতিক উত্তেজনা কমছে এমন কোনো চিহ্নই এখনো দেখা যায় না।

রুশিয়া নিরাপত্তা পরিষদের নিকট অভিযোগ করেছে যে, হাইড্রোজেন বোমা নিয়ে উত্তর মেরুর উপর দিয়ে মার্কিণ এরোপ্লেন মাঝে মাঝেই রুশিয়া সীমান্তের দিকে যাতায়াত করে। পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে যে, যে কোনো সময় যুদ্ধ বেধে যেতে পারে।

আমেরিকার তরফে প্রথম অভিযোগটি অস্বীকার করা হয়। কিন্তু পরে বিভিন্ন মহল থেকে যা বলা হয় তাতে এই অভিযোগ অস্বীকার করার পরিবর্তে "স্বাধীন দুনিয়ার" স্বার্থে এরূপ মহড়ার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেওয়া হয়। এও বলা হয় যে, রুশিয়া যাই বলুক বা করুক না কেনো, এই মহড়া চলতে থাকবে।

যদি মার্কিণ এরোপ্লেন রুশিয়ার দিকে না এসে, সুবিধে এরোপ্লেন হাইড্রোজেন বোমাসমেত আমেরিকার সীমান্তে টহল দিয়ে বেড়াত, তবে? হয়তো, এত দিনে যুদ্ধ বেধে যেত। ভাগ্যিস "গণতান্ত্রিক (কমুনিস্ট) দুনিয়ার" স্বার্থে রুশিয়া এ পন্থতি গ্রহণ করে নি।

বহু যুগ আগের কথা। রুশিয়া তখনও কমুনিস্ট হয় নি, এমন কি মার্ক্সের নেতৃত্বে কমুনিস্ট আন্দোলনও দানা বেঁধে ওঠে নি। কিন্তু আমেরিকা "মানরো" ডকট্রীন ঘোষণা করে ইওরোপের দেশগুলোকে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলো থেকে তফাতে থাকতে নির্দেশ দেয়, যেন সমগ্র মহাদেশটিই তার জমিদারী।

বর্তমান যুগে, মাত্র কয়েক মাস পূর্বে, প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার আবার পশ্চিম এশিয়া সম্বন্ধে প্রায় অনুরূপ একটি নীতি ঘোষণা করেছেন। এ অঞ্চলে দেদার তৈল সম্পদ বর্তমান। আমেরিকার তা চাই। আরব দুনিয়ার কমিউনিজমের প্রসার রোধ করবার নাম করে, এ কাজ করা হয়েছে, কিন্তু আসলে ঘায়েল হচ্ছে বৃটিশ স্বার্থ।

রুশিয়া যদি মেক্সিকো বা ভেনিজুয়েলা সম্বন্ধে অনুরূপ কোনো নীতি ঘোষণা করত, পৃথিবীটা তৃতীয় মহাযুদ্ধে কবে ছারখার হয়ে যেতো। বস্তুত, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় যে রাজনৈতিক পরিস্থিতি শত বছরের উপর ক্রমেই হয়েছে তাতে নিতান্ত মামুলী ধরণের আন্দোলনও—যদি সে আন্দোলন মার্কিণ স্বার্থের পরিপন্থী হয়— সম্ভব নয়।

কয়েক বছর আগে, এমনি এক গভর্ণমেন্ট গঠিত হয়েছিল ক্ষুদ্র রাজ্য গুয়াতেমালায়। আমেরিকান চুটে কোম্পানীর জমিদারীর স্বার্থে আঘাত পড়ে। মার্কিণ অন্তরঙ্গ নিয়ে আমেরিকার তল্পীবাহী বিদ্রোহীরা সে সরকারের পতন ঘটায়। সেখানেও রব তোলা হয়েছিল, কমুনিস্টরা আমেরিকা মহাদেশে প্রবেশ করেছে, এদের নিশ্চিহ্ন করতে হবে।

ঢাকঢুকুড় না করেই আমেরিকা রুশিয়ার চতুর্দিকে বিভিন্ন দেশে সামরিক ঘাঁটি তৈরী করেছে—তুর্কে, আইসল্যাণ্ড, পশ্চিম জার্মানী, ফ্রান্স, ইতালী, তুরস্ক, ইরাক, পাকিস্থান, থাইল্যাণ্ড, ফিলিপাইন, জাপান ইত্যাদি। এসবকে এখন আণবিক ও হাইড্রোজেন অস্ত্রে সজ্জিত করবার চেষ্টা চলছে কোনো কোনো দেশে, যথা বৃটেন—ইতিমধ্যেই মার্কিণ ঘাঁটিগুলোকে আণবিক অস্ত্রে সজ্জিত করা হয়েছে এবং চব্বিশ ঘন্টা মার্কিণ এরোপ্লেন এ সব অস্ত্র সমেত উড়ে বেড়াচ্ছে।

রুশিয়া যদি আমেরিকাকে এমনভাবে সামরিক ঘাঁটি স্থাপা ঘিরবার চেষ্টা করত? "স্বাধীন দুনিয়ার" ত্রাণকর্তা আমেরিকা "আত্মরক্ষার" নামে কিনা করত? আমেরিকান সংবাদপত্রে বহুবার বহু রকমভাবে দেখানো হয়েছে বিদেশের ঘাঁটিগুলো থেকে কি করে রুশিয়া ও তার "ভাবনার" দেশগুলোকে ঘায়েল করা যায়।

আমেরিকার আর্থিক সঙ্কট ও

দুনিয়ার বিপদ

কিছুদিন হল, আমেরিকার আর্থিক সঙ্কট দেখা দিয়েছে। এর ধাক্কা বহু ধনতান্ত্রিক দেশেও পৌঁছেছে। আমেরিকার বস্ত্রোদ্যমে বেকারের সংখ্যা এখন ৫২ লক্ষের বেশী এবং ক্রমেই তা বাড়ছে। শেয়ার বাজারে মন্দা চলছে, প্রধান প্রধান ক্ষেত্রে উৎপাদন কমিয়ে দিতে হচ্ছে। ভারী শিল্প, যথা লৌহ ও ইস্পাত, মোটর গাড়ী ইত্যাদিতে এই সঙ্কট প্রকাশ হয়েছে সর্বাধিক। লৌহ ও ইস্পাত তৈরীর ক্ষমতার শতকরা ৪৮ ভাগ মাত্র কাজে লাগান হচ্ছে। তৈল উৎপাদনও রমেই হ্রাস পাচ্ছে।

১৯২৯—৩০ এর অবস্থা এখনো পৌঁছে নি। তখন আমেরিকার অর্থ ব্যবস্থা সামাল দিতে—অর্থাৎ জিনিসপত্রের দাম চড়া রাখতে—শত শত কোটি টাকার দ্রব্য সমুদ্রে ফেলে দেয়া হয়েছিল এবং জন্য উপায়ে ধ্বংস করা হয়েছিল। মন্দা তার পরও দেখা গেছে, কিন্তু তাকে আখ্যা দেয়া হয়েছে "আর্থিক ব্যবস্থার সাময়িক পশ্চাদপসরণ।" আজ আর এ কথা বলে লোককে ভুলানো যাচ্ছে না। আমেরিকার এখন যত বেকার আছে, গত সতেরো বছরের মধ্যে এত আর কখনো ছিল না।

অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য সরকার বহু কোটি ডলার ব্যয় করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে—রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ী তৈরী করবার উদ্দেশ্যে। আবগারী শুল্ক কমানোর এবং বিদেশ থেকে আমদানী কমিয়ে দেবার দাবী উঠছে।

কিন্তু এ করে বড় অর্থনৈতিক সঙ্কট কখনো এড়ানো যায় না। এ অবস্থায় ধনতন্ত্রের পরিত্রাণের প্রধান উপায় হচ্ছে যুদ্ধ। ধ্বংসের প্রয়োজনে উৎপাদন বৃদ্ধি করে অর্থনীতিতে চাঙ্গা অবস্থা সৃষ্টি সম্ভব। দুনিয়ার মানুষের বিপদ সেখানেই।

আলজিরিয়া, টিউনিসিয়া নিয়ে ফরাসী মার্কিণ মতভেদ ফ্রান্সের মন্ত্রিসভার পতন হয়েছে। শ্রীগাইয়ের বিদায় নিয়েছেন। বর্তমান রাজনৈতিক সঙ্কটের মূলে হচ্ছে আলজিরিয়া। এ নিয়ে ফ্রান্সের টিউনিসিয়ার সঙ্গে বিবাদ বেধে যায় এবং তার ফলে চরম প্রকাশ হয় সাড়ে তিন মাস পূর্বে ফ্রান্স কর্তৃক টিউনিসিয়া গ্রাম সাকিরেতের উপর বোমা বর্ষণে।

সমগ্র পৃথিবীতে, বিশেষ করে আরব দেশগুলোতে, চূড়ান্ত ফরাসী-বিরোধ মনোভাব ছড়িয়ে পড়ে এবং ক্রমে ক্রমে এই মনোভাব সমগ্র পশ্চিমীদের বিরুদ্ধে দেখা দিতে সুরু করে। রুশিয়া এই মনোভাবের প্রচুর ইন্ধন যোগায় এবং সাম্রাজ্যবাদ-পদানত দেশগুলোর স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি জোর সমর্থন জানাতে সুরু করে।

বাগদাদ চুক্তি সত্ত্বেও, পশ্চিমীদের অবশ্য পশ্চিম এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকার কাছিল হয়ে পড়েছিল। টিউনিসিয়া ও আলজিয়ার সঙ্গে ফ্রান্সের বিবাদের নতুন পর্যায়ে পশ্চিমীরা আরও অসহায় বোধ করতে সুরু করে।

অবস্থার জটিলতা দূর করবার জন্য বৃটেন ও আমেরিকা একটি কমিটি নিয়োগ করে। এই কমিটি যখন ফ্রান্সকে কোনো প্রস্তুতাবেই রাজি করাতে সক্ষম হচ্ছিল না প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার স্বয়ং আসরে অবতীর্ণ হন। তিনি ফরাসী স ্র কা র কে হুমকী দেখান যার অর্থ হলো সে যেন টিউনিসিয়ার সঙ্গে সরাসরি আলোচনা সুরু করে। অন্যথায় নিরাপত্তা পরিষদে প্রশ্নটি উঠলে আমেরিকা ফ্রান্সের পক্ষে নাও দাঁড়াতে পারে।

এই হুমকির ফলে শ্রীগাইয়ের মতপরিবর্তন ঘটে, কিন্তু দক্ষিণপন্থীদের কিছুতেই বাগে আ না সম্ভব হয় না। সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা মন্ত্রের উদ্গাতা ফ্রান্সের কিন্তু সাম্রাজ্যের মোহ ফ্রান্সের দক্ষিণপন্থীরা, এমন কি সোস্যালিস্টরাও ত্যাগ করতে পারেন নি।

এই উপলক্ষে ফ্রান্সে উত্র আমেরিকা বিরোধী উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। মন্ত্রিসভার মধ্যে যে মতভেদ ছিল তা জাতীয় সভায়ও প্রকাশ পায়। শ্রী গাইয়ারের প্রস্তাব ৩২১-২৫৫ ভোটে পরাজিত হয়।

প্রেসিডেন্ট কোর্তী শ্রীবিনেকে মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য আহ্বান করেছেন। শ্রীবিনো দক্ষিণপন্থী পপুলার রিপাবলিকান দলের মধ্যেও দক্ষিণপন্থী। তিনি মন্ত্রিসভা গঠন করলে দক্ষিণপন্থীরা সন্তুষ্ট হবে বটে, কিন্তু তাঁর ও ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে আলজিরিয়া নীতির উপর।

আমেরিকার সামনে সমস্যা হচ্ছে আরবদের মনোভাব। যদি সে ফ্রান্সের পক্ষে মত বদলায়, আরবদের উপর তার প্রভাব আরও হ্রাস পাবে, এবং শেষ পর্যন্ত হয়ত ঐ অঞ্চল থেকেই তাকে পাততাড়ি গুটোতে হবে। বাগদাদ চুক্তি ভেঙ্গে যাওয়াও অসম্ভব নয়।

আলজিরিয়া এবং টিউনিসিয়ার সঙ্গে সরাসরি আলোচনা করবার জন্য আমেরিকা ফ্রান্সের উপর চাপ দিচ্ছে। দক্ষিণপন্থীরা এতে একেবারে মারমুখো হয়ে উঠছে। আফ্রিকার সাম্রাজ্য ছাড়া ফ্রান্সের অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়বে বলে দক্ষিণপন্থীরা রব তুলেছে। আর এই সাম্রাজ্যের ম ধ্য নি আলজিরিয়া। এর উপর দখল তারা কিছুতেই ছাড়বে না।

কয়েক বছর পূর্বে ফ্রান্সের দক্ষিণপন্থীদের মধ্যে অনুরূপ ভিন দেখা দিয়েছিল ইন্দোচীন নিয়ে। ফ্রান্সের পরাজয়ে ইন্দোচীন সমস্যার সমাধান হয়। সাম্রাজ্যবাদী দেশ যত কঠিনই হোক না কেনো, সাম্রাজ্যবাদী সূর্য অস্তগামী। এ দুনিয়াতে তাকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা বৃথা। জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন 'যত বিপদের সম্মুখীনই হোক না কেনো, তার জয় অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু আলজিরিয়ার স্থিতীয় ইন্দোচীন না হলে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের চোখ খুলবে বলে মনে হয় না।

সমকালীন রাজনীতি

(দর্পণের পর্যবেক্ষক)

বাংলা দেশের বর্তমান রাজনীতির পটভূমি হল এই যে, কংগ্রেস দেশের সমস্যাগুলির সমাধানে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। বরং বহু নতুন সমস্যা অগ্রগ্রেজনীয়ভাবে বৃদ্ধি করেছে। এর জন্য কংগ্রেসকে কোনভাবেই দোষমুক্ত করা যায় না। নির্বাচনে জয়লাভ করলেও কংগ্রেস প্রকৃত জনসমর্থন হারিয়েছে। দেশের পরিস্থিতি সর্বনাশের দিকে এগিয়ে গেছে কংগ্রেসের শাসনকালে, এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

অথচ, জনসাধারণের পুঞ্জীভূত বিক্ষোভ সোচ্চারে প্রকাশ করার মতো দল হয়তো দেশে আছে, কিন্তু তাদের সুস্থ উন্নত ও প্রগতিশীল স্পষ্টোদ্গোচক বাস্তবে রূপ দেবার মতো কোন সংগঠন, কোন আদর্শ, কোন কর্মপন্থার পরিচয় আজও পাওয়া যায় নি। কংগ্রেসশাসনের বিরুদ্ধে মানুষের যে ভয়ানক অসন্তোষ জমে উঠেছে শুধুমাত্র সেই অসন্তোষের আগুনে হাওয়া দেবার কাজ নিয়ে সব দলগুলি অগ্রসর হয়েছে। তার ফলে, এই দলগুলি জনপ্রিয়তা লাভে সমর্থ হয়েছে বটে, কিন্তু জনসাধারণের বিশ্বাস অর্জন করতে পারেনি। এই দলগুলির মধ্যে বৃহত্তর দল হল কমিউনিস্ট পার্টি। বাংলার রাজনীতিতে কমিউনিস্ট পার্টিই আজ কংগ্রেসের পরেই বামপন্থী নামে পরিচিত দলগুলির নেতা কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি জনসাধারণের মনোভাব বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যায় যে, লোকে এই দলকে সমর্থন করে, ভোট দেয়, তাদের সভায় জমায়েত হয়, তার কারণ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এই হল সবচেয়ে বড় পার্টি, আর এর একটা আন্তর্জাতিক প্রেস্টিজও রয়েছে।

গণতান্ত্রিক দেশে রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্র দুইটি। বিধানসভা এবং বিধানসভার বাইরে জনসাধারণের মাঝখানে। বিধানসভার রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা এবং স্বতন্ত্র সদস্য উভয়ই থাকতে পারেন।--কিন্তু আমাদের বিধান সভায় দলের জোরে বা নিজের ব্যক্তিগত যোগ্যতা দ্বারা যেভাবেই হোক যেসব প্রতিনিধিরা আসেন তাঁদের মন কখনই পরিপূর্ত নয়। আলোচ্য বিষয়গুলির উপর তাঁদের অধিকার প্রায়ই থাকেনা, অপদস্থ এবং সাধারণভাবে কতকগুলি অভিযোগ ছুঁকে দেওয়া ও তার জবাব দেওয়ার বেশি তাঁদের কাছ থেকে আশা করা যায় না। এমন কি, বেছে্ক বক্তব্য থাকে তাও গুছিয়ে বলতে পারার ক্ষমতাও অল্প করেকজনেরই আছে। বাংলার যাঁরা বক্তৃতা করেন তাঁদের বক্তৃতার বাংলা বাঁধ কাউকে অনুবাদ করতে দেওয়া যায় তবে তিনি বিপদে পড়ে যাবেন। বস্তুতঃ সরকারী অনুবাদ বিভাগের লোকদের কাছে জিজ্ঞাসা করে জেনেছি যে এইসব বক্তৃতা ইংরেজিভাষায় অনুবাদ তাঁদের করতে হয়, এবং তাঁদের অভিযোগ এই যে, বাংলা বাক্যের গঠনরীতি সম্পর্কে, বাংলা শব্দের অর্থ সম্পর্কে বিধানসভার বক্তাদের জ্ঞান আদৌ নয়।

বিধান সভার বাইরে যে রাজনীতি চলে তার একটা পরিচয় মুক্ত আঁকা যায়। সভা, কমিটি, জনসভা, মিছিল, প্রেস কনফারেন্স, সত্যাগ্রহ, হরতাল ইত্যাদি করেকটি দুর্নিদিষ্ট হাতিয়ার রাজনৈতিক আন্দোলনকারীদের হাতে আছে। এর বাইরে যে আর কোন পথ থাকতে পারে তা ভাববারও অবসর কারও নেই।

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে যাঁরা বিরোধীর ভূমিকায় রয়েছেন তাঁদের সরকারের বিরুদ্ধে যেসব করি সবচেয়ে বড় অভিযোগ দুর্নীতির। কিন্তু এ প্রসঙ্গে দুটি কথা তাঁরা ভেবে দেখেন নি। এক, দুর্নীতি হতে সম্ভবতঃ কোন পার্টিই মুক্ত নেই। পার্টির অভ্যন্তরে ক্ষমতা-স্বন্দের ব্যাপারে দুর্নীতি বে রঙ্গে রঙ্গে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে তা পার্টির নেতৃবৃন্দ নিশ্চয়ই জানেন। দ্বিতীয়তঃ, পার্টির নাম ও প্রভাব বিস্তারের যেসব সামান্যতম সুযোগ পাওয়া যায় সেখানে সে সুযোগ গ্রহণ করতে প্রত্যেক কর্মী ও নেতা সমুৎসুক হয়ে ওঠেন, তার জন্য। দুর্নীতিগ্রস্তও লোককে সমর্থন করতে, দুর্নীতির মধ্যে নিজেরা জড়িয়ে পড়তেও দ্বিধা করেন না।

সরকারী ভাষা সমস্যা ও গণতান্ত্রিক ভাষানীতি

সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার

সরকারী ভাষা কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে অহিন্দীভাষী প্রদেশগুলিতে প্রতিবাদের যে ঝড় উঠেছে তার জন্য কমিশনের অসাধিকে এবং অ-গণতান্ত্রিক ভাষা নীতিই দায়ী। কমিশন ভারতের ঐক্যকে হিন্দীর চশমা ছাড়া দেখতে পারেন না। তাঁদের মতে সারা ভারতকে শহরে, স্বপক্ষে, চিন্তার ও জাগরণে হিন্দীর স্কে ফেলতে না পারলে দেশের মঙ্গল হবে না। 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের' স্বীকৃতির দ্বারাই ঐক্য প্রকৃতপক্ষে শক্তিশালী হতে পারে সে ধারণাকে কমিশন কার্যতঃ নাকচ করে দিয়েছেন।

ভারতের অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষাগুলির অধিকারের কথা মুখে স্বীকার করলেও কমিশনের ভাবটা হল যে, তাদের অস্তিত্বকে যখন অস্বীকার করা চলে না তখন তাদের যথাসম্ভব কোণঠাসা করে রাখা ভাল। উপরোক্ত দৃষ্টিকোণ থেকে এবং হিন্দীর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার অভূয় উদ্যমে এঁরা হিন্দী বনাম অন্যান্য ভারতীয় ভাষার মধ্যে তীব্র কলহের আবহাওয়া সৃষ্টি করেছেন এবং এমন কতকগুলি সুপারিশ করে-ছেন যা ভারতের একতার পক্ষে অত্যন্ত বিভেদমূলক।

কিন্তু কমিশনের নীতি ও সুপারিশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রসঙ্গে বাংলা এবং তামিলনাদের অ-হিন্দীভাষীদের এক অংশ ইংরাজীর প্রাধান্যকে চিরস্থায়ী করার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছেন। ফলে বিতর্কটা তার মূল পরি-প্রেক্ষিত থেকে সরে গিয়ে হিন্দী বনাম ইংরাজীর কলহার পরিণত হচ্ছে। ভাষা কমিশন বে বিভেদ-মূলক পথে অগ্রসর হয়েছেন তার মূলেও রয়েছে একই কারণ অর্থাৎ যথার্থ পরিপ্রেক্ষিত এড়িয়ে একপেশে দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা সমস্যার বিচার। সে ভুলের বীজ রয়েছে সাংবিধানের সাংশিলষ্ট ধারার এবং কমিশন গঠন প্রসঙ্গে রাষ্ট্রপতির নির্দেশ-নামার উভয় ক্ষেত্রেই সরকারী ভাষার প্রশ্নকে ভারতের সাধারণ সংস্কৃতি ও ভাষাগত সমস্যার বাস্তব পরিস্থিতি থেকে বিচ্ছিন্ন ভাবে উপস্থিত করা হয়েছে।

ইংরাজীর আধিপত্যের সমর্থ-কেরাও একই ভ্রান্ত পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। আজ বিবর্তিকে শুধু ভাষা কমিশনের জোর করে হিন্দী চাপানোর নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, এই নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখে ক্ষান্ত হলে চলবে না। যখন অত্যন্ত ন্যায়সংগতভাবে সরকারী, ভাষার প্রশ্নটি পুনর্বিবেচনার কথা উঠেছে তখন সমস্যাটিকে একেবারে গোড়া থেকে সামগ্রিকভাবেই বিচার করা উচিত। কারণ, সরকারী ভাষা কি হবে না হবে বা তার কেন্দ্র কতটুকু হবে সে কথা একটি বৃহত্তর সমস্যার অংশ মাত্র।

কয়েকটি মৌলিক প্রশ্ন

মূল বিচার্য বিষয় হল বহু ভাষাভাষী ভারতে জনগণের বিকাশের পূর্ণ সুযোগের প্রদস্ত-তর পথের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ভাষা নীতি কি হবে এবং সেই নীতিকে বাস্তবে রূপায়ণের জন্য কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার। আলোচনার সুবিধার জন্য এই বিষয়টিকে কয়েকটি প্রশ্নে ভাগ করে নেওয়া যেতে পারে। যথা ভারতের বিভিন্ন ভাষাভাষীর ভাষার স্থান ও পরস্পর সম্পর্ক। একটিমাত্র ভাষাকে প্রাধান্য দেওয়া হবে না, সকলকে সমান মর্যাদা দেওয়া হবে, (২) বিভিন্ন ভাষার ক্ষেত্র নির্ধারণ এবং বিভিন্ন ভাষাভাষীদের মধ্যে যোগসূত্র হিসাবে অন্তর ভাষা ও কেন্দ্রে সরকারী ভাষার প্রশ্ন, (৩) বিশ্বের আধুনিকতম চিন্তাধারা এবং আন্তর্জাতিক যোগসূত্রের ভাষা।

জনগণের সৃষ্টি শক্তির বন্যা-মুখে খুলে দেওয়ার সহায়ক হিসাবে যত দূরে সম্ভব শিক্ষা এবং জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মাতৃভাষাকে যোগ্য মর্যাদা দিতে হবে। প্রগতি-শীল শিক্ষাবিদ ও চিন্তানায়কেরা সবাই একথা স্বীকার করেন। সেই সঙ্গে অনুসারে গণতান্ত্রিক ভাষা-নীতির প্রথম কাজ হল সমস্ত ভাষার সমান মর্যাদা এবং উন্নতির সমান অধিকারের স্বীকৃতি। আর স্বীকৃতিকে কেবল কথাতে সীমা-বদ্ধ না রেখে সেজন্য কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

সে ব্যবস্থার কয়েকটি প্রধান অঙ্গ হল (১) সমস্ত প্রধান প্রধান ভারতীয় ভাষাকে 'জাতীয় ভাষা' বলে ঘোষণা। জাতীয় ভাষাগুলির বর্তমান তালিকাই চূড়ান্ত হবে না। কারণ এখন যে সব ভাষা অপ্রধান বা অনুন্নত বলে বিবে-চিত হয় ভবিষ্যৎ উন্নতির ফলে তাদের দাবীর কথাও মনে রাখতে হবে। (২) বিভিন্ন রাজ্যে অবিলম্বে ভাষাগত সংখ্যালঘুদের অধিকার সংরক্ষণসহ আঞ্চলিক ভাষাকে সরকারী এবং প্রশাসনিক ভাষা হিসাবে ব্যবহারের ব্যবস্থা। (৩) বিভিন্ন ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী যাতে যতদূর সম্ভব মাতৃভাষায় শিক্ষার সুযোগ পান সেই পরিপ্রেক্ষি নিয়ে কার্যক্রম রচনা। বিশ্ববিদ্যালয়-গুলিতে আঞ্চলিক ভাষাকে মাধ্যম হিসাবে প্রতিষ্ঠা। (৪) অপেক্ষাকৃত অনুন্নত ভাষাগুলিকে বিকাশ লাভের জন্য সুপরিকল্পিতভাবে সাহায্য (৫) বিভিন্ন ভাষা-ভাষী লোকদের মধ্যে অন্তরের যোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে এক একটি ভারতীয় ভাষা শিক্ষার উৎসাহ দান।

একমাত্র উপরোক্ত পূর্বে সর্ত-গুলি পূরণের দ্বারাই সরকারী ভাষা অন্তর ভাষার প্রশ্নটি হৃদ্যতা-পূর্ণভাবে সমাধানের অনুকূল পরিবেশ রচিত হতে পারে। সেজন্য প্রত্যেক শুভ বুদ্ধিসম্পন্ন ভারত-বাসীর কর্তব্য নিজ নিজ প্রদেশে ও সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে এই ইতিবাচক কর্মপন্থা নিয়ে আন্দোলন করা।

কেন্দ্রের সরকারী ভাষা হিসাবে ইংরাজীকে বজায় রাখার পক্ষে যুক্তি দিতে যেয়ে ইংরাজীর উচ্চ সমর্থকগণ এমন সব কথা বলে-ছেন যা উপরে উল্লিখিত মূল নীতির সম্পূর্ণ বিরোধী। অনেককে ইংরাজীকে অন্যতম জাতীয় ভাষা বলে ঘোষণার দাবী তুলতে শোনা গেছে। আবার অনেককে এমন কথাও বলতে শোনা যাচ্ছে যে, ইংরাজীকে কখনও ভারত-বাসীর উপর চাপিয়ে দেওয়া হয় নাই এবং ইংরাজী শিক্ষাই হল ভারতের নবজাগৃতির কারণ।

অতএব ভাষা নীতি প্রসঙ্গে এই বিষয়ের কিছুটা আলোচনাও অপরিহার্য হয়ে পড়ে। ইংরাজীর মারফতে আমরা বিদেশের তথা আধুনিক যুগের জ্ঞান ভাণ্ডারের সাথে পরিচিত হয়েছি সে কথা অনস্বীকার্য। আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলির বিশেষতঃ বাংলা সাহিত্যের বিকাশে ইংরাজীর অবদানকে উপেক্ষা করাও চলে না। ইংরাজী শিক্ষা প্রচলনে রামমোহন, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি অগ্রসর হয়ে-ছিলেন সে কথাও সত্য।

আজ পর্যন্ত জাতীয় জীবনের প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রে মুষ্টিমেয় ইংরাজী শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের আধিপত্য একচেটিয়া হয়ে আছে এবং ইংরাজী না জানা মানুষের সেখানে প্রায় অপাংক্তেয় হয়ে আছেন। অথচ হলেও স্বীকার করতে হবে যে, সেই জন্যই রাজ্য-গুলিতে আঞ্চলিক ভাষাকে সরকারী ও প্রশাসনিক ভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠার কাজ এ যাবৎ উপেক্ষিতই হয়ে এসেছে।

মাতৃভাষাকে সমাক মর্যাদা দেওয়া ও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে আঞ্চ-লিক ভাষাকে মাধ্যম হিসাবে প্রবর্তনের কর্তব্যটিও অবহেলিত হয়েছে। ভারততীয় ভাষাগুলির দ্রুত বিকাশের জন্য এবং জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষকে উপযুক্ত অংশ গ্রহণের সুযোগ দিতে হলে ইংরাজীকে তার বর্তমান আসন থেকে সরাতেই হবে। এখানে বলে রাখা ভাল যে, ইংরাজীর আধিপত্যের অবসান মানে ইংরাজী বর্জন নয়। উচ্চ শিক্ষা ও বিদেশের চিন্তা জগতের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার জন্য তার সুনির্দিষ্ট স্থান থাকবে। আর যতদিন ভারততীয় ভাষাগুলি সমস্ত ক্ষেত্রে ইংরাজীর স্থান্যা নেওয়ার উপযুক্ত হয়ে না ওঠে ততদিন বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তার ব্যবহার বজায় থাকবে।

এবার আসে অন্তর ভাষা ও কেন্দ্রের সরকারী ভাষার আলো-চনা। বহু ভাষাভাষী দেশে আন্তঃ প্রাদেশিক আদান-প্রদান, বিভিন্ন ভাষাভাষীদের মধ্যে যোগাযোগ এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় (কেন্দ্রীয়) সরকারের কার্য পরিচালনের জন্য কোন একটি ভাষাকে মাধ্যম হিসাবে নেওয়ার প্রশ্ন ওঠে। এখন পর্যন্ত ইংরাজীই সেই ভূমিকা পূর্ণ করছে। কিন্তু এখানেও চিরকাল তা চলতে পারে না।

যতদিন সর্বভারতীয় রাজনীতি বা অন্যান্য ক্ষেত্রে এবং আন্তঃ প্রাদেশিক যোগাযোগের বেলায় ইংরাজী শিক্ষিতদেরই অধিকার এককেটিয়া ছিল ততদিন এই সমস্যাটি এত জরুরী হয়ে দেখা দেয় নাই। কিন্তু বর্তমানে প্রদেশের আইনসভাগুলির মত কেন্দ্রের আইনসভাতেও সাধারণ মানুষের প্রতিনিধিরা ক্রমে বেশী সংখ্যায় আসছেন। সর্বভারতীয় সভা-সমিতি, সম্মেলনে তাঁরা অংশ নিচ্ছেন এবং নানা উপলক্ষ্যে এক প্রদেশের সাধারণ মানুষের অন্য প্রদেশে যাওয়ার অবকাশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাঁরা ইংরাজী জানেন না কিন্তু দেশের প্রশাসনিক কাজ ও অন্যান্য কিছ সম্বন্ধে তাঁরা ক্রমশঃ অগ্রহশীল হয়ে উঠছেন।

ইংরাজী সরকারী ও অন্তর ভাষা থেকে গেলে তাঁদের পক্ষে অংশ নেওয়া সম্ভব নয়। অথচ শুধু ইংরাজী না জানার অপরাধে তাঁদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করার কি যুক্তি থাকতে পারে? আজ হয়ত তাঁদের শতকরা আনুপাতিক হার খুব বেশী নয়, তাই বলে কি বরাবরই সে অবস্থা থাকবে, না থাকাটাই বাঞ্ছনীয় হবে? কাজেই ইংরাজীর জায়গায় কোন ভারতীয় ভাষাকে বসানোর কথা ভাবতে হয়।

অনেকে বলেন একটিমাত্র ভারতীয় ভাষাকে বেছে না নিয়ে সমস্ত বা কয়েকটি প্রধান প্রধান ভাষাকে সরকারী ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দিতে আপত্তি কি? সমস্ত প্রধান ভাষাকে সে হিসাবে স্বীকৃতি দিতে নীতিগত আপত্তি নাই। কয়েক-টিকে দিতে গেলে আবার বাছাবাছি নিয়ে তাঁর বিতর্কের সৃষ্টি হবে। কিন্তু ব্যবহারিক দিক থেকে শেষ পর্যন্ত একটি ভাষাকেই সেই কাজ করতে হবে। কারণ যে ভাষা বেশীরভাগ লোকের বোধগম্য তাতেই সকলে স্বাভাবিকভাবে অন্তর ভাষার কাজ চালাতে চাইবে। তবে প্রথম থেকেই পরিষ্কার করে নিতে হবে যে, অন্তর ভাষা বা কেন্দ্রের সরকারী ভাষা হিসাবে তার ক্ষেত্র হবে সীমিত ও সুনির্দিষ্ট এবং অন্য ভাষার নিজস্ব ক্ষেত্রে অধিকারের এতটুকু হানি করার অবকাশ থাকবে না।

এই সীমিত উদ্দেশ্যে হিন্দীর কথা ওঠে দুটি কারণে। হিন্দী অন্যান্য ভাষার তুলনায় শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করতে পারে না এবং তা সর্বজন বোধ্য নয়। কিন্তু জাতীয় আন্দোলনের সময় থেকে সে অন্তর ভাষা হিসাবে খানিকটা স্থান করে নিয়েছে। উত্তর ভারতে সব চাইতে বেশী লোক এই ভাষা বোঝে এবং দক্ষিণ ভারতেও তার অনুপ্রবেশ ঘটেছে। যারা বর্তমানে সরকারী ভাষা হিসাবে হিন্দীর বিরোধিতা করছেন তাঁদেরও অনেকে স্বীকার করেন যে, যদি সীমিত উদ্দেশ্যে একটিমাত্র ভারতীয় ভাষাকে গ্রহণ করতে হয় তবে হিন্দীরই সে স্থান পূরণের সম্ভা-বনা বেশী। আর ভারতের সাধারণ মানুষের পক্ষে ইংরাজী অপেক্ষা হিন্দী শেখা অপেক্ষাকৃত সহজ।

অহিন্দীভাষীদের মনে স্বভাবতঃ একটি আশঙ্কা প্রবল হয়ে ওঠে যে সীমাবদ্ধ উদ্দেশ্যে হলেও যদি একবার হিন্দীকে মেনে নেওয়া হয় তবে অন্যান্য ভাষার উপরে তার আধিপত্য সুনিশ্চিত হবে এবং জোর করে হিন্দী চাপাবার চেষ্টাকে ঠেকানো যাবে না। এ আশঙ্কার উৎপত্তি হয়েছে হিন্দীর অতি উৎসাহী সমর্থকদের আচরণে। কিন্তু গোড়াতে যে মূলনীতি ও ইতি-বাচক কর্মপন্থার কথা বলা হয়েছে তা গৃহীত হলে উক্ত অসঙ্গত সম্ভাবনার পথ রুদ্ধ হবে। সে নীতি অনুসারে কেন একটি ভারতীয় ভাষাকে একটি নির্দিষ্ট কোটা ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে। পারে না।

স্থিতীয়তঃ সে ক্ষেত্রে সরকারী ভাষার নির্বাচন ও প্রচলন হবে বিভিন্ন ভাষাভাষী অঞ্চলের স্বেচ্ছা-মূলক সম্মতির ভিত্তিতে এবং আগে যে পূর্ব সর্তগুলির কথা বলা হয়েছে সেগুলি পূরণের পর। একটি মাত্র ভারতীয় ভাষাকে ব্যবহারিক ভাবে কেন্দ্রের সরকারী ভাষারূপে গ্রহণের পরও পার্লা-মেন্টে কোন সদস্য ইচ্ছা করলে নিজ মাতৃভাষায় বলার অধিকার সর্বতোভাবে দিতে হবে। হিন্দী গৃহীত হলেও কবে একমাত্র সরকারী ভাষারূপে প্রচলিত হবে তা নির্ভর করবে প্রধানতঃ দুটি জিনিষের উপর (১) সেই উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে হিন্দী কতখানি উপযুক্ত হয়েছে, (২) অহিন্দী-ভাষীরা তাকে ব্যবহারের জন্য কতখানি প্রস্তুত হয়েছেন। যতদিন পর্যন্ত সে অবস্থা সৃষ্টি না হয় ততদিন হিন্দী ও ইংরাজী পাশা-পাশি চলবে।

ইংরাজী বর্তমানে যে সব কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে তার সংক্ষেপ করা চলবে না। হিন্দীর সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ভারতীয় ভাষার উন্নতির কাজে সাহায্যের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারকে উদ্যোগী হতে হবে। তার অন্যতম অঙ্গ হিসাবে এখন থেকে সংসদের ও সরকারের আইন-কানুন, সেন্সেক্স, নির্দেশ প্রভৃতিকে অন্ততঃ প্রধান প্রধান ভাষাগুলিতে অনুবাদের ব্যবস্থা করা চাই। অহিন্দীভাষীদের হিন্দী শেখার উৎসাহিত করার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দীভাষীদেরও অবশ্য কর্তব্য হবে অন্য কোন একটি ভারতীয় ভাষা শেখা।

কার্যক্রমের খুঁটিনাটি আলো-চনার আরো বহু বিষয় আছে। সে সবের বিস্তৃত অবতারণা ছোট প্রবন্ধে সম্ভব নয়। তবে প্রসঙ্গশেষ করার আগে একটি বিষয়ের উল্লেখ করা দরকার, সেটি হল সরকারী চাকুরীর প্রশ্ন। অহিন্দীভাষীরা মনে করেন যে, হিন্দী সরকারী ভাষা হলে সর্বভারতীয় চাকুরীর প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় মাধ্যম হবে। তার ফলে যাদের মাতৃভাষা হিন্দী তাঁরা শুধু সেই সুবিধা পাবেন।

প্রথমে ভাবতে হবে ইংরাজী যদি সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতা-মূলক পরীক্ষার ভাষা থাকে তাহলে ইংরাজী না জানা লোকেরা তা থেকে একেবারে বাদ পড়ে যাচ্ছেন। অথচ ইংরাজী জানাটাই যোগ্যতার একমাত্র মাপকাঠি হতে পারে না। অন্য পক্ষে অহিন্দীভাষীদের আশঙ্কাটাও অমূলক নয়।

কিন্তু উপরোক্ত নীতি অনু-যায়ী এ সমস্যার সমাধান নিম্ন-লিখিতভাবে হতে পারে। (১) বর্তমানে পরীক্ষার্থীকে তার ইচ্ছানুসারে ইংরাজী, হিন্দী ও প্রাদেশিক ভাষার যে কোন একটিতে উত্তর দানের সুবোগ দিতে হবে। (২) যখন হিন্দী কেন্দ্রের একমাত্র সরকারী ভাষারূপে প্রচলিত হবে তখন (ক) অহিন্দীভাষীদের জন্য একটি বাধ্যতামূলক হিন্দী প্রশ্নপত্র থাকবে (খ) তেমনি হিন্দীভাষীদের জন্য থাকবে একটি অন্য কোন ভারতীয় ভাষার বাধ্যতামূলক প্রশ্ন-পত্র। (৩) প্রত্যেক প্রশ্নপত্রের জন-সংখ্যা অনুসারে একটি নির্দিষ্ট কোটা ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে।

লেখকদের পারিশ্রমিক

অর্দ্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথের অভ্যুদয়ের পরে সাহিত্যের আকাশে যে সব নব নব জ্যোতিষ্কের আবির্ভাব হইয়াছে—তাহাদের প্রভাবে প্রচুর সাহিত্য রচনা—বাংলার সংস্কৃতিকে উর্বর ও উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে,—তাহার তুলনা ভারতের অন্য কোনও ভাষার পাওয়া যায় না। হিন্দী-ভাষাভাষী, গুজরাটী, তামিল এবং উড়িয়া ভাষাভাষীরা সকলেই এখন দাবী করিতেছেন যে, তাঁহাদের স্ব স্ব ভাষা—সব যুগের নূতন রচনায় সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। সে যাহা হউক, বাংলা-ভাষার অসাধারণ উন্নতির ফলে—শত শত লেখক, সাহিত্যের নানা ক্ষেত্রে লেখনী চালাইয়া—মাতৃ-ভাষার সেবা করিতেছেন। দৈনিক সংবাদপত্রের প্রভূত প্রচারের ফলে এবং নিত্য নূতন নূতন মাসিক, সাপ্তাহিক ও ত্রৈমাসিকের আবির্ভাবে—বাংলার পত্র-সাহিত্য ফুলে ফলরবের সৃষ্টি করিয়াছে। উপন্যাস ও ছোট গল্পের সাঁয়ার যাহিবের বিপুলে পাঠকগোষ্ঠী গড়িয়া উঠিয়াছে—যাঁহারা একাধিক মাসিকপত্র আয়ত্তের সঙ্গে পড়েন। সংবাদ ও পত্র সাহিত্যের ব্যাপক প্রচারের ফলে অনেক লেখক—পত্রসাহিত্যে প্রবন্ধ লিখিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু লেখক ও প্রকাশকের সম্বন্ধ, দুর্ভাগ্যবশতঃ কোনও নৈতিক বা সহানুভূতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

আমি নিজে মুখের বিদ্যার আলোচনা করি, পাণ্ডিত্য, কবিত্ব বা সাহিত্য-সৃষ্টির কোনও দাবী আমার নাই। তথাপি, আমি নিজ ব্যয়ে দশ-বারখানি উচ্চ-মূল্যের পুস্তক ছাপিয়াছি ও প্রকাশ করিয়াছি, দেশের ও বিদেশের পত্রিকার সভ্যতিক ইংরেজী প্রবন্ধ, এদেশে সভ্যতিক বাংলা প্রবন্ধ এবং এদেশে আট-দশটি হিন্দী ভাষায় প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছি। সুতরাং দেশের ও বিদেশের সম্পাদক মহাশয়দের রীতি-নীতি, প্রকাশক মহাশয়দের ব্যবহার সম্বন্ধে এবং ছাপাখানার খরচ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছি।

এই অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া বলিতে পারি যে, বিদেশের সম্পাদক মহাশয়রা বেশুপ প্রসন্ন-চিত্তে এবং বেশুপ উচ্চ-হারে লেখকদের দক্ষিণা দেন, এদেশে তাহা সম্ভব নহে,—তাহার নানা কারণ আছে। প্রধান কারণ হইল, আমাদের দেশের নিরক্ষরতার অভিশাপ। স্বাক্ষরতার সংখ্যা মোট-মাট ষোল-আঠারজন শতকরা ধরিলেও বলিতে হয় যে, মাত্র শতকরা দশ-বারজন পাঠকের সুস্তক, সংবাদপত্র বা মাসিকপত্র পড়িবার সামর্থ্য, অর্থ, অথবা কৌতূহল আছে। সুতরাং এই শতকরা দশ-বারজন পাঠকের পৃষ্ঠপোষকতার উপর নির্ভর করিয়া পুস্তক প্রকাশ বা সাময়িক-পত্র প্রকাশ করিয়া প্রকাশকদের পক্ষে বিশেষ কিছু লাভ করা সম্ভব নহে। দৈনিক পত্রিকার অবশ্য কিছু লাভ, কারণ দৈনিক পত্রিকার স্বত্বাধিকারী মোটা হারে বিজ্ঞাপনের অর্থ উপার্জন করেন। সাময়িক পত্রিকার কোনও কোনও স্বত্বাধিকারী বিজ্ঞাপনের মারফৎ কিছু কিছু উপার্জন করেন বটে, কিন্তু সব খরচ মিটাইয়া দুই-একটি মাসিকপত্র ছাড়া, কেহই বড় কিছু লাভ করিতে পারেন না। কয়েকটি সাময়িক পত্রিকা অছে—যাহাদের স্বত্বাধিকারী যথেষ্ট লাভ করিলেও লেখকদের প্রতি যথাযোগ্য দাক্ষিণ্য দেখান না, এই কারণে পত্রিকার বিরুদ্ধে লেখকদের অভিযোগ ন্যায্য এবং সমর্থনীয়। সাধারণ অল্প সংখ্যক মুদ্রিত পত্রিকার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ খুব সমর্থনীয় নহে। যদিও সাধারণ নীতিবোধের দিক দিয়ে—প্রত্যেক সম্পাদক—লেখকদের দক্ষিণা দিবার দায়িত্ব অস্বীকার করিতে পারেন না। অনেক সাময়িক পত্রিকার সম্পাদক মুখে আস্ফালন করেন যে, তাঁহারা সাহিত্য-প্রচারের এবং শিক্ষা-বিকাশের মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া পত্রিকা প্রকাশ করেন,—তুচ্ছ অর্থ লাভের উদ্দেশ্যে করেন না। সুতরাং লেখক মহাশয়দের রচনা বিনামূল্যে পাইবার তাঁহাদের নৈতিক অধিকার আছে। কিন্তু এই উচ্চ নীতির আদর্শের আস্ফালনের পশ্চাতে অনেক ক্ষেত্রে একটা বড় "ফাঁকি" বা "ফাঁকি" দেখিতে পাওয়া যায়—যাহার কিছু কিছু পরিচয় আমি পাইয়াছি। যাঁহারা এইরূপ নীতির দোহাই পাড়েন—তাঁহাদের মধ্যে দু-চারজনকে দেখিয়াছি যে, স্বত্বাধিকারীর নিকট হইতে কিম্বা পত্রিকা প্রকাশের লভ্যাংশ হইতে সম্পাদক মহাশয় তাঁহার নিজের পারিশ্রমিক সংগ্রহ করিতেছেন। উপবাসের নিয়মটা কেবল লেখকদের উপর জারী করা হয়।

সাহিত্যজগতে লেখক ও প্রকাশকের সম্বন্ধ অত্যন্ত নিগূঢ় এবং নিকট হইলেও সাধারণতঃ বাস্তব জীবনে লেখক ও প্রকাশকের আত্মীয়তা যথেষ্ট সুমধুর নহে। এই সম্বন্ধ সাধারণতঃ মাসিক পত্রিকায় বা দৈনিক আলোচনার সুযোগ হয় না, কারণ প্রকাশক মহাশয়রা তাহাদের স্বার্থের বিশ্বব্যাপী কোনও ব্যাপার ও তথ্য প্রকাশ করিতে নারাজ। লেখকরা লেখা না পাঠাইলে প্রকাশকরা প্রকাশ করিবার বিষয় বা প্রকাশিতব্য সংবাদ পান না। এবং প্রকাশক না থাকিলে, লেখকদের লেখা প্রকাশিত বা প্রচারিত হইবার সুযোগ হয় না। উৎকৃষ্ট সাহিত্য হইলেও লিখিত সাহিত্য-বস্তু অপ্রকাশের অবস্থায় সমাধিস্থ থাকে। সাহিত্য-রসিকরা তাহার আস্বাদন হইতে বঞ্চিত থাকেন। সুতরাং যেটা বাইতেছে যে, লেখক ও প্রকাশক পরস্পরের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় বন্ধু। তথাপি এই সুমিষ্ট বন্ধুত্বের সহজ প্রয়োগের পথে একটি অর্থনৈতিক তিক্ত ব্যবধান থাকে, যাহার ফলে ঐ সম্বন্ধ বা নৈকট্য সব সময় সফল ও সার্থক হইয়া উঠে না। অথচ এই সম্বন্ধ নৈতিক বন্ধনে আবদ্ধ হইলে, উভয় পক্ষের স্বার্থ সুদৃঢ় ও সম্প্রসারিত হয়। ইংলণ্ডে এবং অন্যান্য সভ্য দেশে—লেখক ও প্রকাশকের সম্পর্ক বেশ একটি সুমধুর নীতি-বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত আছে, যাহারা অনুরূপ ব্যবস্থা ভারতবর্ষে এখনও করেন হয় নাই। অবশ্যভাবে এবং একটি অর্থনৈতিক তিক্ত ব্যবধান থাকে, যাহার ফলে ঐ সম্বন্ধ বা নৈকট্য সব সময় সফল ও সার্থক হইয়া উঠে না। অথচ এই সম্বন্ধ নৈতিক বন্ধনে আবদ্ধ হইলে, উভয় পক্ষের স্বার্থ সুদৃঢ় ও সম্প্রসারিত হয়। ইংলণ্ডে এবং অন্যান্য সভ্য দেশে—লেখক ও প্রকাশকের সম্পর্ক বেশ একটি সুমধুর নীতি-বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত আছে, যাহারা অনুরূপ ব্যবস্থা ভারতবর্ষে এখনও করেন হয় নাই। অবশ্যভাবে এবং

পাঠকের সংখ্যালঘুত্বের ফলে, এ দেশে বিদেশের রীতি-নীতি প্রতিষ্ঠিত করা সহজ নহে। তথাপি চেষ্টা করিলে অবশ্যই উন্নতি-সাধন হইতে পারে, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

সম্পাদক ও প্রকাশকদের দিক দিয়া বিচার করিলে বলা যায় যে, লেখকদের যথেষ্ট হারে দক্ষিণা দেওয়ার নিয়ম করা প্রকাশকদের স্বার্থের দিক দিয়া বাঞ্ছনীয় নীতি। কারণ, অনেক সময়ে বিনামূল্যে পাওয়া যাইতেছে বলিয়া, কিম্বা উপরোধ এবং 'খাতিরে পড়িয়া—নামজাদা লেখকের নিকৃষ্ট রচনাও প্রকাশ করিতে হয়—যাহার প্রকাশে লেখক এবং পত্রিকার উচ্চমান ও মর্যাদায় হানি হয়। সর্বত্র মূল্য দিয়া লেখা লইবার নিয়ম থাকিলে—নিকৃষ্ট রচনা প্রত্যাখ্যান করিবার অধিকার সম্পাদক মহাশয়ের থাকে।

৫০ বৎসর পূর্বে এ দেশে মাসিকপত্রের জন্য গৃহীত রচনার জন্য সাধারণতঃ কোনও দক্ষিণা দানের রীতি ছিল না। শুনিয়াছি রবীন্দ্রনাথই মাসিকপত্রে রচনার জন্য দক্ষিণার দাবী প্রথম প্রবর্তন করেন। এখনও অনেক প্রথম শ্রেণীর মাসিকের সম্পাদক বিশেষ বিশেষ লেখক ছাড়া অন্য কাহাকেও দক্ষিণা দেন না। সাধারণ দৈনিক হইতে মাসিকপত্রের বিশেষত্ব এই যে, প্রকাশযোগ্য লেখা—সাহিত্যিক ও লেখকের নিকট হইতে সংগ্রহ করিতে হয়।

সুতরাং লেখক দের উপর সম্পাদকরা নির্ভরশীল, তথাপি নানা কৌশলে তাঁহারা এই নির্ভরতা স্বীকার করেন না। এই অবস্থার জন্য বেশীরভাগ লেখকরাই দায়ী। অনেক সাহিত্যিকের একটি দুর্বলতা আছে—সেটি হল ছাপার অক্ষরে নিজেদের লেখা প্রকাশিত দেখিবার দুর্দ্দম বাসনা। তাঁহারা লেখক হিসাবে প্রচার ও প্রতিষ্ঠা চান। এই দুর্বলতার সুযোগ লইয়া মাসিকপত্রের সম্পাদক মহাশয়রা নূতন লেখকের রচনার জন্য কোনও দক্ষিণা দিতে চান না। নূতন লেখক, যাঁহারা এখনও প্রতিষ্ঠা বা জনপ্রিয়তা অর্জন করিতে পারেন নাই, পাঠক-মহলে কে কতটুকের কোনও চাহিদা নাই; সুতরাং কেবল পত্রিকার পাতা ভরাইবার জন্য এই সব নূতন লেখার প্রকাশের জন্য সম্পাদক মহাশয়ের কোনও তাগিদ বা স্বার্থ নাই। সুতরাং কোনও নূতন লেখকের পাঠক-সমাজে পরিচয়-মাত্র করিয়া দিবার জন্য সম্পাদক মহাশয় যদি কাগজ ও ছাপার খরচ করিয়া অপরিচিত নূতন লেখকের লেখা ছাপেন—তাহা হইলে লেখকের প্রতি যথেষ্ট দাক্ষিণ্য দেখান হয়। তাহার উপর আবার দক্ষিণা দিবার প্রশ্ন উঠে কেমন করিয়া?

ইহার উত্তরে কেউ কেউ বলেন যে, মাসিকপত্রের স্বত্বাধিকারী পাঠকদের নির্দিষ্ট সংখ্যক গ্রাহার ভর্তি (আউ পেজী বা দশ পেজী ফর্মার পূর্বে) সংখ্যার অপ্রাকৃত নিয়া অগ্রিম মূল্য আদায় করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের পত্রিকার সংখ্যার পাপ-পরচের জন্য অনেক সময় নূতন লেখা ছাপা তাঁহাদের মিশানো প্রত্যেক সংখ্যায় আবশ্যক হয়। এ ক্ষেত্রে নূতন লেখকদের রচনা নিশ্চয়ই 'কাজে' লাগে। সুতরাং নূতন লেখকদের লেখার জন্য নামমাত্র দক্ষিণা দিলেও সুবিচার করা হয়। দরিদ্র নূতন লেখকদের রচনা লিখিতে তাহাদের নিজের কিছু কিছু খরচ হয়,—যথা কাগজ, কালি, কলম, 'অরণ্য-কলম', সম্পাদক মহাশয়ের অফিসে হাঁটা-হাঁটি ও 'তাগার ফর' ও ষ্টাম্প-রচনা প্রত্যাখ্যান করিবার অধিকার সম্পাদক মহাশয়ের থাকে। ভাড়া, ডাক-টিকিট,—ইত্যাদির মূল্য লাগে।

সুতরাং নূতন লেখকের কি ছু পা রি শ্র মি ক দি লে সুবিচার করা হইবে। তা ছাড়া নিছক নীতিবোধের দিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যায় যে, ছাপিবার কাজের বিনামূল্যে পাওয়া যায় না, রচনা ছাপিতে ছাপাখানার শ্রমিককে পারিশ্রমিক দিতে হয়, দপ্তরীর প্রাপ্য দিতে হয়, অনেক সম্পাদক মহাশয় নিজে বেতন গ্রহণ করেন, সুতরাং, যাঁহারা রচনা না দিলে পত্রিকাটি বাহির করা যায় না—তাঁহাদের বঞ্চিত করা নীতি-বিরুদ্ধ প্রথা। অনেক নূতন পত্রিকার নূতন সম্পাদক এইরূপ অপ্রাকৃতার করিয়া প্রতিষ্ঠিত লেখকদের নিকট হইতেও বিনা-মূল্যে লেখা আদায় করেন বে, তাঁহার পত্রিকা প্রতিষ্ঠিত হইলে লেখকের ভবিষ্যতে দক্ষিণা দেওয়া হইবে। অনেক ক্ষেত্রেই এইরূপ অপ্রাকৃতার পালিত হয় না। সচিত্র পত্রিকার সচিত্র প্রবন্ধের জন্য আবার খরচ করিয়া ফটোগ্রাফ বা রেখা-চিত্র (ব্লকের) সংগ্রহের কথা উঠে। অনেক সম্পাদক ফটোগ্রাফের জন্য স্বতন্ত্র দক্ষিণা দেন, অনেকে দেন না।

সকল দিক বিচার করিয়া দুই পক্ষের স্বার্থ রক্ষা করিয়া, সম্পাদক ও লেখকের সম্পর্ক নীতি-বোধের দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা যায়। কিন্তু এ বিষয়ে সুচিন্তিত, সুপরিকল্পিত সহযোগিতার ব্যবস্থা এখনও সূচিত হয় নাই।

দৈনিক পত্রিকার অবস্থা-ব্যবস্থা কিছু স্বতন্ত্র। দৈনিক সংবাদপত্রের স্তম্ভ বিশেষ পর দিন পাঠা ও পঠনীয় বস্তুর স্থায়ী পরিপূর্ণ করিবার জন্য স্বত্বাধিকারী বেতন দিয়া সম্পাদক, সহকারী স ম্পা দ ক, "ক ল ম" বা "প্যারাগ্রাফ" রাইটার, রিপোর্টার প্রভৃতি নানা শ্রেণীর লেখককে স্থায়ী কর্মচারীরূপে নিযুক্ত করেন। তথাপি বিশেষ বিশেষ বিষয়ে বিশিষ্ট রীতির প্রবন্ধ উভয় পক্ষেরই প্রভূত উপকারে সংগ্রহ করিতে নির্দিষ্ট কর্মচারীর আসিবে এবং সরলতাই ও লক্ষ্যের ব্যাহারে স্বাধীন বিশেষজ্ঞদের নিকট দক্ষিণা দিয়া লেখা সংগ্রহ করিতে হয়। অনেক সময়ে প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতি অনুসারে এই সব বিশেষজ্ঞ বাহিরের লেখকদের মোটা দক্ষিণা দিতে হয়। তাহা ছাড়া রবিবাসরীয় সংখ্যার বিষয় বস্তুর জন্য বাহিরের লেখকদের নিকট হইতে লেখা সংগ্রহ করিতে হয়। অনেক সময় রবিবাসরীয় প্রবন্ধ অযাচিতভাবে আসে, কোনও চেষ্টা করিতে হয় না।

সাধারণতঃ, দৈনিকপত্রের লেখকদের দক্ষিণা দেওয়া হয় প্রবন্ধ প্রকাশের অব্যবহিত পরেই। ইংরাজী মালিকের পত্রিকা ঠিক সময়ে বিনা তাগিদে দক্ষিণা পাঠাইয়া দেন। দেশী দৈনিকের অনেকেই নিয়ম করিয়াছেন যে, প্রবন্ধ প্রকাশের— এক পক্ষ পূর্বে দক্ষিণা দেওয়া হইবে না। অনেক দরিদ্র লেখকদের পক্ষে এই ব্যবস্থা সুবিচার নহে। কেহ কেহ অভিযোগ করিলে বলা হয় যে, এ সংখ্যার প্রকাশটি প্রকাশিত হয়, সে-সংখ্যার নগদ বিক্রয়ের মূল্যে এজেন্টদের নিকট হইতে সংগ্রহ করিতে দশ-বার দিন লাগে,—সুতরাং লেখকদের এই এক পক্ষ-কাল অপেক্ষা করিতেই হইবে। এই যুক্তিটি বিচার-সহ নহে। স্থায়ী গ্রাহকদের বাংসরিক বা ষণ্মাসিক চাঁদা বা সাবসক্রিপসনের উপর নির্ভর করিয়া এবং বিজ্ঞাপনের আয়ের উপর নির্ভর করিয়া দৈনিক পত্র প্রকাশ হয়,—দৈনিক বিক্রির ভরসার উপরে নহে। স্থায়ী গ্রাহকদের নিকট দৈনিক পত্রের চাঁদা বছরের অগ্রেতেই আদায় করা হইয়াছে; সুতরাং বাহিরের লেখকদের দক্ষিণা এক পক্ষকাল বিলম্ব করিবার কোনও নীতিমূলক হেতু নাই।

বিলাতে এবং অন্যান্য দেশে লেখকদের স্বার্থরক্ষার জন্য সমবেত সমিতি ("অথারস্ এসোসিয়েশন") আছে, প্রায় সমস্ত লেখক ও সাহিত্যিক এই সমিতির সভ্য। কোনও ক্ষেত্রে কোনও লেখকের প্রাপ্য আদায় না হইলে, এই সমিতি যথা শীঘ্র সম্ভব উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া লেখকদের প্রাপ্য আদায়ের সহায়ক হন। এদেশে "পি, ই, এন" নামে একটি লেখকদের সমিতি আছে, কিন্তু অধিকাংশ লেখক এই সমিতির সভ্য নহে। বাংলাদেশে এখন অসংখ্য লেখক ও সাহিত্যিক সাহিত্য-রচনার কার্যে মনোনিবেশ করিতেছেন, অনেকেই তাঁহাদের দৈনন্দিন অনিশ্চিত পারিশ্রমিকের উপর নির্ভর করিয়া জীবন-যাপন করেন। দক্ষিণা খুব অল্প হইলেই পাওয়া যায়, তাহাও যথা সময়ে না পাওয়া গেলে, অনেক দরিদ্র সাহিত্যিকের জীবন-যাপন অচল হইয়া পড়ে।

সম্পাদিতপত্র অনেক দৈনিক ও মাসিক-পত্রিকার স্বত্বাধিকারী মহাশয়রা অনেক সময় এই দরিদ্র লেখকদের প্রতি সুবিচার করিতে তুলিয়া যান। বাংলাদেশে লেখক ও সাহিত্যিকদের একটি সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইলে লেখক ও প্রকাশকদের সম্বন্ধ সুনীতিপূর্ণে পন্থায় নির্দিষ্ট হইতে পারে। এই-রূপ প্রতিষ্ঠান লেখক ও প্রকাশক-সম্বন্ধের নীতি-বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং সরলতাই ও লক্ষ্যের ব্যবহারে অনেকটা অবসান হইবে।

ঘোড়ার ঠিকুজি কোষ্ঠি

(দর্পণের প্রতিনিধি)

সকাল সাড়ে ছটা কি সাতটা হবে। রাস্তা লর্ড-কাট করার জন্যে ময়দানের ওপর দিয়ে ভাড়াতাড়ি যাচ্ছি। দেখি গাছতলায় বেশ একটা জটলা—প্রায় ৫০।৬০ জন লোক গোল হয়ে কিন্তু একটা ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। গোলের কেন্দ্রের কাছে লোকগুলো বসা, আর বাইরে পরিধির দিকে দাঁড়ান। প্রায় প্রত্যেকের হাতেই ছোট ছোট নোট-বই। পরনে কাঁচের মোটা চশমা পরা কয়েকটা লোককে বাইরের দিকে দেখলাম—তেল না দেওয়া পাটকিলে চুল আর হিমঘরাম গড়ন দেখে ইনটেলেকচুয়াল বলে মনে হল। এদের ওপরে আমার দুর্বলতা আছে। তাই দাঁড়িয়ে পড়লাম কৌতূহলে—এক সকালে এরা কি এত গভীর গবেষণায় ব্যস্ত। সেদিন শনিবার।

প্রায় সবাই টুকরো টুকরো কাগজে কি সব লিখছে, আর কাগজগুলো পকেটে রাখছে। সবারের দৃষ্টি ঐ নোট বইয়ের দিকে—গভীর একাগ্রতা, প্রায় ভাব-বিভোর। ঠেলাঠেলি করে প্রায় তিনটি লাইন সামনে বসা লোকে-দের মধ্যে জায়গা করে নিলাম। আমার ঠেলা খেয়ে হেরেকজন আড় চোখে একবার দেখে নিল, কোন প্রতিবাদ নেই। একটু আশ্চর্য মনে হল। তবে কি জাতির চরিত্রে কোন পরিবর্তন আসছে নাকি!

কেন্দ্রে উপবিষ্ট মধ্যবয়সী, দেখে মনে হল বিহারী, এক ভদ্রলোক। পাশে ছাতার কাপড় দিয়ে ঢাকা একটি খাঁচা। বসে আছি, সবাই একে একে কেন্দ্রের খাঁচাওয়ালাকে একটা করে টুকরো কাগজ দিচ্ছেন আর তিনি সেগুলি পরিপাটি করে সাজিয়ে রাখছেন। সকলে দেবার পর একটা পাথরের নুড়ি চাপা দিয়ে তিনি সেগুলো রাখলেন।

তলা থেকে একটা টুকরো বার করে বিহারী হাঁকলেন "বাবু নির্মল দত্ত।" চিন্তিত মুখে নির্মলবাবু এগিয়ে এলেন। দু হাতে মুঠোর মধ্যে টুকরো কাগজ। হোমিওপ্যাথি পুরিয়ার মত পরি-পাটি পাট করা। দত্ত মশায় বল্লেন "তিন শোল্ট" আর তিনটি সিকি ছুড়ে মাটিতে ফেললেন। বিহারী চুম্বক বার করে সিকি তুলে নিলেন।

দত্ত মশায়ের ডান হাত থেকে সাত-আটটা ঘোড়া কাগজ মাটিতে ছড়িয়ে পড়ল। কাল ঢাকাওয়ালা খাঁচার দরজা খুলে গেল, বেরিয়ে এল ঘুঘু ধরদের একটা পাখী। নাচতে নাচতে ঘুঘু একটা ঘোড়া তুলে নিয়ে বিহারীর হাতে দিয়ে আবার খাঁচায় ঢুকে গেল।

দত্তমশায় বিহারীর হাত থেকে ছোঁ মেরে কাগজটি নিয়ে টাঁকে গুজে ফেললেন। এবার দত্তমশায় বাম হাতের ঘোড়া ছড়ালেন। পাখী আবার একটি ঘোড়া বিহারীর হাতে দিয়ে খাঁচায় ঢুকল। নির্মল-বাবু শিবতীয় ঘোড়া টাঁকে রেখে বাম পকেট থেকে ঘোড়া বের করে ছড়ালেন। এইভাবে পাখীর তোলা তিনটি ঘোড়া টাঁকে করে দত্তমশায় সন্তর্পণে বেরিয়ে গেলেন। না তোলা ঘোড়াগুলোও সংগ্রহ করে নিয়ে গেলেন।

এত সব কান্ড ঘটছে,—আশে-পাশের বসা লোকগুলো কিন্তু কেউ কারুর দিকে দেখছে না। প্রত্যেকেই ঐ ছোট ছোট নোট বই থেকে টুকরো কাগজে কি সব লিখছে। পাশের লোকের দিকে চেয়ে দেখি—নোট বইটা রেসের গাইড। এক একটা টুকরো কাগজে একটা করে ঘোড়ার নাম লিখছে।

পাখীর মালিক হাঁকলেন "কমলালী জানা।" কমলালীবাবু প্রায় বৃদ্ধ। তীক্ষ্ণ নাক আর চোখে নিকেল ফ্রেমের চশমা প্রায় নাকের ডগায় নেমে এসেছে। রোগাটে, বেশ লম্বা, পায়ে বাটার ছাই রংয়ের কেডস জুতো। তিনি দুটো শেলট খেললেন। পাখীর তোলা দুটি কাগজ বুক পকেটে নিয়ে উঠে পড়লেন। বাজারের থলি পেতে তিনেন সেটা হাতে করে ছিড়ে বাইরে চলে এলেন। পেছু পেছু আমিও বেরিয়ে এলাম।

কিছু দূরে গিয়ে কমলালীবাবু এধার ওধার দেখে বুক পকেট থেকে দু টুকরো কাগজ বার করলেন, আর রেস গাইডে কানে পেন্সিল গোঁজা পেনসিল দিয়ে দুটি ঘোড়ার নামের পাশে দাগ দিলেন। ইতি-মধ্যে আমি প্রায় কাছে এসে গিয়েছি। তাড়াতাড়ি বইটা বন্ধ করে ফেললেন।

"নমস্কার, কমলালীবাবু, আপ-নার সঙ্গে একটু কথা বলব।" আমার দিকে না দেখেই কমলালী-বাবু উল্টো দিকে চলে যাচ্ছিলেন। তাড়াতাড়ি পাশে পাশে চলতে আরম্ভ করলাম। "না মশায়, ঘোড়ার নাম বলতে পারব না। দরকার হয় নিজে নাম তোলান"। কমলালীবাবু বললেন। আমি জানিয়ে দিলাম ঘোড়ার নাম জানার কোন ইচ্ছা আমার নেই—খবরের কাগজের রিপোর্টার নতুন কোন জিনিষে কৌতূহল আছে।

"এটা মোটেই নতুন জিনিষ নয়, বহুদিন থেকে চলে আসছে। আর পাখীর সেওয়া টিপস মাফে মাঝে মোক্ষম লাগে। এই ত গত সপ্তাহে একবারে ৪।৪বল চোট মিলিয়ে মিল। তবে মশায়, এ পথে আর পা বাড়াবেন না,' সর্বশ্রান্ত হয়েছি" কমলালীবাবু এক নিঃশ্বাসে বলে চললেন।

"তবে যদি পাখীর টিপস আর ভট্টচাযের অঙ্ক মিলে যায় তাহলে আর রক্ষে নেই। সে ঘোড়া জিতবেই। তবে ভট্টাচাযটা শয়তান, পাখীর তোলা নামগুলো জেনে নেয়, কিন্তু নিজের হিসেবের ঘোড়ার নাম বলে না। মিথ্যে যা হোক একটা ছেড়ে দেয়।"

জানতে ইচ্ছে হল কে এই ভট্টচায্। কমলালীবাবু রাজী হলেন আমাকে ভট্টাচযের বাড়ী নিয়ে যেতে। কাছেই বউবাজারে এক গলির মধ্যে একটা ঘর ভাড়া করে ভট্টাচায থাকেন। ঘরের সামনে ঘোতো পড়া একটা টিনে লেখা,... ভট্টচায্ রাজজ্যোতিষী। ঘরের দেওয়ালে অনেকগুলো কাঠের ঢাকে আটান। আর তাতে রোল করা বাঁধান বাঁধান হলদে কাগজ।

"ঠিক কমলালী, পাখীর টিপস কি ভট্টচায্ সাহেবে প্রশ্ন কর-লেন। "তা বলতি, তোমার খাতা খুলে গুনে ফেল দেখি। সওয়াসের অফিসের ক্যাশ বইয়ের মত এক বিরাট বাঁধানো খাতা পাড়লেন—আর সুচীপত্র দেখে ঘোড়ার নামের প্রথম অক্ষর ধরে একটা পাতা বার করলেন। দেখলাম ঐ পাতায় একটি বড় করে রাশিচক্র কাটা। "গ্রহে লাত ঘোড়া কুম্ভ লগ্ন, পূর্ণ চন্দ্রের দৃষ্টি, চান্স আছে।" তারপর একটা প্যাডের ওপর বহু সংখ্যা লিখে চললেন, প্রায় পনের মিনিট ধরে আর মাঝে মাঝে একটা পুরোনো পাঁজি দেখতে লাগলেন।

ভট্টচায্ গম্ভীর হোয়ে বল-লেন, "লগ্নে বুধোদিতা, সপ্তমে কেতু, চন্দ্র, মঙ্গল, আর তৃতীয়ে শনি। এ ঘোড়া বদি একটা থেকে দুটো পনেরোর মধ্যে ছোটে এ জিতবেই। তবে শত্রু আর বৃহস্পতির অবস্থান ভাল নয়। ঐ সময়ে মঙ্গলযোগে দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা আছে। ছুটতে ছুটতে পড়ে যেতে পারে।"

তারপর শিবতীয় ঘোড়ার গণনা হোল। শেষ পর্যন্ত স্থির হল প্রথম ঘোড়ায় "প্লেস"এ পাঁচ টাকা আর শিবতীয় ঘোড়ায় "উইন" পাঁচ টাকা।

অফিসের দেরী হোয়ে যাচ্ছে। কমলালীবাবু তাড়াতাড়ি থলি নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। আমি থেকে গেলাম ভট্টচাযের সঙ্গে আলাপ করার জন্যে। জ্যোতিষী ভট্টচাযের বয়েসত পেলা। গত ৩৭ বছর ধরে তিনি এই পেশায় রয়েছেন। তাঁর বাবাও বিখ্যাত জ্যোতিষী ছিলেন। ভবানীপুরের বিরাট বাড়ী ছেলের হাতে তুলে দিয়ে তিনি বছর কুড়ি হল দেহত্যাগ করেছেন।

ভট্টচাযের অনুসন্ধিৎসু মন—শাস্ত্র অধ্যয়নের পর মনে হল জ্যোতিষী বদি মানুষের ক্ষেত্রে সঠিক হয়—ঘোড়ার ক্ষেত্রেও এ সত্য হোতে বাধা। সঠিক জন্ম সময় পেলে ঘোড়ার জয়-পরাজয় বলা নিশ্চয় সম্ভব। এ নিয়ে ভট্টচায্ গভীর অধ্যয়ন আরম্ভ করলেন। মেন্ট রেঙিংটনের ঘোড়ার কুষ্ঠি তৈরী করতে লাগলেন। অক্সফোর্ডের ডিগ্রি নিশ্চয়ের ঘোড়া কলকাতায় পাঠা-বার সঙ্গে সঙ্গে সেটা সঠিক জন্ম-তারিখ ও সময় নিয়ে দেওয়া হয়—তিনি এ বিষয়ে গবেষণা করছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে নাকি অপ্র-বিশ্বাসনেয় সময় তারিখ নিয়ে চিঠি লিখেছেন এবং এখনও লেখেন। ভট্টচায্ নাকি অনেক টাকা করায়ছিলেন—কুষ্ঠি থেকে জয়ী ঘোড়া ঠিক করে তার ওপর বাজী ধরে। কিন্তু সে সব পয়সা আর নেই। পৈতৃক বাড়ীটাও মহাজনের হাতে বিকিয়ে গেছে।

ভট্টচায্ কিন্তু দমে নি। তার ধারণা ঘোড়ার জন্ম তারিখ ও সময় সে ঠিকমত পায় নি। তাতে কিছু আসে যায় না। এখন তার গবেষণার বিষয় হল কপাল আর পায়ের গঠন দেখে প্রতিটি ঘোড়ার রাশিচক্র করা আর তা থেকে জন্ম সময় বার করা। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস এ বার করা সম্ভব এবং আকাঙ্ক্ষিত ফল পেতে আর দেরীও নেই।

নিস্ব হোয়েছে ভট্টচায্—তাতে তার কোন ক্ষোভ নেই। মৌলিক গবেষণার একটু কষ্ট হবে বৈ কি।

দর্পণ

একমাত্র

(বাঙলা সংবাদ সাময়িকী

চাঁদার হার)

ত্রৈমাসিক———তিন টাকা

ষান্মাসিক———ছয় টাকা

বার্ষিক———বারো টাকা

দর্পণ প্রতি শুক্রবার নিয়মিত প্রকাশিত হয়,

যে কোন সংখ্যা থেকে গ্রাহক হওয়া যায়।

টাকা কড়ি পাঠাবার ঠিকানা—

ম্যানেজার, দর্পণ

৭নং চিত্তরঞ্জন এভেনিউ

কলিকাতা—১৩

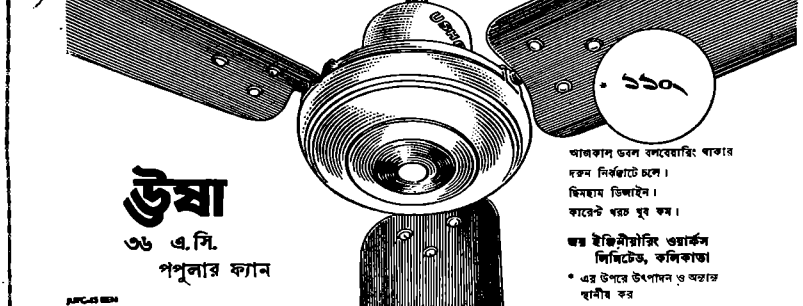

ঊষা

৩৬ এ.সি.

পপুলার ফ্যান

আজকাল ডবল বলবেয়ারিং থাকার দরুন নির্ভরযোগ্য চলে।

ছিমছাম ডিজাইন।

কারেণ্ট খরচ খুব কম।

জর ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কস লিমিটেড, কলিকাতা

• এর উপরে উৎপাদন ও অন্যান্য শুল্কাদি কর

গ্রন্থ পরিচয়

উপনগরীর উপকথা

[রমেন্দ্রকুমার রায়]

বিকিকিনির হাট — লেখক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়; প্রকাশক — নূতন সাহিত্য ভবন, দাম চার টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

বাংলাদেশের বিভিন্ন জনপদের জীবনের দিকে তাকিয়ে লেখকদের দৃষ্টি পড়লেও তারাশঙ্করের সবেত শিল্পবোধের কঠিন সাধনায় তাঁদের মন নেই, 'বিকিকিনির হাট' পড়ে দুঃখের সঙ্গে আর একবার মনে হল। জীবনের সার্বিক রূপায়ণ সামান্যপটের প্রশস্তা যে কত বড় তাঁরা নিশ্চয়ই জানেন, কিন্তু কার্যত ঔপন্যাসিকের দায়িত্ব পালনে আলস্য এবং রোমান্টিক গল্প রসের মোহই তাঁদের মন মজায়।

'বিকিকিনির হাট'-এর ভূমিকায় বলা হয়েছে, একজন লোক যেন একটি চটকল শহরের কয়েকটি বিচিত্র জীবনের স্মৃতি লালন করে রেখেছিল, 'বিকিকিনির হাট' তারই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বিবরণ। পুরোদস্তুর উপন্যাসের পরিচয় চিহ্ন এতে কতটা আছে কতটা নেই সে মীমাংসার দায় তার নয়। এ দায় পাঠকেরই, কিন্তু লেখকের উপন্যাসের ধর্ম পালনের দায় ও এভাবে এড়ানো যায় না। উপন্যাসের পরিচয় চিহ্ন থাকলেই জীবন চিত্রণের সত্যাসত্যের সার্থকতা। মানুষের অস্তিত্বের স্বল্প-বিস্তৃতের জটিল সামগ্রিক রূপায়নের জন্যই প্রয়োজন হয় সমাজপটে ব্যক্তির স্থান নিরূপণের। এটা সিলেপরই দাবী, কোনও সমাজতত্ত্বের নয়। সার্থক শিল্পরূপে দেখার প্রশ্নই লেখককে টেনে নিয়ে যায় জীবনের গভীরে।

বাস্তব জীবনের গল্প বলতে গেলেই স্থান, কাল, পাত্রের জটিল পারস্পরিক সম্পর্কের হিসেব নিতে হয়। লেখকও নিয়েছেন, কিন্তু তা অনেক ক্ষেত্রেই যান্ত্রিক, অ্যামিতিক সূত্রে বিধৃতির মত। এ সম্পর্কের সমন্বয়ও ধরা পড়ে নি বলেই 'বিকিকিনির হাটে'-এর বিভিন্ন পাত্রপাত্রীদের জীবন সমস্যা অগভীর, অসলোম, অনেক সময় মুখরোচক গল্পেই শেষ পর্যন্ত ফুরিয়ে যায়। অথচ এই রচনার একটি সার্থক উপন্যাসের সম্ভাবনা ছিল প্রচুর।

রমা রচনার শিথিল দায়িত্বহীন বিন্যাসই সরোজবাবু গ্রহণ করেছেন, ফলে কোনও চরিত্রই স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে প্রাণবন্ত হতে পারে নি। অথচ তিনি শুধু 'কাহিনী-কেচ্ছাই' পোলাতে চান নি। 'বিকিকিনির হাট'-এর সুবোধ মতিচাঁদ গাড়োয়ানের গল্পের কুলি যখন খালি হয়, তখন লেখকের মনে হয়, আপাতবিচ্ছিন্ন এ সব কাহিনীর যোগসূত্রে নবাগত-জামতলির, বা কোনও চটকল শহরের গল্পই গড়ে ওঠে। অনায়ত্ত বলেন—'আমি ইতিকথার সেই সমস্ত ঘটনার এবং চরিত্রের স্মৃতিতিলপদ্মলোকেই থাবহার করছি যাতে নবাগন্তুকের কাল এবং কালান্তরকে আভাসিত করতে পারি।' কিন্তু কয়েকটি ঘটনার স্মৃতি বিবরণে, মন্তব্য টীকা-টিপ্পনিতে একটি জনপদের জীবনের ভাঙাগড়া স্বল্প-বিস্তৃতির সংগত বেলনার জটিল বিচিত্র ইতিহাস পূর্ণ, সহজ রূপ পেতে পারে না। স্কেচধর্মী রচনায় নবাগন্তুকের মত শহরের কাল এবং কালান্তরকে 'আভাসিত' করা যায় না।

ইংরেজ বাণিজ্য স্বার্থের বিস্তারে আমাদের সামন্ততান্ত্রিক সমাজ নাড়া খায় কিন্তু সম্পূর্ণভাবে ভেঙ্গে পড়ে না, তার বড় একটা অংশ ঐ স্বার্থের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধে, কেননা অংশ বা অতীতের পিছুটানে আত্মরক্ষার পথেই এগোয়। নির্লজ্জ শোষণ, নীচতা, মিথ্যাচারের মধ্যে পতন হয় উপনগরীর। পুরনো বিশ্বাস, মূল্যবোধ ধীরে ধীরে ভাঙ্গতে থাকে, অথচ অধ্যবিত্ত মন তার গণ্ডীর মধ্যেই নতুন প্রত্যয় খুঁজে পায় না। এক অদ্ভুত শূন্যতায় অস্তিত্বকে অর্থহীন মনে হয়, নিজের জীবনের লোলকবাঁধার ঘুরে মরাটাই অদৃষ্টের চরম বিধান ভাবে। কিন্তু মানুষ অবস্থার অন্ধ দাস নয় বলেই সংসর-বৈষম্যের পালা শুরু হতে মেয়ি হয় না, বহুতর জীবনে জীবন যোগ করার প্রশ্ন ওঠে। শ্বেতপ্রভুর কর্তৃত্বের প্রতি ভীতি এবং ভক্তি, আত্মসমর্পণের গ্লানি, নিষ্ঠুর বঞ্চনার ক্ষোভ, অন্ধ আবেগের উত্তেজনা—বহু স্বল্পের টানা পোড়েনে চটকল ছেটে-ওয়ালা নতুন শ্রেণীর মানুষের চৈতন্যরূপ রূপায়ন ঘটতে থাকে। ঔপনিবেশিক জীবনের বাইরের এবং ভেতরের এই স্বন্দের ছকে নবগন্তুর মত উপনগরীর পাত্রপাত্রীদের জীবন ধরার চেষ্টা না করে লেখক রম্য-রচনার সরলীকরণের মোহে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছেন।

নবাগন্তুর 'ক্রনিককলার' মতিচাঁদ গাড়োয়ানের জবানিতে সেখানকার 'করেকটি চরিত্র এবং ঘটনার' বিবরণ পরিবেশিত হয়েছে। কিন্তু মতিচাঁদের মত লোককের দৃষ্টি যতই নিরাসক্ত হোক, তাদের বলির কাহিনী, কেচ্ছা, কিংবদন্তীতে ভরা থাকুক, তারা 'চিকাল-দর্শী' হয় কি করে? হয় না বলেই লেখক বাইরে থেকে বিচ্ছিন্ন গল্পে তাৎপর্যের সূত্র জোগান, গল্পের ফাঁকে ফাঁকে, প্রস্তাবনা বা উপসংহারে ভাষণতলির মহিমা খর্ব হয় নতুন চটকল শহর নবগন্তুর প্রভাপে—সেই সংঘর্ষের কিম্বা আপোষ-রফার, পরিবর্তনের ইতিহাস নিশ্চয়ই শুধু সঠিক তথ্য বিবরণেই ফুটিয়ে তোলার মত নয়। তার জন্য চাই উপন্যাসের বৃহৎ পটভূমি। জামতলির জীবনের স্বল্প-বিস্তৃতির চিত্র পাইনা, সেখানকার বাড়ুজ্জে জমিদার বংশের ধীরবাবু কিভাবে পরিণত হয় চটকলের কুলি-খেংগানো ঠিকাদারে, প্রথমে মামলা বাধলেও বাড়ুজ্জে পরিবারের সঙ্গে আত্তাত হয় চটকলের সাহেবদের, আমরা জানি না। মতিচাঁদের মুখে সংবাদ দিয়েই লেখক দায়িত্ব সারেন।

রোমান্টিক গল্প রসের প্রতি লেখকের দুর্বলতার প্রমাণ বকুলবালা আর ব্রজেশ্বরী দেবীর জীবনবৃত্তান্ত।

—সেহজীবিনীদের আস্তানা বিশির গলি, নবাগন্তুর জীবনের 'বিষাক্ত ক্ষত', 'জুট-টাউনের জটিলতার এক গিঁট।' বকুলবালা এই গলিরই বাসিন্দা ছিল, কিন্তু তার কাহিনী বিশির গলির দেহের হাটের বীভৎসতার গল্প নয়, মতিচাঁদ গাড়োয়ান তার 'বিচিত্র সৌরভের ইতিকথাই' বলে। অভুলনীয় রূপে ছিল বকুলবালার, তার নামে 'একদিন নবাগন্তুর সমস্ত মৌমাছি-মন গুন গুন করে উঠত, বিহ্বল হত বিভ্রান্ত যৌবন।' ধীরুবাবুর ছোট ভাই কচি-বাড়ুজ্জের রক্ষিতা ছিল সে। কচিবাবুর জীবিতকালেও যেমন মৃত্যুর পরেও তেমনি বকুল অন্য কাউকে প্রশ্রয় দেয় নি। সর্বস্ব খুইয়েই কচিবাবুকে দেহের সঙ্গে হৃদয়ও বিকিয়ে দেওয়ার মূল্য তাকে দিতে হয়।

রমারচনার ফাঁদে লেখক পা দিয়েছেন বলেই অনেক সময় প্রসঙ্গভঙ্গ ঘটবার, যখন অন্তঃপ্রসের আতিথ্যে বিকিকিনি হাটের বিষয় বস্তুর মর্যাদা ক্ষুন্ন হয়েছে। তাঁকে কঠিন বিদ্যুৎ যেখানে কামা সেখানে পটে চটলে পরিহাসের রেকর্ডারী মানে লোকসভায় ভারতীয় "মাচেস্ট শিপিং বিল" আনা হয়, বা আপাতভঃ একটি ছত্র "সেলেক্ট কমিটি"র নিকট পাঠান হয়েছে, সুস্মাইরের জন্য। আশা করা যাচ্ছে আগামী জুনমাসে এই কমিটির রিপোর্ট লোকসভায় পেশ করা হবে। এতদিন পর্যন্ত "ইণ্ডিয়ান মার্চেন্ট শিপিং এ্যাক্ট ১৯২৩" এবং "কন্ট্রোল অব শিপিং এ্যাক্ট ১৯৪৭," এই দুইটি প্রধান আইন দ্বারাই ভারতীয় বাণিজ্যনাবী পরিচালিত হত। ভারতবর্ষের পরিবর্তিত অবস্থায়, এখন এই সব আইন একত্র করে, নতুন একটি আইন করাই এই বিলের উদ্দেশ্য, যার দ্বারা ভবিষ্যতে ভারতীয় বাণিজ্য-নাবী পরিচালিত হবে। এতদিন পর্যন্ত ব্রিটিশ আইন অনুসারে ভারতীয় জাহাজগুলি রেজিষ্ট্রি করা হত এবং জাহাজের মালিকনা স্বত্ব, রেজিষ্ট্রার করা, মালিক বদল ইত্যাদি বিষয়ে কোন ভারতীয় আইন ছিল না। নতুন আইন বলবৎ হলে ভারতীয় আইন অনুযায়ী এই প্রথম ভারতীয় জাহাজগুলি রেজিষ্ট্রার হবে এবং সমুদ্রে যাতায়াত কালে ভারতীয় আইন দ্বারাই আমাদের দেশের জাহাজগুলি সংরক্ষিত থাকবে। আপাততঃ ১৮৯২ সালের ব্রিটিশ সংবিধি অনুযায়ী, "মারক্যান্টাইল মেরিন" বিভাগের প্রধান কর্মকর্তা ভারতীয় জাহাজ রেজিষ্ট্রার করার ক্ষমতাপ্রাপ্ত। নতুন আইনব্যারা, কোন বিদেশী এলাকাতেও ভারতীয় আইন দ্বারা ভারতীয় জাহাজ পরিচালিত হবে এবং সমুদ্রে জাহাজের মধ্যে সংঘর্ষ এড়ানর জন্যও নিজস্ব স্বীতিনীতি অবলম্বন করার ক্ষমতা থাকবে।

নতুন আইন অনুযায়ী "ভারতীয় জাহাজ" এর সংজ্ঞাও এখন যত বিরোধ ও চক্রান্তের কারণ। এই আইনে "ভারতীয় জাহাজ" বলা চলতে পারবে, দুই রকম মালিকানা স্বত্বে। ব্যক্তিগত মালিকানা অথবা কোন শিল্প-বাণিজ্য সংস্থার মালিকানা। ব্যক্তিগত হলে মালিকদের সংখ্যা-গরিষ্ঠ অংশ ভারতীয় নাগরিক

বোম্বাইয়ের চিঠি

ভারতীয় জাহাজের সংজ্ঞার্থ পরিবর্তনে গভীর চক্রান্ত

(দর্পণের বিশেষ প্রতিনিধি প্রেরিত)

আদ্যার ব্যাপারী, তবুও জাহাজের খবর দিয়েই 'দর্পণে' এই চিঠির প্রথম কিস্তি সুরু করব। আমার বক্তব্য বিষয় নিয়ে এখানকার জাহাজী মহলে বেশ চাপা আলোড়ন চলছে, ব দি ও সম্ভবে সমরে কেউই বহু কারণে নামতে পারছে না। নিজেদের বিশেষ স্বার্থে, ব্রিটিশ ও ভারতীয় শিল্পপতি এবং সরকারী দুই একজন কর্মকর্তাদের চক্রান্তে, সরকারী নীতির কি ভাবে জলাজলি দেওয়া হচ্ছে, তারই নিদর্শন এই ব্যাপার। ভারতের বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এর ফলাফল সুদূরপ্রসারী হবে।

আসল ঘটনার আসার পূর্বে এর পটভূমিকা সম্বন্ধে পাঠকদের অবহিত করা কর্তব্য। এ বছর বেসব বিভিন্ন সুযোগ, সুবিধা, সাহায্য পায় (যেমন জাহাজ নির্মাণ বা ক্রয় করার জন্য ৪০% সরকারী অংশ) এদেশে রেজিষ্ট্রিকরা বিদেশী জাহাজগুলিও পাবে। বহু বাণিজ্য-নাবীর অধিকারী পশ্চিমের প্রধান বেশীভাগ দেশের কোথাও এইরকম ব্যবস্থা নেই। সেসব দেশের জাতীয় জাহাজগুলির মালিকানার অধিকাংশ নিজের দেশের লোকেদের মধ্যে নিবদ্ধ থাকলেই "জাতীয় জাহাজ" রূপে রেজিষ্ট্রার করা চলবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আ মে রি কা, ইংলণ্ড, নরওয়েতে প্রায় ৬০% অংশীদার দেশবাসী হওয়া চাই।

১৯০% ভারতীয় মূলধন ও পরিচালনা হলেই "ভারতীয় জাহাজ" বলে পরিগণিত করা হবে, ১৯৪৭ সালে সার, সি, পি, রামস্বামী আয়ারের সভাপতিত্বে গঠিত বাণিজ্য-নাবীর উপসমিতির এরকম এক প্রস্তাব ভারত সরকারের অনুমোদন লাভ করে। ভারতের জাহাজের ১০০% মালিকানা একসঙ্গে হওয়া সম্ভব নয় এবং ক্রমে ক্রমে সে অ ব স্থা র উপনীত হতে হবে বলে, ভারত সরকার প্রথমে ৭৫% ভারতীয় মালিক থাকলেই "ভারতীয় জাহাজ" গণ্য করা হবে এবে সাব্যস্ত করেছিলেন। এর একটা কারণ স্বাধীনতার পর বহু ভারতীয় মুসলমান অংশীদার পাকিস্তান অধিবাসী হন। শেয়ারের ৭৫% ভারতীয় অংশীদার হওয়া চাই এবং তা নিজের নামে বা নিজস্ব আমিকাতে, বেনামী হলে চলবে না। তাছাড়া কোম্পানীর সব ডিরেক্টরদেরও ভারতীয় নাগরিক হতে হবে, ভারত সরকার এরকম নীতি গ্রহণ করেন, ১৯৪৭ সালে। বাণিজ্য-নাবী সংক্রান্ত ঘোষিত এই নীতির সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে "ভারতীয় জাহাজ" এর এই নতুন সংজ্ঞার মূলে স্বার্থপ্রণোদিত বিচিত্র প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির, ভারতের কর্মচারীদের গভীর চক্রান্ত রে কথা জানা যায়।

"ভারতীয় জাহা ও সংজ্ঞার্থের এই পরিবর্ত ভয়

(৩য় পৃষ্ঠায়) ৬

চলচ্চিত্রের উন্নয়নে পশ্চিমবঙ্গ সরকার

শৌভিক

[illegible]তদূর জানা আছে, ভার[illegible]র মধ্যে একমাত্র পশ্চিম বঙ্গ [illegible]রাজ্যই বাষ্পশক্তি ছবি নির্মাণে টাকা সাহায্য ব্রতী হয়েছেন। "পথের পাঁচালী" [illegible]য়, প্রাকৃতিক পটে ছবি তোলার সুবিধের জন্য আক[illegible]ল্যাম্পের অভাব। অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, যদিও তা ব্যতিরেকে ছবি তুলে এখানকার আলোক[illegible]চিত্রশিল্পীরা যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাচ্ছেন (যার হালফিলের একটি দৃষ্টান্ত "ডাকহরকরা"), কিন্তু আর্ক-ল্যাম্পের সুযোগ পেলে তারা যে আরো অক্ষুণ্ণ ও চমকপ্রদ কাজ দেখিয়ে তাক লাগিয়ে দিতে পারেন, তাদের ওপর এ বিশ্বাস রাখা যায়। আরো অনেক রকমের প্রয়োজনীয় বস্তুপাতি আছে যা কিনতে বর্তমান স্টুডিওগুলির হয়ত অভিপ্রায় নেই (কেরণ তারা যখন দেখছেন যে সে সব না থাকতেও লোকে ছবি তুলতে আসছে), অথবা কেনার জন্য টাকা নিয়োগ করার সামর্থ্য নেই। ডাঃ রায় এদিক থেকে যদি সাহায্য করতেন তাহলে উন্নততর চিত্রনির্মাণে তখনই প্রকৃত সহায়তা দান হতো।

ডাঃ রায় অবশ্য চলচ্চিত্র-শিল্পকে আর্থিক সাহায্য দান ব্যাপারে হাত গুটিয়ে নেননি। সম্প্রতি উদ্‌ঘাটিত রাষ্ট্রীয় চলচ্চিত্র সম্মান উৎসব অনুষ্ঠানে তাঁর ভাষণ থেকে জানা যায় যে, "পথের পাঁচালী"র ব্যবসায়িক সাফল্যে রাজ্য সরকারকে বেশ কিছু লক্ষ টাকা পাইয়ে দিয়েছে (অবশ্য কতো লক্ষ তা তিনি বলেন নি) এবং চলচ্চিত্রের উন্নতি বিধয়ে তেমন পরিকল্পনা পেলে তিনি সেই টাকা থেকে আর্থিক সাহায্য করতে প্রস্তুত। শোনা যাচ্ছে যে, চলচ্চিত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জনকতক উৎসাহী একটা পরিকল্পনা প্রণয়নে উদ্যোগীও হয়েছেন। ইতিমধ্যে, চিত্রনির্মাণে রাজ্য সরকার কর্তৃক অর্থ সাহায্যে ব্রতী হওয়ার আর একটি উদাহরণ পাওয়া গেল। গত ২১শে এপ্রিল রাধা সিনেমায় চ্যাম্পিয়ন কো-অপারেটিভ ফিল্ম সোসাইটি লিমিটেড নামক এক নবগঠিত প্রতিষ্ঠানের প্রথম ছবি "মোহন ভাঙার ঝিল"-এর মহরৎ অনুষ্ঠানে ডাঃ রায়ের প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিতির তাৎপর্য ছিল (কোন ছবির মহরতে মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতি এই প্রথম) এই যে, এদের সমবায় রীতিতে ছবি তোলার এই প্রচেষ্টাকে গভর্ণমেণ্ট শতকরা নব্বই ভাগ টাকা দিয়ে সাহায্য করতে প্রস্তুত হয়েছেন। এই প্রতিষ্ঠানের ভেতরে কে কে আছেন, তা জানা নেই কিন্তু দেখা গেল ললিত চক্রবর্তী (পরিচালক), কালোবরণ ঘোষ (সংগীত পরিচালক) প্রমুখ কয়েকজনের নাম যারা চিত্র-নির্মাণে যোগ দিয়েছেন বহু বছর, কিন্তু এমন কোন কৃতিত্ব এঁরা এখনও দেখাননি যা সরকারি আর্থিক সাহায্য প্রাপ্তিকে যুক্তি-যুক্ত বলে প্রতিপন্ন করার জোর রাখে। তবে, মনে হলো, গল্পটি হচ্ছে সমবায় প্রথার প্রসার বিষয়ে প্রচার, যার রচয়িতা হচ্ছেন জয়েণ্ট রেজিস্ট্রার অফ কো-অপ্‌স্‌, সুধেন সেনগুপ্ত। সেদিন অনুষ্ঠানে সমবায় মন্ত্রী চিত্ত রায়ও উপস্থিত ছিলেন। এইসব দেখে অবশ্য মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, হয়তো সমবায় প্রথা বিষয়ে প্রচারের উদ্দেশ্যে পশ্চিম বঙ্গ সরকারই এখানি ছবি তোলাচ্ছেন এই প্রতিষ্ঠানটিকে দিয়ে। হয়তো তাই, হয়তো তা নয়। কিন্তু এটা দেখা যাচ্ছে যে, চলচ্চিত্রের উন্নয়নে পশ্চিম বঙ্গ সরকার চেলেছেন বড়ো এলো-মেলো চালে। তা নয়তো একদল উৎসাহী ব্যক্তি সমবায় রীতিতে চিত্র নির্মাণে উদ্যোগী হয়েছেন, অতএব তাদের আর্থিক সহায়তা দান করা হোক—এ নীতিতে না শিল্পের আর না চিত্রের, কারুরই উন্নতি হবার নয়।

কম্যুনিষ্ট রাজনীতি

(দশম পৃষ্ঠার পর)

ছেন। এই দিক থেকে অমৃতসর কংগ্রেসের তাৎপর্য অনেক। ১৯৫৬ সালে শ্রীশ্চেভ কর্তৃক মৃত স্ট্যালিনকে আক্রমণ ও হাঙ্গেরীর বিদ্রোহের পর ভারতীয় কম্যুনিষ্টদের মধ্যে যে হতাশা ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছিল তা কেটে গেছে বলে মনে করা যায়।

গণ-প্রতিষ্ঠান

গত এক বছরে পার্টির সভ্য সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে এবং এখনও হু হু করে বাড়ছে। স্লোগান তোলা হয়েছে "কম্যুনিষ্ট পার্টিকে গণ-প্রতিষ্ঠানে পরিণত কর।" কৃষকসভা, বিশেষ করে গরীব কৃষকদের মধ্যে কাজের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

অমৃতসরে গৃহীত কার্য-সূচীতে বাহাতঃ "বৈপ্লবিক" কিছু নেই। কংগ্রেস বহু দিন বাবৎ যা ঘোষণা করে আসছে কিন্তু ক্ষমতা হাতে পেয়ে যা কার্যে রূপান্তরিত করতে অবহেলা করেছে, কম্যুনিষ্টরা আজ যেন তাই নতুন করে বলছে। এমন কি ভূমি সংস্কার এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বিষয়েও।

জাতীয় মনোভাব আকর্ষণ করবার এর চাইতে আর ভাল হাতিয়ার কি হতে পারে? এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই হয়ত তাঁরা তাঁদের বিশেষ কংগ্রেসের স্থান ও কাল বেছে নিয়েছেন।

১৯৯১ সালে জালিয়ান-ওয়ালাবাগে যে হত্যাকাণ্ড চালিয়ে-ছিল এবং যে হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ভারতে দেশপ্রেমের বন্যা ছড়িয়ে পড়ে কংগ্রেসের নেতৃত্বে, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে কংগ্রেস আজ তা ভুলেছে। জাতীর সম্ভ্রান্তে কংগ্রেস আর কোনো অনুষ্ঠানই করে না। অমৃতসরে জাতীর সম্ভ্রান্তে কম্যুনিষ্টরা বোধ হয় দেশকে জানাতে চেয়েছেন জাতীয় ইতি-হাসে জালিয়ানওয়ালাবাগের স্মৃতি তুলবার নয়, তোলা উচিত নয়। আলোচনার প্রাক্কালে কম্যু-নিষ্ট নেতৃবৃন্দ যান জগুজালি নিবেদন করতে সেই চত্বরে যেখানে উন্মত্ত সাম্রাজ্যবাদ শত শত নরনারী ও শিশু হত্যা করেছিল দেশ-প্রেমের অপরাধে। কম্যুনিষ্টরা আজ সব রকমের প্রমাণ করতে চাইছে যে, তাঁরাই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐতিহ্যের বাহক। যত দিন যাবে তত বেশী তাঁরা এইটিই দেশের সামনে তুলে ধরবার চেষ্টা করবেন।

ডাঃ অধিকারীর ভাষ্য

সাংগঠনিক প্রস্তাবের মুখ-বন্ধটি স্বার্থবোধক নয়। এখানেই শান্তিপূর্ণ পন্থাটির উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু ডাঃ জি অধিকারী মুখবন্ধটির যে ব্যাখ্যা করেছেন (কম্যুনিষ্ট সাপ্তাহিক নিউ এজ-এ এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে) তার উদ্দেশ্য কি? ডাঃ অধিকারী জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে দেখিয়ে-ছেন যে, এখন ভারতে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার "সম্ভাবনা" দেখা দিয়েছে এবং গঠনতন্ত্রে এই "সম্ভাবনার" কথাই স্বীকার করা হয়েছে।

বিষদ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন: "আমরা গণপার্টি গঠনের জন্য কম্যুনিষ্ট পার্টির সামনে ব্যাখ্যান ও আইনসঙ্গত উপায়ে কাজ করার যে সব সুযোগ ও সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে তার উল্লেখ করছি। এমন পার্টি গঠন করতে হবে যে, সে বহুবিধ দায়িত্ব গ্রহণ করবার উপযোগী এবং প্রয়োজন হলে জনসাধারণকে বৈপ্লবিক পন্থার চালনা করতে সক্ষম হয়।"

ডাঃ অধিকারীর বক্তব্যের অর্থ কি এই যে, "শান্তিপূর্ণ পন্থাটি" কৌশল মাত্র, নীতি নয়। "প্রয়োজন হলে" "শান্তিপূর্ণ পন্থাটির" বদলে "বৈপ্লবিক পন্থা" অনুসরণ করতে হবে। এই "বৈপ্লবিক পন্থা" বলতে তিনি এবং কম্যু-নিষ্টরা কি বুঝেছেন?

কম্যুনিষ্টরা যদি সত্যি সত্যিই ভারতীয় "অবস্থা ও ঐতিহ্য" অনুসারে তাঁদের দলের গঠনতন্ত্র সংশোধন করে থাকেন, তবে স্পষ্ট ভাষায় এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

পুরোনো হয়ে গেছে। তার ভিতর একটি—৯০ ইঞ্চি স্টীল পাইপ লাইনটির অবস্থা অতি কম্পট-জনক। আর দুটির মতন এটিও অতি পুরোনো হয়ে গেছে এবং যে কোন সময়ে এটা একেবারে ফেটে যেতে পারে। নতুন পাইপ লাইন বসাবার ভার দেওয়া হয়েছে একটা বোম্বাইয়ের ফার্মকে বছর দুই আগে। অনেক পলিটিকস্ কাজ করেছে এই কনট্রাক্ট দেওয়ার ব্যাপারে।

আমাদের খবর হল এই ফার্মটি নানা অজুহাতে কিছুই করেনি—এই দু বছরেও সমস্ত অসেনি কি—এই বিষয়ে তদন্ত করার? পৌর সভা করে এই বিষয়ে আলোক সম্পাত করবেন।

কলিকাতার পানীয় জল

(দশম পৃষ্ঠার পর)

প্রয়োজন মিটাতে হলে অন্ততঃ-পক্ষে সাময়িক ভাবে দরকার খুব বড় বড় টিউব ওয়েল খনন করা, বিশেষ করে দরকার এগুলির বসতী অঞ্চলে যেখানে বেশীর ভাগ লোককেই নির্ভর করতে হয় গঙ্গা জলের উপর। তাদের দৈনিক চাহিদা মিটাবার জন্যে। —২।১টা টিউবওয়েল রাস্তার ধারে দেখা যায় এ সব অঞ্চলে তাতে যে কী ভীড় তাত সকলেই জানেন। শেষ পর্যন্ত জল নিয়ে এই গরমের দিনে মারামারি নিতা ব্যাপার।

কিছুদিন আগে কর্পোরেশন-এর এক বড় অফিসার বলেছিলেন যে চাহিদার তুলনায় ফিলটার্ড জলের সরবরাহ এত কম যে সে-জন্যে অনেক সংখ্যক পরিবারও নাকি ছেপো গেছে কলকাতায়।

মনে করুন কী সাংঘাতিক ব্যাপার। অমানের পৌর প্রতিষ্ঠান যে এ বিষয়ে ওয়াকিবহাল নয় তা নয়। কিন্তু দলীয় রাজনীতি এখানে এত প্রবল যে প্রয়োজন অনুযায়ী কাজ এগোয়না। টাকা বরাদ্দ করা হয় প্রতি বাজেটে জলের সরবরাহ বাবাবার জন্যে,—নতুন টিউবওয়েল খনন করার জন্য, কিন্তু নানা কারণে আর টাকা ব্যয় হয় আর ভুগতে হয় কলিকা-তার নাগরিকদের।

প্রশ্ন হচ্ছে তা হলে বিশুদ্ধ জল পাওয়ার উপায় কী? উপায় হচ্ছে—প্রথম বন্দোবস্ত করার ফিলটার্ড জলের ইনস্টেলিসন্ড এবং একসটেনসিভ্ এ্যালিসিস; তার-পর লিকেজ বার করার জন্যে স্টাফ নিয়োগ এবং ৮৪,০০০ বাড়ীতে কানেকসনের চেকভালভ্ ইনস্টো-ডিউস করা। সর্বোপরি আনফিল-টার্ড জলের সরবরাহ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করা।

ফিলটার্ড জলের পরিমাণ

কিন্তু আনফিলটার্ড জল বন্ধ করতে হলে আগে ফিলটার্ড জলের সরবরাহের পরিমাণ বৃদ্ধি করার বন্দোবস্ত করতে হবে। কতরকম প্ল্যান ও স্কীমের কথাই যে শোনা যায়। অজহাত ওঠে ফিনিশপত্র পাওয়া যাচ্ছেনা—টাকা পয়সার অভাব ইত্যাদি এবং আরও কত কী। জিজ্ঞাসা করি, যে দেশ ভাখরা নাঙ্গলের কাজ করতে পারে, বড় বড় স্টীল প্লান্ট করতে পারে, তারা কেন পারবেনা জোগাড় করতে প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের—কলি-কাতার জল সরবরাহের সমস্যা ব্যবস্থার উপযোগী?

আর একটা বিষয়ে কিছু বলে জলের ব্যাপার সম্বন্ধে বক্তব্য শেষ করব। পলতা থেকে তিনটি পাইপ লাইন দিয়ে জল নেওয়া হয় টালাতে। এই তিনটি পাইপ লাইনই

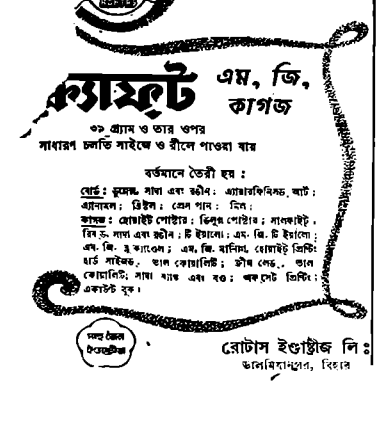

কংগ্রেস ও কম্যুনিষ্ট রাজনীতি

(নিজস্ব রাজনৈতিক ভাষ্যকার)

কংগ্রেসের প্রভাব যে ক্রমশই হ্রাস পাচ্ছে, কঠিন বাস্তবের সম্মুখীন হয়ে কংগ্রেসীরাও তা অস্বীকার করতে পাচ্ছেন না। জাতীয়তাবাদী কলহে ভারতের প্রধান রাজনৈতিক দল জর্জরিত। নেতৃত্বের জন্যেই যখন ভূত চুকেছে তখন তাদের পক্ষে সংগঠন থেকে ভূত তাড়ানো কি করে সম্ভব? স্বাধীনতার গত দশ বছরের বহু সুবিধাবাদী ও স্বার্থান্বেষী এসে এর উপরতলায় ভীড় জমিয়েছে। বহু প্রবীণ নেতারও পদস্খলন হয়েছে।

হাজার সমস্যায় জর্জরিত সাধারণ মানুষ নতুন পথের সন্ধানে ব্যস্ত। কংগ্রেসের সোস্যালিজমের বুলির সেইকরার শক্তি আর দেশপ্রেম রাখা চলছে না। গত দশ বছরে ধনীরা আরও ধনী হয়েছে। অথচ, সাধারণ কৃষক ও মজুর আরও দুর্দশাগ্রস্ত পড়েছে। বাস্তুহারা পুনর্বাসনের প্রায় সবকিছুর ছড়িয়ে রয়েছে। কংগ্রেসের হাতে শাসনভার থাকার দরুণ তাদেরই দুর্দশা-ক্লিষ্ট মানুষের বিক্ষোভ সহ্য করতে হচ্ছে।

অবশ্য কংগ্রেসের অস্তিত্বই সভায় বক্তব্য লোকসভাতে বসেই অনেক বিপক্ষ একথা মনে করবার কড়া সমালোচনা করেছেন। এই কোনো কারণ নেই। আজও তাঁর অদ্ভুত পরিস্থিতি একমাত্র পি-একক সর্বাধিক। বহু বছর সে এস-ডিগ্রতেই সম্ভব। নেতৃত্বের সর্বত্রহর রাজনৈতিক টানাহ্যাচড়ায় কর্মীরা কর্তব্যের কংগ্রেসকে বলে গণ্য হবে। কিন্তু হদিস পাচ্ছেন না। দলটি ছিন্ন-ভিন্ন না হয়ে আজও কি করে টিকে আছে, তাই আশ্চর্য।

দক্ষিণপন্থীরাও কোনঠাসা হয়েছে। উত্তর ভারতের কয়েকটি অঞ্চল বাদে জনসঙ্ঘের অস্তিত্ব বড় একটা চৈত্র পাওয়া যায় না। হিন্দু মহাসভাও নিশ্চিহ্ন হবার মুখে। অকালী দল সুবিধা করে উঠতে পারছে না। দক্ষিণ ভারতে মাদ্রাজে দ্রাবিড় কাজাগামের স্থানীয়ভাবে প্রতিপত্তি কিছু বেড়েছে। অন্যদিকে ছোট ছোট রাজপন্থী দলগুলো যে কোনো দিন ক্ষমতায় আসতে পারে, তা মনে করবার বাস্তব ভিত্তি এখনও নেই।

কম্যুনিষ্টদের সুযোগ

কংগ্রেসের উপর বিতৃষ্ণা বৃদ্ধি পাবার ফলে দেশে রাজনৈতিক প্রভাবের শূন্যতা ক্রমেই ব্যাপক হচ্ছে। প্রশ্ন এই, এই শূন্যতা কে পূরণ করবে। পি-এস-পি'র প্রচুর প্রভাব থাকা সত্ত্বেও নির্দিষ্ট নীতি ও কর্মসূচীর অভাবে সে এই সুযোগ গ্রহণে ব্যর্থ হচ্ছে।

সুযোগ নিচ্ছে কম্যুনিষ্ট দল। এরকম সুসংঠিত ও সুশৃঙ্খল দল কংগ্রেসও নয়, পি-এস-পিও নয়। গত নির্বাচনের পর তার প্রভাব দ্রুত বেড়েছে বলে মনে হয়। সমস্ত প্রদেশ আইনসভাগুলোতে তার প্রতিনিধি আছে। সর্বোপরি, কেরালার তো সে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে মন্ত্রিসভা গঠন করেছে। প্রাদেশিক সরকারের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। তাই বলে ভোটের জোরে কম্যুনিষ্টদের ক্ষমতা লাভের এই নজীরের গুরুত্ব অস্বীকার করবার উপায় নেই।

গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কেরালার কম্যুনিষ্ট শাসন প্রবর্তনের কিছু দিন আগে থেকেই আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট মহলে একটি নতুন রণনীতির আলোচনা শুরু হয়—শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা। প্রস্তাবটি প্রথম প্রকাশ্যে ব্যক্ত করেন শ্রীখ্রুশ্চেভ, ১৯৫৬ সালে। ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টিও কয়েক মাস যাবৎ এই নীতি আলোচনায় ব্যস্ত ছিল। গত ফেব্রুয়ারী মাসে কেন্দ্রীয় কমিটি গঠনতন্ত্র সংশোধনের যে প্রস্তাব করে তাতে এর উল্লেখ করা হয়।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কমিউনিজমের প্রভাব বাড়ছে। ভারতের এক কোণে কেরালার কম্যুনিষ্টরা বাস্তবে সমস্যা সমাধান করতে না পারলেও অন্তত দেশের সামনে এই নজীর রেখেছে যে, তাঁদের শাসন কংগ্রেসের শাসনের চাইতে খারাপ নয়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে যেমন দুর্নীতির দমনের ব্যাপারে উন্নত। এও তাঁরা প্রমাণ করেছে যে, কম্যুনিষ্টদের শাসন একটা ভীতিজনক কিছু নয়।

কম্যুনিষ্ট গঠনতন্ত্র

এই সটভূমিতে নেহিন অন্তত্সরে পার্টির বিশেষ কংগ্রেস বসে। আলোচনার মুখ্য বিষয় ছিল সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পন্থতি।

কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। পার্টির গঠনতন্ত্রে অল্প করেকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনও সাধন করা হয়। পলিট-ব্যুরো বদলে হয়েছে কার্যনির্বাহক সমিতি এবং কেন্দ্রীয় কমিটি হয়েছে জাতীয় পরিষদ। নতুন সংশোধনীগুলোর সমস্যা সংখ্যাও বাড়ানো হয়েছে।

অন্যতরের কম্যুনিষ্ট নেতৃবৃন্দ আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন তাঁদের পার্টি সম্বন্ধে অনেকের মধ্যে যে বদ্ধমূল ধারণা আছে যে তাঁরা বিদেশী একটি রাষ্ট্রের নির্দেশে চলেন তা দূর করতে। ঘোষণা করা হয়েছে আন্তর্জাতিকতায় বিশ্বাসী হয়েও পার্টি ভারতীয় অবস্থা ও ঐতিহ্য অনুসারে তার ইতিকর্তব্য স্থির করবে।

শান্তিপূর্ণ পন্থতিতে বিশ্বাস ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে এও বলা হয়েছে যে, কম্যুনিষ্টরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে অন্যান্যদের রাজনৈতিক মতবাদ প্রকাশ ও সংগঠনের স্বাধীনতা ব্যাপকতর করবে।

নিশ্চয়ই কম্যুনিষ্টরা মনে করেন এই ঘোষণার ফলে তাঁরা দেশের একটি বিরাট সংখ্যক লোকের মন থেকে কম্যুনিষ্ট ভীতি দূর করতে পারবেন এবং বিকল্প দল হিসেবে তাঁদের সুনাম বাড়াতে সক্ষম হবেন। তাঁরা ইতিপূর্বেই বলেছেন, আগামী নির্বাচনে তাঁরা কেরালা বাদে অন্ধ্র ও পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতা দখলের আশা পোষণ করেন।

কম্যুনিষ্ট দলের মধ্যে নানা বিষয়ে মত পার্থক্য বিদ্যমান। অন্যতরের সব মতাবলম্বীদেরই সমাবেশ হয়েছিল। শ্রীঅজয় ঘোষ তো ছিলেনই, পার্টির কৃতপূর্ব সেক্রেটারীরয়, শ্রী পি সি যোশী ও শ্রী বি টি রণদিভেও ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ হতে একদিকে যেমন ছিলেন শ্রীজ্যোতি গুপ্ত ও শ্রীজ্যোতি সসু, অন্যদিকে তেমনি ছিলেন শ্রীসরোজ সেন ও শ্রীসোমনাথ লাহিড়ী।

কার্যনির্বাহক সমিতি ও জাতীয় পরিষদের তালিকা দেখে মনে হয় দুটি সংস্থারই বিভিন্ন মনের নেতৃবৃন্দ নির্বাচিত হয়ে-

(নয়ম পৃষ্ঠায়)

কলিকাতার

পানীয় জল সরবরাহের অবস্থা ও অন্তঃপ্রণালীর সংস্কার প্রয়োজন

(দর্পণের প্রতিনিধি)

জলকষ্টের পানীয় জলের সরবরাহ এবং অন্তপ্রণালী সম্বন্ধে বিস্তৃত তথ্য অনুসন্ধানের জন্য দর্পণের বিজন্ম প্রতিনিধিকে নিযুক্ত করা হয়েছিল। আমরা স্থির করেছিলাম যে, বিশেষজ্ঞ কর্পোরেশনের অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সঙ্গে পরামর্শ করে এবং পাইপ লাইন সম্বন্ধে এযাবৎ যা-কিছু তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে, তার বিস্তৃত বিবরণ একত্র সংকলিত করে একটি নির্ভরযোগ্য রিপোর্ট দাঁড় করাব।

দর্পণের প্রতিনিধি যে রিপোর্ট প্রস্তুত করেছেন, সেটা তাদ্যাবধি এবং কর্তৃপক্ষ যদি এবিষয়ে এখনই সচেতন না হন, তাহলে কলকাতায় অন্যান্যরত্বের রোগ এবং মড়ক যে কোন মুহূর্তে আরম্ভ হতে পারে।

অন্ততঃ একথা নিশ্চয়ই অধিকাংশে পাঠক স্বীকার করবেন যে, পানীয় জলের একটা বিস্তৃত পরীক্ষা অবিলম্বে প্রথম শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে করানো প্রয়োজন। হয়ত কলকাতায় উদরাময়, এমিবায়াসিস জাতীয় রোগের প্রতিষেধক সম্বন্ধেও এর থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যাবে। কলকাতার জল সরবরাহের ব্যবস্থা এমন এক অবস্থায় এসে পৌঁছেছে যে আলোচনা করলে মনে হবে যে কলেরা না হওয়াটাই আশ্চর্যের। কলকাতার সব নাগরিক যে কেন আজ কলেরার আক্রান্ত হচ্ছে না—এটাই বরং সবচাইতে বড় রকমের বিস্ময় বলে মনে হচ্ছে।

পলতা থেকে যে জল ১৪ মাইল রাস্তা ধরে তিনটি বড় পাইপের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে টালা ট্যাঙ্কে প্রবেশ করে, তাকে বিশুদ্ধ করার জন্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা আছে। এবং নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, টালার ট্যাঙ্ক থেকে যে জল বেরিয়ে আসে সেটা অপরিশুদ্ধ নয়।

কিন্তু টালা থেকে জল কলকাতার অন্তঃনালীর ভিতর দিয়ে যখন প্রবাহিত হয়, সেই বিষাক্ত অসংখ্য ছিদ্রযুক্ত পাইপ লাইনের ভিতরে এই পানীয় জলের বিশুদ্ধতা যে থাকতে পারেনা, সেবিষয়েও বিশেষজ্ঞদের মধ্যে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

টালা থেকে বেরিয়ে এই জল কলকাতায় প্রায় ৬০০ মাইল অন্তঃ প্রণালীর মারফৎ নগরীর একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত প্রবাহিত হয় এবং সেখানে জল দূষিত না হয়ে কোথা উপায় নেই।

কলকাতার পাইপ লাইন সম্বন্ধে একটি রিপোর্ট তৈরী করা হয়েছিল। তা থেকে দেখা যায়, সহরের বেশীর ভাগ মেইনগুলি বহুদিন যাবৎ ক্ষয়িষ্ণু হয়ে রয়েছে—কোনো কোনো কোনো পাইপ ৭০ বৎসরের

(নবম পৃষ্ঠায়)

সম্পাদকীয়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ভারতবর্ষেই অন্যান্য নগরীর তুলনায় কলকাতার শ্রেণী বৈষম্য যে আরও কত সুস্পষ্ট এবং গভীর —সভ্যতার বহির্লক্ষণের অন্তরালে ৮ লক্ষ মানুষের জন্য একটা নারকীয় জগৎ সৃষ্টি করে রাখা হয়েছে, সেখানে জীবনের এবং নগর সভ্যতার ন্যূনতম চাহিদাটিও সরবরাহ করা হয়নি এবং এই পিছনে যে কলাকৌশলের রাজনীতি আছে, প্রশাসনিক অযোগ্যতার যে নিকৃষ্টতম দৃষ্টান্ত রয়েছে—কলেরার মহামারীর দ্বারা নেকথা উদ্ঘাটিত হয়। এবং প্রতি বৎসর এই দুহৃৎ কলঙ্ক আমরা মাথা পেতে নিই। অথচ একটি সত্যের সম্মুখীন হতে হয়: "জনপ্রতিনিধিদের" দ্বারা চালিত হয়েও কলকাতা কর্পোরেশন গত ৩০।৪০ বৎসরে ক্রমশঃ অধঃপতনের দিকে গেছে, কর্মসঙ্কটের দিকে এক ধাপ তার উন্নতি ঘটেনি এবং এই পৌরসভার রাজনীতি এমন সাঘাতিক যে, মানুষের পানীয় জল নিয়ে কাউন্সিলর এবং অফিসারেরা হাতে ব্যবসাবৃদ্ধিতে নামতেও কুণ্ঠিত নন। শুধু, রোগের কথা নয়, মৃত্যুর কথাও নয়, এ কি পলঙ্গে সমাজে অসহায় বন্দী আছি? এ কি বীভৎস সমাজ, যার মধ্যে ভোট, কাউন্সিলর, গণতন্ত্র এবং গভর্ণমেণ্টের প্রহসন চলছে?

সম্পাদক—শ্রীরজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য

সম্পাদক কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস, ৭নং ওয়েলিংটন স্কোয়ার, কলিকাতা—১৩ হইতে মুদ্রিত এবং ৭নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা—১৩, দর্পণ কার্যালয় হই